শাস্ত্রমূলক

ভারতীয় শক্তিসাধনা

উপেন্দ্রকুমার দাস

প্রথম খণ্ড

অধ্যায় ১—অধ্যায় ১২

ভূমিকা-সংকেত-সংশোধন ও সংযোজন-সূচীপত্র-শ্লোকাদিসূচী-সহ

"বদামস্তে কিংবা জননি বয়মুচ্চৈর্জড়ধিয়ঃ
ন ধাতা নাপীশো হরিরপি ন তে বেত্তি পরমম্।
তথাপি ত্বদ্ভক্তিঃ মুখরয়তি চাস্মাকমমিতে
তদেতৎ ক্ষন্তব্যং ন খলু পশুরোষঃ সমুচিতঃ॥"

ভূমিকা

অনেক বছর আগেকার কথা, সন তারিখ ঠিক মনে নেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত শাক্তপদাবলী পড়াবার ভার নিতে হয়। পড়াতে গিয়ে দেখি এ শুধু সাহিত্যের অধ্যাপনা নয়, আলোচ্য গ্রন্থে সাহিত্যকে অতিক্রম করে এমন এক সাধনার সন্ধান আছে, যার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানি না আর যা জানি তাও ভাসাভাসা রকমের। নিজের এই অজ্ঞতা যেমন লজ্জা দিল তেমনি এ সম্বন্ধে অনুসন্ধানেও প্রবৃত্ত করল।

বাঙলা ভাষায় শক্তিসাধনা সম্বন্ধে কোনো পূর্ণাঙ্গ প্রামাণ্য আলোচনা আছে কিনা স্বভাবতঃই প্রথমে তার অনুসন্ধান করলাম। দুর্ভাগ্যের বিষয় সে-রকম কোনো বই পাওয়া গেল না। তন্ত্রতত্ত্ব, কৌলমার্গরহস্য, তান্ত্রিক গুরু প্রভৃতি গ্রন্থে শক্তিসাধনা সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট আলোচনা আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু কোনো গ্রন্থেই এই সাধনার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না।

ইংরেজি ভাষায় শক্তিসাধনা সম্বন্ধে ব্যাপকতর আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মহামতি উডরফের দান সর্বাগ্রগণ্য ও সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণীয়। প্রধানতঃ তাঁরই ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে আমাদের দেশের একটি নিগূঢ় সাধনার যথার্থ রূপ ইংরেজি-শিক্ষিত ব্যক্তিদের কাছে প্রকাশিত হয়েছে।

কিন্তু ইংরেজি গ্রন্থাদিতেও শক্তিসাধনার ধারাবাহিক আলোচনা নাই এবং তার পূর্ণ পরিচয়ও পাওয়া দুষ্কর। তা ছাড়া যাঁরা ইংরেজি জানেন না এসব গ্রন্থ তাঁদের নাগালের বাইরে।

শক্তিসাধনার বিস্তৃত বিবরণ আছে তন্ত্রশাস্ত্রে। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় রচিত তন্ত্রগ্রন্থ অল্পলোকেরই অধিগম্য। বাংলার আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় ইংরেজি যতটা জানেন সংস্কৃত জানেন তার চেয়ে ঢের কম। কাজেই তন্ত্রশাস্ত্র পড়ে শক্তিসাধনার বিষয় অবগত হওয়া এঁদের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

বার বার মনে হয়েছে শক্তিসাধনার মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায় এরকম একখানা বাঙলা বই থাকলে বড় ভাল হত। কিন্তু এই বই লেখার চেষ্টা আমি করব এ কথা ভাবতেও পারি নি। কারণ এরূপ কাজের যোগ্যতা যে আমার নেই তা ভাল করেই জানতাম।

গোড়ায় অধ্যাপনার সীমিত প্রয়োজনেই বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধান আরম্ভ করা গিয়েছিল। কিন্তু এক সময়ে বিষয়ের আনন্দে কখন যে প্রয়োজন গেল তলিয়ে তা আজ আর স্মরণ হয় না। কাজের ফাঁকে ফাঁকে বছরের পর বছর ধরে তথ্য সংগ্রহ করেছি, কিছু বুঝেছি কিছু

বুঝিনি, কিন্তু আনন্দের অভাব হয়নি। মনে হল বিষয়ের গুণে যে-আনন্দ পেয়েছি আরও কেউ কেউ হয়ত সেই আনন্দের অভিলাষী হতে পারেন। তাঁদের কথা স্মরণ করেই আমার এই প্রয়াস। এতে শক্তিসাধনার ইতিহাসগত, অনুষ্ঠানগত এবং তত্ত্বগত মোটামুটি একটা সামগ্রিক পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

শক্তিসাধনার গভীরের রহস্য শাস্ত্রমর্মজ্ঞ সাধকই উদ্‌ঘাটিত করতে পারেন। সেখানে আমার মতো অনধিকারীর প্রবেশ নাই। আমার সামান্য বিদ্যাবুদ্ধি অনুসারে তন্ত্রশাস্ত্র থেকে যেটুকু জানতে পেরেছি তাই আমার সম্বল এ কথা গোড়াতেই কবুল করা আবশ্যক।

মানুষের ধর্মসাধনাও বিবর্তনের ধারা অনুসরণ করেছে। যতটা জানা যায় জগতের সর্বত্রই আদিম মানবের মধ্যে ধর্ম বলতে যা ছিল তা একই ধরণের ছিল। তার পর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রতিবেশে মানবগোষ্ঠীর মধ্যে তার রূপ বদলে বদলে গেছে।

সেইজন্য শক্তিসাধনার ঐতিহাসিক আলোচনা আমি আদিম মানুষের দেবতা ও ধর্ম দিয়েই সুরু করেছি। শক্তিসাধনার বিরাট্ স্রোতে নানা ধারা এসে মিশেছে। আদিম মানবের একাধিক বিশ্বাসের ধারা সেই স্রোতে লক্ষ্য করা যায়।

আদিম মানুষের আদি দেবতা শক্তি। শক্তিসাধনার আদিরূপ দেবীপূজা। একদা জগতের প্রায় সর্বত্রই কোনো না কোনো আকারে দেবীপূজা প্রচলিত ছিল। দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেবী তথা মাতৃদেবতার পূজার উৎস-সন্ধান করতে গিয়ে ভারতের বাইরে দেবীপূজার বিষয়ও আলোচনা করা গেছে। যতটা জানতে পারা যায় মাতৃপ্রধান মানবগোষ্ঠী বা কৌমের মধ্যে প্রধানতঃ দেবীপূজা তথা মাতৃদেবতার পূজার প্রচলন হয় আর পিতৃপ্রধান মানবগোষ্ঠী বা কৌমের মধ্যে পুরুষদেবতার পূজার। আদিম মানুষ অন্ততঃ তাদের কোনো কোনো দল এক রকম করে স্ত্রীদেবতাকে সৃষ্টির মূল মনে করেছে এবং প্রজনন তথা যৌনব্যাপারের সঙ্গে দেবীপূজার একটা যোগাযোগ কল্পনা করেছে। ঐতিহাসিক বিচারে শক্তিসাধনার উপায় বিশেষের সঙ্গে যৌনব্যাপারের সংযোগের মূল সম্ভবতঃ এইখানে।

ভারতের মহামানবের সাগরে এসে মিশেছে নানা মানুষের ধারা। নৃতত্ত্বের বিচারে এদের নেগ্রিটো আদি ছটি ভাগ করা হয়েছে। ইতিহাসের দিক্ দিয়ে দেখতে গেলে এদেরই ধর্মবিশ্বাসাদির মধ্যে ভারতীয় প্রধান প্রধান ধর্মসাধনার উৎস সন্ধান করতে হয়। অবশ্য এদের বেশীর ভাগ লোকের সম্বন্ধেই বিশেষ কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। এখানেই মুশ্‌কিল।

যতটা জানা যায় ভারতের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে প্রোটো-অষ্ট্রলয়েডরা প্রধানতঃ স্ত্রীদেবতার পূজা করত। কেউ কেউ এদের শক্তিপূজার প্রবর্তক বলেন।

অনুমান হয় প্রোটো-দ্রাবিড় বা আদি-দ্রাবিড়দের মধ্যেও দেবীপূজার প্রচলন ছিল। মহেঞ্জোদড়োতে মাতৃদেবতার পূজার নিদর্শন পাওয়া গেছে। বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতেরা কেউ কেউ মহেঞ্জোদড়োকে আদি-দ্রাবিড়দের কীর্তি মনে করেন।

আবার কারো কারো অনুমান শক্তিপূজার উদ্ভব হয় বহিরার্যদের মধ্যে। দেবীপূজা বেদপন্থী আর্যদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তাদের কোনো কোনো 'জন' মাতৃতন্ত্র ছিল। মাতৃরূপিণী দেবতার পূজা ভারতের বাইরে থেকে ভারতে এসেছে কিংবা আর্যেতর লোকেদের কাছ থেকে আর্যদের মধ্যে এসেছে এ সম্বন্ধে কোনো সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত করার মতো যথোপযোগী প্রমাণ পাওয়া যায় না।

আর্য 'জন'-এর মধ্যে মাতৃতন্ত্র তাদের আদিম অবস্থা থেকেই প্রচলিত ছিল। ঋগ্‌বেদেই তার নিদর্শন আছে। উক্ত বেদে আছে অদিতির কথা। শাক্তদের আরাধ্যা ব্রহ্মময়ী মহাশক্তির আদি শ্রৌত রূপ এই অদিতি। অদিতিই কালী, দুর্গা, সর্বদেব-স্বরূপিণী।

মহাশক্তি সম্বন্ধে তন্ত্রাদিতে বিধৃত কয়েকটি ধারণারও সূচনা বেদে লক্ষ্য করা যায়। শাক্ততন্ত্রে বর্ণিত নানা আচার অনুষ্ঠানের মূল বিশেষ করে অথর্ববেদে পাওয়া যায়। অথর্ববেদোক্ত ধর্মের সঙ্গে তন্ত্রোক্ত ধর্মের অনেক মিল আছে। তন্ত্রশাস্ত্রে অথর্ববেদকে 'শক্ত্যাচারসমন্বিত' বলা হয়েছে।

বৈদিকে অবৈদিকে মিলে ভারতের সনাতন ধর্ম অর্থাৎ হিন্দুধর্ম। অথর্ববেদে তার প্রাচীনতম নিদর্শন স্পষ্টরূপে লক্ষ্য করা যায়। শাক্তধর্ম এই সনাতনধর্মেরই রূপবিশেষ। এতেও বৈদিক অবৈদিক উভয় ধর্মের সমন্বয় হয়েছে। মা মহাদেবীর পূজা স্বতন্ত্রভাবেই বেদপন্থী ও অবেদপন্থী ভারতীয়দের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

শক্তিসাধনার সাধ্যা ব্রহ্মময়ী মহাশক্তির ভাবরূপ-রচনায় আর্য এবং আর্যেতর উভয়বিধ উপাদানই স্থান পেয়েছে বটে তবে এক্ষেত্রে আর্যদের দানই সমধিক মনে হয়।

অদিতির মধ্যে মহাদেবীর যে-ভাবরূপের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় রাত্রিসূক্ত ও দেবীসূক্তে তা আরও পরিস্ফুট হয়েছে।

বৈদিক দেবমণ্ডলে কালে কালে নানা পরিবর্তন ঘটেছে। বিভিন্ন বৈদিক দেবী কালে ব্রহ্মময়ী মহাদেবীর মধ্যে মিশে গেছেন শ্রৌত সাহিত্যেই তার নিদর্শন আছে। অদিতি এবং বাক্‌ এক হয়ে গেছেন, বাক্‌ ও সরস্বতী এক হয়েছেন। বৈদিক সরস্বতী রণদেবী। তাঁর মধ্যে দেবী দুর্গার পূর্বাভাস পাওয়া যায়। তা ছাড়া বৈদিক রণদেবতা ইন্দ্রও মহাদেবীর রূপকল্পনার উপাদান হয়েছেন।

কেনোপনিষদে প্রথম দেখা মিলে উমা হৈমবতীর। আমাদের ধারণা এই উমার রূপকল্পনার মূল বৈদিক সোম। সোমই কালে উমামূর্তি পরিগ্রহ করেছে।

শ্রৌতসাহিত্যের পর্যালোচনায় স্পষ্ট বোঝা যায় যে শাক্তদের আরাধ্যা মহাদেবী বহিরাগতা নন এবং মূলতঃ আর্যেতর লোকেদের দেবতাও নন। দেবীর আরাধনা যে আর্য এবং আর্যেতর উভয় জনসম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচলিত ছিল এরূপ সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যায়।

শ্রুতি-পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যে মহাদেবীর রূপ সুস্পষ্ট আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

মহাভারতের নানা স্থানে শিবপত্নী উমা বা পার্বতীর উল্লেখ আছে। কিন্তু মহাদেবীর বিশিষ্ট রূপ প্রকাশিত হয়েছে বিরাট্‌পর্বের অন্তর্গত যুধিষ্ঠিরকৃত আর্যাস্তবে এবং ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত অর্জুনকৃত আর্যাস্তবে। স্তবদুটিকে অনেকে প্রক্ষিপ্ত মনে করেন। কিন্তু এই প্রক্ষেপের কাল সম্বন্ধে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হবার মতো অকাট্য প্রমাণ বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না।

সংস্কৃত সাহিত্যের নানা স্থানে নানা দেবীর কথা আছে। অনুমান করা যায় দেশে এঁদের পূজা প্রচলিত ছিল। ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে এই-সব দেবীরা ভিন্ন হলেও তত্ত্বদৃষ্টিতে সবাই যে একই মহাদেবীর বিভিন্ন রূপ দেবীমাহাত্ম্যজ্ঞাপক নানা বর্ণনায় তার প্রমাণ মিলে।

প্রাচীন সিল, মুদ্রা, প্রত্নলিপি প্রভৃতিতে নানা দেবীর নিদর্শন আছে। মহেঞ্জোদড়ো হড়প্পার যুগ থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন শতাব্দীর ভাণ্ডারে এসব সঞ্চিত হয়ে আছে। দেবীপূজার প্রাচীনত্বের অন্যতম প্রমাণ হিসাবে এই সবের সন্ধান করা গেছে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ভারতে দেবীপূজার ধারা সমানে বয়ে চলেছে।

ভারতের দেবী-আরাধনা একদা তার ভৌগোলিক সীমা ছাড়িয়ে বৃহত্তর ভারতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। চম্পায় ও কম্বোজে এ কথার প্রত্নলিপি-প্রমাণ আছে; যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ ও সুমাত্রায় আছে মূর্তি-প্রমাণ। । দেবীপূজার প্রাচীনত্ব ও প্রভাব পর্যালোচনার ক্ষেত্রে এই সব প্রমাণের বিশেষ গুরুত্ব আছে।

ভারতের দুটি প্রাচীন অবেদপন্থী ধর্ম বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম। এই উভয় ধর্মের গ্রন্থাদিতে বিশেষ করে মহাযানী বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে দেবীপূজার পরোক্ষ নিদর্শন আছে। মহাযানী বৌদ্ধমতে বিভিন্ন দেবীর আরাধনার কথা পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব দেবদেবীর আরাধনা নিষেধ করেছেন তবু মহাযানে দেবীদের আরাধনা স্বীকৃত। এটি দেবীপূজার ব্যাপক প্রভাবের নির্দেশক।

বৌদ্ধদের মতো ততটা না হলেও জৈন আচার্যরাও স্বীয় মতে জনপ্রিয় দেবীপূজার স্বীকৃতি না দিয়ে পারেন নি।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে মহাদেবীর ভাবমূর্তি-রচনায় আর্যেতর উপাদানও নগণ্য নয়।

আর্যেতর লোকেদের মধ্যে দেবীপূজার যে-সব নিদর্শন পাওয়া গেছে তার থেকে এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সারা দেশে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে দেবীপূজার ব্যাপক প্রচলন ছিল। এই ব্যাপকতার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের দেবীস্থান ও দেবীতীর্থের বিবরণে।

তন্ত্রশাস্ত্রমতে শিব ও শক্তি অভিন্ন। শিবের বিষয় পর্যালোচনা করলে এই তত্ত্বের তথ্যগত ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। সেইজন্য শক্তিসাধনার অন্যতম ভিত্তিরূপে শিব ও শৈবদর্শনের বিষয় আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

শিবের আদিরূপ বৈদিক রুদ্র। বাজসনেয়ি-সংহিতা অনুসারে রুদ্রের ভগ্নী অম্বিকা। তৈত্তিরীয়-আরণ্যকে অম্বিকা হয়ে পড়েছেন রুদ্রের পত্নী। উক্ত আরণ্যকে রুদ্রকে উমাপতি ও পশুপতি বলা হয়েছে। অম্বিকা ও উমা একই মহাদেবীর ভিন্ন ভিন্ন নাম।

বৈদিক ঋষিরা প্রকৃতির ধ্বংসাত্মক রূপের মধ্যে রুদ্রকে প্রত্যক্ষ করতেন। যা কিছু মানুষের অনিষ্টকর ও প্রাণনাশক তাই তাঁরা রুদ্রের সঙ্গে যুক্ত মনে করতেন। রুদ্র ধ্বংসের দেবতা। তাঁকে সবাই অত্যন্ত ভয় করত।

তবে রুদ্র শুধু ভয়ংকর নন, তিনি কল্যাণকারীও বটেন। স্তবকারীদের তিনি ধন জন আয়ু বল সুখ প্রভৃতি প্রদান করেন, তাদের রক্ষা করেন। তিনি বরাভয়দাতা।

রুদ্র ভয়ংকর হলেও সুন্দর। তাঁর গলায় ছিল বিবিধরূপের হার। কালীর রূপকল্পনায় রুদ্ররূপের প্রভাব অনুমান করা যায়। কালীর রূপও ভয়ংকর এবং সুন্দর। রুদ্রের গলার হারই তাঁর মুণ্ডমালার আদিরূপ।

রুদ্র পিতৃদেবতা, সৃষ্টির দেবতা। পিতৃশক্তি ও মাতৃশক্তির মিলনে সৃষ্টি। সম্ভবতঃ সেই কারণে পিতৃদেবতা রুদ্র মাতৃদেবতা অম্বিকার পতি গণ্য হয়েছেন।

ঋগ্বেদেই এ ব্যাপারের সূচনা হয়েছে। উক্ত বেদে অদিতিকে বলা হয়েছে রুদ্রদের মাতা আর রুদ্রকে বলা হয়েছে রুদ্রদের পিতা। পূর্বেই বলা হয়েছে অদিতি মা মহাদেবীর আদিরূপ।

রুদ্রের বিবিধ পরিচয় পাওয়া যায় যজুর্বেদে। এই সংহিতাতেই আছে রুদ্র সব শ্রেণীর সব মানুষের দেবতা, এমন কি তিনি চোর-ডাকাতদেরও দেবতা।

রুদ্রের সঙ্গে অরণ্য ও পর্বত, জল ও আকাশের বিশেষ যোগ। রুদ্র কৃষির দেবতা।

রুদ্রকে যজুর্বেদেই প্রথম শিব বলা হয়েছে। অথর্ববেদে আছে অসিত রুদ্রের কথা। রুদ্র কালো, মৃত্যুও কালো। রুদ্র মৃত্যু ঘটান। কাজেই রুদ্রের সঙ্গে মৃত্যুর দেবতা যমের একটা যোগাযোগ বেদসংহিতাতেই লক্ষ্য করা যায়।

রুদ্র সংহার ও সৃষ্টির দেবতা। কালও তাই। অথর্ববেদেই কালের স্রষ্টৃরূপের উল্লেখ আছে। মহাভারতে রুদ্রশিবকে বলা হয়েছে মহাকাল। পুরুষরূপে দেখলে যিনি মহাকাল, স্ত্রীরূপে দেখলে তিনিই মহাকালী।

রুদ্র ব্রহ্ম। অথর্ববেদে ও আরণ্যকে রুদ্রের এই পরিচয় প্রথম পাওয়া যায়। এটিকে শৈব ও শাক্ত দর্শনে ব্যাখ্যাত পরমশিবের পূর্বরূপ বলা যেতে পারে। রুদ্র ব্রহ্ম এই তত্ত্বটি উপনিষদ্‌যুগে আরও সুস্পষ্ট হয়েছে। শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদে রুদ্রশিবই ব্রহ্মরূপে বর্ণিত হয়েছেন। এই ভাবধারা তন্ত্রশাস্ত্রেও অনুসৃত হয়েছে।

পৌরাণিক যুগে শিব রুদ্রের স্থান গ্রহণ করেছেন। রুদ্রের গুণধর্মাদি আত্মসাৎ করলেও শিবের রূপ প্রধানতঃ শান্ত, কল্যাণময়। রুদ্রের ভয়ংকরত্ব সে-রূপের আড়ালে ঢাকা পড়েছে।

রুদ্র যেমন শিবও তেমনি জনসাধারণের দেবতা। তাঁর দুই রূপ— বেদগ্রাহ্য ও বেদবাহ্য। মহাভারতে তার পরিচয় আছে। বিশেষ করে দক্ষযজ্ঞকাহিনীতে।

বেদসংহিতাতেই শিবকে বলা হয়েছে পশুপতি। অথর্ববেদের মতে মানুষও পশু। মহাভারতে পশুপতি শিবের উপাসকদের অনুসৃত পাশুপত ধর্মের বিবরণ আছে। এই ধর্ম বর্ণাশ্রম-ধর্মের বিরোধী। তার থেকে অনুমান হয় পশুপতি বেদবাহ্য দেবতা।

কিন্তু শতরুদ্রিয়ের একাধিক মন্ত্রে রুদ্রকে পশুপতি বলা হয়েছে। কাজেই মনে হয় পশুপতি বেদপন্থীদেরও দেবতা।

মহাভারতে আছে শিব রক্তমাল্যাম্বরধর, পক্বান্নমাংসলুব্ধ। তিনি দশবাহু। তাঁকে অষ্টাদশভুজও বলা হয়েছে। ইনি সশক্তি শিব। শিবের শক্তি শিব থেকে অভিন্ন। তাই শিবের অনেক বিশেষত্ব তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। উভয়ের রূপকল্পনা সাদৃশ্যবহুল।

মহাভারতে দেখা যায় শিবপ্রতিমা ও শিবলিঙ্গ উভয়েরই অর্চনা হত। তবে লিঙ্গে শিবার্চনা অধিকতর প্রশস্ত মনে করা হত।

শিবলিঙ্গ ও গৌরপট্ট সম্বন্ধে আমরা কিঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবেই আলোচনা করেছি। শক্তি-সাধনার একটি বিশেষ উপায়ের মর্ম বুঝবার জন্য এই আলোচনা আবশ্যক।

শিবোপাসনার আলোচনাসূত্রে প্রধান প্রধান শৈব সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

শাক্তমত বা দর্শন ভাল করে বুঝতে গেলে শৈব মত বা দর্শনের বিষয় জানা আবশ্যক। যতটা জানা যায় পৃথক্ দর্শনরূপে শাক্তদর্শন প্রচারিত হওয়ার আগে শৈবদর্শনই ছিল শক্তিসাধনারও দার্শনিক ভিত্তি। এই উভয় দর্শনের মধ্যে মিল খুব বেশী।

মাধবাচার্য সর্বদর্শনসংগ্রহে শৈব মতের যে-চারটি শ্রেণীবিভাগ করেছেন শৈবদর্শনের আলোচনায় আমরা প্রধানতঃ তারই অনুসরণ করেছি।

শৈবদর্শন পর্যন্ত আমাদের আলোচনাকে শক্তিসাধনার ভিত্তি-ভূমিকা মনে করা যায়।

এর পর আমাদের আলোচনা সুরু হয়েছে শক্তিতত্ত্ব দিয়ে। শৈব এবং শাক্ত উভয় মতেই শিব ও শক্তি স্বরূপতঃ অভিন্ন। উভয়ের ভেদ কল্পিত। যেখানে ভেদ কল্পনা করা হয় সেখানেও শৈবরা বলেন শক্তি শিবেরই রূপ আর শাক্তরা বলেন শিব শক্তিরই রূপ।

শক্তি ব্রহ্মস্বরূপিণী। উপনিষদে যে-ব্রহ্মলক্ষণ নির্দিষ্ট হয়েছে তন্ত্রশাস্ত্রে শক্তিরও সেই লক্ষণ নির্দিষ্ট। বস্তুতঃ এক্ষেত্রে তন্ত্রশাস্ত্রে ঔপনিষদ ব্রহ্মতত্ত্বই অনুসৃত হয়েছে বলা যায়। তবে উভয় শাস্ত্রের প্রস্থান ভিন্ন বলে ব্রহ্মতত্ত্বের উপস্থাপনও ভিন্ন হয়েছে একথা বলাই বাহুল্য।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে শাক্তরা সাধারণভাবে শিবকে স্বীকার করেন। শিবশক্তির নিত্য-অবিনাভাবসম্বন্ধ স্বীকার করেন। কিন্তু সবাই করেন না। যেমন শক্তিকারণতা-বাদীরা শিবের কল্পনা অনাবশ্যক মনে করেন।

শক্তিতত্ত্বের আলোচনা থেকে সহজেই শাক্তদর্শনের কথা এসে পড়ে। শক্তিসম্বন্ধীয় তত্ত্ব শ্রুতিতেই অভিব্যক্ত হয়েছে অথচ সর্বদর্শনসংগ্রহাদি কোনো দর্শনসংগ্রহগ্রন্থে শাক্তদর্শনের উল্লেখ নাই। প্রসঙ্গতঃ এর কারণ অনুসন্ধান করা হয়েছে।

শাক্ত মতে সাধনাই মুখ্য, দর্শন গৌণ। তন্ত্রশাস্ত্রে তাই মোটের উপর দর্শনের অনাদর। মনে হয় গোড়ার দিকে শক্তিসাধনার সঙ্গে স্বতন্ত্র শাক্তদর্শন প্রচারিত না হবার এটি একটি অন্যতম কারণ।

তবে অন্ততঃ পক্ষে নবম খৃষ্ট শতক থেকে শাক্ত দার্শনিক মত প্রচলিত ছিল এ কথা বলা যায়।

প্রধানতঃ শক্তিসূত্র, পরশুরামকল্পসূত্র প্রভৃতি আকর-গ্রন্থে এবং অভিনবগুপ্ত, ভাস্কররায়-প্রমুখ আচার্যদের রচনায় শাক্ত দার্শনিক মত প্রচারিত হয়েছে।

শৈব দর্শনেও শাক্ত দার্শনিক তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে প্রত্যভিজ্ঞা-দর্শনের নাম করতে হয়। এই দর্শনও আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত।

শক্তিসাধনার সঙ্গে শাক্ত দার্শনিক তত্ত্ব ওতপ্রোত। সাধনার ক্ষেত্রে প্রয়োগেই দর্শনের সিদ্ধান্তের চরম সার্থকতা। আমরা সাধনার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখেই দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা করেছি। শাক্তদর্শনের দার্শনিকোচিত আলোচনা আমাদের লক্ষ্য নয়।

শক্তিসাধকের কাছে আগে সাধনা পরে দর্শন। আমরা সুবিধা হবে মনে করে দর্শনের পরে সাধনার আলোচনা করেছি।

তলিয়ে দেখলে দেখা যায় সব সাধনাই মূলতঃ শক্তিসাধনা। তবু যা প্রত্যক্ষভাবে শক্তিসাধনা বলে গণ্য তা তান্ত্রিক সাধনা।

শক্তিসাধনার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এ সাধনার দ্বার সবার কাছে উন্মুক্ত। শাস্ত্রোক্ত অধিকার থাকলে স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে যে-কোনো ব্যক্তি এ সাধনায় ব্রতী হতে পারেন।

শক্তিসাধনায় ভুক্তি ও মুক্তি উভয়ই লাভ হয়। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয় মার্গেই এ সাধনা বিহিত। তবে শক্তিসাধনা মূলতঃ নিবৃত্তিমার্গের সাধনা। এ নিবৃত্তি নিগ্রহমূলক নয়। সাধকের প্রকৃতি-অনুসারেই শক্তিসাধনার বিধান আছে।

কাজেই এ সাধনা সাধারণ সংসারী মানুষেরও অধিগম্য। অধিকার অনুসারে সমাজের সব শ্রেণীর মানুষের উপযোগী শক্তিসাধনার ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে।

মনে হয় প্রধানতঃ এমনি উদার বিধানের জন্য শক্তিসাধনা ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এক জন্মেই মুক্তির আশ্বাস এ সাধনার জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ হতে পারে।

শক্তিসাধনার নানা স্তর। নিম্নাধিকারীর সাধনা অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের এবং সহজ কিন্তু উচ্চাধিকারীর ব্রহ্মলক্ষ্য সাধনা অতি-উচ্চস্তরের এবং অত্যন্ত কঠিন।

তবে নিম্নাধিকারীর পক্ষে বিহিত সাধনাও পরম কল্যাণকর। শক্তিসাধনা সাধককে দেহমনে শক্তিশালী করে তোলে। এরূপ ব্যক্তি দেশের ও দশের প্রকৃত হিতসাধন করতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় শক্তিসাধনায় দেহের গৌরব বিশেষভাবে স্বীকৃত। শাক্তরা বলেন শরীরই যদি না থাকে তা হলে কি দিয়ে পুরুষার্থলাভ হবে। তা ছাড়া মানবদেহ বিচিত্রশক্তির আধার। শক্তিসাধনার অন্যতম লক্ষ্য এই-সব শক্তিকে পূর্ণবিকসিত করা। কাজেই দেহকে ক্লিষ্ট করা এ সাধনায় নিষিদ্ধ।

শক্তিসাধনা পরমার্থতঃ অদ্বৈতব্রহ্মসাধনা। এ সাধনা জ্ঞানমূলক। প্রথমে পরোক্ষ শাস্ত্রজ্ঞান, পরে অপরোক্ষ শক্তিজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান।

জ্ঞানমূলক হলেও এ সাধনায় কর্ম ও ভক্তির স্থানও সমান গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণভাবে বলা যায় শক্তিসাধনায় জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির সমন্বয় হয়েছে।

সাধক সাধ্য ও সাধনোপায় এই তিনে মিলে সাধনা। পর পর এই তিনের আলোচনা করা হয়েছে।

যাঁরা কোনো সিদ্ধিলাভের জন্য শাস্ত্রবিহিত সাধনা করেন তাঁরাই সাধক। বিভিন্ন বিচারে সাধকের বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে।

শক্তিসাধনা প্রধানতঃ গৃহস্থের সাধনা। তন্ত্রশাস্ত্রে গৃহস্থের একটি আদর্শ নির্দিষ্ট হয়েছে। শাস্ত্রোক্ত আদর্শ গৃহস্থ যে-কোনো দেশে উত্তম নাগরিক এবং দেশের গৌরবস্থল বলে গণ্য হতে পারেন।

ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ সাধককে বলা হয় গৃহাবধূত। উপনিষদের ঋষিরাও গৃহী। এ ক্ষেত্রে প্রাচীন ঔপনিষদ ধারা অনুসৃত হয়েছে।

সর্বোচ্চ স্তরের শক্তিসাধককে বলা হয় কুলাবধূত। ইনি কৌলমতের সাধক। প্রত্যক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানলাভ না হওয়া পর্যন্ত এঁকেও গৃহে থেকে গৃহধর্ম-পালনের সঙ্গে সঙ্গে সাধনা করতে হয়।

কুলাবধূত প্রত্যক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করলে হংস বা পরমহংস হয়ে যান। শাস্ত্রে এঁকেই সাক্ষাৎ শিব বলা হয়েছে।

তন্ত্রের বিচারে শক্তিসাধকের তিন শ্রেণী—পশু বীর ও দিব্য। শক্তিসাধনার ক্ষেত্রে সাধারণতঃ পশু-বীর-দিব্য এই ভাবক্রম বিহিত। পশুভাবে সাধনার আরম্ভ, তার পর বীরভাবের মধ্য দিয়ে দিব্যভাবে পরিসমাপ্তি। তবে অধিকার-অনুসারে যে-কোনো ভাব অবলম্বন করে সাধনা করলে তাতেও সিদ্ধিলাভ হয়।

তান্ত্রিক সাধনা বাস্তবসচেতন মনোবিজ্ঞানসম্মত সাধনা। সাধারণ মানুষের মধ্যে পশুপ্রকৃতির সমস্ত লক্ষণই বর্তমান। শাস্ত্রনির্দিষ্ট সাধনায় যারা সাধকের পশুপ্রবৃত্তি নিবৃত্ত হলে তিনি বীর এবং দিব্য ভাবের সাধনায় অধিকারী হতে পারেন। এইজন্যই সাধনায় ভাবক্রম নির্দিষ্ট।

পশুশব্দটি নিন্দার্থক নয়। তন্ত্রমতে অষ্টপাশবদ্ধ জীবমাত্রই পশু। সাধারণ মানুষ সবাই পশু। পশুভাবের সাধনাও নিতান্ত সহজ নয়। শাস্ত্রে পশুর আচার ও কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে যে-নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা পর্যালোচনা করলেই এ কথা স্পষ্ট হবে।

পশুর উত্তমাদি শ্রেণীনির্দেশ করা হয়েছে। শক্তিসাধনায় আরোহক্রম নির্দিষ্ট। সাধনায় যারা অধম পশুও কালে উত্তম পশু হতে পারেন।

পশুভাবের সাধনার পরবর্তী স্তর বীরভাবের সাধনা। "বীরভাবের সাধনাই প্রকৃত মনুষ্যত্বের সাধনা।" পশুশব্দের মতো বীরশব্দও পারিভাষিক। তন্ত্রে বীরের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

শবসাধনা, পঞ্চমকারযুক্ত সাধনা প্রভৃতি মুখ্যতঃ বীরভাবের সাধনা। এ-সব সম্পর্কে সাধারণের কৌতূহল যেমন বেশী ভ্রান্তিও তেমনি। বীরের বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনাই করা হয়েছে।

শক্তিসাধনার সর্বোচ্চ স্তর দিব্যভাবের সাধনা। বীরভাবেরই পরিণতি দিব্যভাব। দ্বৈতভাব অপসারিত হলেই বীর সাধক দিব্য সাধকে রূপান্তরিত হন।

সাধকের আলোচনা-প্রসঙ্গেই সম্প্রদায়ের কথা এসে পড়ে। তন্ত্রে কেরল গৌড় কাশ্মীর এই তিনটি প্রধান সম্প্রদায়ের বিবরণ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে আবার কাদি হাদি প্রভৃতি মত প্রচলিত। এ সবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা দিয়েছি।

শক্তিসাধনার সাধ্যা পরব্রহ্মস্বরূপিণী মহাশক্তি। সর্বদেবময়ী দেবীর বহু রূপ। তবে

প্রধানতঃ দশমহাবিদ্যারূপেই তিনি শক্তিসাধনার সাধ্যা। দশমহাবিদ্যার মধ্যে আবার কালী তারা ষোড়শীর সাধনা বিশেষভাবে প্রচলিত।

আদ্যা মহাবিদ্যা কালী। বাঙলা দেশে সাধারণ লোকে শক্তিসাধনা বলতে কালীসাধনাই বোঝে। বাঙলার প্রখ্যাত সাধকেরা বেশীর ভাগই কালীসাধক। কালী সম্বন্ধে লোকের মোটামুটি একটা ধারণা আছে কিন্তু কালীতত্ত্ব অল্প লোকেই জানে। বিশেষ করে কালীমূর্তি সম্পর্কে আজকালকার অনেক শিক্ষিত লোকেরও অজ্ঞতা সামান্য নয়। কালীতত্ত্বের ও কালীমূর্তির শাস্ত্রানুসারী ব্যাখ্যা আমরা দিয়েছি।

তন্ত্রে শক্তিসাধনার বিবিধ উপায় নির্দিষ্ট হয়েছে। সাধকের অধিকার-অনুসারে গুরু তার সাধনোপায় স্থির করে দেন। মানুষ বিভিন্ন, তার অধিকারও বিভিন্ন। সেইজন্যই শাস্ত্রে বিবিধ সাধনোপায়ের ব্যবস্থা। সনাতন ধর্মের মতো এমন মনস্তত্ত্বসম্মত উদার বিধান অন্যত্র দুর্লভ।

শক্তিসাধনোপায়ের প্রধান অবলম্বন আচার ও ভাব। বেদাচার-আদি সপ্ত আচার আর পশু-আদি ভাবত্রয়ের বিবরণ তন্ত্রে পাওয়া যায়।

তান্ত্রিক সপ্ত আচারের সঙ্গে যোগবাশিষ্ঠোক্ত সপ্ত জ্ঞানভূমিকার অনেক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। প্রসঙ্গতঃ এ সম্বন্ধেও আলোচনা করা গেছে।

শাস্ত্রে ভাবের মতো আচারের ক্ষেত্রেও ক্রমোৎকর্ষতা নির্দিষ্ট। আদিতে বেদাচার অন্তে কৌলাচার। বেদাচার থেকে দক্ষিণাচার পর্যন্ত আচারচতুষ্টয়কে বলা হয় পশ্বাচার। পশ্বাচার পর্যন্ত প্রবৃত্তিমার্গের সাধনা।

বেদাচারাদি আচারসপ্তক ভিন্ন সময়াচার নামে আরেকটি আচারও আছে। তারও বিবরণ দেওয়া গেল।

আচারসপ্তকের মধ্যে শেষ তিন আচারের সাধনা অত্যন্ত কঠিন। পঞ্চমকার নিয়ে সাধনা এরই অন্তর্ভুক্ত। পঞ্চম আচার বামাচার। এই আচারের কথা অনেকেই শুনেছেন এবং অনেক ক্ষেত্রেই ভুল শুনেছেন। বামাচারের ভিত্তি গভীর নিবৃত্তিজ্ঞান। "যে-প্রক্রিয়ায় জীবের সংস্কার ও প্রবৃত্তির পাশ সৃষ্ট ও সংরক্ষিত হয় এবং জীব সেই পাশের দ্বারা বদ্ধ পশু হয়ে যায় সেই প্রক্রিয়াকে একেবারে উল্টে দেওয়া এর লক্ষ্য।" তন্ত্রে বিভিন্ন বামাচারের উল্লেখ আছে।

অল্প লোকই বামাচারের সাধনায় অধিকারী। চিত্তবিকারের উপকরণপ্রাচুর্যের মধ্যেও যিনি দেবতাধ্যানতৎপর, বীরভাবের সেই যোগী সাধকই বামাচারে অধিকারী। বামাচার বিষয়লম্পট সাধারণ মানুষের জন্য নয়। বামাচারের শাস্ত্রসম্মত বিস্তৃত বিবরণই আমরা দিয়েছি।

বামাচারের সাধনার মতো কৌলাচারের সাধনাও অতি কঠিন। এ সাধনায় অধিকারী ব্যক্তিও সুলভ নয়। কেন না ষড়্‌রিপুজয়ী জিতেন্দ্রিয় ভক্তিশ্রদ্ধাবান্‌ শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরই কৌলাচারে অধিকার শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে।

কৌলাচারের প্রকারভেদ আছে, এতে সম্প্রদায়ভেদও লক্ষ্য করা যায়। কৌলসাধকদেরও উত্তমাদি ভেদ আছে।

বামাচার সিদ্ধান্তাচার ও কৌলাচার এই শেষ তিন আচারের সাধনা বামমার্গের সাধনা। পূর্বেই বলা হয়েছে পঞ্চতত্ত্ব বা পঞ্চমকার নিয়ে এই সাধনা। এতে সাধনার নামে যত ব্যভিচার হয়েছে এবং তার জন্য শক্তিসাধনার অপবাদ রটেছে। প্রধানতঃ শাস্ত্রজ্ঞ সদ্‌গুরুর অভাবে এবং শাস্ত্রশাসন লঙ্ঘন করার ফলেই এরূপ হয়েছে সন্দেহ নাই।

পঞ্চতত্ত্ব নিয়ে সাধনা অদ্বৈতভাবের শাস্ত্রবিহিত ধর্মসাধনা। শাস্ত্রে পঞ্চতত্ত্বকে নির্বাণ-মুক্তির হেতু বলা হয়েছে। আমরা এসম্বন্ধে যথাসম্ভব বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি।

পঞ্চতত্ত্বযুক্ত সাধনার একটি বিশেষ অনুষ্ঠান চক্রানুষ্ঠান। ভৈরবীচক্রের নাম বাঙ্গলার শিক্ষিত সমাজে অপরিচিত নয়। এই তন্ত্রের শাস্ত্রসম্মত বিবরণ দেওয়া গেল এবং সেই সঙ্গে তত্ত্বচক্র নামে একটি চক্রেরও পরিচয় দেওয়া হল।

পঞ্চতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা ধর্মসাধনায় পঞ্চতত্ত্ব-ব্যবহারের প্রাচীনতার বিষয়ও পর্যালোচনা করেছি।

পঞ্চতত্ত্বসাধনার মতো শবসাধনা বীরভাবের একটি প্রখ্যাত সাধনা। বঙ্কিমচন্দ্র-প্রমুখ সাহিত্যিকদের কল্যাণে শবসাধনা সম্বন্ধে শিক্ষিত বাঙালীর একটা অস্পষ্ট ধারণা আছে। এই কঠিন সাধনার শাস্ত্রসম্মত বিবরণ আমরা দিয়েছি।

শক্তিসাধনার প্রথম সোপান দীক্ষা। সাধনেচ্ছু ব্যক্তিকে সর্বাগ্রে সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষা নিতে হবে। কেন না দীক্ষা ব্যতীত তাঁর কোনো তান্ত্রিক ক্রিয়ায় অধিকারই হবে না।

দীক্ষা সম্বন্ধে তন্ত্রশাস্ত্রে বিস্তৃত আলোচনা আছে। দীক্ষার বিভিন্ন ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছে। সহজ কথায় বলা যায় দীক্ষার অর্থ প্রবুদ্ধচৈতন্য গুরুর স্বীয় শক্তি শিষ্যে সঞ্চারিত করে দেওয়া। তাতে শিষ্যের আধ্যাত্মিক শক্তি উদ্‌বুদ্ধ হয়। ফলে মন্ত্রের ফলসাধনত্ব ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর মনে প্রত্যয় জন্মে। এই প্রত্যয় বা বিশ্বাস তাঁকে সাধনার পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

দীক্ষাগ্রহণের পরও যদি কারো মনে এরূপ প্রত্যয় না জন্মে তা হলে বুঝতে হবে সে-দীক্ষা যথার্থ দীক্ষা নয়, একটা লোকদেখানো মনভুলানো ব্যাপারমাত্র।

দীক্ষাদান এবং দীক্ষাগ্রহণ কোনোটিই সহজ নয়। দীক্ষার সাফল্য নির্ভর করে সদ্‌গুরু এবং যোগ্য শিষ্যের উপর। তন্ত্রশাস্ত্রে সদ্‌গুরুর লক্ষণ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

দীক্ষাগ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিকে শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ মিলিয়ে গুরুনির্বাচন করতে হবে। তেমনি গুরুকেও শাস্ত্রোক্ত সৎশিষ্যের লক্ষণ মিলিয়ে ভাবী শিষ্যকে যাচাই করে নিতে হবে। নির্বিচারে গুরুকরণ বা শিষ্যকরণ তন্ত্রশাস্ত্রমতে নিষিদ্ধ।

দীক্ষাগুরু সম্বন্ধে তন্ত্রে নানা বিধিনিষেধের নির্দেশ পাওয়া যায়। যেমন বলা হয়েছে গৃহীকে গৃহস্থ গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে। কামাখ্যাতন্ত্রে বলা হয়েছে—উদাসীনের কাছে প্রাপ্ত দীক্ষা বন্ধ্যা নারীর মতো নিষ্ফল। উপনিষদে দেখা যায় গুরু ব্রহ্মবিদ গৃহস্থ ঋষি। গুরু সম্পর্কে উপনিষদের ভাবধারা তন্ত্রে অনুসৃত হয়েছে বলা যায়। তন্ত্রশাস্ত্রে পুরুষ গুরুর মতো স্ত্রীগুরুরও বিধান আছে।

গুরু ও শিষ্য সম্পর্কে আমরা কিঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবেই আলোচনা করেছি। বিবিধ ক্রিয়াকর্ম নিয়ে শাস্ত্রীয় দীক্ষানুষ্ঠান। মন্ত্রের সংস্কার চৈতন্যসম্পাদন প্রভৃতি ক্রিয়া দীক্ষার পূর্বে করতে হয় এবং পুরশ্চরণ অভিষেক প্রভৃতি পরে করতে হয়।

দীক্ষার পর জপ। তান্ত্রিক সাধনামাত্রেই জপ অবশ্য করণীয়। জপ সকলের পক্ষেই সম্ভবপর। শাস্ত্রে তিন প্রকারের জপের বিধান আছে।

অন্য মন্ত্রজপের চেয়ে পৃথক্ অজপাজপ। অজপা 'হংস'মন্ত্র। নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের সূত্রে এই জপ চলছে। যতদিন জীবন ততদিনই অজপাজপ চলে।

অজপাসাধন গুরুগম্য। সাধক সদ্গুরুর কাছেই এর প্রক্রিয়া শিখতে পারেন।

তন্ত্রশাস্ত্রমতে জপ যজ্ঞ, জপ যোগ। কলিকালে একমাত্র জপই প্রশস্ত। জপের দ্বারা ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ লাভ হয়।

জপের শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিধিবিধান অনেক। সাধককে দেবতা হয়ে মন্ত্রজপ করতে হয়। প্রাণায়াম ধ্যান ও ন্যাসের দ্বারা সাধকের দেবশরীর হয়। জপেচ্ছুর পক্ষে এ-সব অবশ্য কর্তব্য। জপের সঙ্গে পূজাও বিধি।

এ ছাড়া মন্ত্রার্থ, মন্ত্রচৈতন্য, মন্ত্রের সুপ্ত- ও প্রবুদ্ধ-কাল, কুল্লুকা, সেতু প্রভৃতি মন্ত্রাঙ্গের জ্ঞানও আবশ্যক। জপের স্থান আসন সংখ্যা ক্রম এ-সব সম্পর্কেও শাস্ত্রনির্দেশ মেনে চলতে হয়।

জপে মালার প্রয়োজন হয়। বর্ণমালা চরমালা ও করমালা এই তিন রকমের জপমালা নির্দিষ্ট। দেবতাভেদে মালা ভিন্ন। প্রত্যেক মন্ত্রের পৃথক্ জপমালা। জপে ব্যবহারের পূর্বে মালার যথাশাস্ত্র সংস্কার করতে হয়।

জপের প্রসঙ্গে পূজার উল্লেখ করা হয়েছে। সাধারণভাবে বলা যায় পূজা তান্ত্রিক সাধনার অপরিহার্য অঙ্গ। একে মুখ্য সাধনোপায় বলা যায়।

তন্ত্রশাস্ত্রে পূজার নানা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। মহানির্বাণতন্ত্রে সেবক ও ঈশ্বরের ঐক্যকে

পূজা বলা হয়েছে। এই ঐক্যবোধের চরম পরিণতি ব্রহ্মোপলব্ধি বা ব্রহ্মজ্ঞান। পূজাদি সব সাধনারই এইটি চরম লক্ষ্য।

আধ্যাত্মিক সাধনায় প্রাথমিক প্রয়োজন চিত্তশুদ্ধির। পূজার্চাদি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। তা ছাড়া পূজার মোক্ষলাভাদি অন্যান্য ফলও শাস্ত্রে নির্দিষ্ট।

পূজার নানা প্রকারভেদ আছে। সাধকের অধিকার-অনুসারে তাঁর জন্য বিশেষ প্রকারের পূজার বিধান। পূজার নানা বিধিনিষেধও আছে। তান্ত্রিক পূজা করবেন সাধক নিজে, অক্ষম হলে গুরুকে দিয়ে পূজা করাবেন। মতান্তরে তান্ত্রিক পূজা গুরু করবেন, গুরুর অভাবে সাধক নিজে করবেন।

পূজানুষ্ঠানের বিভিন্ন অঙ্গ। গন্ধর্বতন্ত্রে ধ্যানাদি ষড়ঙ্গের উল্লেখ করা হয়েছে। আত্মশুদ্ধি-আদি পঞ্চশুদ্ধি করে পূজা করতে হয়। দেবতাভেদে ও সম্প্রদায়ভেদে পূজাবিধি ভিন্ন হয়ে যায়। তবে তান্ত্রিক পূজার কতকগুলি সাধারণ বিধি আছে। যথা ভূতাপসারণ আচমন শোধন স্বস্তিবাচন ইত্যাদি।

পূজার আগেও সাধকের নানা কর্তব্য বিহিত। তাঁর দিনচর্যা শাস্ত্রনির্দিষ্ট। ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ থেকে আরম্ভ করে প্রাতঃকৃত্য স্নান সন্ধ্যা প্রভৃতি দিনচর্যার শাস্ত্রীয় বিধান আছে। এ সমস্তই এক সুপরিকল্পিত ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত, একটি চরম লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে পরিকল্পিত। কোনো একটি বিশেষ প্রক্রিয়াকে পৃথক করে দেখলে তার যথার্থ তাৎপর্য বোঝা যাবে না। সাধনার সমগ্রতার পরিপ্রেক্ষিতেই প্রত্যেকটি ক্রিয়ার সার্থকতা।

শাস্ত্রে বিবিধ স্নানের বিধান আছে। সাধক যে-কোনো অবস্থাতেই থাকুন না কেন কোনো না কোনো প্রকারের স্নান অবশ্যই করতে পারবেন। নানা অবস্থায় নানা মানুষকে ধর্মকর্মে সহায়তা করার একটি সাধারণ প্রচেষ্টা তান্ত্রিক বিধিনিষেধের মধ্যে লক্ষণীয়।

স্নানের পর সন্ধ্যা। তান্ত্রিক সন্ধ্যায় সবাই অধিকারী। অঘমর্ষণ সূর্যার্ঘ্য ইষ্টদেবতার্ঘ্য গায়ত্রীর ধ্যান ও জপ তান্ত্রিক সন্ধ্যার অঙ্গ। গায়ত্রী দ্বিবিধ—বৈদিক ও তান্ত্রিক। বৈদিক গায়ত্রীরও তান্ত্রিক প্রয়োগ তন্ত্রশাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে। তান্ত্রিক গায়ত্রীতে সবারই অধিকার, বৈদিক গায়ত্রী শুধু দ্বিজদের জন্য। গায়ত্রীজপের পর ইষ্টদেবতাকে জপসমর্পণ; তার পর তর্পণ। তর্পণও বৈদিক-তান্ত্রিক-ভেদে দ্বিবিধ।

এখানে উল্লেখ করা যায় তন্ত্রে যোগীদের সন্ধ্যা ও কৌল সাধকদের সন্ধ্যার পৃথক বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এ সন্ধ্যা সাধারণ সন্ধ্যা নয়।

পূজা-সম্পর্কে আত্মশুদ্ধির উল্লেখ করা হয়েছে। শাস্ত্রবিহিত স্নান ভূতশুদ্ধি প্রাণায়াম ধ্যান ইত্যাদির দ্বারা আত্মশুদ্ধি হয়।

ভূতশুদ্ধি দ্বারা সাধকের পাপদেহ দগ্ধ হয় এবং নবীন সাধনদেহ রচিত হয়।

অধ্বশুদ্ধিও ভূতশুদ্ধির মতো শাস্ত্রবিহিত। অধ্বশুদ্ধির দ্বারা ষড়ধ্বময় শরীরের শুদ্ধি হয়। তন্ত্রের বিধান দেবতা হয়ে দেবপূজা করতে হবে। ন্যাস দেবতা হবার অন্যতম সাধন। "দেহসম্পর্কে কর্তৃত্বাভিমান বা মমত্ববুদ্ধি দূরে নিক্ষেপ করে সেই স্থলে দেবত্বভাবনা বা ভগবদ্বুদ্ধি স্থাপন করাই ন্যাসের তাৎপর্য।" এইজন্যই বলা হয় ন্যাস না করলে পূজাদিতে অধিকারই হয় না।

মাতৃকান্যাস করন্যাস প্রভৃতি বিবিধ ন্যাসের বিধান শাস্ত্রে আছে।

আত্মশুদ্ধির অন্যতর উপায় প্রাণায়াম। উপনিষদে প্রাণায়ামের কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। উপনিষদে পতঞ্জলির যোগসূত্রে এবং তন্ত্রে প্রাণায়ামের মোটের উপর একই রকম সংজ্ঞা লক্ষ্য করা যায়।

প্রাণায়াম অতি কঠিন ব্যাপার। সুদক্ষ গুরুর কাছে শিখতে হয়। প্রাণায়ামের ফল হাতে হাতে পাওয়া যায়। ভুল প্রাণায়ামের ফল কঠিন রোগ। প্রাণায়াম যথাযথ হলে শরীর সুস্থ ও দৃঢ় হয়, চিত্তস্থৈর্যলাভ হয়। গন্ধর্বতন্ত্রমতে প্রাণায়ামের দ্বারা চৈতন্যের আবরণ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

পূজার কথা হচ্ছিল। বহিঃপূজায় প্রতীকে বা প্রতিমায় আরাধ্যদেবতার পূজা করা হয়। শাক্তদের আরাধ্যদেবতা তত্ত্বতঃ পরব্রহ্মস্বরূপিণী আদ্যাশক্তি। ইনি নিরাকারা এবং সাকারা। সাধকের হিতের জন্য অরূপা রূপধারণ করেন এ কথা নানা তন্ত্রে নানাভাবে বলা হয়েছে।

পরমার্থতঃ সমস্ত বিশ্বই ত পরব্রহ্মস্বরূপিণী মহাদেবীর রূপ। কিন্তু নিম্নাধিকারী সাধকের পক্ষে দেবীর এই বিরাট্ রূপের ধারণা করা সম্ভবপর নয়। সেইজন্য এমনি সাধকের ধারণার উপযোগী মহাদেবীর বিভিন্ন রূপ শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে।

তন্ত্রমতে মহাদেবীর স্থূল সূক্ষ্ম ও পর এই ত্রিবিধ রূপ। সাধনার স্তর এবং সাধকের অধিকার-অনুসারে স্থূলাদি রূপের আরাধনা বিহিত।

দেবতার শাস্ত্রোক্ত ধ্যাননির্দিষ্ট বাঙ্ময়রূপও মন্দবুদ্ধিদের কাছে পরিস্ফুট নয়। এদের জন্যই প্রতিমা বা মূর্তির প্রয়োজন।

লক্ষ্য করা গেছে তান্ত্রিক সাধনায় আরোহক্রম স্বীকৃত। প্রতিমাদিতে পূজার ক্ষেত্রেও তাই। ভগবতী-গীতায় ভগবতী বলছেন—নিম্নাধিকারী মুক্তিকামী ব্যক্তি প্রথমে আমার স্থূলরূপ আশ্রয় করবে এবং ক্রিয়াযোগে যথাবিধি সেই সব রূপের অর্চনা করে আমার পরম অব্যয় সূক্ষ্মরূপের অল্প অল্প আলোচনা করবে।

রূপের প্রতি মানুষের আকর্ষণ স্বাভাবিক। কেন না মানুষ নিজেই এক সরূপ সত্তা। রূপ তাকে আনন্দ দেয়, তার মনকে আশ্রয় দেয়। সাকার উপাসনায় মূলে আছে মানুষের এই স্বাভাবিক রূপানুরাগ। সে রূপের মধ্য দিয়ে রূপাতীতের আরাধনা করে।

সাধকের মনোদিষ্ট দেবতার শাস্ত্রবিহিত-ধ্যান-অনুসারে রচিত প্রতিমা বা মূর্তি বাহ্য-পূজার উপযোগী, অন্য মূর্তি নয়। প্রতিমা বা মূর্তি ছাড়া অন্যান্য প্রতীকের ব্যবস্থাও তন্ত্রে আছে।

প্রতীক দেবতাপ্রত্যয়ের আলম্বনমাত্র, দেবপূজার আধারমাত্র। প্রতীকে বা প্রতিমায় চিন্ময়ী দেবতার পূজা করা হয়, প্রতীক বা প্রতিমার নয়। সেইজন্যই প্রতীকে বা প্রতিমায় দেবপূজার ক্ষেত্রে দেবতার আবাহন প্রাণপ্রতিষ্ঠা এবং বিসর্জনের বিধান। এসবের গূঢ় তাৎপর্য আছে। প্রতিমাপূজা তথা মূর্তিপূজার রহস্য শাস্ত্রমর্মজ্ঞদের কাছে জানতে হয়।

প্রতীকোপাসনা তথা প্রতিমাপূজার আলোচনা প্রসঙ্গে তার ঐতিহাসিক দিক্‌টিও লক্ষ্য করা গেছে।

যন্ত্র দেবতার অন্যতম প্রতীক। যন্ত্রে সব দেবতার পূজাই প্রশস্ত। তবে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর সাধকেরাই যন্ত্রে পূজা করতে পারেন।

সাধনমর্মজ্ঞদের মতে কিন্তু যন্ত্রকে প্রতীক মনে করা অগভীরের কথা। গভীরের কথা যন্ত্র শক্তিলেখা (dynamic graph). যে-দেবতার যন্ত্র, সেই দেবতারই রূপ।

প্রত্যেক দেবতার যন্ত্র ভিন্ন। দশমহাবিদ্যার অন্যতমা ষোড়শীর যন্ত্র শ্রীযন্ত্রের বিস্তৃত বিবরণ তন্ত্রগ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। এই যন্ত্রের ব্যাপক প্রচলন ও প্রসিদ্ধি। শ্রীযন্ত্রের ব্যাপারটি জটিল। আমরা সাধারণভাবে এই প্রসিদ্ধ যন্ত্রের পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি।

শাস্ত্রানুসারে বিবিধ উপচারে দেবপূজা করতে হয়। উপচারের অর্থ, তাৎপর্য, উপচারসমর্পণরহস্য এসবের শাস্ত্রানুগ আলোচনা করা হয়েছে। লক্ষ্য করা গেছে কোনো কোনো সাধকের কাছে জীবনযাত্রাই পূজা হয়ে দাঁড়ায়।

তন্ত্রমতে পূজায় বলিদান প্রশস্ত। কোনো কোনো পূজায় বলি অবশ্যই দিতে হয়। নরবলিও বলির অন্তর্ভুক্ত। শাস্ত্রসম্মত বলির বিভিন্ন দিকের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা তার ঐতিহাসিক দিকের আলোচনাও করেছি।

তান্ত্রিক পূজায় বলিদানের পর হোম করা বিধি। এ হোম তান্ত্রিক হোম। ঋগ্বেদের সময় থেকেই হোম সনাতনধর্মীয় অনুষ্ঠানের অন্যতম অঙ্গ। পূজায় হোম অবশ্য কর্তব্য। হোম ত্রিবিধ—স্থূল সূক্ষ্ম ও পর। এতেও ক্রমোচ্চতা নির্দিষ্ট। তিন প্রকারের হোমেরই লক্ষ্য এক—ভেদবিলোপ, পরমাত্মায় সব কিছুর বিলোপসাধন।

হোমের পর জপ। তার পর ক্রমশঃ আত্মসমর্পণ, পূজাসমর্পণ, প্রার্থনা, উদ্বাসন, প্রতিমা-বিসর্জন, নির্মাল্যধারণ ও প্রসাদগ্রহণ। প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানের মূলে আছে গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব। তা না জানলে এসবের তাৎপর্য বোঝা যাবে না।

তন্ত্রশাস্ত্রের অভিমত সাধকের কুণ্ডলিনী না জাগলে পূজার্চাদি কিছুই সফল হয় না।

তন্ত্রে কুণ্ডলিনী সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে। সংক্ষেপে বলা যায় কুণ্ডলিনী সর্বমন্ত্রময়ী সর্বতত্ত্বময়ী সর্বদেবময়ী পরাশক্তি।

তন্ত্রমতে জীবদেহে মূলাধারে কুণ্ডলিনী সাপের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে আছেন। জীবের আত্মবিস্মৃত অবস্থাই কুণ্ডলিনীর নিদ্রা। কুণ্ডলিনীকে জাগাবার প্রকৃত উপায় যোগ। অবশ্য ন্যাস জপ পূজা ইত্যাদি শাস্ত্রসম্মত অন্য উপায়েও কুণ্ডলিনীকে জাগান যায়। তবে যোগই মুখ্য উপায়। কুণ্ডলিনীজাগরণের যোগ কুণ্ডলিনীযোগ বা হঠযোগ।

যোগ-শীর্ষক অধ্যায়ে আমরা যোগ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবেই আলোচনা করেছি। কুণ্ডলিনীযোগ ও হঠযোগ ছাড়া রাজযোগ মন্ত্রযোগ প্রভৃতিও এ-আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত। শক্তিসাধনার শাস্ত্র তন্ত্রশাস্ত্র আমাদের শেষ অধ্যায়ের আলোচ্য।

গোঁড়া বেদমার্গীরা বলেন তন্ত্র বেদভ্রষ্টদের শাস্ত্র। অন্যদের মতে তন্ত্র দ্বিবিধ—বেদগ্রাহ্য ও বেদবাহ্য। অবশ্য কোন কোন তন্ত্র বেদবাহ্য এ নিয়ে মতভেদ আছে।

তন্ত্রশব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয় আবার সঙ্কীর্ণ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সঙ্কীর্ণ অর্থে শিবাদি-প্রোক্ত শাস্ত্র তন্ত্র। একে মন্ত্রশাস্ত্রও বলা হয়।

তন্ত্রের আগম নিগম যামল প্রভৃতি নানা বিভাগ। আবার তন্ত্রশাস্ত্রকে পাঁচটি আম্নায়েও ভাগ করা হয়। শিবের পঞ্চমুখ থেকে পঞ্চাম্নায়ের উদ্ভব। কোনো কোনো তন্ত্রে ষড়াম্নায়ের কথাও বলা হয়েছে। তন্ত্রের অন্যরকম বিভাগও আছে।

বেদ ও তন্ত্র মিলে ব্রহ্মের পূর্ণরূপ। প্রধানতঃ বেদে প্রবাহিত ধর্মস্রোতই কালে তন্ত্রের নূতন ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। এ কথার সমর্থনে বলা যায় সন্ধ্যা তর্পণ হোম প্রভৃতি অনেক অনুষ্ঠান বেদ ও তন্ত্র উভয় শাস্ত্রেই বিহিত। বৈদিক যাগযজ্ঞ ও তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মের ভাবগত ঐক্যও লক্ষণীয়। খাঁটি তান্ত্রিক ক্রিয়ায়ও বৈদিক মন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

তান্ত্রিকদের মতে কলিযুগে একমাত্র তন্ত্রমতই প্রশস্ত। এ যুগের দুর্বল মানুষের বৈদিক ধর্মকর্মের সামর্থ্য নাই, অনেকের সে-অধিকারও নাই। এদের কল্যাণের জন্য করুণাময় পরমশিব বেদের সারভূত তন্ত্রের অবতারণা করেছেন।

দ্বিজ ভিন্ন অন্যের বেদে অধিকার নাই কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রের দ্বার সবার জন্যই উন্মুক্ত। অধিকারী হলে যে-কোনো ব্যক্তি তন্ত্রশাস্ত্র অবগত হতে পারেন।

গন্ধর্বতন্ত্রের বিধান—যিনি আস্তিক শুচি দান্ত দ্বৈতহীন জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রহ্মবাদী ব্রহ্মপরায়ণ সর্বহিংসাবিনির্মুক্ত সর্বপ্রাণীর হিতে রত তিনিই এই শাস্ত্রে অধিকারী, এ ছাড়া অন্য ভ্রমসাধকমাত্র।

তন্ত্র অদ্বৈততত্ত্বের সাধনশাস্ত্র, পারমার্থিক শাস্ত্র, এ শাস্ত্র লৌকিকবুদ্ধিগম্য বিচারশাস্ত্র নয়। গুরুগম্য এই শাস্ত্রের গভীরতত্ত্ব সদ্‌গুরুর উপদেশ ভিন্ন বোধগম্য হয় না।

তন্ত্রশাস্ত্র প্রত্যক্ষফলপ্রদ, বৈজ্ঞানিক যুগের উপযোগী শাস্ত্র। লোকে যেভাবে বিজ্ঞানের সত্য নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে থাকে সেইভাবে তন্ত্রের সত্য নিয়েও পরীক্ষা নিরীক্ষা করে স্বয়ং তা প্রত্যক্ষ করতে পারে। এদিক্‌ দিয়ে তন্ত্রশাস্ত্রকে সাধনবিজ্ঞান বলা যায়।

তন্ত্রের বিষয় কিন্তু বহুব্যাপক। শুধু পারমার্থিক বিষয় নয়, মানুষের জীবনের সঙ্গে সংসৃষ্ট বহু অপারমার্থিক বিষয়ও তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

তন্ত্রকে বলা যায় একপ্রকারের বিশ্বকোষ। এ যেন এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা, এর অনেক তলা, অনেক প্রকোষ্ঠ। ভারতীয় মানসের বিচিত্র সম্ভারে এসব পূর্ণ। উপরের তলায় বেদের সময় থেকে আরম্ভ করে ভারতীয় সংস্কৃতির যা যা শ্রেষ্ঠ সিদ্ধি তা সবই রক্ষিত। নীচের তলায় ঐ বেদেরই সময় থেকে ইন্দ্রজাল, অভিচার, শান্তিস্বস্ত্যয়ন, চিকিৎসা, জ্যোতিষ প্রভৃতি যে-সব পদার্থ সাধারণ মানুষের জীবনে ছিল একান্ত বাস্তব সে-সব সঞ্চিত হয়েছে।

বলা আবশ্যক অনধিকারী ব্যক্তির হাতে পড়ে তন্ত্রের ক্ষেত্রবিশেষে বিকৃতি ঘটেছে এবং অনেক নিকৃষ্ট তন্ত্রও রচিত হয়েছে। উত্তম তন্ত্রমতে এ-সব তামস তন্ত্র এবং বর্জনীয়।

অনধিকারী ব্যক্তির পক্ষে তন্ত্রশাস্ত্রের যথার্থ পরিচয়লাভও দুরূহ। তন্ত্রের সম্প্রদায়গত বিভিন্নতা, বিকার, অপ্রামাণ্য ব্যাখ্যা প্রভৃতির জন্য এই দুরূহতা বৃদ্ধি পায়। তবে তন্ত্রশাস্ত্রের মর্ম শ্রদ্ধাবান্‌ সন্ধানী ব্যক্তির অবিদিত থাকে না।

"তন্ত্রশাস্ত্রের মূলভিত্তি সেই অদ্বৈতবাদ, সেই সোঽহং এবং সাহং একত্র সংযুক্ত হইয়া নিখিল হিন্দুশাস্ত্রের মূলভিত্তি রচনা করিয়াছে।"

দীর্ঘকাল ধরে তন্ত্র ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি বড় অংশ অধিকার করে আছে, তার ধর্মজীবনের এক বিরাট্‌ অংশকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। তাই তন্ত্রের প্রভাব সর্বজনীন এবং সর্বভারতীয়।

শৈব শাক্ত বৈষ্ণব—সনাতনধর্মী এই তিন সম্প্রদায়েরই তন্ত্র আছে, শুধু শাক্ত সম্প্রদায়ের নয়। আমরা শিবপ্রসঙ্গে শৈবদের বিষয় আলোচনা করেছি। প্রসঙ্গতঃ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপরও তন্ত্রের প্রভাব আলোচিত হয়েছে।

বৌদ্ধধর্ম এবং নাথধর্মেও তন্ত্রের প্রভাব পড়েছে, এমন কি রাজা রামমোহন-প্রবর্তিত ধর্মের মূলেও কেউ কেউ তন্ত্রপ্রভাব লক্ষ্য করেন।

তন্ত্রপ্রসঙ্গে স্বভাবতঃই এর প্রাচীনতার প্রশ্নটিও মনে জাগে। এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

তন্ত্রগ্রন্থের সম্পূর্ণ বিবরণ আজ আর পাওয়া যায় না। প্রাক্‌-আধুনিক যুগে নানা কারণে অনেক গ্রন্থ লোপ পেয়ে গেছে। তন্ত্রশাস্ত্র গোপন শাস্ত্র মনে করে আধুনিক যুগেও

তন্ত্রগ্রন্থ প্রকাশ করতে চান না এরূপ লোক আছেন। কাজেই অপ্রকাশিত তন্ত্রগ্রন্থ লোপ পাবার সম্ভাবনা এখনও আছে।

কোনো কোনো তন্ত্রে তন্ত্রগ্রন্থের তালিকা দেওয়া হয়েছে। তালিকায় আকর এবং নিবন্ধ উভয় প্রকার গ্রন্থেরই নাম পাওয়া যায়। এ-রকম তালিকা এই অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আর কিছু না হোক এর একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

'শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা'তে আমরা প্রধানতঃ আকর গ্রন্থ থেকেই প্রমাণবচন উদ্ধার করেছি; তবে প্রয়োজন হলে নিবন্ধ ও অন্যান্য উৎস থেকেও নিয়েছি। সংস্কৃত বচন বাংলা হরফেই মুদ্রিত হয়েছে; শুধু বর্গীয় ব-র জন্য ব এই হরফটি ব্যবহার করা গেছে।

যেখানে বক্তব্য পরিস্ফুট করার জন্য অন্য গ্রন্থকারের রচনা থেকে কোনো উদ্ধৃতি দিয়েছি সেখানে যথারীতি তার উল্লেখ করেছি। এ সব লেখক আমাদের গুরুকল্প। তাঁদের উদ্দেশ্যে সকৃতজ্ঞ সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

প্রুফ সংশোধনের কাজে লেখকের অপটুতার জন্য অনেক ছাপার ভুল থেকে গেছে। শুদ্ধিপত্র দেওয়া হল। কিন্তু তাতেও সব ধরা পড়েছে কি না সন্দেহ। সহৃদয় সুধীজন নিজগুণে এসব ভুলত্রুটি মার্জনা করবেন।

এই গ্রন্থরচনার কাজে আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অনেকে সহায়তা করেছেন। তাঁদের সবাইকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। বিশেষ করে দেশিকোত্তম নিত্যানন্দ-বিনোদ গোস্বামী ও দেশিকোত্তম ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত এই দুই প্রবীণ অধ্যাপকের কাছে আমার ঋণের অন্ত নাই। দিনের পর দিন গোসাঁইজীর বাড়ীতে বসে এই দীর্ঘ গ্রন্থ এঁদের পড়ে শুনিয়েছি। তন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হরিদাস মিত্র মহাশয় এবং বন্ধুবর ডক্টর রামপূজন তিওয়ারীজী মাঝে মাঝে এই পাঠ শুনেছেন। গোঁসাইজী আংশিক অবশাদ হওয়ায় শান্তিনিকেতন হাসপাতালে স্থানান্তরিত হন। তাঁর রোগশয্যার পাশে বসেও তাঁকে এবং দত্তমহাশয়দের আমার রচনা পড়ে শুনিয়েছি। এঁদের কাছে যে-উপদেশ ও সাহায্য পেয়েছি তার তুলনা হয় না।

বিশ্বভারতীর প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর সুধাকর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবং সংস্কৃত বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীসুখময় সপ্ততীর্থ মহাশয় আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁদেরও আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

কেরলে কালীপূজা সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহের কাজে আমাকে সহায়তা করেছেন বিশ্বভারতীর কলাভবনের ছাত্রী শ্রীমতী শান্তা গোবিন্দ ও ছাত্র শ্রীমান্ এ. রামচন্দ্রন্ নায়ার। তাঁদের ধন্যবাদ দিচ্ছি।

বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ডক্টর বিমলকুমার দত্ত এবং তাঁর সহকর্মিগণ বিশেষ করে সংস্কৃত গ্রন্থাগারের ভারপ্রাপ্ত স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ শান্তিপ্রিয় রায় ও তাঁর সহকারী শ্রীমান্ নিমাই আমাকে অকুণ্ঠিতভাবে সাহায্য করেছেন। এঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থপ্রকাশনের ব্যাপারে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন বিশ্বভারতী গবেষণাগ্রন্থ-প্রকাশন সমিতি, বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য শ্রীসুধীরঞ্জন দাশ, বর্তমান উপাচার্য শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য এবং গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশন সমিতির সম্পাদক শ্রীরণজিৎ রায়। এঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গ্রন্থপ্রকাশনের ব্যয়ভার বহন করছেন। তাঁদের অশেষ ধন্যবাদ।

শান্তিনিকেতন প্রেসের ব্যবস্থাপক শ্রীযতীন বিশ্বাস ও তাঁর সহকর্মিগণ বিশেষ করে শ্রীবলরাম সাহা আন্তরিক যত্নের সঙ্গে মুদ্রণকার্য নির্বাহ করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

প্রুফ দেখার কাজে আমার সহকর্মী অধ্যাপক ডক্টর দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক শ্রীউজ্জ্বলকুমার মজুমদার আমাকে কিছু কিছু সাহায্য করেছেন। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

মহাকবি কালিদাস বলেছেন—আ পরিতোষাদ্ বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্—বিদ্বজ্জনের পরিতোষ না হওয়া পর্যন্ত প্রয়োগবিজ্ঞানকে উত্তম মনে করা যায় না। আমাদের সামান্য প্রচেষ্টা সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। ওঁ শম্।

শান্তিনিকেতন
মহালয়া
১৩৭৩

উপেন্দ্রকুমার দাস

সঙ্কেত

অঃ অধ্যায়

অ বে অথর্ববেদ

আপ গৃ সূ আপস্তম্ব-গৃহ্যসূত্র

আপ শ্রৌ সূ আপস্তম্ব-শ্রৌতসূত্র

আশ্ব গৃ সূ আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্র

আশ্ব শ্রৌ সূ আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্র

ঈ উপ ঈশোপনিষৎ

ঈ প্র ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞাবিমর্শিনী

উঃ উল্লাস

উ খ উত্তর খণ্ড

উ ত উত্তর তন্ত্র

উ ভা উত্তর ভাগ

ঋ বে ঋগ্‌বেদ

ঐ আ ঐতরেয়-আরণ্যক

ঐ উপ ঐতরেয়-উপনিষৎ

ঐ ব্রা ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ

ক উপ কঠোপনিষৎ

ক ত কঙ্কালমালিনীতন্ত্র

ক পা যো কপিলাশ্রমীয় পাতঞ্জল যোগদর্শন

ক শ অ কল্যাণ, শক্তি-অঙ্ক

কা খ কালীখণ্ড

কা ত কালীতন্ত্র

কা পু কালিকাপুরাণ

কামা ত কামাখ্যাতন্ত্র

কা শ্রৌ সূ কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্র

কা বি কামকলাবিলাস

কু ত কুলার্ণবতন্ত্র

কে উপ কেনোপনিষৎ

কৌ উপ কৌষীতকি-উপনিষৎ

কৌ নি কৌলাবলীনির্ণয়

কৌ জ্ঞা নি কৌলজ্ঞাননির্ণয়

কৌ র কৌলমার্গরহস্য

গ ত গন্ধর্বতন্ত্র

গা ত গায়ত্রীতন্ত্র

গো গৃ সূ গোভিলগৃহ্যসূত্র

গৌ ত গৌতমীয়তন্ত্র

ঘে স ঘেরণ্ডসংহিতা

চ আ চতুর্থ আহ্নিক

ছা উপ ছান্দোগ্যোপনিষৎ

জা স সা জাতি সংস্কৃতি ও সাহিত্য

জৈ ব্রা জৈমিনীয়-ব্রাহ্মণ

জ্ঞা খ জ্ঞানখণ্ড

তঃ তরঙ্গ

ত অ তন্ত্রাভিধান

ত আ তন্ত্রালোক

ত ত তন্ত্রতত্ত্ব

ত প্র তত্ত্বপ্রকাশ

ত রা ত তন্ত্ররাজতন্ত্র

ত সা তন্ত্রসার

তা খ তারাখণ্ড

তা ত তারাতন্ত্র

তা ভ সু তারাভক্তিসুধার্ণব

তা র তারারহস্য

তৃ আ তৃতীয় আহ্নিক

তৈ আ তৈত্তিরীয়-আরণ্যক
তৈ উপ তৈত্তিরীয়-উপনিষৎ
তৈ ব্রা তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণ
তৈ সং তৈত্তিরীয়-সংহিতা
ত্রি র ত্রিপুরারহস্য
দ ভা তী দক্ষিণ ভারতের তীর্থপ্রসঙ্গ
দ্বি আ দ্বিতীয় আহ্নিক
দ্বি ভা দ্বিতীয় ভাগ
দু স দুর্গাসপ্তশতী
দে পু দেবীপুরাণ
দে ভা দেবীভাগবত
ন আ নবম আহ্নিক
না প নারদ-পঞ্চরাত্র
নি ত নির্বাণতন্ত্র
নিরু ত নিরুত্তরতন্ত্র
পঃ পটল
প ক সূ পরশুরামকল্পসূত্র
পা গৃ সূ পারস্কর-গৃহ্যসূত্র
পা সূ পাশুপতসূত্র
পরি পরিচ্ছেদ
পু চ পুরশ্চর্যার্ণব
পু দ পুরোহিতদর্পণ
পূ খ পূর্বখণ্ড
পূ ত পূজাতত্ত্ব
পূ ভা পূর্বভাগ
প্র আ প্রথম আহ্নিক
প্র উপ প্রশ্নোপনিষৎ
প্র ভা প্রথম ভাগ
প্র সা ত প্রপঞ্চসারতন্ত্র
প্র হৃ প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়
প্রা তো প্রাণতোষণী
ব র বরিবস্যারহস্য
ব সং বসুমতী সংস্করণ
বা ই বাঙ্গালীর ইতিহাস
বা নি বামকেশ্বরতন্ত্রার্গত নিত্যা-ষোড়শিকার্ণব
বা সং বাজসনেয়িসংহিতা
বায় সং বায়বীয়-সংহিতা
বি পু বিষ্ণুপুরাণ
বৃহ উপ বৃহদারণ্যকোপনিষৎ
বৃহ ত সা বৃহৎতন্ত্রসার
বৌ শ্রৌ সূ বৌধায়ন-শ্রৌতসূত্র
ব্র সূ ব্রহ্মসূত্র
ভা উপ ভাবনোপনিষৎ
ভা উ স ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়
ভা ভ্র ভারতভ্রমণ
✓ভা মা মা ভারতীয় মানব ও মানবসমাজ
মহা ত মহানির্বাণতন্ত্র
মহা ভা মহাভারত
মা উপ মাণ্ডুক্যোপনিষৎ
মা পু মার্কণ্ডেয়পুরাণ
মাতৃ ভ মাতৃকাভেদতন্ত্র
মু উপ মুণ্ডকোপনিষৎ
মৈ উপ মৈত্রেয়ী-উপনিষৎ
মৈ সং মৈত্রায়ণী-সংহিতা
যো ত যোগিনীতন্ত্র
যো সূ যোগসূত্র
রু যা রুদ্রযামল
ল স ললিতাসহস্রনাম
লা শ্রৌ সূ লাট্যায়ন-শ্রৌতসূত্র

শ ব্রা শতপথ-ব্রাহ্মণ
শ স ত শক্তিসঙ্গমতন্ত্র
শা গৃ সূ শাঙ্খায়ন-গৃহ্যসূত্র
শা ত শাক্তানন্দতরঙ্গিণী
শা ভা শ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা
শা শ্রৌ সূ শাঙ্খায়ন-শ্রৌতসূত্র
শি দৃ শিবদৃষ্টি
শি পু শিবপুরাণ
শি সং শিবসংহিতা
শ্রীগো ব ফে লে শ্রীগোপাল বসুমল্লিক ফেলোসিপ লেকচার
শ্রীরা ক্র শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ
শ্বে উপ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ
ষ নি ষট্চক্রনিরূপণ
ষ চ বি ষট্চক্রবিবেক
স দ স সর্বদর্শনসংগ্রহ
সা আ সাঙ্খায়ন-আরণ্যক
সা প সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা
সি স সিদ্ধসিদ্ধান্তসংগ্রহ
সু খ সুন্দরীখণ্ড
সে ব সেতুবন্ধ
সৌ ভা সৌভাগ্যভাস্কর
সৌ ল সৌন্দর্যলহরী
হ প্র হঠযোগপ্রদীপিকা
A. A. R. Ancient Art and Ritual
Abhi Abhinavagupta
A. H. I. Advanced History of India
A. I. C. F. E. Ancient Indian Colonies in the Far East
A. I. H. T. Ancient Indian Historical Tradition
A. O. D. V. Aditi and Other Deities in the Veda
A. R. A. S. I. Annual Report of the Archaeological Survey of India
A. S. Archaeological Survey
A. S. M. S. The Asiatic Society Monogram Series
A. T. Antiquity of Tantricism
C. H. A. A Cultural History of Asssam
C. Her. I. Cultural Heritage of India
C. I. I. Corpus Inscriptionum Indicarum
D. E I C. Dravidian Element in Indian Culture
D. G. M. H. Dravidian Gods in Modern Hinduism
D. H. I. Development of Hindu Iconography
D. R. Bh. V. D. R. Bhandarkar Volume
D. Ś. I. L. Doctrine of Śakti in Indian Literature
E. B. Encyclopaedia Britanica
E. H. I. Early History of India
E. I. Epigraphia Indica
El. H. I. Elements of Hindu Iconography
E. R. E. Encyclopaedia of Religion and Ethics
F. C. I. P. A. Foot collection of Indian Prehistoric Antiquities

G. B. Golden Bough
G. B. I. Greeks in Bactria and India
G. G. I. I. The Great Goddess in India and Iran
G. L. The Garland of Letters
G. N. B. Gods of Northern Buddhism
G. O. S. Gaekwad Oriental Series
G. Ph. R. Groundwork of the Philosophy of Religion
Gr. L. The Great Liberation
H. B. Hinduism and Buddhism
H. C. Hindu Civilization
H. I. L. History of Indian Literature
H. I. Ph. History of Indian Philosophy
H. O. History of Orissa
H. O. S. Harvard Oriental Series
H. Ph. E. W. History of Philosophy Eastern and Western
I. A. The Indian Antiquary
I. A. H. Indo-Aryan and Hindi
I. A. R. Indo-Aryan Races
I. B. Br. S. D. M. Iconography of Buddhist and Brahminical Sculptures in the Dacca Museum
I. H. Q. Indian Historical Quarterly
I. K. Inscriptions of Kambuja
K. Sh. Kashmir Shaivism
K. W. K. Kali Worship in Kerala
L. C. R. Lectures on Comparative Religion
M. A. S. I. Memoirs of Archaeological Survey of India
M. G. K. The Mother Goddess Kāmākhyā
M. I. C. Mohenjodaro and Indus Civilization
M. S. I. A. C. Myths and Symbols in Indian Art and Civilization
N. E. M. Nalanda and Its Epigraphical Material
N. N. The Nighantu and Nirukta
O. R. C. Obscure Religious Cults
O. Y. C. T. I. On Yuan Chuang's Travels in India
P. C. Primitive Culture
P. R. The Persian Religion
P. S. Pāśupata Sutras
P. Ś. W. A. Prototypes of Śiva in Western Asia
P. T. Principles of Tantra
R. C. P. I. Rigvedic Culture of the Pre historic Indus
R. I. The Religions of India
R. Ph. Av. The Religion and Philosophy of the Atharvaveda
R. Ph. V. U. The Religion and Philosophy of the Veda and Upanishads
R. Ś. Rudra Śiva
R. T. L. I. Religious Thought and Life in India
R. V. The Religion of the Veda
S. B. E. Sacred Book of the East
Ś. C. S. I. Śakti Cult in South India

S. I. Select Inscriptions
Śk. P. The Śākta Pithas
S. P. The Serpent Power
S. P. R. H. R. C. Studies in the Puranic Records on Hindu Rites and Customs
Ś. R. C. M. Śree Ramakrishna Centinary Memorial
S. S. W. Sex and Sex Worship
S. T. Studies in the Tantras
T. T. Tantrik Texts
V. A. Vedic Age
V. G. S. I. The Village Gods of South India
V. M. Vedic Myth
V. Ś. M. R. S. Vaiṣṇavism Śaivism and other Minor Religious Systems.

Ś Ś

সংশোধন ও সংযোজন

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১	১৩	অবস্থাতে ও	অবস্থাতেও
১৪	৫	দিক	দিক্
১৮	৯	বিরাট	বিরাট্
	১৬	বিরাট	বিরাট্
২০	১৮	ধরিত্রী মাতা	ধরিত্রীমাতা
	২৪	ধরিত্রী দেবী	ধরিত্রীদেবী
২২	৩০	ঋ বে	ঋ বে
২৩	১	ইন্তার	ইশ্‌তার
	২১	আয়ুধ	আয়ুধ
	২৮	Ś,	Ś.
২৪	২০	সনাতন ধর্মী	সনাতনধর্মী
৩১	১৯	পখত	পখ্‌ত
৪৯	৮	সরণ্যু	সরণ্‌যু
	১০	ইন্দ্রানী	ইন্দ্রাণী
৫০	২৩	অদিতিভ্যো	অদিতিভ্যো
৭১	২৩	সূক্ত	সূক্ত
৭৫	২২	ভত্তোহন্তি	ভত্তোঽন্তি
	২৮	যবে	যরে
৭৮	১৭	অসুররা	গন্ধর্বরা
৭৯	২৯	ঋ বে	ঋ বে
৮২	২৫	বা সাং	বা সং
৮৫	১৯	রাত্রি দেবী	রাত্রিদেবী
৯১	২৫	ম্রিয়মাজগায়	ম্রিয়মাজগায়
১০০	১৬	ভূজঙ্গাভোগ	ভূজঙ্গাভোগ
১০১	২১	জম্বুক	জম্বু্‌ক
	২৭	ভূতিভূতিমতাং	ভূতি ভূতিমতাং

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০৬	৬	ইন্দ্রানী	ইন্দ্রাণী
১০৬	১৯	বনেষ	বনেষু
১১৬	২৮	ব্রহ্মণো	ব্‌হ্মণো
১২৪	২২	মহেশ্বরী	মাহেশ্বরী
১২৫	১০	দেবমূর্তি	দেবীমূর্তি
১২৬	৫	দুগামূর্তি	দুর্গামূর্তি
১৩৮	১৫	দুরিতারী	দুরিতারি
	২৪	সরুস্বতী	সরস্বতী
১৫৩	১৭	দেবী ভাগবত	দেবীভাগবত
১৫৪	৩০	O. Y. C.	O. Y. C. T. I.
১৬৮	১৯	কণকেশ্বরী	কনকেশ্বরী
১৭৬	২৮	C. H. I.	C. Her. I.
১৭৭	২৮	C. H. I.	C. Her. I.
১৭৮	২৭	C. H. I.	C. Her. I.
১৭৯	২	গোবর্ধনপাঠ	গোবর্ধনপীঠ
	৩০	করবীরপুর	কববীরপুর
১৮৪	১৩	ত্রিপুরসুন্দরী	ত্রিপুরসুন্দরী
১৯৪	২৪	রথী	রথী
২০০	২৬	ভবানী	ভবাণী
২০২	২০	ধ্বংকারী	ধ্বংসকারী
২১৫	১১	বাধে	বাধে
	১৩	আবিকৃত	আবির্ভূত
২২১	১৬	প্রোটো আষ্ট্রলয়েড	প্রোটো-অষ্ট্রলয়েড
২২২	৭	জ্যোতিলিঙ্গ	জ্যোতির্লিঙ্গ
২২৪	৮	শিবজ্ঞিকে	শিবলিঙ্গকে
	২৭	ধায়োন্নিতাং	ধায়েন্নিত্যং
২২৬	২৮	নৈঋতলিঙ্গ	নৈর্ঋতলিঙ্গ
২৩৫	২	বাহ্মণাঃ	ব্‌াহ্মণাঃ
২৪৮	১৭	মিকক্রিয়া	দৃকক্রিয়া

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৫১	২৭	কতব্যমিতি	কর্তব্যমিতি
২৫৩	২২	ঘোর-মূর্তি	অঘোর-মূর্তি
২৬৫	১০	প্রকৃতিষের	প্রকৃতিতত্ত্বের
২৭২	১৯	প্রকাশবিমর্ষ	প্রকাশবিমর্শ
	২৭	শক্তেৰ্হে হতোঃ	শক্তের্হেতোঃ
২৭৪	৩১	পরাশক্তি	পরাশক্তিঃ
২৮০	১৬	পরহন্তাবিমর্শাত্মক	পরাহন্তাবিমর্শাত্মক
	২৩	প্র,	প্র হৃ.
২৮১	১৯	ব্রহ্মণঃ	ব্র্‌হ্মণঃ
	২২	ও সা	ত সা
২৯৬	২৭	তেষামগনাং	তেষামগুনাং
৩০৯	২৫	উ	উঁ
৩১২	১৯	উচ্ছনতা প্রাপ	উচ্ছ্‌নতাপ্রাপ্ত
৩১৯	৬	ক্রমস্থায়	ক্রমনয়
৩২৭	১৪	দৃক্চরী	দিক্চরী
	১৭	দৃক্চরী	দিক্চরী
৩২৯	২৭	তৈ উ	তৈ উপ
৩৩২	২১	ব্রহ্মস্বরূপিণী	ব্র্‌হ্মস্বরূপিণী
	২৬	তদ্ ব্রহ্ম	তদ্ ব্র্‌হ্ম
৩৩৩	২১	ব্রহ্মাণ্ড	ব্র্‌হ্মাণ্ড
৩৩৪	২৩	আত্মাশক্তি	আত্মাশক্তিঃ
৩৩৫	১১	স্ত্রীরূপুষাদি	স্ত্রীপুরুষাদি
	২৩	দে ত	দে তা
৩৩৮	২৮	ব্রহ্মাণ্ড	ব্র্‌হ্মাণ্ড
৩৩৯	১৫	ক্রুরকর্মাহং	ক্রূরকর্মাহং
৩৪২	৩১	ভগবৎসন্দর্ভ	ভগবৎসন্দর্ভ
৩৪৩	৭	দ্ব্যত্রিংসবলিত	দ্ব্যত্রিংশবলিত
	২৭	দ্ব্যত্রিংসবলিত	দ্ব্যত্রিংশবলিত
৩৪৪	১৩	ঔপনিষদিকেরও	ঔপনিষদিকেরা ও

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৪৬	৩০	কত্তেতি	কর্ত্তেতি
৩৫০	১৭	উৎপন্ন	উৎপন্ন
৩৫৬	২৩	Dey and Das Gupta	Das Gupta and Dey
৩৫৭	২৫	পতিতা	পতিতাঃ
৩৫৮	৩০	C.H.I.	C. Her. I.
৩৬৫	২৮	উচ্ছ্রাবস্থাস্বেব	উচ্ছূনাবস্থাস্বেব
৩৬৮	৮	বিরাট	বিরাট্
		ওড্যাণপীঠ	ওড্যানপীঠ
৩৭৪	২৯	শব্দবহ্ম	শব্দব্রহ্ম
৩৭৭	১৪	শুক্র বিন্দু	শুক্রবিন্দু
৩৭৮	২৩	শোনবিন্দুনৈকী	শোণবিন্দুনৈকী
৩৭৯	২৬	বহ্ম	ব্রহ্ম
৩৮০	৫	বিষ্ণু রেখা	বিষ্ণুরেখা
৩৮২	২২	শব্দবহ্মেতি	শব্দব্রহ্মেতি
৩৯২	২০	সর্ববিদ্যায়া	সর্ববিদ্যায়াঃ
৩৯৪	২৩	ক্রবসোমায়োঃ	কৃবসোমাযোঃ
৩৯৫	২৩	ব্রু ত সা	দুষ্ট স্ত সা
৩৯৭	২৮	বক্ষ্যমোঃ	ব্রহ্মযো
৪০২	৩১	যচ্ছ	যচ্ছ
৪২৫	২২	েত্বাত্বন	তত্ত্বার্থ
৪২৭	৯	তাঁরই	তাঁরই রূপ
৪৩১	২৮	যোগীগুরু	জ্ঞানীগুরু
৪৩৪	২৭	কাম্ব	কাণ্ড
৪৩৫	৭	সান্তিকাদি	সাত্ত্বিকাদি
৪৩৬	১৮	মধ্যো	মর্ধ্যো
৪৩৮	২১	জিতেন্দ্রিয়ঃ	জিতেন্দ্রিয়ঃ
	২৮	ধমযুদ্ধে	ধর্মযুদ্ধে
৪৩৯	২৭	শুভসংস্কাব	শুভসংস্কার

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৩৯	২৯	ব্রহ্মাবৃত	ব্‌হ্মাবৃত
৪৪০	১৮	গোরক্ষমিদ্ধান্ত	গোরক্ষসিদ্ধান্ত
৪৪২	২৫	যশনৈঋায়তে	যশনৈর্ঋায়তে
৪৪৫	১০	নিবৃত	নিবৃত্ত
৪৫২	৬	ষারূপ্য	সারূপ্য
৪৫৫	৩	বীরসাধনের	বীরসাধনার
৪৫৬	৩০	নিষ্ঠরং	নিষ্ঠুরং
৪৬২	১৮	তাম্বলঃ	তাম্বূলং
৪৬৪	২৩	ব্‌মহে	ব্‌হ্মহে
৪৬৮	৩	গুহ্যলক্ষ্মী	গুহ্যকালী
	৭	নৈঋতেশ্বরী	নৈর্ঋতেশ্বরী
৪৭০	২৯	কুলকঃ	কুলর্কং
৪৭১	১৬	ত্রিপুরাসুন্দরী	ত্রিপুরসুন্দরী
	২০	মার্গশীর্ধে	মার্গশীর্ষে
৪৭৬	৬	পঞ্চবক্র	পঞ্চবক্ত্র
৪৭৫	২৮	ব্রহ্ম	ব্‌হ্ম
৪৭৭	২৫	পরব্রহ্ম	পরব্‌হ্ম
৪৭৮	২১	পরব্রহ্ম	পরব্‌হ্ম
৪৮৬	২৭	রক্তপূর্ণমধাম্ভোজাং	রক্তপূর্ণমুখা-ম্ভোজাং
	২৯	ব্রহ্মকেশব	ব্‌হ্মকেশব
৪৮৭	২৬	বিমলায়নন্দ	বিমলানন্দ
৪৯৮	২৮	কপূরঃ	কর্পূরং
	৩০	দ্রঃ T. T. Vol. IX	দ্রঃ পরপৃষ্ঠা
৫০০	২৭	দ্রঃ T. T. Vol. IX	দ্রঃ পরপৃষ্ঠা
৫০১	২৯	দ্রঃ T. T. Vol. IX	দ্রঃ পরপৃষ্ঠা
৫০২	২৫	দ্রঃ T. T. Vol. IX	দ্রঃ পরপৃষ্ঠা
৫০৭	১২	হ্রী	হ্রীঁ
	১৯	কপালকং	কপালকং

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫০৭	২৯	স্বস্বরূপা	স্ব্‌স্বরূপা
৫০৮	১৮	দশবক্ত্রা	দশবক্ত্‌রা
৫১৬	২৩	খটাঙ্গ	খট্বাঙ্গ
৫১৮	৫	ময়াবীজ	মায়াবীজ
৫২০	২৪	মার্ত্তনীলসরস্বতী	মাতর্নীলসরস্বতি
৫২৪	২৬	পুত্রদারার্থবন্ধনাং	পুত্রদারার্থবন্ধ্‌নাং
৫২৬	২৭	পরব্রহ্মমূর্ত্তি	পরব্‌হ্মমূর্ত্তি
৫২৭	৮	ঊ ল হ্রাঁ	ঊ ল হ্রীঁ
	৮	ক হ ল হ্রাঁ	ক হ ল হ্রীঁ
৫৩১	৮	ক্রুর	ক্রূর
	৯	উজ্জ্বলং	উজ্জ্বল
	২৫	ক্রুর	ক্রূর
৫৩৩	২	ত্রিপুরসুন্দরী	ত্রিপুরসুন্দরী
৫৩৪	৬	মায়া বীজ	মায়াবীজ
৫৩৬	১০	হসকলীঁ	হসকল্রীঁ
৫৩৭	২৫	জটাজটাং	জটাজূটাং
৫৩৮	৭	ভবলকসহৈঁ	ভ্‌ ব্‌ ল্‌ ক স্‌ হৈঁ
		ভবলকসহীঁ	ভ্‌ ব্‌ ল্‌ ক স্‌ হীঁ
		ভবলকসহৌঁ	ভ্‌ ব্‌ ল্‌ ক স্‌ হৌঁ
	১০	ষটকূটা	ষট্‌কূটা
	১৫	হসখফ্রেঁ	হ্‌ স্‌ খ্‌ ফ্রেঁ
		হসকল্রীঁ	হ্‌ স্‌ ক ল্রীঁ
		হসৌঃ	হ্‌ সৌঃ
৫৩৯	২২	নবরত্নপ্রভা	নবরত্নপ্রভা
১৬২	৩১	ভস্মাঙ্গমাবতী	ভস্মাঙ্গ্‌মাবতী
৫৪৬	৫	কাণে	কানে
	২৮	ওঁ হ্রী	ওঁ হ্রীঁ
৫৬৭	১৭	কর্ণমাতঙ্গী	কর্ণমাতঙ্গীময়
৫৪৭	৩০	পুজাজপদিকম্	পূজাজপাদিকম্
৫৪৯	১৯	নবরত্নাকীর্ণ	নবরত্নাকীর্ণ

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫৫১	৮	হৃসকর্ণী	সৃহ্‌কর্ণী
৫৫৩	১৩	অবস্থায়	অবস্থায়
৫৫৭	১৪	দোষণীয়	দূষণীয়
	২৬	মোক্ষপ্রাপ্তিবর্ণনং	মোক্ষপ্রাপ্তিবর্ণনং
৫৫৮	২৪	শাব্দতত্ত্ব	শাব্দতত্ত্ব
৫৫৯	১৮	শৈবাচার	শৈবাচার
৫৬৬	২৩	ক্ষিতি তত্ত্ব	ক্ষিতিতত্ত্ব
৫৬৮	২৯	ব্রহ্মচারী	ব্রহ্মচারী
৫৭১	১৬	বামাচারপরায়ণ	বামাচারপরায়ণ
৫৭২	৩০	সো তা	সৌ তা
৫৭৮	২৭	যজ্ঞোদিতমিদং	যজ্ঞোদিতমিদং
	৩০	ব্রহ্ম	ব্রহ্ম
৫৮৭	২০	চতর্ভিরাক্তৈঃ	চতুর্ভিরাক্তৈঃ
		অলবণ	অনুবন্ধ
	২৩	ব্রহ্মাদিস্তম্ব	ব্রহ্মাদিস্তম্ব
৫৮৯	৩১	ব্রহ্মর্ষি	ব্রহ্মর্ষি
৫৯০	২৩	বিধি ন	বিধিন
	২৫	ভেদে	ভেদো
৫৯১	২৪	কলেশ্বরি	কুলেশ্বরি
৫৯৪	২৯	কত্তব্যো	কর্ত্তব্যো
৫৯৫	১২	বিবিনিষেধ	বিধিনিষেধ
৫৯৬	৩১	পুরূপা	পুংরূপা
৫৯৮	২৩	ব্রহ্মজ্ঞানী	ব্রহ্মজ্ঞানী
৬০১	২৫	ব্রাহ্মণঃ	ব্রাহ্মণঃ
৬০৯	১৮	কৌলচারের	কৌলাচারের
৬০২	২৬	স্রাদ্‌ গুণ্ডিতং	স্রাদ্‌গুণ্ডিতং
৬০৬	২৯	যদ্বি	যদি
৬১০	১৯	মহিষ বরাহাজ	মহিষবরাহাজ
৬১৩	১৬	দ্বিতীয়ং	দ্বিতীয়ং

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬১৮	৪	ঈড়া	ইড়া
৬১৯	২১	সুশীলতল	সুশীতল
	২৮	যা	যা
৬২০	২	ঈড়া	ইড়া
৬২১	২৬	পঞ্চম্‌কারেণ	পঞ্চমকারেণ
৬২৩	২৯	বহ্মণো	ব্রহ্মণো
৬২৪	২৯	বহ্মণো	ব্রহ্মণো
৬২৯	২৯	১।১১০	১।৪।১০৮
৬৩০	২৩	সৌত্রামণিযাগ	সৌত্রামণীযাগ
৬৩৭	২৮	বাহ্মণোঽপি	ব্রাহ্মণোঽপি
৬৪০	২৫	বাহ্মণে	ব্রাহ্মণে
	২৭	বাহ্মণস্য	ব্রাহ্মণস্য
		বাহ্মণ:	ব্রাহ্মণ:
৬৪১	২০	বাহ্মণো	ব্রাহ্মণো
	২৩	বাহ্মণস্য	ব্রাহ্মণস্য
	৩০	বাহ্মণ:	ব্রাহ্মণ:
	৩৩	বাহ্মণ:	ব্রাহ্মণ:
৬৪২	২৪	বহ্মণো	ব্রহ্মণো
৬৪৪	২৫	পূর্ববহ্মময়ী	পূর্বব্রহ্মময়ী
৬৫১	২	মাংস শোধন	মাংসশোধন
	২২	ঠৈক	ঠৈঁক
৬৫২	৩১	দ্র: প্রা তো কাণ্ড ৭ পরি: ২	দ্র: পরপৃষ্ঠা
৬৫৬	২৮	বক্তু:	বক্তু:
৬৭১	৭	স্বপচী	শ্বপচী
	১৮	বহ্মচারী	ব্রহ্মচারী
৬৭৩	২৭	বহ্মময়ং	ব্রহ্মময়ং
৬৭৬	২৭	বহ্মোপাসকা	ব্রহ্মোপাসকা
	২৭	বহ্মজ্ঞা	ব্রহ্মজ্ঞা

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬৭৬	৩১	বহ্নহবি	ব্‌হ্নহবি
৬৭৮	৬	সুত্রামণীযাগ	সৌত্রামণীযাগ
৬৮১	১২	সমিধ	সমিধ্‌
৬৯৪	৭	শিশু দেহে	শিশুদেহে
৬৯৭	১৫	বক্ত	বক্ত্‌
৭০২	২৯	স্বান্তঃকরণ বৃত্তৈর্বা	স্বান্তঃকরণবৃত্তৈর্বা
৭০৪	২১	শক্তিমন্ত্রে	শক্তিমন্ত্রে
৭০৮	২৮	বহ্নরূপাং	ব্‌হ্নরূপাং
৭১০	২১	অমুক কর্মণি	অমুককর্মণি
৭১২	২৭	পুরশ্চরণাসিদ্ধতে	পুরশ্চরণসিদ্ধতে
৭১৮	২১	তাম্বূলং	তাম্বূ্লং
৭২৪	৩১	বধ	ব্ধ
৭৩০	৭	স্ত্রীগুরুরলক্ষণ	স্ত্রীগুরুর লক্ষণ
	৩০	ভুক্তবেক্ষেষাং	ভবেস্তেষাং
		ক্তিমুক্তি	ভুক্তিমুক্তি
৭৩৬	২৪	বীর	বীরো
৭৩৭	২৭	কৃ ক	কৃ ত
৭৩৯	২৪	স্থায়া পরঃ	স্থায়াপরঃ
৭৪০	২৫	পাপকর্মণা	পাপকর্মণা
৭৪৬	২৫	ব্যাখ্যো	ব াখ্যো
৭৪৭	২৭	সাক্ষিভূতম্	সাক্ষিভূতম্
৭৫০	২৬	গতৈৰ্মাসৈঃ	গতৈর্মাসৈঃ
৭৫১	২৯	কর	কর্ম
৭৫৪	২৬	লব্ধাজ্ঞানপ্রদং	লব্ধা জ্ঞানপ্রদং
৭৫৫	১৭	লক্ষণযুক্ত	লক্ষণযুক্ত
	২৭	হয়মর্থ	হয়মর্থো
৭৬০	৭	মন্ত্র দীক্ষা	মন্ত্রদীক্ষা
	৩০	পুত্রিনী	পুত্রিণী
৭৬৮	২	তথু	তথু

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭৮০	২৫	সংপ্রবধাস্তে	সংপ্রবৃধাস্তে
৭৮১	১২	ত্রিপুরাসুন্দরীর	ত্রিপুরসুন্দরীর
৭৮৯	শীর্ষক	দীক্ষা	জপ
	২০	জপকমণি	জপকর্মণি
	২৮	বক্ষনাড়ী	ব্রহ্মনাড়ী
৭৯১	১৮	স্বয়ভূ মালিকা	স্বয়ম্ভূমালিকা
৭৯৪	১৯	আনামায়াস্ত্রং	অনামায়াস্ত্রং
৭৯৯	শীর্ষক	ষোড়শোধ্যায়	ষোড়শাধ্যায়
	১২	মন্ত্র জপ	মন্ত্রজপ
	২৩	বাহ্যান্তরমুপাসনম্	বাহ্যান্তরমুপাসনম্
৮০১	৮	নামরূপাদিবিভিন্ন	নামরূপাদিবিভিন্ন-
৮০২	২৯	সত্ত্বশুদ্ধিকরত্বেন	সত্ত্বশুদ্ধিকরত্বেন
৮০৭	২৩	নামবৃদ্ধি ন	নামবৃদ্ধির্ন
৮০৮	২৫	যন্ত্র	যন্ত্র
৮০৯	২০	কমসঙ্কুলে	কর্মসঙ্কুলে
	২৮	শ্রীমদ্‌ভগভদ্‌গীতা	শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা
৮১০	২১	কমণা	কর্মণা
	২৭	সপিঃ	সর্পিঃ
৮১১	২০	নিবাধারা	নিরাধারা
	৩০	বিজানীয়াচ্ছন্ময়া	বিজানীয়াচ্ছন্ময়া
৮১৩	২৬	কাণ্ড	কাণ্ড
	২৭	নণাং	নৃণাং
৮১৫	১১	পূজাসহ	পূজা সহ
৮১৮	২৫	পরব্রহ্মপদং	পরব্রহ্মপদং
৮২২	৬	ইষ্ট পূজাদি	ইষ্টপূজাদি
৮২৮	২৪	যোটামোটি	মোটামুটি
৮৩০	২৩	সম্মুখাকরণ	সম্মুখীকরণ
৮৩৬	৩	অবগাহন স্নানেরই	অবগাহনস্নানেরই

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮৩৬	২৩	হ্রী	হ্রীঁ
	২৪	বধ	ব্‌ধ
৮৪০	৩১	ব্রাহ্মণো	ব্‌াহ্মণো
৮৪৩	১১	ব্রহ্ম	ব্‌হ্ম
৮৪৪	৩১	ব্রাহ্মীং	ব্‌াহ্মীং
৮৪৬	২১	পিতৃংশ্চৈব	পিতৄংশ্চৈব
৮৫০	১	তেজোতত্ত্ব	তেজস্তত্ত্ব
৮৫২	১২	অপাণের	অপানের
৮৫৪	১৩	অন্তমাতৃকা	অন্তর্মাতৃকা
৮৬২	২৭	জীবাত্মানোঃ	জীবাত্মনোঃ
৮৬৮	২৫	মূত্রা	মুদ্রা
৮৭৪	১৮	স্বরূপ সত্তা	সরূপ সত্তা
৮৭৫	২৯	ত্যক্তা	ত্যক্ত্া
৮৮০	২২	বাহ্যপূজা	বাহ্যপূজা
৮৮৪	২৭	হিরন্ময়ার্থিভিঃ	হিরণ্যার্থিভিঃ
৮৮৯	২২	পরমহেশী	পরা মহেশী
		পরিণমতে	পরিনমেত
৮৯৫	২৫	অব্যক্তাহংকৃতি	অব্যক্তাহঙ্কৃতি
৮৯৬	২৭	ভাবোনোপনিষৎ	ভাবনোপনিষৎ
৮৯৭	২২	ভবানোপনিষৎ	ভাবনোপনিষৎ
৯০০	২৩	উষয়ঃ	ঊর্ময়ঃ
৯০২	২৮	শি পূ	শি পু
৯২৩	২৯	স্থুলহোম	স্থূলহোম
৯২৪	১২	জবনিষ্ঠ	জীবনিষ্ঠ
৯২৭	১৩	প্রতিমা বিসর্জন	প্রতিমাবিসর্জন
৯২৮	১৮	নির্মাল্য ধারণ	নির্মাল্যধারণ
৯৩১	২৭	C. H. I.	C. Her. I.
৯৩৩	২৯	কণিকামধ্যে	কর্ণিকামধ্যে
৯৪০	২৬	মেরু মধ্যে	মেরুমধ্যে

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯৪৫	৯	বিন্দুনিবাধায়	বিননিবাধায়
৯৫০	১৬	সয়ম্ভূলিঙ্গ	স্বয়ম্ভূলিঙ্গ
৯৫১	২	স্বয়ম্ভূলিঙ্গ	স্বয়ম্ভূলিঙ্গ
	৩১	ব্রহ্মগ্রন্থি	ব্রহ্মগ্রন্থি
৯৫২	১৬	অপ্‌তত্ত্ব	অপ্‌তত্ত্ব
৯৭১	২২	বৃন্তে	বৃন্তে
৯৭৭	২২	ত্রৈমাধিক:	ত্রৈমাধিক:
৯৮৮	২২	রাজযোগ:	রাজযোগ:
৯৯২	১৫	সদাশি	সদাশিব
৯৯৪	১	কুণ্ডলিনীযোগ সমাধি	কুণ্ডলিনীযোগসমাধি
৯৯৫	১	ষড়্দলপদ্মের	ষড়্দলপদ্মের
১০০১	৪	কুণ্ডলিনী জাগরণের	কুণ্ডলিনীজাগরণের
	৬	কুণ্ডলিনী জাগরণের	কুণ্ডলিনীজাগরণের
১০১৪	১৫	ষট্‌কূটভৈরবী	ষট্‌কূটাভৈরবী
১০১৬	২১	পুংবাং	পুংসাং
		যোনোপদিষ্টতে	যেনোপদিষ্টতে
১০১৯	১৪	রামকৃষ্ণ	রাম কৃষ্ণ
১০২০	২৮	তান্ত্রিক:	তান্ত্রিকৈঃ
১০২১	২৫	কলিচুরণ	কলিচূর্ণ
১০২৫	২৭	ভর্ত্ত	ভর্ত্তা
১০২৬	১৯	বহিমুখা:	বহির্মুখাঃ
	২০	উচ্ছৃঙ্খলা	উচ্ছৃঙ্খলা
১০৩০	২৫	সংসারারব্‌	সংসারার্ণব্‌
১০৪১	২	অভিচার কর্ম	অভিচারকর্ম
		কুমারী পূজা	কুমারীপূজা
১০৪৬	২৬	গোলকে	গোলোকে
১০৫০	১১	রামমোহন প্রবর্তিত	রামমোহনপ্রবর্তিত
১০৫৬	১৬	কবচতাবিজ	কবচতাবিজ

২১ পৃষ্ঠায় ২২ পঙ্‌ক্তিতে 'শিব দেবীর পুত্র' এই উক্তির প্রমাণ অনবধানতাবশতঃ উদ্ধৃত হয় নি। প্রমাণশ্লোকটি এই—

ব্রহ্মবিষ্ণুশিবানাঞ্চ প্রসূতে করুণাময়ি।
জড়ানাং জ্ঞানদে দেবি ত্রাহি মাং শরণাগতম্।

—বৃহন্নীলতন্ত্র, পঃ ৫

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

আদিম মানুষের দেবতা ও ধর্ম

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতের বাইরে দেবীপূজা

তৃতীয় অধ্যায়

ভারতের মানুষ ও প্রাচীন ধর্ম

চতুর্থ অধ্যায়

মহাদেবী—শ্রৌত সাহিত্যে

পঞ্চম অধ্যায়

মহাদেবী

(ক) শ্রুতিপরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যে

(খ) ঐতিহাসিক প্রামাণ্য নিদর্শনে—ভারতে

ষষ্ঠ অধ্যায়

দেবীপূজার ব্যাপকতা

রাজপুতানার দেবীস্থান ও দেবীমন্দির

সপ্তম অধ্যায়

শিব

অষ্টম অধ্যায়

শৈবদর্শন

বিষয়	পৃষ্ঠা

নবম অধ্যায়

শক্তিরহস্য

দশম অধ্যায়

সাধনা ও শাক্ত দর্শন

একাদশ অধ্যায়

সাধনা

দ্বাদশ অধ্যায়

সাধনোপায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

পঞ্চতত্ত্ব ও শবসাধনা

চতুর্দশ অধ্যায়

দীক্ষা

পঞ্চদশ অধ্যায়

জপ

ষোড়শ অধ্যায়

পূজা

সপ্তদশ অধ্যায়

প্রতীক ও প্রতিমা

অষ্টাদশ অধ্যায়

যোগ

উনবিংশতি অধ্যায়

তন্ত্র

শ্লোকাদি-সূচী

আ

ই ঈ

এ ঐ

চ ছ

জ

প ক

ব

য

ষ

স

প্রথম অধ্যায়

আদিম মানুষের দেবতা ও ধর্ম

সন্ধান—মানুষের মনে কবে এবং কেমন করে দেবতার আবির্ভাব হল তার সঠিক তথ্য সুদূর অতীতের যে-গোপন গুহায় নিহিত রয়েছে তার সম্যক্ সন্ধান মানুষ জানে না ; তবে অনুমান করে।

আদি মানবের চলার পথে হাজার হাজার বছর কেটে গেল। এল বুদ্ধিজীবী সভ্য মানুষ। তারা পেরিয়ে-আসা পথের সন্ধানে বেরুল ; খোঁজ পেল এমন-সব মানুষের যারা সবেমাত্র জন্তুর স্তর অতিক্রম করেছে , সিদ্ধান্ত করল আদিম মানব এদেরই মতো ছিল। এরা বিবর্তনের পথে যেখানে প্রথমে দেখা দিয়েছিল সেখানেই থেকে গেছে। এদের আত্মীয়বন্ধুরা গেছে এগিয়ে।

এগিয়ে যারা গেল তারাও সমান তালে এগোতে পারল না। চলতে চলতে জায়গায় জায়গায় এক এক দল যেন থমকে দাঁড়াল। এরাই নানা স্তরের বর্বর মানুষ। জগতের সর্বত্রই এদের কোনো না কোনো গোষ্ঠী, কৌম (clan) বা জনের[1] (tribe) দেখা পাওয়া গেল।

সভ্য মানুষের অতীত পরিচয়—দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে যারা সভ্যতার উঁচু স্তরে এসে পৌঁছাল তাদের চলার পথের নিদর্শন এক দিকে যেমন ছড়িয়ে আছে তাদের নানা অবস্থায় তৈরি নানা জিনিসপত্রের মধ্যে, তেমনি আরেক দিকে ছড়িয়ে আছে পূর্বোক্ত বর্বর মানুষদের মধ্যে। তাই, সভ্য মানুষের অতীত পরিচয় এই নিদর্শনগুলিকে ভিত্তি করেই গড়ে তুলতে হয়।

জগতের সভ্যতম মানবগোষ্ঠীও একদা আদিম বর্বর অবস্থায় ছিল। এ দিক্ দিয়ে দেখতে গেলে সব মানুষই এক জায়গা থেকে চলতে সুরু করেছে। কোনো কোনো পণ্ডিত ত মনে করেন সব মানুষেরই পূর্বপুরুষ এক[2]। এঁরা প্রধানতঃ প্রাণিবিজ্ঞানের বিচারের উপর নির্ভর করে এ রকম সিদ্ধান্ত করেন। এঁদের মত মেনে নিলে মানুষ যে একই জায়গা থেকে চলতে সুরু করেছে এই অভিমতের আরেকটি সমর্থন পাওয়া যায়।

---

১ Tribe অর্থে জন শব্দটির ব্যবহার ঋগ্‌বেদে পাওয়া যায়। যেমন, যাহ্বংজনম্‌-ঋ বে ৮।৬।৪৮ ; ভারতং জনম্‌-ঋ বে ৩।৫৩।১২।

২ Anthropology, 1st Ed., 1904, pp. 5–6

আদিম মানুষের পরিচয়ের প্রয়োজনীয়তা—মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি এগিয়ে চলে স্রোতধারায়; তাতে আকস্মিক কিছু নেই। অতীতকে আত্মসাৎ করেই দেখা দেয় বর্তমান; সে আবার প্রসারিত হয় অনাগতের দিকে।

এই জন্য সভ্য মানুষ আপনার পুরো পরিচয়টি পাবার আগ্রহে বর্বর মানুষের কথা জানতে চায়। প্রত্যক্ষ প্রমাণ যেখানে পাওয়া সম্ভবপর নয় সেখানে পরোক্ষ প্রমাণ এবং অনুমানের উপর নির্ভর করে।

বিশেষ করে মানুষের দেবতা ও ধর্মের ইতিহাসের গোড়ার দিকটা অনেকখানিই এই অনুমানের সাহায্যে গড়ে নিতে হয়।

বর্বর মানুষের দেবতা ও ধর্মই এরূপ অনুমানের প্রধান ভিত্তি। তবে বর্বর মানুষের দেবতা ও ধর্মের যে-রূপ সভ্য মানুষের সন্ধানী দৃষ্টির গোচর হল তার মধ্যেও অনেক ক্ষেত্রে জটিলতা আছে। আর সেই জটিলতার জট ছাড়াতেও অনুমানের সাহায্য নিতে হয়।

একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। সহজেই অনুমান করা যায় এক সময়ে সারা জগৎই ছিল আদিম মানুষের আবাসস্থল। কালে জগতের কোনো কোনো অংশে কোনো কোনো কৌম অপেক্ষাকৃত সভ্য হয়ে উঠতে থাকে। প্রাগৈতিহাসিক যুগেই এমনি কোনো কৌম বা জন বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে প্রবল হয়ে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের লোকদের উপর প্রভুত্ব করতে সুরু করেছে, কখনও বা স্বীয় আবাস-অঞ্চলের বাইরে গিয়ে বর্বর মানুষের অঞ্চল অধিকার করে বসেছে, মানুষের পরবর্তী ইতিহাসের দৃষ্টান্তে এ রকম অনুমান করা যায়। আরও অনুমান করা যায় বিজেতাদের জীবনযাত্রার উপর বিজিতদের প্রভাব পড়েছে, তাদের ধর্ম বিজিতদের ধর্মকে যথাসম্ভব আত্মসাৎ না করে পারে নি[১]।

আদিম মানুষের ধর্মের মূল— বর্বর মানুষের দেবতা ও ধর্মবিষয়ক তথ্যাদি পর্যালোচনা করে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতেরা আদিম মানুষের ধর্মের মূল সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত প্রকাশ করেছেন।

এনিমিজম—হার্বার্ট স্পেন্সর (Herbert Spencer), টাইলর (Tylor), রিজওয়ে (Ridgeway) প্রভৃথ পণ্ডিতেরা মনে করেন আদিম মানবের ধর্মের মূলে রয়েছে 'এনিমিজম' (animism) অর্থাৎ বস্তুমাত্রই সজীব (ensouled) আদিম মানুষের এই ধারণা। আদিম মানুষ মনে করত প্রত্যেক বস্তুতেই স্পিরিট বা আত্মা আছে। সেইজন্য প্রত্যেক বস্তুই সজীব[২]।

আদিম মানুষ মনে করত সে নিজে যেমন সজীব জগতের সব বস্তুই তেমনি সজীব; শুধু

১ H. R., p. 18 ২ G. Ph, R., p. 92

পশুপাখী প্রভৃতি সচল প্রাণী নয়, গাছপালা, পাথর, পাহাড় সবই সজীব। সে ভাবত এই-সব তারই মতো ভালবাসে, রাগ করে, ভাবতে পারে। এমন কি কেউ যদি বলত এই-সব গাছ-পালা পশুপাখী প্রভৃতি তারই মতো কথা বলতেও পারে তা হলেও সে অবিশ্বাস করত না।[১]

মৃতের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা—আইট্রেম (Eitrem) প্রমুখ পণ্ডিতদের মতে আদিম মানুষ মনে করত মানুষ মরে গেলেও তার আত্মা (spirit) থাকে। এই আত্মাকে সে সম্মান করত, শ্রদ্ধা করত। মৃতের আত্মার প্রতি এই শ্রদ্ধা ও সম্মানই মানুষের ধর্মের মূল।[২]

প্রকৃতিপূজা—মৃতের আত্মায় বিশ্বাসের পরের স্তর প্রকৃতির নানা বিভূতির শক্তিশালী 'স্পিরিট' আছে এই বিশ্বাস। আদিম মানুষ মনে করত মৃতের স্পিরিট বা আত্মা পাহাড়-পর্বত, নদীসরোবর, গাছপালা, ঝোপঝাড়ে থাকে। এ থেকে তার সহজেই মনে হয়েছে এই-সব পাহাড় পর্বতাদিরও স্বতন্ত্র স্পিরিট আছে। এই বিশ্বাস থেকে প্রকৃতিপূজার উদ্ভব হয়[৩]। মানুষের ধর্মের অন্যতম উৎস প্রকৃতিপূজা।

ধর্মভাবের মূলে ভয় ও কৃতজ্ঞতা—ওয়াল (Wall) প্রমুখ পণ্ডিতেরা মনে করেন মানুষের মনে ধর্মভাবের সূচনা হয় কৃতজ্ঞতাবোধের থেকে কিংবা ভয় থেকে। আদিম মানুষ দেখত তার চারদিকে এমন-সব বস্তু রয়েছে যেগুলি তার অনিষ্ট করে; এগুলিকে সে ভয় করত। আবার এমন-সব বস্তু দেখত যেগুলি তার উপকার করে। এই উপকারের জন্য সে কৃতজ্ঞতা বোধ করত।[৪]

যে-সব বস্তু আদিম মানুষের উপকার করত বা তার অনিষ্ট করত সেগুলির মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ স্পিরিট আছে বলে সে বিশ্বাস করত। যে-সব স্পিরিট ইষ্টকারী, আদিম মানুষ তাদের প্রতিই কৃতজ্ঞতা বোধ করত।

পিতৃপুরুষের পূজা—ইষ্টকারী স্পিরিটদের মধ্যে প্রধান মৃত পিতৃগণের স্পিরিট বা আত্মা। আদিম মানুষ লক্ষ্য করত পিতা পরিবারের সবাইকে রক্ষা করে। সে বিশ্বাস করত পিতার মৃত্যুর পরও তার স্পিরিট সন্তানসন্ততিদের রক্ষা করে। পিতার জীবিতকালে সে যেমন তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকত, তাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করত, মৃত্যুর পরও তেমনি সে পিতার আত্মার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকত, তাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করত, তাকে পূজা করত। পার্থিব পিতা সম্বন্ধে আদিম মানুষের ধারণাই সভ্য মানুষের জগৎ-পিতার ধারণায় পর্যবসিত হয়েছে।

কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে পিতৃপুরুষের পূজাই সম্ভবতঃ জগতের প্রাচীনতম ও সর্বাপেক্ষা ব্যাপক ধর্ম।[৫] হার্বার্ট স্পেন্সার বলেন সব ধর্মের প্রাথমিক রূপ মৃত পিতৃগণের পূজা।[৬]

১ H. R., pp. 21-22 ২ R. Ph. V. U., p. 43 ৩ Ibid ৪ S. S. W., p. 342
৫ S. S. W., pp. 114-116 ৬ H. R., p. 37

অতিমানব শক্তিতে বিশ্বাস—ল্যাং (Lang) প্রমুখ পণ্ডিতেরা মনে করেন প্রকৃতির নানা বিভূতির মধ্যে আদিম মানব তার আপন শক্তির অনুরূপ, কিন্তু তার চেয়ে বহুগুণে বড়, সব শক্তির প্রত্যক্ষ পরিচয় যখন পেল তখন থেকেই তার মনে ধর্মভাবের সূচনা হল।[১]

নিজের শক্তির চেয়ে বড় শক্তি আছে বলে যদি আদিম মানুষ বিশ্বাস না করত তা হলে তার মনে দেবতা বা ধর্মের কথা উঠতই না।

প্রকৃতির প্রচণ্ডতা—কল্পনা করা যায় প্রকৃতির কোলে এল মানুষ। সে-প্রকৃতি বিরাট্, রহস্যময়ী। চার দিকে গভীর অরণ্য; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছপালা; ঘন বন। তার মধ্যে ঘুরে বেড়ায় সব অতিকায় হিংস্র শ্বাপদ, কালান্তক বিষধর। কখনো প্রচণ্ড ঝড় উঠে সব লণ্ডভণ্ড করে দেয়। মুষলধারে বৃষ্টি নাবে; দিনের পর দিন বর্ষণ চলে। বাজ পড়ে; মানুষ মরে; পশু মরে; গাছপালাতে আগুন ধরে যায়। এই-সবের সামনে মানুষ কত ক্ষুদ্র, কত অসহায়। ভয়ে বিস্ময়ে সে অভিভূত হয়ে পড়ে।

প্রাকৃতিক শক্তি—এই-সব প্রাকৃতিক শক্তির কাজ আদিম মানুষ নিজের চোখে দেখে; দেখে তার ফলাফল। এই-সব শক্তিকে সে ভয় করে, সমীহ করে, সম্ভ্রমের চোখে দেখে। এ-সব তার কাছে এক দুর্বোধ্য রহস্য। এরা তার আয়ত্তের বাইরে। এরা যা করে তা সে করতে পারে না। সে এদের দেবতা বা অপদেবতা মনে করে। এদের নামকরণ করে।[২] এই-সব শক্তির সে পূজা করে।

প্রকৃতিপূজা শক্তিপূজা—কাজেই, দেখা যাচ্ছে জেনেই হোক আর না জেনেই হোক আদিম মানুষ প্রকৃত প্রস্তাবে পূজা করেছে শক্তির।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে প্রকৃতিপূজামূলক ধর্মে naturalistic religion) শক্তির অত্যন্ত প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।[৩] এক দিক দিয়ে প্রকৃতিপূজকদেরও শক্তিপূজক বলা যেতে পারে। Otto Pfleiderer প্রভৃতি জার্মান পণ্ডিতদের মতও অনেকটা এই রকমের বলা চলে। তাঁদের মতে প্রাকৃতিক শক্তিগুলি মানুষের মনে যে গভীর রেখাপাত করে তা থেকেই উদ্ভব হয় ধর্মের।[৪]

আদিম মানব অবশ্য প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন বিভূতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি রয়েছে বলে মনে করত। প্রকৃতি এক এবং শক্তিও এক এ ধারণা তার ছিল না।

প্রকৃতির প্রসন্ন বিভূতি—আমরা প্রকৃতির রুদ্ররূপের উল্লেখ করেছি। কিন্তু আদিম মানব প্রকৃতির শুধু রুদ্ররূপই দেখে নি, তার প্রসন্ন বিভূতিও প্রত্যক্ষ করেছে। সে বিশ্বাস করেছে এমন-সব শক্তি আছে যে-সব শক্তি তাকে খাদ্য, পানীয়, আলো, উত্তাপ দিয়ে বাঁচিয়ে

১ R. Ph. V. U., p. 43 ২ R. T. L. I., p. 209 ৩ G. Ph. R., p. 103 ৪ H. R., p. 45

রাখছে। পূর্বেই বলা হয়েছে এদের এ রকম অনুগ্রহের জন্য সে এদের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়েছে, এদের ভক্তিশ্রদ্ধা করেছে, পূজা করেছে।

প্রাকৃতিক শক্তির পূজার হেতু—আদিম মানুষ যখন দেখল প্রাকৃতিক শক্তিগুলি তার বেঁচে থাকার সহায়তা করতে পারে আবার বিরুদ্ধতাও করতে পারে, যখন বুঝল তার সুখশান্তি এমন কি জীবন পর্যন্ত এই-সব শক্তির আনুকূল্যের উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ এই-সব শক্তিকে সে স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মনে করল, তখন থেকেই সে তাদের খুশী রাখবার জন্য চেষ্টা করতে লাগল; তাদের অনুগ্রহ লাভের আশায় বা তাদের নিগ্রহের হাত থেকে বাঁচবার জন্য তাদের পূজা আরম্ভ করল।

হার্ট্‌ম্যান (Edward Von Hartmann) মনে করেন এই-ভাবে প্রাকৃতিক শক্তির পূজা দিয়েই ধর্মের আরম্ভ হয়।[১]

পূজার মূলভাব—প্রয়োজনের তাগিদে স্বার্থবুদ্ধির প্রেরণায় আরম্ভ হল পূজা। কাজেই বলা যেতে পারে পূজার মূলে আছে মানুষের অভাববোধ, দুঃখদৈন্য।

এলিয়ট (Eliot) বলেন মানুষ যদি পরম সুখে থাকত, যদি তার কোনো দুঃখদৈন্য না থাকত, তা হলে সম্ভবতঃ ধর্মের কথা তার মনেই আসত না; আর তা হলে তার ধর্মহীন মনোভাব যুক্তিযুক্তই হত।[২]

আদিম মানুষ দেবতার পূজা করেছে; প্রতিদানে দুঃখ, দৈন্য, রোগ, শত্রু, আপদবিপদ এ-সবের হাত থেকে রক্ষা পেতে চেয়েছে; সুখশান্তি চেয়েছে। এ যেন দেবতাকে এক রকম উৎকোচ দেওয়া। Otto Pfleiderer প্রভৃতি পণ্ডিতেরা দেবতাকে এমনি-ভাবে উৎকোচ দেওয়াটাই পূজার মূল ভাব বলে মনে করেন না। পূজার মূলগত ভাবটিকে তাঁরা এই ধরণের নিতান্ত স্বার্থবুদ্ধিমূলক বলে মানতে রাজি নন।[৩]

প্রীতি—বাস্তবিক পক্ষে মানুষ শুধু ভয়েই পূজা করেনি, প্রীতিতেও করেছে, নিছক কৃতজ্ঞতাবোধের থেকেও করেছে। আর যে-ক্ষেত্রে প্রীতির থেকে পূজা করেছে সেখানে উৎকোচ দেওয়ার মত ব্যাপারের কথাই উঠে না।

পূজাই ধর্ম—অনেকে মনে করেন পূজা থেকেই মানুষের ধর্মের সূত্রপাত। সেইজন্য, কারো কারো মতে উচ্চতর শক্তিসমূহের পূজাই ধর্ম।[৪] আবার কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে কেউ বা বলেন ধর্ম প্রয়োজনবোধে অদৃশ্য শক্তিসমূহের পূজা।[৫]

Schleiermacher ধর্মের সংজ্ঞা নির্দেশ করলেন—ধর্ম অসীম নির্ভরতার ভাব (a sense of infinite dependence)[৬]। দেবতার উপর এই নির্ভরতা।

---

১ H. R., p. 44 ২ H. B., p. 206 ৩ H. R., p. 45 ৪ Ibid, p. 8 ৫ Ibid, p. 10
৬ Ibid, p. 11

পূজ্যের সঙ্গে পূজকের সম্বন্ধ—মানুষ তারই উপর নির্ভর করে, যার সঙ্গে তার একটা কোনো নির্ভরযোগ্য সম্বন্ধ আছে বলে সে বিশ্বাস করে। আদিম মানুষও তাই করেছে। সে বিশ্বাস করেছে তার চার ধারে তার নিজের চেয়ে অনেক বড় যে-সব শক্তি রয়েছে তাদের সঙ্গে তার একটা সম্বন্ধ আছে; তার সুখদুঃখ, জীবনমৃত্যু তাদের উপর নির্ভর করছে। দেবতা তার প্রার্থনা পূর্ণ করলে দেবতার সঙ্গে আত্মীয়তার সম্বন্ধ দৃঢ় হয় বলে সে মনে করেছে।[১] আর কারো কারো মতে পূজার অন্যতম মর্মকথা উচ্চতর শক্তিগুলির সঙ্গে এমনি একটা সম্বন্ধের অনুশীলন।[২]

লক্ষ্য করার বিষয় সভ্য মানুষের পূজার ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি আদিম মানুষের পূজার মূলেও, পূজ্য এবং পূজকের মধ্যে একটা সম্বন্ধ বা ভাব রয়েছে। অবশ্য, এটি অনুমানমাত্র। আর অনুমান যখন তখন এ সম্পর্কে মতভেদ থাকা স্বাভাবিক।

তবে কেউ কেউ মনে করেন দৈবশক্তির সঙ্গে মানুষের এই যে সম্বন্ধ এইটিই ধর্ম।[৩] এই সম্বন্ধ ব্যক্তিগত এবং অন্তরঙ্গ[৪]। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতেই এ রকম সম্বন্ধ স্থাপিত হতে পারে।

দেবতাদি বৈয়ক্তিক—আদিম মানুষ প্রাকৃতিক শক্তি বা দেবতাকে তার নিজেরই মতো ব্যক্তি বলে মনে করত। নিজের সম্বন্ধে তার যে-ধারণা ছিল সেই ধারণা অনুসারেই সে দেবতার কল্পনা করেছে[৫]। সে মনে করেছে দেবতাও তারই মতো মানুষ; দেবতার স্বভাব-চরিত্র তার নিজেরই মতো। তারই মতো দেবতার রাগ, দ্বেষ, ইচ্ছা, অনিচ্ছা, কাম, ক্রোধ সবই আছে। তবে দেবতা তার চেয়ে অনেক শক্তিশালী। সে যা করতে পারে না, দেবতা তা করতে পারেন।[৬]

দেবতার পরিবার-কল্পনা—আদিম মানুষ নিজের পরিবার, গোষ্ঠী বা সমাজের আদর্শে দেবতার পরিবার, গোষ্ঠী বা সমাজের কল্পনা করেছে। মানুষের মধ্যে আছে স্ত্রীপুরুষ, তাদের মধ্যে নানা সম্বন্ধ। সে মনে করেছে দেবতার মধ্যেও তাই আছে।[৭]

আদিম মানুষ দেখত বিভিন্ন প্রকৃতির নানা মানুষ একই পরিবারের মধ্যে বাস করছে। তাই দেখে সে ভাবত বিভিন্ন প্রকৃতির নানা দেবতাও এক পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে বাস করছেন[৮]।

সর্দার বা রাজার আদর্শে দেবকল্পনা—মানুষের মধ্যে ছোট বড় আছে। কারো শক্তি বেশী, কারো শক্তি কম। যার শক্তি কম, সে বেশী শক্তিশালীকে মেনে চলে। কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে যে সকলের চেয়ে শক্তিশালী সে সর্দার বা রাজা। তার আছে অনুগ্রহ-

১ H. R., p. 12 ২ Ibid, p. 8 ৩ L. C. R., p. 7 ৪ P. C., Vol II, pp. 184-85
৫ Ibid, p. 184 ৬ Ibid, pp. 247-48 ৭ S. S. W., pp. 375-76; H. R., p. 50; P. C., Vol. II, pp. 248, 335 ৮ H. R., p. 47

নিগ্রহের ক্ষমতা ; তাকে সবাই মানে। আদিম মানুষ এ-সব দেখত আর কল্পনা করত দেবতাদের মধ্যেও ছোট বড় আছে। বড় বড় দেবতারা সর্দার বা রাজার মতো। সর্দার বা রাজার আদর্শে সে এ-সব দেবতার স্বভাবচরিত্র, মেজাজ, ভাবনা-চিন্তা, কাজ-কর্ম, এমন কি আকৃতিরও কল্পনা করেছে।[১]

এই ধরনের বীর সর্দার বা রাজাকে দেখেই মানুষের মনে বৈয়ক্তিক দেবতার কল্পনা এসেছিল বলে কেউ কেউ মনে করেন। Wundt অনুমান করেন বীরত্বের যুগে (heroic age) মানুষের মধ্যে যে বীর, যে স্বতন্ত্র, যে আপন শৌর্যবীর্য কার্যকলাপের দ্বারা অন্য সকলের উপর মাথা তুলে দাঁড়ায়, আজকের দিনের অতিমানবের যে আদিরূপ, তার চরিত্রে দুটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। এক দিকে সে দানব আরেক দিকে সে বীর। দানবরূপে তার আছে যাদুশক্তি, লোকে তাকে ভয় করে ; কিন্তু বীর হিসাবে তাকে ভালবাসে, তার প্রশংসা করে। এই উভয়ের ফলস্বরূপ দেখা দিল বৈয়ক্তিক দেবতার ধারণা।[২]

এ রকম অনুমানের সত্যাসত্য যাচাই করা যায় না। তবে এর থেকে একটা ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠে—আদিম মানুষও একই দেবতাকে ভীষণ ও ভয়ঙ্কর এবং প্রসন্ন ও বরদ মনে করতে পারত।

দেবপূজার মূলেও আছে এই বীরপূজার নজির। সর্দার বা রাজার অনুগ্রহ পাবার জন্য বা নিগ্রহ এড়াবার জন্য আদিম মানুষ যেমন প্রীতি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে অথবা সভয়ে সসম্ভ্রমে তাকে ভাল ভাল জিনিষ দিয়েছে, তার নানা সুখ্যাতি করে, নানাভাবে খোসামোদ করে তাকে খুশী করতে চেয়েছে ; তার কাছে কোনো একটা অভীষ্ট বস্তুর জন্য প্রার্থনা করেছে ; দেবতার পূজার বেলায়ও সে ঠিক তাই করেছে। দেবতার উদ্দেশ্যে ভাল ভাল জিনিষ উপহার দিয়েছে ; সেইসব খাদ্য, পানীয় দিয়েছে যা সে নিজে উৎকৃষ্ট বলে মনে করে ; দেবতার স্তবস্তুতি করেছে ; তার কাছে অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেছে।

পূজা ক্রিয়াপ্রধান—এই পূজা ছিল ক্রিয়াপ্রধান। তবে এই ক্রিয়াকাণ্ড বিস্তৃত বা জটিল ছিল না। সেদিন কোনো শাস্ত্র ছিল না ; তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিধিবিধানও ছিল না। প্রচলিত লোকাচার ও লোকমত অনুসারেই পূজা হত দেবতার।[৩] তা ছাড়া, সেদিন ধর্ম ছিল প্রধানতঃ জনগত (tribal), ব্যষ্টিগত নয়। ব্যষ্টির ক্ষেত্রে অবশ্য ব্রতপালন করা, দেবতার স্তবস্তুতি করা, দেবতার কাছে প্রার্থনা করা এ-সব চলত।[৪] তবে অনুমান করা হয় পূজানুষ্ঠান সমষ্টিগত ছিল।

১ P. C., Vol. II, p. 248 ২ G. Ph. R., pp. 216-17
৩ H. R., pp. 64-65 ৪ H. R., pp. 74-75

পূজায় ভোজ ও নৃত্যগীতাদি—আদিম মানুষের পূজার প্রধান অনুষ্ঠান ভোজ। স্থান-বিশেষের সমগ্র কৌম এই ভোজে যোগ দিত। সবাই মিলে দেবতার সামনে আমোদ-আহ্লাদ করত, নাচত, গান করত, হৈ-হুল্লোড় করত। সময়ে সময়ে এরা আনন্দে উন্মত্ত হয়ে উঠত। নাচতে নাচতে অনেকের ভাব লেগে যেত। এ রকম লোকেরা মনে করত তাদের উপর দেবতা ভর করেছেন। তখন তারা এমন আচরণ করে বসত যার কথা অন্য সময়ে স্বপ্নেও ভাবতে পারত না।[১]

পূজার আধার—আদিম মানুষের পূজার আধার ছিল প্রধানতঃ গাছ, পাথর, ঝর্ণা এই-সব। পরবর্তী কালেও জগতের সর্বত্র তার অবশেষ থেকে গেছে। সভ্য মানুষও বিশেষ বিশেষ গাছ, পাথর, ঝর্ণা, কূপ বা নদীকে পবিত্র মনে করেছে। বিশেষ করে পাথরে যে ব্যাপকভাবে পূজা হত তার বহু নিদর্শন এখনও সারা জগতে ছড়িয়ে আছে। এই-সব পাথর স্বয়ম্ভু। প্রাচীন গ্রীসে ডেলফিতে (Delphi) গইয়া (Gaia) দেবীর যে-স্থান ছিল তার নাম ওম্ফালস (Omphalos)। সেখানে একখণ্ড পাথর ছিল। তাকেই পরে ওম্ফালস বলা হত। এটিকে অতি পবিত্র পূজাবস্তু (fetish thing) মনে করা হত। এটি থাকত মন্দিরের একেবারে ভিতরে।[২] অনুমান হয় গোড়ায় একেই দেবীর প্রতীক মনে করা হত। মক্কাশরীফে কাবার কাছে যে-পাথর রয়েছে, এফিসসে ডায়েনামন্দিরে যে-পাথর রয়েছে, এগুলি জগৎ-প্রসিদ্ধ। অনেকে মনে করেন ইউরোপের সর্বত্র এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম এসিয়ায় যে-সব খাড়া পাথর দেখতে পাওয়া যায় এক সময়ে সেগুলোর পূজা হত।[৩] ভারতবর্ষে শুধু খাড়া নয়, এই ধরণের শোয়ানো পাথরও বহু আছে। অনেকগুলিকে এখনও দেবতার প্রতীকরূপে পূজা করা হয়।

প্রত্যক্ষ দেবতা বা শক্তি—আদিম মানুষ গোড়ায় বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিভূতিকেই দেবতা বলে পূজা করেছে ; এদের কোনো অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কথা ভাবেনি। সূর্যকে সে সূর্য বলেই পূজা করেছে, চন্দ্রকে চন্দ্র বলে, আকাশকে আকাশ বলে। পাহাড়, নদী, ঝর্ণা, গাছ, পাথর, বনখণ্ড (grove), শস্য, জল, জন্তুজানোয়ার এ-সবকে সে সেই সেই পদার্থ বলেই পূজা করেছে অর্থাৎ এদের অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন প্রত্যক্ষ যথানাম দেবসত্তারূপেই পূজা করেছে।

অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—কালে কালে সে অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কথা ভাবতে শিখল ; বস্তু থেকে আত্মাকে (spirit) পৃথক করতে শিখল। সে মনে করল প্রত্যেক বস্তুরই আত্মা আছে। আদিম মানুষের ধারণা হল সব জায়গাই দেবতা আর অপদেবতায় ভর্তি।

১ H. R., p. 75 ২ Themis, p. 396 ৩ H. R., p. 57

এক শক্তির ধারণা—অনুমান করা যায় এই-সব দেবতা-অপদেবতাদের প্রত্যেককে সে প্রথমে পৃথক ও স্বতন্ত্র মনে করত। তার পর ক্রমে তার মনে হল জগৎ জুড়ে রয়েছে একই শক্তি। আর এই শক্তিকেই আদিম মানুষ মনে করত 'মেনা' (mana)। সে ভাবত এই মেনা অসংখ্য পৃথক্ পৃথক্ শক্তির আকারে দেখা দিয়েছে। এরাই সব ভূতপ্রেত, দৈত্যদানা, ছরীপরী।[১] উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে এই রহস্যময়ী শক্তির সম্বন্ধে একটি চমৎকার ধারণা প্রচলিত আছে। তারা একে বলে ওরেণ্ডা (Orenda)। এই শক্তি চন্দ্র, সূর্য, গ্রহনক্ষত্র, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু, জল প্রভৃতি সব প্রাকৃতিক বস্তুর মধ্য দিয়ে এবং সব বস্তুর আকারে আপনাকে প্রকাশ করছে। বাতাসে এই শক্তিই নিঃশ্বাস ফেলে, বজ্রে শোনা যায় এরই গর্জন।[২]

দেবতা ও অপদেবতা—কে দেবতা আর কে অপদেবতা আদিম মানুষ সহজ বুদ্ধি দিয়েই তা স্থির করে নিয়েছিল। মোটামুটি যে তার অনিষ্ট করে তাকে অপদেবতা আর যে ইষ্ট করে তাকে সে দেবতা মনে করত। তবে অপদেবতাও ইষ্ট করতে পারে এবং দেবতাও অনিষ্ট করতে পারেন এ ধারণাও তার ছিল। এনিমিজমের সব স্তরেই দেখা যায় মানুষ কোনো কোনো দেবতা বা অপদেবতাকে তার পরিচিত, সহায়ক এবং রক্ষাকারী বলে মনে করেছে।[৩] একে আমাদের সনাতন ধর্মীয় শাস্ত্রনির্দিষ্ট ইষ্টদেবতা-তত্ত্বের সূচনা বলা যায়।

অপদেবতা—আদিম মানুষ মনে করত অধিকাংশ অপদেবতা অনিষ্টকারী।[৪] সে ভাবত যত রকমের আপদবিপদ, স্বাস্থ্যভাব, রোগ, মৃত্যু সবই এদের জন্য হয়। এরা চার ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সুযোগ পেলেই মানুষের ক্ষতি করে। তাই, এদের সে বড্ড ভয় করত।

অপদেবতা বা ভূতপ্রেতে বিশ্বাস এবং তাদের ভয় বিশ্বজনীন। সর্বত্রই, সভ্য মানুষের মধ্যেও, এই বিশ্বাস ও ভয় ছিল এবং এখনও একেবারে যে নেই তা বলা যায় না। ওয়াল (Wall) বলেন অপদেবতা যে রোগ ও মৃত্যু ঘটায় এ বিশ্বাস খৃষ্টানদের মধ্যেও ব্যাপক ছিল।[৫]

প্রেতাত্মা অপদেবতা—আমরা দেখেছি আদিম মানুষ মনে করত মানুষ মরে গেলেও তার আত্মা (spirit) থাকে আর এই আত্মাকে সে সম্মান করত। তবে সব ক্ষেত্রে করত না। কারণ, মৃতব্যক্তির এই আত্মাই ত ভূত। শুধু মৃত মানুষ নয়, মৃত জীবজন্তুর আত্মার অস্তিত্বেও সে বিশ্বাস করত। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় এই ভূতকে সে শত্রু

---

১ G. Ph. R., p. 220. 'মেনা' অর্থ রহস্যময়ী নৈর্ব্যক্তিক শক্তি। দ্র. Ibid, p. 88 ২ Mahamaya, Prefacc, pp. III-IV ৩ P. C., Vol. II, pp. 199-200 ৪ G. Ph. R., p. 92 ৫ S. S. W., p. 45

মনে করত। এ যাতে ফিরে এসে তার কোনো অনিষ্ট না করতে পারে এই জন্য সে অনেক রকম ফন্দিফিকির করত।[১] ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্রে অপদেবতা প্রভৃতি বিতাড়নের যে-সব ব্যবস্থা আছে ইতিহাসের দিক্ দিয়ে বিচার করলে তার মূল এখানে পাওয়া যায়।

ভূততোষণ—সার কথা, আদিম মানুষ ভূতকে ভীষণ ভয় করত। সে তাকে সব রকমে এড়িয়ে চলতে চাইত। ভূতকে খুশী রাখবার জন্য অনেক ক্ষেত্রে সে তার পূজা-আর্চাও করত। স্পেন্সার ত মনে করেন সকল ধর্মের মূল এই ভূততোষণ।[২]

প্রেতাত্মা দেবতা—তবে আদিম মানুষ মৃত ব্যক্তির আত্মামাত্রকেই প্রচলিত অর্থে যাকে ভূত বলা হয় তা কিছু মনে করত না। কোনো কোনো আত্মাকে সে দেবতা মনে করত। কেউ কেউ এমন কথাও বলেন যে সব দেবতাই মানুষ ছিলেন; একটু অন্যভাবে বলা হয়, মানুষের মধ্যে যাঁরা বীর ছিলেন, মরার পর তাঁরাই লোকের চোখে দেবতা হয়ে গিয়েছেন।[৩]

দেবতার আকৃতি—আদিম মানুষ তার নিজেরই আদর্শে দেবতার কল্পনা করেছে, মনে করেছে দেবতার আকৃতিও মানুষেরই মতো। তবে দেবতার অন্য রকম রূপও সে কল্পনা করতে পারত। যার মধ্যেই রহস্যময়ী শক্তি রয়েছে মনে করেছে তাকেই সে দেবতা ভেবেছে। বিশেষ করে জীবজন্তুকে সে দেবতা মনে করত। কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন প্রাকৃতিক শক্তিগুলির উপরও নরত্ব আরোপ করার আগে পশুত্ব আরোপ করা হয়েছে।[৪] অর্থাৎ আদিম মানুষ প্রকৃতির শক্তি বা দেবতাদের প্রথমে ভেবেছে জন্তুর মতো, তার পর ভেবেছে তারা মানুষের মতো।

জন্তুরূপী দেবতা—আদিম মানুষ যে জন্তুকে দেবতা ভাবত বা দেবতার জন্তুরূপ কল্পনা করত সভ্য মানুষের পুরাণাদিতেও তার নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রাচীন মিশরে জন্তুরূপী দেবতার পূজা প্রচলিত ছিল। যে-পিরামিড সব চেয়ে পুরনো তারও অনেক অনেক কাল আগে থেকে, মানুষের বর্বর অবস্থা থেকে, এই পূজার ধারা চলে এসেছে। মিশরীয় দেবতা 'হথর' (Hathor)-এর গাভীরূপ এবং 'সেবেক' (Sebek)-এর কুমীররূপ প্রসিদ্ধ।[৫]

আমাদের দেশেও বেদ-পুরাণাদিতে রুদ্র-শিব, ভগবতী প্রভৃতির বৃষভ, গাভী, শৃগাল প্রভৃতি রূপের কথা পাওয়া যায়। বানরমূর্তি মহাবীর এখনও লক্ষ লক্ষ মানুষের পূজা পাচ্ছেন। আদিম মানুষ যে জন্তুরূপী দেবতার পূজা করত এই-সব তারই নিদর্শন।

---

১ H. R., p. 31 ২ H. R., pp. 36-37; স্পেন্সার পূর্বপুরুষের প্রেতাত্মার কথা বলেছেন; প্রেতাত্মা ভূত। ৩ S. S. W., p. 332 ৪ H. R., p. 50 ৫ P. C., Vol. II, pp. 237-238

বর্বর মানুষ মনে করত জন্তুর শক্তি, সাহস এবং ধূর্তবুদ্ধি তার নিজের চেয়ে অনেক বেশী। সে বিশ্বাস করত তার নিজেরই মতো জন্তুরও আত্মা আছে। জন্তু মরে গেলেও তার আত্মা মরে না। সে আত্মা তেমনি শক্তিশালী থাকে এবং মানুষের ইষ্ট বা অনিষ্ট করতে পারে।[১] এর পরে জন্তুকে দেবতা কল্পনা করা তার পক্ষে কঠিন হল না। সে বিশ্বাস করত জন্তুদেহেও দেবতা আপন শক্তি প্রকাশ করতে পারেন।

টোটেম—এই প্রসঙ্গে জন্তু সম্পর্কে আদিম মানুষের আরেকটি বিশ্বাসের উল্লেখ করতে হয়। এটি টোটেম (totem)। এই টোটেম এক রহস্যময় বস্তু। আদিম মানুষ মনে করত বিশেষ বিশেষ জন্তুর মধ্যে অশরীরী অজ্ঞাতনামা শক্তির আবির্ভাব হয়। এই জন্য, এই জন্তুদের সে বিশেষভাবে সমীহ করে চলত, সম্মান করত। আসলে জন্তুকে উপলক্ষ্য করে সেই শক্তিকেই সে সম্মান করত। এই জন্তুগুলিই টোটেম। ডার্কহাইম (Durkheim) মনে করেন কৌম এবং তার অন্তর্ভুক্ত লোকদের টোটেমের সঙ্গে এবং যে-বিশ্বশক্তির সে প্রতীক তার সঙ্গে একটা মর্মগত ঐক্য রয়েছে।[২]

মানুষ স্বভাবতঃ শক্তিবিশ্বাসী—লক্ষ্য করবার বিষয় বর্বর অবস্থাতেও মানুষ, যতই অস্পষ্টভাবে হোক না কেন, নিজের সঙ্গে জীবজন্তু ও বিশ্বশক্তির একটা ঐক্যের ধারণা করতে পেরেছিল। মানুষ স্বভাবতই শক্তিবিশ্বাসী, শক্তিনিষ্ঠ।

দেবতার সঙ্গে যথেচ্ছ ব্যবহার—আদিম মানুষের দেবতা সম্বন্ধে আরেকটি ব্যাপারের উল্লেখ করা প্রয়োজন। আফ্রিকার বর্বর মানুষের কোনো কোনো দলের মধ্যে এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করা হয়েছে। কোনো দেবতাকে পূজার জন্য নির্বাচন করার পর এই-সব দলের মানুষ তার সঙ্গে যে-রকম ব্যবহার উপযুক্ত মনে করত তাই করতে পারত। সে দেবতার গুণগান করে স্তবস্তুতি করত, তার কাছে প্রার্থনা করত। কিন্তু তাতে কোন ফল না হলে সে দেবতাকে অপদার্থ বলে পরিত্যাগ করত, তার আর পূজা করত না। অভীষ্টসিদ্ধি না হলে সে অনেক সময় দেবতাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করত, এমন কি তাকে অর্থাৎ তার প্রতীককে প্রহার পর্যন্ত করত, ভাবত এর ফলে দেবতা তার ইচ্ছামত কাজ ভালভাবে করবে। দেবতা যেন মানুষের বশংবদ, মানুষের অভিপ্রায়মত কাজ করার জন্যই তাকে রাখা রয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তিরই কাজকর্মে সহায়তা করবার জন্য তার নিজস্ব দেবতা থাকত।[৩] এখানে সম্ভবতঃ তন্ত্রোক্ত বেতালসিদ্ধি প্রভৃতির আদিরূপ পাওয়া যাচ্ছে।

যাদুক্রিয়া—দেবতাকে এবং অপদেবতাকে বশে রাখবার জন্য আদিম মানুষ যাদুক্রিয়ার অনুষ্ঠান করত। যাদুর উপর তার অটুট বিশ্বাস ছিল। যাদুশক্তি এক রহস্যময়ী শক্তি।

১ P. O., Vol. II, pp. 229-30 ২ G. Ph. R., p. 91 ৩ H. R., pp. 32-33

সে মনে করত যাদুর দ্বারা যা-খুশি করা যায়। বৃষ্টি নাবান, ঝড়ঝঞ্ঝা রোধ করা, প্রচুর ফসল ফলান, অনিষ্টকারী অপদেবতাদের বিতাড়ন, শত্রুনিধন—এমনি যা-কিছু তার জীবনের প্রয়োজনে আসে সবই যাদুসাধ্য বলে আদিম মানুষ বিশ্বাস করত।

আদিম মানুষের মৌলিক প্রয়োজন—আদিম মানুষের সব প্রয়োজনেরই মূলে ছিল দুটিমাত্র প্রয়োজন। এক—বেঁচে থাকা। তার জন্য খাদ্যের আর শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রয়োজন। দুই—বংশরক্ষা। তার জন্য প্রয়োজন প্রজননের।

মৌলিক প্রয়োজন সাধনে যাদু—যাদুক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে আদিম মানুষ প্রধানতঃ এই দুটি প্রয়োজনই মেটাতে চাইত।[১]

অশ্লীল ভাষণাদি যাদুর অঙ্গ—আদিম মানুষের বিশ্বাস ছিল অশ্লীল কথাবার্তা এবং যৌনক্রিয়া জমির উর্বরতা ও ফসলের ফলন বাড়ায়। সে মনে করত এ-সবের যাদুশক্তি আছে। সেই জন্য, শস্য বুনার আগে সে সঙ্গীকে ক্ষেতে নিয়ে যৌনক্রিয়ার অনুষ্ঠান করত। কোথাও কোথাও এই-সব যৌনক্রিয়াদি শস্যবপন-উৎসবের অপরিহার্য অঙ্গ বলে গণ্য হত।[২]

যাদুক্রিয়ায় মন্ত্রতন্ত্রাদি—সাধারণতঃ যাদুক্রিয়ার অঙ্গ ছিল মন্ত্রতন্ত্র, নানা রকমের অঙ্গভঙ্গী ও নাচ এবং যাদু-উদ্দিষ্টের কোনো প্রতীক ব্যবহার।[৩] বর্বর মানুষের কাছে নাচের বড় আদর। নানা রকম অঙ্গভঙ্গী করে নাচ করাকে সে প্রধান যাদুক্রিয়া মনে করত। এ নাচ গোষ্ঠীযুক্ত সকলের সমবেত নাচ, একক নাচ নয়। রোদ চাই, কিংবা হাওয়া বা বৃষ্টি? কোনো ভাবনা নেই, সবাই মিলে নেচে দিলে সূর্যনাচ বা বায়ুনাচ বা বৃষ্টিনাচ।[৪] সে বিশ্বাস করত এতেই বাঞ্ছিত ফল ফলবে।

ইতিহাসের দৃষ্টিতে মনে হয় যাদুক্রিয়ার অঙ্গ প্রতীক অঙ্গভঙ্গীই তান্ত্রিক পূজার অঙ্গ মুদ্রার আদিরূপ।

যাদুক্রিয়ায় মন্ত্র-ব্যবহারের ইতিহাস নির্ণয় করা অত্যন্ত দুরূহ। বিশেষ ধরণের কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ করলে বিশেষ ফল হয়, অর্থাৎ সেই উচ্চারিত শব্দের বিশেষ শক্তি আছে, এ ধারণা আদিম মানুষের মনে প্রথমে কি করে এল নিশ্চয় করে বলা যায় না। হয়ত তারা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলার সময় শ্রোতার উপর বিশেষ শব্দের বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করেছে এবং তারই দৃষ্টান্তে দেবতাদির উপরও বিশেষ বিশেষ শব্দের বিশেষ বিশেষ প্রভাব কল্পনা করেছে; আর যাদুক্রিয়াদিতে সে-রকম শব্দ ব্যবহার করেছে। তবে প্রথম ব্যবহার যেভাবেই হোক না কেন, এ কথা ঠিক যে, এই ধরণের শব্দ বা মন্ত্রের ব্যবহার এক সময়ে

১ A. A. R., p. 50 ২ G. B., Part I, Vol II, pp. 97-101 ৩ G. B. Part I, Vol. I, pp. 55-74 ; H. R., pp. 72-78 ; E. B., 1961, Vol. 14, p. 624 (দ্রঃ Magic) ৪ A. A. R., p. 80

জগতের সর্বত্র প্রচলিত ছিল। এমন কি একাধিক ভাষায় প্রায় একই আকারের যাদুমন্ত্র খুঁজে পাওয়া যায়।[১]

টেবু—যাদুর সঙ্গে আদিম মানুষের আরেকটি ধারণা যুক্ত হয়ে আছে। সে কতগুলো বস্তুকে 'মেনা' মনে করত। এ রকম বস্তু তার কাছে 'টেবু' অর্থাৎ নিষিদ্ধ। কারণ, সে ভাবত এগুলোর মধ্যে যাদুশক্তি আছে। আর এই যাদুশক্তি বিপৎকারিণী রহস্যময়ী শক্তি।[২] আসলে 'টেবু' অর্থ পবিত্র। ঐ বিপৎকারিণী রহস্যময়ী শক্তি আছে বলেই পবিত্র। পাছে অজ্ঞ লোকে এ রকম বস্তু নিয়ে হেলাফেলা করে সেই জন্যই 'টেবু' নিষিদ্ধ বলে গণ্য হয়।[৩]

আলোচ্য শক্তি গাছপাথর, জীবজন্তু, উৎসব-অনুষ্ঠান, স্থান, কাল, পাত্র, যে-কোনো পদার্থেই থাকতে পারে, আদিম মানুষের এই ধারণা ছিল। কাজেই, এরকম যে-কোনো পদার্থ 'টেবু' হতে পারত।[৪]

নারী 'টেবু'—আদিম মানুষের মধ্যে নারী সম্পর্কে যাদুতে ধর্মেতে মিশানো একটা ধারণা প্রচলিত ছিল। সে মনে করত নারী, বিশেষ করে, নারীর রক্ত পবিত্র।[৫] এর অর্থ নারীকে সে সময়-বিশেষে 'টেবু' মনে করত।

আমাদের দেশে তন্ত্রমতে যে নারীকে, নারীর রক্তকে, বিশেষ করে ঋতুমতী নারীকে, বিশেষ পবিত্র মনে করা হয়, তার ঐতিহাসিক কারণের একটা সূত্র মনে হয় এখানে পাওয়া যাচ্ছে।

বিশেষ বস্তুর বিশেষ শক্তি—'টেবু' ছাড়াও বিশেষ বিশেষ বস্তুর বিশেষ বিশেষ গুপ্ত গুণ বা শক্তি আছে বলে আদিম মানুষ বিশ্বাস করত। সে মনে করত বিশেষ কৌশলে এই-সব বস্তুর ব্যবহার করতে পারলে বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যায়।[৬]

দু রকমের যাদু—যাদু ছিল দু রকমের, শুক্ল আর কৃষ্ণ। যার ফল শুভ তা শুক্ল আর যার ফল অশুভ তা কৃষ্ণ।[৭] শত্রুনিপাত প্রভৃতি কৃষ্ণ যাদুর নিদর্শন আছে বেদে। বেদের ভাষায় তাকে বলা হয় কৃত্যা। তান্ত্রিক অভিচার-ক্রিয়া এরই প্রকারভেদ।

পুরোহিতের আদিরূপ যাদুকর—যাদু সকলের জানা থাকত না। প্রত্যেক কৌম বা জনের মধ্যে বিশেষ কোনো ব্যক্তি এটি জানত এবং তার প্রয়োগ করত।[৮] এই যাদুকর মানুষটিই পুরোহিতের আদিরূপ।

যাদু ও ধর্ম—আদিম মানুষের ধর্মের সঙ্গে যাদু ওতপ্রোত হয়ে আছে। একটি থেকে

১ R. Ph. V. U., p. 40 ২ I. C. R., p. 17 ৩ Ibid ৪ Ibid
৫ Ibid., p 48 ৬ H. R., pp. 72 73 ৭ G. Ph. R., p. 95 ৮ H. R., p. 73 ?

আরেকটিকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। মানুষ সভ্য হয়ে যাওয়ার পরও দীর্ঘকাল ধরে জগতের সর্বত্র সকল ধর্মের সঙ্গে যাদু ওতপ্রোত হয়েই ছিল। আজও যে সর্বত্র এ দুটি পৃথক্ হয়ে গেছে তা বলা যায় না। কেউ কেউ ত মনে করেন সব চেয়ে বিশুদ্ধ ধর্মের মধ্যেও যাদুর একটা সংমিশ্রণ আছে। কেননা, যাদুর মধ্যে একটা রহস্যময়তা আছে আর ধর্মেরও আছে একটা রহস্যময় দিক। এই রহস্যময়তার ক্ষেত্রেই উভয়ের মিশামিশি।[১]

---

১ G. Ph R., p. 161

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতের বাইরে দেবী-পূজা

দেবতাদের মধ্যে মানবীয় সম্বন্ধ—আমরা লক্ষ্য করে এসেছি আদিম মানুষ কল্পনা করেছে মানুষের মধ্যে যেমন স্ত্রীপুরুষ আছে তেমনি দেবতাদের মধ্যেও স্ত্রীদেবতা এবং পুরুষদেবতা আছেন। তাঁদের পরস্পরের সম্বন্ধ কিরূপ, কাঁর কিরূপ মর্যাদা ইত্যাদি বিষয় সে স্থির করেছে আপন পরিবার বা গোষ্ঠীতে যেমনটি দেখেছে সেই অনুসারে।[১]

আদিম মানুষের পরিবার—আদিম মানুষের পরিবার বা গোষ্ঠীর ব্যবস্থা কি রকম ছিল, তাদের মধ্যে নরনারীর সম্বন্ধ কি রকম ছিল, নিশ্চয় করে বলা কঠিন। পণ্ডিতেরা অবশ্য অনুমান করেছেন কিন্তু এ বিষয়ে তাঁরা একমত নন।

পুরুষপ্রাধান্য—অনেকে মনে করেন আদিম মানুষের পরিবারে প্রধান স্থান ছিল পুরুষের। আজ যেমন জগতের অধিকাংশ মানুষ পিতৃনামে আপন পরিচয় দেয়, তাদের বংশলতা বাড়ে পিতৃক্রমে, আদিম মানুষদের মধ্যেও তাই হত। সেই প্রাচীন ব্যবস্থাই বরাবর চলে এসেছে।

প্রাণীজগতের দৃষ্টান্ত—এঁরা প্রাণীজগতের দৃষ্টান্ত দিয়ে নিজেদের মতের সমর্থন করেন। প্রাণীজগতে দেখা যায় স্ত্রীর চেয়ে পুরুষ বলবান। এক-একটি পালে এক-একটি করে থাকে পুরুষ আর বাকী-সব স্ত্রী। পুরুষটি দলপতি। সাধারণভাবে বলা যায় স্তন্যপায়ী প্রাণীর স্তর থেকেই ক্রমবিবর্তনের ধারা বেয়ে দেখা দিয়েছে মানুষ। সঙ্গে নিয়ে এসেছে প্রাক্-মানব সংস্কার। তাই আদিম মানুষের পরিবারও ঐ সব স্তন্যপায়ী প্রাণীর দলের মতো গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ সেখানেও পুরুষের প্রাধান্য।

স্ত্রীপ্রাধান্য—অন্যদের ভিন্ন মত। তাঁরা মনে করেন জগতের সর্বত্রই সভ্যতার নীচের ধাপগুলিতে এমন-সব জন বা উপজাতির দেখা মিলে যাদের মধ্যে প্রধান স্থান নারীর। এরা মায়ের নামে নিজেদের পরিচয় দেয়। এদের বংশধারা চলে মাতৃক্রমে। অস্ট্রেলিয়ার অধিকাংশ আদিম জাতির মধ্যে দেখা যায় এই ব্যবস্থা। এদের সন্তানরা মায়ের কৌমের অন্তর্ভুক্ত হয়, বাপের নয়। এইজন্য, কৌমে কৌমে যুদ্ধ বাধলে অনেক সময় দেখা যেত পিতাপুত্র পরস্পরের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে।[২]

১ S. S. W., pp. 275-77

২ Anthropology, 1st Ed., 1904, p. 402.

প্রাণীজগতের দৃষ্টান্ত—আবার আদিম মানুষের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের সমপ্রাধান্যের অনুমানও করা যায় প্রাণীজগতের দৃষ্টান্ত থেকেই। স্তন্যপায়ী তৃণভোজী এমন অনেক জন্তু দেখা যায় যারা দল বেঁধে বাস করে। এদের এক-এক দলে অনেক স্ত্রীজন্তু ও পুরুষজন্তু থাকে। এদের মধ্যে যৌনমিলন অবাধ। এই অবাধ যৌনমিলনকে উভয়ের সমপ্রাধান্যের প্রকৃষ্ট নিদর্শন মনে করা যায়।

মাতৃপ্রাধান্য—মনে হয় আদিম মানুষের মধ্যেও এই ব্যবস্থাই ছিল। তখনও বিয়ের রীতি প্রচলিত হয়নি। নরনারী প্রবৃত্তির নির্দেশে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হত; এ সম্বন্ধে কোনো নিয়মকানুন ছিল না। এ রকম অবস্থায় সন্তানের পিতৃনির্ণয় হয় না। ফলে, সন্তানের একমাত্র নির্ভরস্থল হয়ে পড়ে মা। মা-ই তাকে লালনপালন করে। সন্তান শুধু মাকেই চেনে; মায়ের নামে আপনার পরিচয় দেয়। এ রকম ক্ষেত্রে অজ্ঞাত পিতার চেয়ে মায়েরই গৌরব বেশী হয়।[১] বংশধারা চলে মাতৃক্রমে, দায়ভাগও হয় মাতৃক্রমে। এই মত অনুসারে একদা আদিম মানব-সমাজে সর্বত্রই মাতৃপ্রাধান্য ছিল।[২] এখনও জগতের বিভিন্ন অংশে কোনো কোনো জনের মধ্যে এই মাতৃপ্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। যাদের সমাজ পিতৃতন্ত্র, একদা তাদের মধ্যেও যে মাতৃপ্রাধান্য ছিল, তার কিছু কিছু নিদর্শন তাদের পিতৃতন্ত্র সমাজব্যবস্থার মধ্যেও থেকে গেছে।[৩]

মাতৃপ্রাধান্যের ব্যাখ্যা—এই যে মাতৃপ্রধান্য এর অর্থ এই নয় যে পুরুষের চেয়ে নারীর গায়ের জোর বা শৌর্যবীর্য বেশী ছিল। সন্তান একমাত্র মাকেই চিনত; মা-ই ছিল তার একমাত্র আশ্রয় ও অবলম্বন। পরিবার বন্ধনের মূল যে-স্নেহপ্রেম প্রভৃতি হৃদয়বৃত্তি সে-সবের প্রকাশ একমাত্র মায়ের মধ্যেই দেখা যেত। মা-ই ছিল পরিবারের কেন্দ্র। এখানেই মায়ের প্রাধান্য। মাতৃরূপেই নারীর এই প্রাধান্য, জন-এর ভাবী পরিণত-বয়স্কদেরও জননীরূপে তার এই প্রাধান্য, স্ত্রীরূপে বা শুধু নারীরূপে নয়।[৪]

নারীর মধ্যে রহস্যময়ী শক্তি—আদিম মানুষের মধ্যে নারীর প্রাধান্যের আরেকটা কারণও অনুমান করা যায়। আদিম মানুষ নারীর মধ্যে এক রহস্যময়ী শক্তি রয়েছে বলে মনে করত। দেখা যায় এই রহস্যময়ী শক্তির অধিকারিণী বলে কোথাও কোথাও নারী সমাজের নেত্রী হয়ে বসেছে।[৫]

সন্তানজন্ম—সম্ভবতঃ আদিম মানুষের কাছে নারীর এই রহস্যময়ী শক্তির সব চেয়ে স্পষ্ট নিদর্শন ছিল সন্তানের জন্ম। অনুমান করা যায় এই জন্ম-ব্যাপারটা ছিল তার কাছে

১ S. S. W., p. 180 ২ E. B., 1961, Vol 15, p. 98 (দ্রঃ Matriarchy)
৩ G. B., Part I, Vol. II pp. 283 84 ৪ Thomis, p. 494 ৫ L. O. R., p. 28

পরম বিস্ময়কর। কেমন করে নারীর মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসে একটি নূতন জীব তা সে বুঝতে পারত না। সন্তানজন্মের ব্যাপারে পুরুষের কোনো সম্বন্ধ আছে কি না বহুকাল পর্যন্ত সে তা জানত না। আদিম মানুষের এই শিশুসুলভ অজ্ঞতার কিছু কিছু অবশেষ সভ্য মানুষের দেবকল্পনায়ও লক্ষ্য করা যায়। সে কল্পনা করেছে ইশ্‌তার, ননা প্রভৃতি দেবীর পুরুষসংসর্গ ছাড়াই সন্তান হয়েছে। এ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে ফ্রেজার লিখেছেন কুমারী জননীদের এ-সব কাহিনী সেই শিশুসুলভ অজ্ঞতার যুগের স্মরণচিহ্ন যে-যুগে যৌন-মিলনই যে সন্তানজন্মের মূল কারণ মানুষ এ কথা জানত না।[১]

আদিম মানুষ মনে করত সন্তানের জন্ম দেওয়া রহস্যময়ী দৈবী শক্তি বা দেবতার কাজ। তার বিশ্বাস ছিল নারীর মধ্যে এই শক্তি বা দেবতা আছেন। শুধু মানবী নয়, অন্য জীবজন্তু ও ভূমির মধ্যেও এই রহস্যময়ী প্রজননশক্তি বা দেবতা রয়েছেন বলে সে বিশ্বাস করত। সে এই প্রজননশক্তি বা দেবতাকেও সাধারণতঃ স্ত্রীজাতীয় মনে করত।[২] কারণ, সে লক্ষ্য করত স্ত্রীজাতীয় জীবই সন্তানের জন্ম দেয়।

মা শিশুজনীন—অসভ্য সভ্য প্রায় সব মানুষের ভাষাতেই জননীকে মা শব্দে বা তারই পরিবর্তিত কোনো রূপে ডাকা হয়। শিশু জন্মাবামাত্রই মা, মা বলে কেঁদে ওঠে। হয়ত মা শব্দটি তখন স্পষ্ট উচ্চারিত হয় না। কিন্তু সে যে-শব্দ করে তা ঐ রকমই শোনায়। তারপর শিশুর যখন প্রথম কথা ফোটে তখন সাধারণতঃ যে-শব্দটি তার মুখ দিয়ে বেরোয় সে মা। শিশুকে বুকে জড়িয়ে ধরে জননী আদরে আদরে তাকে অস্থির করে তোলে আর শিশুর মুখ দিয়ে কথা ফোটে মা, মা। জননী ভাবে শিশু তাকে নাম ধরে ডাকছে। সেই জন্যই, জগতের প্রায় সব ভাষাতেই জননীকে বলে মা, আম্মা বা মাম্মা।[৩]

মাতৃদেবতা—আদিম মানুষও জননীকে মা-ই বলেছে এরূপ অনুমান করা যেতে পারে। আর নারীর মধ্যে যে-শক্তি বা দেবতা আছেন বলে সে বিশ্বাস করেছে তাঁকেও স্ত্রীজাতীয় দেবতা বা মাতৃদেবতা মনে করেছে। কাজেই আদিম মানুষের আদি দেবতা মাতৃদেবতা এরূপ অনুমান করা অযৌক্তিক হবে না।[৪]

পিতৃতন্ত্র ও মাতৃতন্ত্র লোকদের দেবতা—সম্ভাব্য যুক্তির সহায্যে যতটা জানা যায় অতি প্রাচীন কালেই আদিম মানুষের মধ্যে ছিল নানা জন এবং কৌম। তাদের কোনো কোনোটির মধ্যে ছিল পিতৃপ্রাধান্য, পিতৃক্রম বা পিতৃতন্ত্র সমাজ আর কোনো কোনোটির মধ্যে মাতৃপ্রাধান্য, মাতৃক্রম বা মাতৃতন্ত্র সমাজ।

---

১ G. B (abridged) p. 347 ২ S. S. W., p. 462 ; H. B., Vol. I, pp. lxxxvi-lxxxvii

৩ S. S. W., p 156 ৪ Ibid, p. 462

সহজেই অনুমান করা যায় যে যাদের মধ্যে পিতৃপ্রাধান্য ছিল, তাদের প্রধান দেবতা পিতা, আর যাদের মধ্যে মাতৃপ্রাধান্য ছিল, তাদের প্রধান দেবতা মাতা।[১] তবে পিতৃ-প্রধান লোকদের দেবতাদের মধ্যেও স্ত্রীদেবতা ছিলেন আর মাতৃপ্রধান লোকদের দেবতাদের মধ্যেও পুরুষদেবতা ছিলেন।[১]

মাতৃদেবতার পূজার ব্যাপকত্ব ও প্রাচীনত্ব—যতটা জানা যায় মাতৃদেবতার অর্থাৎ মাতৃরূপিণী দেবীর পূজা অতি প্রাচীন এবং বহুব্যাপক। জগতের সর্বত্রই তার প্রচলন ছিল।[২] তবে বিশেষ করে ভূমধ্য সাগরের তীরে পশ্চিম এসিয়ার দেশগুলিতে মাতৃরূপিণী মহাদেবীর পূজার ব্যাপক প্রচলন ছিল বলে অনুমান করা হয়। ইজিয়ান সাগরের (Aegian) তীর থেকে এক দিকে ইরাণ হয়ে ককেসাস আরেক দিকে মিশর —এই বিরাট ভূখণ্ডের মধ্যে এই মহাদেবীর পূজা হত। এই এলাকার মধ্যে বিশেষ করে নাম করতে হয় এলাম, মেসোপটেমিয়া, এসিয়া মাইনর, সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন প্রভৃতি দেশের।

সিন্ধু-উপত্যকায় এবং বেলুচিস্থানে প্রাগৈতিহাসিক যে-সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নারীমূর্তি পাওয়া গেছে, উক্ত এলাকায়ও সেই রকম মূর্তি পাওয়া গেছে। এই মূর্তিগুলিকে সাধারণতঃ দেবী-মূর্তি মনে করা হয় এবং বলা হয় পশ্চিম এসিয়ায় যে-মহাদেবীর পূজা হত এগুলি তাঁরই মূর্তি। ভারতবর্ষের এবং নিকট-প্রাচ্যের ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করে এবং সেই সঙ্গে এই-সব মূর্তির কথা বিচার করে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে এক বিরাট এলাকায় একদা এক মহাদেবীর পূজা হত। আর ইনি ছিলেন আদিতে মাতৃরূপিণী।[৩] শুধু তাই নয়, এই মহাদেবী ছিলেন সর্বেশ্বরী, সকল দেবতার উপরে।[৪]

এই মা মহাদেবীর বহু মূর্তি কৃষ্ণ সাগরের তীরে এবং দানুবে-উপত্যকায়ও পাওয়া গেছে।[৫]

পূর্বোক্ত অঞ্চলের লোকদের মধ্যে ছিল মাতৃপ্রাধান্য। তাদের সমাজ ব্যবস্থা ছিল মাতৃক্রম বা মাতৃতন্ত্র। প্রফেসর প্যাটনের (Paton) মতে সেমিটিকদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদের সমাজ ছিল মাতৃতন্ত্র। মাতৃক্রমে তারা বংশপরিচয় দিত। তাদের মধ্যে মা-ই ছিল সর্বেসর্বা, কৌমের নেত্রী। কাজেই, তাদের কল্পনায় মাতৃদেবতার প্রাধান্য ত থাকবেই।[৬]

ফ্রেজারও মনে করেন একদা এসিয়া মাইনরে মাতৃতন্ত্র বা মাতৃক্রম সমাজব্যবস্থা ব্যাপক ছিল।[৭] প্রাচীন মিশরে সহোদর ভাইবোনের বিয়ে হত। ফ্রেজারের মতে এর কারণ

১ G. G. I. I., I. H. Q., Vol. X, pp. 415-416. ২ Ibid, pp. 417-20 ; M. S. I. A. C., p. 92
৩ G. G. I. I., I. H. Q., Vol. X, p. 406 ৪ Ibid, pp. 414-15 ৫ M. S. I. A. C., p. 99
৬ E. R. E. Vol. II, p. 115 ৭ G. B , Part IV, Vol. II, p. 213

মাতৃতন্ত্র সমাজব্যবস্থা।[১] অতএব, এসিয়া মাইনর প্রভৃতি অঞ্চলে মাতৃদেবতার প্রাধান্য থাকা সে যুগে স্বাভাবিকই ছিল।

জগতের বিভিন্ন অঞ্চলে 'মা'র পূজা—মাতৃরূপিনী মহাদেবী প্রাচীন জগতের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন নামে পূজা পেয়েছেন। যেখানে তিনি সর্বপ্রধান দেবতা ছিলেন না, সেখানেও তাঁর পূজার প্রচলন ছিল। পিতৃপ্রধান জাতি এবং জনের দেবমণ্ডলেও মাতৃদেবতার গৌরবের স্থান ছিল। কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন মা এই নামে বা মা শব্দের ঈষৎ রূপান্তরিত কোনো না কোনো নামেই একাধিক দেশে মহাদেবীর পূজা হত। প্রাচীন মিশরে ছিলেন মা বা মাউত (Ma or Maut) দেবী। ইনি মঙ্গলদায়িনী মা ধরিত্রী।[২] কেপ্প-ডশিয়াবাসীদের মধ্যে যে-মাতৃদেবতার পূজা হত সম্ভবতঃ তাঁর নাম ছিল মা। কারণ, এই নামেই পরবর্তীকালে তিনি কমানাতে (Comana) পূজিতা হতেন। একদা কেপ্পডশিয়া হিট্টাইট্‌দের অধিকারভুক্ত ছিল। এই জন্য অনুমান হয় হিট্টাইট্‌দের মধ্যে যে-মাতৃরূপিণী মহাদেবীর পূজা প্রচলিত ছিল তাঁরও নাম ছিল মা।[৩] অর্থাৎ মা নামেই দেবী পরিচিতা ছিলেন।

গ্রীস এবং রোমে ছিলেন মাইয়া (Maia) দেবী।[৪] মাইয়া শব্দ ভারতের মাতৃকার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। হিন্দীভাষী কোনো কোনো অঞ্চলে এখনও সাধারণ লোকে দেবী দুর্গা বা কালীকে বলে মাইয়া। এর থেকে বোঝা যায় মা, মাতৃকা বা মাইয়া শব্দ মাতৃদেবতা-বাচক সাধারণ শব্দ হিসাবে জগতের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকেদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। আর এই ব্যাপারটিকে মাতৃদেবতার পূজার ব্যাপকতার অন্যতম নিদর্শন বলেও গণ্য করা যায়।

রোমকরা মাইয়া দেবীকে 'বোনা দিয়া'ও (Bona Dea) বলত। 'বোনা দিয়া' অর্থ মঙ্গল দেবী। 'বোনা দিয়া' দেবমাতা। ফ্রান্সে এবং স্পেনে মাতৃরূপিণী দেবী 'মায়ে' (Maye) এই নামে পূজা পেতেন। ইংলণ্ডে ইনিই হয়ে পড়লেন 'মা-র রাণী' (May Queen)। ৫০০ খৃঃ এ রকম সময় থেকে খৃষ্ট ধর্মেই 'মাইয়া' দেবী মা-র্-ইয়া [Maria= Ma(r)ia] এই নামে গৃহীত হয়েছেন। ইনিই মেডোনা। মেডোনাপূজা বস্তুতঃ মাতৃদেবতা-পূজা।[৫] প্রাগৈতিহাসিক মেক্সিকোতে আবার ইনিই মা-ইওএল (Mayoel) নামে পূজিত হতেন। মা-ইওএল অর্থ দেবতা ও মানুষের মা।[৬]

দেবমণ্ডলে পরিবর্ত্তন—সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নানা কারণে মানুষের মধ্যে নানা পরিবর্তন ঘটে। তাদের চিন্তাভাবনার পরিবর্তন ঘটে ; জীবনধারা, সমাজ-ব্যবস্থা বদলে বদলে যায়।

---

১ G. B., Part IV, Vol. II, pp. 214-15 ২ S. S. W., p. 501 ৩ E. R. E, Vol. VI, p 725 ৪ S. S. W., p 501 ৫ S. S. W., pp. 502-503 ৬ Ibid, pp. 500-501

সঙ্গে সঙ্গে তাদের দেবমণ্ডলেও রদবদল হয়। পুরাতন ধ্যানধারণার সঙ্গে নূতন ধ্যানধারণা যুক্ত হয়। পুরাতন দেবতার স্থানে নূতন দেবতার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যাযাবর শিকারজীবী জনের লোকেরা যদি কোনো জায়গায় স্থায়ী হয়ে বসে চাষবাস সুরু করে দেয় তা হলে তাদের দেবমণ্ডলে শিকারের দেবতার স্থলে উর্বরতা ও কৃষির দেবতার প্রাধান্য হয়।

আবার দেখা যায় কোনো একটি জন বা জাতির দেবতা অন্য কোনো জন বা জাতির দেবমণ্ডলে স্থান পান; একই দেবতা বিভিন্ন জনের মধ্যে বিভিন্ন নামে ও রূপে পূজিত হন; এক দেবতার সঙ্গে আরেক দেবতা মিশে যান।

দেবীর মাতৃরূপ ভিন্ন অন্যান্য রূপ—দেবীপূজার পূর্ববৃত্তান্ত আলোচনার সময় এই কথাগুলি মনে রাখতে হবে। আরেকটি কথা। প্রাচীন জগতে শুধু মাতৃদেবতার পূজা নয়, অন্যান্য দেবীর পূজাও প্রচলিত ছিল। তত্ত্বের বিচারে বলা যায় মহাদেবীর মাতৃরূপ ভিন্ন অন্যান্য বহু রূপের কল্পনা প্রাচীন জগতে লক্ষ্য করা যায়।

সাধারণতঃ দেখা যায় প্রকৃতির নানা শক্তি এবং মানবহৃদয়ের নানা কোমল ভাব তথা শক্তিই নানা দেবীরূপে কল্পিত হয়েছে।[১] এ ছাড়া যে-সব ব্যাপারের রহস্য মানুষ বুঝতে পারত না অথচ যা অতর্কিতে তার উপর রাবর্ষিণের আঘাত হানত সে-সবও সে স্ত্রীদেবতার কাজ বলে মনে করত অর্থাৎ তার মনে হত এই-সব ব্যাপারের দেবতা স্ত্রীদেবতা।

আদ্যা দেবী মাতৃশক্তি—তবে কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে মাতৃশক্তি বা প্রজননশক্তিই আদিম মানুষের আদ্যা দেবী।[২] নারী জন্ম দেয় মানবশিশুর, ধরিত্রী জন্ম দেয় শস্যের। সেইজন্য আদিম মানুষের কাছে ধরিত্রী মাতা। প্রাচীন জগতের সর্বত্র দেবী ধরিত্রীমাতা পূজা পেয়েছেন। অসভ্য সভ্য সব মানুষই তাঁর পূজা করেছে।

ধরিত্রীমাতা—বেদেও ধরিত্রী বা পৃথিবীকে মাতা বলা হয়েছে আর দ্যৌকে পিতা।[৩] প্রাচীন চীনে পিতা দ্যৌ এবং মাতা ধরিত্রীর পূজা ছিল সর্বজনীন।[৪] গ্রীকদের মধ্যে গোড়ায় ধরিত্রী-মাতার নাম ছিল গইয়া (Gaia)। প্রাচীন গ্রীসের ডেলফিকে (Delphi) ধর্মকেন্দ্র বলে মানা হয়। সেখানে প্রতিষ্ঠিত দেবতাদের মধ্যে কালানুক্রমে সকলের আগে দেবী গইয়ার স্থান।[৫] পরবর্তী কালে গ্রীসে ধরিত্রী দেবীর নাম হয় ডিমিটার (Demeter)। এই দেবীর কল্পনায় অধিকতর নরত্বারোপ করা হয়। সারা দেশ জুড়ে ছিল এঁর বহু মন্দির।[৬] রোমকরা এঁকে বোলাতো টেরা মেটার (Terra Mater) অর্থাৎ ধরিত্রীমাতাই

১ E. R. E., Vol. V. p. 828 ২ S. S. W., p. 1[illegible] ৩ ঋ বে ১।৮৯।৪
৪ P. C., Vol. II, p. 272 ৫ Themis, p. 3[illegible]5 ৬ P. C., Vol. II, p. 278

বলতেন।[১] তাতার জনগুলির মধ্যে ধরিত্রীমাতার পূজা সুদৃঢ় ও ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল।[২]

কৃষির অধিষ্ঠাত্রী দেবী—ধরিত্রীর সঙ্গে সঙ্গে মানুষ কৃষির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকেও দেবী মনে করেছে। কারণ, উর্বরতা, উৎপাদন এ-সবকে সে নারীর সঙ্গে যুক্ত কল্পনা করত।[৩] সেইজন্য প্রাচীন জগতের অনেক জায়গায় দেখা যায় শস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজায় শুধু নারীরই অধিকার। পূর্বে যে 'বোনা দিয়া'র উল্লেখ করেছি তাঁকে উর্বরতার দেবী বলা হয়। তাঁর পূজায় শুধু নারীরই অধিকার ছিল।[৪] আমাদের দেশে রাজপুতানায় যে-অন্নপূর্ণা দেবীর পূজা হয় তাঁরও পূজারিণী শুধু নারী।[৫]

দেবী সৃষ্টির মূল—আমরা লক্ষ্য করেছি আদিম মানুষ নারীকেই সন্তানজন্মের একমাত্র কারণ বলে জানত। এই ব্যাপারে পুরুষের যে কোনো যোগ আছে তা সে বুঝত না। নারীর সাদৃশ্যে সে পৃথিবীকেও স্ত্রী কল্পনা করেছে। আর প্রজনন ব্যাপারটাকে সে দৈবশক্তির কাজ বলে মনে করেছে। কাজেই, সৃষ্টির মূল যিনি তাঁকে সে দেবীই মনে করেছে। সোজা কথা, এক রকম করে আদিম মানুষ বুঝেছিল প্রকৃতিই সৃষ্টির মূল, পুরুষ নয়। সহজেই অনুমান করা যায় সৃষ্টি-ব্যাপারে স্ত্রীপুরুষের যোগাযোগের ব্যাপারটা সে বুঝতে পারে অনেক পরে।

যখন বুঝতে পারল তখনও কিন্তু প্রকৃতি সম্বন্ধে, দেবী সম্বন্ধে, তার পূর্ব-ধারণা দূর হল না। বিশেষ করে যাদের মধ্যে দেবীর প্রাধান্য ছিল তাদের তো নয়ই। তবে অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল মানুষ পূর্ব-ধারণার সঙ্গে নূতন-ধারণার একটা সামঞ্জস্য করে নিল।

পুরুষ দেবতার সংসর্গহীন আদি-সৃষ্টি—এদের কল্পনা দেবী পুরুষসংসর্গ ছাড়াই তাঁর প্রথম পুত্রের জন্ম দেন। তারপর এই পুত্রই হন তাঁর চিরসাথী। এঁরই সহবাসে দেবী সমস্ত দেবতা এবং অন্যান্য সব প্রাণীর জন্ম দেন।[৬] আমাদের শাস্ত্রেও আছে শিব দেবীর পুত্র। দেবী পুত্র শিবকেই পতিত্বে বরণ করেন।

দেবী সম্পর্কে মানবীয় যৌনবিচার অচল—পরবর্তী সময়েও নানা দেশের দেবীপূজার কতকগুলি আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে পূর্বোক্ত ধারণার অবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। দেবীর উপাসকদের একটা অংশের মুষ্কচ্ছেদ করা হত। উপাসিকাদের যখন দেবীর সেবাপূজার পালা পড়ত তখন তারা বিবাহিত জীবন যাপন করতে পারত না। আবার

১ P. C., Vol. II, p. 278 ২ Ibid, p. 271 ৩ V. G. S. I., p. 150

৪ Classical Dictionary, p 109, (দ্রঃ Bona Dea)

৫ অন্নপূর্ণা, পৃ ৮৫-৮৬ ৬ E. R. E., Vol. I, p. 147

কখনো বা পূজার অঙ্গ হিসাবে তাদের অবাধ যৌনমিলনের অনুষ্ঠান করতে হত।[১] দেবী সম্বন্ধে যে যৌনবিচার চলেনা এবং তাঁর মানুষের মত বিবাহ বলে কিছু থাকতে পারে না এসব যেন তারই নিদর্শক।[২]

যৌনব্যাপার পূজানুষ্ঠানের অঙ্গ— তবে আরেকটা কথাও আছে। প্রজননের সঙ্গে যৌনব্যাপারের সংযোগের বিষয় যখন মানুষ বুঝতে পারল, অনুমান হয় তখন থেকে প্রজননশক্তি বা দেবীর পূজার সঙ্গে সে যৌনব্যাপারের অনুষ্ঠানকে যুক্ত করে দেয়। এ ব্যাপারকে সে দূষ্যও মনে করত না। সন্তানজন্মকে সে সাধারণ স্বাভাবিক কাজ মনে করত এবং তার অঙ্গ যে-যৌনমিলন তাকেও তাই মনে করত। সেইজন্য একে পূজানুষ্ঠানের অঙ্গ বলে গণ্য করতে তার কোনো দ্বিধা হয় নি।

কালে অপেক্ষাকৃত সভ্য মানুষের মধ্যে যৌনব্যাপার গোপনীয় বলে গণ্য হয়। কিন্তু তারাও বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে দেবপূজার অঙ্গ হিসাবে যৌনমিলনকে দূষণীয় মনে করে নি।

দেবী একাধারে সৃষ্টি ও ধ্বংসের দেবতা—কোথাও কোথাও প্রজননের দেবীকে ধ্বংসের দেবীও মনে করা হত। অর্থাৎ তাঁকে একাধারে প্রকৃতির সৃষ্টিশক্তি ও ধ্বংসশক্তির বিগ্রহ মনে করা হত। ইশ্‌তার, অশ্‌তারেথ বা অস্টার্ত, আনৎ, সাইবেল এই রকম দেবী।[৩] কারো কারো মতে বেবিলন ও এশিয়া মাইনরে এই ধরণের দেবীর প্রাধান্য ছিল, মিশরে প্রাধান্য না থাকলেও বিশিষ্ট স্থান ছিল।[৪]

মহাদেবীর বিভিন্ন রূপ—এর আগে আমরা পশ্চিম এশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের যে-মহাদেবীর কথা বলে এসেছি, তিনি বিভিন্ন জাতের মধ্যে বিভিন্ন নামে পূজা পেয়েছেন। সেমিটিক, ইরাণীয়, গ্রীক এরা সবাই এই মহাদেবীর পূজা করত।[৫] পূর্বোক্ত ইস্তার-আদি দেবী সেই মহাদেবীরই রূপবিশেষ।

ননা (Nana, Nanai)—সেমিটিকদের মধ্যে দেবী প্রধানতঃ ননা বা ননই নামে পূজিতা হতেন। পণ্ডিতদের অনেকের বিশ্বাস সেমিটিকরা ছিল আদিতে মাতৃতন্ত্র। তখন তাদের কোন পুরুষদেবতা ছিল না, তারা এক দেবীরই পূজা করত।[৬] কেউ কেউ মনে করেন ননা মাতৃবাচক একটা সাধারণ শব্দ। পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কহীন বিভিন্ন ভাষায় মা অর্থে এই শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়।[৭] ঋগ্বেদেও মা অর্থে ননা শব্দের প্রয়োগ আছে।[৮] এর থেকে বোঝা যায় সেমিটিকরাও দেবীকে মা বলেই পূজা করত। তিনি

১ E. B. E., Vol. I, p. 147 ২ Ibid ৩ S. [illegible] W., p. 670

৪ H. B., Vol. I., pp. lxxxvi-lxxxvii ৫ G. G. I. I., I. H. Q., Vol. X, p. 497

৬ H. B., p. 159 ৭ G. G. I. I., I. H. Q., Vol. X, p. 499 ৮ ঋগ্বেদ ৯।১১২।৩

ছিলেন প্রজননশক্তির বিগ্রহ। তবে তাঁর আরেকটি রূপও ছিল। বেবিলনিয়ার ইস্তার বা কার্থেজের লিলিস্টিনের মত তিনি ছিলেন রণদেবী, যোদ্ধাদের ইষ্টদেবী ও জয়দাত্রী।[১]

ননার পূজা বেক্‌ট্রিয়ানা (Bactriana) পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। এ দিকে কুশানরাজ হুবিষ্কের প্রথম খৃষ্ট-শতকের মুদ্রায় ননার নাম পাওয়া গেছে। ও দিকে আর্মেনিয়ার লাইকস উপত্যকায় তিনি সুপ্রতিষ্ঠিতা ছিলেন। গ্রীস দেশে দেবীকে নিয়ে যায় প্রাচ্য বণিকেরা।[২]

বেলুচিস্থানের হিংলাজ অন্যতম শক্তিপীঠ। কিন্তু মনে হয় গোড়ায় এটি ছিল ননার স্থান। এখন ওখানকার লোকেরা সব মুসলমান; তারা হিংলাজকে বলে নানীর তীর্থ (নানী কী হজ)। পাকিস্তান হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বরাবর ভারতের তীর্থযাত্রীরা হিংলাজে তীর্থ করতে যেত। তাদের প্রদত্ত বিবরণ থেকে জানা যায় স্থানীয় লোকেরা দেবীকে খুব মান্য করে; তীর্থযাত্রীদের হাত দিয়ে তাঁর স্থানে ফলমূল-উপহার পাঠায় আর বাতি জ্বালাবার জন্য পাঠায় মোমবাতি।[৩]

দেবী ননা বা ননইয়া এবং গ্রীক দেবী আর্টিমিসের (Artemis) একটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। এঁদের লাঞ্ছন (symbol) ভ্রমর। এপিসাস (Eppesas) এবং সুসাতে (Susa) এঁদের ভ্রমরলাঞ্ছন প্রতিকৃতি পাওয়া গেছে।[৪] আমাদের দেশেও মহাদেবীকে ভ্রামরী বলা হয়েছে।[৫]

অনৎ (Anat)—ননার সমপর্যায়ের আরেকজন সেমিটিক দেবীর কথা পাওয়া যায়। তাঁর নাম অনৎ। কেনান-এ (বর্তমান প্যালেষ্টাইন) এঁর পূজার প্রচলন ছিল। কেনানবাসীদের কাছে ইনি ছিলেন নারীসুলভ বিভিন্ন শক্তির, বিশেষ করে, প্রজননশক্তির বিগ্রহ। তারা বিশ্বাস করত এঁর কৃপায় প্রেমের উদ্ভব হয়, নারী মাতৃত্ব লাভ করে। ফারাওদের সময় থেকে মিশরেও এই দেবীর পূজার প্রচলন হয়। কিন্তু মিশরে দেবীর রণচণ্ডী-মূর্তি। সে-মূর্তির আয়ুধ শূল, চর্ম এবং পরশু (battle axe)।[৬] কাজেই, অনৎ একাধারে উৎপাদিকাশক্তি ও রণদেবী। সহজ কথায় এঁকে কৃষি ও যুদ্ধের দেবতা বলা যায়। আমাদের দেশের মা দুর্গাকেও কৃষি ও যুদ্ধের দেবতা মনে করা হয়।

অল্লৎ (Allat)—আরব দেশে মহাদেবীর নাম ছিল অল্লৎ বা অলিলৎ। অল্লৎ অর্থ ভট্টারিকা (the Lady)। আদিম সেমিটিক ধর্মের অন্যান্য দেবীর মতো এই দেবী ছিলেন অতি তেজস্বিনী, স্বতন্ত্র, ঈশ্বরী। তিনি কোনো দেবতার স্ত্রী নন। তিনি শুদ্ধ মাতৃমূর্তি।

১ G. G. I. I., I. H. Q., Vol. X, p 409 ২ Ibid

৩ দ্রঃ মরুতীর্থ হিংলাজ। ৪ P. S., W. A., D. R. Rh. V., P. 302

৫ বা পু ৩১।৩৯, দে ভা ১০।১৩।২৩ ৬ G. G. I. I., I. H. Q., Vol. X, p. 411

এতটুকু অশোভন ধারণাও তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত নয়। তিনি সেই প্রাচীন কালের দেবী, যে-কালে মায়েরই ছিল প্রাধান্য, মা-ই ছিল কর্ত্রী। তখন পরিবারের পুরুষের কর্তৃত্ব ছিল না। এই দেবীর একটি সুস্পষ্ট রূপের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁর কোনো ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় না। তাঁকে নিয়ে কোনো পৌরাণিক কাহিনী গড়ে উঠে নি।[১]

ইশ্‌তার (Ishtar)—বেবিলন ও এসিরিয়াতে মহাদেবী ইশ্‌তার নামে পূজিতা হতেন। প্রাচীন মৃৎফলকলিপিতে (Cuneiform tablets) তাঁকে বলা হয়েছে স্বর্গের প্রথমজাত; বলা হয়েছে তিনি আদি দেবতা, সৃষ্টির করুণাময়ী জননী, দেবতার জননী, মানুষের জননী।[২]

ইশ্‌তার মাতৃদেবতা। তিনি উর্বরতার দেবতা। যে-সব গাছপালা জন্মায়, ফসল ফলে, সে-সবের তিনিই দেবতা।[৩] অর্থাৎ তিনি মূলতঃ ভূমিদেবতা,[৪] সেই প্রাচীন ধরিত্রীমাতা।

ইশ্‌তারের নানা কাজ। ঝর্ণা, পাহাড়, সমুদ্রের তিনি অধীশ্বরী। নদীনালার তিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। গরুবাছুর, পশুপাখী, মানুষ সবার জন্যই তিনি অন্নজলের ব্যবস্থা করেন, মেষপালকদের রক্ষা করেন। সব প্রজনন তাঁর নির্দেশেই হয়। প্রেম, পারিবারিক জীবন প্রভৃতির তিনিই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।[৫]

এই প্রসঙ্গে মাতৃদেবতা সম্পর্কিত একটি বিশেষত্বের উল্লেখ বাঞ্ছনীয়। দেবীর সঙ্গে জলের একটা যোগাযোগ অতি প্রাচীন কাল থেকেই লক্ষ্য করা যায়। দেবী স্বভাবতঃই জলেরও দেবী হয়ে গিয়েছেন।[৬] কেননা, জীবন নির্ভর করে জলের উপর। আমাদের দেশেও দেবীপীঠগুলির কাছে কোনো কুণ্ড বা ঝর্ণা বা নদী রয়েছে দেখা যায়। বর্তমানে যেখানে নেই অনুমান করা হয় সেখানেও এক সময়ে ছিল। আমাদের গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী প্রভৃতি নদীকে সনাতন ধর্মী জনসাধারণ দেবী বলে, মা বলে জানে।

ইশ্‌তার দেবীর একটি রুদ্ররূপও আছে। ক্রুদ্ধ হলে তিনি ভয়ঙ্করী হয়ে উঠেন এবং যে-সব মূঢ় তাঁকে অবজ্ঞা করে তাদের কঠিন আঘাত করেন। সে-আঘাত অনেক সময়ে আসে মারাত্মক ব্যাধির আকারে। তাঁর একদল অনুচর আছে, মানুষের অনিষ্টকারী সব ভূতপেত্নীর দল। দেবীর ধ্বংসাত্মক কাজে এরাই তাঁর সহায়তা করে।[৭]

ইশ্‌তার দেবীর একজন নিত্যসহচর আছেন। তন্ত্রের ভাষায় বলা যায় ইনি দেবীর ভৈরব। সহচরটি একাধারে দেবীর পুত্র, পতি ও ভ্রাতা। তবে পতি থাকলেও দেবীকে কুমারীই বলা হত।[৮] দেবীর এই সহচরটির নাম এবং রূপ দেশভেদে ভিন্ন ছিল। যেমন বেবিলনে তাকে

---

১ H. R., P. 215 ২ R. Ś., p. 61. ৩ R. Ś., p. 61 ৪ H. R., p. 97 ৫ R. Ś, p. 61
৬ G. G. I. I., I. H. Q., Vol. X, p. 4[illegible]0 ৭ R. Ś, p. 61 ৮ R. Ś., p. 64

বলা হত টম্মুজ (Tammus or Tammuz), এসিরিয়াতে অশুর (Ashur)। অশুর শক্তিমান্ রণদেবতা।

ইশ্‌তারের নানা কাজ। তাঁর রূপও একাধিক।[১] মনে হয় একাধিক দেবী ইশ্‌তারের মধ্যে মিশে গিয়েছিলেন। Franz Cumont মন্তব্য করেছেন ননা বা ননইয়া অতি প্রাচীন কালেই ইশ্‌তারের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছিলেন।[২]

ইশ্‌তার এক রূপে উর্বরতা বা প্রজননের দেবী। প্রজননের সঙ্গে রয়েছে প্রেমের যোগ। কাজেই, তিনি প্রেমেরও দেবতা। তাঁর এই রূপের পূজার সঙ্গে এমন-সব অনুষ্ঠানের যোগ আছে যেগুলিকে একালের সভ্য মানুষ রুচিবিগর্হিত মনে করে। ইশ্‌তারের একদল পূজারিণী ছিল। তাদের বলা হত ইশ্‌তারিতাম (Ishtaritum) অর্থাৎ পবিত্র বারাঙ্গনা। তারা দেবীর মন্দিরের হাতার মধ্যেই থাকত এবং বারাঙ্গনাবৃত্তি করত।[৩]

'মেসোপটেমিয়া' নামক গ্রন্থে এ সম্পর্কে হিরোডটাসের (Herodotus) মন্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে। তাতে দেখা যায় বেবিলনে প্রথা ছিল প্রত্যেক নারীকেই স্বামীসহবাসের পূর্বে একবার অন্য কোনো পুরুষের সহবাস করতে হবে এবং তার দেহের প্রথম ফল (first fruits of her body) অর্থাৎ দেহবিক্রয়লব্ধ অর্থ দেবীর কাছে উৎসর্গ করে দিতে হবে।[৪]

ফ্রেজারও এই প্রথার উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন[৫] বেবিলনে ধনী গরীব প্রত্যেক নারীকেই জীবনে একবার মিলিত্তা (Militta) অর্থাৎ ইশ্‌তারের মন্দিরে পরপুরুষের কাছে দেহবিক্রয় করতে হত এবং এই পবিত্র বারাঙ্গনাবৃত্তির দ্বারা লব্ধ অর্থ দেবীকে উৎসর্গ করে দিতে হত। সাইপ্রাসেও প্রত্যেক মেয়েকে বিয়ের আগে দেবীমন্দিরে এই কাজ করতে হত। সাইপ্রাসের এই দেবী অস্ত্রেতও (Astrate) হতে পারেন আবার এফ্রদিতিও (Aphrodite) হতে পারেন অথবা তাঁর অন্য কোনো নামও থাকতে পারে।

পশ্চিম এশিয়ার বহু অংশে এ রকম প্রথা ছিল। এ প্রথার উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, একে লোকে ধর্মানুমোদিত পবিত্র কর্তব্য মনে করত, মা মহাদেবীর পূজার অন্যতম অঙ্গ মনে করত, একে লালসাচরিতার্থ করার একটা উপায় মনে করত না।[৬]

লিডিয়ার (Lydia) ট্রলেসে (Tralles) প্রাপ্ত একটি গ্রীক অনুশাসনলিপি থেকে জানা যায় ধর্মের অঙ্গ হিসাবে এই পবিত্র বারাঙ্গনাবৃত্তি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।[৭]

ইশ্‌তারের আলোচ্য রূপের সঙ্গে গ্রীক দেবী এফ্রদিতির হুবহু মিল রয়েছে। একই দেবী, শুধু ভিন্ন নাম।

১ H. R., p. 96 ২ G. G. I. I., I. H. Q., Vol. X, p. 408 ৩ R. S., p. 62
৪ Mesopotamia, p. 88 ৫ G. B. (abridged), p. 330 ৬ Ibid ৭ Ibid, p. 331

তবে আমরা আগেই বলেছি ইশ্‌তারের একটি রণচণ্ডীরূপও ছিল। এই রূপে তিনি কঠোর। বিশুদ্ধ তাঁর পূজা। তাঁর পূজারিণী বীর্যবতী প্রমীলার দল, ইংরেজিতে যাদের বলা হয় Amazon।[১] পশুবলি এই দেবীর বিশেষ প্রীতিকর। দেবী পশুর মধ্যে আবার মহিষ বিশেষভাবে পছন্দ করতেন। সিংহ ছিল তাঁর লাঞ্ছন (emblem)।[৪]

বেবিলনে প্রধান পুরুষ দেবতাকে বলা হত বেল (Bel)। বেল অর্থ প্রভু, ঈশ্বর। তাঁর স্ত্রী বেলিৎ (Belit)। এর অর্থ ঈশ্বরী। এসিরিয়াতেও প্রধানা দেবীকে ঈশ্বরী অর্থে বেলিৎ বলা হত। এই জন্য, ইশ্‌তারকেও বলা হয়েছে বেলিৎ। অশুরবানপাল (Ashurbanapal)[৩] কখনো দেবীকে বলেছেন বেলিৎ, কখনো ইশ্‌তার।[২]

দেখা যায় জাতি বা জনের ভাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে তাদের দেবদেবীর ভাগ্যও পরিবর্তিত হয়। এসিরিয়ার সম্রাট্‌দের প্রবল প্রতাপ ও গৌরবের দিনে দেবী ইশ্‌তারেরও ছিল প্রবল প্রতাপ ও গৌরব। এসিরীয়দের জাতীয় দেবতা অশুরের তিনি পত্নী। যুদ্ধের সময় এসিরীয় সেনাবাহিনী তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যেত। সঙ্কটকালে সঙ্কটত্রাণের জন্য সম্রাটরা তাঁর শরণ নিতেন।[৫]

অনাহিত (**Anahita**)—এসিরীয়-বাবিলনীয় সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ল। তার জায়গায় গড়ে উঠল একিমেনীয় (Achaemenian) সাম্রাজ্য। দেবীর গৌরব কিন্তু গেল না। বিজয়ী ইরাণীরাও তাঁর পায়ে মাথা নোয়াল। তবে তারা দেবীর নাম ও বেশ বদলে দিল। দেবী দেখা দিলেন ইরাণী বেশে। তাঁর নাম হল অনাহিত আর তাঁর স্বামীর নাম মিথ্‌র।[৬]

মাজ্‌দা ধর্মে দেবী অনাহিত মিথ্‌রের সঙ্গে বিশেষ গৌরবের স্থান অধিকার করে রয়েছেন। আবেস্তার দীর্ঘতম 'যাশ্‌ত'গুলির অন্যতম একটি 'যাশ্‌তে' (yast) তাঁরই স্তুতি করা হয়েছে। পবিত্র জলের তিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। নক্ষত্রলোকে তাঁর বাস। তিনি শক্তিময়ী, মহিমময়ী। চতুরশ্ববাহিত তাঁর রথ। যত অত্যাচারী, অনিষ্টকারী সবাইকে তিনি ধ্বংস করেন ; সব দৈত্যকে তিনি সংহার করেন। আহুর মাজ্‌দা তাঁকে সৃষ্টিরক্ষার ভার দিয়েছেন। সব দেবতা তাঁর আরাধনা করেন এবং তাঁর কাছে বল ও ধন লাভের জন্য প্রার্থনা করেন। তাঁর কৃপায় প্রকৃতি এবং সব প্রাণী প্রজননক্ষম হয়। গোমেষাদির তিনি রক্ষাকারিণী। আবেস্তায় তাঁর চমৎকার রূপবর্ণনা আছে। তিনি রূপলাবণ্যময়ী,

১ H. R., p. 98 ২ R. S., p. 61 ৩ R. S., p. 27

৪ ইশ্‌তারের সঙ্গে দেবী দুর্গার কোনো কোনো বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

৫ R. S., pp. 64-65 ৬ R. S., p. 62

তন্বী, ক্ষীণকটি, পীনপয়োধরা, শুভ্রবাহু। তাঁর বাহুতে বলয়। দেবীর মাথায় তারকাখচিত স্বর্ণমুকুট। তাঁর কানে কুণ্ডল, পায়ে স্বর্ণপাদুকা। গায়ে সোনার কাজকরা ভোঁদড়ের চামড়ার জামা।[১]

অনাহিত দেবীর পূজার অন্যতম প্রধান অঙ্গ পশুবলি। লোকে দেবীর কৃপালাভের জন্য তাঁর কাছে পশুবলি দিত। রাজারা শত্রুজয়ের জন্য এবং রাজ্যলাভের জন্য নানা পশু বলি দিয়ে দেবীর পূজা করত। এরা বলি দিত মেষ, বৃষ এবং অশ্ব। এই সব বলির এবং যে-সব রাজা ও রাজপুত্র দেবীর কাছে বলি দিয়ে তাঁর কৃপালাভ করেছিল তাদের উল্লেখ আছে 'জেন্দ-আবেস্তা' (Zend-Avesta) গ্রন্থে।[২]

দেবীর সব চেয়ে প্রিয় পশু ছিল মহিষ। ইরাণের একটি জনপদের নাম ছিল অকিলেসিন (Akilesene)। সেখানকার এরিজ (Eriz) নামক এক জায়গায় ছিল দেবী অনাহিতের মন্দির। সমস্ত জনপদটিই ছিল দেবোত্তর, মন্দিরের সম্পত্তি। ঐ জনপদে দলে দলে ঘুরে বেড়াত দেবীর পবিত্র মহিষ। বলি দেবার সময়, প্রয়োজনমত তাদের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক মহিষ ধরে আনা হত।[৩]

এরিজের মন্দিরে দেবীর স্বর্ণমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই মন্দিরে অভিজাত বংশের কুমারীরা দেবীর কৃপালাভের জন্য অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে সহবাস করত।[৪]

অর্দ্বি (**Ardvi**)—ইরাণে মহাদেবীর প্রাচীন নাম ছিল অর্দ্বি। অর্দ্বি এবং অনাহিত একই দেবী। 'যাশ্ত'-এ দেবীকে 'অর্দ্বি সুর অনাহিত' বলা হয়েছে।[৫] অর্দ্বির একটি বিশেষত্ব লক্ষণীয়। আবেস্তাতে আছে অর্দ্বি শুধু মহাদেবীর নাম নয়, একটি পৌরাণিক নদীর নামও অর্দ্বি। হুকইরিয় (Hukairya, সুকর্ণ ?) পর্বত থেকে বেরিয়ে এসে নদীটি পড়েছে একটি হ্রদে। হ্রদটির নাম বৌরুকশ (Vaurukaśa)। এই নদীই জগতের সব জলের উৎস; এর থেকেই সব নদী, উপনদী, সব জলধারা বেরিয়েছে। কাজেই এই স্বর্গীয় উৎস স্বয়ং মহাদেবী। অর্দ্বি শুধু জগতের সব প্রাণীর জননী নয়, সব জলেরও জননী।[৬]

কাহিনীটির সঙ্গে আমাদের ভগবতী গঙ্গার কাহিনীর কিছুটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

অনইতিস (**Anaitis**)—১ ইরাণীরা যাঁকে অনাহিত বলত, গ্রীকরা সেই দেবীকেই বলত অনইতিস।[৭] এশিয়ামাইনরে বিশেষ করে তার পশ্চিম অঞ্চলে অনইতিসকে বলা হত তনইস (Tanais)। এর সঙ্গে ননই (ননা) শব্দের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। সম্ভবতঃ দেবী ননই ঐ অঞ্চলে এসে তনইস হয়ে গিয়েছিলেন।[৮]

১ P. R., pp. 61-62 ২ The Zend-Avesta, Part II, pp. 58-78
৩ E. R. E., Vol. I, p. 415 ; ৪ Ibid ৫ The Zend-Avesta, Part II, p. 54.
৬ G. G. I. I., I. H. Q., Vol. X, p. 418 ৭ P. R., p. 28
৮ G. G. I. I., I. H. Q., Vol. X, p. 410

আর্মেনিয়াতে অচিলিসেন (Acilisena) নামক স্থানে দেবী অনইতিসের মন্দির ছিল। পবিত্র বারাঙ্গনাবৃত্তি এই দেবীরও পূজার অঙ্গ হিসাবে গণ্য হত। সব চেয়ে অভিজাত বংশের মেয়েদেরও দেবীর সেবিকা হিসাবে মন্দিরে বাস করতে হত এবং পবিত্র বারাঙ্গনা-বৃত্তি অবলম্বন করতে হত। বিয়ের আগে দীর্ঘকাল তাদের এইভাবে থাকতে হত।[১] স্পষ্টই বোঝা যায় সেকালের আর্মানীরা এই প্রথাকে গর্হিত মনে করত না।

অশেরা (Ashera)—কেনানের অনৎ দেবীর কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এই দেশে অশেরা বা বালিৎ দেবীর পূজাও হত। তাঁর স্বামী বাআল (Baal) কেনানের প্রধান দেবতা ছিলেন। বাআল অর্থ প্রভু, ঈশ্বর। অশেরা বা বালিৎ অর্থ ঈশ্বরী। এইজন্য, কোনো কোনো পণ্ডিত অনুমান করেন অশেরা বা বালিৎ কোনো একজন দেবীর নাম নয়, দেশের প্রত্যেক স্থানীয় দেবীর সাধারণ নাম।[২]

কেনানে বাআল ও অশেরার একসঙ্গে পূজা হত। সৃষ্টির বা প্রজননের পুরুষশক্তি বা পুরুষ বাআল এবং স্ত্রীশক্তি বা প্রকৃতি অশেরা। অশেরার পূজায় ইশ্‌তারের পূজার মতো যৌনক্রিয়ার প্রত্যক্ষ অনুষ্ঠান বিহিত ছিল। এঁরও মন্দিরে এই ব্যাপারের জন্য একদল পূজারিণী বা সেবিকা থাকত।[৩]

অস্ত্রেত বা অশ্‌তরেথ (Astrate or Ashtoreth)— ফিনিসীয়রা যে-দেবীর পূজা করত তাঁর নাম অস্ত্রেত বা অশ্‌তরেথ। ইনি সূর্যের পত্নী চন্দ্র। সূর্যদেবতাকে এরা বলত বাআল আর চন্দ্রকে স্ত্রীদেবতা মনে করত। অশ্‌তরেথের সঙ্গে সেমিটিকদের আদি-দেবী ননার খুব মিল আছে। ননার মতো ইনিও পূতচরিত্র মাতৃমূর্তি।[৪]

তবে অন্যত্র আবার অস্ত্রেতকে অশেরা বা ইশ্‌তারের মতো দেবী মনে করা হত। তাঁর পূজাতেও অবাধ যৌনক্রিয়ার অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। যেমন এক্কেডীয়দের (Accadian) মধ্যে দেবীর এই ধরণের পূজাদির প্রচলন দেখা যায়। পণ্ডিত মনে করেন এই এক্কেডীয়দের কাছ থেকেই দেবীপূজার স্থূল এবং অপবিত্র আচার-অনুষ্ঠানগুলি অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে।[৫]

সিরিয়াতেও অস্ত্রেত দেবীর পূজা প্রচলিত ছিল। হিরপলিসে (Hierapolis) ছিল দেবীর সব চেয়ে প্রসিদ্ধ মন্দির। এখানে এসিরিয়া, বাবিলনিয়া, ফিনিসিয়া, আরব প্রভৃতি দেশ থেকে হাজার হাজার যাত্রী দেবীর পায়ে পূজার অর্ঘ্য দিতে আসত।[৬]

এই দেবীর মন্দিরেও পূজার অঙ্গরূপে বারাঙ্গনাবৃত্তি বিহিত ছিল। ফ্রেজার লিখেছেন দেশের প্রত্যেক নারীকে দেহবিক্রয় করে দেবীর প্রতি ভক্তির পরিচয় দিতে হত।[৭]

১ G. B. (abridged), p. 331 ২ H. R., p. 166 ৩ Ibid, p. 167

৪ Ibid, p. 170 ৫ S. S. W., p. 509 ৬ G. B. (abridged), p. 349

৭ Ibid, pp. 330-31 ; ফ্রেজার এখানে দেবীস্থানের নাম নির্দেশ করেছেন হেলিওপলিস (Heliopolis)

টাইরীয় (Tyrian) অস্ত্রেত দেবীকে তনিৎও বলা হত। এঁর পূজারও সেই একই কাহিনী। দেবীর মন্দিরে পূজার অঙ্গরূপে অবাধ যৌনমিলনের অনুষ্ঠান হত।[১]

মিলিত্তা (Mylitta)—ফিনিসীয়দের একজন দেবীর নাম ছিল মিলিত্তা। ইনি প্রেমের দেবতা, যৌনমিলনের অধিষ্ঠাত্রী। এশিয়া মাইনরের প্রায় সব অঞ্চলেই এমনি একজন দেবীর পূজা প্রচলিত ছিল।[২]

ফ্রেজার লিখেছেন ফিনিসিয়ার মন্দিরগুলিতে নারীরা বারাঙ্গনার কাজে ভাড়া খাটত। তারা বিশ্বাস করত এরূপ করলে দেবী তাদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাদের কৃপা করবেন।[৩]

মনে হয় মিলিত্তা-ধরণের দেবীর মন্দির সম্বন্ধে ফ্রেজার এই মন্তব্য করেছেন।

সাইবেল (Cybele)—ফ্রিজিয়ার অধিবাসীদের পূজিতা দেবীর নাম সাইবেল। ফ্রেজার বলেন[৪] ইনি সকল দেবতার জননী, এশিয়ার সেই মা মহাদেবী। এক সময়ে সারা এসিয়ামাইনরে এঁর পূজার প্রচলন ছিল। ইনি পরে গ্রীকদের কাছে রিয়া (Rhea) নামে পূজা পান। ক্রীট এবং আনাতলিয়াতে এঁর পূজা হত।[৫] আনাতলিয়াতে দেবীর মূর্তি ছিল সিংহবাহিনী।[৬] সাইবেলের স্বামী অত্তীশ (Attis).

রোমকরা দেবীকে ফ্রিজিয়া থেকে ইতালীতে নিয়ে যায়। একখণ্ড ক্ষুদ্র কৃষ্ণপ্রস্তর দেবীর প্রতিমূর্তিরূপে পূজিত হত। রোমক রাজদূতেরা তাকে নিয়ে গিয়ে পেলেনটাইন (Palantine) পাহাড়ের উপর বিজয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করে।[৭]

সৌমারীয় ননা— সেমিটিকদের আদি-দেবী ননার সম্বন্ধে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। সৌমারদের (সুমারবাসী) আরাধ্যা দেবীও ননা। সৌমাররা মূলতঃ প্রাচ্যদেশের লোক বলে অনুমান করা হয়। এরা ভারতবর্ষের লোক হতে পারে।[৮]

ননা কুমারী। তিনি একাধারে মাতৃরূপিণী এবং রণচণ্ডী। মেসোপটেমিয়ার প্রত্নলিপিগুলিতে তাঁকে সব সময়েই যুদ্ধকালে সেনাদলের নেত্রী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পর্বতের সঙ্গে তাঁর যোগ ঘনিষ্ঠ। তাঁকে সব সময়ে দেবী পার্বতী (Lady of the mountain) বলা হয়েছে। দেবীর বাহন সিংহ এবং তাঁর স্বামীর বাহন বৃষভ।[৯] ননা দেবীর কাছে নরবলিও দেওয়া হত। অবাধ যৌনক্রিয়া এঁরও পূজানুষ্ঠানের অঙ্গরূপে গণ্য হত।[১০] মনে হয় মূলে ইনি আমাদের পার্বতী দুর্গা। সৌমাররা এঁকে ভারতবর্ষ থেকে নিয়ে গিয়েছিল।

১ S. S. W., p. 509 ২ Ibid, p. 508 ৩ G. B. (abridged) p. 331
৪ G. B. (abridged), p. 347 ৫ S. S. W., pp. 121, 509 ; M. I. C., Vol. I, p. 54
৬ M I. C., Vol, I, p. 54 ৭ G. B. (abridged), p. 348
৮ Pre-Aryan Elements in Indian Culture, I. H. Q., Vol. X., pp. 16-17
৯ Ibid, p. 15, n. ১০ Ibid. pp. 15-16

হিট্টাইটদের দেবী—হিট্টাইটদের মধ্যেও দেবীপূজার প্রচলন ছিল। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে হিট্টাইটরা সঙ্কর জাতি, আর্য ও ককেশীয়দের সংমিশ্রণে এদের উদ্ভব।[১] পূর্বেই বলা হয়েছে এদের পূজিতা দেবীর নাম কি ছিল সঠিক জানা যায় না। তবে খুব সম্ভব এরা তাঁকে মা বলত। দেবীর বাহন সিংহ বা ব্যাঘ্র।[২]

বঘাজিকেয়ী (Boghazikeui) মৃৎফলকলিপি থেকে হিট্টাইটদের দেবতা সম্পর্কে কিছুটা তথ্য পাওয়া যায়। দেখা যায় একজন দেবতা সিংহবাহিনী এক দেবীর সঙ্গে রয়েছেন। দেবতাটির সঙ্গে একটি পশু আছে। অনুমান করা হয় এটি ষণ্ড।[৩]

কেপ্পডশিয়ার দেবী— পূর্বেই কেপ্পডশিয়ার (Cappodocia) দেবী 'মা'র উল্লেখ করা হয়েছে। এই দেবীও সিংহবাহিনী। তাঁর স্বামীর নাম তেসাব। তিনি বৃষভবাহন এবং তাঁর হাতে আছে ত্রিফলক বজ্র[৪] অর্থাৎ ত্রিশূল।

এঁদের সঙ্গে এবং সৌমার ও হিট্টাইটদের দেবদেবীর সঙ্গে আমাদের শিবদুর্গার সাদৃশ্য এত বেশী যে মনে হয় এঁরা শিবদুর্গার থেকে অভিন্ন। কিন্তু এঁদের গতিবিধি নির্ণয় করবার উপযোগী নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। কাজেই এঁরা পূর্ব থেকে পশ্চিমে গেছেন, না পশ্চিম থেকে পূর্বে এসেছেন কিংবা পূর্ব ও পশ্চিমে একই সঙ্গে আবির্ভূত হয়েছেন এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করে কিছু বলা সম্ভবপর নয়।

আইসিস (Isis)—মিশরের প্রধান দেবী ছিলেন আইসিস। সারা দেশ জুড়ে তাঁর পূজা হত।[৫] আইসিসের সঙ্গে ইশ্‌তারের অনেক বিষয়ে মিল আছে। ফারাও সিওস্রিস (২৩০০ খৃঃ পূঃ) ছিলেন চক্রবর্তী সম্রাট্‌। আফ্রিকার অধিকাংশ, লিবিয়া, প্যালেষ্টাইন, ইউরোপের কতক অংশ, এ ধারে পূব দিকে ভারতের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা জুড়ে ছিল তাঁর সাম্রাজ্য। তিনি যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই দেবী আইসিসের পূজার প্রচলন করেছেন, দেবীর স্তম্ভ স্থাপন করেছেন। সেই স্তম্ভের গায়ে সামনের দিকে দেবীর প্রতীক যোনিচিহ্ন উৎকীর্ণ থাকত।[৬]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় সেকালে কোথাও সুন্দরী নারীমূর্তি, কোথাও বা বৃত্ত এবং পবিত্র স্ত্রীচিহ্ন-ত্রিকোণ, আবার কোথাও বা কোনো পশু, যেমন গাভী, দেবীর প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হত।[৭] আর এই প্রতীকেই দেবীর পূজা হত। আইসিসের স্বামী ওসাইরিস।

হেথর (Hathor)—মিশরে হেথর নামে আরেকজন দেবীর পূজা প্রচলিত ছিল।

১ E. R. E., Vol. VI, p. 723. ২ Ibid, p. 725

৩ Frazer : Adonis, Thinker's Library Ed., p. 184 (দ্রঃ শ্রীদুর্গা, পৃ ৮৪)

৪ D. R. Bh. V., p. 802 ৫ S. S. W., p. 447 ৬ Ibid, p. 510 ৭ Ibid, p. 464

কেউ কেউ হেথরকে আইসিস থেকে অভিন্ন মনে করেন। এঁদের মতে হেথর আইসিসেরই নামান্তর। স্বরূপতঃ হেথর আর আইসিস অভিন্ন হলেও ব্যবহারতঃ ভিন্ন ছিলেন। কেননা, হেথরের স্বামীও ভিন্ন, তিনি হোরাস। আদিতে হেথর গাভীরূপিণী। অনুমান করা হয় মিশরে গাভীই ছিল মাতৃদেবতার আদিরূপ।[১] পরে হেথরের যে-মূর্তি কল্পিত হয় তার দেহ মানবীর আর মস্তক গাভীর। মাথায় শিং আছে।[২]

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে মাতৃদেবতার গাভীরূপ কল্পনার অতি প্রাচীন নিদর্শন আমাদের দেশেও আছে। ঋগ্‌বেদে মা অদিতিকে গাভীরূপে কল্পনা করা হয়েছে।[৩]

চন্দ্রের গাভীরূপ—মিশরের বাইরে ক্রীটে সূর্যদেবের বৃষভরূপ আর চন্দ্রদেবীর গাভীরূপ কল্পিত হত। অর্থাৎ ক্রীটবাসীরা বৃষকে সূর্যের প্রতীক আর গাভীকে চন্দ্রের প্রতীক মনে করত। প্রাচীন জগতের অনেক জায়গাতেই চন্দ্রকে শস্য-উৎপাদনকারিণী দেবতা, ওষধি-বনস্পতি-উৎপাদনকারিণী দেবতা কল্পনা করা হত। কাজেই, এদিক্ থেকে দেখলে চন্দ্র মাতৃদেবতা। আমরা লক্ষ্য করে এসেছি স্ত্রীদেবতার আদিরূপ মাতৃরূপ। আবার দেখা গেল গাভী মাতৃরূপের অন্যতম প্রতীক। অনেক প্রাচীন দেবীমূর্তি বা দেবীর প্রতিকৃতির মাথায় যে-শিং দেখা যায় সেই শিং মনে হয় দেবীর মাতৃরূপের নিদর্শক চিহ্ন। কেননা, এই শিং গাভীর শিং হতে পারে আবার চন্দ্রকলাও হতে পারে; কিন্তু যেটিই হোক না কেন মাতৃরূপের দ্যোতকই হবে।

বাবস্তিস (Bubastis)—আরেকজন মিশরীয় দেবীর কথা জানা যায়। তাঁর নাম বাবস্তিস বা বাস্ত্ (Bast)। তিনি সতীত্বের দেবতা। গ্রীকদের ডায়েনা তাঁর প্রতিরূপ।[৪]

মিশরে এ ছাড়া অনেক স্থানীয় দেবীও ছিলেন। তাঁদের নথ (Nath), পখত (Pakht) , শেখেত (Sekhet), মাত (Mut), সাবেন (Suben), নতি (Nati)—এই সব নাম ছিল। তবে এঁরা ভিন্ন ভিন্ন দেবী নাও হতে পারেন। হয়ত বা এই সব নাম একই দেবীর বিভিন্ন স্থানীয় নাম।[৫]

তবিতি (Tabiti)—৮০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে গ্রীকরা কৃষ্ণসাগরের তীরে গিয়ে উপস্থিত হয়। জায়গাটা এখনকার রুশ দেশের মধ্যে। সেখানে যে-লোকদের তারা দেখতে পেল তাদের নাম দিল শিথিয়ান অর্থাৎ শক। এই শকদের সর্বপ্রধান দেবতা ছিলেন দেবী তবিতি। ইনি গার্হস্থ্য অগ্নিদেবতা বা পরিবারের দেবতা[৬] অর্থাৎ গৃহদেবী।

হেস্তিয়া ও ভেস্তা (Hestia and Vesta)—গ্রীকদের মধ্যে ইনিই হেস্তিয়া নামে

১ D. E. I. C., p. 109 ২ H. R., p. 128 ৩ ঋ বে ৮।১০।১৫
৪ S. S. W., p. 509 ৫ Ibid, p. 517 ৬ Ibid, p. 353

পূজা পেতেন। হেস্তিয়া গৃহাগ্নি-দেবতা। প্রত্যেক পরিবারেরই নিজস্ব হেস্তিয়া থাকতেন।[১] এই দেবীই রোমকদের দেবমণ্ডলে ভেস্তা নামে গৃহীত হয়েছেন। ভেস্তা রোমকদের গৃহাগ্নি-দেবতা।

গ্রীকদের ও রোমকদের বিভিন্ন দেবী—গ্রীক ও রোমক দেবমণ্ডলে দেবীদের সংখ্যা কম নয়। মাতৃদেবতারূপেই তাঁদের অনেকের পূজা হত। গ্রীকরা বিভিন্ন ব্যাপারের বিভিন্ন অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা কল্পনা করত। যেমন যুদ্ধের দেবী এথিনি, প্রেমের দেবী এফ্রদিতি, শিকারের দেবী আর্তিমিস। গ্রীকদের ধরিত্রীদেবী গইয়ার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

জুনো (Juno)—গ্রীকদের প্রধান দেবী হেরা। রোমকরা এঁকে বলত জুনো। হেরা বা জুনো দেবরাজ জিউসের পত্নী। পূর্ণ-সৌন্দর্যে বিকশিত অতুলনীয় মহিমায় ভাস্বর মাতৃমূর্তি জুনো বা হেরা।[২] মানুষের অশেষ কল্যাণ-কারিণী এই দেবী জীবনের নানা ব্যাপারের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা। তিনি রাষ্ট্র ও সমাজের রক্ষাকারিণী, নারীদের রক্ষাকারিণী ইষ্টদেবী। ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য ইনি ভিন্ন ভিন্ন নামে পূজা পেতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় জুনো কুমারী মেয়েদের কুমারীধর্মের রক্ষাকারিণীরূপে ভার্জিনেন্‌সিস (Virginensis) নামে পূজা পেতেন; দাম্পত্যজীবনের অধিষ্ঠাত্রীরূপে মেট্রোনা (Matrona) নামে তাঁর পূজা হত।[৩]

জুনোর পূজা উপলক্ষ্যে মার্চমাসে বিরাট উৎসব হত। যে-সব মেয়ের চরিত্র সম্বন্ধে কখনো কোনো কানাঘুষাও শোনা যায় নি কেবলমাত্র সেই-সব নিষ্কলঙ্কচরিত্র কুমারী ও সধবা মেয়েরাই এই উৎসবে যোগ দিতে পারত। দেবী জুনোর পূজা-আর্চায় কোনো রকম অসংযমের স্থান ছিল না। তাঁর অসংখ্য ডাকিনী যোগিনী অনুচরী ছিল।[৪]

ভেনাস (Venus)— ফিনিসিয়ার লোকেরা যাকে বলত অস্তারতি গ্রীকরা তাকেই বলত এফ্রদিতি আর রোমকরা ভেনাস। ইনি প্রেম ও সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী-দেবী। প্রেক্‌জিটেলিস (Praxiteles) থেকে আরম্ভ করে বহু শিল্পী যুগে যুগে তাদের শিল্পসৃষ্টির সমস্ত শক্তি উজাড় করে দিয়ে এই দেবীর অপূর্ব সুন্দর মূর্তি রচনা করেছে, পাথর দিয়ে করেছে, করেছে রং ও তুলি দিয়ে।[৫] এফ্রদিতির স্বামী এডনিস।

হিরোডটাসের (Herodotus) মতে ফিনিসীয়রা সাইপ্রাস দ্বীপের পেফসে (আধুনিক কুক্‌লিয়া) দেবী এফ্রদিতির মন্দির প্রতিষ্ঠা করে। ফ্রেজার মনে করেন ফিনিসীয়রা পেফসে যাবার আগেই ওখানে স্থানীয় উর্বরতার দেবীর পূজা হত। ফিনিসীয়রা দেখল এই দেবী ঠিক তাদের দেবী অস্তারতির মতো। তাই তারা তাঁকে অস্তারতি বলে পূজা করতে লাগল।[৬]

১ H. R., p. 278 ২ Ibid, p. 284 ৩ S. S. W., pp. 512-13
৪ Ibid, pp. 512-13 ৫ Ibid, pp. 511-12 ৬ G. B. (abridged), p. 330

এথিনি (Athene)—এথেন্সের অধিবাসীদের সর্বারাধ্যা দেবী এথিনি বা এথিনা। ইনি কুমারী। এঁকে এথেন্সবাসীদের কুলদেবী বলা যায়। এথিনিমূর্তির মাথায় দেখা যায় শিরস্ত্রাণ, হাতে শূল ও চর্ম। এ মূর্তি রণদেবীর। কিন্তু পার্থিননে দেবীর মন্দিরে তাঁর একটি প্রাচীন মূর্তিও ছিল। সে-মূর্তি খাঁটি মাতৃমূর্তি।[১] এথিনি আবার সমস্ত বিদ্যা ও শিল্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ইনিই রোমকদের দেবী মিনার্ভা। এঁকে আমাদের সরস্বতীর প্রতিরূপ বলা যায়।

আর্তিমিস (Artemes)—গ্রীকদের দেবী আর্তিমিস সাধারণভাবে প্রকৃতি বা বহিঃপ্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী-দেবী এবং বিশেষভাবে উর্বরতার দেবী।[২] তিনি আবার শিকারেরও অধিষ্ঠাত্রী-দেবী। তবে তিনি প্রধানতঃ মাতৃদেবতা। তিনি মাতৃদেবতা চন্দ্র, প্রজননের অধিষ্ঠাত্রী।[৩] এফিসিয়ানে (Ephesian) আর্তিমিসের মূর্তি পাওয়া গেছে। মূর্তিটি বহুস্তনা[৪]। দেবী যে প্রধানতঃ মা, মূর্তিটি তারই পরিচায়ক। আর্তিমিসই রোমক দেবমণ্ডলে দেখা দিয়েছেন ডায়েনারূপে।

দেবতার মাতৃরূপের আদর—প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় গ্রীসের জনসাধারণ দেবতার মাতৃরূপের পূজায় অধিক আনন্দ পেত। তারা পশুবলি দিয়ে পূজা করত। কোথাও কোথাও যে বহু পশু বলি দেওয়া হত তারও নিদর্শন আছে।[৫]

লক্ষ্য করা গেছে রোমক দেবমণ্ডলেও গ্রীক দেবীদেরই দর্শন পাওয়া যায়। তবে এখানে তাঁদের নাম বদলে গেছে আর কারো কারো ক্ষেত্রে রূপও বদলেছে। যেমন দেখা গেল হেরার নাম হয়েছে জুনো, এথিনির মিনার্ভা, এফ্রদিতির ভেনাস আর আর্তিমিসের নাম হয়েছে ডায়েনা। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন, গ্রীকদের দেবকল্পনা আর রোমকদের দেবকল্পনা একরকম হলেও হুবহু এক নয়; উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও আছে।

ডায়েনা (Diana)—দৃষ্টান্ত হিসাবে রোমক দেবী ডায়েনার উল্লেখ করা যায়। গ্রীক দেবী আর্তিমিসই ডায়েনা হয়েছেন সন্দেহ নাই কিন্তু উভয় দেবীর রূপকল্পনার মধ্যে পার্থক্যও আছে। প্রকৃতির মধ্যে যে-বিরাট প্রাণশক্তি অভিব্যক্ত, গাছপালা জীবজন্তুর মধ্যে প্রবাহিত, তারই মূর্তবিগ্রহ ডায়েনা। তিনি বনদেবী, বনের অধীশ্বরী, বন্য জীবজন্তুর রক্ষাকারিণী।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে ঠিক এমনি একজন দেবীর উল্লেখ আছে ঋগ্‌বেদে। তিনি অরণ্যের দেবী অরণ্যানী।[৬] এছাড়া, বাংলা মঙ্গলকাব্যের দেবী চণ্ডীর সঙ্গেও ডায়েনার মিল লক্ষণীয়। উভয়েই বন্য জীবজন্তুর রক্ষাকারিণী।

১ A. A. R., p. 179 ২ G. B., Part I, Vol. II, p. 128 ৩ S. S. W., p. 514
৪ Ibid ৫ Themis, p. 504 ৬ ঋ বে ১০।১৪৬

ডায়েনা কিন্তু শিকারীদেরও ইষ্টদেবী। আবার পশুপালকরাও তাঁর আশ্রিত। আর্তিমিসের মতো ডায়েনা চন্দ্রদেবী, শস্যের এবং সন্তানজন্মের অধিষ্ঠাত্রী। তাঁর কৃপাতেই মানুষ সন্তান লাভ করে।[১] আমাদের মা ষষ্ঠীর কথা মনে পড়ে।

আভেনটাইন (Aventine) নদীর ধারে ছিল দেবী ডায়েনার মন্দির। মন্দিরে ছিল দেবীর বহুস্তনা মূর্তি। মূর্তিটি গ্রীকদের আর্তিমিসমূর্তির অনুকরণে তৈরি।[২]

অন্নপেরেন্না (Anna Perenna)—রোমক দেবমণ্ডলে অন্নপেরেন্না নামে একজন নূতন দেবীর দেখা পাওয়া যায়। এঁকে বর্ষচক্রের দেবী বলা হত। বৎসরের তৎকালীন প্রথম মাসের অর্থাৎ মার্চ মাসের পূর্ণিমায় এই দেবীর উৎসব হত। এই উৎসবে অসংযত আমোদ-প্রমোদও চলত।[৩]

কেউ কেউ অন্নপেরেন্নাকে অন্নাধিষ্ঠাত্রী-দেবী মনে করেন। আমাদের দেবী অন্নপূর্ণার সঙ্গে এঁর সাদৃশ্য লক্ষণীয়। অন্নপূর্ণার পূজাও বসন্তকালেই হয়ে থাকে। এ বিষয়ে এর অতিরিক্ত কিছু বলার মতো উপযুক্ত তথ্য পাওয়া যায় না।

অন্যান্যদের মধ্যে দেবীপূজা—প্রাচীন টিউটনদের মধ্যেও দেবীপূজার প্রচলন ছিল। জার্মান দেশে বাল্টিক সাগরের দক্ষিণ ধারের জনগুলি দেবী হের্‌থাসের (Herthus) পূজা করত। হের্‌থাস সেই প্রাচীন ধরিত্রীমাতা।[৪]

ইউরোপের নানা স্থানে আরও নানা দেবীর পূজা হত। যেমন থ্রিসিয়ার (জার্মানী) লোকেরা হল্‌ডা (Hulda) নামে এক দেবীর পূজা করত। ইনি জেলে ও চাষার দেবী।[৫] আইসল্যাণ্ডে দেবী ফ্রিগ্‌গার (Frigga) পূজা প্রচলিত ছিল। দেবীর মহিমময়ী মাতৃমূর্তি। সন্তানহীনেরা এঁর কৃপায় সন্তানলাভ করত।[৬]

শক্তিপূজা মানুষের মজ্জাগত—আমরা লক্ষ্য করে এসেছি আদিম মানুষের আদি-দেবতা শক্তি। আদিম মানুষের শক্তিতে বিশ্বাস ছিল, সে শক্তির পূজা করেছে। কাজেই, বলা যায় শক্তির প্রতি বিশ্বাস, শক্তির পূজা মানুষের মজ্জাগত হয়ে গেছে। কালে কালে মানুষের কত পরিবর্তন হয়েছে; আদিম মানুষ হয়েছে সুসভ্য। মানুষের চিন্তাভাবনা, সমাজ, ধর্ম সব বদলে গেছে। কিন্তু সেই আদিম বিশ্বাস যায়নি।

ফরাসী বিপ্লবে শক্তিপূজা—তাই দেখা যায় ফরাসী বিপ্লবের সময়ও জনসাধারণ প্রকৃতির নারীমূর্তি গড়ে পূজা করেছে। শিল্পী দেখিয়েছেন সে-মূর্তির অনাবৃত স্তন থেকে বইছে জলধারা; এ ধারা স্তন্যধারার প্রতীক। শুধু তাই নয়, প্রজ্ঞাদেবীর (Goddess of

১ G. B., Part I, Vol II, p. 123 ২ Ibid ৩ E. P., Vol. I, p. 997 (দ্রঃ Anna Perenna)
৪ H. R., p. 255 ৫ Ibid, pp. 259-60 ৬ Ibid, p. 268

Reason) প্রতিমূর্তিরূপে একজন সত্যিকারের নারীকে নিয়ে তারা পেরিসের রাস্তায় রাস্তায় বিজয়-শোভাযাত্রা করেছে, তারপর তাকে গীর্জায় নিয়ে গিয়ে বেদীর উপর বসিয়ে পূজা করেছে।[১]

এ কালের ইউরোপে শক্তির স্বীকৃতি—এ কালের ইউরোপীয় সাহিত্য এবং দর্শনেও শক্তির স্বীকৃতি আছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে কবি সুইনবার্ণের Mater Triumphalis, Hertha, The Pilgrims এবং Dolores-এই ক'টি কবিতার উল্লেখ করা যায়। তাতে শক্তি সম্বন্ধে যে-ধারণা প্রকাশ পেয়েছে সেই ধারণা আর ভারতীয় ধর্মের শক্তির ধারণা প্রকৃতপ্রস্তাবে একই রকম।[২]

কোনো কোনো পাশ্চাত্য পণ্ডিতও মনে করেন ধর্মের যথার্থ মর্ম জানতে হলে প্রথমে বিশ্বাস করতে হবে মানুষের ইন্দ্রিয়গত জীবনকে অতিক্রম করে রয়েছে তার আধ্যাত্মিক জীবন। সেই জীবনের মধ্যেই তার ইন্দ্রিয়গত জীবনের প্রতিষ্ঠা ও বৃদ্ধি। এই আধ্যাত্মিক জীবনের প্রধান অবলম্বন এক অতীন্দ্রিয় শক্তিতে বিশ্বাস। এই শক্তি যুক্তিতর্কবিচার-নিরপেক্ষ, প্রত্যক্ষ-অনুভূতিগম্য।[৩]

প্রত্যাদেশ-নিরপেক্ষ প্রাকৃতিক ধর্মে শক্তি— প্রত্যাদেশ-নিরপেক্ষ প্রাকৃতিক ধর্মে (Naturalistic religion) শক্তির প্রতি বিশ্বাস সুস্পষ্ট। এই শক্তিকে কেউ বলেন অন্ধ জড় শক্তি, কেউ বা এর মধ্যে চৈতন্যের পরিচয় পান। এই শক্তিকেই কেউ কেউ মানুষের ভাগ্যনিয়ন্ত্রী শক্তি মনে করেন। কিন্তু তাঁদের মতে এ শক্তি মানুষের সুখদুঃখে সম্পূর্ণ উদাসীন। মানুষ হয় একে পূজা করেছে, স্তবস্তুতি করেছে, নয় একে অবজ্ঞা করেছে এবং এই শক্তির চেয়ে নিজের কোনো আদর্শকে শ্রেষ্ঠ মনে করে তারই পূজা করেছে।[৪]

হার্বার্ট স্পেন্সার ও শক্তি -হার্বার্ট স্পেন্সার মনে করতেন জগতের সমস্তই এক অসীম অনন্ত শাশ্বত শক্তির মধ্যে বিলীন হয়ে যায় আবার তার থেকেই হয় সৃষ্টি, সুরু হয় বিবর্তনের ধারা।[৫] এটি ভারতীয় শক্তিতত্ত্বের অনুরূপ।

নীট্‌শে ও শক্তি— পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মধ্যে সেরা শক্তিবাদী মনে হয় নীট্‌শে (Nietzsche)। তিনি বলেন "এই বিশ্ব এক বিরাট্ শক্তি। এর মধ্যে কোন অস্পষ্টতা নেই এবং এ অসীমেও ব্যাপ্ত হয় না। এ হচ্ছে দেশপরিচ্ছিন্ন এক নির্দিষ্টপরিমাণ শক্তি। এই বিশ্বে চলছে শক্তির তরঙ্গলীলা। এ শক্তি একই সঙ্গে এক এবং বহু; কোথাও পুঞ্জীকৃত, কোথাও ক্ষীয়মাণ। যেন শক্তির এক সমুদ্র প্রচণ্ড ক্রোধে তোলপাড় করছে,

১ S. S. W., p. 504 ২ H. B., Vol. II, p. 287, n. 1 ৩ G. Ph. R., pp. 86-87
৪ Ibid, pp. 103-104 ৫ Ibid., p. 108

গর্জন করছে। কত যুগযুগান্তের উপর দিয়ে তার কত নামরূপের জোয়ারভাঁটা চলছে। ভাঁটার টানে যা দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে, জোয়ারের টানে তাই আবার ফিরে দেখা দিচ্ছে।"[১] নীট্‌শে মৃন্ময়ী শক্তির কথা বলেছেন। চিন্ময়ী মহাশক্তির তত্ত্ব তাঁর অধিগত ছিল না। অবশ্য নীট্‌শের অভিমতকেও ভারতীয় শক্তিতত্ত্বের এক সঙ্কীর্ণ ব্যাখ্যা বলা চলে। তিনি বুদ্ধি দিয়ে শক্তির জড়রূপ সম্বন্ধে যেটুকু জেনেছেন তাই বলেছেন। কিন্তু চিৎ-জড়াত্মিকা মহাশক্তির তত্ত্ব সামান্যমাত্রই বুদ্ধিগ্রাহ্য। সেইজন্য, ভারতীয় বিচারে শক্তি সম্বন্ধে নীট্‌শের ধারণা নিতান্ত অসম্পূর্ণ।

ভারতের বাইরে দেবীপূজার সন্ধান কেন?—রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় লিখেছেন "শাক্তদের দেবী সম্বন্ধে যে-ধারণা তার অনুরূপ ধারণার সন্ধান করতে হলে আমাদের চলে যেতে হবে বেদপন্থী আর্যদের দেশ ছাড়িয়ে আবেস্তাপন্থী ইরাণীদের দেশ ছাড়িয়ে এসিয়া-মাইনরে, সিরিয়ায়, মিশরে, চলে যেতে হবে ভূমধ্যসাগরের তীরঘেঁষা অন্য অন্য দেশগুলিতে।"[২]

এই অধ্যায়ে যথাসাধ্য সে চেষ্টা করা গেল এবং সেই সঙ্গে ইউরোপেও দেবীপূজার সন্ধান করে আসা গেল। দেখা গেল শাক্তদের আরাধ্যা মহাশক্তি মহাদেবীর পূজা এবং প্রভাব কোনো না কোনো আকারে একদা ভারতের বাইরেও এক বিস্তৃত এলাকায় ব্যাপ্ত ছিল।

---

১ G. Ph. R., p. 107 ২ I. A. R., p. 148

তৃতীয় অধ্যায়

ভারতের মানুষ ও প্রাচীন ধর্ম

নৃতাত্ত্বিক শ্রেণীবিভাগ—ইতিহাসের যবনিকা যখন উঠল তখন দেখা গেল ভারতের রঙ্গমঞ্চ জুড়ে রয়েছে বিভিন্ন স্তরের মানুষ। একেবারে আদিম স্তর থেকে আরম্ভ করে সভ্যতার উচ্চ স্তর পর্যন্ত এরা ছড়িয়ে আছে। এদের আকৃতি-প্রকৃতি, জীবনযাত্রা-প্রণালী, ভাব, ভাষা ইত্যাদি নানা বিষয় বিচার করে পণ্ডিতেরা এদের সাধারণতঃ এই কটি জনসমষ্টি বা শ্রেণীতে ভাগ করেন। যথা—(ক) নেগ্রিটো (নেগ্রিলো)। (খ) প্রোটো-অষ্ট্রলয়েড অর্থাৎ আদি-অষ্ট্রেলীয়; এদের কোলিডও বলা হয়। (গ) প্রোটো-দ্রাবিড় অর্থাৎ আদি-দ্রাবিড় বা প্রত্ন-দ্রাবিড়। (ঘ) আলপাইন বা ইন্দো-আলপাইন। (ঙ) প্রোটো-নর্ডিক। (চ) মঙ্গোল বা ভোটচীন। মঙ্গোলরা ভারতে আসে সবার শেষে।

ভাষাগত শ্রেণীবিভাগ—ভাষার বিচারে এদের অষ্ট্রিক, দ্রাবিড়, আর্য এবং ভোটচীন মোটামুটি এই কটি ভাগ করা যায়। কিন্তু সাধারণতঃ আর্য এবং অনার্য এই দুটি ভাগই করা হয়। আবার আর্য এবং অনার্য এই শব্দ দুটিকে শুধু ভাষাবাচক নয়, জাতি-ও সংস্কৃতি-বাচকও মনে করা হয়।

নেগ্রিটো—বিশেষজ্ঞদের অনুমান ভারতের একেবারে আদিম অধিবাসীরা ছিল নেগ্রিটো। এদের মধ্যে ছিল নানা জন।[১] পরবর্তীকালে এরা প্রায় লোপ পেয়ে যায়। তবে আন্দামানে এদের একটা ছোট দল টিকে আছে। এ ছাড়া, কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুরের (বর্তমান কেরলের) পার্বত্য কাডার (Kadar) ও পুলয়ানদের (Pulayan) মধ্যে, ওয়াইয়ানাডের (Wynad) ইরুলদের মধ্যে, আসামের আঙ্গামী নাগাদের মধ্যে এবং বিহারের রাজমহল পাহাড়ের কোনো কোনো আরণ্যক জাতির মধ্যে এদের অবশেষ আছে বলে পণ্ডিতরা অভিমত প্রকাশ করেন।[২]

নেগ্রিটোদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। গভীর অরণ্যে বিশেষ করে সমুদ্র-তীরের স্থানসমূহে এরা বাস করত। কৃষিকাজ এরা জানত না। এদের কোনো রকম সভ্যতার বালাই ছিল না।[৩]

১ ভা মা মা, সা প, ১৩৫৪, ৪র্থ সং পৃ ২৪৪ ২ V. A., p. 148 ৩ ভা স সা, পৃ ১১

অনুমান করা যায় আদিম মানুষ যে রকম দেবতা অপদেবতায় বিশ্বাস করত নেগ্রিটোরাও সেই রকমই বিশ্বাস করত। কিন্তু এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করে কিছু বলার মতো তথ্যাদি পাওয়া যায় না।

ভারতের আদিম অধিবাসী—ভারতের অধিবাসীদের সম্বন্ধে পণ্ডিত-মহলে একটি বহুল-প্রচারিত মত এই যে এদের মধ্যে শুধু নেগ্রিটোরাই এদেশের আদিম অধিবাসী আর সবাই বাইরের থেকে এসেছে। বিশেষ করে দ্রাবিড় এবং আর্যভাষীরা যে বহিরাগত এই মতটি সব চেয়ে বেশী প্রচারিত। কিন্তু এ বিষয়ে ভিন্ন মতও আছে। ভিন্নমতাবলম্বীরা বলেন দ্রাবিড়ভাষ-ও আর্যভাষা-ভাষীরাও মূলতঃ ভারতের অধিবাসী, ভারত থেকেই তারা বাইরে গেছে।[১]

প্রোটো-অষ্ট্রলয়েড—নেগ্রিটো জাতির জীবননাট্য-অভিনয়ের শেষের দিকে ভারত-রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে পাথরের অস্ত্রশস্ত্র হাতে নিয়ে বর্তমান মুণ্ডা, ভীল, সাঁওতাল, ওরাঁও, খণ্ড, গন্দ, প্রভৃতি জাতিদের পূর্বজরা। এরা সম্ভবতঃ ছিল ককেশীয় জাতির একটি অধস্তন শাখা। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন এরা অষ্ট্রেলিয়ার বর্তমান অসভ্য জাতিদের নিকটতম জাতি; তাই তাঁরা এদের প্রোটো-অষ্ট্রলয়েড জাতি বলেন এবং এদের ভাষাকে অষ্ট্রিক ভাষার অন্তর্ভুক্ত করেন। দ্রাবিড়দের আগে এরা ভারতে এসেছিল বলে এদের দ্রাবিড়-পূর্ব বা Pre-Dravidian জাতি বলা হয়। এই দ্রাবিড়-পূর্ব প্রোটো-অষ্ট্রলয়েড জাতিগুলিকে ভারতের বর্তমান অধিবাসীদের মূল-স্তবক (substratum) মনে করা হয়।[২] পণ্ডিতেরা মনে করেন এদের সঙ্গে নেগ্রিটোদের রক্তের সংমিশ্রণ হয়েছিল।

এই প্রোটো-অষ্ট্রলয়েডরা এক সময়ে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। হিমালয়ের দক্ষিণ-পশ্চিম পাদদেশ থেকে আরম্ভ করে মধ্যপ্রদেশ, বাংলা, আসাম হয়ে বর্মা এবং কম্বোজ পর্যন্ত ছিল এদের বাস।[৩] কেউ কেউ মনে করেন পশ্চিমে ইরান পর্যন্ত সম্ভবতঃ এরা ছড়িয়ে পড়েছিল।[৪] আবার এধারে দক্ষিণ-ভারত ও সিংহল থেকে অষ্ট্রেলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় এই প্রোটো-অষ্ট্রলয়েডরা বাস করছিল বলে অনুমান করা হয়।[৫]

ভারতীয় সভ্যতার গোড়াপত্তন—পণ্ডিতরা অনুমান করেন এই প্রোটো-অষ্ট্রলয়েডরাই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির গোড়াপত্তন করে। এরা চাষবাস করতে সুরু করে, কৃষিজীবী

১ মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা, ডি. এস. ত্রিবেদী, এল. ডি. কল্ল, এস. শ্রীকণ্ঠ শাস্ত্রী, কে. এম. মুন্সী প্রভৃতি মনে করেন আর্যরা ভারত থেকেই বাইরে গেছেন। দ্রঃ—V. A., Ch 10, Appendix. দ্রাবিড়দের সম্বন্ধে দ্রঃ—B. Ph. V. U., pp. 9-12 ২ ভা সা ব, সা প, ১৩৪৪, পৃ ১৪৪

৩ ঐ পৃ ২৪৩ ৪ ভা স সা, পৃ ১৪ ৫ বা ই, পৃ ৪১

মানুষের সুসংবদ্ধ সমাজ-ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। যতদূর জানা যায় এদের জীবন ছিল গ্রামকেন্দ্রিক।

প্রোটো-অস্ট্রলয়েডদের ধর্মবিশ্বাস—এরা মানুষের একাধিক আত্মায় বিশ্বাস করত। এদের ধারণা ছিল মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা গাছে, পাহাড়ে অথবা অন্য জীবজন্তুর মধ্যে প্রবেশ করে। সম্ভবতঃ এদের এই ধারণাই পরবর্তীকালে হিন্দুদের পুনর্জন্মবাদে রূপান্তরিত হয়। মনে হয় এদের মধ্যে হিন্দুদের শ্রাদ্ধের অনুরূপ রীতিও ছিল। এরা মৃতের উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে খাদ্যাদি দিত। প্রোটো-অস্ট্রলয়েডরা মৃতদেহের বৃক্ষসমাধি দিত। এর অর্থ মৃতদেহটিকে গাছের ছাল বা কাপড় দিয়ে জড়িয়ে গাছের উপরে ডালের সঙ্গে বেঁধে রেখে দিত। তবে এরা মৃতদেহ মাটিতেও পুঁতে দিত এবং সমাধির উপর একখণ্ড লম্বা পাথর খাড়া করে পুঁতে রাখত।[১]

শক্তিপূজার আদি-প্রবর্তক— প্রোটো-অস্ট্রলয়েডরা প্রধানতঃ স্ত্রীদেবতারই পূজা করত। এদের প্রায় সব দেবতাই স্ত্রীদেবতা। কেউ কেউ অনুমান করেন এরাই সম্ভবতঃ ভারতের শক্তিপূজার আদি-প্রবর্তক।[২]

প্রোটো-অস্ট্রলয়েডদের বিভিন্ন জন— প্রোটো-অস্ট্রলয়েডদের মধ্যে ছিল বিভিন্ন জন। কোনো কোনো জন ছিল নেগ্রিটোদের মতো অরণ্যবাসী, শিকারজীবী। এরা চাষবাস প্রভৃতি জানত না। এই অরণ্যবাসী অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের প্রোটো-অস্ট্রলয়েডরাই প্রাচীন ভারতে নিষাদ, 'ভিল-কোল' প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল।[৩]

স্বভাবচরিত্র—প্রোটো-অস্ট্রলয়েডদের স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে বলা হয় তারা ছিল সরল সোজা নিরীহ মানুষ। স্বভাবতঃ শান্তিপ্রিয় ছিল বলে প্রবল জাতির আক্রমণ বা প্রভাব কোনোটাই ঠেকাতে পারত না, প্রবলকে মেনে নিত। তারা ছিল আমুদে মানুষ, স্বভাবতই হাসিখুশী। ভাবপ্রবণতা এবং কল্পনাপ্রবণতা তাদের ছিল, কাজেই কবিত্বশক্তিও ছিল। তারা কতকটা কামুক ছিল। কাজকর্মে উৎসাহ এবং দায়িত্ববোধও তাদের কিছুটা কম ছিল। মোটের উপর তাদের অল্পবিস্তর অলসপ্রকৃতির লোকই বলা যায়। সংহতিশক্তি বা চরিত্রের দৃঢ়তাও তাদের কমই ছিল। তবে তারা ছিল অফুরন্ত প্রাণশক্তির অধিকারী। নানা বিপর্যয়ের মধ্যেও সে-প্রাণশক্তি নিঃশেষ হয় নি।[৪]

এদের দান—পূর্বেই বলেছি প্রোটো-অস্ট্রলয়েডরাই ভারতীয় সভ্যতার গোড়াপত্তন করেছে বলে অনুমান করা হয়। কেউ কেউ ত মনে করেন ভারতীয়দের জীবনযাত্রার

১ ভা স সা, পৃ ১৩-১৪ ২ ভা বা বা, সা প, ১৩৫৫, পৃ ২৩৭

৩ ভা স সা, পৃ ১৫ ৪ ঐ পৃ ১৪-১৫

ব্যবহৃত নানা বস্তু যেমন ধান, পান, হলুদ, সিন্দুর, কলা, সুপারি প্রভৃতি এই প্রোটো-অস্ট্রলয়েডদেরই দান।[১]

প্রোটো-দ্রাবিড়—প্রোটো-অস্ট্রলয়েডদের পরে ভারতে আসে প্রোটো-দ্রাবিড় বা আদি-দ্রাবিড় বা প্রত্ন-দ্রাবিড়। পণ্ডিতরা কেউ কেউ মনে করেন[২] প্রোটো-অস্ট্রলয়েডরা এসেছিল ভারতের উত্তর-পূর্ব[৩] সীমান্ত দিয়ে আর আদি-দ্রাবিড়রা এসেছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে। সেইজন্য, অনুমান করা হয় তারা আগে পরে না এসে একই সঙ্গেও ভারতে প্রবেশ করতে পারে।

ইন্দো-মেডিটারেনিয়ান—কোনো কোনো পণ্ডিতের অভিমত আদি-দ্রাবিড়রা ছিল প্রাচীন সুমেরীয় বাবিলনীয় ইজিপ্‌শিয়ান প্রভৃতি জাতির জ্ঞাতি। এরা ইউরোপের মেডিটারেনিয়ান জাতির পূর্বজদের জ্ঞাতি বলে এদের ইন্দো-মেডিটারেনিয়ান বলা যেতে পারে।[৪]

এদের জ্ঞাতি—অনুমান করা হয় এই ইন্দো-মেডিটারেনিয়ান বা দ্রাবিড়দের জ্ঞাতিরা ইরাণ, ইরাক, এসিয়ামাইনর প্রভৃতি দেশে এবং গ্রীসে ও গ্রীক দ্বীপপুঞ্জে বাস করত।[৫]

বেদের অসুর—কোনো কোনো পণ্ডিতের ধারণা বেদপন্থী আর্যরা এই দ্রাবিড়দেরই অসুর বলতেন।[৬]

আদি-দ্রাবিড় ও মোহেন-জো-দড়ো-হড়প্পা— অনুমান আদি-দ্রাবিড়দের মধ্যেও নানা জন ছিল এবং কোনো কোনো জন সভ্যতার নীচু স্তরেই ছিল। আবার কোনো কোনো জন উন্নত সভ্যতার অধিকারী ছিল। অনুমান করা হয় এদের সভ্যতা ছিল নগর-কেন্দ্রিক। অনেকের ধারণা মোহেন-জো-দড়ো ও হড়প্পার বিরাট নগরগুলি আদি-দ্রাবিড়দেরই কীর্তি।[৭]

হল (Hall) মনে করেন দ্রাবিড়রা সিন্ধু-উপত্যকায় প্রথমে তাদের সভ্যতা গড়ে তোলে। এদেরই একটা দল এই সভ্যতাকে নিয়ে যায় সুমেরদেশে এবং এই দলই সুমেরীয় নামে পরিচিত হয়। অর্ধযাযাবর সেমিটিকরা এই সুমেরীয়দের (সৌমারদের) কাছ থেকেই সভ্য জীবনযাত্রার অনেক বিষয় শিক্ষা করে। তাদের কাছ থেকে লিপিকৌশল, নগরপত্তন, পাথর দিয়ে বাড়ী তৈরি প্রভৃতি নানা বিদ্যা শেখে।[৮]

মোহেন-জো-দড়ো ও হড়প্পা সম্বন্ধে মতভেদ—মোহেন-জো-দড়ো ও হড়প্পার নগর

১ ভা স সা, পৃ ১৫ ২ ঐ

৩ তবে হাটন (Hutton), বিরজাশঙ্কর গুহ প্রমুখ পণ্ডিতেরা মনে করেন প্রোটো-অস্ট্রলয়েডরা ভারতে প্রবেশ করেছিল পশ্চিম দিক্ থেকে। দ্রঃ—V. A., Ch. 8, p. 142 ৪ ভা বা বা, সা প, ১৩৫৫, পৃ ২৪৮

৫ ভা স সা, পৃ ১৫ ৬ D. E. I. C, pp. 54-56 ; ভা বা বা, সা প, ১৩৫৫, পৃ ২৪৮

৭ ভা স সা, পৃ ১৬ ৮ B. Ph. V. U. p 10

কাদের সৃষ্টি এ সম্বন্ধে কিন্তু যথেষ্ট মতভেদ আছে। ধ্বংসাবশেষের মধ্যে লিপিযুক্ত যে-সব সিল পাওয়া গেছে সেইগুলির লিপির সঠিক পাঠোদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা সম্ভবপর নয়। স্বামী শঙ্করানন্দের গবেষণা এ সম্পর্কে নূতন তথ্যের সন্ধান দিয়েছে।[১] স্বামীজী মোহেন-জো-দড়োর অধিকাংশ সিলের পাঠোদ্ধার করতে পেরেছেন বলে দাবি করেন।[২] স্বামীজীর সিদ্ধান্ত মোহেন-জো-দড়ো আর্যভাষীদেরই কীর্তি।

নরকঙ্কাল—মোহেন-জো-দড়ো ও হড়প্পাতে যে ক'টি নরকঙ্কাল পাওয়া গেছে কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে তার মধ্যে নিম্নলিখিত বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর মানুষের কঙ্কাল আছে। যথা—(১) আদি-অস্ট্রেলীয় বা প্রোটো-অস্ট্রলয়েড (২) মেডিটারেনিয়ান (৩) আলপাইন এবং (৪) মোঙ্গল-আলপাইন (Mongoloid Alpine)।[৩]

কঙ্কালের সাক্ষ্য থেকে বোঝা যায়, নগরে নানা জাতীয় লোকের বাস ছিল। আর তাদের মধ্যে আদি-দ্রাবিড়রাও ছিল।

আদি-দ্রাবিড়দের বসতি—আদি-দ্রাবিড়রা মনে হয় প্রধানতঃ পশ্চিম- ও দক্ষিণ-ভারতেই বাস করত।[৪] তবে এদের কয়েকটি দল পূর্বভারতের দিকেও এগিয়ে গিয়ে বসতি স্থাপন করে, তারা বর্তমান আসাম প্রান্তেও উপনিবেশ স্থাপন করেছিল এ রকম কিংবদন্তী আছে।[৫] অনুমান করা হয় আদি-অস্ট্রেলীয়দের সঙ্গে এদের সর্বত্রই অল্পাধিক রক্তের সংমিশ্রণ হয়েছিল।[৬]

স্বভাবচরিত্র—পরবর্তী দ্রাবিড়দের দেখে এবং তাদের সাহিত্য পর্যালোচনা করে আদি-দ্রাবিড়দের স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে একটা আন্দাজ করা হয়। তারা কর্মিতকর্মা মানুষ, শিল্পীর জাত, ভাবপ্রবণ ও মরমী (mystic)। আধ্যাত্মিক বিশ্বাস যেমন তাদের মধ্যে যথেষ্ট ছিল, তেমনি ছিল তাদের সজ্ঞাশক্তি।[৭]

সমাজ ও ধর্ম—আদি-দ্রাবিড়দের ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধেও প্রধানতঃ পরবর্তী দ্রাবিড়দের ধর্ম ও সমাজ দেখে একটা অনুমান করা হয়। মনে হয় আদি-দ্রাবিড়দের কোনো কোনো দল ছিল মাতৃতন্ত্র এবং কোনো কোনো দল পিতৃতন্ত্র। কেন না পরবর্তী দ্রাবিড়দের মধ্যেও তাই দেখা যায়।

পরবর্তী দ্রাবিড়দের দেবমণ্ডলে দেবীদের সংখ্যা এবং প্রভাব বেশী।[৮] অনুমান করা যায় আদি-দ্রাবিড়দের দেবমণ্ডলেও তাই ছিল। আমরা এদের জাতিদের বাসভূমি এশিয়া-

---

১ দ্রঃ R. C. P. I. ২ দ্রঃ Indus People Speak ৩ H. C., p. 28

৪ ভা স সা, পৃ ১৩ ৫ ভা বা স, সা প, ১৩৫৪, পৃ ২৫৮

৬ ভা স সা, পৃ ১৩ ৭ ঐ ৮ V. G. S. I., pp. 17-18

মাইনর প্রভৃতি অঞ্চলে দেবীপূজার যথেষ্ট প্রচলন লক্ষ্য করে এসেছি। তার থেকেও এই অনুমানের সমর্থন পাওয়া যায়।

দ্রাবিড়দের দেবীপূজা ও অন্যান্য পূজা—লক্ষ্য করা যায় পরবর্তী দ্রাবিড়দের বিভিন্ন দেবীপূজার মূলে আছে ভয়। সাধারণ লোকেরা এই-সব দেবীদের অত্যন্ত হিংস্র ও ঈর্ষাপরায়ণ মনে করত। তাদের ধারণা ছিল পূজা না পেলেই এরা অনিষ্ট করবে। যাতে অনিষ্ট না করে সেইজন্য ভয়ে ভয়ে এদের পূজা করত। সেই একই কারণে তারা ভূতপ্রেত দৈত্যদানবেরও পূজা করত। আর সে-সব পূজার প্রধান অঙ্গ ছিল পশুবলি।[১]

এ ছাড়া পরবর্তী দ্রাবিড়দের মধ্যে সর্পপূজা ও বৃক্ষপূজার প্রচলন ছিল। অনুমান হয় আদি-দ্রাবিড়দের মধ্যেও তাই ছিল।

মোহেন-জো-দড়ো ও হড়প্পার ধর্ম—মোহেন-জো-দড়ো ও হড়প্পাকে যদি আদি-দ্রাবিড়দেরই কীর্তি বলে ধরা হয় তা হলে সেই সূত্র থেকে তাদের ধর্মেরও সামান্য সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

মোহেন-জো-দড়োতে যে-সব সিল, মূর্তি প্রভৃতি পাওয়া গেছে তা নিয়ে বিচার করে অনেকে অনুমান করেন ওখানে মাতৃকা-দেবীর পূজা হত; তা ছাড়া, একজন পুরুষ-দেবতারও পূজা হত। এঁকে পরবর্তী কালের শিবের আদিরূপ মনে করা হয়। এ ছাড়া পশু বা পশুদেবতার, বৃক্ষ বা বৃক্ষদেবতার, সর্প বা সর্পদেবতার এবং লিঙ্গ- ও যোনি-প্রতীকের পূজা হত। কতকগুলি পাথরেরও পূজা হত। সম্ভবতঃ এগুলিকে কোনো কোনো দেবতা বা অপদেবতার আবাসস্থল মনে করা হত। অনুমান করা হয় মোহেন-জো-দড়োর লোকেরা ভূতপ্রেত, মন্ত্রতন্ত্র, কবচতাবিজ এ-সবে বিশ্বাস করত। আর সম্ভবতঃ তারা হঠযোগও জানত।[২]

আদি-দ্রাবিড় ও দেবমূর্তি—কোনো কোনো পণ্ডিতের অনুমান আদি-দ্রাবিড়রাই দেবদেবীর মূর্তিনির্মাণ এবং দেবতাকে পুষ্পাঞ্জলিদান এই দুটি ব্যাপারের প্রবর্তক।[৩] বলাই বাহুল্য, অনুমান প্রমাণ নয়, আর এ-সব ব্যাপারে মতভেদও থাকে।

আলপাইন—আদি-দ্রাবিড়দের পরে এবং নর্ডিকদের আগে যারা ভারতে আসে তাদের বলা হয় আলপাইন (Homo Alpinus) কেউ কেউ এদের বলেন আলপো-দীনারীয়। কারণ, পূর্ব-ইউরোপের দীনারীয়দের সঙ্গে এদের সুস্পষ্ট সম্বন্ধ রয়েছে। আবার কেউ কেউ এদের নাম দেন ইন্দো-আলপাইন। কোনো কোনো পণ্ডিতের ধারণা এই আলপাইনরাই বাঙ্গালী, গুজরাটি মারাঠী প্রভৃতি কয়েকটি জাতির পূর্বজ।[৪]

১ E. R. E., Vol. XI, p. 91 (দ্রঃ Shaivism), V. G. S. I., p. 18

২ H. C, p. 23 ৩ ভা মা বা, সা প, ১৩৫৫, পৃ ২৫৯ ৪ ঐ, পৃ ২৫১

আলপাইনদের আদি-ভূমি—আদি-দ্রাবিড়দের মতো এই আলপাইনরাও আসে বিভিন্ন দলে। কিন্তু এল কোথা থেকে? সাধারণতঃ মনে করা হয় এরা ভারতে এসেছে তাকলামাখান-মরুভূমি ও পামীর-মালভূমি থেকে।[১] তবে আল্পস-পর্বত, দক্ষিণ-আরব ও ইউরোপের পূর্বদেশগুলিতেও এদের বাস ছিল।[২]

তাদের ভাষা— আলপাইনদের ভাষা কি ছিল এ বিষয়ে পণ্ডিতরা একমত নন। একদল এদের আর্য- বা ইন্দো-ইউরোপীয়-ভাষাভাষী বলেন।[৩] কিন্তু অন্যদের মতে এরা আর্যেতরভাষাভাষী।[৪]

আলপাইন ও ব্রাত্য—কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে বেদপন্থী আর্য, দ্রাবিড় এবং নিষাদের সঙ্গে এই আলপাইনদের সংমিশ্রণে যে-ইন্দো-আর্যদের (Indo-Aryans) উদ্ভব হয়েছে তারাই বেদপন্থী আর্যদের এলাকার বাইরেকার আর্য বা বহিরার্য।[৫] এরা বেদপন্থী ছিল না। শ্রুতিগ্রন্থে এদেরই ব্রাত্য বলা হয়েছে।[৬]

আলপাইনদের বসতি—অনুমান করা হয় যখন আলপাইনরা ভারতে প্রবেশ করে তখন গাঙ্গেয়-উপত্যকায় দ্রাবিড়-পূর্ব জাতির প্রাধান্য ছিল; সিন্ধু-উপত্যকায় ইন্দো-মেডিটারেনিয়ান জাতির আধিপত্য ছিল; আর দক্ষিণ-ভারত ছিল প্রত্ন-দ্রাবিড়দের অধিকারে। আলপাইনরা বিভিন্ন দলে বর্তমান গুজরাট অঞ্চলে, মহারাষ্ট্রদেশে, দক্ষিণে কর্ণাট পর্যন্ত এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। এ ধারে কয়েক দল মধ্যপ্রদেশ হয়ে রাঢ়, সুহ্ম, বঙ্গ, পুণ্ড্র প্রভৃতি অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে।[৭] আবার ও দিকে বিহার হয়ে কাশী পর্যন্ত এদের বাস ছিল।[৮] তা ছাড়া পূর্বদিকে আসামের কামরূপ পর্যন্ত এদের বসতি ছিল মনে করা হয়। ওড়িশাতেও এরা বসতি স্থাপন করে। উচ্চশ্রেণীর ওড়িশাবাসীদের এরাই পূর্বজ।[৯]

ইন্দো-আফগান—আলপাইনরা উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে। ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে এবং বেলুচিস্তানে বেদপন্থী আর্য, আবেস্তাপন্থী আর্য এবং দ্রাবিড়দের সঙ্গে এদের সংমিশ্রণের ফলে মাঝামাঝি ইন্দো-আফগানদের উদ্ভব হয়েছে।[১০] গুজরাটীদের পূর্বজ প্রাচীন ভারতের আর্যভাষাভাষী সৌরাষ্ট্র এবং আভীরদের এই ইন্দো-আফগান গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয়।[১১]

১ I. A. R., p. 73 ২ বা ই, পৃ ৪৩ ৩ I. A. R. p. 74

৪ বাঙ্গলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, পৃ ৫১ ৫ I. A. R., p 75 ৬ Ibid, pp. 43-44

৭ ভা মা বা. সা প, ১৩৪৪, পৃ ২৪৩ ৮ H. O., pp 39-40

৯ ভা মা বা. সা প, ১৩৪৪, পৃ ২৪৩ ১০ I. A. R., p. 75 ১১ Ibid, p. 105

আভীরদের সম্বন্ধে অবশ্য পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ কেউ মনে করেন আলেক্‌জেণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময়ে আভীররা মধ্য-এসিয়া থেকে ভারতে প্রবেশ করে। মহাভারতে এবং পতঞ্জলির মহাভাষ্যে এদের শূদ্র বলা হয়েছে।[১]

আলপাইন ও মোহেন-জো-দড়ো—অনুমান করা হয় মোহেন-জো-দড়োতে বিভিন্ন স্তরে যে-ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে তার মধ্যে শেষের দিককার স্তরে এই আলপাইন বা আলপো-দীনারীয় নরগোষ্ঠীর কীর্তিচিহ্ন থাকা সম্ভবপর।[২]

আলপাইনদের ধর্মাদি—আলপাইনদের ধর্ম, তাদের সংস্কৃতি কেমন ছিল জানবার সরাসরি কোনো উপায় নেই। তাদের আদি-বাসভূমিতে পরবর্তীকালে যে-সব মালমশলা পাওয়া গেছে সে-সব বৌদ্ধযুগের। এই-সব মালমশলার সাহায্যে আলপাইনদের ধর্ম, সংস্কৃতি প্রথমে কি রকম ছিল জানা যায় না।[৩]

ভারতে আসার পর আলপাইনদের ধর্ম, সংস্কৃতি প্রভৃতি কি রূপ নিয়েছিল সে সম্বন্ধেও কিছু জানার উপায় নাই। বেদপন্থী বা আবেস্তাপন্থী আর্যদের ধর্মাদি সম্বন্ধে যেমন বেদ বা আবেস্তা থেকে নানা তথ্য পাওয়া যায় এদের ধর্মাদি সম্বন্ধে সে রকম কিছুই পাওয়া যায় না।[৪]

বেদবাহ্য আর্যদের মধ্যে শক্তিপূজা—আলপাইনদের থেকে বেদবাহ্য আর্য বা বহিরার্যদের উদ্ভব হয় এই মতের উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত এই বেদবাহ্য আর্যদের আরাধ্য দেবতাদি সম্পর্কে সূত্রবাদির সূত্র ধরে বিচার করে কিছু কিছু অনুমান করেছেন। প্রফেসর গার্বে (Garbe), রমাপ্রসাদ চন্দ প্রমুখ পণ্ডিতেরা মনে করেন কৃষ্ণপূজা বা বাসুদেবপূজা তথা পঞ্চরাত্র-মত বেদবাহ্য আর্যদের মধ্যেই উদ্ভূত হয়।[৫] চন্দ মহাশয়ের মতে এদের মধ্যে এক সময়ে মাতৃতন্ত্র বা মাতৃক্রম সমাজব্যবস্থা ছিল; শক্তিপূজাও সেই কারণে এদের মধ্যে উদ্ভূত হয়।[৬]

আদি-নর্ডিক—আলপাইনদের পরে ভারতের মহামানবের সাগরে এসে মিলল আদি-নর্ডিকদের ধারা। এরাই বেদপন্থী আর্য। ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপাদান জুগিয়েছে সব ধারার মানুষ কিন্তু তাকে গড়ে তোলার প্রধান কৃতিত্ব এই বেদপন্থীদের। আজও ভারতের অধিকাংশ মানুষ প্রধানতঃ এদের কীর্তি নিয়েই গর্ব করে। ভারতের ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, সোজা কথায়, তার সভ্যতা ও সংস্কৃতি নিয়ে যে-কোনো আলোচনা করাই হোক না কেন সাধারণতঃ বেদের থেকেই তার সূচনা করা হয়।

---

১ G. B. I, pp. 171-72 ২ বা ই, পৃ ৭৬; H. C., p. 28 ৩ I. A. R., p. 79

৪ Ibid ৫ Ibid, p. 99 ৬ Ibid, p. 166

মঙ্গোল—এদের সম্বন্ধে আলোচনা সুরু করার আগে প্রাচীন ভারতের শেষ আগন্তুক মঙ্গোল বা ভোটচীনদের কথাটা বলে নেওয়া যাক। ভোটচীন-গোষ্ঠীর লোকদের আদি-ভূমি য়াঙ্-ৎসে-কিয়াং নদীর উৎপত্তিস্থলে। ভোট বা তিব্বত থেকে এদের কতকগুলি দল ভারতে প্রবেশ করে। প্রথমে আসামে এবং সেখান থেকে উত্তর- ও পূর্ব-বঙ্গে উপনিবেশ স্থাপন করে। অনুমান করা হয় ভোটচীন-গোষ্ঠীর যে-সব লোকেরা ভারতে আসে তারা ছিল স্বভাবতঃই প্রফুল্লচিত্ত, কর্মকুশল, পরিশ্রমী ; কিন্তু তাদের কল্পনাশক্তি ছিল না[1]।

কিরাত—সংস্কৃত সাহিত্যে বহুবর্ণিত কিরাতরাও মঙ্গোল। চীন, ভোট এবং অন্যান্য মঙ্গোল জনেরা এদের জ্ঞাতিগোষ্ঠী।[2]

দেবীপূজার ক্ষেত্রে কিরাতদের স্থান সামান্য নয়। স্বয়ং দেবীকে বহু স্থলে কিরাতী বা কিরাতিনী বলা হয়েছে। বিখ্যাত-দেবীপীঠ কামরূপ। একে যোগিনীপীঠও বলা হয়। যোগিনীতন্ত্রে বলা হয়েছে এই যোগিনীপীঠের ধর্ম কৈরাতজ।[3] তান্ত্রের সনাতন ধর্ম এই কৈরাতজ ধর্মকে আপনার অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।

আর্যেতর লোকদের দান—এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আর্যেতর জনদের দান প্রভূত। কেউ কেউ অনুমান করেন ধর্মের ক্ষেত্রে শিব, দেবী, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাদের ভাবরূপ-গঠনে আর্যেতর ভাবকল্পনা প্রচুর উপাদান জুগিয়েছে। পূজা ব্যাপারটাই আর্যেতর লোকদের। পূজার অনেক উপকরণ, যেমন নারকেল, পান এ-সবও ওদের। সংস্কৃত পুরাণ-ইতিহাস-মহাকাব্যাদির অনেক আখ্যায়িকা, রূপক ইত্যাদি আর্যেতর লোকদের কাছ থেকে এসেছে। যোগসাধনা, কর্মবাদ এবং জন্মান্তরবাদও ওদের। ভারতের নানা স্থানে এয়োরা মাথায় সিঁদুর পরেন। বিয়ে প্রভৃতি ব্যাপারে হলুদ এবং সিঁদুর মাঙ্গল্য বলে গণ্য হয়। এ-সব আর্যেতর লোকদের দান। এ ছাড়া, ব্যাবহারিক জীবনের উপযোগী নানা বস্তু, নানা শিল্পদ্রব্যও ওদের সৃষ্টি। এমন কি ভারতবাসীর সাধারণ পরিধেয় ধুতি এবং শাড়ীও আর্যেতর লোকদের কাছ থেকেই পাওয়া গেছে মনে করা হয়।[4]

বেদপন্থীদের বসতি—এবার ফিরে আসা যাক বেদপন্থী আর্যদের কথায়। ঋগ্‌বেদের সূক্ত থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি আলোচনা করে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন ঋগ্‌বেদের সময়ে বেদপন্থীরা যে-অঞ্চলে বাস করত সে-অঞ্চলের মধ্যে ছিল আধুনিক আফগানিস্তান, অবিভক্ত পাঞ্জাব, সিন্ধু-প্রদেশ ও রাজপুতানার কতক অংশ, উত্তরপশ্চিম-সীমান্ত-প্রদেশ, কাশ্মীর এবং সরযূ-নদীর তীর পর্যন্ত পূর্ব-ভারত।[5]

১ ভা স সা, পৃ ১৮ ২ Kirāta-Jana-Kṛti, p. 16

৩ শিবেশি ! যোগিনীপীঠে ধর্ম্মঃ কৈরাতজো মতঃ ।—যোগিনীতন্ত্রবচন, উদ্ধৃত, M. G. K, p. 111.

৪ I. A. H., p. 84 ৫ V. A., p. 244

এই অঞ্চলের বেশীর ভাগ অংশকে বলা হত সপ্তসিন্ধু।[১] ঋগ্‌বেদের সপ্তসিন্ধু সাতটি নদী যথা—শুতুদ্রী, বিপাশ, পরুষ্ণী (রাবি), অসিক্নী (চেনাব), বিতস্তা, সিন্ধু এবং সরস্বতী।[২] অনুমান করা যায় এই সপ্তসিন্ধু-বিধৌত অঞ্চলটিই বৈদিক আর্যদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র ছিল।

সেই প্রাচীন যুগে সাধারণতঃ নদীর ধারে ধারেই গড়ে উঠত জনপদ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র। আর্যদের ভারতবর্ষেও তাই হয়েছিল। আর্যরা সপ্তসিন্ধু অঞ্চল থেকে ক্রমশ গঙ্গাযমুনার উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়ে। ঋগ্‌বেদে তার আভাসও পাওয়া যায়। নদীসূক্তে অন্যান্য নদীর সঙ্গে গঙ্গাযমুনারও স্তুতি করা হয়েছে।[৩]

আর্যদের বিভিন্ন জন—আর্যদের মধ্যে ছিল নানা জন। ঋগ্‌বেদে যদু, ভরত, তৃৎসু, পূরু, তুর্বশ, অনু, দ্রুহ্য, বৈকর্ণ প্রভৃতি জন-এর উল্লেখ পাওয়া যায়।[৪] ব্রাহ্মণগ্রন্থে কুরু, পাঞ্চাল প্রভৃতি আরও বিভিন্ন জন-এর উল্লেখ আছে।

আর্যরা ভারতে এসেছে বাইরের থেকে এই মত অনুসারেও তাদের বিভিন্ন জন স্বীকৃত। এই মতের সমর্থক পণ্ডিতেরা বলেন আর্যরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দলে ভারতে এসেছে। সব চেয়ে আগে যারা এসেছিল তাদের সঙ্গে সব চেয়ে পরে যারা এল তাদের আচার, অনুষ্ঠান, ধর্ম, ভাষা সব ব্যাপারেই অনেক পার্থক্য ছিল।[৫]

এই জনগুলির পরস্পরের মধ্যে সময় সময় সংঘর্ষও হত। ঋগ্‌বেদেই রাজা সুদাসের সঙ্গে দশ জন রাজার সংগ্রামের বিবরণে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।[৬]

আর্যদের সমাজ—বেদে আর্যদের সমাজের যে-পরিচয় মিলে তা পিতৃতন্ত্র। তবে একদা কোনো কোনো আর্য জন-এর মধ্যে যে মাতৃপ্রাধান্য তথা মাতৃতন্ত্র সমাজব্যবস্থা ছিল এরূপ অনুমানের অনুকূল কিছু কিছু নিদর্শন বেদেই পাওয়া যায়।

মাতৃপ্রাধান্যের নিদর্শন—ঋগ্‌বেদে দীর্ঘতমা মামতেয় ঔচথ্য নামে একজন ঋষির উল্লেখ আছে। দুটি মন্ত্রে ঋষির ঔচথ্য এই পিতৃনামের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৭] কিন্তু আরও কয়েকটি মন্ত্রে[৮] দেখা যায় শুধু মামতেয় এই মাতৃনামেরই উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো পুরুষ-মানুষের মাতৃনামে পরিচয় দেওয়াটাকে মাতৃপ্রাধান্যের নিদর্শন বলে গণ্য করা যায়।

১ A. H. I., p. 28

২ V. A., pp. 243-44 ; Vedic Index, p. 424 ; সায়ণের মতে নদীগুলি এই— গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, পরুষ্ণী, অসিক্নী-সহ মরুদ্‌বৃধা, বিতস্তা- ও সুষোমা-সহ আর্জীকীয়া (দ্রঃ ঋ বে ১০।৭৫।৫-ভাষ্য)

৩ ঋ বে ১০।৭৫।৫-৬ ৪ ঐ ১।১০৮।৮; ৬।৩৩।১১, ৭।১৮।১১, ১৩

৫ E. R. E., Vol. II, p. 540 (দ্রঃ Bhakti-Mārga) ৬ ঋ বে ৭।৩৩।৩, ৫

৭ ঐ ১।১৫৮।১, ৬ ৮ ঐ ১।১৪৭।৩, ১৫২।৬, ১৫৮।৬, ৪।৪।১৩

এই রকম মাতৃনামে পরিচয়ের নিদর্শন আরণ্যক, উপনিষদ্ এবং শ্রৌতসূত্রাদিতেও পাওয়া যায়।

ঐতরেয়-আরণ্যকে[1] রাজা ঐতরেয় মহিদাসের নাম পাওয়া যাচ্ছে। সাংখ্যায়ন-আরণ্যকে জাতূকর্ণ্য কাত্যায়নীপুত্র[2] নামক এক ব্যক্তির উল্লেখ আছে।

বোধায়ন-শ্রৌতসূত্রে[3] ঔপমন্যবীপুত্র এই মাতৃনামপরিচায়ক নাম বা নামের বিশেষণটি পাওয়া যাচ্ছে।

তবে এই ধরণের বেশীর ভাগ নাম পাওয়া যাচ্ছে বৃহদারণ্যক-উপনিষদে। এগুলি আচার্যদের নাম বা নামের বিশেষণ। কাণ্ব শাখার একটি মন্ত্রে (৫।১।১) কৌরব্যায়ণীপুত্র এই নাম বা নামের বিশেষণটি পাওয়া যাচ্ছে। মাধ্যন্দিন শাখার আলোচ্য উপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায় চতুর্থ ব্রাহ্মণ-এ নিম্নলিখিত নাম বা নামের বিশেষণগুলি আছে: আত্রেয়ীপুত্র, আর্তভাগীপুত্র, আলম্বীপুত্র, আলম্বায়নীপুত্র, কার্শকেয়ীপুত্র, কাপীবালাক্যামাঠরীপুত্র, কৌৎসীপুত্র, ক্রৌঞ্চিকীপুত্র, গার্গীপুত্র (এই নামে তিনজন আচার্য ছিলেন), গৌতমীপুত্র, জায়ন্তীপুত্র, প্রাচীপুত্র, পারাশরীকৌণ্ডিনীপুত্র, পারাশরীপুত্র, পৈঙ্গীপুত্র, বাডেয়ীপুত্র, বৌধীপুত্র, ভারদ্বাজীপুত্র, (একাধিক আচার্যকে ভারদ্বাজীপুত্র বলা হয়েছে), ভালুকীপুত্র, মাণ্ডূকীপুত্র, মাণ্ডূকায়নীপুত্র, মৌষিকীপুত্র, বাৎসী মাণ্ডবীপুত্র, বার্কারুণীপুত্র, বার্ষগণীপুত্র, বৈদভৃতীপুত্র, শাণ্ডিলীপুত্র, শাণ্ডিলীপুত্র, শালঙ্কায়নীপুত্র, শৌনকীপুত্র, সাঞ্জীবীপুত্র, সাংকৃতীপুত্র, পৌতীপুত্র।[4]

ছান্দোগ্য-উপনিষদে ঐতরেয় মহিদাস (৩।১৬।৭), দেবকীপুত্র কৃষ্ণ (৩।১৭।৬) এবং সত্যকাম জাবাল (৪।৪) এই তিনটি নাম পাওয়া যায়। লক্ষণীয় প্রত্যেকটি নামের সঙ্গেই মাতৃপরিচায়ক বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে।

দেবমণ্ডলে—আর্য দেবমণ্ডলেও মাতৃপ্রাধান্যের কিছু কিছু নিদর্শন আছে। আদিত্য এবং দৈত্য এই শব্দদুটি মাতৃনামের পরিচায়ক। অদিতির পুত্র আদিত্য এবং দিতির পুত্র দৈত্য। কাজেই দেখা যাচ্ছে দেবতাদের এবং দৈত্যদের পরিচয় রয়েছে মাতৃনামে। অনুমান করা যায় যখন আর্যদের মধ্যে মাতৃপ্রাধান্য ছিল অথবা তার স্মৃতি প্রবল ছিল সেই সময়ে আদিত্য এবং দৈত্য শব্দ দুটি দেবতা ও দৈত্যের পরিচায়ক শব্দরূপে প্রথমে ব্যবহৃত হয়েছিল।

শ্রুতিগ্রন্থে[5] দেখা যায় অম্বিকাকে প্রথমে রুদ্রের ভগ্নী বলা হয়েছে এবং পরে বলা হয়েছে স্ত্রী। ভগিনীবিবাহ মাতৃতন্ত্র জনদের সমাজে প্রাচীন কালে প্রচলিত ছিল।

---

১ ঐ আ ২।১।৮, ৩।৭ ২ শা আ ৮।১০ ৩ Vedic Index. p 127 ৪ শ ব্রা ১৪।৫।৫।৩০-৩৩
৫ বা সং ৩।৫৭, তৈ ব্রা ১।৬।১০

বহিরার্যদের মধ্যে মাতৃক্রম— বৌদ্ধসাহিত্যে ভগিনীবিবাহের যে-সব কাহিনী আছে সেগুলি নিয়ে বিচার করে রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় অনুমান করেছেন বহিরার্যদের মধ্যে মাতৃক্রম (mother-kin) সর্বজনীন ছিল।[১] একটি বহিরার্য জন-এর মধ্যে যে মাতৃক্রম প্রচলিত ছিল তার সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে মহাভারতে। এই জনটি আরট্ট-বাহিক জন। এই জন-এর লোকদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে এদের সম্পত্তির ভাগীদার ভাগিনেয়রা, পুত্রেরা নয়।[২]

মহাভারতে পাণ্ডুপুত্রদের বিশেষ করে তৃতীয় পাণ্ডবের পার্থ বা কৌন্তেয় এই মাতৃনাম-পরিচায়ক নাম প্রায়ই ব্যবহৃত হয়েছে। এ ব্যাপারটিকে মাতৃপ্রাধান্যের স্মারক মনে করা যায়।

মাতৃপ্রাধান্যের পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন—মাতৃপ্রাধান্যের স্মারক পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনও কিছু কিছু পাওয়া যায়। খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকের ঘসুণ্ডি শিলালেখে দেখা যায় অশ্বমেধযজ্ঞকারী সর্বতাত রাজা পারাশরীপুত্র বলে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন।[৩]

খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকের দুজন সাতবাহন রাজার নামের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তাঁদের মাতৃনাম। এঁদের একজন গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী; আরেকজন তাঁরই পুত্র বাসিষ্ঠীপুত্র পুলুমায়ী।[৪] দেখা যাচ্ছে এই দুজন রাজা মায়ের নামে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন।

ভারহুতের স্তম্ভগাত্রলিপিতে (খৃঃ পূঃ ১ম শতকের লেখাই) তিনজন শুঙ্গ রাজার মাতৃনামে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এই তিন জন রাজা—গার্গীপুত্র বিশ্বদেব, গৌপ্তীপুত্র অঙ্গারদ্যুৎ আর বাৎসীপুত্র ধনভূতি।[৫] শুঙ্গ রাজাদের ব্রাহ্মণবংশীয় মনে করা হয়।[৬]

অযোধ্যায় প্রাপ্ত এক শিলালিপিতে (১ম খৃষ্টাব্দ এ রকম সময়কার) পুষ্যমিত্রবংশীয় এক ব্যক্তি কৌশিকীপুত্র বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। সম্ভবতঃ এঁর নাম ছিল ধনদেব আর ইনি ছিলেন ঐ অঞ্চলের রাজা।[৭]

নাগার্জুনীকোণ্ডা স্তূপগাত্রলিপিতে (খৃঃ ৩য় শতক) দেখা যায় ইক্ষাকুবংশীয় রাজা শান্তমূলকে বাসিষ্ঠীপুত্র বলা হয়েছে এবং রাজা বীরপুরুষদত্তকে বলা হয়েছে মাঠরীপুত্র।[৮] নাগার্জুনীকোণ্ডাতে প্রাপ্ত অন্য আরেকটি প্রস্তরলিপিতেও[৯] বাসিষ্ঠীপুত্র শান্তমূল এবং মাঠরীপুত্র বীরপুরুষদত্তের উল্লেখ আছে।

১ I. A. R., p. 156 ২ তস্মাত্তেষাং ভাগহরা ভাগিনেয়া ন সূনবঃ—মহা ৮।৪৪।১৩

৩ কারিতোয়ং রাজ্ঞা ভাগবতেন গাজায়নেন পারাশরীপুত্রেণ সর্বতাতেন অশ্বমেধযাজিনা—দ্রঃ S. I., p. 91

৪ A. H. I., p 115 ৫ S. I., p. 90 ৬ A. H. I., p. 113

৭ S. I., p. 96 ৮ S. I., p. 221 ৯ S I., p. 231

ভিটাতে প্রাপ্ত একটি সিলে উৎকীর্ণ লিপিতে আছে 'মহারাজ গৌতমীপুত্রস্য শ্রীশিবমেঘস্য'। মার্শেল অনুমান করেন এই লিপি দ্বিতীয় বা তৃতীয় খৃষ্টাব্দের।[১] দেখা যাচ্ছে ঐ সময়কার রাজা শিবমেঘ পরিষ্কার মায়ের নামেই নিজের পরিচয় দিচ্ছেন।

আর্যদের সব জন-এর মধ্যে না হোক কোনো কোনো জনের মধ্যে যে একদা মাতৃপ্রাধান্য ছিল পূর্ববর্তী নিদর্শনগুলি তার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

বৈদিক দেবমণ্ডল—এবার ফিরে আসা যাক বেদপন্থী আর্যদের কথায়। বৈদিক দেবমণ্ডলে দেখা যায় পুরুষদেবতার প্রাধান্য। বেদসংহিতায় উষা, পৃথিবী, বাক্, সরস্বতী, রাত্রি, ধীষণা, ইলা, সিনিবালী, মহী, ভারতী, অরণ্যানী, নির্ঋতি, মেধা, পৃশ্নি, সরণ্যু, রাকা, সীতা, শ্রী প্রভৃতি দেবীদের নাম অবশ্য পাওয়া যায়। এ ছাড়া শ্রুতির ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদ্ অংশেও অম্বিকা, ইন্দ্রাণী, রুদ্রাণী, শর্বাণী, ভবানী, কাত্যায়নী, কন্যাকুমারী, উমা, হৈমবতী প্রভৃতি দেবীদের উল্লেখও আছে। তবে মোটের উপর বলা যায় এঁদের কোনো স্বাতন্ত্র্য বা প্রাধান্য নেই।

অবশ্য, এ কথা সাধারণভাবেই সত্য। কেন না, শ্রুতিতেই লক্ষ্য করা যায় ভারতী, সরস্বতী, ইলা প্রভৃতি দেবী আপন অধিকারেই পূজা পেয়েছেন।[২] এঁদের স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করা যায় না।

অদিতি—কিন্তু এই সমস্ত দেবীদের সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন দেবী অদিতি। বৈদিক দেবমণ্ডলে প্রধান পুরুষ-দেবতাদের মতোই এঁর স্বাতন্ত্র্য ও গৌরব। আর্যদের মধ্যে অন্ততঃ তাদের কোনো কোনো জন-এর মধ্যে যে একদা মাতৃপ্রাধান্য ছিল অদিতি সেই কথাটাই স্মরণ করিয়ে দেন।

অদিতিকে নিয়ে কোনো সম্পূর্ণ সূক্ত অবশ্য ঋগ্বেদে পাওয়া যায় না কিন্তু বিভিন্ন সূক্তে অনেকবার (অন্ততঃ ৮০ বার) তার উল্লেখ করা হয়েছে।[৩] এর থেকেই বোঝা যায়, বৈদিক ঋষিরা মাতৃপ্রধান পূর্বপুরুষদের এই সর্বেশ্বরী দেবীকে ভুলতে পারছিলেন না। ভুলতে যে পারছিলেন না অন্য একটি ঘটনা থেকেও তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

অগ্নিষ্টোম একটি ঐকাহিক সোমযাগ। তার উদ্যোগ-আয়োজন-অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিন প্রাতে হত যজ্ঞের আরম্ভসূচক একটি ইষ্টিযাগ। একে বলা হত প্রায়ণীয় ইষ্টি। এই ইষ্টিযাগের দেবতা পথ্যা, অগ্নি, সোম, সবিতা এবং অদিতি। দেবতারা অদিতিকে এক সময় বর দিয়েছিলেন যে তাঁকে নিয়েই যজ্ঞ আরম্ভ হবে। সেই থেকে সোমযজ্ঞের

১ D. H. I., p. 184　　২ A. O. D. V., p. 86　　৩ R. Ph. V. U., p. 215

আরম্ভে অদিতির উদ্দেশে যাগ বিহিত হয়েছে। অদিতিকে চরু দিতে হয়, আর অন্য চারজনকে দিতে হয় আজ্য।[1]

একদা অদিতিই ছিলেন প্রধান দেবতা, সকলের আগে তাঁরই উদ্দেশে যজ্ঞ হত, সোমযাগের আরম্ভে অদিতির উদ্দেশে যাগের ব্যবস্থায় মনে হয় তারই যেন প্রচ্ছন্ন স্বীকৃতি রয়েছে।

সর্বদেবময়ী সর্বেশ্বরী—ঋগ্‌বেদেই অদিতির সর্বদেবময়ী-সর্বেশ্বরী-রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি যে কেবলমাত্র কোনো মাতৃক্রম জন-এর প্রধান দেবতা, মাতৃকা মহাদেবী, তা নয়, পরবর্তী শাক্তশাস্ত্রে যাঁকে ব্রহ্মময়ী বলা হয়েছে তিনি তাও বটেন। বৈদিক ঋষি তাঁকে সেইভাবেই জেনেছেন। বলেছেন[2]—

অদিতি দ্যৌ, অদিতি অন্তরিক্ষ, অদিতি মাতা, পিতা, পুত্র, সমস্ত দেবতা অদিতি, পঞ্চজন[3] অদিতি, যা জাত তা অদিতি, যা জন্মাবে তাও অদিতি।

এই সূক্তের ব্যাখ্যায় কোনো কোনো পণ্ডিত দ্যৌ এবং অন্তরিক্ষ এই শব্দ দুটি চৈতন্যবাচক বলে ধরেছেন।[4] তা হলে অর্থ দাঁড়ায় দেবী অদিতি চিৎস্বরূপিণী। তিনি মাতা, পিতা, পুত্র। সৃষ্টিকর্ত্রীও তিনি, সৃষ্টিও তিনি, সমস্ত দেবতা অদিতি। এর অর্থ সমস্ত দেবতাই ব্রহ্মরূপিণী মহাদেবীর কোনো না কোনো রূপবিশেষ।

কালীর আদিরূপ—কেউ কেউ মনে করেন[5] ঋগ্‌বেদে অদিতির যে-রূপ ব্যক্ত হয়েছে তা কাল তথা কালীর আদিরূপ। কেন না, ঋগ্‌বেদে অদিতির যে-কাজের বিবরণ দেওয়া হয়েছে মহাভারতে দেখা যায় কালেরও সেই কাজ। মহাভারতে আছে—কাল সব প্রাণীর সৃষ্টি করে, আবার কালই তাদের সংহার করে। প্রাণিদের সংহারকারী কালকে আবার কালই দমন করে। জগতে শুভাশুভ বহু ভাব আছে সব কালেরই সৃষ্টি। প্রলয়কালে কালই সমস্ত সংহরণ করে এবং আবার সৃষ্টিকালে কালই সমস্ত সৃজন করে।[6]

---

১ যজ্ঞকথা, পৃ ৭৭

২ অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষমদিতির্মাতা স পিতা স পুত্রঃ।
বিশ্বে দেবা অদিতিঃ পঞ্চজনা অদিতির্জাতমদিতির্জনিত্বম্‌। ঋ বে ১।৮৯।১০

৩ নিরুক্তে (৩।৮) পঞ্চজন শব্দের দুই মতের দুই অর্থ দেওয়া হয়েছে। এক মতে পঞ্চজন অর্থ গন্ধর্ব, পিতৃ, দেব, অসুর ও রাক্ষস। অন্য মতে ব্রাহ্মণাদি চার বর্ণ এবং পঞ্চম বর্ণ নিষাদ এই পঞ্চজন। দ্রঃ N. N., p. 245

৪ A. O. D. V., p. 7   ৫ G. G. I. I., I. H. Q., Vol X. pp. 429-30

৬ কালঃ সৃজতি ভূতানি কালঃ সংহরতে প্রজাঃ। সংহরন্তং প্রজাঃ কালং কালঃ শময়তে পুনঃ।
কালো হি কুরুতে ভাবান্ সর্বান্ লোকে শুভাশুভান্। কালঃ সংক্ষিপতে সর্বাঃ প্রজা বিসৃজতে পুনঃ।
—মহা ভা ১।১।২০৯-২১০ (দ্রঃ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ-সংস্করণ, ১৩৩৮)

ব্রহ্মস্বরূপিণী— কঠোপনিষদে অদিতিকে স্পষ্ট করেই সর্বদেবতারূপিণী এবং ব্রহ্মের অন্যতম রূপ হিরণ্যগর্ভ বলা হয়েছে। বলা হয়েছে সর্বদেবতাময়ী অদিতি হিরণ্যগর্ভরূপে জাত হন। তিনি সর্বপ্রাণী সমন্বিত হয়ে জাত হয়েছেন। তিনি হৃদয়াকাশে অবস্থিতা। হৃদয়াকাশে প্রবেশ করে যিনি তাঁকে এইরূপে দর্শন করেন তিনি এই ব্রহ্মকেই দর্শন করেন।[১]

পরবর্তীকালে তন্ত্রে কুণ্ডলিনীকে সর্বদেবময়ী[২] বলা হয়েছে। কুণ্ডলিনী ব্রহ্মস্বরূপিণী মহাশক্তি। কাজেই, দেখা যাচ্ছে ঐতিহাসিক বিচারে বৈদিক অদিতিই শাক্তদের আরাধ্যা ব্রহ্মস্বরূপিণী মহাশক্তির আদিরূপ।

তা ছাড়া, মহাশক্তি সম্বন্ধে তন্ত্রাদিবিবৃত পরবর্তী কয়েকটি ধারণার সূচনাও বেদে লক্ষ্য করা যায়।

মহাশক্তি— ঋগ্বেদের একটি সূক্তে আছে ঋষি বসিষ্ঠ মিত্র এবং বরুণের সঙ্গে আহ্বান করছেন অদিতিকে। তাতে বলা হয়েছে অদিতিকে সহজে আহ্বান করা যায়। তিনি জ্যোতির্ময়ী এবং অপ্রতিহতা।[৩]

দেবী জ্যোতির্ময়ী, কাজেই চিদ্রূপিণী। তিনি মা। তাই তাঁকে সহজে আহ্বান করা যায়। তিনি অপ্রতিহতা অর্থাৎ তাঁকে কেউ আঘাত করতে পারে না। এর অর্থ তিনি মহাশক্তি, সকল শক্তির উৎস। আঘাত করবার শক্তিও তিনি। কাজেই, কেউ তাঁকে আঘাত করতে পারে না।

দেখা যাচ্ছে ঋষি বসিষ্ঠের সঙ্গে মহাশক্তির যোগাযোগের একটা নিদর্শন রয়েছে ঋগ্বেদেই। এর পরে কালিকাপুরাণ প্রভৃতিতে দেবীর সঙ্গে বসিষ্ঠের যে-যোগাযোগ লক্ষ্য করা যায় তারই সূত্র সূচনা আলোচ্য সূক্তে থাকা অসম্ভব নয়।

অন্য একটি সূক্তে বলা হয়েছে অদিতি জ্যোতির্ময়ী, তিনি জগৎ ধারণ করে আছেন অর্থাৎ জগতের তিনি ধারয়িত্রী বা স্থিতিকারিণী শক্তি। তিনি স্বর্বতী অর্থাৎ তিনি স্বর্গ বা আলোর অধিষ্ঠাত্রী দেবী।[৪]

জগদ্ধাত্রী— অদিতি জগৎ ধারণ করে আছেন এই ভাবটিই পরবর্তীকালের জগদ্ধাত্রীরূপ-কল্পনার মূল মনে হয়। দুর্গাসপ্তশতীতে দুর্গা সম্বন্ধে এই কথাটাই ত বলা হয়েছে— ভগবতী দেবী দুর্গা যাঁর দ্বারা এই জগৎ বিধৃত হয়ে আছে।[৫]

১ যা প্রাণেন সম্ভবত্যদিতির্দেবতাময়ী। গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং যা ভূতেভির্ব্যজায়ত। এতদ্বৈ তৎ।
—ক উপ, ২।১।৭

২ সর্বদেবময়ী দেবী সর্বমন্ত্রময়ী শিবা।— শা তি ১।৪৪ ৩ সুহবা দেব্যদিতিরনর্বা। ঋ বে ৭।৪০।৪

৪ জ্যোতিষ্মতীমদিতিং ধারয়ৎক্ষিতিং স্বর্বতীম্।—ঋ বে ১।১৩৬।৩

৫ দুর্গা ভগবতী দেব্যা যয়েদং ধার্যতে জগৎ।—দু স, ৪।৩৩

অদিতি শব্দের ব্যুৎপত্তি—অদিতি শুধু স্থিতিকারিণী নন, লয়কারিণী বা ধ্বংসকারিণীও বটেন। এটি তাঁর নামেই সূচিত হচ্ছে। অদিতি শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা সবাই একমত নন। কোনো কোনো পণ্ডিত √দো ধাতু থেকে অদিতি শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করেন। √দো অর্থ খণ্ডিত করা, সীমিত করা। কাজেই যা খণ্ডিত, সীমিত তাই দিতি। ন দিতি=অদিতি। অতএব, অদিতি অর্থ যা খণ্ডিত নয়, সীমিত নয়।[১] সায়ণও অদিতি অর্থ করেছেন অখণ্ডনীয়া।[২] অদিতির মধ্যে সমস্ত খণ্ডতা লয়প্রাপ্ত হয়, তিনি সব খণ্ডতা ধ্বংস করেন। কাজেই তিনি লয়কারিণী এবং ধ্বংসকারিণী।

লয়কারিণী—আবার শ্রীঅরবিন্দ[৩] প্রমুখ কেউ কেউ √অদ্ ধাতু থেকে অদিতি শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করেন। √অদ্ অর্থ গ্রাস করা, খাওয়া। 'যঃ অত্তি' যিনি গ্রাস করেন তিনি অদিতি।[৪] প্রলয়কালে যিনি সব গ্রাস করেন, সব যাঁর মধ্যে লয়প্রাপ্ত হয়, তিনিই অদিতি। এই অর্থেও অদিতি লয়কারিণী এবং ধ্বংসকারিণী।

কোনো দেবমণ্ডলে নূতন কোনো দেবতার আবির্ভাব হলে প্রায়ই দেখা যায় পুরাতন কোনো দেবতার সঙ্গে তিনি যুক্ত হয়ে আছেন, হয় একজন আরেক জনের মধ্যে মিশে গেছেন, না হয় এক জনের সঙ্গে আরেক জনের কোনো একটা আত্মীয়-সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে।

অদিতির বিভিন্ন রূপ—দেবী অদিতি এক সময়ে সর্বেশ্বরী ছিলেন। সেই জন্যই তাঁকে বলা হয়েছে 'বিশ্বে দেবাঃ' অর্থাৎ সর্বদেবতাস্বরূপিণী। কিন্তু এ রকম একটা নির্বিশেষ তত্ত্ব বোধহয় সকল যজমানের বোধগম্য ছিল না। তাই যারা তত্ত্বটা বুঝতে পারত না তাদের জন্য কথাটাকে আরও সহজ করে ঋষি বললেন, অদিতি রুদ্রদের মাতা, বসুদের দুহিতা, আদিত্যদের ভগিনী, অমৃতের আবাসস্থল, অপাপবিদ্ধ জ্যোতিষ্মতী গাভী, তাঁকে হিংসা করো না।[৫]

দেখা যাচ্ছে ঋগ্বেদে দেবীকে গাভী কল্পনা করা হয়েছে বা সায়ণের মতে গাভীকে দেবী কল্পনা করা হয়েছে। পরবর্তী কালে সনাতন ধর্মী সমাজে গাভীকে যে ভগবতী মনে করা হয়েছে অনুমান হয় সে কল্পনার সূত্রপাত এখানেই হয়েছে।

১ ন দীয়তে খণ্ড্যতে বৃহত্ত্বাৎ দো-ক্তিচ্, নঃ তঃ।—দ্রঃ বাচস্পত্য-অভিধান।
২ ঋ বে ১।৮৯।১০; ২।২৭।৭; ৮।১৮।৬ ইত্যাদি মন্ত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।
৩ A. O. D. V., p. 6. f. n. 1   ৪ Ibid. pp. 5-6
৫ মাতা রুদ্রাণাং দুহিতা বসূনাং স্বসাদিত্যানামমৃতস্য নাভিঃ।
প্র নু বোচং চিকিতুষে জনায় মা গামনাগামদিতিং বধিষ্ট ॥ ঋ বে ৮।১০১।১৫
৬ সায়ণের মতে এই মন্ত্রে গোদেবতার স্তব করা হয়েছে। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতেরা অনেকে মনে করেন এতে অদিতির স্তব করা হয়েছে। দ্রঃ A. O. D. V. p. 27-28

শাক্তাদ্বৈতের সূচনা—আসল কথা, দেবী অদিতি যে অসীম দেশকালের অধিষ্ঠাত্রী বিশ্বাত্মিকা এবং দেশকালের অতীত বিশ্বোত্তীর্ণা চিদানন্দময়ী সত্যসন্ধ ঋষির ধ্যানস্তব্ধ হৃদয়ে এ সত্য প্রতিভাত হয়েছিল। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে এখানে শাক্ত দর্শনের অদ্বৈততত্ত্বের সূচনা হয়েছে বলা চলে। অবশ্য, অদ্বৈততত্ত্ব ঋগ্বেদের অন্যত্রও স্পষ্ট ভাষায় ধ্বনিত হয়েছে। যথা—এঁকে (সূর্যকে, মতান্তরে অগ্নিকে) বলা হয় ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, ইনিই সেই গরুড় পক্ষী। একই সত্তা, দেবতাতত্ত্ববিদ্ জ্ঞানীরা এঁর কথা বহুপ্রকারে বলেন। বলেন ইনি অগ্নি, যম, বায়ু।[1] কিংবা অন্যত্র আছে—একই এই সমস্ত হয়েছিলেন।[2]

বিভিন্ন রূপকল্পনার হেতু—তবে এই ধরণের তত্ত্ব সাধারণ লোকে বুঝতে পারে না। তাই তাদের জন্য নানা রকম রূপকল্পনার প্রয়োজন হয়।

অদিতির ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। সেইজন্য, অদিতি কখনও আদিত্যদের ভগ্নী, কখনও মাতা। তা ছাড়া, অদিতা শব্দটিকেই মাতৃনামবাচক (matronymic) মনে করা হয়।[3] পূর্বেও আমরা এ কথার উল্লেখ করেছি।

দক্ষকন্যা—ঋগ্বেদেই অদিতিকে দক্ষের মাতা ও কন্যা বলা হয়েছে। একটি মন্ত্রে আছে—

উত্তানপদ অর্থাৎ বৃক্ষ থেকে উৎপন্ন হল ভূ। ভূব থেকে উৎপন্ন হল আশা। অদিতি জন্ম দিলেন দক্ষের, দক্ষ জন্ম দিলেন অদিতির।[4]

এই মন্ত্রেই দক্ষকন্যা সতীর পৌরাণিক কাহিনীর সূত্রপাত হয়েছে। পরবর্তী মন্ত্রেই বিষয়টি আরও পরিষ্কার করে বলা হয়েছে—

অদিতিই দক্ষের কন্যা হয়ে জন্মালেন। সেই অদিতি থেকেই ভদ্র ও অমৃতবন্ধু দেবগণ জন্মালেন।[5]

মাতৃরূপিণী—দেখা যাচ্ছে অদিতি যেমন দক্ষের কন্যা তেমনি আবার দক্ষের মাতা এবং রুদ্রদেরও মাতা। শুধু তাই নয়, অদিতি দ্যৌ এবং পৃথিবী।[6] আসল কথা, অদিতি মাতা, মাতৃদেবতা।

---

১ ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।—ঋ বে ১।১৬৪।৪৬

২ একং বা ইদং বিবভূব সর্বম্।—ঋ বে ৮।৫৮।২

৩ R. V., p. 181

৪ ভূর্জজ্ঞ উত্তানপদো ভুব আশা অজায়ন্ত
অদিতের্দক্ষো অজায়ত দক্ষাদ্বদিতিঃ পরি।—ঋ বে ১০।৭২।৪

৫ অদিতির্হ্যজনিষ্ট দক্ষ যা দুহিতা তব।
তাং দেবা অন্বজায়ন্ত ভদ্রা অমৃতবন্ধবঃ।—ঋ বে ১০।৭২।৫

৬ অদিতির্দ্যাবাপৃথিবী।—ঋ বে ১০।৬৩।৩

লোকের মনে মাতৃত্বের ধারণার সঙ্গে পত্নীত্বের ধারণা আপনি এসে যায়। তাই বেদসংহিতাতেই দেখা যায় অদিতি শুধু কন্যা, ভগ্নী বা মাতা নন, তিনি পত্নীও বটেন।

ঋতের পত্নী— একটি বৈদিক মন্ত্রে বলা হয়েছে[১] অদিতি শোভন-কর্মাদের মাতা, ঋতের পত্নী। তাঁর শক্তি বহুধা। তিনি অজরা, চিরনবীনা। তিনি বহুগমনশীলা অর্থাৎ বহুদিকে তাঁর গতি। তিনি মহৎ আশ্রয়। তিনি সুনেত্রী। রক্ষা করবার জন্য তাঁকে আহ্বান করি।

ঋত অর্থ সত্য, সত্যের বাক্ রূপ।[২] আর সত্য ব্রহ্ম।[৩] অবশ্য, যজুর্বেদে ঋতকেও ব্রহ্ম বলা হয়েছে।[৪]

শিবপত্নীর আদিরূপ— অতএব দেখা যাচ্ছে অদিতি সত্যের পত্নী বা ব্রহ্মের পত্নী। সত্য হলেন শিব।[৫] আর ব্রহ্মও শিব। কাজেই, বলা যায় অদিতি শিবপত্নী।

আবার অদিতিকে বলা হয়েছে রুদ্রগণের মাতা। মরুদ্গণকে বলা হয় রুদ্রগণ। এরা সব রুদ্রের পুত্র। কাজেই, অদিতি রুদ্রপুত্রগণের মাতা। অতএব, তাঁকে রুদ্রপত্নী বলতে হয়। বৈদিক রুদ্র পরবর্তীকালে পৌরাণিক শিবে রূপান্তরিত হন। কাজেই, বলা যায় অদিতিই মহাদেবী দুর্গার আদিরূপ।

শাস্ত্রেও এ কথার সমর্থন আছে। বৃহদ্দেবতায় বলা হয়েছে অদিতি, বাক্ এবং সরস্বতী একই দেবতা।[৬] এবং দুর্গা বাগ্‌দেবীর অন্যতম নাম।[৭] দুর্গা শিবপত্নী। আবার শিব বাচস্পতি।[৮] কাজেই অদিতি বা বাক্ শিবপত্নী।

অতএব দেখা যাচ্ছে অদিতিই শিবপত্নী দুর্গার আদিরূপ।

অদিতি, সর্বমঙ্গলা সর্বসমৃদ্ধিদায়িনী— যজুর্বেদ ও অথর্ববেদের মন্ত্রে অদিতিকে কল্যাণকারিণী রক্ষাকারিণী দেবীরূপে আহ্বান করা হয়েছে। অথর্ববেদেও[৯] ইন্দ্রাদি দেবতাদের সঙ্গে অদিতির কাছে বিপদ প্রভৃতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং শান্তির জন্য প্রার্থনামন্ত্র পাওয়া যায়।

অদিতি সমৃদ্ধিদায়িনীও বটেন। একটি বৈদিক মন্ত্রে আছে —

---

১ মহীমূষু মাতরং সুব্রতানামৃতস্য পত্নীমবসে হবেম।
তুবিক্ষত্রামজরন্তীমুরূচীং সুশর্মাণমদিতিং সুপ্রণীতিম্।
—বা সং ২১।৫ , অ বে ৭।৬।২ (কয়েক-স্থলে রূপান্তরে)

২ A. O. D. V., p. 13 ৩ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। তৈত্তি উপ ২।১।৩

৪ ঋতং…সত্যম্ বৃহৎ।—বা সং ১০।১৮ ৫ মহা ভা ৭।৭৮।৫৫ ৬ বৃহদ্দেবতা ২।৮৪

৭ ঐ ২।৭৭ ৮ মহা ভা ৭।৭৮।৫০ ৯ অ বে ৮।৯।১৩ , ৭।৬।২

সমৃদ্ধি দেবেন বলে আমরা পরমাতৃকা দেবী অদিতিকে নাম ধরে আহ্বান করছি। তাঁর কোল জুড়ে রয়েছে বিপুল অন্তরিক্ষ। তিনি আমাদের ত্রিধামস্থ (দেহ, মন এবং প্রাণ এই ত্রিধাম) কল্যাণ দিন।[১]

শাক্তশাস্ত্রেও দেখা যায় ভগবতী সর্বসমৃদ্ধিদায়িনী।

অদিতি তরণী—শুক্লযজুর্বেদে অদিতিকে দৈবী তরণী বলা হয়েছে। একটি মন্ত্রে আছে—অদিতি দৈবী তরণী। এই তরণীতে বসান আছে উত্তম কেন্দুয়াল। নির্দোষ নিশ্ছিদ্র এ তরণী আরোহীদের রক্ষা করতে সমর্থ। পৃথিবীর মতো বিপুল, দ্যৌর মতো প্রশান্ত এই তরণী অতি উত্তম আশ্রয়, উত্তম যান। কল্যাণের জন্য আমরা এ তরণীতে আরোহণ করব।[২]

পরবর্তী শাক্ত সাহিত্যে দেখা যায় এই ভাবটি বহুপ্রচারিত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুর্গাসপ্তশতী থেকে দুয়েকটি বচনের উল্লেখ করা যায়। যথা—তুমি দুর্গা, দুর্গম ভবসাগরের তরণী। তোমার কোনো আসক্তি নাই।[৩] দুস্তর ভবসাগর যিনি পার করেন সেই দুর্গাদেবীকে প্রণাম।[৪]

অদিতি কি বহিরাগতা?—পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে পশ্চিম-এসিয়ায় যে মাতৃকা-মহাদেবীর দর্শন পাওয়া গেছে অদিতি তাঁরই সমগোত্রীয়া।[৫] এঁরা গোড়া থেকেই ধরে নিয়েছেন আর্যভাষাভাষীরা চিরকাল পিতৃতন্ত্র। সেইজন্য এঁদের মতে অদিতির মতো মাতৃকা-মহাদেবী সেমিটিক দেবমণ্ডল থেকে আর্য দেবমণ্ডলে এসেছেন।[৬]

কিন্তু লক্ষ্য করা গেছে আর্যরা চিরকাল পিতৃতন্ত্র ছিল না। তারা সবাই না হোক তাদের কোনো কোনো জন একদা মাতৃতন্ত্র বা মাতৃক্রম ছিল। কাজেই অদিতিকে আর্যদেবমণ্ডলে বহিরাগতা কল্পনা করার কোনো প্রয়োজন নাই। যতটা জানা যায় মাতৃকা-দেবীর পূজা একদা জগতের সর্বত্রই প্রচলিত ছিল। বর্বর, অর্ধসভ্য, সভ্য, সেমিটিক, আর্য, আর্যেতর সবাই এক সময়ে কোনো না কোনো রূপে মাতৃরূপিণী দেবতার পূজা করেছে। এ পূজার উৎস মানুষের সহজাত সংস্কারের মধ্যে। কাজেই, ভারতেও মা-মহাদেবীর পূজা

১ বাজস্য নু প্রসবে মাতরং মহীমদিতিং নাম বচসা করামহে।
যস্যা উপস্থ উর্বন্তরিক্ষং সা নঃ শর্ম ত্রিবরূথং নি যচ্ছাৎ।
—য বে ৭।৬।৪

২ সুত্রামাণং পৃথিবীং দ্যামনেহসং সুশর্মাণমদিতিং সুপ্রণীতিম্।
দৈবীং নাবং স্বরিত্রামনাগসমস্রবন্তীমা রুহেমা স্বস্তয়ে।
—বা সং, ২১।৬

৩ দুর্গাসি দুর্গভবসাগরনৌরসঙ্গা।—দু স, ৪।১০ ৪ দুর্গায়ৈ দুর্গপারায়ৈ…নমঃ।—ঐ, ৫।১০

৫ O. G. I. I., I. H. Q., Vo'. X, pp. 413-14, 428 ৬ Ibid, pp. 413-14

অন্যনিরপেক্ষভাবেই উদ্ভুত হয়েছে। পশ্চিম-এসিয়ার মা-মহাদেবী দেবী অদিতির জ্ঞাতি এই পর্যন্ত বলা যায়।

বৈদিক আর্যদের ধর্মগ্রন্থ—ঋগ্‌বেদ বৈদিক আর্যদের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ। কিন্তু ঋগ্‌বেদে বৈদিক আর্যদের ধর্মেরও পূর্ণ পরিচয় নেই। তার কারণ সম্পূর্ণ ঋগ্‌বেদ পাওয়া যায় নি। প্রচলিত ঋগ্‌বেদ সম্পূর্ণ ঋগ্‌বেদ নয়। প্রচলিত ঋগ্‌বেদে বড় বড় দেবতাদের উদ্দেশে কৃত যজ্ঞে বিশেষ বিশেষ পুরোহিত-বংশের ব্যবহৃত সূক্ত সংগৃহীত হয়েছে। এই-সব সূক্তও আবার প্রধানতঃ সোমযাগ-সম্বন্ধীয় সূক্ত। এক অশ্বমেধের মতো প্রখ্যাত এবং বিরল যজ্ঞ ছাড়া অন্যান্য পশুমেধযজ্ঞ সম্পর্কিত সূক্তও এতে বড় একটা দেখা যায় না।[১]

ঋগ্‌বেদের দেবতা—যে-সব দেবতার সোমযাগের সঙ্গে তেমন যোগ নেই ঋগ্‌বেদে তাঁদের স্থান অতি সঙ্কীর্ণ। নামোল্লেখের সংখ্যানুসারে ম্যাক্‌ডোনেল ঋগ্‌বেদের দেবতাদের পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। যথা—(১) ইন্দ্র, অগ্নি, সোম; (২) অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদগণ, বরুণ। (৩) উষা, সবিতা, বৃহস্পতি, সূর্য, পূষা। (৪) বায়ু, দ্যাবাপৃথিবী, বিষ্ণু, রুদ্র। (৫) যম, পর্জন্য।[২]

দেখা যাচ্ছে এই তালিকা পুরো নয়। কেন না এর থেকে অদিতি, প্রজাপতি প্রভৃতির মতো প্রধান দেবতাও বাদ পড়েছেন। তা ছাড়া ঋগ্‌বেদেই একাধিক মন্ত্রে[৩] তেত্রিশজন দেবতার উল্লেখ করা হয়েছে। একটি মন্ত্রে ত ৩৩৩৯ জন দেবতার উল্লেখ আছে।[৪]

বৈদিক দেবতার ব্যাখ্যা—দেবতা সম্বন্ধে মানুষের ধারণা স্থান-কাল-পাত্র অনুসারে বিভিন্ন হয়, অন্ততঃ প্রাচীনকালে হত। বৈদিক আর্যদের দেবতা সম্বন্ধে কি রকম ধারণা ছিল যাস্কের দেব-শব্দের ব্যাখ্যা থেকে তা অনুমান করা যায়। সে যুগে ব্যাখ্যা হত সম্প্রদায় অনুসারে। কাজেই যাস্কের ব্যাখ্যায় বৈদিক ঋষিদের ধারণারই পরিচয় রয়েছে বলা যেতে পারে। যাস্ক বলেছেন[৫]—ঐশ্বর্য দান করেন বলে বা তেজোময় বলে বা প্রকাশময় বলে দেব বলা হয়। অথবা দ্যুস্থানস্থ বলে দেব বলা হয়। যিনি দেব তিনিই দেবতা।

বৈদিক দেবতা ও মানুষের সম্বন্ধ—ঋগ্‌বেদের যুগের বিশ্বাস ছিল দেবতাদের খেয়াল-খুশির উপর নির্ভর করত যজমানদের পুত্রকলত্র, সুখসম্পদ সব কিছু। তাই দেখা যায় দেবতাদের অনুগ্রহ লাভ বা তাঁদের নিগ্রহ পরিহার করার আশায় তাঁদের স্তবস্তুতি করা হচ্ছে বা তাঁদের উদ্দেশে যাগযজ্ঞ করা হচ্ছে। বহু সূক্তের প্রধান সুর দেওয়া নেওয়ার

---

১ R. Ph, V. U., p. 18 ২ V. M., p. 20

৩ ঋ বে ১।৩৪।১১, ১।৪৭।২, ১।১৩৯।১১, ৮।২৮।১, ৮।৩০।২ ৪ ঋ বে ৩।৯।৯

৫ দেবো দানাদ্বা। দীপনাদ্বা। দ্যোতনাদ্বা। দ্যুস্থানো ভবতীতি বা। যো দেবঃ সা দেবতা।

—নিরুক্ত ৭।১৫

সুর—আমি তোমাকে এইটে দিচ্ছি, অতএব, ওগো দেবতা, তুমি আমাকে ঐটে দাও। অবশ্য, দেবতার কাছে সব সময়েই যে কোনো পার্থিব বস্তু চাওয়া হয়েছে তা নয়, অনেক সময় দেখা যায় শুধু দেবতার কাছে মার্জনা ভিক্ষা করা হয়েছে, তাঁকে কেবলমাত্র প্রসন্ন করতে চাওয়া হয়েছে।[১]

এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক। তত্ত্বদর্শীরা বৈদিক দেবতা ও যাগযজ্ঞাদির বিচার করেন দু দিক্ থেকে, এক স্থূল ব্যাবহারিক দিক্ থেকে, আরেক সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক দিক্ থেকে। আমরা প্রধানতঃ স্থূল ব্যাবহারিক দিক্ দিয়েই আলোচনা করছি।

বৈদিক আর্যদের প্রার্থনাদি—ব্রাহ্মণ পর্যন্ত শ্রুতিগ্রন্থে আর্যদের যে-পরিচয় পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় তারা অতিশয় প্রাণবান্ মানুষ। জগৎ এবং জীবনকে তারা পুরোপুরি উপভোগ করতে চায়। দৃষ্টি তাদের ইহলোকের দিকেই। একে তারা মিথ্যাও বলে না, বন্ধনও বলে না। দেবতাদের কাছে তাদের প্রার্থনা—শতবর্ষ আয়ু দাও, সুখ দাও, ধন দাও, সন্তান দাও, জয় দাও, শত্রু বিনাশ কর। তারা ভুক্তিকামী, মুক্তির ধার ধারেনা।

ঋগ্‌বেদের ভাবধারা শাক্তশাস্ত্রে অনুসৃত—ঠিক এই ভাবধারাটিই অনুসৃত হয়েছে শাক্তশাস্ত্রে। মার্কণ্ডেয়-পুরাণের অন্তর্গত দেবীমাহাত্ম্যে ঋষি মার্কণ্ডেয়ের মুখে 'রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি' বলে যে-প্রার্থনা উচ্চারিত হয়েছে তাতে বৈদিক সূক্তের প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। শাক্তশাস্ত্রের এই ভাবটির মূল যে ঋগ্‌বেদ পর্যন্ত প্রসারিত এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। অবশ্য, তন্ত্রশাস্ত্রে ভুক্তির সঙ্গে মুক্তিরও ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু সে কথা পরে।

ঋগ্‌বেদে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব— ঋগ্‌বেদে গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কথাও আছে। সে-সব তত্ত্ব সাধারণ লোকের জানবার কথা নয়। তত্ত্বদর্শী ঋষিদেরই সে-সব জানা ছিল। এই আধ্যাত্মিক তত্ত্বধারাই উপনিষদ্‌পর্বে ব্রহ্মবিদ্যা বা ব্রহ্মতত্ত্ব নামে প্রাধান্য লাভ করে। এই ব্রহ্মতত্ত্ব পরমগুহ্য।[২] এর সাধনবিধিও গুহ্য।[৩] সাধারণ লোকে বুঝতে পারবে না বলে ঋষিরা এটি গোপন রাখতেন।

ঋগ্‌বেদে দেখা যায় আর্যরা দেবতার আরাধনা করত যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে। সে-অনুষ্ঠানে ক্রিয়াকাণ্ড ছিল বিস্তৃত ও জটিল। সেইজন্য, দক্ষ পুরোহিতদের উপর যাগযজ্ঞের ভার ছিল। যজমানেরা সব খরচা দিত, উদ্যোগ-আয়োজন করে দিত আর পুরোহিতরা যজমানের প্রতিনিধিস্বরূপ যজ্ঞ করতেন। পুরোহিতকে দক্ষিণা দিতে হত। বৈদিক ঋষি

---

১ L. C. B., p. 64 ২ শ্বে উপ ৬।২২, ৩ ছা উপ ৩।৫।২

দক্ষিণাদানের প্রভূতফল বর্ণনা করেছেন।[১] যজ্ঞে মুখ্য পুরোহিত, গৌণ যজমান। মনে হয় ঋগ্‌বেদের সময় থেকেই পৌরোহিত্য প্রধানতঃ বংশগত হয়ে পড়ে।[২]

পরবর্তীকালেও দেখা যায় সনাতনধর্মে প্রধানতঃ এই ধারাই চলে এসেছে,— যজমানের হয়ে দেবপূজা করেন পুরোহিত।

অথচ, পণ্ডিতেরা অনুমান করেন অন্যান্য প্রাচীন ধর্মের মতো একদা আর্যধর্মেও পুরোহিত ছিলেন না, পূজার্থী নিজেই পূজা করত।[৩]

অতি প্রাচীন প্রথা তান্ত্রিক পূজায় অনুসৃত—তন্ত্রমতে শক্তিসাধনায় দেবীপূজার ক্ষেত্রে আমরা সেই অতি প্রাচীন প্রথার নিদর্শন দেখতে পাই। শক্তিসাধক নিজেই দেবীপূজা করেন। তবে আনুষ্ঠানিক তান্ত্রিক পূজার ক্রিয়াকাণ্ড জটিল, গুরুর কাছে শিখতে হয়। আর সাধক অসমর্থ হলে তার প্রতিনিধিস্বরূপ গুরু বা তাঁর স্থলাভিষিক্ত অন্য কারো পূজা করারও বিধি আছে।

ঋগ্‌বেদীয় যজ্ঞ—বৈদিক যজ্ঞের উদ্দিষ্ট এক বা একাধিক দেবতা। যজ্ঞের প্রধান উপকরণ মন্ত্র আর প্রধান অঙ্গ হোম। মন্ত্র পড়ে দেবতাকে যজ্ঞে আহ্বান করে আনা হত। তার পর মন্ত্র পড়ে বিবিধ খাদ্য-পানীয় দিয়ে এবং স্তবস্তুতি করে তাঁকে তুষ্ট করা হত। খাদ্য ছিল প্রধানতঃ ঘি, দুধ, অন্ন এবং পুরোডাশ আর পানীয় সোমরস। কোনো কোনো যজ্ঞে পশুবলিও দেওয়া হত। যতদূর জানা যায় পূজার ব্যাপারে বৈদিক যুগের আগেও মানুষ মোটের উপর তাই করেছে এবং আজ পর্যন্তও করছে।

ঋগ্‌বেদে মন্ত্রশক্তির নিদর্শন—আদিম মানুষের পূজার মতো বৈদিক ঋষিদের যজ্ঞেও মন্ত্রেরই প্রাধান্য। মানুষ আদিম অবস্থা থেকেই মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস করে এসেছে। ঋগ্‌বেদেও মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাসের বহু নিদর্শন আছে। যেমন একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে—

(হে ইন্দ্র), আমাদের বর্জনীয় পাপ বিনাশ কর। ঋক্-মন্ত্র দিয়ে আমরা তাদের বিনাশ করব যাদের কাছে ঋক্-মন্ত্র নাই।[৪]

এ ছাড়া, বিষনাশের মন্ত্র,[৫] শত্রুধ্বংসের মন্ত্র,[৬] সপত্নীনির্বাসন-মন্ত্র,[৭] সন্তানোৎপাদন-মন্ত্র,[৮] মৃতসঞ্জীবনী-মন্ত্র,[৯] এবং রাক্ষসাদির বিনাশ-মন্ত্র[১০] প্রভৃতি আরও সব মন্ত্র ঋগ্‌বেদে আছে। এইগুলিই তান্ত্রিক ষট্‌কর্মাদির আদিরূপ।

১ ঋ বে ১।১২৫।৩; এ ছাড়া, ঋ বে ১।১৬৮।৭; ৬।২৭।৮; ৮।২৪।২৯, ৬৯।৫; ১০।১০৭ প্রভৃতি মন্ত্রেও দক্ষিণার কথা আছে। ২ I. A. R., p. 12 ৩ H. R., P. 249-50

৪ অব নো বৃজিনা শিশীহ্যচা। বনেমানৃচঃ।—ঋ বে ১০।১০৫।৮ ৫ ঋ বে ১।১৯১

৬ ঐ ১০।১৬৬ ৭ ঐ ১০।১৪৫ ৮ ঐ ১০।১৮৩ ৯ ঐ ১০।৫৮ ১০ ঐ ৭।১০৪

আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি ঋগ্‌বেদে আর্যদের ধর্মেরই পুরো ছবি পাওয়া যায় না, তদানীন্তন ভারতের অন্যান্য লোকদের ধর্মের ত কথাই নাই।

অথর্ববেদে জনসাধারণের ধর্মের ছবি—আর্য-সাধারণের এবং তাদের নিকট-সংস্রবে এসেছিল যে-সব আর্যেতর সাধারণ মানুষ, তাদের সবার ধর্মের একটা পুরো ছবি পাওয়া যায় অথর্ববেদে। অবশ্য যজ্ঞপ্রধান ঋগ্‌বেদীয় ধর্মের কথাও এতে আছে। তবে ধর্মের লৌকিক রূপটিই বিশেষভাবে এই বেদে ফুটে উঠেছে।

ধর্মের দুই ধারা—বেদের সময় থেকে আরম্ভ করে ভারতীয় ধর্মের দুটি প্রধান ধারা বরাবর লক্ষ্য করা যায়; একটি ব্রাহ্মণ্য, অপরটি লৌকিক বা লোকায়ত। সব সময়েই ধারা-দুটির পরস্পর মিশামিশি হয়েছে। আর্যদের প্রতিভা সংশ্লেষণী। বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য-সংস্থাপন তার বিশেষত্ব। পুরোহিত ব্রাহ্মণ যখনই লক্ষ্য করেছেন কোনো লৌকিক দেবতা যজমানসমাজে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন তখনই তাঁকে আপন দেবমণ্ডলে স্থান করে দিয়েছেন; আপনাদের কোনো দেবতার সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন। এইভাবে লৌকিক দেবতা ও ধর্মবিশ্বাস বেদের সময় থেকেই ব্রাহ্মণ্য দেবমণ্ডল ও ধর্মবিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে এসেছে।

অথর্ববেদের বৈদিক মর্যাদা—অনেকে মনে করেন অথর্ববেদ বেদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ, অর্বাচীন। বেদের কৌলীন্য তার নেই। এইজন্য খাঁটি বেদের পঙ্‌ক্তিতে তার স্থানও হয় না। কারণ, বেদকে বলা হয় ত্রয়ী। আর ত্রয়ী বলতে ঋক্, সাম এবং যজু এই তিনকেই বুঝায়।

আবার অনেকের মতে এই যুক্তির মধ্যে ফাঁকি আছে। তাঁরা বলেন, ঋক্, যজু আর সাম এই তিন শ্রেণীর মন্ত্র ব্যতীত আর চতুর্থ শ্রেণীর মন্ত্র নাই। এইজন্যই মন্ত্রাত্মক বেদবিদ্যাকে ত্রয়ীবিদ্যা বলে।[১] কাজেই বেদকে ত্রয়ী বললে অথর্ববেদ বেদের বাইরে পড়ে না। বেদকে চার ভাগ করার বিচার আলাদা।

সংহিতা-বিভাগ—বেদের মন্ত্র তিন শ্রেণীর বটে কিন্তু বেদমন্ত্রের সংহিতা চারখানা[২]। ছন্দে বাঁধা অর্থাৎ পদ্যে রচিত বেদমন্ত্রগুলি একত্র সংগ্রহ বা সংহত করে নাম দেওয়া হল ঋক্-সংহিতা বা ঋগ্‌বেদ। যজ্ঞে যে-সব ঋক্ গান করা হত সেগুলির সংগ্রহের নাম সাম-সংহিতা বা সামবেদ। আর যজ্ঞে ব্যবহার্য যে-সব মন্ত্র গদ্যে রচিত সেই গুলিকে একত্র করে নাম দেওয়া হল যজুঃ-সংহিতা বা যজুর্বেদ। পদ্য, গান এবং গদ্য বেদমন্ত্রের এই তিন ভাগের জন্যই বেদকে ত্রয়ী বলা হয়। পূর্বোক্তরূপ সংকলিত মন্ত্র ছাড়া আরও কতকগুলি

---

১ বেদকথা পৃঃ ১৩ ২ ঐ পৃঃ ১৪

মন্ত্র ছিল যেগুলি সাধারণ যজ্ঞে ব্যবহৃত হত না, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি কর্মে ব্যবহৃত হত। এই-সব মন্ত্র একত্র করে নাম দেওয়া হল অথর্ব-সংহিতা বা অথর্ববেদ। তবে অনেক ঋক্-মন্ত্রও অথর্বসংহিতার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। দেখা যায় অথর্ব-সংহিতারও অধিকাংশ মন্ত্রই ঋক্-মন্ত্র।[১]

কাজেই অথর্ববেদের অর্বাচীনত্ব বা অকৌলীন্য কোনোটাই অকাট্য সিদ্ধান্ত বলে গ্রহণ করা যায় না। বরং তার বিপরীত সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

অথর্ববেদের ঋগ্‌বেদাদির সমান মর্যাদা—অথর্ববেদেরও যে ঋগ্‌বেদাদির সমান মর্যাদা তার শ্রৌত প্রমাণ আছে। যেমন ছান্দোগ্যোপনিষদে দেখা যায় নারদ সনৎ-কুমারকে বলছেন— ভগবান্, আমি প্রথমে ঋগ্‌বেদ পড়েছি, তারপর যজুর্বেদ ও সামবেদ এবং চতুর্থ পড়েছি অথর্ববেদ।[২]

বৃহদারণ্যক উপনিষদে অন্য তিন বেদের সঙ্গে অথর্ববেদকেও পরমাত্মার নিঃশ্বাস বলা হয়েছে।[৩] কাজেই বেদ হিসাবে অথর্ববেদের গুরুত্ব অন্য কোনো বেদের চেয়ে কম নয়।

অথর্ববেদ ও তন্ত্র— শক্তিসাধনার ইতিহাসে অথর্ববেদের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কেননা, শাক্ততন্ত্রে বিহিত অনেক আচার-অনুষ্ঠানের মূল পাওয়া যায় অথর্ববেদে। তন্ত্রশাস্ত্রে অথর্ববেদকে স্পষ্টভাষায় শক্ত্যাচারসমন্বিত বলা হয়েছে। তান্ত্রিকদের দৃষ্টিতে অথর্ববেদ সকল বেদের সার। রুদ্রযামলে আছে—

মহাদেব, এর পর অথর্ববেদের লক্ষণ বলছি। অথর্ববেদ সর্ববর্ণের সার, শক্ত্যাচারসমন্বিত। অথর্ববেদ থেকে তমোগুণপ্রধান সামবেদ উৎপন্ন হয়েছে। সামবেদের থেকে সত্ত্বগুণপ্রধান যজুর্বেদের উদ্ভব হয়েছে এবং যজুর্বেদের থেকে রজোগুণপ্রধান ঋগ্‌বেদ উৎপন্ন হয়েছে। অথর্ববেদরূপিণী দেবী মৃণালসূত্রাকারা।[৪]

তন্ত্রের মূল অথর্ববেদের সৌভাগ্যকাণ্ড—তন্ত্রোক্ত ধর্মের সঙ্গে অথর্ববেদোক্ত ধর্মের অনেক মিল আছে। কেউ কেউ অথর্ববেদকে বিশেষ করে তার অধুনা অজ্ঞাত এবং অমুদ্রিত সৌভাগ্যকাণ্ড নামক উত্তরকাণ্ডকে তন্ত্রের মূল মনে করেন।[৫]

---

১ বজ্রকথা, পৃঃ ১৪ ২ ঋগ্‌বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্বেদং সামবেদমাথর্বণং চতুর্থম্। ছা উপ ৭।১।২

৩ বৃহ উপ ২।৪।১০, ৪।১।২

৪ অথ বক্ষ্যে মহাদেব! অথর্ববেদলক্ষণম্। সর্ববর্ণস্য সারং হি শক্ত্যাচারসমন্বিতম্।
অথর্ববেদাদুৎপন্নঃ সামবেদঃ তমোগুণঃ। সামবেদাদ্ যজুর্বেদো মহাসত্ত্বসমুদ্ভবঃ।
রজোগুণময়ো ব্রহ্মা ঋগ্‌বেদো যজুষি স্থিতঃ। মৃণালসূত্রসদৃশী অথর্ববেদরূপিণী।

—রু যা, উ ত, পৃঃ ১৭

৫ দ্রঃ—Ś.Ś., 2nd Ed., p. 72.

অথর্ববেদোক্ত ধর্মের লক্ষ্য—অথর্ববেদোক্ত ধর্মের প্রধান লক্ষ্য দেখা যায় ইহলোকের সুখসমৃদ্ধি। এ বিষয়ে ঋগ্‌বেদের সঙ্গে অথর্ববেদ একমত। আথর্বাণ ঋষিরও প্রার্থনা—হে সূর্য, তোমাকে এক শ বছর ধরে দেখব, এক শ বছর বাঁচব।[১] রোগ, সর্পাঘাত প্রভৃতি যে-সব কারণে এই বাঞ্ছিত আয়ু শেষ না হতেই মানুষের মৃত্যু হতে পারে সে-সব দূর করবার জন্য এবং দীর্ঘায়ু লাভের জন্য অথর্ববেদে মন্ত্রতন্ত্র ও ভেষজাদির ব্যবস্থা আছে।[২]

অপদেবতা, ভূতপ্রেত, দৈত্যদানব, রাক্ষস প্রভৃতি এবং কোনো কোনো দেবতাও মানুষের অনিষ্টকারী বলে প্রাচীনকালের মানুষ বিশ্বাস করত। সেই সঙ্গে তাদের এ বিশ্বাসও ছিল যে যাদুমন্ত্র দিয়ে বা যে-সব জিনিষে যাদুশক্তি আছে বলে তারা মনে করত সে রকম কোনো জিনিষ দিয়ে এই-সব অনিষ্টকারীদের তাড়ান যায়। দেখা যায় মানুষের আদিম অবস্থা থেকেই এ রকম বিশ্বাস চলে আসছে। অথর্ববেদেও এ রকম বিশ্বাসের প্রভূত নিদর্শন আছে।[৩]

দেবতাকে দিয়ে স্বকার্যসাধন—লক্ষ করা গেছে আদিম মানুষের দেবতা সম্পর্কে আরেকটি বিশ্বাস ছিল। তারা মনে করত ক্ষেত্রবিশেষে দেবতাকে দিয়ে আপন ইচ্ছামত কাজ করিয়ে নেওয়া যায়। অথর্ববেদেও এরূপ বিশ্বাসের নিদর্শন আছে। যেমন একটি মন্ত্রে[৪] আছে পাপদেবতা 'অপ্‌ওয়াকে' যথাবিধি তুষ্ট করে শত্রুর বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেওয়া যায়। তিনি তাদের শরীরে প্রবেশ করেন এবং হৃদয়ে অবস্থান করে তাদের রোগভয়াদি-জনিত শোকে জর্জরিত করেন।

স্বস্ত্যয়নাদি—নানা রকম উৎপাতের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করবার জন্য অথর্ববেদে নানা রকম মণিধারণ, মন্ত্রতন্ত্র ও স্বস্ত্যয়নকর্মের ব্যবস্থা আছে।[৫] স্বস্ত্যয়নকর্মে বিপদ্ থেকে রক্ষা পাবার জন্য কল্যাণকারী দেবতার শরণ লওয়া হত।[৬] আবার বিঘ্ন ও আপদ্ দূর করার জন্য জলও মন্ত্রপূত করা হত। তাকে বলা হত শান্ত্যুদক।[৭]

অভিচারাদি—চিরকালই সাধারণ মানুষের হিংসাদ্বেষ আছে, তার শত্রু আছে। সে শত্রুকে হয় পদানত করতে চায়, না হয় ধ্বংস করতে চায়। তার এই চাহিদা মেটাবার ব্যবস্থা অথর্ববেদে আছে। শত্রুর অনিষ্টকর বিশেষ ক্রিয়ানুষ্ঠানের নাম অভিচার। বৈদিক

---

১ পশ্যেম শরদঃ শতম্। জীবেম শরদঃ শতম্ :—অ বে ১৯।৬৭।১, ২

২ অ বে ১।২, ২২—২৫, ৩০, ৩৫ ; ২।৪, ৯, ১৩, ২৮, ৩২, ৩৩ , ৩।১১ ; ৪।৬, ৭, ১৩, ৩৭ ; ৫।১৫, ২২, ২৩ ৬।১২, ৪১, ৪৪, ৫৬, ১১০ ; ৭।৫৩ ; ৮।২ ; ১৯।৩৯, ৬৩ ইত্যাদি

৩ অ বে ৮।৬।৫-১৯ ; ৪।৩৭।৩ , ৫।২৯ ইত্যাদি   ৪ অ বে ৩।২।৫

৫ অ বে ৪।১০ , ৬।৯৯, ১০।৭।৪ ; ১৯।২৬, ২৮, ২৯, ৩০   ৬ ঐ ৬।৯৩

৭ দ্রঃ অ বে ১১।৩ এবং সায়ণভাষ্য

যুগে একে কৃত্যা বা যাতু বলা হত। অথর্ববেদে অভিচার এবং অভিচারের প্রতিকার এই উভয় প্রকারের অনুষ্ঠানের মন্ত্রই আছে।[১]

অথর্ববেদোক্ত ধর্মানুষ্ঠানাদির প্রধান লক্ষ্য মানুষের দীর্ঘজীবন, তার সুখসমৃদ্ধি। কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন অথর্ববেদোক্ত অভিচারাদিরও ঐ একই লক্ষ্য; তাদের প্রধান উদ্দেশ্য শত্রুর হাত থেকে যজমানকে রক্ষা করা। তবে অমিশ্রবিদ্বেষমূলক অভিচারও ছিল। এই-সব অভিচার বা কৃত্যাকে বলা হয়েছে আসুরী ও আঙ্গিরসী[২]; অর্থাৎ এই-সব কৃত্যা অসুরদের এবং অঙ্গিরাদের।[৩]

যারা মানুষের অনিষ্ট করে অথর্ববেদে তাদের বধ করার মন্ত্রও আছে।[৪]

অথর্ববেদে সতীনকে বা প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিনীকে জব্দ করার আভিচারিক মন্ত্রাদিও আছে;[৫] বশীকরণমন্ত্রাদিও আছে। পুরুষের বশীকরণমন্ত্র[৬] এবং নারীর বশীকরণমন্ত্র[৭] পৃথক্ পৃথক্।

এই সব স্বস্ত্যয়ন-অভিচারাদি কর্ম সাধারণতঃ ঋষিরাই করতেন। তবে অন্যেরাও করতে পারত।[৮]

তপঃশক্তি ব্রহ্ম— বৈদিক যুগেও ঋষিরা যজ্ঞাদি করে অতিপ্রাকৃত শক্তি লাভ করতেন। অথর্ববেদে এই শক্তিকে বলা হয়েছে ব্রহ্ম। এটি তপঃশক্তি। পরবর্তীকালে তন্ত্রশাস্ত্রে সিদ্ধপুরুষদের যে-শক্তির কথা বলা হয়েছে তাও মূলতঃ এই শক্তি।

ব্রহ্মের অধিকারী ঋষির বাক্য অমোঘ। কেন না, সে-বাক্য ব্রহ্মসংহিত। দেবতাদেরও তা লঙ্ঘন করবার শক্তি ছিল না। বরুণের মতো দুর্দ্ধর্ষ দেবতাকেও দেখা যায় অথর্ববিদ্ ঋষির ব্রহ্ম মেনে চলতে হয়।[৯]

ব্রহ্মের বলে ঋষি মুমূর্ষুকে আরোগ্য করতে পারতেন, এমন কি মৃতকে জীবনদান করতে পারতেন।[১০] তবে ইচ্ছা করলে যে-কোনো লোকের জীবন নাশও করতে পারতেন।[১১]

অপদেবতা, যাতুধান, পাপতাপ, রোগশোক প্রভৃতি যা-কিছু মানুষের অনিষ্টকারী সে-সব ব্রহ্ম দূর করে দিতে পারত। ঋষিরা ব্রহ্মের দ্বারা এই-সব দুঃখের কারণ দূর করে মানুষের ভুক্তি নির্বিঘ্ন করে দিতেন।

১ অ বে ২।১২, ১৮-২৪ ; ৩।৬ ; ৪।৩, ১৭, ২২, ৪০ ; ৫।৮ ; ৬।৬, ৩৪, ৬৫-৬৭, ১০৩, ১০৪, ১০৮ ; ৭।৮, ১৩, ৩১, ৩৪, ৬২, ৭৭, ৯১, ৯৫ ইত্যাদি

২ যা কৃত্যা আঙ্গিরসীর্যা কৃত্যা আসুরীর্যা—অ বে ৮।৫।৯   ৩ R. Ph. AV., p. 104

৪ অ বে ১।৭, ৮, ২৮ ; ২।১৪ ; ৪।২০ ; ৫।২৯ ; ৬।৭, ৩২, ৬৬ ; ১৯।৬৬

৫ ঐ ১।১৪ ; ৭।৩৫ , ১০।৩ ইত্যাদি   ৬ ঐ ৬।১৩০, ৭।৩৭, ৩৮ ইত্যাদি

৭ ঐ ১।৩৪ ; ২।৩০ , ৬।৯ ইত্যাদি   ৮ R. Ph. AV., p. 5

৯ অ বে ১।১০।৩-৪   ১০ অ বে ৭।৫৩।৩   ১১ ঐ ৬।১৩৪।১-৩

মন্ত্রশক্তি—ঋগ্‌বেদে মন্ত্রশক্তির নিদর্শন পাওয়া গেছে। অথর্ববেদেও সে রকম নিদর্শন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। যেমন ঋষি মন্ত্রপুত জলের দ্বারা মৃতপ্রায় রোগীকে সুস্থ করে তুলছেন[১] কিংবা শত্রুকে পদানত বা বধ করছেন এই ধরণের দৃষ্টান্ত অনেক আছে।[২]

যাদুশক্তি—এই ধরণের অলৌকিক শক্তিকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন যাদুশক্তি। অবশ্য, আমাদের মন্ত্রশক্তি কথাটা আরও গভীর এবং ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়। মন্ত্রের প্রসঙ্গে পরে আমরা মন্ত্রশক্তির আলোচনা করব। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে অথর্ববেদ প্রধানতঃ যাদুবিদ্যার গ্রন্থ (book of magic)[৩]

যাদুর নিদর্শন ঋগ্‌বেদাদিতেও আছে। ওলডেনবুর্গ[৪] প্রমুখ পণ্ডিতের মতে ঋগ্‌বেদের প্রথম ও দশম মণ্ডলে বহু যাদুমন্ত্র আছে। এই মন্ত্রগুলি আবার অথর্ববেদেও পাওয়া যায়।

যজুর্বেদেও যাদু বা মায়ার নিদর্শন অনেক আছে।[৫] আসল কথা, সেই প্রাচীন যুগে সর্বত্রই ধর্মেতে আর যাদুতে ছিল মাখামাখি। সাধারণ লোকে একটা থেকে আরেকটাকে পৃথক্ করতে পারত না। আর্যদের ধর্মের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। ঋগ্‌বেদেই এ কথার সমর্থন আছে। একটি সূক্তে[৬] দেখা যায় একজন ধার্মিক ব্যক্তি অভিযোগ করছেন দুষ্ট লোকে তাঁকে যাতুধান অর্থাৎ মায়াবী বলছে।

ধর্মানুষ্ঠান ও যাদুক্রিয়া—ধর্মানুষ্ঠান এবং যাদুক্রিয়ার পার্থক্য তা হলে কিভাবে নির্ধারণ করা যায়? খুব সাধারণভাবে বলা চলে ধর্মানুষ্ঠানের ফলাফল নির্ভর করে দেবতার অনুগ্রহের উপর আর যাদুক্রিয়ার ফলাফল দেবতানিরপেক্ষ। যাদুমন্ত্র তথা যাদুক্রিয়াই ঈপ্সিত ফল দিতে পারে।

অথর্ববেদে দেখা যায় যজ্ঞ যাদুক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে।[৭] যথাবিধি যজ্ঞ সম্পাদিত হলে সেই যজ্ঞেরও একটি বিশেষ শক্তি জন্মে। এই শক্তির বলে যজমানের ঈপ্সিত ফল লাভ হয়। এর অর্থ হল যজ্ঞের ফল দেবতার খেয়ালখুশির উপর নির্ভর করে না। দেবতার খেয়াল যাই হোক না কেন, যজমান যজ্ঞের জন্যই ফল পাবে।

ঠিক এই রকম ব্যাপারই তন্ত্রেও লক্ষ্য করা যায়। তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্ম যথাবিধি অনুষ্ঠিত হলে শাস্ত্রনির্দিষ্ট ফল তার থেকে অবশ্যই পাওয়া যায়। উদ্দিষ্ট দেবতাও এই ধরণের ক্রিয়াকর্মের বশ।

১ ঐ ৫।৩০ ২ ঐ ১০।৪।১৫-২১ ৩ R. Ph. V. U., p. 379 ৪ R. Ph. AV., p. 2
৫ বা সং ৫।২৩, ১৫।১৫, ২৬।১ ইত্যাদি ৬ ঋ বে ৭।১০৪।১৬
৭ R. Ph. AV, p. 199

কেউ কেউ মনে করেন অথর্ববেদে যজ্ঞের পূর্বোক্ত যাদুশক্তির দিকটারই প্রাধান্য দেখা যায়। অন্যান্য বেদোক্ত যজ্ঞের মতো এই সব যজ্ঞেও দেবতারা আছেন ; কিন্তু তাঁরা আছেন, অথবা বলা যায়, তাঁদের নামগুলি আছে কেবলমাত্র মন্ত্রের যাদুশক্তি বাড়াবার জন্য। এরূপ নামের তালিকা যত দীর্ঘ হবে যজ্ঞের ফল তত ভাল হবে এমনি একটা বিশ্বাস মনে হয় যজ্ঞকারীদের ছিল।[১]

আর্য ও আর্যেতর ধর্মের সংমিশ্রণ—কারো কারো মতে অথর্ববেদে বৈদিক ধর্মের নীচের স্তরের রূপ প্রকাশ পেয়েছে। এই স্তরে আর্যের ধর্মে আর অনার্যের ধর্মে মিশামিশি হয়ে গেছে।

কথাটা আংশিকভাবে সত্য। কারণ, অথর্ববেদে ধর্মের উঁচু স্তরের পরিচয়ও আছে।[২]

তবে আর্য ও অনার্যের ধর্মের সংমিশ্রণ হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। কেননা, আর্য-অনার্যের যে-সংযোগ হয়েছিল তার নিদর্শন ঋগ্‌বেদেই আছে। এ সংযোগ প্রথমে বিরোধের মধ্য দিয়েই হয়েছিল এটা অনুমান করা কঠিন নয়। ঋগ্‌বেদে যাদের রাক্ষস, দাস, দস্যু, মূরদেব, শিশ্নদেব বলা হয়েছে তাদের সাধারণতঃ অনার্য বলেই ধরা হয়। এ ছাড়া, পণি, কীকট, ঋগ্‌বেদোক্ত 'পঞ্চজন'-এর পঞ্চম জন নিষাদ—এরা সব ত আছেই।

কাজেই, অনুমান করা যায় ঋগ্‌বেদের সময়েই আর্য ও অনার্যের ধর্মের সংমিশ্রণ হয়েছিল। অতএব, বলতে হয় অথর্ববেদের সময়েও অবশ্যই হয়েছিল। তবে অথর্ববেদের ধর্মে কোন কোন ক্ষেত্রে অনার্য ধর্মের সংমিশ্রণ হয়েছিল নিশ্চয় করে বলা কঠিন।

অবশ্য অনুমান করা হয় ধর্মের পূর্বোক্ত যাদু বা মায়ার অংশটি অনার্যদের কাছ থেকে এসেছে। অথর্ববেদে মায়াকে বলা হয়েছে 'অদেবী'।[৩] শতপথ-ব্রাহ্মণেও বলা হয়েছে মায়া অসুরদের।[৪] কাজেই, মায়া বা যাদু নিশ্চয়ই অনার্যদের। কেননা, দেববিরোধী অসুর অনার্য না হয়ে যায় না। আর তা ছাড়া, আর্যদের মত এমন সুসভ্য জাতির ধর্মে মায়া বা যাদু থাকবে এটা সহসা বিশ্বাসও করা যায় না।

তবু বিশ্বাস করবার পক্ষেই যুক্তি রয়েছে। আর্যদেরও যে যাদু বা মায়া জানা ছিল তা আমরা লক্ষ্য করেছি। আর অসুরদের শ্রুতিতেই আর্য বলা হয়েছে। যেমন বৃহদারণ্যক-উপনিষদে আছে—প্রজাপতির সন্তান দুই শ্রেণীর, দেবগণ এবং অসুরগণ। দেবতারা সংখ্যায় অল্প, অসুররা বহুসংখ্যক।[৫]

১ R. Ph. V. U., p. 24. ২ দ্রঃ অ বে ৪।১৬ ; ১১।৮ ইত্যাদি

৩ অ বে ৮।৩।২৪ ৪ দ্রঃ শ ব্রা ১৩।৪।৩।১১ ৫ বৃহ উপ ১।৩।১

অসুররা আর্য কিনা এ বিষয়ে কিন্তু পণ্ডিতরা একমত নন। কেউ কেউ মনে করেন অসুর যখন দেবতার সমগোত্রীয় তখন অসুর দেবতার মত আরাধ্য। আর্যভাষীদের মধ্যে একদল ছিল দেব-উপাসক, অন্য দল অসুর-উপাসক।[১] অন্যেরা অসুরদেরও আর্যদের মতো জাতি বা জন মনে করেন। তাঁদের মতে অসুররা ভারতে আসে এসিরিয়া থেকে আর্যদের আগে এবং মোহেঞ্জোদড়োর সভ্যতা এদেরই কীর্তি।[২]

অথর্ববেদে সার্বজনীন ধর্ম—অথর্ববেদেই যে প্রথম সে যুগের ভারতের অন্ততঃ একটা এলাকার জনসাধারণের ধর্মের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতি-নিম্নাধিকারী শকংভর[৩] থেকে আরম্ভ করে অতি-উচ্চাধিকারী ঋষি পর্যন্ত সবাইকে নিয়ে এই জনসাধারণ। অথর্ববেদের ধর্ম, পুরুষ নারী সবার ধর্ম ; গ্রামের ধর্ম, নগরের ধর্ম ; এ ধর্ম যেমন ব্যষ্টিগত, তেমনি তার সমষ্টিগত রূপও লক্ষ্য করা যায়।[৪]

'সব'-যাগ—অথর্ববেদে সাধারণ মানুষের ধর্মকর্মের দিকে যে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল তার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ মিলে এই বেদের 'সব'-যাগের ব্যবস্থায়। ঋগ্‌বেদাদিতে নির্দিষ্ট যাগযজ্ঞের ক্রিয়াকাণ্ড অত্যন্ত জটিল এবং এই-সব যজ্ঞাদি অতিশয় ব্যয়সাধ্যও ছিল। কাজেই, সাধারণ লোকের এ-সবের অনুষ্ঠান করার সামর্থ্য ছিল না। কিন্তু 'সব'-যাগগুলি খুবই সরল, স্বল্পব্যয়সাধ্য অথচ ঋগ্‌বৈদিক যজ্ঞের মতোই ফলদায়ক।[৫] সেইজন্য, সাধারণ লোকেও এই-সব যাগের অনুষ্ঠান করতে পারত।

ধর্মানুষ্ঠানের ভার পুরোহিতের উপর—অথর্ববেদেও দেখা যায় ধর্মানুষ্ঠানের ভার পুরোহিতের উপর ; যজমানের হয়ে পুরোহিতই যাগযজ্ঞ করতেন। তবে কোনো কোনো ব্যাপার পুরোহিত ছাড়াই চলত।[৬]

যাগযজ্ঞ ব্যক্তিগত বা পরিবারগত—বৈদিক যাগযজ্ঞ ছিল ব্যক্তিগত বা পরিবারগত ধর্মানুষ্ঠান। তবে কতকগুলি বড় বড় যজ্ঞও ছিল যাতে বহুলোক যোগ দিত। এইসব লোকের মধ্যে তথাকথিত নীচু জাতের লোকেরাও থাকত।[৭]

গৃহস্থের ধর্ম—এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় বেদোক্ত ধর্ম গৃহস্থের ধর্ম। উপনিষদের ব্রহ্মবাদী ঋষিরাও প্রধানতঃ গৃহস্থ। বেদোক্ত ধর্মের এই বিশেষত্বটি তন্ত্রোক্ত ধর্মেও লক্ষ্য করা যায়। তন্ত্রের ধর্মও প্রধানতঃ গৃহস্থের ধর্ম।

যজ্ঞে সঙ্গীতাদি—বৈদিক যজ্ঞে আহূত দেবতাদের প্রসন্ন করবার জন্য গীত, বাদ্য, নৃত্য

১ দ্রঃ V. A., pp. 219-20 ২ Ibid, p. 250
৩ অ বে ৫।২২।৪ ৪ R. Ph. AV., pp. 5-6
৫ R. Ph. AV., p. 7 ৬ Ibid, p. 5 ৭ R. I., p. 202

এ-সব ত থাকতই। তাছাড়া, মল্লযুদ্ধ, লক্ষ্যভেদ, রথচালনা-প্রতিযোগিতা এবং পাশাখেলা থাকত আর থাকত অশ্লীল ভাষণ।[১]

এই সবের মধ্যে কতকগুলোকে পরবর্তীকালেও কোনো কোনো পূজার উৎসবানুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত দেখা যায়।

ইষ্টি-যাগ—বেদে নানা রকমের যাগযজ্ঞের কথা আছে। তার মধ্যে কতকগুলিকে বলা হত ইষ্টি-যাগ। অমাবস্যায় এবং পূর্ণিমাতে কতকগুলি ইষ্টি-যাগ হত। এই গুলির ছিল বিশেষ গৌরব।[২]

অমাবস্যা—এ ছাড়া বৈদিক ঋষিরা অমাবস্যাকে অগ্নিস্থাপনের প্রশস্ত সময় মনে করতেন।[৩]

পরবর্তীকালেও দেখা যায় তন্ত্রাদিতে অমাবস্যাকে কালীপূজার অতি প্রশস্ত সময় বলে গণ্য করা হয়েছে। অনুমান হয় তার অন্যতম কারণ ধর্মানুষ্ঠানের ক্ষেত্রে বেদের সময় থেকে আরম্ভ করে বরাবর অমাবস্যার গুরুত্ব স্বীকৃত হয়ে এসেছে। সেইজন্য অমাবস্যায় বৈদিক ক্রিয়াকর্ম বন্ধ হয়ে গেলে তার স্থান নেয় স্মার্ত ক্রিয়াকর্ম বা তান্ত্রিক পূজা।

মানত—মানুষ তার আদিম অবস্থা থেকেই দেবতার কাছে মানত করে এসেছে। বৈদিক যুগের মানুষও করেছে।[৪] পরবর্তীকালেও দেখা যায় লোকে মানত করে দেবপূজা করছে। তন্ত্রশাস্ত্রে এই ধরণের পূজাকে কাম্যপূজা বলা হয়েছে।

শিবা—আরেকটি বৈদিক অনুষ্ঠানের উল্লেখ করা যায়। হিরণ্যকেশী-গৃহ্যসূত্রে (১।১৬।২১) আছে শিবাকে (শৃগালীকে) উদ্দেশ করে মন্ত্র পড়ে তার পূজা করার বিধান।[৫]

এই শিবাপূজাই হয়ত তন্ত্রশাস্ত্রে দেবীর শিবারূপ কল্পনার এবং বিবিধ তান্ত্রিক ক্রিয়ায় 'শিবাবলি' দেবার বিধানের মূল।

এমনিভাবে দেখা যায় বৈদিক যুগের মানুষের ধর্মে এমন অনেক কিছু ছিল যা প্রায় ঠিক সেই রকম ভাবেই তন্ত্র পর্যন্ত চলে এসেছে।

বেদে নারী—তন্ত্রে দেখা যায় নারীর অতি উচ্চ স্থান। বেদে তার কিরূপ স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে দেখা যাক।

পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় ব্রহ্মসূত্রের শক্তিভাষ্যে[৬] জৈমিনীয় সূত্রাদির আলোচনা করে দেখিয়েছেন, নারীর যাগাধিকার ছিল এবং ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার ছিল।

১ R. Ph. V. U, p. 258-59 ২ Ibid, p. 319 ৩ Ibid

৪ তৈ সং ৩।৪।৫ ৫ Grihya-Sutras, Part II, p. 188

৬ ব্রহ্মসূত্রের (৩।৩।৪৩) ভাষ্যে

গৃহ্যসূত্র অনুসারে[1] যজমান অসমর্থ হলে তার পত্নীর গৃহ্য অগ্নিতে সায়ং- এবং প্রাতঃ-হোম করার এবং সায়ং-'বলিহরণে'র অধিকার আছে।[2]

তা ছাড়া, যজমানকে সপত্নীক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে হত। পত্নী ছাড়া যজ্ঞই হত না। যজ্ঞানুষ্ঠানে পত্নীরও কতকগুলি কৃত্য ছিল।

বৈদিক যুগে বেদপন্থীদের মধ্যে নারীর গৌরবের আসনই ছিল। ঋগ্‌বেদে মন্ত্রদ্রষ্টা পুরুষের মত মন্ত্রদ্রষ্টা নারীরও দেখা মিলে। লোপামুদ্রা,[3] বিশ্ববারা আত্রেয়ী,[4] অপালা আত্রেয়ী,[5] বাগাম্ভৃণী,[6] শ্রদ্ধা কামায়নী[7] প্রভৃতি ঋক্-মন্ত্রের ঋষি।

এ ছাড়া উপনিষদেও গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি ব্রহ্মবাদিনী নারীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

কাজেই, নারীর ক্ষেত্রেও দেখা যায় বেদে তার যে-গৌরবের আসন ছিল তন্ত্রেও তাই অব্যাহত আছে, বরং তন্ত্রে যেন আরও মহিমান্বিত হয়েছে।

ধর্মপ্রবাহ—আদিম মানুষের সরল হৃদয়ের গোপন গুহায় জন্ম নিল দেবকল্পনার নির্ঝর। সে-নির্ঝর একদা স্রোতস্বিনী হয়ে বেরিয়ে পড়ল অন্তহীন যাত্রাপথে। কত মানুষের কত ধর্মবিশ্বাসের ধারা এসে সেই স্রোতস্বিনীতে মিশল। তেমনি একটি ধারা বৈদিক ঋষিদের ধর্মের এবং আরেকটি ধারা বৈদিক যুগের সাধারণ মানুষের। শেষোক্ত ধারাটি প্রথমোক্ত ধারার চেয়ে প্রাচীন এরূপ অনুমান করা যায়। এই উভয় ধারার সম্মিলনের প্রথম গ্রন্থগত পরিচয় পাওয়া গেল অথর্ববেদে এবং তার পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে।

স্রোতস্বিনী বয়ে চলল মিলিত ধারায়, প্রবাহিত হল নানা শাখায় প্রশাখায়। পরিচিত হল শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি নানা নামে।

সনাতনধর্ম— এই ধর্ম সনাতনধর্ম, ভারতের বেশীর ভাগ মানুষের ধর্ম। হিন্দুধর্ম নামে এর সাধারণ পরিচয়। হিন্দু নাম বিদেশীর দেওয়া। তা ছাড়া, কথাটার মধ্যে ধর্মের কোনো পরিচয়ের ইঙ্গিতও নেই। সে-ইঙ্গিত আছে সনাতন শব্দটির মধ্যে। সনাতনধর্ম এই ধর্মের শাস্ত্রসম্মত নামও বটে।

এ ধর্ম শাশ্বত সত্যানুসন্ধান, এ একটা মত বা Creed-মাত্র নয়। সেইজন্য এ ধর্ম কখনও সেকেলে হয়ে যায় না।[8] তাই, এ ধর্ম সনাতন। কোনো অবতার, মুনি-ঋষি বা মহাপুরুষের উপর এর নির্ভর নয়। এঁরা যুগে যুগে এসেছেন আর সনাতন ধর্মকে যুগোপযোগী করে প্রচার করে গেছেন এইমাত্র।

---

১ দ্রঃ গোভিল গৃহ্যসূত্র ১।৩।১৫, ১।৪।১৯ ২ R. Ph. V. U., p. 358

৩ ঋ বে ১।১৭৯-এর সায়ণভাষ্য ৪ ঐ ৫।২৮ ও সায়ণভাষ্য ৫ ঐ ৮।৯১ ও সায়ণভাষ্য

৬ ঋ বে ১০।১২৫ ও সায়ণভাষ্য ৭ ঐ ১০।১৫১ ও সায়ণভাষ্য ৮ H. B., Vol. I., p. XOI

সত্যানুসন্ধানের কোনো বাঁধা রাস্তা নেই ; নির্দিষ্ট কোনো একটিমাত্র শাস্ত্রগ্রন্থ নেই ; কোনো এক সময়ে এই ধর্মের চরম লক্ষ্যে পৌঁছে গেছেন এমন কোনো একজনমাত্র মহাপুরুষও থাকতে পারেন না।

সেই জন্য সনাতনধর্মে নূতন নূতন শাস্ত্র দেখা দেয়, নূতন নূতন অবতার আসেন, নূতন নূতন মত ও পথ গড়ে উঠে। ধর্মসম্বন্ধীয় কোনো জ্ঞান, কোনো চিন্তাভাবনার সঙ্গেই এ ধর্মের কোনো বিরোধ নেই। একমাত্র জড়বাদী নাস্তিক ছাড়া আর সবার জন্যই এর দ্বার খোলা।

এই সনাতনধর্ম নিত্য চলমান। প্রচণ্ড এর জীবনী শক্তি। দেখা গেছে যখনই কোনো গ্লানি উপস্থিত হয়ে একে শুকিয়ে মারবার উপক্রম করেছে তখনই নূতন নূতন পুষ্পপল্লবে এ ধর্ম আবার বিকশিত হয়ে উঠেছে।[১]

অধিকারভেদ—সত্যানুসন্ধানের শক্তি সকলের সমান থাকে না। এই মনোবিজ্ঞান-সম্মত সত্যটি সনাতনধর্মে অতি প্রাচীন কাল থেকেই স্বীকৃত হয়ে এসেছে। সেইজন্য, এই ধর্মের সাধনার ক্ষেত্রে অধিকারভেদ মেনে চলা হয়। সাধনার ক্ষেত্রে যার যত টুকু শক্তি তার ততটুকু অধিকার। সেই অধিকার অনুসারে তার জন্য ধর্মব্যবস্থা। এমন কি প্রত্যেক ব্যক্তির প্রকৃতি ও রুচি অনুসারে তার ধর্মসাধনা নির্দিষ্ট হয়। জগতের আর কোনো ধর্মে এরূপ ব্যবস্থা নাই।

সেইজন্য, সনাতনধর্মে গ্রাম্য দেবদেবীর পূজক অন্ধবিশ্বাসী অতি নিম্নাধিকারী মানুষ থেকে আরম্ভ করে উচ্চতম তত্ত্বের অনুসন্ধানকারী ব্রহ্মসাধক পর্যন্ত সবার জন্যই সাধনার ব্যবস্থা আছে।

ধর্মসমন্বয়— প্রধানতঃ বেদপন্থী ব্রাহ্মণরাই সনাতনধর্মের নেতা। যজমানের দল বাড়াবার জন্য স্বার্থবুদ্ধির খাতিরেই হোক কিংবা মানসিক উদারতার জন্যই হোক এঁরা সভ্যতার নানা স্তরের নানা জন-এর দেবতা ও ধর্মবিশ্বাসকে নিজেদের ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আর যে-সবকে করেন নি সে-সব সম্বন্ধেও চোখ বুজে রয়েছেন। তাই দেখা যায় শাস্ত্রীয় দেবতা ও ধর্মবিশ্বাসের পাশেই লৌকিক দেবতা ও ধর্মবিশ্বাসের সহজেই স্থান হয়েছে।

সনাতনধর্মীয় দেবমণ্ডল— সেইজন্যই, সনাতনধর্মের দেবমণ্ডলে বহু এবং বিচিত্র দেবদেবীর স্থান ; বিচিত্র তাঁদের রূপকল্পনা। এই দেবমণ্ডলে কত পরিবর্তন ঘটেছে ; নূতন নূতন দেবতারা এসেছেন। অনেক ক্ষেত্রে পুরনোরা তাঁদের আত্মসাৎ করে নিয়েছেন ;

১ H. B. Vol. I., p. XCI

তার জন্য পুরনোদেরও রূপ বদলে গেছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে পুরনোরা নূতনদের জায়গা ছেড়ে দিয়ে অন্তর্ধান করেছেন। এই অন্তর্ধানকারীদের দলে আছেন মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি সব বড় বড় বৈদিক দেবতা।

একই কারণে সনাতনধর্মী মানুষের মধ্যেও বিচিত্র মত ও বিশ্বাস লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু সমস্ত বৈচিত্র্যকে এক সুতোয় গেঁথে রেখেছে একটি তত্ত্ব—পরম একের তত্ত্ব, বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মতত্ত্ব।

অবৈদিক ধারা—লক্ষ্য করা গেছে বেদের সময়েই ভারতের ধর্মপ্রবাহে একটি অবৈদিক ধারা ছিল। যে-ধারাকে আমরা জনসাধারণের ধর্মের ধারা বলেছি সেই লোকায়ত ধারাও প্রধানতঃ অবৈদিক। কালে এই ধারায় বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি কয়েকটি স্রোত দেখা দিল। এই-সব ধর্মে দেবতা ও ব্রাহ্মণকে নস্যাৎ করে দেওয়া হল। ধর্মের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য অস্বীকার করে সকল মানুষের সাম্য ঘোষণা করা হল। এই-সব মতের সার কথা মানুষ আত্মশক্তির বলেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবে, তার জন্য দেবতা বা ব্রাহ্মণ কারুর উপরই নির্ভর করার প্রয়োজন নেই।

শৈবমত এবং শাক্তমতেরও একটা বড় অংশ অবৈদিক। কিন্তু সে কথা পরে।

বৈদিকে অবৈদিকে মিলে সনাতনধর্ম—বৈদিকে অবৈদিকে মিলে সনাতনধর্ম। এতে আছে নানা সম্প্রদায় এবং উপসম্প্রদায়। শাস্ত্রে সাধারণতঃ শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত, সৌর এবং গাণপত্য এই পাঁচটি উপাসক-সম্প্রদায়ের উল্লেখ করা হয়।

যাঁরা বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ভুক্ত নন তাঁদের দশকর্মান্বিত হিন্দু বলা হয়; তাঁরা বিশেষ কোনো দেবতার মন্ত্রে দীক্ষা নিলেও অন্যান্য দেবতার পূজা করেন এবং মোটামুটি স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান মেনে চলেন। তাঁদের মধ্যে এমন-সব উৎসব আছে, মেয়েরা এমন-সব ব্রত-নিয়ম পালন করেন, যেগুলি লোকায়ত এবং আদিম মানুষের ধর্মবিশ্বাসের স্মৃতি বহন করছে বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন।[১]

সনাতনধর্মের উদারতা—ভারতের এই সনাতনধর্ম। এই ধর্মে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা আছে, অর্থহীন আচারের অযৌক্তিক প্রাধান্য আছে, মূঢ়তা আছে, বিকার আছে, কিন্তু এ-সব থাকা সত্ত্বেও এ এক মহান্ বিরাট্ প্রবাহ। কত শতাব্দীর ঘাটে ঘাটে বয়ে এল, কত কোটি মানুষের হৃদয়ের তৃষ্ণা মিটাল, তাদের অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়সের ব্যবস্থা করল। আশ্চর্য উদার এই ধর্ম।

১ বা ই, পৃঃ ৫৭৬-৭৭

এই ধর্মেরই এক মহাপুরুষের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে বিশ্বমানবের কণ্ঠ—পিতৃশক্তি শিব আর মাতৃশক্তি পার্বতী। জগতের এই পিতামাতা আমার পিতামাতা। সব শিবভক্ত অর্থাৎ কল্যাণের উপাসক আমার বান্ধব আর ত্রিভুবন আমার স্বদেশ।[1]

১ মাতা চ পার্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্‌।
—শঙ্করাচার্যকৃত অন্নপূর্ণাস্তব, শ্লোক ১২

চতুর্থ অধ্যায়

মহাদেবী—শ্রৌত সাহিত্যে

বৈদিক দেবতা : প্রাকৃতিক শক্তির রূপকল্পনা—কেউ কেউ মনে করেন বেদের প্রধান প্রধান দেবতারা প্রকৃতিরই বিভিন্ন শক্তির রূপকল্পনা। এঁরা অবশ্য প্রকৃতি বলতে মনে করেন বহিঃপ্রকৃতি, ইংরেজিতে যাকে বলে External Nature. কাজেই এঁদের কথা আংশিকভাবে সত্য বলা যায়। কিন্তু যদি প্রকৃতিকে ভারতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্রের দৃষ্টিতে দেখা যায়, এবং প্রকৃতি বলতে পরা প্রকৃতি এবং অপরা প্রকৃতি এই উভয় রূপকেই ধরা হয় তা হলে কথাটার পূর্ণ সত্য পাওয়া যাবে।

এইভাবে বিচার করলে দেখা যাবে দেবতারা-সব শক্তিরই বিগ্রহ। প্রত্যেক দেবতা একটি বিশেষ শক্তির বিগ্রহ।[১] ঐ শক্তিতেই ঐ দেবতার দেবত্ব। যাতে করে অগ্নির অগ্নিত্ব সেই শক্তিই ত অগ্নি। সেই শক্তি থেকে পৃথক করলে অগ্নির অস্তিত্বই থাকে না। অন্যান্য দেবতাদের সম্বন্ধেও ঐ একই কথা।

শক্তির পুরুষরূপ—তবে পূর্বেই লক্ষ্য করা গেছে বৈদিক ঋষিরা এই-সব শক্তিকে অর্থাৎ দেবতাকে প্রধানতঃ পুরুষরূপেই কল্পনা করেছেন। শক্তির পুরুষরূপ কল্পনার কথা শুনলেই কেমন খট্‌কা লাগে। কারণ সংস্কৃত ভাষায় শক্তি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। এই ভাষার বিচারেই খট্‌কা, নৈলে খট্‌কা লাগবার কথা নয়। কেন না, পরমার্থতঃ শক্তি পুরুষও নয়, স্ত্রীও নয়; এটি স্ত্রীপুরুষনিরপেক্ষ সত্তা। কাজেই, শক্তিকে পুরুষও কল্পনা করা যেতে পারে, স্ত্রীও কল্পনা করা যেতে পারে। বৈদিক ঋষিরাও তাই করেছেন।

ঋগ্‌বেদে মহাশক্তির আদিরূপ—অদিতি সম্পর্কে আলোচনা করবার সময় আমরা দেখেছি বিভিন্ন দেবদেবী যে একই পরম দেবতার রূপভেদ এই তত্ত্ব ঋগ্‌বেদেই প্রকাশিত হয়েছে। অদিতি যে এমনি পরম দেবতা, শাক্ত শাস্ত্রোক্ত আদ্যাশক্তি বা ব্রহ্মময়ী মা মহাশক্তির ভাবটি যে তাঁর মধ্যে রয়েছে তা ও লক্ষ্য করা গেছে।

ঋগ্‌বেদের আরও দুটি বিখ্যাত সূক্তে এই ভাবটির বিশেষ অভিব্যক্তি দেখা যায়। একটি সূক্তকে বলা হয় রাত্রিসূক্ত এবং অপরটিকে বলা হয় দেবীসূক্ত।

রাত্রিসূক্ত—অনুমান করা যায় বৈদিক যুগে একদিন গভীর কাল রাত্রির দিকে অপলক ধ্যান দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন ঋষি কুশিক। তাঁকে আবৃত করে হিল্লোলিত হচ্ছে গভীর

---

১ D. S. I. L., p. 15

কৃষ্ণ অন্ধকার। সহসা তাঁর অন্তরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল রাত্রির সত্য, তার স্বরূপ। তিনি প্রত্যক্ষ করলেন রাত্রিরূপিনী মহাশক্তিকে। বলে উঠলেন[১]—

রাত্রি দেবী সব দেশে সর্বত্র বিরাজ করছেন। ঐ যে তিনি আসছেন। তিনি প্রকাশমান নক্ষত্রসমূহের দ্বারা (অথবা তেজের দ্বারা) বিশেষরূপে দেখছেন। তিনি সর্বশ্রী বা সর্বকল্যাণ ধারণ করছেন (বা প্রদান করছেন।)।

অমর্ত্যা রাত্রি দেবী বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষ (নিখিল প্রপঞ্চ) প্রথমতঃ অন্ধকারে পরিপূর্ণ করলেন; তারপর স্বীয় তেজে আবৃত করলেন নিম্ন লতাগুল্মাদি, উচ্চ বৃক্ষাদি। আর গ্রহনক্ষত্রাদিরূপে জ্যোতির দ্বারা তমঃ নাশ করলেন।

রাত্রি দেবী আসছেন। তিনি নিজের বোন উষাকে আলো দিয়ে সাজালেন। উষা দেখা দিলে রাতের আঁধার দূর হয়।

যাঁর প্রসাদে আমরা সুখে গৃহে (স্বস্বরূপে) 'অবস্থান করি', পাখীরা বৃক্ষে বাস করে, তিনি আজ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন।

দেবীর কৃপায় গ্রামবাসীরা সুখে ঘুমায়, পশুপাখীরা সুখে ঘুমায়, দ্রুতগামী শ্যেনাদিও সুখে থাকে।

মা রাত্রি দেবী, বাঘিনী ও বাঘকে আমাদের থেকে দূরে রাখ (অর্থাৎ হিংসাদ্বেষ প্রভৃতিকে দূরে রাখ), তস্করদের থেকে (অর্থাৎ কামাদির থেকে) আমাদের দূরে রাখ। তার পর আমাদের সহজে (ভবসাগর) তরিয়ে দাও।

সকল বস্তুর উপর ঘন হয়ে আছে কালো অন্ধকার। সেই কালো স্পষ্ট রূপ নিয়ে এসেছে আমার কাছে। ওগো উষা, ওগো রাত্রিদেবী, একে ঘুচিয়ে দাও, যেমন করে ঘুচিয়ে দাও তোমার স্তবকারীদের ঋণ।

ওগো রাত্রি দেবী, ওগো দ্যুতিমানের (পরমাকাশের বা পরমাত্মার) মেয়ে, তুমি গাভীর মত, তোমার স্তব করছি, প্রসন্ন হও। তোমার প্রসাদে আমরা শত্রুজয় করব, আমাদের স্তব এবং হবি গ্রহণ কর।

১ ওঁ রাত্রী ব্যখ্যদায়তী পুরুত্রা দেব্যক্ষভিঃ। বিশ্বা অধি শ্রিয়োঽধিত ॥১
ওর্বপ্রা অমর্ত্যা নিবতো দেব্যুদ্বতঃ। জ্যোতিষা বাধতে তমঃ ॥২
নিরু স্বসারমস্কৃতোষসং দেব্যায়তী। অপেদু হাসতে তমঃ ॥৩
সা নো অদ্য যস্যা বয়ং নি তে যামন্নবিক্ষ্মহি। বৃক্ষে ন বসতিং বয়ঃ ॥৪
নি গ্রামাসো অবিক্ষত নি পদ্বন্তো নি পক্ষিণঃ। নি শ্যেনাসশ্চিদর্থিনঃ ॥৫
যাবয়া বৃক্যং বৃকং যবয় স্তেনমূর্ম্যে। অথা নঃ সুতরা ভব ॥৬
উপ মা পেপিশত্তমঃ কৃষ্ণং ব্যক্তমস্থিত। উষ ঋণেব যাতয় ॥৭
উপ তে গা ইবাকরং বৃণীষ্ব দুহিতর্দিবঃ। রাত্রি স্তোমং ন জিগ্যুষে ॥৮
ঋ বে ১০।১২৭।১-৮

রাত্রিদেবীই কালী—স্বামী অভেদানন্দ বলেন, "এই রাত্রিদেবীই পরে 'কালী' নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছেন।"[1] স্কন্দপুরাণ প্রভৃতি পুরাণে[2] বর্ণিত আছে যে রাত্রিদেবী ব্রহ্মার অনুরোধে মেনকার গর্ভে প্রবেশ করে উমার গাত্রবর্ণ ঢেকে দিয়ে তাঁকে কৃষ্ণবর্ণা করেছেন। এ থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে বৈদিক দেবী রাত্রিই পৌরাণিক পার্বতীরূপে পূজিত হয়ে আসছেন।[3]

বৃহদ্দেবতায় বাগ্‌দেবীকে রাত্রি, সরস্বতী, অদিতি ও দুর্গা বলা হয়েছে।[4] কাজেই সিদ্ধান্ত করা যায় রাত্রি দেবী তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত মহাশক্তি থেকে অভিন্ন।...অন্যভাবে বলা যায় তত্ত্বদৃষ্টিতে বাক্, রাত্রি প্রভৃতি একই মহাদেবীর রূপভেদমাত্র।

দেবীসূক্ত—মহর্ষি অম্ভৃণের কন্যা বাক্। তিনিও একজন মন্ত্রদ্রষ্ট্রী। একদা বাক্ পরাশক্তিকে আপন আত্মারূপে প্রত্যক্ষ করলেন; করে ব্রহ্মরূপিণী হলেন। সেদিন এক অপূর্ব উপলব্ধিতে তাঁর অন্তর উদ্ভাসিত হল। তিনি বলে উঠলেন[5]—

---

১ শ্রীদুর্গা গ্রন্থের অবতরণিকা, পৃঃ ৪০-৪১

২ স্কন্দপুরাণ, মাহেশ্বরখণ্ডান্তর্গত কুমারিকাখণ্ড, অঃ ২২; মৎস্যপুরাণ; অঃ ১৫৪

৩ শ্রীদুর্গা গ্রন্থের অবতরণিকা, পৃঃ ৪২-৪৩   ৪ বৃহদ্দেবতা ২।৭৪-৭৭

৫ ওঁ অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা ।১
অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্যহং ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্।
অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে ।২
অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তীম্ ।৩
ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মাং ত উপ ক্ষিয়ন্তি শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি ।৪
অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।
যং কাময়ে তংতমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্ ।৫
অহং রুদ্রায় ধনুরা তনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং দ্যাবাপৃথিবী আ বিবেশ ।৬
অহং সুবে পিতরমস্য মূর্ধন্ মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বি তিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বোতামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপ স্পৃশামি ।৭
অহমেব বাত ইব প্র বাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈতাবতী মহিনা সং বভূব ।৮
—ঋ বে ১০।১২৫।১-৮

আমি একাদশ রুদ্ররূপে, অষ্টবসুরূপে বিচরণ করি ; দ্বাদশ আদিত্যরূপে, সকল দেবতারূপে বিচরণ করি। আমি মিত্র ও বরুণ উভয়কে ধারণ করি, ইন্দ্র ও অগ্নি উভয়কে ধারণ করি, আর ধারণ করি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে।

আমি শত্রুহন্তা সোমকে ধারণ করি, আমিই ধারণ করি ত্বষ্টা, পূষা আর ভগদেবতাকে। যে হবির অধিকারী, প্রচুর হবি দিয়ে দেবতাদের তৃপ্তিসাধন করে যে এবং যে সোমরস প্রস্তুত করে, সেই যজমানকে আমি ধনাদি দিয়ে থাকি।

আমি সবজগতের ঈশ্বরী, উপাসকদের সব ধন আমিই দিই। আমি স্বাত্মারূপে ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ করেছি, আমি ব্রহ্ম। আমি যজ্ঞার্হদের মধ্যে প্রথমস্থানীয়া। বহুভাবে প্রপঞ্চরূপে আমি অবস্থিতা, সর্বভূতে জীবভাবে প্রবিষ্টা। সেইজন্য, সর্বদেশে দেবতারা (জ্ঞানী ব্যক্তিরা) আমারই আরাধনা করেন।

যে অন্ন ভোজন করে, যে দেখে, যে নিশ্বাস-প্রশ্বাস নেয়, কিছু বলা হলে যে শোনে, সে আমার দ্বারাই অর্থাৎ আমার শক্তিতেই এ-সব করে। যারা আমাকে এরূপভাবে (অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত) জানে না তারা এই না জানার জন্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ওগো কীর্তিমান্ বন্ধু শোন, তোমাকে যা শ্রদ্ধালভ্য সেই ব্রহ্মতত্ত্ব বলছি।

দেবতাদের এবং মানুষদের সেবায় ও প্রার্থনায় তুষ্ট হয়ে আমি স্বয়ং এটি (ব্রহ্মতত্ত্ব) বলছি। যাকে ইচ্ছে করি তাকেই আমি শ্রেষ্ঠ করে দিই, ব্রহ্মা করে দিই, ঋষি করে দিই, প্রজ্ঞাবান্ করে দিই।

ব্রাহ্মণদ্বেষী হিংস্র অসুরকে (ত্রিপুরাসুর) বধ করার জন্য আমিই রুদ্রের ধনুতে জ্যা আরোপণ করি। আমি স্তবকারীদের জন্য (তাদের কল্যাণের জন্য) সংগ্রাম করি। আমি দ্যৌ এবং পৃথিবীতে অনুপ্রবিষ্টা হয়ে আছি। এই ভূলোকের উপর যে পিতা দ্যৌ (আকাশ) রয়েছেন তাকে আমি প্রসব করেছি। সমুদ্রে (অন্তরিক্ষে) জলময় দেবশরীরে আমার যোনি অর্থাৎ কারণভূত ব্রহ্মচৈতন্য বিরাজমান। এইজন্য, কারণাত্মিকা অর্থাৎ ব্রহ্মময়ী বলে আমি সমস্ত ভুবনে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছি। আর ঐ দ্যুলোক আমার কারণভূত মায়াত্মক দেহের দ্বারা স্পর্শ করে আছি।

আমিই কারণরূপে বিশ্বভুবনের উৎপত্তিস্থল এবং আমিই স্বয়ং বিশ্বভুবনরূপে বর্তমান। বায়ুর মতো সহজে আমি বিশ্বের মধ্যে (অন্তরে ও বাইরে) বিচরণ করি। ব্রহ্মচৈতন্যরূপে আমি আকাশকেও ছাড়িয়ে রয়েছি, এই পৃথিবীকেও ছাড়িয়ে রয়েছি। আবার স্বমহিমায় দ্যৌ-পৃথিবীরূপ অর্থাৎ জগৎপ্রপঞ্চরূপ হয়েছি।

শক্তিতত্ত্বের মূল—ঋগ্বেদীয় এই দেবীসূক্তকে শক্তিতত্ত্বের আদি-উৎস মনে করা হয়। এই সূক্তে দেবীর যে-রূপ অভিব্যক্ত হয়েছে, যে-তত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে, পরবর্তী শাক্তশাস্ত্রে তাই বিস্তারিত হয়েছে।

মহাদেবীর ভাববিগ্রহ—মহাদেবীর এই ভাবরূপের উন্মেষ হলে সমস্ত দেবীর এবং অনেক দেবের ভাবরূপ তার সঙ্গে মিশে গেল, কোথাও সম্পূর্ণরূপে, কোথাও আংশিকভাবে, কোথাও বা ঈষৎ-পরিবর্তিত আকারে। অন্যভাবে বলা যায় বহুদেবতার উপাদান নিয়ে বহুকাল ধরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠল মহাদেবীর বিরাট্ ভাববিগ্রহ। এ-সব উপাদান কেবলমাত্র আর্য দেবমণ্ডল থেকে আসে নি, আর্যেতর দেবমণ্ডল থেকেও এসেছে।

বহু দেবতার সমবায়ে যে মহাদেবীর ভাববিগ্রহ গড়ে উঠেছে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে মার্কণ্ডেয়পুরাণে। ঋষি মেধা বলছেন[১]—

তারপর অতিক্রুদ্ধ বিষ্ণুর মুখ থেকে এবং ব্রহ্মা ও শিবের মুখ থেকে নির্গত হল মহৎ তেজ। ইন্দ্রাদি অন্য দেবতার শরীর থেকে সুমহৎ তেজ নির্গত হয়ে একত্র মিলিত হল।

সমস্ত দেবতার শরীরজাত অতুলনীয় সেই ত্রিলোকব্যাপী তেজোরাশি একত্র হয়ে এক নারীমূর্তি ধারণ করল।

বৈদিক দেবীগণ—বেদে দেবীদের যে-সব নাম পাওয়া যায় সে-সব নামের একটা মোটামুটি তালিকা আমরা আগেই দিয়ে এসেছি। এই-সব দেবীদের মধ্যে যাঁদের নাম বেদের সংহিতা-অংশে আছে তাঁদের কাউকে কাউকে পরবর্তীকালে আর দেখতেই পাওয়া যায় না। দৃষ্টান্ত হিসাবে নাম করা যায় সরন্যূ, পৃশ্নি, সিনিবালী প্রভৃতির।

সিনিবালী, রাকা, অনুমতি, কুহূ এঁরা বাগ্‌দেবীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছেন। বৃহদ্দেবতায় (২।৭৭) সিনিবালী প্রভৃতিকে বাগ্‌দেবীরই ভিন্ন ভিন্ন নাম বলা হয়েছে।

আবার রাত্রি, মেধা, নির্ঋতি, সরস্বতী, শ্রী, লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবীরা কেউ কেউ স্বনামেই শাক্তদের আরাধ্যা মহাদেবীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছেন। মহাদেবীর নামের তালিকায় এই নামগুলি পাওয়া যায়।[২] এঁদের মধ্যে রাত্রির বিষয় আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বিষয় একটু স্বতন্ত্র। মার্কণ্ডেয়পুরাণের দুর্গাসপ্তশতীতে মহাকালী,

---

১ ততোঽতিকোপপূর্ণস্য চক্রিণো বদনাৎ ততঃ। নিশ্চক্রাম মহৎ তেজো ব্রহ্মণঃ শঙ্করস্য চ।
অন্যেষাং চৈব দেবানাং শক্রাদীনাং শরীরতঃ। নির্গতং সুমহৎ তেজস্তচ্চৈক্যং সমগচ্ছত।
অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্বদেবশরীরজম্। একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা।

দু স, ২।৯-১০, ১২

২ নৈঋত্যৈ ভূভৃতাং লক্ষ্মৈ শর্বাণ্যৈ তে নমো নমঃ।—দু স, ৫।৯
লক্ষ্মি লজ্জে মহাবিদ্যে শ্রদ্ধে পুষ্টি স্বধে ধ্রুবে।
মহারাত্রি মহামায়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে।
মেধে সরস্বতি বরে ভূতি বাভ্রবি তামসি।
নিয়তে ত্বং প্রসীদেশে নারায়ণি নমোঽস্তু তে।—ঐ, ১১।২১-২২

মহালক্ষ্মী এবং মহাসরস্বতী—মহাদেবীর এই তিন রূপের কথা আছে। আবার ধর্মানুষ্ঠানের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র দেবীরূপে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর পূজা হয়।

সরস্বতী—বাক্, ভারতী, সরস্বতী, ইলা এঁরা প্রথমে স্বতন্ত্র দেবী ছিলেন। তার প্রমাণ আছে বেদসংহিতাতেই। ঋগ্‌বেদে আছে[1]—

আমাদের যজ্ঞে ভারতী আসুন; ইলা এই যজ্ঞের কথা চিন্তা করে আসুন; মানুষ কোথাও শীঘ্র আসা কর্তব্য মনে করে যেমন করে আসে তেমনি আসুন; আর আসুন দেবী সরস্বতী। তিনজন সুকর্মা দেবী এই সুখকর যজ্ঞে আসুন।

দেখা যায় ইলা ও ভারতী বৈদিক সরস্বতীর নিত্যসহচরী। সরস্বতীসূক্ত ছাড়াও অন্যান্য সূক্তের ৪০টি মন্ত্রে সরস্বতীর স্তুতি আছে। এগুলির মধ্যে অধিকাংশ মন্ত্রেই সরস্বতীর সঙ্গে ইলা ও ভারতীর নামও পাওয়া যায়।[2]

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় শ্রৌত সম্প্রদায়গত মত অনুসারে ইলা, ভারতী এবং সরস্বতী অগ্নিরই মূর্তি। সায়ণ একটি সূক্তের ভাষ্যে ইলাদি শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন ইলাদি শব্দে অভিহিত হয়েছে অগ্নির তিন মূর্তি।[3]

কোনো কোনো মন্ত্রে[4] এই তিন দেবীর সঙ্গে মহীর নামও করা হয়েছে। আবার কোনো কোনো মন্ত্রে[5] ভারতীকে বাদ দিয়ে অন্য তিন জন দেবীর নাম পাওয়া যায় অর্থাৎ ইলা, সরস্বতী ও মহীর নাম পাওয়া যায়।

তার পর দেখা যায় সরস্বতী এসেছেন এঁদের পুরোভাগে। তাঁর সঙ্গে ইলাদি অন্য দেবীরা এক হয়ে গেছেন। এই সময়ে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-পর্বে বাক্-দেবীও সরস্বতীর সঙ্গে এক হয়ে যান।[6]

সরস্বতী শব্দের ব্যাখ্যা—বেদে সরস্বতী যেমন দেবতার নাম তেমনি নদীর নামও বটে। যাস্ক লিখেছেন[7]—সরস্বতী কথাটি নদী এবং দেবতা উভয় অর্থেই বেদে ব্যবহৃত

১ আ নো যজ্ঞং ভারতী তূয়মেত্বিলা মনুষ্বদিহ চেতয়ন্তী।
তিস্রো দেবীর্বর্হিরেদং স্যোনং সরস্বতী স্বপসঃ সদন্তু।
—ঋ বে ১০।১১০।৮

২ ঋ বে ১।১৮৮।৮, ২।১।১১, ২।৩।৮, ৩।৪।৮, ৭।২।৮ ইত্যাদি

৩ ইলাদিশব্দাভিধেয়া বহ্নিমূর্তয়স্তিস্রঃ।—ঋ বে ১।১৩।৯-এর সায়ণ-ভাষ্য।

৪ ঋ বে ১।১৪২।৯, ৯।৫।৮

৫ ঋ বে ১।১৩।৯, ৫।৫।৮,

৬ বাগ্‌বৈ সরস্বতী।—শ ব্রা ২।৫।৪।৬, ৩।৯।১।৭

৭ সরস্বতী ইতি এতস্য নদীবদ্দেবতাবচ্চ নিগমা ভবন্তি।—নিরুক্ত ২।২৩

হয়েছে। তবে শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নদী। যাস্কের মতে সরঃ বা সরস্ অর্থ জল। জল যার আছে সে সরস্বতী অর্থাৎ সরস্বতী।[1] ঋগ্‌বেদসংহিতায় জল অর্থে সরস্ শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।[2]

পরে ব্রাহ্মণ- ও উপনিষদ-যুগে সরস্ শব্দের অর্থ বদলেছে।[3] অনুমান করা হয় তখন থেকেই সরস্ শব্দ জ্যোতি অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে, এবং সেইজন্য সরস্বতীরও অর্থ হয়েছে জ্যোতির্ময়ী।

বেদে সরস্বতী শব্দ দেবতা অর্থে ব্যবহৃত হলেও অনুমান হয় গোড়ায় নদী অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। কেন না, বৈদিক ঋষিরা উচ্ছ্বসিতভাবে সরস্বতী নদীর মহিমা বর্ণনা করেছেন। তবে মনে হয় সরস্বতী বলতে তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীকেই লক্ষ্য করেছেন।[4] আর এইজন্যই, সরস্বতীশব্দ ক্রমে দেবতাবাচক হয়ে যায়।

সরস্বতী মাতৃদেবতা—অথর্ববেদে দেখা যায়—আমাদের পুত্র দাও বলে তাঁর কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে।[5] শতপথ-ব্রাহ্মণে বাগ্‌দেবীকে বলা হয়েছে সর্পরাজ্ঞী।[6] সর্প উর্বরতা ও প্রজননের প্রতীক। কাজেই, বাক্ বা সরস্বতী যে মাতৃদেবতা এ ক্ষেত্রেও তার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

মাতৃদেবতার সঙ্গে জলের একটা যোগাযোগ অতি প্রাচীন কাল থেকেই লক্ষ্য করা যায়। সরস্বতীর ক্ষেত্রেও তাই দেখা যাচ্ছে। ঋগ্‌বেদেই বলা হয়েছে—সরস্বতী শ্রেষ্ঠ মাতা, শ্রেষ্ঠ নদী ও শ্রেষ্ঠ দেবী।[7]

সরস্বতী-সম্পর্কীয় কাহিনী—তৈত্তিরীয়সংহিতা, মৈত্রায়ণীসংহিতা এবং শতপথ-ব্রাহ্মণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগ্রন্থে সরস্বতীকে নিয়ে রচিত চমৎকার সব কাহিনী পাওয়া যায়।

যেমন শতপথ-ব্রাহ্মণে এই কাহিনীটি আছে[8]—একবার ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা করায় সোমরস পানের অধিকার হারালেন। ফলে, তিনি নির্বীর্য ও হীনবল হয়ে পড়লেন। দেবতাদের দুর্ভাবনার অন্ত নেই। তাঁরা অশ্বিনীকুমার-দুজনকে বললেন—তোমরা ত ব্রহ্মভিষক্, ভাল করে দাও ইন্দ্রকে। অশ্বিনীকুমারদ্বয় বললেন—আমাদের কাছে পশুবলি দিতে হবে, তবে করব। দেবতারা বললেন—তোমাদের কাছে ছাগবলি দেওয়া হবে।

---

১ সরস্বতী সর ইত্যুদকনাম। সর্তেঃ। তদ্বতী।—নিরুক্ত ৯।২৬

২ ঋ বে ৭।৯৬।৪, ৯।৯৭। ৫২, ১০।৬৬।৫ ইত্যাদি

৩ সরস্বতী, পৃঃ ৪৪ ৪ ঐ, পৃঃ ৫৯

৫ প্রজাং দেবি ররাস্ব নঃ।—অ বে ৭।৬৮ (৭০)।১ ৬ শ ব্রা ৪।৬।৯।১৭

৭ অম্বিতমে নদীতমে দেবিতমে সরস্বতি।—ঋ বে, ২।৪১।১৬

৮ শ ব্রা ১২।৭।১।১১-১২, ১৪

সরস্বতী ভিষক্—দেবতারা সরস্বতীকে বললেন—তুমিও ত ভিষক্, দাও না ইন্দ্রকে ভাল করে।

সরস্বতী বললেন—আমার কাছে পশুবলি দিতে হবে, তবে করব।

দেবতারা বললেন—তোমার কাছে মেষ বলি দেওয়া হবে। তার পর অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং সরস্বতী ইন্দ্রকে ভাল করে দিলেন।

এই কাহিনীর মূল পাওয়া যায় শুক্লযজুর্বেদে। তাতে আছে[১]—দেবতারা ঔষধরূপ সৌত্রামণী যজ্ঞ করলেন। দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমার-দুজন ঔষধের দ্বারা এবং সরস্বতী ত্রয়ীলক্ষণা বাকের দ্বারা ইন্দ্রকে বীর্যবান্ করে তুললেন। সরস্বতী ও ভিষক্।

বাক্ ও সরস্বতী—এখানে আমরা প্রথম বাকের (বাক্যের) সঙ্গে সরস্বতীর সম্পর্ক দেখতে পাই। যখন তিনি বাক্যের দ্বারা ইন্দ্রের বলাধান করেছিলেন তখন তাঁকে বাগ্‌দেবী বলা যেতে পারে।[২]

বাক্ ও সরস্বতী যে এক হয়ে যান এমনিভাবেই সম্ভবতঃ তার সূচনা হয়েছিল।

বাক্ ও সোম—বেদের প্রধান যজ্ঞ সোমযাগ। অথচ, দেবতাদের কাছে সোম ছিল না। সোম তাদের কিনে আনতে হত।

ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে[৩] এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর কাহিনী আছে। সোম তখন গন্ধর্বদের কাছে। দেবতারা ভেবেই আকুল। তাদের কাছ থেকে কেমন করে সোম আনা যাবে? অসুররা সহজে সোম দেবে না। তখন তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন বাগ্‌দেবী। বললেন 'গন্ধর্বরা স্ত্রীকামুক, আমাকে মূল্যস্বরূপ দিয়ে তোমরা সোম কিনে আন।'

সোম না হলে দেবতাদের চলে না; আবার তাঁদের প্রিয় বাগ্‌দেবীকেও তাঁরা ছাড়তে পারেন না। দেবতারা ভারী মুস্কিলে পড়লেন। বাগ্‌দেবী বললেন কোনো চিন্তা করো না তোমরা। তোমাদের যখনই প্রয়োজন হবে তখনই আমি ফিরে আসব।

শেষে দেবতারা রাজি হলেন এবং 'মহতী নগ্নরূপধারিণী' (মহানগ্না কৃত্বা) বাগ্‌দেবীকে গন্ধর্বদের দিয়ে সোম ক্রয় করলেন।

গন্ধর্বদের কাছ থেকে বাগ্‌দেবীর সোম আনয়নের কাহিনী শতপথ-ব্রাহ্মণেও[৪] আছে। তবে অন্যরকমে।

এই-সব কাহিনী থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় বাকের সঙ্গে সোমের একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

১ দেবা যজ্ঞমতন্বত ভেষজং ভিষজাশ্বিনা। বাচা সরস্বতী ভিষগিন্দ্রায়েন্দ্রিয়াণি দধতঃ।—বা সং, ১৯।১২

২ সরস্বতী, পৃঃ ৩১ ৩ ঐ ব্রা ১।৫।১ ৪ শ ব্রা ৩।২।৪।১-৬

কালীমূর্তির পূর্বাভাস—এখানে উল্লেখ করা যায় ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে যেমন 'মহতী নগ্নরূপধারিণী' বাকের কথা আছে তেমনি নিঘণ্টুতেও বাক্‌কে নগ্না বলা হয়েছে।[১] কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে এই নগ্না দেবীর মধ্যে পরবর্তী কালের দিগম্বরী কালীমূর্তির পূর্বাভাস পাওয়া যায়।[২]

দুর্গার পূর্বাভাস—দেবী সরস্বতীর মধ্যে পরবর্তী কালের রণদেবী দুর্গারও পূর্বাভাস পাওয়া যায়। কেন না, দেবী সরস্বতীও রণদেবী। ঋগ্‌বেদেই একাধিক মন্ত্রে[৩] সংগ্রামে দেবী সরস্বতীর সাহায্য প্রার্থনা করা হয়েছে। একটি মন্ত্রে[৪] আছে ঘোররূপা দেবী সরস্বতী হিরণ্ময় রথে আরোহণ করে শত্রুনিধন করেন। অন্য একটি মন্ত্রে দেবীর কাছে এই বলে প্রার্থনা করা হয়েছে[৫]—মরুৎদের সঙ্গে মিলে শত্রুদের পরাভূত কর।

আমরা পূর্বেই বলেছি অদিতিকে শাক্তদের আরাধ্য মহাদেবীর আদি বৈদিকরূপ মনে করা হয়। নিঘণ্টু[৬] অনুসারে অদিতি বাক্-নামের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই অদিতি আর বাক্ অভিন্ন। এদিক দিয়েও বাক্ বা সরস্বতী মহাদেবীর অন্যতম আদিরূপ। দুর্গা মহাদেবীরই রূপভেদ। অতএব সরস্বতীকে দুর্গার পূর্বাভাস বলা যায়।

বাগ্‌দেবীর সিংহীরূপ—বাক্ বা সরস্বতীর মধ্যে যে দুর্গার পূর্বাভাস সূচিত হয়েছে তার আরেকটি নিদর্শনও পাওয়া যায়। শতপথ-ব্রাহ্মণের একটি কাহিনীতে দেখা যায় বাগ্‌দেবী ক্রুদ্ধ হয়ে সিংহীরূপ ধারণ করেন।[৭] এর থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে ঐ ব্রাহ্মণের সময়ে বা তারও আগে দেবীর পশুরূপ স্বীকৃত হত।

অতিপ্রাচীন কালে দেবতার পশুরূপ কল্পিত হত। আর যে-দেবতার যে-পশুরূপ কল্পিত হত দেখা যায় পরবর্তী কালে সাধারণতঃ সেই পশু সেই দেবতার বাহন হয়ে পড়েছে।

এই সূত্র অনুসারে বাগ্‌দেবী বা সরস্বতীর সিংহবাহনা হওয়ার কথা। কিন্তু বেদপরবর্তী সনাতন-দেবমণ্ডলে সিংহবাহনা দেবী দুর্গা, সরস্বতী নন। সরস্বতীকে বাংলা দেশে দুর্গার পরিবার-দেবতা মনে করা হয়। তিনি হংসবাহনা। মহারাষ্ট্রাদি অঞ্চলে সরস্বতী ময়ূরবাহনা।

তবে বৌদ্ধ-দেবমণ্ডলে সরস্বতী সিংহবাহনাই বটেন। সিংহবাহনা বৌদ্ধ সরস্বতীর এবং বাগীশ্বরীর মূর্তি পাওয়া গেছে।[৮]

---

১ নিঘণ্টু ১।১১। নিঘণ্টুতে প্রচলিত পাঠ 'নবা'র পাঠান্তররূপে 'নগ্না'র উল্লেখ আছে দেবরাজের টীকায়। দ্রঃ N. N, p. 4. f. n. 2.

২ Ś. Ś., 2nd Ed., pp. 446-47. ৩ ঋ বে ৬।৬১।৫, ৬

৪ উত স্যা নঃ সরস্বতী ঘোরা হিরণ্যবর্তনিঃ। বৃত্রঘ্নী বষ্টি সুষ্টুতিম্।—ঋ বে ৬।৬১।৭ ৫ ঐ ২।৩০।৮

৬ নিঘণ্টু ১।১১ ৭ শ ব্রা ৩।৫।১।২১ ৮ 'সরস্বতী' গ্রন্থে মুদ্রিত ১৫ নং এবং ১৬ নং চিত্র দ্রষ্টব্য।

লক্ষ্মী—ঋগ্‌বেদে লক্ষ্মী[১] শব্দটি আছে, কিন্তু সেখানে লক্ষ্মী অর্থ লক্ষ্মীদেবী নয়। তেমনি শ্রী[২] শব্দও আছে, তবে শ্রীদেবী অর্থে নয়।

অথর্ববেদে পাওয়া যাচ্ছে "পাপি লক্ষ্মী"[৩] এবং "পুণ্যা লক্ষ্মীঃ"-র[৪] কথা। তবে এঁরা দেবী কি না এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। মনে হয় সায়ণ ওঁদের দেবীই মনে করতেন। কেন না, 'পাপি লক্ষ্মি'-র তিনি ভাষ্য করেছেন 'অলক্ষ্মি'।

শ্রীসূক্ত—ঋগ্‌বেদের খিল অংশে আছে শ্রীসূক্ত।[৫] কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন যজুর্বেদের সময় এই সূক্ত রচিত হয়।[৬]

পৌরাণিক শ্রীদেবী বা লক্ষ্মীদেবীর যে-সব নাম, উপাধি, গুণ, শক্তি ইত্যাদির কথা পাওয়া যায় তার কতকগুলি এই সূক্তে পাওয়া যাচ্ছে। শ্রী এবং লক্ষ্মী এই দুটি বিখ্যাত নামই এতে আছে। পুরাণাদিতে দেখা যায় দেবীর এক নাম পদ্মা এখানেও দেখা যায় দেবীকে বলা হয়েছে পদ্মনেমি, পদ্মেস্থিতা, পদ্মবর্ণা, পদ্মমালিনী ও পুষ্করিণী। পদ্মের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে দেবীর বিশেষ যোগ রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন পদ্ম একান্তভাবে ভারতেরই জিনিস আর দেবী পদ্মাও ভারতেরই কৃষির দেবতা। আগন্তুক আর্যরা পদ্মও চিনত না, পদ্মাকেও চিনত না। তাই, ঋগ্‌বেদে পদ্মা, শ্রী বা লক্ষ্মী দেবীর দেখা মিলে না।[৭]

লক্ষ্মী কৃষির দেবতা—আমরা আগেই লক্ষ্য করে এসেছি আর্যরা ভারতে আগন্তুক কি না এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তা ছাড়া ঋগ্‌বেদে আর্যভাষীদের ধর্মকর্মের পুরো ছবি পাওয়া যায় না। কাজেই, পূর্বোক্ত মতটি অবিসংবাদিত হতে পারে না।

তবে লক্ষ্মী যে কৃষির দেবতা এ বিষয়ে কোনো মতভেদ নাই। আলোচ্য সূক্তে দেবীকে বলা হয়েছে করীষিণী। করীষ অর্থ শুষ্ক গোময়। কাজেই, করীষিণী অর্থ যার অধিকারে গোবর রয়েছে অর্থাৎ যিনি 'গবাদিবহুপশুসমৃদ্ধ'।

সূক্তে আছে দেবীর দুই পুত্র—কর্দম এবং চিক্লীত অর্থাৎ আর্দ্রতা। ভাল চাষের জমির পক্ষে এই দুটিই অপরিহার্য। এর থেকে অনুমান করা হয় লক্ষ্মী ছিলেন গোড়ায় কৃষিজীবী আর্যেতর লোকদের দেবতা।[৮]

দেবী যে সমস্ত ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী সূক্তটিতে তারও পরিচয় আছে। বলা হয়েছে তিনি 'সুবর্ণরজতমালাধারিণী', হিরণ্যবর্ণা, হিরণ্ময়ী। ধনসম্পদ, সন্তানসন্ততি, দাসদাসী সবই তিনি দেন।

---

১ ঋ বে ১০।৭১।২ ২ ঐ ৪।৫৭।৬

৩ অ বে ৭।১১৫।১ (৭।১২০।১) ৪ অ বে ৭।১১৫।৪ (৭।১২০।৪), ১২।৫।৬ ৫ খিল ২।৬

৬ Preface to 'Khilani', Rgveda Saṁhitā, Vol. IV, Vaidik Saṁśodhana Maṇḍala, p. 920. ৭ M. S. I. A. C., pp. 90-91 ৮ Ibid, p. 91

চতুরঙ্গ সেনারূপেও দেবীর স্তুতি করা হয়েছে। তিনি আবার মনের কামনা, তিনি সঙ্কল্প, তিনি বাক্যের সত্য। হরিবল্লভা এবং বিষ্ণুপত্নী বলেও তাঁর উল্লেখ করা হয়েছে।

লক্ষ্মীর পূর্বাভাস—কেউ কেউ মনে করেন ঋগ্‌বেদের পুরন্ধি, রাকা, সিনীবালী প্রভৃতি দেবীর মধ্যে শ্রী বা লক্ষ্মীদেবীর পূর্বাভাস পাওয়া যায়। পুরন্ধি প্রাচুর্যের দেবী, রাকা ঐশ্বর্যশালিনী এবং সুন্দরী। অথর্ববেদে দেবী সিনীবালীর কাছে ধনধান্য কামনা করা হয়েছে।[১] আবার ঋগ্‌বেদে তাঁকে বলা হয়েছে পৃথুষ্টুকা[২] অর্থাৎ পৃথুজঘনা এবং তাঁর কাছে পুত্রাদি চাওয়া হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় দেবীর সঙ্গে প্রজননের যোগ আছে। ঋগ্‌বেদের অন্যত্রও এই যোগ লক্ষ্য করা যায়।[৩] যাস্ক সিনীবালীর অর্থ করেছেন অন্নবতী।[৪] কাজেই সিনীবালী কৃষি ও প্রজননের দেবী।

রাকা ও সিনীবালী—পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে সিনীবালী ও রাকা উভয়েই চন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। পূর্ণিমার অধিষ্ঠাত্রী দেবী রাকা এবং 'সিনীবালী চন্দ্রকলাযুক্তা-অমাবাস্যাভিমানিনী দেবতা'।[৫]

ওষধি, বনস্পতি, শস্য এবং প্রজননের সঙ্গে চন্দ্রের একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ধারণা প্রাচীন জগতে ব্যাপক ছিল। কাজেই, সিনীবালী ও রাকা কৃষি ও প্রজননের দেবতা ছিলেন বলেই অনুমান হয়।

রাকা ও সিনীবালী যে লক্ষ্মীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন কোজাগরী পূর্ণিমায় ও দীপান্বিতা অমাবস্যায় লক্ষ্মীপূজার বিধানের মধ্যে তার একটি নিদর্শন যেন পাওয়া যায়।

আবার আমরা লক্ষ্য করে এসেছি বৃহদ্দেবতায় (২।৭৭) সিনীবালী প্রভৃতিকে বাগ্‌দেবীরই ভিন্ন ভিন্ন নাম বলা হয়েছে। মনে হয় তার কারণ এই-সব দেবীদের কোনো সুস্পষ্ট নির্দিষ্ট রূপ তখনও গড়ে উঠে নি। এইজন্য এঁদের সম্বন্ধে এই ধরণের ভাবনা সম্ভবপর হত।

তা ছাড়া, বাক্‌ ও শ্রী এই উভয় দেবীর কল্পনায়ও বহু মিল ছিল। রাকা ও সিনীবালীর এই উভয় দেবীর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার এটিও একটি কারণ হতে পারে।

শ্রীর সুনির্দিষ্ট দেবীমূর্তি—শ্রীসূক্তেই শ্রীর সুনির্দিষ্ট দেবীমূর্তি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।[৬] যজুর্বেদেও মূর্তিটি সুস্পষ্ট। তবে মনে হয় গোড়ায় শ্রী ও লক্ষ্মী পৃথক্‌ পৃথক্‌ দেবী ছিলেন।

১ অ বে ১৯।৩১।১০ ২ ঋ বে ২।৩২।৬ ৩ ঐ ১০।১৮৪।২ ৪ নিরুক্ত ১১।৩১

৫ বা সং (১১।৫৫)—মহীধরভাষ্য।

৬ কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে সুনির্দিষ্ট দেবীরূপে শ্রীর প্রথম দেখা মিলে শতপথ-ব্রাহ্মণে। দ্রঃ R. Ph. V. U., p. 212

বাজসনেয়িসংহিতায়[১] লক্ষ্মী ও শ্রীকে আদিত্যের দুই স্ত্রী বলা হয়েছে। এখানে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে শ্রী ও লক্ষ্মী ভিন্ন। পরে উভয়ে এক হয়ে যান।

শ্রী ও ভদ্রকালী—শাঙ্খায়ন-গৃহ্যসূত্রে[২] শ্রীর সঙ্গে ভদ্রকালীর উল্লেখ পাওয়া যায়। বিশ্বদেবতাকে অর্ঘ্যদান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে শয্যার শিরোদেশে অর্ঘ্য দিতে হবে শ্রীকে এবং পাদদেশে ভদ্রকালীকে। এ বিষয়ে মনুসংহিতাতেও অনুরূপ বিধান আছে।[৩]

শ্রী ও সরস্বতী—পরবর্তী কালে সরস্বতীকে[৪] ভদ্রকালী বলা হয়েছে। বৈদিক যুগেও শ্রী এবং সরস্বতীর ঘনিষ্ঠ যোগ লক্ষ্য করা যায়। উভয়ের ভাবকল্পনায় প্রভূত মিল আছে। মনে হয় যেন এঁরা অভিন্ন। অনুমান হয় তার কারণ বেদসংহিতার সময়ে বাক্, সরস্বতী, শ্রী প্রভৃতি দেবতার মূর্তি এবং কার্যকলাপ সুনির্দিষ্ট হয় নি। সেইজন্য, কোনো কোনো ক্ষেত্রে একজনের সঙ্গে অপরের সহজে মিশামিশি হয়ে গেছে।

যেমন অথর্ববেদের একটি মন্ত্রে[৫] বলা হয়েছে সরস্বতী ধন দেবেন, গরুর দুধ বাড়াবেন এবং ধান্যাদি বাড়াবেন। শতপথ-ব্রাহ্মণেও[৬] সরস্বতীকে বলা হয়েছে পুষ্টি অর্থাৎ সম্পদের দেবতা। সরস্বতী শ্রীর পুষ্টি হরণ করে নিয়েছিলেন। শ্রী তাঁকে অর্ঘ্য দিয়ে তাঁর কাছ থেকে পুষ্টি ফিরিয়ে পান।

এ দিকে শ্রীসূক্তে শ্রীকে বলা হয়েছে 'বাচঃ সত্যম্'—বাক্যের সত্য। বাক্যের যিনি সত্য তিনিই বাগ্‌দেবী। কাজেই শ্রী বাগ্‌দেবী বা সরস্বতী। শ্রী যে বাগ্‌দেবী এ রকম একটা ঐতিহ্য বহুকাল প্রচলিত ছিল। তার প্রমাণ আছে শুক্রনীতিসারে। উক্ত গ্রন্থে শ্রী বা লক্ষ্মীর সাত্ত্বিক মূর্তি বর্ণনায় বলা হয়েছে দেবী চতুর্ভুজা, তাঁর চার হাতে আছে বীণা, পুষ্প, (দাড়িম), বর- এবং অভয়-মুদ্রা।[৭]

সরস্বতীর লোকপ্রসিদ্ধ বীণাপাণি মূর্তি। কাজেই শুক্রনীতিসারের সময়েও যে শ্রী ও বাগ্‌দেবীর ভাবকল্পনা অভিন্নপ্রায় ছিল তা বোঝা যায়।

পরবর্তী কালেও দেখা যায় মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষের যে পঞ্চমীতে সরস্বতীপূজা বিহিত তাকে বলা হয় শ্রীপঞ্চমী। মনে হয় এই নামকরণেও শ্রী ও সরস্বতীর অভিন্নতা বা অভিন্নপ্রায়তার প্রাচীন ঐতিহ্যের নিদর্শন পাওয়া যায়।

১ বা সং ৩১।২২ ২ শাং গৃ সূ ২।১৪।১৩

৩ উচ্ছীর্ষকে শ্রিয়ৈ কুর্যাদ্ ভদ্রকাল্যৈ চ পাদতঃ।—মনু ৩।৮৯

৪ ওঁ সরস্বত্যৈ নমো নিত্যং ভদ্রকাল্যৈ নমো নমঃ।—ব্রঃ পুঃ ন, অঃ ৬১, পৃষ্ঠা ২৫৭

৫ অ বে ১৯।৩১।১০ ৬ শ ব্রা ১১।৪।৩।১৬

৭ বীণাপুষ্পাভয়বরকরা সত্ত্বা শ্রিয়ঃ।—শুক্রনীতিসার ৪।৪।১৪০

পৌরাণিক যুগে শ্রী বা লক্ষ্মী এবং সরস্বতী সম্পূর্ণ ভিন্ন দেবতা। বাংলাদেশে সরস্বতীর মতো লক্ষ্মীও দুর্গার পরিবার-দেবতা।

মহালক্ষ্মী মহিষমর্দিনী— কিন্তু মার্কণ্ডেয়পুরাণ অনুসারে মহিষমর্দিনী দেবীই মহালক্ষ্মী। বলা হয়েছে সমস্ত দেবতার শরীর থেকে অমিতপ্রভা যিনি আবির্ভূতা হলেন সেই ত্রিগুণা দেবী মহিষমর্দিনী, তিনি সাক্ষাৎ মহালক্ষ্মী।[১]

এই মহালক্ষ্মীই শাক্তদের আরাধ্যা মা মহাদেবী। বলা হয়েছে[২]—ত্রিগুণময়ী পরমেশ্বরী মহালক্ষ্মী সকলের আদ্যা। তিনি সগুণা এবং নির্গুণা এবং সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চ ব্যাপ্ত করে অবস্থান করছেন।

ঋগ্‌বেদে মহাদেবীর লোকপ্রসিদ্ধ নাম নাই—কিন্তু অম্বিকা, উমা, দুর্গা, কালী, তারা প্রভৃতি মহাদেবীর লোকপ্রসিদ্ধ নামগুলির একটিও ঋগ্‌বেদে পাওয়া যায় না।

অম্বিকা—শুক্ল যজুর্বেদে সর্বপ্রথম অম্বিকা নামটি পাওয়া যাচ্ছে। একটি মন্ত্রে[৩] আছে—

রুদ্র, তোমার ভগিনী অম্বিকার সঙ্গে এই তোমার ভাগ গ্রহণ কর।

লক্ষ্য করার বিষয় দেবী অম্বিকাকে এখানে রুদ্রের ভগিনী বলা হয়েছে। তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণ[৪] অনুসারেও অম্বিকা রুদ্রের ভগিনী।

রুদ্রের পত্নীরূপে অম্বিকার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় তৈত্তিরীয়-আরণ্যকে।[৫]

দুর্গা—উক্ত আরণ্যকের একটি মন্ত্রে[৬] দেবী দুর্গার প্রথম নামোল্লেখ করা হয়েছে। মন্ত্রটির ভাবার্থ এই—যিনি অগ্নিবর্ণা, যিনি তপস্যার দ্বারা জ্যোতির্ময়ী, যিনি বৈরোচনী, 'কর্মফলের নিমিত্ত যিনি উপাসিতা' সেই দুর্গা দেবীর শরণ নিলাম।

ঋগ্‌বেদের খিল অংশের একটি সূক্তে[৭] ঠিক এই মন্ত্রটিই আছে। আলোচ্য খিল সূক্তের আরেকটি মন্ত্রেও[৮] দুর্গার নাম আছে।

---

১ সর্বদেবশরীরেভ্যো যাবির্ভূতামিতপ্রভা। ত্রিগুণা সা মহালক্ষ্মীঃ সাক্ষান্মহিষমর্দিনী।—দু স, বৈকৃতিক-রহস্য, শ্লোক ৭

২ সর্বস্যাদ্যা মহালক্ষ্মীস্ত্রিগুণা পরমেশ্বরী। লক্ষ্যালক্ষ্যস্বরূপা সা ব্যাপ্য কৃৎস্নং ব্যবস্থিতা।—দু স, প্রাধানিক রহস্য, শ্লোক ৪

৩ এষ তে রুদ্র ভাগঃ সহ স্বস্রাম্বিকয়া তং জুষস্ব স্বাহা।—বা সং ৩।৫৭ ৪ তৈ ব্রা ১।৬।১০

৫ অম্বিকাপতয়ে উমাপতয়ে পশুপতয়ে নমো নমঃ।—তৈ আ ১০।১৮।১

৬ তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্। দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ সুতরসি তরসে নমঃ।
তৈ আ ১০।১।৬৫

৭ ঋ বে, খিল ৪।২।১২ ৮ ঐ ৪।২।৫

দুর্গাকে বলা হয়েছে বৈরোচনী। বিরোচন শব্দের অন্যতম অর্থ সূর্য বা অগ্নি। কাজেই বৈরোচনী অর্থ সূর্য বা অগ্নির কন্যা।

সূর্য-অগ্নি-দুর্গা—এর থেকে বৈদিক দেবতা সূর্য এবং অগ্নির সঙ্গে দেবী দুর্গা বা শাক্তদের আরাধ্যা মহাদেবীর একটি নিবিড় সম্পর্কের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সূর্যের বিশেষ করে অগ্নির অনেক গুণ এবং কার্যকলাপ দেবী আত্মসাৎ করেছেন। বলা যায় সূর্য এবং অগ্নি দেবীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছেন।

দুর্গা সূর্যদেবতা—কেউ কেউ মনে করেন দেবী দুর্গা মূলতঃ সূর্যদেবতা। এঁদের মতে সূর্য থেকে দুর্গার রূপেরও কল্পনা করা হয়েছে। দেবীর 'তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা' ও 'জটাজুটসমাযুক্তা' মূর্তি সহস্রাংশু কাঞ্চনবর্ণ সূর্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।[১]

এঁরা মনে করেন[২] পরবর্তীকালে দুর্গাপূজার অঙ্গ হিসাবে বিল্ববৃক্ষপূজা, নবপত্রিকা-পূজা ও কলসপূজার যে-বিধি দেখা যায় তা প্রাচীন সূর্যপূজার স্মারক। এঁদের মতে কলস আসলে যূপের রূপান্তর আর বৈদিক যুগে যূপ ছিল আদিত্যের প্রতীক।[৩]

সূর্য কৃষির দেবতা। কেন না, ঋগ্‌বেদেই আছে সূর্য বর্ষণ করেন।[৪] কথাটা তৈত্তিরীয়-আরণ্যকে আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে—যে রশ্মিসমূহের দ্বারা আদিত্য তাপ দেন তাই দিয়েই পর্জন্য বর্ষণ করেন।[৫] স্মৃতিতে আরও পরিষ্কার করে বলা হল—আদিত্য থেকে জাত হয় বৃষ্টি, বৃষ্টি থেকে অন্ন আর অন্ন থেকে প্রজা।[৬] কাজেই, কৃষি সূর্যের উপর নির্ভরশীল। অতএব, সূর্যকে কৃষির দেবতা বলা যায়। দেবী দুর্গাকে কৃষি ও যুদ্ধের দেবতা বলা হয়। সেইজন্য, অনুমান করা যায় কৃষির দেবতারূপে দেবীর ভাবরূপ রচনায় সূর্যও উপাদান হয়েছেন।

তা ছাড়া, ঋগ্‌বেদেই একটি মন্ত্রে সূর্যকে দ্যৌ, পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, স্থাবরজঙ্গম সব কিছুর আত্মা বলা হয়েছে।[৭] সায়ণ মন্ত্রটির ভাষ্যে বলেছেন সূর্য স্থাবরজঙ্গমাত্মক কার্যবর্গের কারণ। শাক্ত মতে মহাদেবীই সমস্ত কার্যের কারণ। কাজেই, পারমার্থিক বিচারেও মহাদেবী সূর্য থেকে অভিন্ন।

বিষ্ণু ও দেবী—আবার বৈদিক সূর্যই যে বিষ্ণু ঋগ্‌বেদের সংসৃষ্ট সূক্তগুলি আলোচনা

---

১ শ্রীদুর্গা, পৃ ৬৪-৬৫ ২ ঐ, পৃ ১৩৯

৩ আদিত্যো যূপঃ।—তৈ ব্রা ২।১।৫ ; অসৌ বা অস্য (অগ্নিহোত্রস্য কতুঃ) আদিত্যো যূপঃ।—ঐ ব্রা ৫।৫(২৫)।৩ ৪ ঋ বে ৭।৩৬।১

৫ যাভিরাদিত্যস্তপতি রশ্মিভিস্তাভি পর্জন্যো বর্ষতি।—তৈ আ ১০।৬৩।১৬

৬ আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ বৃষ্টেরন্নং ততো প্রজাঃ।—মনু, ৩।৭৬ ৭ ঋ বে ১।১১৫।১

করলেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। আর পরমার্থতঃ বিষ্ণু এবং মহাদেবীর মধ্যে কোনো ভেদ নেই। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন "জগদ্ধাত্রীর পালনীশক্তির নাম বিষ্ণু। সূর্যে সে-শক্তি নিহিত আছে।"[১]

দেবীই যে বিষ্ণু এ কথার প্রমাণ আছে বায়ুপুরাণে। শিব বিষ্ণুকে বলছেন—আপনাকে প্রকৃতি এবং আমাকে পুরুষ শিব বলে জানবে। তুমি আমার শরীরের অর্ধভাগ এবং আমি তোমার শরীরের অর্ধভাগ।[২] দেবী প্রকৃতি। তিনি শিবের শরীরের অর্ধভাগ। কাজেই বিষ্ণু দেবী।

সূর্য ও অগ্নি— ঋগ্‌বেদেই[৩] আছে সূর্য এবং অগ্নি এক। একটি ঋকে বলা হয়েছে[৪]—হে অগ্নি, তুমি বৃষভ ইন্দ্র এবং তুমি উরুগায় বিষ্ণু। আর সূর্য ও বিষ্ণু যে এক তা পূর্বেই লক্ষ্য করা গেছে।

অগ্নি ও দেবী—যাস্ক বলেছেন অগ্নিকেও অদিতি বলা হয়।[৫] ইলা, ভারতী ও সরস্বতী যে বহ্নিমূর্তি তা আমরা লক্ষ্য করে এসেছি। শতপথ-ব্রাহ্মণে[৬] পৃথিবীকে অগ্নি বলা হয়েছে। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের মতে সকল দেবতা অগ্নি।[৭] কাজেই, মহাদেবীর সঙ্গে অগ্নিরও যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। অগ্নিও দেবীর ভাবমূর্তির অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

আমরা অদিতির প্রসঙ্গে দক্ষতনয়ার উল্লেখ করেছি। বৈদিক যুগে যজ্ঞবেদীকে (মতান্তরে যজ্ঞকুণ্ডকে) দক্ষতনা বা দক্ষতনয়া বলা হত।[৮] এই দক্ষতনার উপর 'জ্যোতিষ্মতী অগ্নি' বা 'হব্যবাহনী অগ্নি' স্থাপন করা হত। ঋগ্‌বেদে হব্যবাহনী অগ্নিশিখা[৯] বা হব্যবাহন অগ্নির[১০] উল্লেখ আছে। আবার উক্ত বেদের খিল অংশে[১১] দেখা যায় রাত্রিকে হব্যবাহনী বলা হয়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে অগ্নি ও রাত্রি দেবী এক হয়ে গেছেন।[১২]

দেখা গেছে বৃহদ্দেবতার মতে রাত্রি এবং দুর্গা একই দেবী। আর রাত্রি দেবীকেই

১ পূজাপার্বণ, পৃ ২

২ আত্মানং প্রকৃতিং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি পুরুষং শিবম্।
ভবানর্ধশরীরং মে ত্বহং তব তথৈব চ।—বায়ুপুরাণ, অঃ ২৫

৩ ঋ বে ১।১৪৬।৪, ৪ ঋ বে ২।১।৩

৫ অগ্নিরপ্যদিতিরুচ্যতে।—নিরুক্ত ১১।২৩ ৬ শ ব্রা ৬।১।১।১৪

৭ অগ্নিঃ সর্বা দেবতাঃ।—ঐ ব্রা ২।১।৩ ৮ ঋ বে ৩।২৭।৯ ও সায়ণভাষ্য

৯ ঐ ১০।১৮৮।৩ ১০ ঐ ১০।১১৮।৫

১১ যে ত্বাং দেবি প্রপশ্যন্তি ব্রাহ্মণা হব্যবাহনীম্। অবিদ্যা বহুবিদ্যা বা স নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা।—ঋ বে, খিল ৪।২।৭

১২ Ś. Ś., 4th Ed., p. 109

কালীর আদিরূপ বলে অনুমান করা হয় তাও লক্ষ্য করা গেছে। কাজেই বলা যায় অগ্নিই মহাদেবীর দুর্গা ও কালীরূপের অন্যতম উপাদান হয়েছেন।

অগ্নি যে মহাদেবীর ভাবরূপের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন তার আরও নিদর্শন আছে। শুক্ল যজুর্বেদের একটি মন্ত্রের[১] মহীধরকৃত ভাষ্যে দেখা যায় অগ্নির তিন রূপ আমাদ, ক্রব্যাদ আর যাগযোগ্য। যে আম মাংস গ্রাস করে সে আমাদ, যে শব দগ্ধ করে সে ক্রব্যাদ বা চিতাগ্নি, আর যে-অগ্নিতে যজ্ঞ হয় সে যাগযোগ্য। এই অগ্নিই হব্যবাহন। ঋগ্‌বেদেও[২] ক্রব্যাদ এবং হব্যবাহন অগ্নির উল্লেখ আছে।

বৈদিক ঋষিরা এবং যজমানেরা চোখের উপর দেখতে পেতেন লেলিহান অগ্নিশিখা আহুতি প্রদত্ত মাংসাদি গ্রাস করছে; শ্মশানে শবসংকার করতে গিয়ে দেখতে পেতেন আগুন লক্‌লকে জিভ বের করে নাচতে নাচতে শবদেহটিকে আত্মসাৎ করছে। অগ্নির এই রূপ শ্মশানচারিণী লোলজিহ্বা নৃত্যপরা কালী বা আমমাংস-ভক্ষণকারিণী চামুণ্ডার রূপকল্পনার আদি উৎস মনে হয়।

অগ্নিই যে মহাদেবীর কালীরূপের অন্যতম মূল উপাদান তার একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে মুণ্ডকোপনিষদে। তাতে বলা হয়েছে[৩] অগ্নির লেলায়মান জিহ্বা সাতটি। যথা কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী ও দেবী বিশ্বরুচী।

সম্ভবতঃ দেবীর কালী এই নামের উদ্ভব এখান থেকেই হয়েছে।

বেদপন্থীদের বাড়ীতে থাকত স্থায়ী অগ্নিশালা। তাতে থাকত চারকোণা বেদী। সেই বেদীর তিন দিকে তিন অগ্নির স্থান—পশ্চিমে গার্হপত্য, পূর্বে আহবনীয় আর দক্ষিণে দক্ষিণাগ্নি। আহবনীয় অগ্নিতেই দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি দেওয়া হত।[৪] দক্ষিণাগ্নিতে আহুতি দেওয়া হত পিতৃগণের উদ্দেশ্যে। দক্ষিণ দিকের অধিপতি যম। যম মৃত্যুর দেবতা।

মৃত্যু অন্ধকার,[৫] কালো। কাজেই দেখা যায় দক্ষিণাগ্নির সঙ্গে কালো এবং মৃত্যু বা কালের একটা যোগ রয়েছে।

মনে হয় এই দক্ষিণাগ্নিই কালভয়নিবারিণী দক্ষিণাকালীর রূপকল্পনার মূল।

বৈদিক যুগে বেদপন্থীরা দেবতার আরাধনা করতেন যজ্ঞ করে। যজ্ঞের অগ্নিতে সব

---

১ বা সং ১।১৭ ২ ঋ বে ১০।১৬।৯-১০

৩ কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ।

মু উপ ১।২।৪

৪ যজ্ঞকথা পৃ ২৩ ৫ মৃত্যুর্বৈ তমঃ।—শ ব্রা ১৪।১।১।৩২

দেবতাকে আহ্বান করা হত। এইজন্যই, অগ্নিকে সর্বদেবতা বলা হত। আর যে-দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি দেওয়া হত সেই দেবতার নামে অগ্নির নামকরণ হত।[১]

কাজেই, তখন অদিতি, সরস্বতী প্রভৃতি দেবীদের উদ্দেশেও অগ্নিতেই আহুতি দেওয়া হত। ঋগ্‌বেদেই এ কথার সমর্থন আছে। একটি ঋকে[২] অগ্নিকে সোজাসুজি অদিতি, ভারতী এবং সরস্বতী বলা হয়েছে। অতএব বলা যায় সে-যুগে অগ্নিই ছিলেন দেবীর প্রতিরূপ।

আজকের দিনেও দক্ষিণ ভারতে অগ্নিশিখাতে মহাদেবীর অর্চনা করা হয়।[৩] আর সর্বত্রই পূজা শেষে যে হোম করার বিধি তা অগ্নিতে দেবার্চনার সেই প্রাচীন ব্যবস্থারই স্মৃতি বহন করছে।

লক্ষ্য করা গেছে বৈদিক দেবতারা প্রত্যেকেই আসলে এক একটি শক্তি। আর "ঋগ্‌বেদের ঋষিগণ অগ্নিকে যাবতীয় শক্তির প্রতিনিধি করিয়াছিলেন"।[৪]

বেদে অগ্নির নানা উপাধি, গুণ ও কার্যকলাপের বিবরণ আছে। এই-সব উপাধি, গুণ এবং কার্যকলাপের অনেকগুলি পরবর্তীকালে মহাদেবীতে আরোপিত হয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ অগ্নি-সম্পর্কিত কয়েকটি ঋক্-মন্ত্রের উল্লেখ করা গেল।

'অগ্নি সমস্ত ভুবন পর্যবেক্ষণ করেন।'[৫]

অগ্নি, কর্ম তোমার থেকে উৎপন্ন হয়। সব স্তুতি তোমার থেকে উৎপন্ন হয়।[৬]

অগ্নি, তুমি শক্তিপুত্র, যুবা, বরিষ্ঠ, জ্ঞানবান্।[৭]

জাতবেদা, মহত্ত্বের দ্বারা তুমি দেবতাদের শত্রুমুক্ত করেছ।[৮] হে অগ্নি, তুমি প্রভু, সেই জন্য সংগ্রামে তোমাকে আহ্বান করছি।[৯]

হে অগ্নি,[১০] তুমি ইন্দ্র, তুমি বিষ্ণু, তুমি নানা বস্তু সৃষ্টি কর, নানা প্রকার বুদ্ধিতে তোমার অবস্থান। তুমি বরুণ, শত্রুনাশক মিত্র তুমি, তুমি আকাশের অসুর (শত্রুনিবারক) রুদ্র।[১১]

হে অগ্নি, তুমি বিপুল তেজোরাশির দ্বারা দীপ্যমান্, তুমি শত্রুদের নাশ কর, রাক্ষসদের পিশাচীদের নাশ কর, তুমি সুখের হেতু, শত্রুবিজয়ের দ্বারা মহীয়ান্, তোমাকে সুষ্ঠুভাবে আহ্বান করা হয়। সুখের জন্য তোমাকে প্রকৃষ্টভাবে স্থাপন করে যজ্ঞ করব।[১২]

---

১ শ্রীদুর্গা, অবতরণিকা, পৃ ৩৪ ২ ঋ বে ২।১।১১

৩ S. C. S. I., S. R. C M , VOl. IV., p. 258

৪ পূজাপার্বণ, পৃ ৯০ ৫ ঋ বে ১০।১৮৭।৪

৬ ঋ বে ৪।১১।৩ ৭ ঐ ৬।৫।১ ৮ ঐ ৭।১৩।২ ৯ ঐ ৮।৪৩।২১ ১০ ঐ ২।১।৩-৬

১১ আলোচ্য মন্ত্রগুলির নির্বাচন ও ভাবানুবাদ করেছেন যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়।
দ্র:—পূজাপার্বণ, পৃ ৯২ ১২ ঋ বে ৩।১৫।১

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে এই সব সূক্তে অগ্নির যে যে গুণ এবং কর্ম ব্যক্ত হয়েছে, সে সে গুণ ও কর্ম সংক্ষেপে দেবীসূক্তে এবং পুরাণোক্ত দুর্গার স্তোত্রে সবিস্তারে ব্যক্ত হয়েছে।[১]

বৈদিক অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র এঁরা যে মহাদেবীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন তন্ত্রশাস্ত্রেও তার স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। প্রপঞ্চসারতন্ত্রে বলা হয়েছে—মহাদেবী, তুমি ভূতান্তরাত্মা। রবিধর্মে তুমি প্রজা সৃষ্টি কর, চন্দ্রধর্মে পোষণ কর, অগ্নিমূর্তিতে দগ্ধ কর অথবা আহুতি বহন কর। তোমার থেকেই এই তেজস্ত্রয়ের উদ্ভব।[২]

ইন্দ্র ও দেবী—মহাদেবীর ভাবমূর্তি রচনায় আর একজন প্রধান বৈদিক দেবতা উপাদান হয়েছেন। ইনি ইন্দ্র। একমাত্র বরুণ ছাড়া ইন্দ্রের সমকক্ষ দেবতা ঋগ্‌বেদে আর নাই। ইন্দ্র প্রধানতঃ রণদেবতা। দস্যুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেই হোক, আর জ্ঞাতিশত্রুদের বিরুদ্ধেই হোক, বেদপন্থীরা প্রধানতঃ ইন্দ্রেরই সাহায্য চেয়েছেন, তাঁর কাছে বিজয় প্রার্থনা করেছেন। ইন্দ্র স্বয়ং দস্যুদের ও অসুরদের বিনাশ করেন। তিনি মহাবলশালী দেবতা।

এই ইন্দ্র যে পরবর্তী কালে রণদেবী দুর্গা বা চণ্ডীর মধ্যে মিশে যান বেদেই তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। একটি ঋকে[৩] আছে ইন্দ্রকে এক শত মহিষ ও মদির সোম দিতে হবে।

দেবী দুর্গার কাছেও প্রশস্ত বলি মহিষবলি। অন্য একটি ঋকে[৪] দেখা যায় ইন্দ্র মদকর সোম পান করে তবে বৃত্রদের বধ করেন। সোমরস পান করে তবে ইন্দ্র শত্রুবধ করেন অথর্ববেদেও[৫] এ কথা বলা হয়েছে।

অথর্ববেদের একটি সূক্তে[৬] দেখা যায় ইন্দ্র 'বলকে' বিদ্ধ করার আগে সোমরস পান করে করে মত্ত হয়ে পড়েছেন।

মহিষাসুর বধের আগে জগন্মাতা চণ্ডিকাও ক্রুদ্ধ হয়ে পুনঃ পুনঃ উত্তম সুরা পান করলেন, তাঁর চোখ লাল হয়ে উঠল এবং তিনি অট্টহাস্য করলেন।[৭]

তৈত্তিরীয়সংহিতায় (৬।২।৪) এবং মৈত্রায়ণীসংহিতায় (৩।৮।৩) আছে ইন্দ্র একবার সলাবৃকীরূপ ধারণ করেন।[৮] সলাবৃকী অর্থ শিবা বা শৃগালী।

১ পূজাপার্বণ, পৃ ৯২

২ রবিত্বেন ভূতান্তরাত্মা দধাসি প্রজাঃ চন্দ্রমত্বেন পুষ্যাসি ভূয়ঃ।
দহস্যগ্নিমূর্তিং বহস্যাহুতিং বা মহাদেবি তেজস্ত্রয়ং ত্বৎ এব।—প্র সা ত, ১১।৫৫

৩ ঋ বে ৬।১৭।১১ ৪ ঐ ৯।২৪।৭ ৫ অ বে ৬।২ ৬ ঐ ২।৫।১-৩

৭ ততঃ ক্রুদ্ধা জগন্মাতা চণ্ডিকা পানমুত্তমম্। পপৌ পুনঃ পুনশ্চৈব জহাসারুণলোচনা।—দু স ৩।৩৩

৮ B. Ph. V. U., p.457

তন্ত্রশাস্ত্রেও দেবীর শিবারূপের কথা পাওয়া যায়।

রণদেবীর আবির্ভাব—বৈদিক যুগে বেদপন্থী আর্যদের রণদেবতা ছিলেন পুরুষ। এই আর্যদেরই উত্তরপুরুষদের দেবমণ্ডলে পরবর্তী কালে কি করে রণদেবীর আবির্ভাব হল এবং কি করেই বা পূর্ববর্তী রণদেব তাঁর মধ্যে আত্মবিলোপ করলেন এই প্রশ্ন অবশ্যই উঠতে পারে।

মুদ্গলানী—আমরা দেখেছি বৈদিক আর্যদের কোনো কোনো জন-এ মাতৃপ্রাধান্য ছিল। ঋগ্‌বেদেই এমন যোদ্ধ্রী নারীর দেখা মিলে যার বীরত্ব যে-কোনো পুরুষের বীরত্বের তুলনায় কম ছিল না। এমনি এক নারী মুদ্গলানী। একটি ঋকে আছে—মুদ্গলানীর অংশুক প্রচণ্ড রথবেগের জন্য বাতাসে উপরের দিকে উড়ছিল। তখন তিনি রথে চড়ে গিয়ে শত্রুদের পরাজিত করে তাদের কবল থেকে হাজার গরু উদ্ধার করে ফিরছিলেন। এই গরুগুলি শত্রুরা চুরি করে নিয়েছিল। তিনি সেইগুলি উদ্ধার করবার জন্য রথে চড়ে গিয়েছিলেন। তিনি শত্রুদলনকারিণী সেনানী মুদ্গলানী।[১]

কাজেই দেখা যাচ্ছে নারীর রণরঙ্গিণী মূর্তি ঋগ্‌বেদের সময় থেকেই আর্যদের পরিচিত ছিল।

ইন্দ্রের স্ত্রীরূপ—আবার রণদেবতা ইন্দ্রও কখনো কখনো স্ত্রীরূপ ধারণ করতেন। একটি ঋকে[২] পাওয়া যাচ্ছে ইন্দ্র রাজা বৃষণশ্বের মেনা অর্থাৎ দুহিতা হয়েছিলেন।

অথর্ববেদের একটি মন্ত্রেও[৩] ইন্দ্রের স্ত্রীরূপ ধারণের ইঙ্গিত আছে। ইন্দ্র অসুরী বিলিস্তেঙ্গার প্রেমে পড়ে একবার অসুরদের মধ্যে গিয়ে বাস করেন। তিনি পুরুষদের মধ্যে পুরুষ এবং মেয়েদের মধ্যে মেয়ে হয়ে থাকতেন।[৪] কাজেই, ইন্দ্রের রণদেবীর মধ্যে মিশে যাওয়াটা বিস্ময়কর কিছুই নয়।

তা ছাড়া, আরাধকরা আপন আরাধ্য দেবতাকে অন্যান্য সব প্রধান প্রধান দেবতার গুণ এবং কর্মের অধিকারী মনে করতেন এটা ত সে যুগে সর্বত্রই দেখা যেত। এইভাবে শক্তি-উপাসকেরা ইন্দ্রাদি দেবতার গুণ ও কর্ম আপন আরাধ্য দেবতায় আরোপ করতেও পারেন।

আরেকটা কথা। ইন্দ্র ত শুধু যুদ্ধের দেবতা নন, তিনি কৃষিরও দেবতা। ঋগ্‌বেদেই[৫] পাওয়া যায় ইন্দ্র ও সূর্য এক। শতপথ-ব্রাহ্মণেও বলা হয়েছে[৬]—ঐ ইন্দ্র,

---

১ উৎস্ম বাতো বহতি বাসো অস্যা অধিরথং যদজয়ৎ সহস্রম্।
রথীরভূন্মুদ্গলানী গবিষ্টৌ ভরে কৃতং ব্যচেদিন্দ্রসেনা।—ঋ বে ১০।১০২।২

২ ঋ বে। ১।৫১।১৩ ৩ অ বে ৭।৩৮।২ ৪ ”, Ph V. U. p. 125

৫ ঋ বে ১।৮৩।৫ ৬ ইন্দ্রোঽসৌ স আদিত্যঃ। শ ব্রা ৮।৫।৩।২

তিনি আদিত্য। আর সূর্যের উপর কৃষির নির্ভর চিরকাল। এ সম্বন্ধে আমরা আগেও আলোচনা করেছি। তা ছাড়া, ইন্দ্র বর্ষণও করেন। ঋগ্‌বেদেই[১] তার নিদর্শন আছে। কৃষি বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল। কাজেই, ইন্দ্র কৃষির দেবতা।

অতএব দেখা যাচ্ছে এ দিক্‌ দিয়েও ইন্দ্র মিশে গেছেন দেবী দুর্গার মধ্যে। কেন না, দেবী দুর্গাও একাধারে কৃষি ও যুদ্ধের দেবতা।

অম্বা—আমরা অম্বিকার কথা আলোচনা করছিলাম। বেদে অম্বা[২] শব্দ মাতা অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। অম্বা অম্বিকা সমার্থক শব্দ। অম্বিকা শব্দ অম্বা শব্দ থেকেই ব্যুৎপন্ন হয়েছে।

অবশ্য, কেউ কেউ মনে করেন অম্বিকা শব্দ এসেছে ত্র্যম্বক শব্দ থেকে।[৩] একটিমাত্র ঋকে[৪] ত্র্যম্বক শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এই ঋকের ভাষ্যে সায়ণ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই তিনের অম্বক অর্থাৎ পিতা ত্র্যম্বক এইভাবে ত্র্যম্বক শব্দের অর্থ করেছেন।[৫] কিন্তু অম্বক শব্দ কি করে পিতৃবাচক হল তা বলেন নি এবং অম্বক শব্দের ব্যুৎপত্তিনির্ণয়ও করেন নি।

শতপথ-ব্রাহ্মণে স্ত্রীলোক অম্বিকার সহিত রুদ্রের যে ভাগ অর্থাৎ ভাগের পুরোডাশগুলি তাদের বলা হয়েছে ত্র্যম্বকা।[৬] কাজেই এই ব্যাখ্যা অনুসারে অম্বিকা শব্দের থেকেই ত্র্যম্বক শব্দ এসেছে।

মোটকথা, অম্বিকা সেই মহাদেবী আদিম কাল থেকে লোকে যাঁকে মা, আম্মা, অম্বা প্রভৃতি নামে ডেকেছে।

তৈত্তিরীয়-আরণ্যকে একটি মন্ত্রে আছে[৭]—অম্বিকাপতি উমাপতি পশুপতিকে নমস্কার নমস্কার।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে তৈত্তিরীয়-আরণ্যকের সময়ে অম্বিকা এবং উমা একই দেবের পত্নী বলে গণ্য হয়েছেন।

আলোচ্য আরণ্যকে দুর্গা-গায়ত্রী[৮] পাওয়া যাচ্ছে। এই মন্ত্রে দুর্গার কাত্যায়নী ও কুমারী নামের উল্লেখ আছে।

---

১ ঋ বে ২।১১।২০, ৭।৪৭।৪, ৮।১২।৭ ইত্যাদি

২ ঋ বে ২।৪১।১৬ ; ১০।৮৬।৭, ৯৭।২ ; বা সং ৩।৩৩, ১১।৬৮ , তৈ সং ৪।১।৩, ১।৪।১, ৬।৪।৪

৩ R. Pb. V. U., p. 144   ৪ ঋ বে ৭।৫৯।১২

৫ ত্রয়াণাং ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাণামম্বকং পিতরং।—সায়ণ।

৬ তদ্ যদস্যৈব স্ত্রিয়া সহ ভাগঃ তস্মাৎ ত্র্যম্বকা নাম।—শ ব্রা ২।৬।২।৯

৭ অম্বিকাপতয়ে উমাপতয়ে পশুপতয়ে নমো নমঃ। তৈ আ ১০।১৮।১

৮ কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্যকুমারী ধীমহি। তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ।—ঐ. ১০।১।৭

উমা—সামবেদীয় কেনোপনিষদের একটি মন্ত্রে আছে—তিনি (ইন্দ্র) সেই আকাশেই বহুশোভমানা স্ত্রীরূপিণী হৈমবতী উমার কাছে এলেন।[১]

উমা এখানে ব্রহ্মবিদ্যা। এই মন্ত্রের ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর হৈমবতী শব্দের দুটি অর্থ করেছেন ; এক—স্বর্ণালঙ্কারযুক্তার মতো, দুই—হিমালয়ের দুহিতা।[২]

এই হৈমবতী উমাই শিবপত্নী উমাতে রূপান্তরিত হয়েছেন। তৈত্তিরীয়-আরণ্যকেই আমরা দেখেছি উমাপতিকে নমস্কার করা হয়েছে।

কিন্তু এই উমা এলেন কোথা থেকে ? তাঁকে হৈমবতী কেন বলা হল ? হিমালয়ের সঙ্গে তাঁর কেমন করে যোগাযোগ হল ?

এই ধরণের নানা প্রশ্ন মনে জাগে। পণ্ডিতেরা এ-সব নিয়ে নানা জল্পনাকল্পনা করেছেন। ওপার্ট (Oppert) প্রমুখ পণ্ডিতদের ধারণা মাতৃবাচক আম্মা শব্দ থেকে উমা শব্দের উদ্ভব হয়েছে।[৩]

জেকবি (Jacobi) মনে করেন উমা মূলতঃ এক স্বতন্ত্র দেবী, সম্ভবতঃ এক পার্বত্য অপদেবতা (spirit), হিমালয়ের পাহাড়ে পর্বতে ঘুরে বেড়াতেন। পরে রুদ্রপত্নীর সঙ্গে একীভূত হয়ে যান।[৪]

আমাদের মনে হয় উমার রূপকল্পনার মূল বৈদিক সোম। সোমই কালে উমার রূপ পরিগ্রহ করেছে।

রুদ্র ও হিমাচল—বাজসনেয়িসংহিতায়[৫] রুদ্রকে বলা হয়েছে গিরিশন্ত, গিরিশ, গিরিত্র, গিরিচর।

বেদপন্থীদের মতে রুদ্রের স্থান উত্তর দিকে, অন্য দেবতাদের পূর্বদিকে। আপস্তম্ব-ধর্মসূত্রে (২।২৬।২৩) আছে উত্তর দিকে রুদ্রের জন্য হবিঃশেষ রেখে দেওয়া হত।[৬]

কাজেই অনুমান করা যায় উত্তরে হিমাচল-অঞ্চলই ছিল রুদ্রের স্থান। পরবর্তী সাহিত্যেও এ কথার সমর্থন আছে। তাতে আছে শিবধাম কৈলাস হিমালয়েই অবস্থিত।

সোমের স্থান—ঋগ্বেদে[৭] সোমকে বলা হয়েছে মৌজবান্। এর অর্থ মূজবান্ পর্বতে

---

১ স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীম্।—কে উপ ৩।১২

২ হৈমবতীম্ হেমকৃতাভরণবতীমিব। হিমবতো দুহিতা হৈমবতী।

৩ দ্রঃ শ্রীদুর্গা, পৃ ৩৫

৪ E. R. E., Vol II, p ৪১৭. ৫ বা সং ১৬।২, ৩, ৪, ২২, ২৯

৬ R. Ph. V. U., P. 145. ৭ ঋ বে ১০।৩৪।১

সোম পাওয়া যেত। অনুমান করা হয় মূজবান্ হিমালয়েরই একটি শৃঙ্গ। জিমার (Zimmer) মনে করেন শৃঙ্গটি কাশ্মীর উপত্যকার দক্ষিণ-পশ্চিমে।[১]

সোম ও রুদ্র—এই মূজবান্ পর্বতে রুদ্রদেবতারও বাস ছিল[২] কাজেই, সোমের সঙ্গে রুদ্রের যোগাযোগ হল সহজেই। ঋগ্‌বেদেই[৩] 'সোমারুদ্র'র অর্থাৎ সোম ও রুদ্রের একত্র উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। ঋগ্‌বেদের সংসৃষ্ট সূক্তটি অনুধাবন করলে মনে হয় 'সোমারুদ্র' সোম এবং রুদ্রের যুগ্মরূপ ; তাত্ত্বিক পরিভাষায় বলা যায় যুগনদ্ধরূপ। উভয় পৃথক্ বটে কিন্তু যেন উভয়ে মিলে এক হয়ে গেছেন।

বাজসনেয়িসংহিতায় (১৬।৩৯) রুদ্রকে সোম বলা হয়েছে। এখানেও দেখা যাচ্ছে সোম এবং রুদ্র এক হয়ে গেছেন। তন্ত্রশাস্ত্রেও দেখা যায় শিব-শক্তি বা উমা-মহেশ্বর স্বরূপতঃ অভিন্ন ; তাঁদের অবিনাভাব-সম্বন্ধ। তাঁরা দুই এবং এক।

রুদ্র ও ইন্দ্র—একাধিক ঋকে[৪] ইন্দ্রকে বলা হয়েছে সোমপতি।

ঋগ্‌বেদে দেখা যায় ইন্দ্র এবং অগ্নির সঙ্গে রুদ্রের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। পরে ইন্দ্র এবং অগ্নি উভয়কেই আত্মসাৎ করে প্রধান হয়ে উঠেন মহাদেব রুদ্র।

রুদ্র এবং অগ্নি যে এক তা বেদসংহিতাতেই[৫] বলা হয়েছে। ব্রাহ্মণগ্রন্থেও[৬] তাই দেখা যায়। আবার ঋগ্‌বেদেই[৭] দেখা যায় ইন্দ্র ও অগ্নি এক। অথর্ববেদেও[৮] ইন্দ্রকে অগ্নি বলা হয়েছে। একটি ঋকে[৯] ইন্দ্রকে বলা হয়েছে সূর্য। আবার অথর্ববেদে[১০] সূর্যকে বলা হয়েছে রুদ্র। যজুর্বেদে[১১] রুদ্রের সূর্যরূপে স্তব করা হয়েছে। কাজেই দেখা যায় রুদ্রের সঙ্গে অগ্নি, সূর্য ও ইন্দ্রের মিশামিশি হয়েছে। ইন্দ্র ও রুদ্রকে যে অভিন্ন কল্পনাও করা হত তার আরেকটি নিদর্শন বেদে আছে। ইন্দ্র সহস্রাক্ষ। শুক্ল যজুর্বেদে রুদ্রকেও বলা হয়েছে সহস্রাক্ষ।[১২]

রুদ্র সোমপতি—অনুমান করা যায় এর পর ইন্দ্রের স্থলে অনায়াসেই রুদ্র হয়ে পড়লেন সোমপতি। রুদ্র এবং সোমের একই অঞ্চলে অবস্থানের জন্য এটি সহজেই হতে পারে।

দেখা যায় শুক্ল যজুর্বেদের একটি মন্ত্রে[১৩] স্পষ্ট ভাষাতেই রুদ্রকে বলা হয়েছে অন্ধস্পতি অর্থাৎ সোমপতি।

রুদ্রকে যে সোমপতি ভাবা হত তার নিদর্শন আছে পরবর্তী কালে শিবের সোমেশ্বর ও সোমনাথ নাম দুটিতে।

---

১ *V. A.*, pp. 241-242 ২ বা সং ৩।৬১ ৩ ঋ বে ৬।৭৪ ৪ ঋ বে ১।৭০।৩, ৩।৩৩।১, ৮।২১।৩

৫ ঋ বে ২।১।৬, অ বে ৭।৮৭।১ ৬ শ ব্রা ৫।২।৪।১৩, ৫।৩।১।১০ ; তৈ ব্রা ২।১।৩।১ ইত্যাদি।

৭ ঋ বে ২।১।৩ ৮ অ বে ১৩।৪।১৩ ৯ ঋ বে ৬।৩০।৫ ১০ অ বে ১৩।৪।২৩

১১ বা সং ১৬।৬ ১২ বা সং ১৬.২৯ ১৩ বা সং ৩।৫৭

বেদসংহিতায় দেখা যায় সোম এক রকমের উদ্ভিদ্ বা লতা। আর্যরা এটি পেষণ করে রস বের করতেন। সোমযাগ ছিল বৈদিকদের অন্যতম প্রধান যজ্ঞ। বেদ-সংহিতা সোমের মাহাত্ম্য বর্ণনায়, সোমের স্তবস্তুতিতে মুখর।

সোমরসপানে উল্লসিত ঋষিদের কাছে সোম শুধু সোমলতা নয়, সোম দেবতা। শুধু দেবতা নয়, দেবতাদের মধ্যে একজন রাজা।[১]

"দেবতা সোম দ্যুলোকে অবস্থান করেন। পার্থিব সোম মর্ত্যলোকে তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ।"[২] এই পার্থিব সোমই উদ্ভিদ্ বা লতা।

সোম ও চন্দ্র—ঋগ্‌বেদেই[৩] দেখা যায় সোমকে বলা হয়েছে ইন্দু। এর অর্থ সোমকে চন্দ্র কল্পনা করা হয়েছে। ব্রাহ্মণগ্রন্থে[৪] এ কথা স্পষ্টভাষাতেই বলা হয়েছে।

এটি কেমন করে হল? চন্দ্রের সঙ্গে সোমলতার সাদৃশ্য কোথায়? এ সম্বন্ধে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে সূর্যাস্ত হলে সূর্যের তেজের কতকটা প্রবেশ করে চন্দ্রে। সেইজন্য রাত্রে চন্দ্র উজ্জ্বল হয়, আর কোনো কোনো ওষধিও উজ্জ্বল হয় এ রকম বর্ণনা সংস্কৃত সাহিত্যে অনেক পাওয়া যায়। হিমালয়-পর্বতে এ রকম আলোকবিকিরণকারী ওষধি আছে কালিদাসপ্রমুখ কবিরা এ কথা বলেছেন।

সোমলতা সম্ভবতঃ ছিল এক রকমের আলোকবিকিরণকারী ওষধি। আকাশের চাঁদের মতো সন্ধ্যার আগে পর্যন্ত সোম নিষ্প্রভ থাকত; তার পর সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে আকাশে উজ্জ্বল হত চাঁদ আর পর্বতে সোম। একের সঙ্গে যেন অন্যের সম্পর্ক বাঁধা ছিল।

লোকে দেখত চাঁদের ক্ষয়বৃদ্ধি আছে; চাঁদ অমাবস্যায় লোপ পায় তার পর আবার দেখা দেয়। তেমনি বর্ষজীবী ওষধি সোমও বৎসরে একবার জন্মায়, মরে এবং তার পর আবার জন্মায়। চাঁদ ও সোমের এমনি সাদৃশ্য দেখে কল্পনাপ্রবণ মনীষীদের পক্ষে অনুমান করা কঠিন ছিল না যে চাঁদ এবং সোমলতা "উভয়েই স্বরূপতঃ এক, উভয়েই সোম।"[৫]

তা ছাড়া, সোমপানে খুব স্ফূর্তি হত, আনন্দ হত। মত্ততাও দেখা দিত। একাধিক ঋকে[৬] সোমকে মদকর বলা হয়েছে। সোমপান করে দেবতারাও মাঝে মাঝে যে বেসামাল হয়ে পড়তেন, ইন্দ্রের বেলা তা আমরা লক্ষ্য করে এসেছি।

চাঁদ দেখলে কবিদেরও স্ফূর্তি হয় একথা চিরপ্রসিদ্ধ। সায়ণাচার্য একাধিক ঋকের[৭]

---

১ ঋ বে ১০।১০৯।২, অ বে ৫।১৭।২, ২১।১১, ১৪।১।৪৯   ২ যজ্ঞকথা, পৃঃ ৭০

৩ ঋ বে ৯।১৪।৪ ৫, ৭; ৯।১৩।৫, ৯।২১।৩, ৫; ৯।৯৫।৩; ৯।৯৬।৩ ইত্যাদি

৪ চন্দ্রমা বৈ সোমঃ—শ ব্রা ১১।১।৪।৩, সোমো বৈ চন্দ্রমাঃ—কৌ ব্রা ১৬।৫।১০

৫ যজ্ঞকথা, পৃঃ ৯৮-৯৯   ৬ ঋ বে ৯।১৮।৩, ২৫।৪, ৩২।১৯ প্রভৃতি

৭ ঋ বে ১।১৩০।৩, ৮।৪৮।৩

ভাষ্যে বলেছেন চন্দ্রঃ সর্বেষাং আহ্লাদকঃ—চন্দ্র সকলের আহ্লাদকারী। অনুমান করা যায় বৈদিক যুগের কবিদেরও চাঁদ দেখে আহ্লাদ হত। এইজন্য, চাঁদকেও সোম মনে করা তাঁদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ছিল।

বেদসংহিতাতে[১] সোমকে বলা হয়েছে অমৃত। পরবর্তী কালে চন্দ্র হয়েছেন অমৃতের ভাণ্ডারী। সুধাকর সুধাংশু ইত্যাদি নামেই তার পরিচয় আছে। অমৃত সোমই যে চন্দ্রের সঙ্গে এক হয়ে গেছে এটি তারই নিদর্শন।

চন্দ্র স্ত্রীদেবতা—আমরা দেখেছি অতি প্রাচীন কাল থেকেই চন্দ্রকে কৃষি ও প্রজননের দেবতা মনে করা হয়েছে। জগতের নানা অঞ্চলে চন্দ্রকে স্ত্রীদেবতা মনে করা হত। বেদপন্থীরাও এই ধারণার সঙ্গে অপরিচিত ছিল না। রাকা এবং সিনীবালী দেবীর কল্পনায় তার পরিচয় পাওয়া যায়।

ঋগ্‌বেদের একটি খিল-মন্ত্রে (খিল ২।৬।১) দেবী শ্রীকে বলা হয়েছে চন্দ্রা। বোঝা যাচ্ছে ঐ মন্ত্রের ঋষির পক্ষে চন্দ্রের স্ত্রীরূপ কল্পনা করা কঠিন ছিল না।

চন্দ্র-সোম-উমা—ইন্দ্র আকাশে বহুশোভমানা হৈমবতী উমার কাছে গিয়েছিলেন। মনে হয় এ কথার মধ্যেও উমা যে চন্দ্র বা সোম তার ইঙ্গিত আছে। আকাশচারী চন্দ্র 'বহুশোভমানা' এবং হিমকরবর্ষী। তাই উমাও বহুশোভমানা এবং হৈমবতী। সোমের আকাশে অবস্থান করার উল্লেখ বেদসংহিতাতেই আছে।[২]

সোমও কৃষি এবং প্রজননের সঙ্গে যুক্ত। নিম্নলিখিত শ্রুতিবাক্যে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যথা, সোম ওষধিসমূহের অধিপতি।[৩] সোম রেতোধা।[৪] সোম অন্ন।[৫]

আবার ঋগ্‌বেদেই দেখা যায় সোম শত্রুনাশ করেন[৬] এবং ধনাদিও দেন।[৭]

উমা তথা দেবী দুর্গাও এই কাজগুলিই করেন। লক্ষ্য করা গেছে সোমের সঙ্গে রুদ্রের অতি ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। পরবর্তী সময়ে শিবের মাথায় বা ললাটে যে 'সোমকলা' দেখা যায় মনে হয় তা ঐ প্রাচীন যোগাযোগের স্মৃতি বহন করছে।

দেখা গেছে রুদ্রকে সোমপতি কল্পনা করা হত। রুদ্র যখন সোমপতি তখন সোমকে তাঁর পত্নী কল্পনা করা সহজেই সম্ভবপর হতে পারে। সম্ভবপর যে হয়েছে তার নিদর্শন আছে বায়ুপুরাণে। আমরা লক্ষ্য করে এসেছি উক্ত পুরাণ অনুসারে শিব পুরুষ আর

---

১ বা সং ১৯।৭২, অ বে ৮।৭।২০ ২ তৈ সং ৩।৪।৭

৩ সোমো বা ওষধীনাং রাজা।—তৈ সং ৬।১।৯, তৈ ব্রা ৩।৯।১৭

৪ সোমো রেতোধাঃ।—কাঠকসংহিতা ৫।৪ (দ্রঃ Vedic Concordance)

৫ তৈ সং ১।৪।১ ৬ ঋ বে ৯।৬১।২০ ৭ ঋ বে ৯।৬১।২, ৩; ৯।৬১।২০ ইত্যাদি

বিষ্ণু প্রকৃতি। এই পুরাণেই দেখা যায় শিব বিষ্ণুকে বলছেন, আমি অগ্নি তুমি সোম তুমি রাত্রি আমি দিন।[১] সোম বিষ্ণু; বিষ্ণু প্রকৃতি। অতএব সোম প্রকৃতি আর শিব পুরুষ। শিবশক্তিই পুরুষপ্রকৃতি। অতএব, সোম শিবপত্নী।

সোম যখন রুদ্রের পত্নী হলেন তখন অনুমান হয় ভাষার নিয়মেই তাঁকে সোমা হতে হল। তা ছাড়া, ঋগ্‌বেদোক্ত 'সোমারুদ্রা' কথাটাও এই কল্পনার সহায়তা করেছে মনে হয়। সোমারুদ্রা উচ্চারণ করতে সোমা এবং রুদ্রা শব্দ উচ্চারিত হয়। কল্পনাকে উদ্‌বুদ্ধ করতে এই টুকুই যথেষ্ট। লোকে ভেবে নিল রুদ্রের পত্নী সোমা।

এই সোমার থেকেই এসেছে উমা[২] শব্দ ভাষারই নিয়মে। সোমের স্থান হিমালয়ে। কাজেই উমা হৈমবতী।

সোমই যে উমা তার অন্য প্রমাণও আছে। নিঘণ্টুতে[৩] বাক্ শব্দের একটি প্রতিশব্দ দেওয়া হয়েছে গৌরী। আমরা দেখেছি বাগ্‌দেবী এবং শাক্তদের আরাধ্যা মহাদেবী অভিন্ন। দেবীসূক্তের ঋষি অম্ভৃণকন্যা বাক্ আপনাকে ব্রহ্ম মনে করেছেন। বাক্ ব্রহ্ম।[৪]

কাজেই বাক্ বা গৌরী ব্রহ্মময়ী মহাদেবী। পরবর্তী যুগে তাই গৌরী হয়েছেন ব্রহ্মময়ী মহাশক্তি, শিবপত্নী। আর গৌরী ও উমা অভিন্ন।

সোমই গৌরী। একটি ঋকে[৫] স্পষ্ট ভাষাতেই সোমকে গৌরী বলা হয়েছে। ভাষ্যে সায়ন গৌরী শব্দের অর্থ করেছেন বাক্।[৬]

বাক্ ব্রহ্ম। ব্রহ্ম আর ব্রহ্মবিদ্যা একই। সেইজন্য, ব্রহ্মস্বরূপিণী আম্ভৃণী বাক্ দেবীসূক্তে বলেছেন আমি সোমকে ধারণ করি।[৭]

সোম গৌরী। গৌরী বাক্। বাক্ সোমকে ধারণ করছেন। এই সব শ্রৌত উক্তি থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে হৈমবতী উমা মূলতঃ সোম।

নিঘণ্টুতে দেখা যায় বাকের আরেকটি প্রতিশব্দ মেনা।[৮] অনুমান হয় এই মেনাই পৌরাণিক যুগে হৈমবতী উমার মা মেনা বা মেনকা হয়েছেন।

সোমই যে উমা হয়েছেন তার অন্য যুক্তিও আছে। লক্ষ্য করা গেছে তন্ত্রে দেবীর পোষণী বা পালনী শক্তিকে চন্দ্রমা বলা হয়েছে। পোষণ পালন মাতৃশক্তির কাজ। আর

---

১ অহমগ্নির্ভবান্ সোমো ভবান্ রাত্রিরহং দিনম্ ।—বায়ুপুরাণ ২৫।২১

২ সোমা > হোমা > ঔমা > ওম > উমা   ৩ নিঘণ্টু ১।১১

৪ বাগ্ বৈ ব্রহ্ম ।—বৃহ উপ ৪।১।২   ৫ ঋ বে ৯।১২।৩

৬ 'গৌরী গান্ধর্বী' ইতি বাঙ্‌নামসু পাঠাৎ।

৭ অহং সোমমাহনসং বিভর্মি ।—ঋ বে ১০।১২৫।২   ৮ নিঘণ্টু ১।১১

চন্দ্রমা তথা সোম যে কৃষি ও প্রজননের দেবতা, মাতৃদেবতা বা মাতৃশক্তি তাও আমরা দেখেছি।

স্বামী যোগত্রয়ানন্দ লিখেছেন সোমশক্তিই উদ্ভিদ্-প্রসবিনী শক্তি, পোষণ-শক্তি। মায়ের সোমশক্তিই বিশ্বজগতের অন্নরূপ।[১]

এ কথার শ্রৌত সমর্থন আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে[২]—সোমই অন্ন, অগ্নি অন্নাদ অর্থাৎ অন্নভোক্তা।

শুক্ল যজুর্বেদে[৩] আছে রুদ্র অন্নের পতি। সোম অন্ন। কাজেই, রুদ্র সোমের পতি। অতএব, সম্বন্ধ-সাদৃশ্যে সোম উমা।

বিষয়টি অন্যভাবেও বিচার করা যায়। তৈত্তিরীয়-উপনিষদে অন্ন শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে এইভাবে—প্রাণীরা একে খায় এবং এ প্রাণীদের খায়, এইজন্য একে অন্ন বলা হয়।[৪]

এই অন্ন ব্রহ্ম[৫]। কাজেই সোম ব্রহ্ম। আবার সোম গৌরী, সোম বাক্। বাক্ ব্রহ্ম। কাজেই, এদিক্ দিয়েও দেখা যায় সোম ব্রহ্মময়ী উমাতে রূপান্তরিত হয়েছেন। শ্রুতিতে ব্রহ্মবিদ্যারূপে উমার প্রথম আবির্ভাবেও একথার সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে।

আবার নিঘণ্টুতে বাকের নামতালিকায় আছে ননা শব্দ। ননা আর উমা যে একই দেবী তার ঐতিহাসিক নজিরও আছে। আমরা দেখতে পাব হুবিষ্কের একটি মুদ্রায় উৎকীর্ণ দেবদেবীর মূর্তির পরিচয়লিপিতে দেবটীকে বলা হয়েছে উমেশ এবং দেবীকে ননা। স্পষ্ট বোঝা যায় এখানে ননা আর উমা একই দেবী। কেন না দেবমূর্তিটি শিবের মূর্তি বলে সনাক্ত করা হয়েছে। কাজেই উমা বাক্। বাক্ গৌরী। গৌরী সোম। অতএব বলা যায় সোমই উমা হয়েছেন।

তন্ত্রশাস্ত্রের সমর্থ:—এই সিদ্ধান্তের সমর্থন তন্ত্রশাস্ত্রেও পাওয়া যায়। গন্ধর্বতন্ত্রে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে সোম শক্তি আর শিব সূর্য, নিশা শক্তি আর দিবা শিব।[৬]

তন্ত্রে অবশ্য সোম শব্দ চন্দ্র অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি বৈদিক যুগেই সোম বলতে সোমলতা এবং চন্দ্র উভয়কেই বোঝাত, উভয়ের কল্পনায় মিশামিশি হয়ে যায়।

---

১ শ্রীসীতাতত্ত্ব, ক ৭ অ, পৃঃ ২০২

২ সোম এবান্নমগ্নিরন্নাদঃ।—বৃহ উপ ১।৪।৬ ৩ বা সং ১৬।১৮

৪ অদ্যতেঽত্তি চ ভূতানি। তস্মাদন্নং তদুচ্যতে।—তৈ উপ ২।২ ৫ অন্নং ব্রহ্ম।—ঐ ৩।২

৬ সোমঃ শক্তিঃ শিবঃ সূর্যো নিশা শক্তির্দিবা শিবঃ।—গ ত ২২।৪৭

সম্মোহনতন্ত্রে শক্তিরূপা ইড়া-নাড়ীকে সাক্ষাৎ অমৃতবিগ্রহা চন্দ্রস্বরূপিণী বলা হয়েছে।[১]

শারদাতিলকে[২] বিন্দু অর্থাৎ শিবকে বলা হয়েছে সূর্য আর বিসর্গ অর্থাৎ শক্তিকে বলা হয়েছে চন্দ্র অর্থাৎ সোম।

উক্ত তন্ত্রের একটি শ্লোকের টীকায় রাঘবভট্ট বলেছেন শিব সূর্য এবং অগ্নি, আর শক্তি সোমরূপা।[৩]

কাজেই দেখা যাচ্ছে সোমই উমা হয়েছেন এই সিদ্ধান্তটি তন্ত্রেও সমর্থিত হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায় এই বৈদিক ভাবধারাটি তন্ত্রেও অনুসৃত হয়েছে।

উপনিষদে মহাদেবী—প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলিতে মহাদেবীর কোনো রূপের দর্শন বড় একটা মিলে না। উমার বিষয়ে আলোচনা করা হল। মুণ্ডকোপনিষদের কালী, করালী ইত্যাদিরও উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদে আছে—মায়াকে প্রকৃতি আর মহেশ্বরকে মায়ার অধিষ্ঠান বলে জানবে।[৪] এখানে দেবীর রূপের চেয়ে দার্শনিক তত্ত্বকেই অধিক লক্ষ্য করা রয়েছে। তবে পরবর্তী কালে মহাদেবীকে মায়া এবং প্রকৃতি দুইই বলা হয়েছে। তত্ত্বটির সূচনা হয়ত উক্ত উপনিষদ-মধ্যেই হয়েছে।

---

১ বামগা যা ইড়া নাড়ী শুভ্রা চন্দ্রস্বরূপিণী। শক্তিরূপা হি সা দেবী সাক্ষাদমৃতবিগ্রহা।
—সম্মোহনতন্ত্রবচন, ষটচক্রনিরূপণের ১ম শ্লোকের কালীচরণকৃত টীকায় উদ্ধৃত।

২ বিন্দুঃ পুমান্ রবিঃ প্রোক্তঃ সর্গঃ শক্তির্নিশাকরঃ।—শা তি ২।৬

৩ শিবঃ সূর্যাগ্নিরূপঃ শক্তিঃ সোমরূপা।—ঐ ২।৮-এর টীকা

৪ মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।—শ্বে উপ ৪।১০

পঞ্চম অধ্যায়

মহাদেবী

(ক) শ্রুতিপরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যে

মহাভারত—মহাভারতের নানা স্থানে শিবপত্নী উমা[1] তথা পার্বতীর[2] উল্লেখ আছে। শান্তিপর্বে আছে দক্ষযজ্ঞের কাহিনী। দক্ষযজ্ঞে শিবকে নিমন্ত্রণ না করায় দেবী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। তাঁর সেই ক্রোধ প্রশমনের উদ্দেশ্যে শিব দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের জন্য বীরভদ্রের সৃষ্টি করেন। আর দেবীর ক্রোধের থেকে আবির্ভূতা হন মহাভীমা মহাকালী মহেশ্বরী। তিনি দক্ষের যজ্ঞধ্বংস দেখার জন্য বীরভদ্রের সঙ্গে চলেন।[3] এঁকে ভদ্রকালীও বলা হয়েছে।[4]

যুধিষ্ঠিরকৃত দুর্গাস্তব—তবে মহাদেবীর বিশিষ্টরূপ এবং বিশেষ মাহাত্ম্য প্রকাশিত হয়েছে দুটি স্তবে—একটি যুধিষ্ঠিরকৃত স্তব, অন্যটি অর্জুনকৃত স্তব।

বিরাটপর্বের ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথমেই আছে—রম্য বিরাটনগরে যেতে যেতে যুধিষ্ঠির মনে মনে ত্রিভুবনেশ্বরী যশোদাগর্ভসম্ভূতা, নারায়ণবরপ্রিয়া, নন্দগোপের কুলে জাতা, মঙ্গলকারিণী, কুলবর্ধিনী, কংসবিদ্রাবণকারিণী, অসুরক্ষয়কারিণী, শিলাতটে বিক্ষিপ্ত হলে আকাশে গমনকারিণী, বাসুদেবের ভগিনী, দিব্যমাল্যধারিণী, দিব্যবস্ত্রপরিহিতা, খড়্গ-খেটকধারিণী দেবী দুর্গার স্তব করলেন।[5]

দেবীর দর্শনাকাঙ্ক্ষী রাজা যুধিষ্ঠির ভাইদের সঙ্গে মিলে এই বলে স্তব করলেন—বরদা, কৃষ্ণা, কুমারী, ব্রহ্মচারিণী বালার্কসদৃশাকারা, পূর্ণচন্দ্রনিভাননা তোমাকে নমস্কার।

১ মহা ভা ৩।১৯।৪, ৭।২০১।২৭, ৯৮, ১০০, ১১। ৮৩।২৯, ১৩।১৪।৪০৬, ১৪।৪ ইত্যাদি।

২ ঐ ৭।৭৮।৪০; ৭।২০০।৭০, ২০১।৯৩; ১০।৭।৪৬ ইত্যাদি।

৩ মন্যুনা চ মহাভীমা মহাকালী মহেশ্বরী। আত্মনঃ কর্মসাক্ষিত্বে তেন সার্ধং সহানুগা।

—মহা ভা ১২।২৮৩।৩২

৪ ভদ্রকালীতি বিখ্যাতা দেব্যাঃ কোপাদ্বিনির্গতা।—ঐ ১২।২৮৩।৪৪

৫ বিরাটনগরং রম্যং গচ্ছমানো যুধিষ্ঠিরঃ। অস্তুবন্মনসা দেবীং দুর্গাং ত্রিভুবনেশ্বরীম্।
যশোদাগর্ভসম্ভূতাং নারায়ণবরপ্রিয়াম্। নন্দগোপকুলে জাতাং মঙ্গল্যাং কুলবর্ধিনীম্।
কংসবিদ্রাবণকরীমসুরাণাং ক্ষয়ঙ্করীম্। শিলাতটবিনিক্ষিপ্তামাকাশং প্রতি গামিনীম্।
বাসুদেবস্য ভগিনীং দিব্যমাল্যবিভূষিতাম্। দিব্যাম্বরধরাং দেবীং খড়্গখেটকধারিণীম্।

—মহা ভা, বঙ্গবাসী সং, ৪।৬।১-৫

তুমি চতুর্ভুজা, চতুর্বক্ত্রা, পীনশ্রোণিপয়োধরা, ময়ূরপিচ্ছবলয়া, কেয়ূরাঙ্গদধারিণী, তোমাকে নমস্কার। তুমি নারায়ণপরিগৃহীতা লক্ষ্মীর ন্যায় শোভা পাচ্ছ। ওগো আকাশচারিণী, বিশদ ব্রহ্মচর্য তোমার স্বরূপ। কাল মেঘের মতো তুমি কৃষ্ণা, সঙ্কর্ষণের মতো তোমার আনন। তোমার দুই বাহু বরাভয় প্রদানে শক্রের ধ্বজের মতো উচ্ছ্রিত। তোমার এক হাতে পাত্র, এক হাতে পদ্ম, এক হাতে ঘণ্টা, এক হাতে পাশ, এক হাতে ধনু এবং এক হাতে চক্র। এমনি বিবিধ আয়ুধ তোমার হাতে। তোমার দুই কর্ণ কুণ্ডলযুক্ত। তোমার মুখ চন্দ্রবিস্পর্দ্ধী। তোমার মাথায় বিচিত্র বেণী ও মুকুট শোভা পাচ্ছে। সর্পাকার এই বেণী শ্রোণিসূত্র অর্থাৎ মেখলার সঙ্গে শোভা পাচ্ছে। তুমি সর্পবেষ্টিত মন্দরপর্বতের মতো দীপ্তি পাচ্ছ। শিখিপিচ্ছলাঞ্ছিত তোমার ধ্বজ। তুমি কৌমারব্রত ধারণ করে স্বর্গকে রক্ষা করেছিলে, এইজন্য দেবতারা তোমার স্তব ও পূজা করেন। তুমি ত্রৈলোক্য রক্ষা করার জন্য মহিষাসুর বধ করেছ। ওগো সুরশ্রেষ্ঠা, আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে আমাকে দয়া কর, আমার কল্যাণ কর। তুমি জয়া, তুমিই বিজয়া, সংগ্রামে তুমিই জয় প্রদান কর। দেবী, সম্প্রতি আমাকেও বিজয় বর দাও। ওগো নগশ্রেষ্ঠা, তোমার শাশ্বত স্থান বিন্ধ্যপর্বতে। কালী, মহাকালী, মদ্য, মাংস ও পশু তোমার প্রিয়। তুমি কামচারিণী, ব্রহ্মাদি প্রাচীনেরা নিত্য তোমার স্মরণ করে তোমার কাছে বর পেয়েছেন। ভারমোচনের জন্য যে-সব লোক তোমাকে স্মরণ করে, যারা প্রাতে উঠে তোমাকে প্রণাম করে, তাদের কাছে ধন পুত্র প্রভৃতি কিছুই দুর্লভ নয়। দুর্গ অর্থাৎ দুর্গতি থেকে ত্রাণ কর বলে লোকে তোমাকে বলে দুর্গা। দুর্গম পথে অবসন্ন, মহাসাগরে মগ্ন, দস্যুদের দ্বারা বন্দী সব লোকের তুমি পরমা গতি। মহাদেবী, জলপ্রতরণে, কান্তারে, অটবীতে যে তোমাকে স্মরণ করে তার আর কোনো দুঃখ থাকে না। তুমি কীর্তি, শ্রী, ধৃতি, সিদ্ধি, হ্রী, বিদ্যা, সন্ততি, মতি, সন্ধ্যা, রাত্রি, প্রভা, নিদ্রা, জ্যোৎস্না, কান্তি, ক্ষমা, দয়া। তোমার পূজা করলে তুমি লোকের বন্ধন, মোহ, পুত্রনাশ, ধনক্ষয়, ব্যাধি, মৃত্যু এবং ভয় দূর কর। রাজ্যভ্রষ্ট আমি তোমার শরণ নিলাম। সুরেশ্বরী, আমি মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে তোমাকে প্রণাম করছি। পদ্মপত্রাক্ষী, ভক্তবৎসলা দুর্গা, আমাকে ত্রাণ কর, আমাকে আশ্রয় দাও।[১]

---

১ নমোঽস্তু বরদে কৃষ্ণে কুমারি ব্রহ্মচারিণি। বালার্কসদৃশাকারে পূর্ণচন্দ্রনিভাননে।
চতুর্ভুজে চতুর্বক্ত্রে পীনশ্রোণিপয়োধরে। ময়ূরপিচ্ছবলয়ে কেয়ূরাঙ্গদধারিণি।
ভাসি দেবী যথা পদ্মা নারায়ণপরিগ্রহা। স্বরূপং ব্রহ্মচর্যঞ্চ বিশদং তব খেচরি।
কৃষ্ণচ্ছবিসমা কৃষ্ণা সংকর্ষণসমাননা। বিভ্রতী বিপুলৌ বাহূ শক্রধ্বজসমুচ্ছ্রিতৌ।
পাত্রী চ পঙ্কজী ঘণ্টী স্ত্রীবিশুদ্ধা চ যা ভুবি। পাশং ধনুর্মহাচক্রং বিবিধান্যায়ুধানি চ।
কুণ্ডলাভ্যাং সুপূর্ণাভ্যাং কর্ণাভ্যাং চ বিভূষিতা। চন্দ্রবিস্পর্দ্ধিনা দেবি মুখেন ত্বং বিরাজসে।

অর্জুনকৃত দুর্গাস্তব—কৌরব সৈন্যদের সম্মুখীন অর্জুন কৃষ্ণের আদেশে শত্রুদের পরাজিত করার উদ্দেশ্যে দুর্গার স্তব করেন। তিনি রথ থেকে মাটিতে নেমে এইভাবে স্তব করেন :—সিদ্ধসেনানী, আর্যা, মন্দরবাসিনী, কুমারী, কালী, কাপালী, কপিলা, কৃষ্ণপিঙ্গলা, তোমাকে নমস্কার। ভদ্রকালী তোমাকে নমস্কার। মহাকালী, তোমাকে নমস্কার। চণ্ডী, চণ্ডা, তারিণী, বরবর্ণিনী, তোমাকে নমস্কার। তুমি কাত্যায়নী, মহাভাগা, করালী, বিজয়া, জয়া, শিখিপিচ্ছধ্বজা, নানা-আভরণভূষিতা। উৎকট শূল তোমার প্রহরণ, তুমি খড়্গখেটকধারিণী, গোপেন্দ্রের অনুজা, তুমি জ্যেষ্ঠা, নন্দগোপের কুলে তোমার উদ্ভব। মহিষের রক্ত তোমার নিত্য প্রিয়। তুমি কৌশিকী, পীতবাসা, অট্টহাসিনী, কোকমুখা রণপ্রিয়া, তোমাকে নমস্কার। উমা, শাকম্ভরী, শ্বেতা, কৃষ্ণা, কৈটভনাশিনী, হিরণ্যাক্ষী, বিরূপাক্ষী, সুধূম্রাক্ষী তোমাকে নমস্কার। তুমি বেদশ্রুতিমহাপুণ্যস্বরূপা, ব্রহ্মণ্যা, অগ্নিরূপিণী, জম্বুবৃক্ষসমূহের দ্বারা আবৃত চৈত্যের সন্নিধানে তোমার নিত্য-আলয়। বিদ্যাসমূহের মধ্যে তুমি ব্রহ্মবিদ্যা, দেহীদের মধ্যে তুমি মহানিদ্রা। তুমি ভগবতী স্কন্দমাতা, কান্তারবাসিনী দুর্গা। তুমি স্বাহা, স্বধা, কলা, কাষ্ঠা, বেদমাতা সাবিত্রী। তোমাকে বেদান্ত বলা হয়। আমি বিশুদ্ধ অন্তরে তোমার স্তব করছি, তোমার প্রসাদে যুদ্ধে আমার জয়লাভ হোক। তুমি ভক্তদের রক্ষার জন্য কান্তারে, ভয়স্থানে, দুর্গমক্ষেত্রে, ভক্তদের আলয়ে

মুকুটেন বিচিত্রেণ কেশবন্ধেন শোভিনা। ভুজঙ্গাভোগবাসেন শ্রোণিসূত্রেণ রাজতা।
ভ্রাজসে চাপবিদ্ধেন ভোগেনেবেহ মন্দরঃ। ধ্বজেন শিখিপিচ্ছানামুচ্ছ্রিতেন বিরাজসে।
কৌমারং ব্রতমাস্থায় ত্রিদিবং পাবিতং ত্বয়া। তেন ত্বং স্তূয়সে দেবী ত্রিদশৈঃ পূজ্যসেঽপি চ।
ত্রৈলোক্যরক্ষণার্থায় মহিষাসুরনাশিনি। প্রসন্না মে সুরশ্রেষ্ঠে দয়াং কুরু শিবা ভব।
জয়া ত্বং বিজয়া চৈব সংগ্রামে চ জয়প্রদা। মমাপি বিজয়ং দেহি বরদা ত্বঞ্চ সাম্প্রতম্।
বিন্ধ্যে চৈব নগশ্রেষ্ঠে তব স্থানং হি শাশ্বতম্। কালি কালি মহাকালী সীধুমাংসপশুপ্রিয়ে।
কৃতানুযাত্রা ভূতৈস্ত্বং বরদে কামচারিণি। ভারাবতারে যে চ ত্বাং সংস্মরিষ্যন্তি মানবাঃ।
প্রণমন্তি চ যে ত্বাং হি প্রভাতে চ নরা ভুবি। ন তেষাং দুর্লভং কিঞ্চিৎ পুত্রতো ধনতোঽপি বা।
দুর্গাত্তারয়সে দুর্গে তত্ত্বং দুর্গা স্মৃতা জনৈঃ। কান্তারেষ্ববসন্নানাং মগ্নানাঞ্চ মহার্ণবে।
দস্যুভির্বা নিরুদ্ধানাং ত্বং গতিঃ পরমা নৃণাম্। জলপ্রতরণে চৈব কান্তারেষ্বটবীষু চ।
যে স্মরন্তি মহাদেবি ন চ সীদন্তি তে নরাঃ। ত্বং কীর্তিঃ শ্রীর্ধৃতিঃ সিদ্ধির্হ্রীর্বিদ্যা সন্ততির্মতিঃ।
সন্ধ্যা রাত্রিঃ প্রভা নিদ্রা জ্যোৎস্না কান্তিঃ ক্ষমা দয়া। নৃণাঞ্চ বন্ধনং মোহং পুত্রনাশং ধনক্ষয়ম্।
ব্যাধিং মৃত্যুং ভয়ঞ্চৈব পূজিতা নাশয়িষ্যসি। সোঽহং রাজ্যাৎ পরিভ্রষ্টঃ শরণং ত্বাং প্রপন্নবান্।
প্রণতশ্চ যথা মূর্ধ্না তব দেবি সুরেশ্বরি। ত্রাহি মাং পদ্মপত্রাক্ষি সত্যে সত্যা ভবস্ব নঃ।
শরণং ভব মে দুর্গে শরণ্যে ভক্তবৎসলে।—মহা ভা, বঙ্গবাসী সং, ৪।৬।৮-৩

ও পাতালে নিত্য বাস কর এবং যুদ্ধে দানবদের পরাজিত কর। তুমি জম্ভনী (অর্থাৎ তন্দ্রা), মোহিনী, মায়া। তুমি হ্রী, শ্রী, সন্ধ্যা। তুমি প্রভাবতী, জননী, সাবিত্রী। তুমি তুষ্টি, পুষ্টি, ধৃতি, দীপ্তি, চন্দ্রসূর্যবিবর্ধিনী, মহেশ্বরাদি ঐশ্বর্যবানদের তুমি ঐশ্বর্য। আত্মবিবেকরূপ সমাধিতে সিদ্ধচারণগণ তোমাকে দর্শন করেন।[1]

স্তব দুটি প্রক্ষিপ্ত—এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় মহাভারতের পূর্বোক্ত স্তব দুটিকে প্রক্ষিপ্ত মনে করা হয়। পুনার ভাণ্ডারকর প্রাচ্য-গবেষণা-প্রতিষ্ঠান থেকে যে-মহাভারত প্রকাশ করা হয়েছে তাতে স্তব দুটিকে মূলের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি, পরিশিষ্টে স্থান দেওয়া হয়েছে। বিরাটপর্বের অন্তর্ভুক্ত যুধিষ্ঠিরকৃত স্তব সম্বন্ধে উক্ত পর্বের সম্পাদক ডক্টর রঘুবীর লিখেছেন বাংলা দেশের যে-সব পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করা হয়েছে তার কোনোটিতে স্তবটি পাওয়া যায় নি, তেমনি কাশ্মীরী পাণ্ডুলিপিতেও পাওয়া যায় নি। এমন কি কোনো কোনো টীকাতেও এই স্তবটি ধরা হয় নি। যবদ্বীপে প্রচলিত মহাভারতেও এটি নাই। কাজেই স্তবটী পরবর্তী যোজনা।[2] বরোদা প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিতে স্তবটি পাওয়া গেছে।

ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত অর্জুনকৃত স্তবটি কিন্তু বাংলাদেশ, তাঞ্জোর, বরদা ও পুনাতে প্রাপ্ত কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া গেছে।[3]

১ নমস্তে সিদ্ধসেনানি আর্যে মন্দরবাসিনি। কুমারি কালি কাপালি কপিলে কৃষ্ণপিঙ্গলে।
ভদ্রকালি নমস্তুভ্যং মহাকালি নমোঽস্তু তে। চণ্ডি চণ্ডে নমস্তুভ্যং তারিণি বরবর্ণিনি।
কাত্যায়নি মহাভাগে করালি বিজয়ে জয়ে। শিখিপিচ্ছধ্বজধরে নানাভরণভূষিতে।
অট্টশূলপ্রহরণে খড্গখেটকধারিণি। গোপেন্দ্রস্যানুজে জ্যেষ্ঠে নন্দগোপকুলোদ্ভবে।
মহিষাসৃক্প্রিয়ে নিত্যং কৌশিকি পীতবাসিনি। অট্টহাসে কোকমুখে নমস্তেঽস্তু রণপ্রিয়ে।
উমে শাকম্ভরি শ্বেতে কৃষ্ণে কৈটভনাশিনি। হিরণ্যাক্ষি বিরূপাক্ষি সুধূম্রাক্ষি নমোঽস্তু তে।
বেদশ্রুতিমহাপুণ্যে ব্রহ্মণ্যে জাতবেদসি। জম্বুকটকচৈত্যেষু নিত্যং সন্নিহিতালয়ে।
ত্বং ব্রহ্মবিদ্যা বিদ্যানাং মহানিদ্রা চ দেহিনাম্। স্কন্দমাতর্ভগবতি দুর্গে কান্তারবাসিনি।
স্বাহাকারঃ স্বধা চৈব কলা কাষ্ঠা সরস্বতী। সাবিত্রী বেদমাতা চ তথা বেদান্ত উচ্যতে।
স্তুতাসি ত্বং মহাদেবি বিশুদ্ধেনান্তরাত্মনা। জয়ো ভবতু মে নিত্যং ত্বৎপ্রসাদাদ্রণাজিরে।
কান্তারভয়দুর্গেষু ভক্তানাং চালয়েষু চ। নিত্যং বসসি পাতালে যুদ্ধে জয়সি দানবান্।
ত্বং জম্ভনী মোহিনী চ মায়া হ্রীঃ শ্রীস্তথৈব চ। সন্ধ্যা প্রভাবতী চৈব সাবিত্রী জননী তথা।
তুষ্টিঃ পুষ্টির্ধৃতির্দীপ্তিশ্চন্দ্রাদিত্যবিবর্ধিনী। ভূতির্ভূতিমতাং সংখ্যে বীক্ষ্যসে সিদ্ধচারণৈঃ।

—মহা ভা, বঙ্গবাসী সং, ৬।২৩।৪-১৬

২ Introduction to Viratparvan, pp. XV, XX.

৩ দ্রঃ পুনা ভাণ্ডারকর প্রাচ্য-গবেষণা-প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত, ভীষ্মপর্ব, ভূমিকা, পৃঃ ১১৭, পাদটীকা; Appendix I, No. I

যে-পাণ্ডুলিপিগুলিতে আলোচ্য স্তব দুটি পাওয়া গেছে তার কোনোটিই ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ববর্তী নয়। কাজেই, পাণ্ডুলিপির প্রমাণ অনুসারে স্তব দুটির প্রক্ষেপের কাল ষোড়শ শতাব্দী। কিন্তু এই পাণ্ডুলিপির প্রমাণকে চরম প্রমাণ বলে গণ্য করা যায় না। কারণ, ভাণ্ডারকর প্রাচ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান যে-কখানা পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করেছেন তা ছাড়া অন্য পাণ্ডুলিপি দেশে ছিল না এ কথা বলা যায় না। কাজেই, উক্ত প্রতিষ্ঠানের হাতে পড়ে নি এ রকম পাণ্ডুলিপিতে স্তব দুটি থাকা সম্ভবপর। তা ছাড়া, আবহাওয়ার দরুণ এবং অন্যান্য কারণে ভারতের বহু গ্রন্থের প্রাচীন পাণ্ডুলিপি নষ্ট হয়ে গেছে। সেই সব লুপ্ত পাণ্ডুলিপির মধ্যেও আলোচ্য স্তব দুটি থাকতে পারে।

নীলকণ্ঠের টীকা—আরও একটি কারণ আছে। মহাভারতের বিখ্যাত টীকাকার নীলকণ্ঠ উভয় স্তবের টীকা করেছেন। নীলকণ্ঠ গোদাবরীতীরস্থ কূর্পরগ্রাম-নিবাসী ছিলেন। তিনি কাশীতে বসে হরিবংশসহ মহাভারতের টীকা রচনা করেন।[১] নীলকণ্ঠ সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন।[২] তিনি আধুনিক গবেষণাকারী পণ্ডিতদের মতো প্রথমে বিভিন্ন পুঁথি আলোচনা করে মহাভারতের পাঠ নির্ণয় করেছেন এবং তার পরে টীকা রচনা করেছেন। ভারতভাবদীপ নামক স্বীয় টীকার প্রারম্ভে তিনি লিখেছেন—বিভিন্ন অঞ্চলের বহু কোশ সংগ্রহ করে আলোচনা করেছি এবং বহু পুঁথি আলোচনা করে মূলের শ্রেষ্ঠপাঠ নির্ণয় করেছি। তার পর পূর্ববর্তী গুরুদের অনুসরণ করে ভারতভাবদীপ নামক টীকা রচনা আরম্ভ করেছি।[৩]

নীলকণ্ঠ যে মহাভারতের বিভিন্ন পুঁথি আলোচনা করেছেন তাঁর টীকাতে তার বহু নিদর্শন আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আদিপর্বের দ্বাবিংশ অধ্যায়ের উল্লেখ করা যায়। এই অধ্যায়ে মাত্র বারোটি শ্লোক আছে। এই অধ্যায়ের টীকার আরম্ভে নীলকণ্ঠ লিখেছেন 'নাগাশ্চ সংবিদং কৃত্বা' দিয়ে এই যে দ্বাদশশ্লোক অধ্যায়টি আরম্ভ হয়েছে এটি কোনো কোনো পুঁথিতে নেই, কোনো কোনো পুঁথিতে এর শ্লোকগুলির কয়েকটিকে পূর্ব-অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, আবার কোনো পুঁথিতে পাঁচ ছয়টি মাত্র শ্লোক স্থান পেয়েছে। অতএব, এই শ্লোকগুলি বিশুদ্ধ বলে আমাদের মনে হয় না।[৪]

১ রামচন্দ্র শাস্ত্রী কিঞ্জওয়াডেকর সম্পাদিত হরিবংশপর্ব, ১ম সং, পৃঃ ৪

২ Deccan College Manuscript Cat., পৃঃ ১৮৩, সংগ্রহ ১৮৮২-৮৩ (কবিরাজ: কাশী কী সারস্বত সাধনা, পরিষদ্-পত্রিকা, পৃঃ ১৬, বর্ষ ২, অঙ্ক ৪, ১৯৬৩)

৩ বহূন্ সমাহৃত্য বিভিন্নদেশ্যান্ কোশান্ বিনিশ্চিত্য চ পাঠমগ্র্যম্।
প্রাচাং গুরূণামনুসৃত্য বাচমারভ্যতে ভারতভাবদীপঃ।

৪ নাগাশ্চ সংবিদং কৃত্বেতি দ্বাদশশ্লোকমধ্যায়ং কেচিন্ন পঠন্তি কাংশ্চিদস্যান্ শ্লোকান্ পূর্বত্রৈব চ পঠন্তি অন্যে তু পঞ্চষান্ পঠন্তি। অতোঽত্র বিশুদ্ধিঃ ন প্রতীমঃ।

কাজেই দেখা যাচ্ছে নীলকণ্ঠ মহাভারতের টীকা রচনা করার সময় বিভিন্ন পুঁথি বিচার করেছেন এবং মূলে যা বিশুদ্ধ নয় বলে মনে করেছেন তারও উল্লেখ করেছেন।

নীলকণ্ঠ প্রক্ষিপ্ত মনে করেন নি—নীলকণ্ঠ আলোচ্য স্তব দুটির টীকা করেছেন কিন্তু তাদের বিশুদ্ধি সম্বন্ধে কোনো বিচার করেন নি। এর অর্থ তিনি যে-সব পুঁথি আলোচনা করেছেন সে-সব পুঁথিতে স্তব দুটি ছিল। কোনো পুঁথিতে না থাকলে তিনি তার উল্লেখ করতেন। কেন না, টীকায় দেখা যায় যেখানে কোনো পাঠান্তরও লক্ষ্য করেছেন সেখানেও তিনি তার উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করেছেন।

নীলকণ্ঠ যে-সব পুঁথি আলোচনা করেছিলেন সেগুলি সব তাঁরই সময়ে লিখিত না হওয়ারই সম্ভাবনা। কোনো কোনো পুঁথি সম্ভবতঃ আরও প্রাচীন ছিল। কাজেই, বলা যায় স্তব দুটি নীলকণ্ঠের পূর্ব থেকেই মহাভারতে ছিল। কিন্তু কত পূর্ব থেকে ছিল?

এ কথার সঠিক উত্তর দেওয়া সম্ভবপর নয়। তবে এই বিষয় বিচার করার সময় একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। নীলকণ্ঠ স্পষ্টই বলেছেন তিনি পূর্বাচার্যদের অনুসরণ করে টীকা রচনা করেছেন। এর অর্থ তিনি সম্প্রদায় (tradition) বা গুরুশিষ্যক্রমে আগত পরম্পরার অনুসরণ করেছেন। স্তব দুটি যদি এই পরম্পরাসম্মত না হত তা হলে তিনি অবশ্যই তার উল্লেখ করতেন। এরূপ অবস্থায় স্তব দুটিকে নীলকণ্ঠের বহুপূর্ববর্তী বলে অনুমান করা যায়।

হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণে অনুরূপ বিষয়—এ সম্পর্কে আরেকটি বিষয়ও বিবেচ্য। হরিবংশে যোগনিদ্রার বর্ণনায় এবং দুটি আর্যাস্তবে এই স্তব-দুটিরই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে বলা যায়। তা ছাড়া, বিষ্ণুপুরাণে যোগনিদ্রার যে-বিবরণ পাওয়া যায় তার সঙ্গেও আলোচ্য স্তব-দুটির যথেষ্ট মিল রয়েছে।

হরিবংশ—হরিবংশ মহাভারতের খিল-অংশ। মহাভারতের 'পর্বসংগ্রহ' বর্ণনায় মহাপ্রস্থানিক-পর্বের উল্লেখ করে বলা হয়েছে—তার পর হরিবংশ, এটি খিল নামক প্রাক্‌প্রবৃত্ত পর্ব।[১]

হরিবংশের কোনো গবেষণামূলক সংস্করণ প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত যোগনিদ্রার বিবরণ ও আর্যাস্তব পরবর্তী যোজনা কি না নিশ্চয় করে বলা যায় না। উইণ্টারনিজ অবশ্য আর্যাস্তবকে প্রক্ষিপ্ত বলেছেন।[২] কিন্তু তিনি স্বমতের সমর্থনে কোনো যুক্তি দেন নি। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে নীলকণ্ঠ হরিবংশেরও টীকা করেছেন। টীকায় তিনি আলোচ্য অংশের বিশুদ্ধি সম্বন্ধে কোনো কথা বলেন নি। কাজেই, তিনি যে-সব পুঁথি বিচার করেছেন

১ হরিবংশস্ততঃ পর্ব পুরাণং খিলসংজ্ঞিতম্।—মহা ভা ১।২।৮২

২ H. I. L., Vol. I., p. 446, f. n. 1

সেই-সব পুঁথিতে এই অংশগুলি ছিল এবং তিনি এইগুলি মূলের অন্তর্ভুক্ত মনে করেছেন এই সিদ্ধান্ত হয়।

অতএব স্তব দুটি যদি প্রক্ষিপ্তও হয়, তা হলেও সে-প্রক্ষেপ যে নীলকণ্ঠের টীকা রচনার অনেক আগেই হয়েছে এ কথা বলা অযৌক্তিক হবে না।

বিষ্ণুপুরাণ—বিষ্ণুপুরাণ খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে রচিত হয়েছে বলে অনুমান করা হয়।[১] উইন্টারনিজ বলেন বিষ্ণুপুরাণ মোটের উপর তার মূলরূপেই রক্ষিত হয়েছে।[২] এই পুরাণোক্ত যোগনিদ্রার বিবরণ প্রক্ষিপ্ত এ কথা এ যাবত কেউ প্রমাণ করেন নি। সেরূপ কোনো প্রমাণের অভাবে এই বিবরণকে মূলগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত মনে করা যেতে পারে। যোগনিদ্রার বিবরণে বিভিন্ন দেবীর আদিরূপ-স্বরূপ মহাদেবীর বিশিষ্ট রূপের ধারণাটি সুস্পষ্ট আকার নিয়েছে বলা যায়।

কাজেই, ভাবের বিচারে আলোচ্য স্তব দুটিতে অভিব্যক্ত ভাবও অন্ততঃ বিষ্ণুপুরাণের সময় থেকে প্রচলিত ছিল বলা যেতে পারে।

যোগ নিদ্রা—হরিবংশে আছে বিষ্ণু যোগনিদ্রার রূপ বর্ণনা করে বলছেন—তুমি আমার নির্দেশ অনুসারে কুমারী-যোগ্য ব্রত পালন করে ত্রিদিবে প্রয়াণ করবে। সেখানে সহস্রলোচন ইন্দ্র আমার আদেশে তোমার অভিষেক করবেন, দেবতাদের সঙ্গে তোমার পূজা করবেন এবং তোমাকে আপন ভগিনীরূপে গ্রহণ করবেন। কুশিকগোত্রের পরিচয়ে তুমি হবে কৌশিকী। ইন্দ্র পর্বতশ্রেষ্ঠ বিন্ধ্যে তোমার শাশ্বত স্থান নির্দিষ্ট করে দেবেন। তার পর পৃথিবীতে সহস্র স্থানে তুমি শোভা পাবে। তুমি ত্রৈলোক্যচারিণী। তোমার পূজা করে তোমার কাছে যে-প্রার্থনা করা হবে তা অবশ্যই সফল হবে। তুমি বরদা, কামরূপিণী হয়ে সর্বত্র বিরাজ করবে। মনে মনে আমাকে স্মরণ করে তুমি পর্বতচারী সানুচর শুম্ভ ও নিশুম্ভ দানবকে বিনাশ করবে। সুরা ও মাংস তোমার প্রিয় বলি। নবমী তিথিতে পশুবলি দিয়ে তোমার পূজা করা হবে। আমার প্রভাবজ্ঞ যে-সব লোক তোমার পূজা করবে তাদের পক্ষে পুত্র, ধন কিছুই দুর্লভ হবে না। দুর্গম পথে অবসন্ন, মহাসাগরে নিমগ্ন এবং দস্যুদের দ্বারা বন্দী সব লোকের তুমি পরমা গতি। যে ভক্তিভরে এই স্তব করে তোমাকে সন্তুষ্ট করবে সে নিত্য মদ্ভক্তি লাভ করবে এবং আমি তাকে ত্যাগ করব না।[৩]

১ Ibid, p. 545, f. n. 2 : Pargiter : A. I. H. T., p. 80

২ H. I. L., Vol. I, p. 545

৩ কৌমারং ব্রতমাস্থায় ত্রিদিবং ত্বং গমিষ্যসি। তত্র ত্বাং শতদৃক্‌শক্রো মৎপ্রদিষ্টেন কর্মণা।
অভিষেকেণ দিব্যেন দৈবতৈঃ সহ যোক্ষ্যসে। তত্রৈব ত্বাং ভগিন্যর্থে গ্রহীষ্যতি স বাসবঃ।
কুশিকস্য তু গোত্রেণ কৌশিকী ত্বং ভবিষ্যসি। স তে বিন্ধ্যে নগশ্রেষ্ঠে স্থানং দাস্যতি শাশ্বতম্।

প্রথম আর্যাস্তব—পূর্বেই বলা হয়েছে হরিবংশে দুটি আর্যাস্তব আছে। প্রথম স্তবটি এই—ত্রিভুবনেশ্বরী দেবী নারায়ণীকে নমস্কার করি। তুমি সিদ্ধি, ধৃতি, কীর্তি, শ্রী, বিদ্যা, সন্নতি, মতি, সন্ধ্যা, রাত্রি, প্রভা, নিদ্রা, কালরাত্রি। তুমি আর্যা, কাত্যায়নী, কৌশিকী, ব্রহ্মচারিণী, সিদ্ধসেনের অর্থাৎ কার্তিকেয়ের জননী, উগ্রচারিণী, মহাবলা, জয়া, বিজয়া, পুষ্টি, তুষ্টি, ক্ষমা, দয়া, জ্যেষ্ঠা, যমের ভগ্নী, তোমার পরিধানে নীলকৌশেয় বস্ত্র। তুমি বহুরূপা, বিরূপা, অনেকবিধিচারিণী, বিরূপাক্ষী, বিশালাক্ষী, ভক্তদের রক্ষাকারিণী; ঘোর পর্বতের শিখরদেশে, নদীতে, গুহায়, বনে তোমার বাস। বর্বর শবর এবং পুলিন্দদের দ্বারা তুমি পূজিতা, ময়ূরপিচ্ছ তোমার ধ্বজ, সমস্ত লোকসমূহ তুমি ভ্রমণ কর। কুক্কুট, ছাগল, মেষ, সিংহ ও ব্যাঘ্র-সমূহের দ্বারা তুমি পরিবৃতা, তুমি ঘণ্টানিনাদবহুলা, বিন্ধ্যবাসিনী বলে পরিচিতা। তুমি ত্রিশূল- এবং পট্টিশধারিণী। চন্দ্রসূর্য তোমার পতাকা। তুমি কৃষ্ণপক্ষের নবমী এবং শুক্লপক্ষের একাদশী। তুমি বলদেবের ভগিনী, কলহপ্রিয়া, রজনী। তুমি সর্বভূতের আবাস অর্থাৎ আশ্রয়স্থল, তুমি নিষ্ঠা, তুমি পরমা গতি অর্থাৎ মুক্তি। তুমি নন্দগোপসুতা, দেবতাদের বিজয়বিধায়িনী, চিরবাসা, সুবাসা, রৌদ্রী, সন্ধ্যাচরী, নিশা, প্রকীর্ণকেশী, মৃত্যু। সুরা ও মাংস তোমার প্রিয় বলি। তুমি লক্ষ্মী, দানবদের বধের নিমিত্ত তুমি অলক্ষ্মী। তুমি দেবতাদের ও মনুষ্যসমূহের মাতা সাবিত্রী, কন্যাদের তুমি ব্রহ্মচর্য, স্ত্রীদের তুমি সৌভাগ্য, যজ্ঞসমূহের তুমি অন্তর্বেদী, ঋত্বিক্‌দের তুমি দক্ষিণা, কর্ষকদের তুমি সীতা, প্রাণি-সমূহের ধরিত্রী, সাংযাত্রিকদের অর্থাৎ জাহাজী বণিকদের তুমি সিদ্ধি, সাগরের তুমি বেলা, যক্ষদের মধ্যে প্রথমা যক্ষী (অর্থাৎ কুবেরমাতা), নাগদের মধ্যে সুরসা। তুমি ব্রহ্মবাদিনী, দীক্ষা, পরমশোভা, সূর্যাদি তেজোময় পদার্থের তুমি প্রভা, নক্ষত্রদের মধ্যে রোহিণী। রাজদ্বারে, তীর্থে, নদীসঙ্গমে তুমি পূর্ণা, চন্দ্রে তুমি পূর্ণিমা। তুমি কৃত্তিবাসা, বাল্মীকির তুমি সরস্বতী, দ্বৈপায়নের স্মৃতি। ঋষিদের তুমি ধর্মবুদ্ধি, দেবতাদের মানসী (অর্থাৎ সত্যাসত্যাত্মিকা চিত্তবৃত্তি)। তুমি সুরাদেবী, প্রাণীদের মধ্যে স্বকর্মের দ্বারা স্তুতা হও, তুমি ইন্দ্রের চারুদৃষ্টি, তুমি সহস্রনয়না। তপস্বীদের তুমি দেবী, অগ্নিহোত্রীদের অরণি, সর্বভূতের তুমি ক্ষুধা,

ততঃ স্থানসহস্রেষু পৃথিবীং শোভয়িষ্যসি। ত্রৈলোক্যচারিণী সা ত্বং ভুবি সত্যোপযাচনা।
চরিষ্যসি মহাভাগে বরদা কামরূপিণী। তত্র শুম্ভনিশুম্ভৌ দ্বৌ দানবৌ নগচারিণৌ।
তৌ চ কৃত্বা মনসি মাং সানুগৌ নাশয়িষ্যসি। কৃতানুযাত্রা ভূতৈস্ত্বং (?) সুরামাংসবলিপ্রিয়া।
তিথৌ নবম্যাং পূজাং ত্বং প্রাপ্স্যসে সপশুক্রিয়াম্। যে চ ত্বাং মৎপ্রভাবজ্ঞাঃ প্রণমিষ্যন্তি মানবাঃ।
ন তেষাং দুর্লভং কিঞ্চিৎ পুত্রতো ধনতোঽপি বা। কান্তারেষ্ববসন্নানাং মগ্নানাং চ মহার্ণবে।
দস্যুভির্বা নিরুদ্ধানাং ত্বং গতিঃ পরমা নৃণাম্। ত্বাং তু স্তোষ্যন্তি যে ভক্ত্যা ভজমানেন বৈ শুভে।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি।—হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব, ২য় অধ্যায়।

দেবতাদের তুমি তৃপ্তি। তুমি স্বাহা, তৃপ্তি, ধৃতি, মেধা, বসুদের তুমি বসুমতী। মানুষের তুমি আশা, কৃতকর্মাদের পুষ্টি, তুমি দিগ্‌বিদিক্‌, অগ্নিশিখা, প্রভা। তুমি শকুনী, পূতনা, রেবতী, তুমি সুদারুণা। সর্বভূতের তুমি নিদ্রা, তুমি মোহিনী, ক্ষত্রিয়া। বিদ্যাসমূহের মধ্যে তুমি ব্রহ্মবিদ্যা, তুমি ওঁকার, বষট্‌। নারীদের মধ্যে তোমাকে পার্বতী এবং পৌরাণী বলে ঋষিরা জানেন। প্রজাপতির বাক্য অনুসারে তুমি সাধ্বীদের মধ্যে অরুন্ধতী। যথাযথ অর্থযুক্ত দিব্য নামসমূহের দ্বারা তুমি পরিচিত এবং ইন্দ্রানী বলে খ্যাত, স্থাবর জঙ্গম সমগ্র জগৎ তোমার দ্বারা পরিব্যাপ্ত। সব যুদ্ধে, অগ্নিকাণ্ডে, নদীতীরে, চোরের উপদ্রবে, কান্তারে, সব রকমের ভয়ে, প্রবাসে, রাজবন্ধনে, শত্রুদমনে, সব রকমের প্রাণসঙ্কটে তুমিই রক্ষাকর্ত্রী সন্দেহ নাই। দেবী, আমার হৃদয়, চিত্ত, মন তোমাতে নিবিষ্ট। আমাকে সমস্ত পাপ থেকে রক্ষা কর, আমার প্রতি প্রসন্ন হও।[১]

১ নারায়ণীং নমস্যামি দেবীং ত্রিভুবনেশ্বরীম্‌।
ত্বং হি সিদ্ধির্ধৃতিঃ কীর্তিঃ
শ্রীর্বিদ্যা সন্নতির্মতিঃ।
সন্ধ্যা রাত্রিঃ প্রভা নিদ্রা
কালরাত্রিস্তথৈব চ।
আর্যা কাত্যায়নী দেবী কৌশিকী ব্রহ্মচারিণী। জননী সিদ্ধসেনস্য উগ্রচারী মহাবলা।
জয়া চ বিজয়া চৈব পুষ্টিস্তুষ্টিঃ ক্ষমা দয়া। জ্যেষ্ঠা যমস্য ভগিনী নীলকৌশেয়বাসিনী।
বহুরূপা বিরূপা চ অনেকবিধিচারিণী। বিরূপাক্ষী বিশালাক্ষী ভক্তানাং পরিরক্ষিণী।
পর্বতাগ্রেষু ঘোরেষু নদীষু চ গুহাসু চ। বাসস্তে চ মহাদেবি বনেষূপবনেষু চ।
শবরৈর্বর্বরৈশ্চৈব পুলিন্দৈশ্চ সুপূজিতা। ময়ূরপিচ্ছধ্বজিনী লোকান্‌ ক্রমসি সর্বশঃ।
কুক্কুটৈশ্ছাগলৈর্মেষৈঃ সিংহৈর্ব্যাঘ্রৈঃসমাকুলা। ঘণ্টানিনাদবহুলা বিন্ধ্যবাসিনিবিশ্রুতা।
ত্রিশূলী পট্টিশধরা সূর্যচন্দ্রপতাকিনী। নবমী কৃষ্ণপক্ষস্য শুক্লস্যৈকাদশী তথা।
ভগিনী বলদেবস্য রজনী কলহপ্রিয়া। আবাসঃ সর্বভূতানাং নিষ্ঠা চ পরমা গতিঃ।
নন্দগোপসুতা চৈব দেবানাং বিজয়াবহা। চীরবাসাঃ সুবাসাশ্চ রৌদ্রী সন্ধ্যাচরী নিশা।
প্রকীর্ণকেশী মৃত্যুশ্চ সুরামাংসবলিপ্রিয়া। লক্ষ্মীরলক্ষ্মীরূপেণ দানবানাং বধায় চ।
সাবিত্রী চাপি বেদানাং মাতা মন্ত্রগণস্য চ। কন্যানাং ব্রহ্মচর্যং ত্বং সৌভাগ্যং প্রমদাসু চ।
অন্তর্বেদী চ যজ্ঞানামৃত্বিজাং চৈব দক্ষিণা। কর্ষকাণাং চ সীতেতি ভূতানাং ধরণীতি চ।
সিদ্ধিঃ সাংযাত্রিকানাং তু বেলা ত্বং সাগরস্য চ। যক্ষাণাং প্রথমা যক্ষী নাগানাং সুরসেতি চ।
ব্রহ্মবাদিন্যথো দীক্ষা শোভা চ পরমা তথা। জ্যোতিষাং ত্বং প্রভা দেবি নক্ষত্রাণাং চ রোহিণী।
রাজদ্বারেষু তীর্থেষু নদীনাং সঙ্গমেষু চ। পূর্ণা চ পূর্ণিমা চন্দ্রে কৃত্তিবাসা ইতি স্মৃতা।
সরস্বতী চ বাল্মীকে স্মৃতির্দ্বৈপায়নে তথা। ঋষীণাং ধর্মবুদ্ধিস্তু দেবানাং মানসী তথা।
সুরা দেবী তু ভূতেষু স্তূয়সে ত্বং স্বকর্মভিঃ। ইন্দ্রস্য চারুদৃষ্টিস্ত্বং সহস্রনয়নেতি চ।

শাস্ত্রবিশ্বাসীরা মনে করেন এই স্তব বিষ্ণুকৃত,[১] ব্যাসদেব একে পদ্যরূপ দিয়েছেন।[২]

অপর আর্যাস্তব—এই স্তবটি অনিরুদ্ধকৃত। বাণ উষাসহ অনিরুদ্ধকে বন্দী করে রাখেন। তখন অনিরুদ্ধ আত্মরক্ষার জন্য দেবী কোটবতীর শরণ নেন এবং এই স্তব করেন।

স্তবটির সূচনাতেই বলা হয়েছে—ঋষি এবং দেবতাগণ বাক্‌পুষ্পের দ্বারা যাঁর পূজা করেন, যিনি সর্বদেহে বিরাজমানা, সর্বদেবনমস্কৃতা, সর্বলোকনমস্কৃতা, চণ্ডী, কাত্যায়নী আর্যা সেই দেবীর সেই-সব নাম দিয়ে স্তব করব যে-সব নামে শ্রীহরি স্তব করেছিলেন।[৩]

অনিরুদ্ধ বললেন—কল্যাণের জন্য শুচি পবিত্র হয়ে ভাবশুদ্ধ মনে কৃতাঞ্জলিপুটে মহেন্দ্র ও বিষ্ণুর ভগিনী তোমাকে নমস্কার করি এবং তোমার স্তব করি। তুমি গৌতমী, কংসের পক্ষে ভয়দা, যশোদার আনন্দবর্ধনকারিণী, মেধ্যা, গোকুলসম্ভূতা, নন্দগোপের নন্দিনী। তুমি প্রজ্ঞা, দক্ষা, শিবা, সৌম্যা, দানববিমর্দিনী, সর্বদেহস্থা, সর্বদেবনমস্কৃতা, দর্শনী, পূরণী, মায়া। চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নির তুমি প্রভা। তুমি শান্তি, ধ্রুবা, জননী, মোহিনী, শোষণী। ঋষিগণ ও দেবতাগণ তোমার সেবা করেন, সমস্ত দেবতারা তোমাকে প্রণাম করেন। তুমি কালী, কাত্যায়নী, দেবী, ভয়দা, ভয়নাশিনী। কালরাত্রি, কামগমা, ত্রিনেত্রা, ব্রহ্মচারিণী, সৌদামিনী, মেঘরবা তুমি। তুমি বেতালী, বিপুলাননা, যূথের আস্থা, মহাভাগা, শকুনী, রেবতী। তিথি সমূহের মধ্যে তুমি পঞ্চমী, ষষ্ঠী, চতুর্দশী এবং পূর্ণিমা। তুমি সপ্তবিংশতি ঋক্ষ, সমস্ত নদী এবং দশ দিক্। নগর, উপবন, দ্বার এবং অট্টালিকায় তুমি

তাপসানাং চ দেবী ত্বমরণী চাগ্নিহোত্রিণাম্। ক্ষুধা চ সর্বভূতানাং তৃপ্তিস্ত্বং দৈবতেষু চ।
স্বাহা তৃপ্তির্ধৃতির্মেধা বসূনাং ত্বং বসুমতী। আশা ত্বং মানুষাণাং চ পুষ্টিশ্চ কৃতকর্মণাম্।
দিশশ্চ বিদিশশ্চৈব তথা হ্যগ্নিশিখা প্রভা। শকুনী পূতনা ত্বং চ রেবতী চ সুদারুণা।
নিদ্রাঽসি সর্বভূতানাং মোহিনী ক্ষত্রিয়া তথা। বিদ্যানাং ব্রহ্মবিদ্যা ত্বমোঙ্কারোঽথ বষট্ তথা।
নারীণাং পার্বতীং চ ত্বাং পৌরাণীমৃষয়ো বিদুঃ। অরুন্ধতী চ সাধ্বীনাং প্রজাপতিবচো যথা।
যথার্থনামভির্দিব্যৈরিন্দ্রাণী চেতি বিশ্রুতা। ত্বয়া ব্যাপ্তমিদং সর্বং জগৎস্থাবরজঙ্গমম্।
সংগ্রামেষু চ সর্বেষু অগ্নিপ্রজ্বলিতেষু চ। নদীতীরেষু চৌরেষু কান্তারেষু ভয়েষু চ।
প্রবাসে রাজবন্ধে চ শত্রূণাং চ প্রমর্দনে। প্রাণাত্যয়েষু সর্বেষু ত্বং হি রক্ষা ন সংশয়ঃ।
ত্বয়ি মে হৃদয়ং দেবি ত্বয়ি চিত্তং মনস্ত্বয়ি। রক্ষ মাং সর্বপাপেভ্যঃ প্রসাদং কর্তুমর্হসি।

—হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব, তৃতীয় অধ্যায়।

১ অনিরুদ্ধীয়ে অধ্যায়ে বিষ্ণুনা প্রোক্তবিষ্ণুনা। আর্যাস্তব উপক্রান্তো কথ্যতে ইতীর্যতে।

—ঐ, নীলকণ্ঠকৃত টীকার আরম্ভ।

২ বিষ্ণুনা কৃতমপি ব্যাসেন পদ্যরূপেণ রচিতম্।—ঐ, ২৮ সংখ্যক শ্লোকের নীলকণ্ঠকৃত টীকা।

৩ হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব, অঃ ১২০

বাস কর। তুমি হ্রী, শ্রী, গঙ্গা, গন্ধর্বা, যোগিনী, সৎলোকের যোগদাত্রী। তুমি কীর্তি, আশা, দিক্‌, স্পর্শ, সরস্বতী, তোমাকে নমস্কার। তুমি বেদমাতা সাবিত্রী, ভক্তবৎসলা, তপস্বিনী, শান্তিকারিণী। তুমি একানংশা, সনাতনী, কৌটবী, মদিরা, চণ্ডা, ইলা, মলয়বাসিনী, ভূতধাত্রী, ভয়ঙ্করী, কুষ্মাণ্ডী, কুসুমপ্রিয়া। তুমি দারুণী, মদিরাবাসা, বিন্ধ্য এবং কৈলাসে তোমার বাস। তুমি বরাঙ্গনা, সিংহরথী, বহুরূপা, বৃষধ্বজা, দুর্লভা, দুর্জয়া, দুর্গা। তুমি নিশুম্ভকে ভয়প্রদর্শন কর। দেবতাদের তুমি প্রিয়, তুমি সুরাদেবী, তুমি ইন্দ্রের অনুজা, কল্যাণকারিণী। তুমি চীরবসনা কিরাতী, চোর এবং সেতুরা তোমাকে নমস্কার করে। তুমি আজ্য এবং সোম পান কর। তুমি সৌম্যা, সমস্ত পর্বতে তোমার বাস। তুমি নিশুম্ভশুম্ভমথনী, গজকুম্ভোপমস্তনী। তুমি সিদ্ধসেনের জননী, সিদ্ধ ও চারণগণ তোমার সেবা করে। তুমি চন্দ্রা, কুমারজননী, পর্বতকন্যা পার্বতী। পঞ্চাশৎ দেবকন্যা, সমস্ত দেবতাদের পত্নীরা এ-সব তুমি। তুমিই হাজার হাজার কদ্রুপুত্রের পুত্রপৌত্র এবং বরস্ত্রী। তুমি মাতা, তুমি পিতা, জগতের মান্যা তুমি, স্বর্গে দেবতা ও অপ্সরাদের তুমি মান্যা। ঋষিপত্নী, যক্ষপত্নী, গন্ধর্বপত্নী, বিদ্যাধরপত্নী, সাধ্বী নারী—এঁদের সবার মধ্যে তুমি সর্বভূতের আশ্রয়রূপে বিরাজমানা। তুমি ত্রৈলোক্য-নমস্কৃতা। কিন্নরগণ গান করে তোমার সেবা করে। তুমি অচিন্ত্যা, অপ্রমেয়া, তুমি যা তুমি তাই, তোমাকে নমস্কার। ওগো গৌতমী, এই সব নামে এবং অন্যান্য নামে তোমার কীর্তন করা হয়। তোমার প্রসাদে শীঘ্রই নির্বিঘ্নে বন্ধনমুক্ত হব। ওগো বিশালাক্ষী, দেখ আমি তোমার পাদপদ্মে শরণ নিয়েছি, সমস্ত বন্ধন মোচন কর।[১]

---

১ মহেন্দ্রবিষ্ণুভগিনীং নমস্যামি হিতায় বৈ। মমদা তাবত্তকেন স্তুতিঃ স্তোতে কৃতাঞ্জলিঃ।
গৌতমীং কংসভয়দাং যশোদানন্দবর্দ্ধিনীম্। মেধ্যাং গোকুলসম্ভূতাং নন্দগোপস্য নন্দিনীম্।
প্রাজ্ঞাং দক্ষাং শিবাং সৌম্যাং দনুপুত্রবিমর্দ্দিনীম্। তাং দেবীং সর্বদেহস্থাং সর্বভূতনমস্কৃতাম্।
দর্শনীং পূরণীং মায়াং বহ্নিস্বর্ণশিপ্রভাম্। শান্তিং প্রভাং চ জননীং মোহিনীং লোকনীং তথা।
সেব্যাং দেবৈঃ সর্ষিগণৈঃ সর্বদেবনমস্কৃতাম্। কালীং কাত্যায়নীং দেবীং ভয়দাং ভয়নাশিনীম্।
কালরাত্রিং কামগমাং ত্রিনেত্রাং ব্রহ্মচারিণীম্। সৌদামিনীং মেঘরবাং বেতালীং বিপুলাননাম্।
বৃষস্তাভাং মহাভাগাং শকুনীং রেবতীং তথা। দ্বিতীয়াং পঞ্চমীং ষষ্ঠীং পূর্ণিমাসীং চতুর্দশীম্।
সপ্তবিংশতিঋক্ষাণি নক্তং সর্বা দিশো দশ। নগরোপবনোদ্যানপ্রাসাদাট্টালকবাসিনীম্।
হ্রীং শ্রীং গঙ্গাং চ গন্ধর্বাং যোগিনীং যোগদাং সতাম্। কীর্তিমাশাং দিশং স্পর্শাং নমস্যামি সরস্বতীম্।
বেদানাং মাতরং চৈব সাবিত্রীং ভক্তবৎসলাম্। তপস্বিনীং শান্তিকরীমেকানংশাং সনাতনাম্।
কৌটবীং মদিরাং চণ্ডামিলাং মলয়বাসিনীম্। ভূতধাত্রীং ভয়করীং কুষ্মাণ্ডীং কুসুমপ্রিয়াম্।
দারুণীং মদিরাবাসাং বিন্ধ্যকৈলাসবাসিনীম্। বরাঙ্গনাং সিংহরথীং বহুরূপাং বৃষধ্বজাম্।
দুর্লভাং দুর্জয়াং দুর্গাং নিশুম্ভভয়দর্শিনীম্। সুরপ্রিয়াং সুরাং দেবীং মহেন্দ্রস্যানুজাং শিবাম্।

বিষ্ণুপুরাণে যোগমায়া—বিষ্ণুপুরাণে আছে শ্রীভগবান্ যোগমায়াকে বলছেন, আমি প্রাবৃট্‌কালে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীর রাত্রে উৎপন্ন হব এবং নবমীতে তুমি প্রসূত হবে। আমার শক্তিপ্রেরিত-বুদ্ধিতে বসুদেব আমাকে যশোদার শয্যায় এবং তোমাকে দেবকীর শয্যায় নিয়ে যাবে। কংস তোমাকে ধরে পাথরের উপর আছাড় দেবে কিন্তু তুমি তৎক্ষণাৎ অন্তরীক্ষে অবস্থান করবে। তার পর সহস্রলোচন শক্র আমার গৌরবে তোমাকে প্রণাম করে প্রণিপাত-নতশিরে তোমাকে ভগিনী বলে গ্রহণ করবেন। তার পর তুমি শুম্ভনিশুম্ভ প্রভৃতি সহস্র সহস্র দানব বধ করবে এবং অনেক স্থানে অবস্থান করে সেই সব স্থানের দ্বারা পৃথিবীর শোভাবর্ধন করবে। তুমি ভূতি, সন্নতি, কীর্তি, কান্তি, দ্যৌ, পৃথিবী, ধৃতি, লজ্জা, পুষ্টি, উষা এবং এমনি অন্য যা-কিছু সে-সবও তুমিই। যারা তোমাকে আর্যা, দুর্গা, বেদগর্ভা, অম্বিকা, ভদ্রা, ভদ্রকালী, ক্ষেম্যা, ক্ষেমঙ্করী বলে সকালে ও সন্ধ্যায় নম্র হয়ে তোমার স্তব করবে তারা আমার প্রসাদে সমস্ত কাম্যবস্তু লাভ করবে। সুরা ও মাংস উপহার দিয়ে এবং অন্যান্য ভক্ষ্য ও ভোজ্য দিয়ে তোমার পূজা করলে তুমি প্রসন্ন হয়ে মানুষের অশেষ কাম্যবস্তু প্রদান কর। আমার প্রসাদে তোমার প্রদত্ত কাম্যবর নিঃসন্দেহ সফল হবে। তুমি যথানির্দিষ্ট স্থানে যাও।[১]

কিরাতীং চীরবসনাং চৌরসেনানমস্কৃতাম্। আজ্যপাং সোমপাং সৌম্যাং সর্বপর্বতবাসিনীম্।
নিশুম্ভশুম্ভমথনীং শঙ্কুলোপমস্তনীম্। জননীং সিদ্ধসেনস্য সিদ্ধচারণসেবিতাম্।
চরাং কুমারপ্রভবাং পার্বতীং পর্বতাত্মজাম্। পঞ্চাশদ্দেবকন্যানাং পত্ন্যো দেবগণস্য চ।
কদ্রুপুত্রসহস্রস্য পুত্রপৌত্রবরস্থিতঃ। মাতা পিতা জগন্মাতা দিবি দেবাপ্সরোগণৈঃ।
ঋষিপত্নীগণানাং চ ব্রহ্মণবধোষিতাম্। বিদ্যাধরাণাং নারীষু সাধ্বীষু মনুজাসু চ।
একৈকাসু নারীষু সর্বভূতাশ্রয়া হ্যসি। ন মন্ত্রাঽসি ত্রৈলোক্যে কিন্নরোদ্গীতসেবিতে।
অচিন্ত্যা রূপবেষাঽসি যাঽসি সাসি নমোঽস্তু তে। এভির্নামভিরন্যৈশ্চ কীর্তিতা হ্যসি গৌতমি।
ত্বৎপ্রসাদাদবিঘ্নেন ক্ষিপ্রং মুচ্যেয় বন্ধনাৎ। অবেক্ষস্ব বিশালাক্ষি পাদৌ তে শরণং ব্রজে।
সর্বেষামেব বদ্ধানাং মোক্ষণং কর্তুমর্হসি।—হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব, অঃ ১২০।

১ প্রাবৃট্‌কালে চ নভসি কৃষ্ণাষ্টম্যামহং নিশি। উৎপৎস্যামি নবম্যাঞ্চ প্রসূতিং ত্বমবাপ্স্যসি।
যশোদাশয়নে মাং তু দেবক্যাস্ত্বামনিন্দিতে। মচ্ছক্তিপ্রেরিতমতির্বসুদেবো নয়িষ্যতি।
কংসশ্চ ত্বামুপাদায় দেবি শৈলশিলাতলে। প্রক্ষেপ্স্যত্যন্তরিক্ষে চ ত্বং স্থানং সমবাপ্স্যসি।
ততস্ত্বাং শতদৃক্ শক্রঃ প্রণম্য মম গৌরবাৎ। প্রণিপাতানতশিরা ভগিনীত্বে গ্রহীষ্যতি।
ততঃ শুম্ভনিশুম্ভাদীন্ হত্বা দৈত্যান্ সহস্রশঃ। স্থানৈরনেকৈঃ পৃথিবীমশেষাং মণ্ডয়িষ্যসি।
ত্বং ভূতিঃ সন্নতিঃ কীর্তিঃ কান্তির্দ্যৌঃ পৃথিবী ধৃতিঃ। লজ্জা পুষ্টিরুষা যা চ কাচিদন্যা ত্বমেব সা।
যে ত্বামার্যেতি দুর্গেতি বেদগর্ভেঽম্বিকেতি চ। ভদ্রেতি ভদ্রকালীতি ক্ষেম্যা ক্ষেমঙ্করীতি চ।
প্রাতশ্চৈবাপরাহ্ণে চ স্তোষ্যন্ত্যানম্রমূর্তয়ঃ। তেষাং হি প্রার্থিতং সর্বং মৎপ্রসাদাদ্ভবিষ্যতি।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র—কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের (খৃঃ পূঃ ৩য় -১ম শতক[১]) দুর্গনিবেশ অধ্যায়ে পুরমধ্যে অপরাজিত, অপ্রতিহত, জয়ন্ত, বৈজয়ন্ত, শিব, বৈশ্রবণ এবং অশ্বির (অশ্বিনীকুমারদ্বয়) জন্য কোষ্টকের ব্যবস্থা দিয়ে বলা হয়েছে[২] 'শ্রীমদিরাগৃহং চ পুরমধ্যে কারয়েৎ'-পুরমধ্যে শ্রীমদিরাগৃহও করাবে। দেবালয়স্থাপন সম্পর্কে অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে শ্রীমদিরার নাম করার জন্য স্পষ্টই বোঝা যায় এখানে শ্রীমদিরা অর্থ মদিরাদেবী। লক্ষ্য করা গেছে হরিবংশের অনিরুদ্ধকৃত আর্যাস্তবেও দেবীকে মদিরা বলা হয়েছে।

হালের সপ্তশতী— হালের সপ্তশতীতে (খৃঃ পূঃ ৩য়-২য় শতক) গৌরীর উল্লেখ আছে।[৩]

মহাবস্তু—মহাবস্তুতে আছে শুদ্ধোধন অমাত্যদের আদেশ দেন—কুমারকে (বুদ্ধদেবকে) দেবী অভয়ার পাদবন্দনার জন্য 'শাক্যবর্দ্ধন' দেবমন্দিরে নিয়ে যাও।[৪]

অনুমান হয় অভয়া ছিলেন শাক্যদের কুলদেবী।

বুদ্ধচরিত—অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে (২য় খৃষ্টাব্দ) এক জায়গায় বলা হয়েছে—একটি স্ত্রীলোক। মেঘকালী তার নাম। তার হাতে নরকপাল। সে মহর্ষির (বুদ্ধের) চিত্তমোহ জন্মাবার জন্য সেখানে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াতে লাগল। অস্থিরমতি লোকের বুদ্ধি যেমন শাস্ত্রের মধ্যে কোথাও স্থির হয়ে থাকতে পারে না তেমনি সেও স্থির হয়ে থাকতে পারছিল না।[৫]

লক্ষ্য করবার বিষয় বৌদ্ধ কবির কল্পনায় কালী মারের দলভুক্ত একজন প্রলুব্ধকারিণী স্ত্রীলোক হয়ে পড়েছেন। বৌদ্ধদের হাতে সনাতন দেবগুলের দেবদেবীর এ রকম দুর্গতির বহু নিদর্শন আছে। তবে কেউ কেউ মনে করেন এই মেঘকালী, দেবী কালী নাও হতে পারেন।[৬]

মনুসংহিতা—মনুসংহিতাতে (৩য় খৃঃ শতক) শ্রী এবং ভদ্রকালীকে অর্ঘ্যদানের বিধান পাওয়া যায়।[৭]

সুরামাংসোপহারৈশ্চ ভক্ষ্যভোজ্যৈশ্চ পূজিতা। নৃণামশেষকামাংস্ত্বং প্রসন্না সম্প্রদাস্যসি।
তে সর্বে সর্বদা ভদ্রে মৎপ্রসাদাদসংশয়ম্। অসন্দিগ্ধা ভবিষ্যন্তি গচ্ছ দেবি যথোদিতম্।

—বি পু ৫।১।৮৩-৮৪

১ Pargiter মনে করেন অর্থশাস্ত্র রচিত হয় খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতকে। দ্রঃ A. I. H. T., p. 54

২ অর্থশাস্ত্র ৪।২২ ৩ গাথা সপ্তশতী ১।১ ; ৭।১০০ ; ৫।৪৮

৪ Senart : Mahavastu, 1890, p. 26

৫ স্ত্রী মেঘকালী তু কপালহস্তা কর্তুং মহর্ষেঃ কিল মোহচিত্তম্।
বভ্রাম তত্রানিয়তং ন তস্থৌ চলাত্মনো বুদ্ধিরিবাগমেষু।

—বুদ্ধচরিত ১৩।৪৯

৬ The Buddhacarita, Part II, p. 197 ৭ মনু ৩।৮৯

কালিদাসের কাব্য—কালিদাস (৪-৫ খৃঃ শতক) তাঁর রঘুবংশের প্রথম শ্লোকেই পার্বতীপরমেশ্বরের বন্দনা করেছেন। কুমারসম্ভবে আছে শশাঙ্কমৌলী শঙ্করের সঙ্গে পার্বতী তথা উমার বিবাহ এবং পার্বতীর গর্ভে কুমারজন্মের কথা। কবি শিবের বিবাহে বরযাত্রীদের মধ্যে সপ্তমাতৃকার উল্লেখ করেছেন। মহাকবি লিখেছেন কনকপ্রভা সেই দেবীদের পিছনে পিছনে চলেছেন কপালধারিণী কালী যেন বলাকাশোভিত নীল মেঘমালার সামনে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।[১]

দেখা যাচ্ছে ব্যবহারিক দৃষ্টিতে কালিদাসের সময়েও উমা তথা পার্বতী আর কালী পৃথক্ দেবী।

মৎস্যপুরাণ—মৎস্যপুরাণে[২] দেখা যায় দেবী গৌরী দক্ষের কাছে ১০৮ তীর্থে অধিষ্ঠিত আপনার ১০৮ নামের উল্লেখ করেছেন।[৩]

এই পুরাণে অর্ধনারীশ্বরমূর্তির উমার এবং দশভুজা সিংহবাহনা কাত্যায়নীর রূপবর্ণনা করা হয়েছে।[৪]

মার্কণ্ডেয়পুরাণ—পুরাণগুলির মধ্যে দেবীর মাহাত্ম্যবর্ণনায় সব চেয়ে বিখ্যাত মার্কণ্ডেয়পুরাণ। এই পুরাণের দুর্গাসপ্তশতী বা দেবীমাহাত্ম্য[৫] শাক্তদের কাছে সবিশেষ আদৃত।

ব্রহ্মাকৃত স্তুতি, শক্রাদিকৃত স্তুতি, দেবগণকৃত স্তুতি আর নারায়ণীস্তুতি এই চারটি চমৎকার স্তোত্র দুর্গাসপ্তশতীর অন্তর্ভুক্ত। এই স্তোত্রগুলির মাধ্যমেই বিশেষ করে দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়েছে।

রাত্রিসূক্ত, মহাভারত, হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণের দেবীস্তোত্রে দেবীর যে তত্ত্ব, মাহাত্ম্য ও রূপ প্রকাশিত হয়েছে তা সবই এই স্তোত্রগুলিতে আছে। এমন সহজ সুন্দর করে ব্রহ্মময়ী মহাশক্তি মহাদেবীর তত্ত্ব ও মাহাত্ম্য এর আগে আর প্রকাশিত হয় নি।

দুর্গাসপ্তশতীতে মহাদেবীকে বলা হয়েছে মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী, মহামায়া, চণ্ডিকা, অম্বিকা, ভদ্রকালী, গৌরী, শিবদূতী। তবে তাঁকে প্রধানতঃ বলা হয়েছে চণ্ডিকা। চণ্ডিকাকে শিবশক্তিরূপে, শিবানীরূপেই পরিচিত করা হয়েছে।

১ তাসাঞ্চ পশ্চাৎ কনকপ্রভাণাং কালী কপালাভরণা চকাসে
বলাকিনী নীলপয়োদরাজী দূরং পুরঃ ক্ষিপ্তশতহ্রদেব।

—কুমারসম্ভব ৭।৩৯

২ সাধারণতঃ মৎস্যপুরাণকে ৫ম খৃঃ শতকের রচনা মনে করা হয়। তবে পার্জিটার মনে করেন মৎস্যপুরাণ আপস্তম্বের পূর্ববর্তী অর্থাৎ খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকেরও পূর্ববর্তী।—দ্রঃ A. I. H. T., p. 51.

৩ মৎস্যপুরাণ, অঃ ১৩ ৪ ঐ অঃ ২৬০

৫ মার্কণ্ডেয়পুরাণের এই অংশের রচনা ষষ্ঠ শতাব্দীর পরবর্তী নয়।—দ্রঃ H. I. L, part I, P. 565

দুর্গাসপ্তশতীতে দেখা যায় দেবী চণ্ডিকার ভ্রুকুটিকুটিল ললাটদেশ থেকে কালী বিনিষ্ক্রান্ত হয়েছেন।[১] তিনি চণ্ড ও মুণ্ডের মাথা দুটি কেটে চণ্ডিকা দেবীর কাছে নিয়ে আসেন বলে তার নাম হয় চামুণ্ডা।[২]

এই বিবরণ থেকে বোঝা যায় কালী, চামুণ্ডা এঁরা পৃথক্ দেবীই ছিলেন। পরে মহাদেবীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান, মহাদেবীরই রূপভেদ বলে গণ্য হন।

দেবী কৌশিকী যে মহাদেবীরই রূপবিশেষ আলোচ্য গ্রন্থে তারও স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। কৌশিকীর কাহিনীটি এই—শুম্ভনিশুম্ভ দেবতাদের স্বর্গ থেকে তাড়িয়ে দেয়। তখন তাঁরা হিমালয়ে গিয়ে বিষ্ণুমায়ার স্তব করতে থাকেন।

দেবতারা যখন স্তব করছিলেন তখন দেবী পার্বতী গঙ্গাস্নানে যাবার পথে তাঁদের সামনে এসে উপস্থিত হলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন—আপনারা কাঁর স্তব করছেন?

তখন দেবী পার্বতীরই দেহকোশ থেকে অম্বিকা বেরিয়ে এলেন এবং বললেন এঁরা আমারই স্তব করছেন।

পার্বতীর দেহকোশ থেকে নিঃসৃত হয়েছেন বলে দেবী কৌশিকী নামে পরিচিতা হলেন।[৩]

মৎস্যপুরাণে[৪] কিন্তু কৌশিকী দেবীর আবির্ভাব-কাহিনী অন্যভাবে দেওয়া হয়েছে। তাতে দেখা যায় নীলোৎপলদলবর্ণা উমাকে একদিন শিব অসিতা বলে পরিহাস করেন। এতে দেবী খুব মর্মাহত ও ক্রুদ্ধ হন এবং কঠোর তপস্যা করে ব্রহ্মার কাছে কাঞ্চনবর্ণা হবার বর লাভ করেন। ব্রহ্মা বর দেওয়ামাত্র শৈলনন্দিনী স্বীয় ভৃঙ্গাভ ও নীলোৎপল-সদৃশ ত্বক্ পরিত্যাগ করেন। তখন সেই ত্বক্ থেকে ঘণ্টাহস্তা, ত্রিলোচনা, নানাভরণভূষিতা পীতকৌষেয়ধারিণী এক দেবী আবির্ভূতা হলেন। মৎস্যপুরাণের মতে ইনিই দেবী কৌশিকী; ইনি নিশা; ইনি একানংশা। ব্রহ্মা এঁকে বিন্ধ্যাচলে গিয়ে দেবকার্য-সাধন করতে বললেন। আবার লক্ষ্য করা গেছে হরিবংশ অনুসারে কুশিকগোত্রের আরাধ্যা যে-দেবী তিনি কৌশিকী। অর্থাৎ এই মতে কৌশিকদের কুলদেবীর নাম কৌশিকী।

কৌশিকী নামের ব্যাখ্যা যাই হোক না কেন, এ কথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে মৎস্যপুরাণ ও মার্কণ্ডেয়পুরাণের সময়ে পার্বতী, অম্বিকা, কৌশিকী, নিশা ও একাংশা—এঁরা এক হয়ে গেছেন। অর্থাৎ এঁরা যে স্বরূপতঃ এক, এ ধারণা সর্বসাধারণের মধ্যেও প্রচলিত হয়েছে।

১ ভ্রুকুটীকুটিলাত্তস্যা ললাটফলকাদ্দ্রুতম্।
কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী।—দু স ৭।৫

২ যস্মাচ্চণ্ডং চ মুণ্ডং চ গৃহীত্বা ত্বমুপাগতা। চামুণ্ডেতি ততো লোকে খ্যাতা দেবী ভবিষ্যসি।—ঐ ৭।২৫

৩ দু স ৫।৩৭-৪০ ৪ মৎস্যপুরাণ, অঃ ১৫৪-১৫৭

বৃহৎসংহিতা—বরাহমিহির (ষষ্ঠ খৃঃ শতক) তাঁর বৃহৎসংহিতায় বিষ্ণু, সবিতা ও শিবের উপাসকদের সঙ্গে মাতৃকাদেরও মণ্ডল সম্বন্ধে পারদর্শী উপাসকদের উল্লেখ করেছেন।[১]

দেখা যাচ্ছে বরাহমিহিরের সময় বিষ্ণু, সূর্য এবং শিবের পূজার মতো মাতৃকাদের পূজারও প্রচলন ছিল।

গরুড়পুরাণ—গরুড়পুরাণ বৈষ্ণব পুরাণ। এই পুরাণেও দুর্গাপূজার বিবরণ আছে। এই দুর্গা অষ্টাদশভুজা। তাঁর বাম হস্তে কপাল, খেটক, ঘণ্টা, দর্পণ, তর্জনী, ধনু, ধ্বজ, ডমরু ও পাশ আর দক্ষিণ হস্তে শক্তি, মুদ্গর, শূল, বজ্র, শঙ্খ, অঙ্কুশ, শর, চক্র এবং শলাকা।[২]

কাদম্বরী—বাণভট্ট (৭ম খৃঃ শতক) তাঁর কাদম্বরীতে চণ্ডিকার নিকট নরবলির বিবরণ দিয়েছেন।[৩] এ ছাড়া, চণ্ডীশতক নামে একখানি চণ্ডীমাহাত্ম্যকাব্যও বাণভট্টের রচনা মনে করা হয়।

মালতীমাধব—ভবভূতির (৭ম খৃঃ শতকের শেষ দিক্) মালতীমাধবে[৪], দেবী চামুণ্ডার কাছে নরবলি দেবার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

বাসবদত্তা— ভবভূতির সমসাময়িক লেখক সুবন্ধুর বাসবদত্তাতে বেতালা নামে পরিচিতা ভগবতী কাত্যায়নীর উল্লেখ আছে।[৫] লক্ষণীয় অনিরুদ্ধকৃত আর্যাস্তবেও দেবীকে বেতালী বলা হয়েছে।

গৌড়বহকাব্য— বাক্‌পতিরাজের (৮ম খৃঃ শতকের প্রথম দিক্) গৌড়বহকাব্যে[৬], দেবী বিন্ধ্যবাসিনীর স্তব পাওয়া যায়। কবি দেবীকে শবরী[৭] এবং কালী[৮] বা পার্বতী থেকে অভিন্ন মনে করেছেন।

---

১ বিষ্ণোর্ভাগবতান্ মগাংশ্চ সবিতুঃ শম্ভোঃ সভস্মদ্বিজান্।
মাতৄণামপি মাতৃমণ্ডলবিদো বিপ্রান্ বিদুর্ব্রাহ্মণাঃ।

বৃহৎসংহিতা ৬০।১৯

২ কপালং খেটকং ঘণ্টাং দর্পণং তর্জনীং ধনুঃ। ধ্বজং ডমরুকং পাশং বামহস্তেষু বিভ্রতী।
শক্তিঞ্চ মুদ্গরং শূলং বজ্রং শঙ্খং তথাঙ্কুশম্। শরং চক্রং শলাকাঞ্চ দুর্গামায়ুধসংযুতাম্।

গরুড়পুরাণ ১৩৪।৭-৯

৩ 'তদভিমুখশ্চ কিঞ্চিদধ্বানং গত্বা'—থেকে আরম্ভ করে চণ্ডিকার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। দ্রঃ কাদম্বরী, পূর্বভাগ, অনুচ্ছেদ ২১৬, পৃ ২২৪

৪ দ্রঃ—পঞ্চম অঙ্ক।

৫ ভগবতী কাত্যায়নী বেতালাভিধানা স্বয়ং প্রতিবসতি।—বাসবদত্তা, পৃঃ ১১৭

৬ দ্রঃ গৌড়বহ, শ্লোঃ ২৮৫-৩৩৭

৭ ঐ, শ্লোঃ ৩০৫ ৮ ঐ, শ্লোঃ ২৯৭

কূর্মপুরাণ—কূর্মপুরাণে (৮ম খৃঃ শতক) এক হাজার আট নামে দেবীর স্তব করার উল্লেখ আছে।[১]

এই পুরাণে এক জায়গায় আছে দেবী দুর্গা হিমালয়কে বলছেন—ধ্যান, কর্মযোগ, ভক্তি ও জ্ঞানের দ্বারা আমাকে পাওয়া যায়। অন্যরকম কোটি কর্মের দ্বারাও পাওয়া যায় না। তুমি মুক্তির জন্য সর্বদা অধ্যাত্মজ্ঞানের সহিত শ্রুতিস্মৃতি-নির্দিষ্ট বর্ণাশ্রমাত্মক কর্ম কর।[২]

পদ্মপুরাণ—পদ্মপুরাণের (৮ম খৃঃ শতক[৩]) সৃষ্টিখণ্ডে পুষ্করতীর্থের মাহাত্ম্যবর্ণনা প্রসঙ্গে দেবী দুর্গার কথা বলা হয়েছে।[৪]

সৌন্দর্যলহরী—সৌন্দর্যলহরী বা আনন্দলহরী দেবী ত্রিপুরসুন্দরীর স্তব। চমৎকার কাব্যসৌন্দর্যের সঙ্গে গভীর শক্তিতত্ত্বের অভিব্যক্তি এই স্তুতিকাব্যের বিশেষত্ব। এটি শঙ্করাচার্যের রচনা মনে করা হয়। তবে এই শঙ্করাচার্য শারীরকভাষ্যকার শঙ্করাচার্য কি না এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

অগ্নিপুরাণ— অগ্নিপুরাণে (৯ম খৃঃ শতক) বিংশতিভুজা চণ্ডী, অষ্টাদশভুজা চণ্ডী, দশভুজা চণ্ডী, রুদ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চণ্ডরূপা, অতিচণ্ডিকা, উগ্রচণ্ডা, শঙ্করী, কৌমারী, বারাহী প্রভৃতি দেবীর বর্ণনা আছে।[৫]

বরাহপুরাণ—বরাহপুরাণে দেবী ত্রিকলা, ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও রৌদ্রীর বিবরণ আছে। এতে বৈষ্ণবী কর্তৃক মহিষাসুরবধের এবং রৌদ্রী কর্তৃক রুরু নামক দৈত্যবধের কথা পাওয়া যায়। এই রৌদ্রীই চামুণ্ডা, ইনিই কালরাত্রি, ইনিই মহাকালী।[৬]

রামচরিতকাব্য—অভিনন্দের (৯ম খৃঃ শতক) রামচরিতকাব্যে (দ্রঃ ষোড়শ সর্গ) দেবীমাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়েছে।

শ্রীমদ্ভাগবত—ভাগবতের দশম স্কন্ধে (দ্বাবিংশ অধ্যায়) আছে ব্রজকুমারীরা হেমন্তের প্রথম মাসে হবিষ্যাশী হয়ে কাত্যায়নীর অর্চনা করতেন।

বৃহৎকথামঞ্জরী—বৃহৎকথামঞ্জরীতে (একাদশ খৃঃ শতক) আছে দেবী বিন্ধ্যবাসিনীর পূজার কথা।[৭]

---

১ আত্মভাষায় চাত্মানমোজাহং সমভ্যুন্নয়ন্। নাম্নামষ্টসহস্রেণ তুষ্টাব পরমেশ্বরীম্।—কূর্মপুরাণ, পূর্বভাগ, ১২।৬০

২ ধ্যানেন কর্মযোগেন ভক্ত্যা জ্ঞানেন চৈব হি। প্রাপ্যাহং তে গিরিশ্রেষ্ঠ নান্যথা কর্মকোটিভিঃ।
শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং সম্যক্ কর্ম বর্ণাশ্রমাত্মকম্। অধ্যাত্মজ্ঞানসহিতং মুক্তয়ে সততং কুরু।—ঐ, ১২।২৩৩-৫০

৩ কেউ কেউ মনে করেন মূল পদ্মপুরাণ ৩০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ববর্তী রচনা। দ্রঃ A. I. H. T., p. 50

৪ H. I. L., Part I, p 583

৫ অগ্নিপুরাণ, অঃ ৫০   ৬ বরাহপুরাণ, অঃ ৯০-৯৬   ৭ বৃহৎকথামঞ্জরী ১।১।৩৪

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ—(একাদশ খৃঃ শতক) প্রকৃতিখণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে আছে প্রকৃতির দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও সাবিত্রী এই পঞ্চ রূপ ধারণের কথা।

তা ছাড়া, এই খণ্ডে স্বাহা[১], স্বধা[২], ষষ্ঠী[৩], মঙ্গলচণ্ডী[৪] ও মনসাদেবীর[৫] উপাখ্যান আছে।

রাজতরঙ্গিনী—কহ্লন তাঁর রাজতরঙ্গিনীতে (দ্বাদশ খৃঃ শতক) রণাদিত্য নামক ষষ্ঠ শতকের এক কাশ্মীররাজের প্রসঙ্গে বিন্ধ্যপর্বতের দেবী ভ্রমরবাসিনীর উল্লেখ করেছেন।[৬] কেউ কেউ মনে করেন এই ভ্রমরবাসিনী আর বিন্ধ্যবাসিনী একই দেবী। অনুমান বিন্ধ্য পর্বতে অনেক ভ্রমর ছিল বলে দেবীর ঐ নাম হয়। তবে উপযুক্ত তথ্যের অভাবে এই অনুমানের সত্যাসত্য নির্ধারণ করা যায় না। মার্কণ্ডেয়পুরাণ[৭] এবং দেবীভাগবতে[৮] দেবী ভ্রামরীর নাম পাওয়া যায়।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের (দ্বাদশ খৃঃ শতক[৯]) উত্তরভাগে আছে ললিতাসহস্রনাম।[১০] শাক্তদের কাছে, বিশেষ করে শ্রীবিদ্যার উপাসকদের কাছে ললিতাসহস্রনামের খুবই আদর।

স্কন্দপুরাণ—স্কন্দপুরাণ (দ্বাদশ খৃঃ শতক[১১]) বিখ্যাত শৈব পুরাণ। এই বিরাট পুরাণের বহু স্থলে দেবীর বিষয় আছে। মাহেশ্বরখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত কেদারখণ্ডে আছে— দক্ষযজ্ঞধ্বংস (১ম-৫ম অধ্যায়), শিবপার্বতীর বিবাহ (অধ্যায় ২১-২৭); কুমারিকাখণ্ডে আছে— দেবী কামাখ্যার কামকন্টকাকে বরদান (অধ্যায় ৫২), যুধিষ্ঠির কর্তৃক দেবী একানংশার স্তব এবং এই পরাৎপরা মহাশক্তি মহামায়ার মাহাত্ম্যব্যাখ্যান (অধ্যায় ৬৫); অরুণাচল-মাহাত্ম্য পূর্বার্ধে আছে পার্বতীর তপস্যা ও শিবপূজা (অধ্যায় ৩-৫), দুর্গা কর্তৃক মহিষাসুর-বধ (অধ্যায় ১০-১১)।

অরুণাচলমাহাত্ম্য উত্তরার্ধে মহিষাসুরবধ সম্পর্কে কিছু নূতন কথা বলা হয়েছে। মহিষাসুর বধ করে দুর্গা এক হাতে খড়্গ এবং এক হাতে মহিষের মুণ্ড নিয়ে নাচতে নাচতে গিয়ে গৌরীকে প্রণাম করলেন। তখন গৌরী বললেন বিন্ধ্যবাসিনী, তুমি অতি দুষ্কর কর্ম

১ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড, অঃ ৪০ ২ ঐ, ঐ, অঃ ৪১ ৩ ঐ, ঐ অঃ ৪৩

৪ ঐ, ঐ অঃ ৪৪ ৫ ঐ, ঐ অঃ ৪৫ ৬ রাজতরঙ্গিনী, তৃতীয় তরঙ্গ, শ্লোঃ ৩৯৪-৪৩১

৭ মা পু ৯১।৪৯ ৮ দে ভা ১০।১৩।২২

৯ কেউ কেউ মনে করেন ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ অতি প্রাচীন। এইটিই সম্ভবতঃ বায়ুপুরাণের আদিরূপ। কিন্তু মূল ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ পাওয়া যায় না। দ্রঃ H. I. L., Part I, p. 578

১০ D. S. I. L., pp. [illegible]

১১ আদি স্কন্দপুরাণ প্রাচীন বলে মনে করা হয়। সপ্তম শতকের লিপিতে লেখা এক খানি পুঁথি পাওয়া গেছে। দ্রঃ H. I. L., Part I, pp, 570, 571 and and note 1

করেছ। তোমার প্রভাবে আমার তপস্যা নির্বিঘ্ন হয়েছে। এখন ঐ ভয়ঙ্কর অপবিত্র মহিষের মুণ্ড তোমার পরিত্যাগ করা উচিত। তুমি যে জগৎপাবনী।[১]

কিন্তু দুর্গার হাত থেকে মহিষের মুণ্ড আর খসে না। তখন গৌতমের উপদেশ অনুসারে দেবী খড়গাঘাতে খড়গতীর্থ নির্মাণ করেন এবং তাতে স্নান করেন। তখন তাঁর হাত থেকে মহিষমুণ্ড খসে পড়ে।[২]

লক্ষণীয় এই পুরাণমতে দুর্গা আর গৌরী পৃথক্ দেবী।

স্কন্দপুরাণের বিভিন্ন খণ্ডে বিভিন্ন দেবীর বিবরণ আছে। যথা চতুঃষষ্টিযোগিনী,[৩] লক্ষ্মী,[৪] শীতলা,[৫] একানংশা,[৬] অম্বাবৃদ্ধাদেবী,[৭] ধারাদেবী,[৮] পঙ্কপিণ্ডিকা গৌরী,[৯] চর্মমুণ্ডা,[১০] অজাপালারাধিতা অজাপালেশ্বরী,[১১] মঙ্গলাদি শক্তিত্রয়,[১২] ললিতোমা ও বিশালাক্ষী,[১৩] চত্বরপ্রিয়াদেবী,[১৪] সিদ্ধলক্ষ্মী,[১৫] মহাকালী,[১৬] মাতৃগণ,[১৭] কনকনন্দাদেবী,[১৮] ভদ্রকালী,[১৯] দেবী কণ্টকশোধিনী[২০] এবং দেবী শ্রীমাতা।[২১]

এই পুরাণ থেকে জানা যায় ব্রহ্মা উমাকে কৃষ্ণবর্ণা করে দেবার জন্য রাত্রিদেবীকে অনুরোধ করেন।[২২] তখন রাত্রিদেবী ব্রহ্মার কথা অনুসারে জগন্মাতার জননীর মুখ দিয়ে তাঁর জঠরে প্রবেশ করেন এবং কার্তিকজননীর শরীর কৃষ্ণবর্ণ করে দেন।[২৩]

বৈদিক রাত্রিদেবী যে উমার মধ্যে মিশে গিয়েছিলেন সেই ইঙ্গিতটিই এখানে পাওয়া যাচ্ছে।

সদুক্তিকর্ণামৃত—সদুক্তিকর্ণামৃতে (ত্রয়োদশ খৃঃ শতক) গৌরী, দুর্গা ও কালী বিষয়ক কয়েকটি শ্লোক সংগৃহীত হয়েছে।[২৪]

১ ত্বয়াতিদুষ্করং কর্ম নির্মিতং বিন্ধ্যবাসিনি। জাতং তব প্রভাবেণ নিরন্তরায়ং মে তপঃ।
অথৈতন্মাহিষং শীর্ষমপবিত্রং ভয়ঙ্করম্। জগৎপবিত্রচারিত্রে ত্যক্তুমর্হসি হস্ততঃ।
স্কন্দপুরাণ, মাহেশ্বরখণ্ড, অরুণাচলমাহাত্ম্য, উত্তরার্ধ, ২০।৪-৬

২ ঐ ২০।৭-১৩ ৩ বিষ্ণুখণ্ড, অযোধ্যামাহাত্ম্য, অঃ ৭ ৪ ঐ, কার্তিকমাসমাহাত্ম্য, ঐ ৯

৫ আবন্ত্যখণ্ড, অঃ ১২ ৬ ঐ, ঐ ১৮ ৭ নাগরখণ্ড, ঐ ৮৯ ৮ ঐ, ঐ ১৩৮

৯ ঐ, ঐ ১৭৮ ১০ ঐ, ঐ ৫৪ ১১ প্রভাসখণ্ড, ঐ ৫৮ ১২ ঐ, ঐ ৬০

১৩ ঐ, ঐ ৬১ ১৪ ঐ, ঐ ৬২ ১৫ ঐ, ঐ ১০২ ১৬ ঐ, ঐ ১০৯

১৭ ঐ, ঐ ২২৮ ১৮ ঐ, ঐ ২০৫ ১৯ ঐ, ঐ ২৯১ ২০ ঐ, ঐ ১০২, ২১ অর্বুদখণ্ড, ঐ ২২

২২ তস্যাস্ত্বিষং কুরু কৃষ্ণাং যথা কালী ভবেত্তু সা।—স্কন্দপুরাণ, মাহেশ্বরখণ্ডে কুমারিকাখণ্ড, ২২।৫৩

২৩ আবিবেশ মুখং রাত্রির্ব্রহ্মণো বচনাত্তদা। জন্মদাত্র্যা জগন্মাতুঃ স্বদেশে জঠরাত্তদা।
অরঞ্জয়চ্ছবিং দেব্যা জগন্মাতুর্বিভাবরী।—ঐ ২২।৬৭-৬৮

২৪ দ্রঃ সদুক্তিকর্ণামৃত, শ্লোক ২২, ২৫, ২৬

ব্রহ্মপুরাণ—ব্রহ্মপুরাণে (ত্রয়োদশ খৃঃ শতক) দেবী পার্বতীর কাহিনী বিবৃত হয়েছে (অধ্যায় ৩৪-৩৬, ৩৮, ৭২)।

বৃহদ্ধর্মপুরাণ—বৃহদ্ধর্মপুরাণের (চতুর্দশ খৃঃ শতক) উত্তরখণ্ডে (২।৬০) মহাদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে এবং পূর্বখণ্ডে (অধ্যায় ২১-২২) দুর্গাপূজার বিবরণ আছে।

অন্যান্য পুরাণ— দেবীপুরাণ,[১] দেবীভাগবত,[২] মহাভাগবত বিশেষভাবে দেবীর মাহাত্ম্য-প্রকাশক পুরাণ।

এ ছাড়া, শিবপুরাণ, কালিকাপুরাণ[৩] প্রভৃতিতেও মহাদেবীর নানা রূপ ও মাহাত্ম্যের বিবরণ পাওয়া যায়।

ব্রহ্মময়ী পরমেশ্বরী—মহাদেবী যে পরমেশ্বরী, তিনি যে ব্রহ্মময়ী, সকল দেবতা যে তাঁরই রূপ এই-সব দেবী-মাহাত্ম্য-প্রকাশক পুরাণে তা ভাল করেই বুঝান হয়েছে। শুধু পৌরাণিক দেবীরা নয়, গ্রাম্য দেবীরাও মহাদেবীরই রূপভেদ। দেবীভাগবতে স্পষ্টই বলা হয়েছে—ভারতে প্রকৃতিরূপিণী দেবীর বহু কলা অর্থাৎ অংশরূপ বর্তমান। যাঁরা যাঁরা গ্রামদেবী বলে পরিচিতা তাঁরা সবাই প্রকৃতির কলারূপ।[৪]

শক্তি-আরাধনার অব্যাহত ধারা—এই আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে দেবী-আরাধনার যে-ধারার সূচনা হয়েছিল শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সেই ধারাই অব্যাহতভাবে বয়ে চলেছে। শ্রুতি-পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যে তারই নিদর্শন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে।

১ কেউ কেউ মনে করেন দেবীপুরাণ খৃঃ সপ্তম শতকের শেষে বা অষ্টম শতকের প্রথমে রচিত হয়েছে। দ্রঃ C. H. A., Vol. I., p. 147

২ দেবী ভাগবতের অন্য নাম শ্রীভাগবতমহাপুরাণ। অষ্টাদশ পুরাণের তালিকায় যে ভাগবত-পুরাণের নাম আছে শাক্তরা দাবি করেন তা দেবীভাগবত। বৈষ্ণবরা যেটিকে শ্রীমদ্‌ভাগবত বলেন শাক্তরা সেটিকে বলেন বিষ্ণুভাগবত। তাঁদের মতে দেবীভাগবত বিষ্ণুভাগবতের পূর্ববর্তী। তবে সাধারণতঃ দেবীভাগবতকে অর্বাচীনই মনে করা হয়। স্মার্ত রঘুনন্দন দেবীভাগবত থেকে কোনো বচন উদ্ধার করেন নি। অথচ, তিনি বহু পুরাণ থেকে বচন উদ্ধার করেছেন। সেইজন্য, দেবীভাগবতকে তাঁরও পরবর্তী মনে করা হয়।

৩ কেউ কেউ মনে করেন কালিকাপুরাণ খৃঃ একাদশ শতকের শেষে বা দ্বাদশ শতকের প্রথমে রচিত হয়েছে। দ্রঃ I. H. Q., Vol. XXIII, No : 4, p. 328

৪ বহ্ব্যঃ সন্ত্যঃ কলাশ্চৈব প্রকৃতেরেব ভারতে। যা যাশ্চ গ্রামদেব্যঃ স্যুস্তাঃ সর্বাঃ প্রকৃতেঃ কলাঃ।

—দে ভা ৯।১।১৩৬

(খ) ঐতিহাসিক প্রামাণ্য নিদর্শনে : ভারতে

মোহেঞ্জোদড়ো ও হড়প্পায় ধরিত্রীমাতা— মোহেঞ্জোদড়ো ও হড়প্পায় অনেক পোড়ামাটির (terracotta) নগ্ননারীমূর্তি পাওয়া গেছে। মার্শেল প্রমুখ পণ্ডিতেরা এইগুলিকে মাতৃদেবতার মূর্তি মনে করেন।[১] মেক্কয়ও (Mackay) মনে করেন এই মূর্তিগুলি মাতৃদেবতা বা ধরিত্রীমাতার মূর্তি। তাঁর মতে ঐ সময়ে মাতৃদেবতা বা ধরিত্রী-মাতার মূর্তি নগ্নই হত।[২]

হড়প্পায় একটি পোড়ামাটির আয়ত সিল (oblong terracotta seal) পাওয়া গেছে। এই সিলের মুখপাতের দিক্‌টাতে ডান ধারে আছে একটি নগ্ননারীমূর্তি। মূর্তিটির মাথা নীচের দিকে আর পা উপরের দিকে। পা দুটো ফাঁক-করা। মূর্তিটির পেটের ভিতর থেকে একটি চারা গাছ বেরিয়ে আসছে। তার বাঁ দিকে এক জোড়া বাঘ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। সিলটির উল্টো পিঠে আছে একজন পুরুষ ও একজন নারীর মূর্তি। মেয়েটির চুল আলুথালু। সে মাটিতে বসে পড়েছে আর হাত তুলে পুরুষটির কাছে অনুনয় করছে। পুরুষটি ভীতিকর ভঙ্গীতে মেয়েটির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার এক হাতে চাল জাতীয় একটি বস্তু এবং অন্য হাতে কাস্তে জাতীয় একটি বস্তু। মার্শেল অনুমান করেন নগ্নমূর্তিটি ধরিত্রীমাতার আর সিলের উল্টো পিঠে তাঁর কাছে নরবলি দেবার একটি দৃশ্য দেখান হয়েছে।[৩]

ভিটাতে প্রাপ্ত গুপ্তযুগের গোড়ার দিক্‌কার অনুরূপ একটি সিলের বিবরণ মার্শেল দিয়েছেন। তবে এই সিলটিতে দেখা যায় চারাগাছের পরিবর্তে একটি পদ্ম মূর্তির ঘাড়ের থেকে বেরিয়েছে।[৪]

বারহুতে সিরিমা—বারহুতের (খৃ: পূ: ১ম-২য় শতক) স্তূপবেষ্টনীর (railing) গায়ে যে-সব অলঙ্করণমূর্তি (relief) পাওয়া গেছে তার মধ্যে পরিচায়ক-লেখনের সাহায্যে সিরিমা (শ্রীমা), চুলকোকা (ক্ষুদ্র কোকা) এবং মহাকোকা এই তিনজন দেবীকে চেনা যায়।[৫]

স্মরণ হয় অর্জুনকৃত দুর্গাস্তবে দেবীকে কোকমুখা বলা হয়েছে।

গজলক্ষ্মী—বারহুতে একটি গজলক্ষ্মীর মূর্তিও পাওয়া গেছে। একটি জলপূর্ণ পাত্রে পাঁচটি মৃণালের মাথায় ফুটে আছে পাঁচটি পদ্ম। মাঝখানের পদ্মটির উপর বসে আছেন

১ M. I. C., Vol. I., pp. 49-51 ২ F. E. M., Vol. I, p. 266

৩ M. I. C., Vol. I., p. 52 ৪ Ibid, p. 52

৫ D. H. I., p. 100; B. M. Barua : Barhut. Vol. II, pp. 71-74.

শ্বেতাননা দেবী। সন্তানকে স্তন্যদানের ভঙ্গীতে ডান হাতে পীনপয়োধর তুলে ধরেছেন। দেবীর ডান পাশের পদ্ম দুটির উপর দুই পা রেখে শুঁড় উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে একটি হাতী এবং ঠিক ঐ ভঙ্গীতেই বাঁ পাশের পদ্ম দুটির উপর দুই পা রেখে দাঁড়িয়ে আছে আরেকটি হাতী। হাতী দুটি ধীরে ধীরে দেবীর মাথায় জল ঢালছে।[১]

প্রাচীন মুদ্রায় গজলক্ষ্মী প্রভৃতি দেবী—গজলক্ষ্মীর দণ্ডায়মানা মূর্তি পাওয়া গেছে কৌশাম্বীর একটি লিপিবিহীন মুদ্রায় (খৃঃ পূঃ ৩য় শতক); উজ্জয়িনীর লিপিহীন মুদ্রাগুলিতে (খৃঃ পূঃ ৩য়-২য় শতক); বিশাখদেব ও শিবদত্তের মুদ্রায় এবং সম্ভবতঃ বাসুদেবের (খৃঃ পূঃ প্রথম শতক) মুদ্রায়।[২]

মুদ্রার উপরে গজলক্ষ্মীমূর্তির এই পরিকল্পনাটি এত জনপ্রিয় ছিল যে এজিলিসেস (Azilises), রজুবুল (Rajuvula) এবং শোড়াস (Sodasa) প্রভৃতি উত্তরভারতের বিদেশী শাসকেরাও আপন আপন মুদ্রায় এটি ব্যবহার করেন।[৩]

দেখা যায় মধ্যভারতের প্রাচীন মনুমেন্টগুলির গায়ে অলঙ্করণ-মূর্তিরূপে এই গজলক্ষ্মীমূর্তি ব্যবহৃত হয়েছে।[৪] এটিকেও গজলক্ষ্মীর জনপ্রিয়তার অন্যতম নিদর্শন বলা যেতে পারে।

ভদ্রঘোষের মুদ্রার (পঞ্চাল মিত্র সিরিজ) উল্টো পিঠে একটি দেবীমূর্তি আছে। এল্লান Allan মনে করেন এই দেবী ভদ্রা।[৫] কিন্তু ডক্টর জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন ইনি সম্ভবতঃ লক্ষ্মী কিংবা একানংশারূপিণী দেবী দুর্গা।[৬]

হাতী ছাড়া লক্ষ্মীর মূর্তি দেখা যায় উজ্জয়িনীর মুদ্রায়; ব্রহ্মমিত্র, দৃঢ়মিত্র, বিষ্ণুমিত্র, পুরুষদত্ত, উত্তমদত্ত প্রভৃতি হিন্দু রাজাদের মুদ্রায়। দেবী পূর্ণবিকসিত পদ্মের উপর হয় বসে আছেন, নয় দাঁড়িয়ে আছেন; আর তাঁর হাতেও রয়েছে পদ্ম।[৭]

কেউ কেউ মনে করেন প্রাচীন মুদ্রাগুলিতে উৎকীর্ণ যে-সব দেবীমূর্তির ডান হাতে পদ্ম আর বাঁ হাত কটির উপর ন্যস্ত, তাদের কতকগুলি দুর্গামূর্তির প্রকারভেদমাত্র।[৮]

শিবদত্ত, হগামাস, রজুবুল, শোড়াস প্রভৃতি মথুরার ক্ষত্রপদের মুদ্রার উপরে, রাজন্য জনপদের মুদ্রার উপরে এবং পঞ্চালের ভদ্রঘোষের মুদ্রার উপরে লক্ষ্মীর শুধু হাত উৎকীর্ণ হয়েছে।[৯]

প্রস্তরবলয় বা অঙ্গুরীয়কে—তক্ষশীলায় অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরবলয় বা অঙ্গুরীয়ক পাওয়া গেছে। এই সব বলয় বা অঙ্গুরীয়কের ভিতরের দিকে একটি নগ্নদেবীমূর্তি আছে। মার্শেল মনে করেন এই মূর্তি উৎপাদিকাশক্তির মূর্তি।[১০]

১ M. S. I. A. C., p. 92. ২ D. H. I., p. 110 ৩ D. H. I. p. 110
৪ Ibid., pp. 110-111 ৫ Ibid, p. 188 ৬ Ibid ৭ Ibid, p. 111.
৮ Ibid, p. 184. ৯ Ibid, p. 111. ১০ M. I. O., Vol. I., pp. 62-63.

দেবীর সঙ্গে গোধা—আলোচ্য বলয় বা অঙ্গুরীয়কের কোনো কোনোটিতে দেখা যায় মূর্তির সঙ্গে একটি গোধা বা কুমীর (alligator) রয়েছে।[১]

বাংলাদেশে মধ্যযুগের যে-সব পার্বতীমূর্তি পাওয়া গেছে তাদের পাদপীঠে কুমীর বা গোধা দেখতে পাওয়া যায়।[২] বাংলা চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে দেখা যায় দেবী চণ্ডী গোধিকা-রূপ ধারণ করেছিলেন।

দক্ষিণভারতেও উমামহেশ্বরের অনেক অলঙ্করণমূর্তির (reliefs) সঙ্গে গোধাকে দেখতে পাওয়া যায়।[৩]

উদয়গিরির (মধ্যভারতের ভিলসায়) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের গুহামুখের পাষাণগাত্রে দ্বাদশভুজা মহিষমর্দিনীর অলঙ্করণমূর্তি আছে। খৃঃ পঞ্চম শতকের প্রথম বা দ্বিতীয় বৎসরে এটি উৎকীর্ণ হয়েছিল। মূর্তিতে দেখা যায় দেবী দুহাতে একটি গোধাকে ধরে রয়েছেন।[৪]

সিংহবাহিনী দুর্গা—প্রথম খৃঃ শতকের কুষাণনৃপতি প্রথম এজেসের (Azes I) কতকগুলি মুদ্রায় দেখা যায় এক দেবীর পাশে একটি পশুর সম্মুখভাগ উৎকীর্ণ রয়েছে। পশুটিকে সিংহ বলে নিশ্চিতরূপে সনাক্ত করতে পারলে দেবীমূর্তিকে সিংহবাহিনী দুর্গামূর্তি বলা যায়।[৫]

এজেসের একটি মুদ্রার এক পীঠে আছে ঐ রকম পশুসহ দেবীমূর্তি আর অপর পিঠে আছে একটি ষণ্ডমূর্তি। এটিকে শিবের পশুমূর্তি মনে করা হয়। কাজেই কেউ কেউ দেবীমূর্তিটিকে সিংহবাহিনী দুর্গামূর্তি মনে করেন।[৬]

উমা—কুষাণরাজ হুবিষ্কের মুদ্রায় দেবী উমার মূর্তি সনাক্ত করা যায়।[৭]

হুবিষ্কের একটি ক্ষুদ্র মুদ্রায় আছে দণ্ডায়মান দেবদেবীর মূর্তি। মুদ্রাতে উৎকীর্ণ লিপিতেই এঁদের একজনকে বলা হয়েছে ওয়েস (উমেশ) অপরকে নন। ননা সাধারণ মাতৃবাচক শব্দ। ননার সংক্ষিপ্ত রূপ নন। দেখা গেছে ঋগ্‌বেদেও মাতা অর্থে ননা শব্দের প্রয়োগ আছে; আবার পশ্চিম এশিয়াতেও মা মহাদেবী ননা নামে পূজিতা হতেন। অনুমান করা যায় মা উমার স্থলেই মুদ্রাপ্রস্তুতকারক নন এই সাধারণ মাতৃবাচক শব্দটি ব্যবহার করেছেন। সম্ভবতঃ তখন ঐ অঞ্চলে ননা বা নন বললেই লোকে মাতৃদেবতা উমাকে বুঝত।

এ কথার সমর্থন পাওয়া যায় হুবিষ্কের আরেকটি মুদ্রায়। মুদ্রাটির দেবীমূর্তিকে মুদ্রাতে উৎকীর্ণ লিপিতেই বলা হয়েছে ওম।[৮]

১ D. H. I., p. 172 ২ Ibid ৩ Ibid ৪ Ibid ৫ Ibid, pp. 184-185
৬ Ibid, pp. 184-185 ৭ Ibid, p 186 ৮ দ্রঃ D. H. I., p. 126.

হুবিষ্কের কতকগুলি তাম্রমুদ্রায় দেখা যায় শিব নন বা উমার সামনে কৃপাপ্রার্থীর ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছেন।[১] কয়েকটি মুদ্রায় শিবের সঙ্গিনীকে বলা হয়েছে নন আর কয়েকটিতে উমা।[২]

বিদেশী গ্রন্থে কন্যাকুমারী—Periplus of the Erythræan Sea নামক গ্রন্থে (খৃ: ১ম শতক) ভারতের দক্ষিণতম প্রান্তকে বলা হয়েছে কোমরি (Comari)। উক্ত গ্রন্থ অনুসারে এই স্থান প্রাচীনকাল থেকেই এক দেবীর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে।[৩]

বলাই বাহুল্য, ইনি দেবী কন্যাকুমারী। প্লিনিও Cape Comorin-এর উল্লেখ করেছেন।[৪]

আরও গজলক্ষ্মীমূর্তি—উত্তর প্রদেশের কানপুর জেলার ভেহরাপুর তহসিলের একটি ছোট গ্রাম লালভগত। এই গ্রামে কতকগুলি পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এইগুলিকে দ্বিতীয় খৃ: শতকের নিদর্শন মনে করা হয়। এই সবের মধ্যে বেলে পাথরের একটি থাম আছে। এই থামের মাথায় একটি গজলক্ষ্মীমূর্তি খোদিত আছে।[৫]

বসারে (Basarh) গুপ্তযুগের কতকগুলি সিল পাওয়া গেছে। এই সিলগুলিতেও গজলক্ষ্মীর মূর্তি উৎকীর্ণ রয়েছে।[৬]

অম্বিকা—গুপ্তসম্রাটদের চন্দ্রগুপ্ত-কুমারদেবী-স্বর্ণমুদ্রায় এক দ্বিভুজা আসীনা দেবীমূর্তি আছে। দেবীর বাঁ হাতে পদ্ম আর ডান হাতে ঘট। কোনো কোনো মুদ্রায় তাঁর পা পদ্মের উপর ন্যস্ত। এল্লান (Allan) মূর্তিটিকে লক্ষ্মী অথবা অম্বিকার মূর্তি মনে করেন।[৭]

মহিষমর্দিনী—ভিটাতে গুপ্তযুগের যে-সব পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে তার মধ্যে আছে পাথরের তৈরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্তি (অলঙ্করণমূর্তি)। মূর্তিগুলি দ্বিভুজা মহিষমর্দিনীর।[৮]

উড়িষ্যায় একটি প্রাচীন দ্বিভুজা মহিষমর্দিনীমূর্তি পাওয়া গেছে। রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের মতে মূর্তিটি গুপ্তযুগের।[৯]

নাগার্জুনি পাহাড়ের এক গুহায় ষষ্ঠ খৃ: শতকে মৌখরীরাজ অনন্তবর্মন্ ভূতপতি ও দেবীর

---

১ দ্র: D. H. I., p. 541 ২ Ibid, ৩ Periplus of the Erythræan Sea, p. 46.

৪ Natural History, Vol. II, p. 403. ৫ D. H. I., pp. 105-106

৬ T. Block's Notes on Excavations at Basarh, A. R. A. S. I., 1903-1904, pp. 107-109

৭ দ্র: D. H. . , p 8 ৮ দ্র: D. H. I., p. 496

৯ A. S., No : 44, Pl 4. দ্র: Obscure Figures In Some Famous Temples of Orissa: Sushilchandra De, Curator, Orissa State Archives, A. B. Patrika, Sept., 28, 1952

মূর্তি স্থাপন করেন এবং অন্য একটি গুহায় মা মহাদেবীর মূর্তি স্থাপন করেন। এই মহাদেবীকে বলা হয়েছে দেবী, ভবানী, কাত্যায়নী ও মহিষাসুরমর্দিনী।[১]

সপ্তমাতৃকা— বিশ্ববর্মনের গঙ্গধার প্রস্তলিপিতে (খৃ: ৪২৩) আছে এক 'নৃপতি-সচিব' পুণ্যলাভের জন্য মাতৃকাদের ডাকিনীসমাকুল 'বেশ্ম' নির্মাণ করিয়েছিলেন।[২]

দেওগড় পাষাণ-লিপিতে (আনুমানিক ষষ্ঠ শতক) মাতৃকাদের উল্লেখ আছে। দেওগড় দুর্গের ধারে 'বেতওয়া' নদীর ঘাটের সিঁড়ির পাথরের উপর এই প্রস্তলিপিটি আছে। এই সব সিঁড়ির সঙ্গে তৈরি কুলুঙ্গিতে সপ্তমাতৃকার প্রাচীন প্রস্তরমূর্তিও রয়েছে।[৩]

হিউয়েন সাঙের বিবরণীতে ভীমা দেবী—হিউয়েন সাঙের 'সি-যু-কি' থেকে জানা যায় প্রাচীন গান্ধারের এক মহান্ পর্বতে শিবপত্নী ভীমাদেবীর এক ঘননীল-স্বয়ম্ভূ-প্রস্তরমূর্তি ছিল। সারা ভারতবর্ষ থেকে তীর্থযাত্রীরা সেখানে যেত। পর্বতের পাদদেশে ছিল মহেশ্বরের মন্দির। গায়ে ভস্মমাখা তীর্থিকরা সেই মন্দিরে পূজা করত।[৪]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় বৌদ্ধ গ্রন্থ মহামায়ূরীতে (খৃষ্টাব্দের প্রথম কয়েক শতাব্দীর মধ্যে রচিত) আছে ভারতের উত্তর-পশ্চিমতম প্রান্তে দেবী ভীষণার পূজাস্থান এবং তাঁর পতি শিবভদ্র। কেউ কেউ মনে করেন এই ভীষণা আর ভীমা একই দেবী।[৫]

হিউয়েন সাঙ আরেক জন দেবীর উল্লেখ করেছেন। পুষ্কলাবতীর বৌদ্ধ বিহার থেকে মাইল আটেক উত্তর-পশ্চিমে ছিল একটি স্তূপ। সেখানে এক মাতৃদেবতার স্থান ছিল। চৈনিক পরিব্রাজক একে দানবজননী (Mother of Demons) বলেছেন। লিখেছেন ও দেশের লোকেরা সন্তানকামনায় এর পূজা করত। বুদ্ধদেব একে বৌদ্ধ করে নেন (Converted) আর সেই ঘটনারই স্মারক ঐ স্তূপ।[৬]

বোঝা যাচ্ছে হিউয়েন সাঙ-বর্ণিত স্থানটি একটি প্রাচীন দেবীস্থান। হিউয়েন সাঙের ভারতে আসার আগেই স্থানটিতে বৌদ্ধপ্রাধান্য স্থাপিত হয়। হিউয়েন সাঙ যখন এলেন তখন প্রাচীন স্মৃতিও ঝাপসা হয়ে বিকৃত হয়ে গেছে। সেইজন্য বিদেশী বৌদ্ধ পরিব্রাজকের কানে দেবীর সঠিক নামটিও পৌঁছয়নি।

অইহোলে মহিষমর্দিনী—অইহোলে (খৃ: ষষ্ঠ বা সপ্তম শতক) অষ্টভুজা মহিষাসুর-মর্দিনীর একটি অলঙ্করণ-মূর্তি পাওয়া গেছে। দেবী মহিষাসুরের উদ্ধত গ্রীবা শূলবিদ্ধ করছেন। তাঁর বাহন সিংহ পাশে দাঁড়িয়ে আছে।[৭]

---

১ ŚK. P., p. 104 ২ S. I., p. 385 ৩ E. I., XVIII, pp. 125-26.

৪ O. Y. C. T. I., Vol. I. p. 221 ৫ দ্র: D. H. I., p. 495

৬ O. Y. C. T. I. Vol. I, p. 215 ৭ D. H. I., p. 499

এই স্থানে (Aihol-এ) একটি দুর্গামন্দিরও প্রতিষ্ঠিত হয় আনুমানিক ষষ্ঠ খৃঃ শতাব্দীতে।[১] কোনো এক প্রথম দিকের চালুক্য-নরপতি মন্দিরটি নির্মাণ করান বলে অনুমান করা হয়।[২]

মহাবলিপুরমে দেবীমূর্তি—মামল্লপুরমের (মহাবলিপুরমের) প্রধান পাহাড়ের নানা স্থানে মোট দশটি মণ্ডপ আছে। এইগুলি সপ্তম থেকে একাদশ খৃষ্ট শতকের মধ্যে তৈরি হয়। মণ্ডপগুলির বিভিন্ন নাম আছে। যেমন একটির নাম বরাহমণ্ডপ, আরেকটির নাম মহিষাসুরমণ্ডপ, এমনি। মণ্ডপে বড় বড় স্তম্ভ আছে আর স্তম্ভের গায়ে নানা অলঙ্করণ-মূর্তি খোদাই করা আছে। বরাহমণ্ডপের স্তম্ভের গায়ে আছে মহিষাসুরের সঙ্গে মহিষ-মর্দিনীর যুদ্ধের দৃশ্য।[৩]

এই মহিষমর্দিনীর মূর্তিটি পল্লবদের সুকুমার ও তেজস্বী ভঙ্গীতে নির্মিত। এটিকে সপ্তম শতাব্দীর মূর্তি মনে করা হয়।[৪]

সর্বাণীমূর্তি—ত্রিপুরা জেলার চৌদ্দগ্রাম থানার দেউলবাড়ী গ্রামে অষ্টধাতুনির্মিত অষ্টভুজা একটি দেবীমূর্তি পাওয়া গেছে। মূর্তিটির পাদপীঠে উৎকীর্ণলিপি থেকে জানা যায় দেবীর নাম সর্বাণী। রাজা দেবখড়্গের মহিষী প্রভাবতী স্বর্ণপত্রসহ এই মূর্তিটি দান করেন। দেবখড়্গ খৃঃ সপ্তম শতকের শেষভাগে পূর্বভারতে রাজত্ব করতেন।[৫]

দেবী সর্বাণী আর দুর্গা, ভদ্রকালী, অম্বিকা ইত্যাদি নামে যিনি পরিচিতা তিনি অভিন্ন।[৬]

নালন্দাতে প্রাপ্ত সিলে দেবীমূর্তি—নালন্দাতে অনেক সিল পাওয়া গেছে। এই সিলগুলির মধ্যে নরসিংহগুপ্ত, কুমারগুপ্ত প্রভৃতি গুপ্তনৃপতিদের সিলও আছে। এঁরা পঞ্চম-ষষ্ঠ খৃঃ শতকে বিদ্যমান ছিলেন।[৭] খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের পর থেকেই বিদ্যাচর্চার অন্যতম কেন্দ্র হিসাবে নালন্দার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। খৃঃ ষষ্ঠ থেকে নবম শতক নালন্দার চরম গৌরবের যুগ। অবশ্য, বৌদ্ধশাস্ত্রচর্চার কেন্দ্ররূপে নালন্দার খ্যাতি মুসলমান অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত বজায় ছিল।[৮]

নালন্দাতে বিভিন্ন সময়ের সিল পাওয়া গেছে। সময়টা খৃঃ পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সব সিলের অনেকগুলিতে দেবীমূর্তি উৎকীর্ণ আছে। এখানে কয়েকটির বিবরণ দেওয়া গেল। যথা—

---

১ H. S. I., p. 431 ২ S. C. S. I., C. Her. I., Vol. IV, p. 368

৩ H. S. I., pp. 439-440. ৪ M. S. I. A. C., pp. 191-92.

৫ I. B. Br. S. D. M., pp. 203-204 ৬ Ibid. p. 198 ৭ A. H. I., p. 151

৮ N. E. M., M. A. S. I., No : 66. pp. 19-20

একটি ক্ষুদ্র সিলের এক পিঠে আছে সিংহপৃষ্ঠে পদ্মাসনা চতুর্ভুজা দেবীমূর্তি, অন্য পিঠে নালন্দা বিহারের নাম ও প্রতীক। সিলটিতেই লেখা আছে দেবী শ্রীমদ্‌দেবেশ্বরী। অনুমান করা হয় ইনি সিংহবাহিনী দুর্গা।[১]

একটি সিলে এক চতুর্ভুজা দেবীমূর্তি উৎকীর্ণ হয়েছে। দেবীর হাতে গদা, খড়্গ এবং পদ্ম লক্ষ্য করা যায়। দেবীর নীচে যে-জন্তুটি উৎকীর্ণ তাকে মহিষের মতো মনে হয়। সপ্তমাতৃকার অন্যতমা বারাহীর বাহন মহিষ। ইনি মাতৃকা বারাহী হতে পারেন। তবে কেউ কেউ বলেন এঁকে বারাহীর মতো দেখায় না।[২]

অন্য একটি ক্ষুদ্র সিলেও এক চতুর্ভুজা মহিষবাহনা দেবীকে দেখতে পাওয়া যায়। দেবীর উপরের দুই হাতে খড়্গ এবং চক্র; নীচের এক হাতে ত্রিশূল, অন্য হাতে কি আছে বুঝা যায় না। ইনিও সম্ভবতঃ মাতৃকা বারাহী। তবে কেউ কেউ এঁকে বারাহী বলতে চান না।[৩]

একটি সিলে আছে এক অষ্টভুজা সিংহবাহিনী দেবীমূর্তি। দেবীর হাতে অসি, পদ্ম ঘণ্টা ও পাশ লক্ষ্য করা যায়; দুই হাতে বর ও অভয় মুদ্রাও নজরে পড়ে। ইনি দেবী দুর্গা।[৪]

চণ্ডেকয়-গ্রামজনপদের একটি সিলে এক চতুর্ভুজা দেবীমূর্তি লক্ষ্য করা যায়। দেবীর বাহনটি যেন সিংহই মনে হয়।[৫]

দিকারি-গ্রামের বৃত্তাকার একটি মাটির সিলে একটি দাঁড়ান মহিষাসুরমর্দিনীমূর্তি আছে। মূর্তিটি চতুর্ভুজা। দেবীর হাতে আছে অসি, ত্রিশূল, চর্ম এবং ঘণ্টা।[৬]

অলীকপৃষ্ঠ-গ্রামের একটি সিলে আছে এক নির্মাংস কঙ্কালসার চতুর্ভুজা দেবীমূর্তি। হীরানন্দ শাস্ত্রী[৭] মনে করেন মূর্তিটি মহাকালীর কিন্তু। ডক্টর জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে মূর্তিটি চামুণ্ডার।[৮]

একটি ভাঙ্গা সিলে এক ষড়্‌ভুজা বৃষভবাহনা দেবীমূর্তি লক্ষ্য করা যায়। ইনি সম্ভবতঃ মাতৃকা মহেশ্বরী।[৯] হীরানন্দ শাস্ত্রী এঁকে বলেছেন দুর্গা।[১০]

পোড়া লাল মাটির একটি ক্ষুদ্র সিলে আছে এক চতুর্ভুজা আসীনা দেবীমূর্তি। দেবীর হাতে আছে পাশ, ত্রিশূল, পদ্মকোরক এবং কমণ্ডলু। সিলে লেখা আছে ব্রাহ্মণী-গ্রামজনপদস্য। দেবীটি মাতৃকা ব্রহ্মাণী হতে পারেন।[১১]

ঘনাঞ্জন গ্রামজনপদের লম্বা ধরণের ডিমের আকারের একটি ছোট সিলে দেখা যায় সিংহের

---

১ D. H. I., p. 165 ২ Ibid, pp. 185-186 ৩ D. H. I., p. 186 ৪ Ibid.
৫ N. E. M., M. A. S. I., No: 66, p. 48 ৬ Ibid, p. 54 ৭ Ibid, p. 48
৮ D. H. I., pp. 186-187 ৯ Ibid, p. 186
১০ N. E. M., M. A. S. I., No: 66, p. 48 ১১ D. H. I., p. 186

পিঠে বসে আছেন এক অষ্টভুজা দেবী। দেবীর হাতে চক্র, ধনু এবং ত্রিশূল চিনতে পারা যায়। অনুমান করা হয় ইনি দেবী দুর্গা।[১]

একটি সিলে এক চতুর্ভুজা দেবীমূর্তি লক্ষ্য করা যায়। দেবীর বাহনটি মনে হয় কুমীর। সিলটিতে লেখা আছে কালিগ্রামকীয় জনপদ।[২]

আরেকটি সিলেও এক চতুর্ভুজা দেবীমূর্তি আছে। মনে হয় দেবীর বাহনটি মকর।[৩]

একটি সিলে গজলক্ষ্মীর মূর্তি আছে। দেখা যায় একটি হাতী শুঁড় দিয়ে একটি পদ্মফুল ধরে দেবীর পাশে দাঁড়িয়ে আছে।[৪]

কুমারামাত্যাধিকরণের একটি সিলে উপবিষ্টা গজলক্ষ্মীর মূর্তি লক্ষ্য করা যায়। এ ছাড়া আরও কয়েকটি সিলেও গজলক্ষ্মীর মূর্তি পাওয়া গেছে।[৫]

নালন্দায় প্রাপ্ত দেবমূর্তি—নালন্দার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে শিবপার্বতীর দুটি যুগলমূর্তি পাওয়া গেছে। মূর্তিদুটি পাথরের।[৬] একটি চমৎকার চণ্ডিকামূর্তিও পাওয়া গেছে।[৭]

এ ছাড়া একটি দাঁড়ান পার্বতীমূর্তিও পাওয়া গেছে। তাঁর ডান ধারে শিবলিঙ্গ এবং মাথার বাঁ ধারে চন্দ্রকলা।[৮]

নালন্দার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রাপ্ত একখণ্ড স্লেটপাথরের উপর উৎকীর্ণ সপ্তমাতৃকার মূর্তি পাওয়া গেছে। এটি এখন লকনৌ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।[৯]

মানদেবের প্রস্তরলিপিতে দেবীমন্দিরের উল্লেখ— চঙ্গু-নারায়ণ-মন্দির-স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ সূর্যবংশীয় লিচ্ছবি-রাজ মানদেবের প্রস্তরলিপি থেকে জানা যায় সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের মধ্যেই নেপালে বৈষ্ণব, শৈব এবং শাক্ত মন্দিরগুলি প্রসিদ্ধি লাভ করে।[১০] মন্দিরে কোন কোন দেবতার পূজা হত তার উল্লেখ না থাকলেও সপ্তম শতাব্দীতে যে নেপালে শিব, বিষ্ণু ও দেবীর কোনো না কোনো রূপের পূজা হত এ বিষয়ে প্রস্তরলিপির সাক্ষ্য সুনিশ্চিত।

দেবী লক্ষণা—চম্বার রাজা মেরুবর্মনের সময়কার (৮ম খৃঃ শতক) একটি চমৎকার চতুর্ভুজা মহিষাসুরমর্দিনীমূর্তি পাওয়া গেছে। মূর্তিটি পিতলের। মূর্তিটির পাদপীঠে উৎকীর্ণলিপিতে দেবীকে বলা হয়েছে লক্ষণা। মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধরত দেবী সম্বন্ধে দুর্গাসপ্তশতীতে (দু স ৩।৩৭) বলা হয়েছে দেবী "মহিষাসুরের কণ্ঠদেশ পদদ্বারা

---

১ D. H. I., p. 186 ; N. E. M., M. A. S. I., No : 66, p. 46. Pl. IV, j.
২ N. E. M., M. A. S. I., No : 66, p. 47
৩ Ibid ৪ Ibid, p. 53 ৫ Ibid, pp. 51, 52,49
৬ Ibid, p. 116 ৭ Ibid, Pl. XII,e ৮ Ibid, p. 116
৯ Ibid, p. 115 ১০ Kirata-jana-krti, p. 89

নিপীড়ন করিয়া তাহার বক্ষে শূলাঘাত করিলেন।" এই বর্ণনার সঙ্গে আলোচ্য মূর্তিটি হুবহু মিলে যায়।[১]

ইলোরা ও এলিফেন্টায়—ইলোরা গুহার রাবণ কী খোহ নামক অংশে একটি একশিলাস্তম্ভ-প্রকোষ্ঠ আছে। এই প্রকোষ্ঠের প্রবেশমুখের দুধারে গুহার গায়ে অনেকগুলি মূর্তি খোদিত আছে। এই গুলির মধ্যে একটি ভগ্ন দুর্গামূর্তি লক্ষ্য করা যায়।[২]

ইলোরার বিশ্ববিখ্যাত কৈলাসমন্দিরে (অষ্টম খৃঃ শতকের শেষার্ধ) হরগৌরীর একটি অলঙ্করণমূর্তি পাওয়া গেছে। কৈলাস-শিখরে হরগৌরী আসীন। তাঁদের আসনের নিম্নভাগে আছে বন্দী রাবণ।[৩]

এলিফেন্টা গুহায় আছে অর্দ্ধনারীশ্বরমূর্তি এবং শিব ও পার্বতীর মূর্তি।[৪]

বরাহ্ তাম্রশাসনে—গুর্জর-প্রতিহার-বংশীয় রাজা ভোজদেবের বরাহ্ (Barah) তাম্রশাসনে (৮৩৬ খৃঃ) মহারাজ বৎসরাজের পুত্র মহারাজ শ্রীনাগভট্টদেবকে পরম ভগবতীভক্ত বলা হয়েছে।[৫] সহজেই অনুমান করা যায় দেবীভক্ত এই রাজার রাজ্যে দেবীপূজার বিশেষ আদর ও প্রচলন ছিল।

বিভিন্ন তাম্রলিপিতে স্তম্ভেশ্বরী—শুল্কী-বংশীয় সমস্তমহাসামন্তাধিপতি রণস্তম্ভদেবের ঢেনকানল তাম্রলিপিতে আছে স্তম্ভেশ্বরী শুল্কী-বংশের কুলদেবী।[৬]

মহারাজ জয়স্তম্ভদেবের ঢেনকানল তাম্রলিপিতেও বলা হয়েছে শুলকী-বংশীয় কুলস্তম্ভ দেবী স্তম্ভেশ্বরীর বর লাভ করেন।[৭]

মহারাজ রণস্তম্ভকুলস্তম্ভদেবের ভীমনগরীগড় তাম্রলিপিতে দেখা যায় শুল্কী-বংশীয় বিক্রমাদিত্য দেবী স্তম্ভেশ্বরীর বরলাভ করেছিলেন।[৮]

উড়িষ্যার ভঞ্জ-বংশীয় (ভঞ্জদের সময় আনুমানিক ৯ম-১০ম শতক। দ্রঃ H. O., p. 154.) মহাসামন্ত রাণক রণভঞ্জদেবের বিঙ্কা (Binka) তাম্রলিপিতে দেখা যায় এই বিষ্ণুভক্ত রাজা দেবী স্তম্ভেশ্বরীর কাছে বরলাভ করেছিলেন।[৯]

তাম্রশাসনে মহাগৌরী—কামরূপরাজ বনমালের (নবম খৃঃ শতক) তাম্রশাসনে দেবী মহাগৌরীর উল্লেখ আছে।[১০]

১ D. H. I., p. 493 ২ H. S. I., p. 434 ৩ M. S. I. A. C., pp. 197-198.

৪ H. S. I , p. 435 ৫ E. I., Vol. XIX, p. 18.

৬ Bhandarkar : List No : 1697 ; E. I., Vol. XX, p. 230 ; শুল্কদের সময় আনুমানিক ৯ম খৃঃ শতক।—দ্রঃ H. O., p. 149.

৭ Bhandarkar : List No : 1700 ; E. I., Vol. XX, p. 233 ৮ Ibid, List No : 1698, Ibid

৯ Ibid, List No : 1493, Ibid p. 204 ১০ কামরূপশাসনাবলী, পৃঃ ৯০

কামরূপরাজ ইন্দ্রপালের (একাদশ খৃঃ শতক) তাম্রশাসনেও ভট্টারিকা মহাগৌরীর উল্লেখ পাওয়া যায়।[১]

বাংলাদেশে পালপর্বের (খৃঃ অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতকের প্রথমার্ধ) বিভিন্ন দেবীমূর্তি পাওয়া গেছে। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের মতে এই দেবীদের মধ্যে চামুণ্ডা বা চামুণ্ডীই ছিলেন বাঙ্গালীর প্রিয়। দেবীর সিদ্ধযোগেশ্বরী, দন্তুরা, রূপবিদ্যা, ক্ষমা, রুদ্রচর্চিকা রুদ্রচামুণ্ডা, সিদ্ধচামুণ্ডা প্রভৃতি বিভিন্ন রূপের মূর্তি বাংলার নানা স্থানে পাওয়া গেছে।[২]

তবে অন্যান্য দেবীর বা মহাদেবীর অন্যান্য রূপের পূজাও বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল। তার ঐতিহাসিক নিদর্শনও আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ পূর্বোক্ত সর্বাণীমূর্তির উল্লেখ করা যায়। আরেকটি নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে রাজা দনুজমর্দনদেবের একটি রৌপ্যমুদ্রায় (খৃঃ ১৪১৬-১৪১৮)। মুদ্রার এক পিঠে লেখা আছে রাজার নাম এবং অন্য পিঠে শ্রীচণ্ডীচরণপরায়ণ।[৩] বোঝা যাচ্ছে দনুজমর্দনের সময় বাংলাদেশে চণ্ডীপূজার বিশেষ প্রচলন ছিল।

আমাদের দেশে দেবী আরাধনার ধারা প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আরম্ভ করে বরাবর চলে এসেছে। গ্রন্থাদির প্রমাণ আলোচনা করে এই যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়েছিল দেখা গেল ইতিহাসের সাক্ষ্যও তার সমর্থন করছে।

(গ) ঐতিহাসিক প্রামাণ্য নিদর্শনে ঃ বৃহত্তর ভারতে।

শুধু ভারতে নয় ভারতের বাইরে বৃহত্তর ভারতেও মহাদেবী সম্পর্কে ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া যায়।

চম্পায়—চম্পার রাজা ভদ্রবর্মনের মাইসন (Myson) প্রত্নলিপিতে (খৃঃ পঞ্চম শতক) মহেশ্বরের সঙ্গে উমাকে প্রণাম জানান হয়েছে।[৪]

কম্বোজে—কম্বোজের পনহিয়া হোর (Ponhea Hor) প্রত্নলিপির (খৃঃ ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি) সংস্কৃত অংশে আছে পুসেন্দ্রগতি নামে এক রাজকর্মচারী শিবলিঙ্গ, দুর্গামূর্তি, শম্ভু-বিষ্ণু-মূর্তি এবং ত্রৈলোক্যসার বিষ্ণুমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। এই লিপিরই পরবর্তী অংশে লক্ষ্মীমূর্তির কথা আছে।[৫]

স্নয় পোল (Snay Pol) প্রত্নলিপিতে (ষষ্ঠ বা সপ্তম খৃঃ শতক) দেবী ভগবতীকে আশ্রমন ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী দানের ঘোষণা পাওয়া যায়।[৬]

১ কামরূপশাসনাবলী পৃঃ ১৩৯ ২ বা ই, পৃঃ ৩২৬ ৩ Kirata-Jana-krti, p. 62

৪ সিদ্ধং নমো মহেশ্বর উমাঞ্চ প্র... ।—A. I. C. F. E. Vol I, Book III, p. 5

৫ I. K., A. S. M. S., Vol. VIII. p. 18 ৬ I. K., A. S. M. S., Vol. VIII, p. 50

কম্বোজের কণ্ডোলষ্টাঙ্ (Kandol-Stung) প্রদেশে ছিল শিবপার্বতীর একটি বিখ্যাত মন্দির। নাম বট বিহার ত্রাণ (Vat Vihar Tarn)। এই মন্দিরে ছিল শিবপার্বতীর চমৎকার মূর্তি। দেবী শিবের বাম উরুর উপর আসীনা। প্রত্নলিপির প্রমাণ অনুসারে মন্দিরটি সপ্তম শতাব্দীর।[১]

কম্বোজরাজ ইন্দ্রবর্মনের প্রাহ্ কো (Prah Ko) প্রত্নলিপি (খৃঃ ৮৭৯) থেকে জানা যায় তিনি তিনটি শিববিগ্রহ এবং তিনটি দেবীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেন।[২]

ইন্দ্রবর্মনের বেকঙ্গ (Bakong) প্রত্নলিপিতে আছে বিষ্ণুলোকপ্রাপ্ত তৃতীয় জয়বর্মনের কল্যাণের জন্য শিব, গঙ্গা, উমা এবং বিষ্ণুস্বামী নামক বিষ্ণুমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এ ছাড়া, হরিহর, ইন্দ্রাণী এবং মহিষাসুরমর্দিনীর মূর্তিপ্রতিষ্ঠার কথাও এতে আছে।[৩]

প্রথম হরিবর্মনের পো নগর মন্দিরলিপিতে (খৃঃ ৮১৭) দেখা যায় 'কোঠারে' ভগবতীর জগৎপ্রসিদ্ধ মূর্তিটির স্থান দীর্ঘকাল শূন্য পড়ে থাকায় আবার তাঁর এক শিলাময়ী প্রতিমা নির্মাণ করান হয়।[৪]

কম্বোজের ললেই (Loley) নামক স্থানে ছিল চারটি মন্দির। তার মধ্যে একটি ভবানীর। এই মন্দিরের দ্বারস্তম্ভে উৎকীর্ণ লিপিতে আছে 'শ্রীযশোবর্ম-নরেন্দ্রবর্য' ভবানীর প্রতি ভক্তিবশতঃ মন্দিরের জন্য কিঙ্করাদির ব্যবস্থা করেছেন।[৫]

এই যশোবর্মনের এক প্রত্নলিপির (Phnom Sandak Stele Inscription, 895 A. D.) এক পিঠে আছে ত্রিমূর্তি, গৌরী এবং সরস্বতীর বন্দনা আর যশোবর্মনের প্রশস্তি। অন্য পিঠে আছে ত্রিমূর্তি এবং দেবী অপর্নার বন্দনা আর রাজা জয়বর্মনের প্রশস্তি।[৬]

দ্বিতীয় ঈশান বর্মনের বট থিপডি (Vat Thipadi) প্রত্নলিপিতে (৯১০ খৃঃ) শিব, বিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং উমার বন্দনা করা হয়েছে।[৭]

তৃতীয় ইন্দ্রবর্মনের পো নগর ফলকলিপিতে (৯১৮ খৃঃ) আছে ইন্দ্রবর্মন্ জগতে যশোলাভের জন্য দেবী ভগবতীর স্বর্ণময়ী প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করেন।[৮]

রাজেন্দ্রবর্মনের প্রাশৎ প্রাম (Prasat Pram) লিপিতে (৯৬১ খৃঃ) পাওয়া যায় ইন্দ্রবর্মনের স্বনামধন্য গুরু শিবসোমের শিষ্য এবং রাজেন্দ্রবর্মনের আচার্য রুদ্রাচার্য দুটি শিবলিঙ্গ এবং একটি দেবীপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করেন।[৯]

১ I. K., A. S. M. S , Vol. VIII p. 8 ২ Ibid., p. 61 ৩ Ibid, pp. 66-67
৪ A. I. C. F. E., Vol. I, Book III, pp. 62-64
৫ I. K., A. S. M. S., Vol. VIII, p. 140
৬ I. K., A. S. M. S., Vol. VIII, p. 151 ৭ Ibid, p. 161
৮ A. I. C. F. E., Vol. I, Book III, p. 199 ৯ I. K., A. S. M. S., Vol. VIII, p. 180

এই রাজার মেবন (Mebon) প্রস্তরলিপি (৯৫২ খৃঃ) থেকে জানা যায় যে তিনি লিঙ্গ-শিবপুরে শিবলিঙ্গ এবং দুটি পার্বতীমূর্তির প্রতিষ্ঠা করেন।[১]

রাজেন্দ্রবর্মনের কয়েকটি প্রস্তরলিপি পাওয়া গেছে। তাঁর প্রি রূপ (Pre Rup) অর্থাৎ মন্দির-লিপিতে (খৃঃ ৯৬১) আছে তিনি লিঙ্গ রাজেন্দ্রভদ্রেশ্বরের মূল মন্দিরের সঙ্গে আরও চারটি মন্দির নির্মাণ করিয়ে তার দুটিতে দুটি শিবমূর্তি, একটিতে উমামূর্তি এবং অন্যটিতে বিষ্ণুমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেন।[২]

বন্টই শ্রেই (Bantay Srei) নামক স্থানে পঞ্চম জয়বর্মনের সময়কার (দশম খৃঃ শতকের শেষ দিক) কয়েকটি প্রস্তরলিপি পাওয়া গেছে। এর মধ্যে চারটি উৎসর্গলিপি। এই-সব লিপি থেকে জানা যায় রাজা জয়বর্মনের গুরু যজ্ঞবরাহ, উমা এবং মহেশ্বরের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেন।[৩]

চম্পার অন্যান্য প্রস্তরলিপিতে—রাজা প্রথম জয়পরমেশ্বরবর্মনের পো নগর (Po Nagar) মন্দির-লিপিতে দেবী 'যাপু নগরকে' রাজার দানের কথা আছে।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় পো নগর বা যাপু নগর কথাটার অর্থ নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। চম্পার কৌঠার অঞ্চলে দেবীপূজার ব্যাপক প্রচলন ছিল। এইজন্য দেবী পো নগরকে সংস্কৃতে বলা হত ভগবতী কৌঠারেশ্বরী। ন্হ ত্রঙ্ (Nha Trang) নামক স্থানে ছিল দেবীর বিখ্যাত মন্দির। এই স্থানকে দেবীর নাম অনুসারে পো নগর বলা হত। পো নগর চম্পাবাসীদের জাতীয় দেবস্থান হয়ে উঠে।

কেউ কেউ মনে করেন হিন্দুদের উপনিবেশ স্থাপনের পূর্ব থেকেই ন্হ ত্রঙে স্থানীয় দেবীর পূজা হত। হিন্দুদের হাতে পড়ে ইনিই ভগবতী হয়ে যান।[৪]

ন্হ ত্রঙের ভগবতীমূর্তিটি কাল পাথরের। অতি চমৎকার মূর্তি। দেবী পদ্মাসন করে বসে আছেন। তিনি পীনোন্নতপয়োধরা, তাঁর উদর বলয়াঙ্কিত। এই গুলি মাতৃত্বের নিদর্শক। মূর্তিটি দশভুজা। দেবীর আট হাতে আছে অসি, শূল, ধনু, বাণ, অঙ্কুশ, চর্ম, চক্র এবং শঙ্খ। বাকী দুই হাত দুই হাঁটুর উপর ন্যস্ত। দেবীর হাতে কঙ্কণ, গলায় হার। সৌম্য মূর্তি। কেউ কেউ মনে করেন ৯৬৫ খৃষ্টাব্দে ইন্দ্রবর্মন্ মূর্তিটির প্রতিষ্ঠা করেন। আবার কারো কারো মতে মূর্তিটির প্রতিষ্ঠা করেন রাজকুমারী সূর্যদেবী ১২৫৬ খৃষ্টাব্দে।[৫]

কম্বোজের প্রথম সূর্যবর্মনের (রাজত্বকাল খৃঃ ১০০১—১০৪৯) প্রাশৎ খোম (Prasat

১ I. K., A. S. M. S., Vol. VIII pp. 193-194 ২ Ibid, p. 234 ৩ Ibid, pp. 281-282

৪ H. B., Vol. III, p. 165 ৫ A. I. Q. F. E., Vol. I, Book II, pp. 189-90

khtom) লিপিতে দেখা যায় প্রথমেই আছে তিনটি মন্দিরের সম্পত্তি ও ক্রীতদাসদাসীর তালিকা। মন্দির তিনটির একটি শিবের, একটি ভগবতীর, অপরটি পরমেশ্বরীর।[১]

উদয়াদিত্যবর্মনের স্‌ডক্ কক্ থম্ (Sdok kak Thom) ফলকলিপিতে (১০৫২ খৃ:) অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে আছে রাজা যশোবর্মন্ (৯ম খৃ: শতক) তাঁর গুরু বামশিবকে ভদ্রপত্তনে একটি শিবলিঙ্গ এবং ভগবতীর একটি প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করতে দেন।[২]

একটি কুক্ ত্রপান স্রক্ (Kuk Trapan Srak) ফলকলিপিতে (১০৭৩ খৃ:) আছে বিন্দুদেব নামে এক ব্যক্তি সোমালয় নামে একটি গ্রাম বসান এবং সেখানে শিবলিঙ্গ, আর বিষ্ণু ও ভগবতীর প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করেন।[৩]

অন্য একটি কুক্ ত্রপান স্রক্ ফলকলিপিতে দেখা যায় শ্রীকবীশ্বর পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দ ব্রোঞ্জের তৈরি এক চণ্ডীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেন।[৪]

আরেকটি কুক্ ত্রপান্ স্রক্ ফলকলিপি থেকে জানা যায় কবীশ্বর পণ্ডিতের সহোদর ভাই শ্রীকণ্ঠ পণ্ডিত রাজার কাছ থেকে ভূমিদান পেয়ে বারখানা গ্রাম বসান আর শিবলিঙ্গ ও ভগবতীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেন।[৫]

প্রথম জয়হরিবর্মনের পো নগর মন্দিরলিপি (১১৬০ খৃ:) থেকে জানা যায় তিনি প্রথমে যাপু নগর নামক দেবতার সেবা প্রভূত ধনৈশ্বর্য দিয়ে করেছিলেন।[৬]

চতুর্থ জয়ইন্দ্রবর্মনের পো নগর মন্দির লিপিতে (১১৬৭ খৃ:) রাজা জয়ইন্দ্রবর্মন্, তাঁর রাণী এবং পুত্রকন্যারা ভগবতী কৌঠারেশ্বরীকে যে-দান করেছিলেন তার বিবরণ আছে।[৭]

রাজকুমারী সূর্যদেবীর পো-নগর মন্দিরলিপিতে (১২৫৬ খৃ:) আছে তিনি ভগবতী মাতৃলিঙ্গেশ্বরীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেন।[৮]

চম্পার একটি প্রত্নলিপিতে দেবীকে মহাভগবতী গৌরী বলা হয়েছে।[৯] আরেকটিতে বলা হয়েছে মহাদেবী।[১০]

চম্পাতে দেবীসম্পর্কিত প্রত্নলিপি যত পাওয়া গেছে তার তুলনায় মূর্তি পাওয়া গেছে অনেক কম। কয়েকটি মাত্র মূর্তি পাওয়া গেছে। এই সব প্রত্নলিপি ও মূর্তির বিবরণ আলোচনা করলে লক্ষ্য করা যায় শিব এবং দেবীর মধ্যে ভেদ নেই। দেবী শিবেরই স্ত্রীরূপ। শিবের যে-সব লক্ষণ-লাঞ্ছন দেবীরও তাই। শিবের বাহন নন্দী বা বৃষভ, দেবীরও তাই। দেবীর চতুর্ভুজা থেকে দশভুজা পর্যন্ত বিভিন্ন মূর্তি, শিবেরও চতুর্ভুজ থেকে দশভুজ পর্যন্ত বিভিন্ন বিগ্রহ। তবে শিবের দ্বিভুজ থেকে ত্রিংশদ্ভুজ পর্যন্ত বিগ্রহও আছে।[১১]

১ I. K., A. S. M. S., Vol. VIII, p. 614. ২ Ibid, p. 366 ৩ Ibid, p. 621
৪ Ibid, p. 628 ৫ I. K., A. S. M. S., Vol. VIII, p. 629
৬ A. I. C. F. E., Vol. I, Book III, pp. 194-195 ৭ Ibid, p. 198 ৮ Ibid, p. 213
৯ Inscription No: 26, A. I. C. F. E., Vol. I, Book III, p. 68
১০ Ibid No: 37, Ibid, P. 69 ১১ A. I. C. F. E., Vol. I, Book II, pp. 189-90 ; 190

যবদ্বীপে—যবদ্বীপে ব্রাহ্মণ্য দেবতাদের মধ্যে শিবেরই প্রাধান্য ছিল। প্রাচীন হিন্দু মন্দিরগুলির অধিকাংশই শিবমন্দির। দেবদেবীর যে-সব প্রাচীন মূর্তি পাওয়া গেছে তাদেরও অধিকাংশ শিব এবং তাঁর পরিবার-দেবতাদের।[১]

তবে বিষ্ণু এবং তাঁর শক্তি শ্রী বা লক্ষ্মীর এবং ব্রহ্মা ও তাঁর শক্তি সরস্বতীর পূজাও প্রচলিত ছিল। অবশ্য, শিবের পরেই বিষ্ণুর পূজা অধিক প্রচলিত ছিল। বিষ্ণুশক্তি শ্রী বা লক্ষ্মী চতুর্ভুজা। তাঁর চার হাতে পদ্ম, শস্যশীষ, চামর এবং অক্ষমালা। ব্রহ্মার শক্তি সরস্বতী দ্বিভুজা বা চতুর্ভুজা এবং ময়ূরবাহনা।[২]

শিবের দুই রূপ—যবদ্বীপে শিবের শান্ত এবং উগ্র দুই রূপেরই পূজা হত। শান্তরূপের নাম ছিল মহাদেব এবং উগ্ররূপের নাম মহাকাল বা ভৈরব। উভয় রূপেরই প্রাচীন মূর্তি পাওয়া গেছে।[৩]

শক্তির দুই রূপ—শিবের শক্তিরও তেমনি দুই রূপ দেখা যায়। মহাদেবের শক্তি দেবী, মহাদেবী, পার্বতী বা হৈমবতী উমা। এটি শক্তির শান্তরূপ। দেবী চতুর্ভুজা। এই শান্তরূপেরই প্রকারভেদ দুর্গা বা মহিষাসুরমর্দিনী। মহিষাসুরমর্দিনীর মূর্তি ষড়্ভুজা, অষ্টভুজা, দশভুজা এবং দ্বাদশভুজা।[৪] বাতাবিয়া মিউজিয়ামে কতকগুলি সুন্দর মহিষমর্দিনী মূর্তি রক্ষিত হয়েছে।[৫]

মহাকালী—মহাকাল বা ভৈরবের শক্তি মহাকালী বা ভৈরবী। এটি শক্তির উগ্ররূপ। মহাকালীর মূর্তি শবের উপর আসীনা। দেবীর কণ্ঠভূষণ ও শিরোভূষণ নৃমুণ্ড এবং তাঁর গলায় নৃমুণ্ডের উপবীত। দেবী দ্বিভুজা। তাঁর একহাতে ত্রিশূল, অন্য হাতে একটি ক্ষুদ্র পাত্র। দেবীর আরও ভয়ঙ্করী মূর্তিও আছে।[৬]

অন্যান্য মূর্তি—যবদ্বীপে শিবদুর্গার অর্ধনারীশ্বরমূর্তিও পাওয়া গেছে।[৭] মধ্য-যবদ্বীপের ডিয়েঙ্গ মালভূমিতে অনেক হিন্দুমন্দির ছিল। সেখানে যে-সব মূর্তি পাওয়া গেছে তার মধ্যে আছে শিব, দুর্গা ও গণেশের মূর্তি।[৮]

জিডঙ্গ-সঙ্গ (Gedong-Sanga) নামক স্থানের মন্দিরে এক নূতন ধরণের দুর্গামূর্তি পাওয়া গেছে। দেবী অসুরের ঘাড় ধরে বৃষের উপর বসে আছেন।[৯]

এ ছাড়া আসীন শিব ও উমার মূর্তি পাওয়া গেছে। বাতাবিয়ার মিউজিয়ামে এমনি কয়েকটি চমৎকার মূর্তি রক্ষিত হয়েছে।[১০]

১ A. I. O. F. E. Vol. II, Part II, p. 101 ২ Ibid, p. 104
৩ Ibid, p. 101 ৪ Ibid, p. 102 ৫ দ্বীপময় ভারত, পৃঃ ১৩০
৬ A. I. O. F. E., Vol. II, Part II, pp. 102-103 ৭ Ibid, p. 103
৮ Ibid, p. 176 ৯ Ibid, p. 178 ১০ দ্বীপময় ভারত, পৃঃ ১৪৮

পূর্ব-যবদ্বীপের চণ্ডি কিদল (Candi Kidal) চিতাশালা-মন্দিরে দুর্গা, গণেশ, নন্দীশ্বর এবং মহাকালের মূর্তি পাওয়া গেছে। মূর্তিগুলি এখন লাইডেন মিউজিয়ামে আছে।[১] আলোচ্য মন্দিরটি ত্রয়োদশ খৃষ্টীয় শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল মনে করা হয়।

প্রম্বানন উপত্যকায় লরা জঙ্গরঙ্গ (Lara-Jongrang) মন্দির-শ্রেণীর একটি ছোট মন্দিরে শিলাময়ী দুর্গামূর্তি ছিল। এঁর নাম লরা জঙ্গরঙ্গ। প্রবাদ লরা জঙ্গরঙ্গ আসলে একজন রাজকন্যা ছিলেন। তাঁর এক পাণিপ্রার্থীর অভিশাপে পাষাণী হয়ে যান। পরে লোকের কাছে এই পাষাণীমূর্তি দুর্গামূর্তি বলে গণ্য হয়।[২]

মানবীর দেবীত্বপ্রাপ্তির অনেক কাহিনী আমাদের দক্ষিণভারতেও প্রচলিত আছে।

যবদ্বীপে যে-সব মূর্তি পাওয়া গেছে সেগুলি বিভিন্ন সময়ের। খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের গোড়ার দিকেই যে যবদ্বীপে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রচলন ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ফা হিয়েনের ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে।[৩]

খৃঃ অষ্টম শতকের গোড়ার দিকেই এই দ্বীপে ব্রাহ্মণ্যধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।[৪] এই সময় থেকে আরম্ভ করে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে হিন্দুরাজত্বের অবসান পর্যন্ত সময়ের মধ্যে পূর্বোক্ত মূর্তিগুলি নির্মিত হয়েছে।

যবদ্বীপে দেবীর প্রতিষ্ঠা শিবের শক্তি হিসাবে। তাঁর স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় নি।

বলিদ্বীপে—বলিদ্বীপে খৃঃ ষষ্ঠ শতকে প্রথম বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তিত হয়। কিন্তু ক্রমশঃ পৌরাণিক-ব্রাহ্মণ্যধর্মও সেখানে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[৫]

ব্রাহ্মণ্য দেবতাদের মধ্যে এখানেও শিবের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। শিবই পরম দেবতা। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু তাঁরই রূপভেদ।

শিবের শক্তি উমা বা পার্বতী, কালী এবং দুর্গা। শান্তমূর্তি শিবের শক্তি পার্বতী বা উমা আর উগ্রমূর্তি শিবের বা মহাকালের শক্তি কালী, দুর্গা। বিষ্ণুর শক্তি শ্রী বা লক্ষ্মী এবং ব্রহ্মার শক্তি সরস্বতীরও এখানে অধিষ্ঠান ছিল।

এই দ্বীপেও একাধিক মহিষাসুরমর্দিনীমূর্তি পাওয়া গেছে। কুত্রি নামক স্থানে যে-মূর্তিটি (খৃঃ দশম-দ্বাদশ শতক) পাওয়া গেছে সেটি অতি চমৎকার। মূর্তিটি ভগ্নাবস্থায় পাওয়া গেছে।[৬]

বলিদ্বীপে সর্বসাধারণের জন্য যে-সব পূজামন্দির ছিল তার মধ্যে এক ধরণের মন্দিরকে

১ A. I. C. F. E., Vol. II, Part II, p. 269 ২ Ibid, p. 218
৩ H. B., Vol. III, p. 159 ৪ A. I. C. F. E., Vol. II, Part II, p. 99
৫ Ibid, pp. 188-189 ৬ Ibid, p. 816.

বলা হত পুর ডলেম (Pura Dalem)। শ্মশানে বা শ্মশানের কাছে এই মন্দির তৈরি করে দেবী দুর্গাকে উৎসর্গ করা হত।[১] বোঝাই যাচ্ছে এইগুলি দুর্গামন্দির।

সুবর্ণদ্বীপে—সুবর্ণদ্বীপে (সুমাত্রায়) পৌরাণিক-ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মের কিছু কিছু প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া গেছে। ব্রাহ্মণ্য দেবতাদের মধ্যে শিব, গণেশ, নন্দী, ব্রহ্মা এবং ত্রিমূর্তির পাথরের মূর্তি পাওয়া গেছে। গণেশের ব্রোঞ্জমূর্তিও পাওয়া গেছে।[২]

দেবীর কোনো মূর্তি পাওয়া যায় নি। তবে শিব যখন ছিলেন তখন তাঁর শক্তিও অবশ্য ছিলেন যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপের দৃষ্টান্তে তা অনুমান করা যেতে পারে।

বোর্ণিওতে—বোর্ণিওদ্বীপেও পৌরাণিক-ব্রাহ্মণ্য দেবতাদের কতকগুলি মূর্তি পাওয়া গেছে। পূর্ব-বোর্ণিওর কোম্বেঙ গুহায় শিব, গণেশ, স্কন্দ, নন্দী ও মহাকালের মূর্তি পাওয়া গেছে।[৩] কিন্তু কোনো দেবীমূর্তি পাওয়া যায় নি।

তবে দক্ষিণ-বোর্ণিও এবং পূর্ব-বোর্ণিওর অন্যান্য স্থানে যে-সব মূর্তি পাওয়া গেছে তার মধ্যে একটি পাথরের দুর্গামূর্তি আছে।[৪]

খৃষ্টীয় পঞ্চম থেকে পঞ্চদশ শতক— মোটামুটি এই হাজার বছর ধরে দেখা গেল বৃহত্তর ভারতে শাক্তদের আরাধ্যা মহাদেবী নানারূপে পূজা পেয়েছেন। তবে লক্ষ্য করা যায় দেবী ঐ অঞ্চলে প্রধানতঃ শিবশক্তিরূপেই পূজিতা।

(ঘ) বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যাদিতে

বৌদ্ধ এবং জৈন দুটি অতি প্রাচীন অবেদপন্থী ধর্মসম্প্রদায়। শাক্তদের আরাধ্যা মহাদেবীর পরোক্ষ নিদর্শন উভয় সম্প্রদায়ের সাহিত্যে, বিশেষ করে, বৌদ্ধ সাহিত্যে পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ সাহিত্যে—বুদ্ধদেব বৌদ্ধ শ্রমণদের পক্ষে যে-সব ব্যাপার নিষিদ্ধ মনে করতেন দীঘনিকায়ের সীলক্খন্ধবগ্‌গে সেইগুলির বিবরণ দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য বহু নিষিদ্ধ ব্যাপারের মধ্যে আছে, 'আদিচ্চুপট্‌ঠানং' অর্থাৎ আদিত্যপূজা, 'মহতুপট্‌ঠানং' অর্থাৎ মহাদেবতার পূজা এবং 'সিরিব্হায়নং' অর্থাৎ শ্রীদেবীর আহ্বান।[৫]

রাইস ডেবিড্‌স (Rhys Davids) মনে করেন পূর্বোক্ত মহতুপট্‌ঠানং শব্দের অর্থ মা মহাদেবী (Great Mother Earth) ধরিত্রীর পূজা।[৬]

১ A. I. C. F. E. Vol. II, Part II, p. 141 ২ Ibid, p 145.

৩ Ibid, Part I, p. 128 ৪ Ibid, Part II, P. 151.

৫ দীঘনিকায়, সীলক্খন্ধবগ্‌গ, ব্রহ্মজালসুত্ত, সীলমত্তকং, ২৭

৬ Dialogues of the Buddha, Part I, 1956, p. 24, f. n. 5

বুদ্ধদেবের নিষেধ থেকেই বুঝা যায় তাঁর সময়ে, অন্ততঃ সুত্তপিটক-সংগ্রহের সময়ে ত বটেই, শ্রী. ধরিত্রী প্রভৃতি দেবীর পূজা দেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল।

এই-সব পূজা যে কিরূপ জনপ্রিয় ছিল তার সব চেয়ে বড় প্রমাণ ভগবান্ বুদ্ধের নিষেধ সত্ত্বেও পরবর্তী কালের বৌদ্ধধর্ম একাধিক কারণে এ-সবকে আপনার অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।

এই কাজটি হয় মহাযান-বৌদ্ধমতে। মহাযানীরা নব-ব্রাহ্মণ্য দেবমণ্ডলের দেবদেবীর অনেককে আপনাদের ধর্মমতের মধ্যে গ্রহণ না করে পারলেন না। এর অন্যতম কারণ শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের প্রবল চাপ।[১]

শুধু তাই নয়, মহাযানীরা আপন মতকে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে লোকায়ত্ত স্থানীয় দেবদেবী এমন কি ভূতপ্রেত প্রভৃতিকেও স্বীকার করে নেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন "বৌদ্ধধর্ম কোথাও বা পূর্বপুরুষের উপাসনার সহিত, কোথাও বা ভূতপ্রেত উপাসনার সহিত মিশিয়া গিয়াছে"।[২]

তান্ত্রিক বৌদ্ধমতে দেবী—সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে তান্ত্রিক বৌদ্ধমত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এই মত অনুসারে সশক্তিদেবারাধনা প্রবর্তিত হয়। এই তান্ত্রিক বৌদ্ধ দেবমণ্ডলেই যত সব ভয়ঙ্করী দেবীদের দেখা পাওয়া যায়।[৩]

বৌদ্ধ স্ত্রীদেবতাদের মর্যাদা অনুসারে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। এক—দেবী, দুই—শক্তি, তিন—ডাকিনী। দেবীদের আবার দুই শ্রেণী। এক শ্রেণীর দেবীরা বোধিসত্ত্বের সমপর্যায়ের, এঁরা সৌম্য। অন্য শ্রেণীর দেবীরা ধর্মপালের সমপর্যায়ের, এঁরা উগ্র।[৪]

সাধারণতঃ দেখা যায় শান্ত দেবীমূর্তিগুলি আসীন। বোধিসত্ত্বের অলঙ্কারাদি লক্ষণ-লাঞ্ছন সবই তাদের আছে; মায় পঞ্চপত্র মুকুটটি পর্যন্ত। তাঁরা স্মেরাননা। তাঁদের কপালের উপর ঊর্ণা। তাদের দীর্ঘ তরঙ্গায়িত কেশরাজি সুবিন্যস্ত।[৫]

উগ্র দেবীদের কেশরাজি আলুলায়িত। তাঁদের তান্ত্রিক লক্ষণ-লাঞ্ছন অলঙ্কার প্রভৃতি। এই দেবীদের আছে তৃতীয় নেত্র।[৬]

শক্তিদের কদাচিৎ একক দেখা যায়। যিনি যে-দেবের শক্তি তাঁকে সাধারণতঃ সেই দেবের সঙ্গে যুগনদ্ধ অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। দেবের প্রকৃতি অনুসারে শক্তি সৌম্য বা উগ্র হয়ে থাকেন। সাধারণতঃ শক্তিদের পরিধানে থাকে সিংহচর্ম বা ব্যাঘ্রচর্ম।[৭]

১ Early Buddhism, H. Ph. E. W., pp. 169-170

২ বৌদ্ধধর্ম, পৃঃ ৩-৪ ৩ G. N. B., p. 108. ৪ Ibid, p. 104 ৫ Ibid.

৬ Ibid ৭ Ibid

ডাকিনীরা মর্যাদায় সব স্ত্রীদেবতাদের মধ্যে নীচে। সাধারণতঃ দেখা যায় এদের মূর্তি নৃত্যের ভঙ্গীতে দাঁড়ান। মূর্তিগুলি সৌম্য এবং উগ্র উভয়ই হতে পারে।[১]

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে সনাতনধর্মের স্ত্রীদেবতাদের সঙ্গে এই বৌদ্ধ স্ত্রীদেবতাদের বিশেষ কোনো পার্থক্য নাই। ওঁরাই যেন একটু বেশ বদল করে বৌদ্ধ দেবমণ্ডলে ঢুকে পড়েছেন। তবে সাধারণভাবে বলা যায় সনাতনধর্মীয় দেবীদের মতো মর্যাদা বৌদ্ধ দেবীদের নেই।

তারা—বৌদ্ধ দেবীদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্যা তারা। অনুমান করা হয় খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইনি মহাযানী দেবমণ্ডলে প্রবেশ করেন। হিউয়েন সাঙ উত্তরভারতে বহু তারামূর্তি দেখতে পান। অষ্টম থেকে দ্বাদশ খৃষ্টীয় শতাব্দীর মধ্যে তারার জনপ্রিয়তা চরমে পৌছয়। তারার বহু মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় ; তাঁর নামে বহু বিদ্যালয় উৎসর্গ করা হয়। গৃহস্থ ভক্তদের ঘরে ঘরে তারামূর্তি থাকত।[২]

বিভিন্ন তারা—সপ্তম শতাব্দীতে তারার দুটি রূপভেদ লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীকালে এই রূপভেদ ক্রমশঃ সংখ্যায় বাড়তে বাড়তে একুশটিতে গিয়ে ঠেকে।[৩]

তান্ত্রিক বৌদ্ধমতে তারা ধ্যানী বুদ্ধের শক্তি। পাঁচজন ধ্যানী বুদ্ধ। তাঁদের বর্ণ—সিত, শ্যাম, পীত, লোহিত এবং নীল। সেইজন্য, এই পাঁচটি বর্ণের তারামূর্তিও দেখতে পাওয়া যায়।[৪]

এঁদের মধ্যে সিত এবং শ্যাম বর্ণের তারা সৌম্য ; পীত, লোহিত এবং নীল বর্ণের তারা উগ্র।[৫]

সিততারা—সিততারা পরম পবিত্রতার প্রতিমূর্তি। এঁকে বোধিজ্ঞানের প্রতীক মনে করা হয়। ইনি অবলোকিতেশ্বরের শক্তি। সিততারা সাধারণতঃ ত্রিনয়না। তবে সপ্তনয়না মূর্তিও দেখা যায়। তখন এঁর হাতের তালুতে ও পায়ের পাতায় চোখ থাকে।[৬]

সিততারারই এক তান্ত্রিক রূপ জাঙ্গুলীতারা। সাপের বিষ নামানর সময় এঁকে আহ্বান করা হয়। জাঙ্গুলীতারা চতুর্ভুজা। দেবী দুহাতে বীণা বাজাচ্ছেন। তাঁর এক হাতে অভয়-মুদ্রা এবং অপর হাতে একটি সাদা সাপ।[৭]

জাপানে সাদা সাপের মূর্তিতে সরস্বতীর পূজা করা হত। বীণা সরস্বতীর বিশেষ লাঞ্ছন। আবার সাদা সাপ জাঙ্গুলীতারার বিশেষ লাঞ্ছন।[৮] কাজেই, মনে হয় জাঙ্গুলীতারা আর সরস্বতী মূলতঃ অভিন্ন।

কেউ কেউ জাঙ্গুলীতারাকে বাংলার লৌকিক দেবতা মনসার আদিরূপ মনে করেন।

১ G. N. B., p. 104 ২ Ibid, p. 105 ৩ Ibid, p. 108 ৪ Ibid, p. 106
৫ Ibid ৬ Ibid. pp. 107-108 ৭ Ibid, p. 108 ৮ Ibid

জাঙ্গুলীতারা দ্বিবিধা—শ্যামবর্ণা এবং পীতবর্ণা। শ্যামবর্ণা দেবী চতুর্ভুজা, পীতবর্ণা ষড়্ভুজা। ষড়্ভুজা দেবী ত্রিশিরা।[১]

শ্যামাতারা—তিব্বতীদের মতে শ্যামাতারা আদ্যা তারা। ইনি অবলোকিতেশ্বরের শক্তি। দেবী পদ্মের উপর আসীনা। বোধিসত্ত্বের মতো এঁর পোষাকপরিচ্ছদ, অলঙ্কার, পঞ্চপত্র-মুকুট।[২]

পীততারা—পীততারা বা ভৃকুটীতারা চতুর্ভুজা দেবী। ইনি তারার এক উগ্ররূপ।[৩]

নীলতারা—ভৃকুটীতারার ষড়্ভুজ ত্রিশির রূপের নাম নীলতারা।[৪]

বজ্রতারা—বজ্রতারাও পীততারারই রূপভেদ। এঁর আট হাত এবং চার মাথা। প্রত্যেক মাথার সঙ্গে তৃতীয় নেত্রও আছে।[৫]

খদিরবনীতারা—খদিরবনীতারাও পীততারার একটি বিশেষ রূপ।[৬] বাংলাদেশে যত বৌদ্ধ তারামূর্তি পাওয়া গেছে তার মধ্যে খদিরবনীতারা, ভৃকুটীতারা এবং বজ্রতারার মূর্তিই বেশী।[৭]

একজটা বা উগ্রতারা—পূর্বোক্ত নীলতারাকে একজটা বা উগ্রতারাও বলা হয়। অতি ভয়ঙ্করী মূর্তি। দেবীর দুই রূপ। এক রূপে ইনি শ্যামাতারার সহকারিণী। এই রূপে ইনি দ্বিভুজা। এঁর এক হাতে খড়্গ, অন্য হাতে নরকপাল।[৮]

অন্য রূপে দেবী একজটা বা উগ্রতারা স্বতন্ত্র। এই রূপে এঁর চতুর্ভুজা মূর্তি থেকে আরম্ভ করে বিংশতিভুজা মূর্তি পর্যন্ত পাওয়া যায়। সাধারণতঃ দেখা যায় ইনি দক্ষিণ পার্শ্বে স্থিত শবের উপর এক পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। দেবী লোলজিহ্বা, ভীষণদংষ্ট্রা, অট্টহাসিনী। ইনি রক্তচক্ষু, নৃমুণ্ডমালিনী, ত্রিনয়না। এঁর পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম। ইনি স্থূলাঙ্গী, খর্বকায়া।[৯]

কুরুকুল্লা—দেবী কুরুকুল্লা চতুর্ভুজা, রক্তবর্ণা, রক্তাম্বরা, রক্তমুকুটধারিণী, রক্তপদ্মের উপর উপবিষ্টা। কুরুকুল্লা প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আবার ধনৈশ্বর্যের দেবীও বটেন। কুরুকুল্লা পর্বতের মনোরম গুহায় এঁর বাস।[১০]

কুরুকুল্লার দণ্ডায়মানা এবং নৃমুণ্ডমালিনী মূর্তিও দেখা যায়।[১১]

চুণ্ডা—চুণ্ডাদেবীর মূর্তি চতুর্ভুজা, ষোড়শভুজ এবং অষ্টাদশভুজা। চতুর্ভুজা মূর্তি লোহিতবর্ণা। সৌম্য মূর্তি। দেবীর উপরের দুহাতে জপমালা ও পুস্তক, নীচের দুহাতে ধ্যানমুদ্রা ও কমণ্ডলু (vase)।[১২]

১ G. N. B. p. 108 f. n. 2 ২ Ibid, p. 108 ৩ Ibid, p. 110 ৪ Ibid
৫ Ibid ৬ Ibid ৭ বা ই, পৃঃ ৩৫৭ ৮ G. N. B., p. 111
৯ Ibid, p. 111 ১০ Ibid, p. 112 ১১ Ibid ১২ Ibid, p. 115

মারীচী—দেবী মারীচী শূকরবাহনা। সপ্তশূকরবাহিত তাঁর রথটি অগ্নিশিখার মতো রশ্মিজালে আবৃত। মনে হয় সপ্তাশ্ববাহিত সূর্যরথের অনুকরণে দেবীর রথের কল্পনা করা হয়েছে।[১] সূর্যকে বলা হয় মরীচিমালী। দেবীর নামকরণের মধ্যেও মরীচিমালীর প্রভাব থাকা অসম্ভব নয়।

মারীচীর প্রাচীন নাম বজ্রবরাহী।[২] দুই প্রকারের মারীচীমূর্তি পাওয়া যায়, সিত আর লোহিত। 'সাধনা' অনুসারে সিতমূর্তির দশ হাত এবং চার পা। তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকে মাড়িয়ে চলেছেন। লোহিতমূর্তির ছয় মাথা এবং বার হাত। মারীচীর অন্য একটি লোহিত মূর্তিও আছে। এই মূর্তিতে দেবীর ত্রিমুণ্ড, দশবাহু, স্থূলাঙ্গ। তিনি হয়গ্রীবের শক্তি।[৩]

পর্ণশবরী—পর্ণশবরী, তারার অনুচরী। তার পরিধানে পর্ণ। দেবীকে বলা হয়েছে 'সর্বশবরাণাং ভগবতী' অর্থাৎ সব শবরদের ভগবতী। তাঁর তিনটি মাথা, একটি সিত, একটি পীত, আরেকটি লোহিত। কিন্তু দেবীর গায়ের রং পীত।[৪]

হারীতী-বসুধারা—দেবী হারীতী ধনৈশ্বর্যের দেবী। এঁর অন্যরূপকে বলা হয় বসুধারা। বসুধারা কুবেরের শক্তি।[৫]

সরস্বতী—সরস্বতী মঞ্জুশ্রীর শক্তি। বৌদ্ধরাও সরস্বতীকে সঙ্গীত ও কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনে করেন। সরস্বতীর আরাধনা চীন ও জাপান পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। জাপানী দেবী বেনটেনকে (Benten) সরস্বতীরই মূর্তবিগ্রহ মনে করা হয়।[৬]

বৌদ্ধদের সরস্বতীর হাতেও বীণা। তবে তিব্বতে দেবীর হাতে বজ্রও দেখা যায়। বজ্রহস্তা দেবীর নাম বজ্রসরস্বতী। দেবী শ্বেতবর্ণা ও ময়ূরবাহনা।[৭]

তিব্বতে বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের একজন তান্ত্রিক সরস্বতীও আছেন। তিনি লোহিতবর্ণা, ত্রিমুখী এবং ষড়্ভুজা।[৮]

অন্যান্য দেবী—বৌদ্ধদেবমণ্ডলে এ ছাড়া উষ্ণীষবিজয়া, প্রজ্ঞাপারমিতা প্রভৃতি আরও সব দেবীরা আছেন।

আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি সনাতনধর্মীয় দেবমণ্ডলে সাধারণতঃ দেবীদের যে-মর্যাদার স্থান বৌদ্ধ দেবমণ্ডলের দেবীদের সে রকম মর্যাদার স্থান নাই। বিশেষ করে এঁদের মধ্যে মাতৃরূপিণী কোনো দেবীর কদাচিৎ দেখা মিলে।

তবু একটা কথা এঁদের বিবরণ থেকেও বুঝতে অসুবিধা হয় না। জনসাধারণের মধ্যে

---

১ G. N. B., pp. 117-118 ২ Ibid, p. 117 ৩ Ibid, p. 118 ৪ Ibid, p. 119. ৫ Ibid, p. 116 ৬ Ibid, p. 118 ৭ Ibid ৮ Ibid

বিভিন্ন দেবীর পূজা প্রচলিত ছিল, সম্ভবতঃ ব্যাপকভাবেই ছিল। বৌদ্ধ আচার্যরা একদা বাধ্য হয়েই এঁদের নিজেদের ধর্মমতের মধ্যে স্থান করে দিয়েছিলেন।

আর বৌদ্ধরা যাই বলুন না কেন এই-সব গণারাধ্যা দেবীরাও শাক্তশাস্ত্রমতে শাক্তদের আরাধ্যা মা মহাদেবীরই রূপভেদমাত্র।

জৈন সাহিত্যাদিতে—সারা দেশে যা ছিল ব্যাপক জৈন আচার্যরাও তাকে সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে চলতে পারেন নি। বিভিন্ন দেবীর পূজা-আর্চা তাঁদেরও কতকটা স্বীকার করে নিতে হয়।

জৈনশাস্ত্রে আছে পৃথিবীর উপরে এবং নীচে বহু দেবদেবীর বাস। এঁদের পূজা-আর্চা করলে এঁদের বরে সাংসারিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে, বাসনা কামনা পূর্ণ হতে পারে। শ্বেতাম্বর দিগম্বর উভয় সম্প্রদায়েই কেবলমাত্র এইরূপেই শক্তি-উপাসনা স্বীকৃত।[১]

যক্ষিণী, যোগিনী, শাসনদেবী এবং অন্যান্য দেবীদের পূজা-আচার অনেক প্রকারভেদে জৈন সম্প্রদায়ে প্রচলিত। সাধারণতঃ কোনো মন্দির প্রতিষ্ঠা বা কোনো তপ-অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে এই-সব দেবীদের আবাহন ও পূজা করা হয়।[২]

শাসনদেবী—জৈনদের চব্বিশজন তীর্থংকরের প্রত্যেকের একজন করে শাসনদেবী আছেন। শ্বেতাম্বরমতে এঁরা—১। চক্রেশ্বরী ২। অজিতবলা ৩। দুরিতারী ৪। কালিকা ৫। মহাকালী ৬। শ্যামা ৭। শান্তা ৮। জ্বালা ৯। সুতারকা ১০। অশোকা ১১। শ্রীবৎসা ১২। চণ্ডা ১৩। বিজয়া ১৪। অঙ্কুশা ১৫। পন্নগা ১৬। নির্বাণী ১৭। বলা ১৮। ধারিণী ১৯। ধারণপ্রিয়া ২০। নরদত্তা ২১। গান্ধারী ২২। অম্বিকা ২৩। পদ্মাবতী এবং ২৪। সিদ্ধায়িকা।[৩]

লক্ষ্য করবার বিষয় সনাতনধর্মীয় দেবমণ্ডলের যে-সব দেবী অতি পরিচিতা তাঁদের অনেকের নাম এই তালিকায় পাওয়া যাচ্ছে। বৌদ্ধ দেবীদের সম্পর্কে যে-বক্তব্য করা হয়েছে এঁদের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। জনপ্রিয় দেবীদের জৈন আচার্যরাও কোনো না কোনোরূপে স্বীকৃতি না দিয়ে পারেন নি।

সরস্বতী—জৈনদের কাছেও বিশেষ গৌরবের স্থান দেবী সরস্বতীর। জৈনকাব্যেও সরস্বতীর সুন্দর বন্দনা পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ সিদ্ধসারস্বতাচার্য শ্রীবালচন্দ্র সূরির মহাকাব্য 'বসন্তবিলাস'-এর মঙ্গলাচরণ-শ্লোকে সরস্বতীবন্দনার উল্লেখ করা যায়।[৪]

তবে এ কথা ঠিক, সনাতনধর্মীয় শাস্ত্রে দেবীদের যে-মাহাত্ম্য ও গৌরব লক্ষ্য করা যায় জৈনমতে স্বীকৃত দেবীদের তা নেই।

---

১ জৈন ধর্ম মেঁ শক্তিপূজা—ক শ অ, পৃঃ ৫৩৩   ২ ঐ

৩ বৌদ্ধ ঔর জৈন ধর্ম মেঁ শক্তি-উপাসনা—ক শ অ, পৃঃ ৫১৯   ৪ ঐ

(৬) আর্যেতর লোকেদের মধ্যে

লক্ষ্য করা গেছে দেবীপূজা যেমন আর্যদের মধ্যে প্রচলিত ছিল তেমনি ছিল আর্যেতর লোকেদের মধ্যে। মহাদেবীর ভাবমূর্তিরচনায় আর্যেতর উপাদানও কম লাগে নি। এ কথার সমর্থন নানা ক্ষেত্রে পাওয়া যায়।

শবরাদিপূজিতা—হরিবংশে বলা হয়েছে দেবী শবর, বর্বর ও পুলিন্দদের দ্বারা পূজিতা হতেন। তিনি কিরাতী।

রঘুনন্দনের তিথিতত্ত্বে একটি ভবিষ্যোত্তরীয়বচন উদ্ধৃত করা হয়েছে। তাতে আছে এইভাবে দেবী নানা ম্লেচ্ছদের দ্বারা এবং সমস্ত দস্যুদের দ্বারা পূজিতা হতেন।[১]

এই-সব বচন পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় শবর, পুলিন্দ, ম্লেচ্ছ, দস্যু (পুলিন্দাদির মতো কৌম-বিশেষ) এদের নিজস্ব সব দেবী ছিলেন। পরে তাঁরা মহাদেবীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান।

পর্বতকান্তারবাসিনী—মহাভারতের অর্জুনস্তবে দেবীকে বলা হয়েছে কান্তার-বাসিনী। হরিবংশে খুব স্পষ্ট ভাষাতেই দেবীর বাসস্থান নির্দেশ করা হয়েছে ঘোর পর্বত-শিখরে, গুহায়, বনে। বিন্ধ্যপর্বতকে বলা হয়েছে দেবীর শাশ্বত স্থান।

দেবীপুরাণেও আছে তুঙ্গগিরিশৃঙ্গে এবং কন্দরে দেবী নিত্য বাস করেন।[২]

অনুমান করা যায় পাহাড়ে পর্বতে সাধারণতঃ বাস করত আর্যেতর নানা কৌম এবং জন। দেবী নানা নামে ও রূপে তাদের কাছে পূজা পেতেন। এইজন্যই, দেবীর বাস বনে পর্বতে নির্দেশ করা হয়েছে।

শবরী কিরাতী—সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে দেবীর শবরী ও কিরাতী বা কিরাতিনী নামের বহু প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। যেমন হরিবংশে দেবীকে কিরাতিনী বলা হয়েছে। মহাভারতে কিরাতবেশী শিব ও উমার বিবরণ আছে।[৩] বাক্‌পতিরাজের গৌড়বহকাব্যে দেবী বিন্ধ্যবাসিনীর স্তোত্রে তাঁকে বলা হয়েছে শবরী।[৪] বরাহপুরাণে তাঁকে কিরাতিনী বলা হয়েছে।[৫]

শারদাতিলকে দেবী কৈরাতীর ধ্যান দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে দেবী শ্যামা, তাঁর মাথায় ময়ূরপুচ্ছ, পরিধানে পর্ণাংশুক, আর গলায় গুঞ্জাফলের মালা। বাসুকী প্রমুখ

১ এবং নানাম্লেচ্ছগণৈঃ পূজ্যতে সর্বদস্যুভিঃ।—তিথিতত্ত্ব, দুর্গোৎসববিধি দ্রঃ।

২ শৈলশৃঙ্গেষু তুঙ্গেষু নিত্যং বস কন্দরবাসিনি।—দে পু, ১৭।২৩

৩ মহা ভা ৩।৩৯ (৫০) ৪ গৌড়বহ, শ্লোঃ ৩০৫ ৫ বরাহপুরাণ ২৮।৩৪

অষ্টনাগ তাঁর তাটঙ্ক, অঙ্গদ, মেখলা ও নূপুর হয়েছে। দেবীর হাতে বরাভয়মুদ্রা। দেবী ত্রিনেত্রা।[১]

কিরাতীর ঐতিহ্যটি অতি প্রাচীন। অথর্ববেদের একটি মন্ত্রে আছে—পর্বতগুলির সানুদেশে কুমারী কৈরাতিকা একা একা সোনার শাবল দিয়ে ঔষধ খুঁড়ছে।[২]

বৈদিক ঋষি এই যে কিরাত কন্যাটিকে পাহাড়ে পাহাড়ে ঔষধ খুঁজতে দেখেছেন এইটিই সম্ভবতঃ দেবী কিরাতীর আদিরূপ।

মনে হয় অথর্ববেদের 'কৈরাতিকা কুমারিকা'টিকেই শারদাতিলকের পূর্বোক্ত ধ্যানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

মানবকন্যা দেবী হয়ে গেছে অথবা মানবকন্যার মধ্যে দেবী রূপপরিগ্রহ করেছেন এমনি একটা ঐতিহ্য মঙ্গোলয়েড জনদের মধ্যে বহুকাল ধরে প্রচলিতও রয়েছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ তিব্বতের এক ঐতিহ্যের উল্লেখ করা যায়। স্রোঙ্-চন্-গম্পো (Srong-tsan-gampo) নামে তিব্বতের এক মহাধার্মিক রাজার দুই রাণী ছিলেন। একজনের নাম ওয়েন্ চেঙ্গ (Wen Cheng)। ইনি চীনের রাজকন্যা। অন্য রাণী নেপালের রাজকন্যা, নাম ব্রিব্সান (Bribsun)। তিব্বতীদের বিশ্বাস ওয়েন্ চেঙ্গ দেবী সিত-তারা এবং ব্রিব্সান দেবী শ্যামাতারা হয়ে যান।[৩]

কামাখ্যা—এখনও আসামের কিরাত-জনদের অনেক সাধারণ মানুষের বিশ্বাস দেবী কামাখ্যা তাদেরই মেয়ে।

কেউ কেউ মনে করেন দেবী কামাখ্যা গোড়ায় ছিলেন খাসিয়া, গারো প্রভৃতির মতো আর্যেতর মাতৃতন্ত্র কৌমের দেবী।[৪]

অহমদের দেবী— অহমদের দেবী খাঁ-খম্পা-ফা (Khan-khampa-pha) মা মহাদেবীর সঙ্গে মিশে যান আর জ-চিঙ্গ-ফা (Ja-ching-pha) দেবী সরস্বতীর সঙ্গে এক হয়ে গেছেন।[৫]

তাম্রেশ্বরী— আসামের একেবারে পূর্বপ্রান্তে সুবন্‌সিরি ও ডিহিং নদীর ধারে এক সময়ে (আনুমানিক খৃঃ ত্রয়োদশ শতকে) রাজত্ব করতেন চুটিয়ারা। তাঁরা ছিলেন দেবীর

১ শ্যামাং বর্হিকলাপশেখরযুতামাবদ্ধপর্ণাংশুকাং গুঞ্জাহারলসৎপয়োধরভরামষ্টাহিপান্ বিভ্রতীম্।
তাটঙ্কাঙ্গদমেখলাগুণরণন্মঞ্জীরতাং প্রাপ্তিতান্ কৈরাতীং বরদাভয়োদ্যতকরাং দেবীং ত্রিনেত্রাং ভজে।

শা তি, ১০।৭

২ কৈরাতিকা কুমারিকা সকা খনতি ভেষজম্। হিরণ্যয়ীভিরভ্রিভির্গিরীণামুপ সানুষু।

—অ বে ১০।৪।১৪

৩ G. N. B., pp. 105-106 ৪ M. G. K., p. 17 ৫ Kirāta-Jana-Kṛti, p. 57

উপাসক। অসমীয়া ভাষায় এঁদের দেবীকে বলা হয় কেচাইখাতী বা কাঁচামাংসখেকো। এঁর কাছে নরবলিও দেওয়া হত। এই দেবীকে পরে মা কালীর সঙ্গে এক করে দেওয়া হয়।[১]

চুটিয়াদের এই দেবীই তাম্রেশ্বরী। সদিয়াতে এঁর মন্দির ছিল।[২]

ডঃ কাকতি মনে করেন[৩] ইনিই কালিকাপুরাণোক্ত দেবী দিক্করবাসিনী। দিক্করবাসিনীর দুইরূপ। ইনি তীক্ষ্ণকান্তা এবং ললিতকান্তা। তীক্ষ্ণকান্তাই ভয়ংকরী। ইনি কৃষ্ণবর্ণা, ঘটোদরী, একজটা। এঁরই অন্য নাম উগ্রতারা। দেবীর সহচরী—ভগা, সুভগা, চামুণ্ডা, করালা, ভীষণা এবং বিকটা। উগ্রমদ্য, মাংস, মোদক, নারকেল এবং ইক্ষু দেবীর পূজায় লাগত। এঁর কাছে নরবলি হত।[৪]

ঠাকুরাণী মাঈ— ভুঁইয়ারা বিহার অঞ্চলের আদিবাসী। এদের আরাধ্যা দেবী ঠাকুরাণী মাঈ। ডালটন এঁকে বলেছেন 'রক্তপিপাসু দেবী'। এই দেবীকে এখন দুর্গা বা কালীর রূপভেদ মনে করা হয়।[৫]

দ্রাবিড়দের দেবী—আর্যেতর জনসমূহের বাস সারা ভারতে। এদের মধ্যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক্ দিয়ে নানা স্তরভেদ প্রাচীন কাল থেকেই লক্ষ্য করা যায়।

দক্ষিণভারতের আর্যেতর লোকেদের মধ্যে অগ্রণী দ্রাবিড়ভাষী জনগুলি। এদের মধ্যে কোনো কোনো জন প্রাচীন কাল থেকেই উচ্চ সভ্যতা ও সংস্কৃতির অধিকারী।[৬]

দ্রাবিড়দের ধর্মে পরম গৌরবের স্থান মাতৃরূপিণী দেবীর।[৭] দক্ষিণের সব স্তরের আর্যেতর লোকেদের মধ্যেই নানা দেবীর পূজা প্রচলিত। কোনো কোনো কৌমের লোকেরা ত শুধু দেবীরই পূজা করত। নিয়ড়িরা এমনি একটি কৌম।[৮]

সাধারণভাবে বলা হয় দ্রাবিড়দের দেবতারা প্রধানতঃ স্ত্রীদেবতা।[৯]

দ্রাবিড়দের দেবীদের সাধারণতঃ বলা হয় শক্তি। সম্ভবতঃ গোড়ায় এঁদের সঙ্গে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শক্তির কোনো সম্বন্ধ ছিল না। পরে এঁদের অধিকাংশকে শিবপত্নী পার্বতী দুর্গা বা কালীর রূপবিশেষ বলে গ্রহণ করা হয়।[১০]

দ্রাবিড়দের দেবীদের সম্পর্কে সাধারণভাবে বলা যায় এঁরা কলহপ্রিয়া, প্রতিহিংসাপরায়ণা, ঈর্ষাপরায়ণা এবং হিংস্র। যে কোনো ছলে এঁরা মানুষের অনিষ্ট করে বসেন।[১১]

১ Kirāta-Jana-Kṛti, p. 56 ; M. G. K., p. 66 ২ C. H. A., Vol. I, p. 149
৩ M. G. K., p. 64 ৪ দ্রঃ C. H. A., Vol. I., p. 149 ৫ E. R. E., Vol. II, p. 487
৬ D. E. I. C., pp. 46, 58 ৭ E. R. E. Vol. V, p. 6 ৮ R. I., p. 537
৯ D. G. M. H., p. 18 ১০ Ibid, p. ১১ Ibid, pp. 40, 146

এঁরা যাতে অনিষ্ট না করেন সেই জন্য লোকে ভয়ে ভয়ে এঁদের পূজা করে। এঁদের পূজার মূলপ্রেরণা ভয়, ভক্তি বা প্রীতি নয়। এই দেবীদের পূজা করলে কোনো রকম আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে এমন প্রত্যাশাও কেউ করে না। এঁদের পূজা করার প্রধান উদ্দেশ্য এঁদের ক্রোধের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া।[১]

এই-সব দেবীরা সবাই গ্রামদেবতা বা স্থানীয় দেবতা। যদি কোনো কারণে কোনো দেবীর বিশেষ খ্যাতি হত তা হলে তাঁর কৃপাপ্রার্থীদের ভিড় বাড়ত আর দেবীর বাড়ত ধন ও প্রতিপত্তি। তখন স্থানীয় কোনো রাজা বা জমিদার দেবীকে ভূমিদান করতেন। পুরনো দেবস্থানে নতুন মন্দির গড়ে উঠত আর দেবীকে সনাতনধর্মীয় দেবমণ্ডলে গ্রহণ করে নূতন মর্যাদা দেওয়া হত।[২]

মীনাক্ষী—এমন কি মাদুরার বিখ্যাত মন্দিরের শিব ও মীনাক্ষী সম্বন্ধেও এই ধরণের জনশ্রুতি আছে। মাদুরার মন্দির যেখানে, সেখানে আদিতে ছিলেন চোক্কলিঙ্গম নামে এক পুরুষ-দেবতা আর মীনাক্ষী নামক এক দেবী। দুজনেরই অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। তবে লোকে চোক্কলিঙ্গমের চেয়ে মীনাক্ষীকে বেশী ভয় ও সমীহ করত। ব্রাহ্মণরা পরে চোক্কলিঙ্গমকে শিব এবং মীনাক্ষীকে তাঁর পত্নী বলে সনাতনধর্মীয় দেবমণ্ডলে গ্রহণ করেন।[৩]

এমনিভাবে আর্যেতর দেবমণ্ডলের দেবীরা অনেকে আর্য দেবমণ্ডলে স্থান পেয়েছেন এবং মহাদেবীর রূপভেদ বলে স্বীকৃত হয়েছেন।

এই দেবীদের মধ্যে কেউ কেউ প্রাচীন আবার কেউ কেউ অর্বাচীন। সাধারণ মানুষের যুক্তিহীন বিশ্বাস এবং ভয়ের ক্ষেত্রে যখন এঁদের আবির্ভাব তখন সে-আবির্ভাব যে-কোনো সময়েই সম্ভবপর।

মারি-অম্মন্—যেমন, দেশে প্লেগ বা কলেরা বা বসন্ত দেখা দিল। বহু লোক মরতে লাগল। সাধারণ লোকে মনে করল দেবী মারি-অম্মন্ ক্রুদ্ধ হয়েছেন বলেই এই মড়ক লেগেছে। তারা মনে করে মারি-অম্মন্ মড়কের দেবী। তিনি ক্রুদ্ধ না হলে মড়ক হতে পারে না।

কত্তি অম্মন্—কত্তি অম্মন্ এই ধরণের আরেকজন দেবী। লোকের বিশ্বাস ইনি শ্মশান বা গোরস্থানের শক্তি। তাঁর আহার শব। এই শক্তি অতি ভয়ংকরী। এঁর ক্রোধে অগ্নিকাণ্ড ঘটে, শিশুমৃত্যু হয়। গোমড়কেও এঁর মহা-আনন্দ।[৪]

কনক-দুর্গা-অম্মন্—প্রাচীন দেবীদেরও অনেক ক্ষেত্রে প্রাচীন নাম বদলে গেছে, নূতন করে ব্রাহ্মণ্য নামে তাঁদের পরিচয় হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কনক-দুর্গা-অম্মনের কথা বলা যায়।

১ V. G. S. I., p 46 ২ E. R. E., Vol. 12, p. 91
৩ D. G. M. H., pp. 84-85 ৪ Ibid, p. 41

এঁর কোনো স্থায়ী মন্দির নাই বা কোনো মূর্তিও নাই। এঁর জন্য বিশেষ কোনো উৎসবও হয় না। ইনি বিশেষ করে গবাদি পশুর রক্ষাকারিণী দেবতা। যখন গো-মড়ক দেখা দেয় তখন এঁর পূজার ধুম পড়ে যায়।[১]

বোঝা যায় এই দেবীটি প্রাচীন এবং লৌকিক কিন্তু তাঁর নামটি লৌকিক নয়, ব্রাহ্মণ্য।

বেলারির দুর্গা-অম্মন্—স্থানীয় লৌকিক দেবীকে দেবী দুর্গা করে নেওয়া হয়েছে তার আরেকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। বেলারিতে দুর্গা-অম্মনের একটি স্থান আছে। গোড়ায় সেখানে ছিল কেবল একটি উইঢিবি। পরে পাথরের মন্দির করে দেওয়া হয়েছে। এক সময়ে ঐ উইঢিবিতে একটা প্রকাণ্ড সাপ থাকত। লোকেরা দেবীকে দুধ, ডিম প্রভৃতি অর্ঘ্য দিত আর সাপটি এসে সে-সব খেয়ে যেত।[২]

স্পষ্টই বোঝা যায় এই দেবী ছিলেন আদিতে স্থানীয় এবং আদিম মানুষের দেবী। কেন না, এই রকম সাপের বাসা উইঢিবি প্রভৃতিতে দেবতার পূজার প্রথা আদিম মানুষের মধ্যে দেখা যায়।

পরে এই দেবী হয়ে গেলেন দুর্গা-অম্মন্ অর্থাৎ মা দুর্গা। তখন থেকে ধুম করে তাঁর পূজা হয়। বছরে একবার দেবীর স্থানে মেলা বসে। তখন মোষ, মেষ, ছাগ ও মোরগ বলি দিয়ে দেবীর পূজা হয়।

এই দেবীর পূজারী অব্রাহ্মণ।[৩] দেবী যে গোড়ায় আর্যেতর লোকেদের দেবী ছিলেন এটি তার অকাট্য প্রমাণ। কারণ, দক্ষিণভারতে উত্তরভারত থেকে আগত ব্রাহ্মণ ছাড়া আর সবাইকে সাধারণতঃ আর্যেতর মনে করা হয়।

চণ্ডেশ্বরী—কুর্নুল জেলার নন্দযরম নামক স্থানের ভোগতজাতির আরাধ্যা দেবী চণ্ডেশ্বরী। এই দেবীর পূজারী ব্রাহ্মণ। দেবীর যা-পরিচয় পাওয়া যায় তাতে মনে হয় ইনিও গোড়ায় ছিলেন গ্রামদেবতা। কোনো কারণে ব্রাহ্মণেরা পরে এঁর পূজা করতে আরম্ভ করেন এবং তখন থেকে এঁর ব্রাহ্মণ্য নামও চালু হয়ে যায়।[৪]

কালী-অম্মন্—কালী-অম্মন্ বা মা কালীকেও নানা অঞ্চলে গ্রামদেবতা মনে করা হয়। কোনো কোনো অঞ্চলে লোকের বিশ্বাস ইনি প্রথমে গ্রামদেবতা ছিলেন না। মহিষাসুর বধ করার পর গ্রামদেবতাদের মধ্যে স্থান পান।[৫]

তাঞ্জোর অঞ্চলে কালীকে গ্রামের রক্ষাদেবী মনে করা হয়। গ্রামসীমানায় এঁর স্থান। ত্রিচিনপল্লী, কুড্ডালোর প্রভৃতি অঞ্চলের লোকের বিশ্বাস কালী-অম্মন্ গ্রামবাসীদের ভূতপ্রেত

১ D. G. M. H., p. 57 ২ V. G. S. I., pp. 74-75 ৩ Ibid, p. 75

৪ D. G. M. H., pp. 118-119 ৫ V. G. S. I., p. 24

এবং বন্য জন্তুদের কবল থেকে রক্ষা করেন। কোথাও কোথাও কালী-অম্মন্‌কে বিশেষ-ভাবে ব্যাধদের দেবী মনে করা হয়।[১]

ত্রিচিনপল্লী জেলার অনেক গ্রামে কালীকে বলা হয় মদুরৈ-কালী-অম্মন্‌। অনেক গ্রামে মোষ বলি দিয়ে দেবীর পূজা হয়। আবার কোনো কোনো গ্রামে দেবীর কাছে কোনো পশুবলিই হয় না। পশুবলি হয় কোথাও দেবীর সহচর মদুরৈ-বীরন্‌ বা করুপ্পনের কাছে, কোথাও বা পেরিঅম্না-স্বামীর কাছে।[২]

উজিনিহঙকালী—এই জেলার মহাকালীকুডি নামক গ্রামের প্রধান দেবী উজিনিহঙকালী বা মহাকালী। এই দেবীর চারজন সহচরী—এল্লি-অম্মন্‌, পুলথল-অম্মন্‌, বিশলক্ষী-অম্মন্‌ এবং অঙ্গল-অম্মন্‌। আর সহচর তিনজন—মদুরৈ-বীরন্‌, বতলম এবং অয্যনার। প্রথমে দেবীর পূজারীরা ছিলেন অব্রাহ্মণ। পরে ব্রাহ্মণরাও দেবীর পূজা করতে আরম্ভ করেন। এইজন্য, দেবীর মন্দিরে ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ দুরকম পূজারীই আছেন।[৩]

কোনো কোনো অঞ্চলে মহাকালীকে গ্রামদেবী মারি-অম্মনের এক রূপবিশেষ মনে করা হয়। অতি কোপনস্বভাব এই দেবীর। এঁর ক্রোধে কলেরা মহামারী আকারে দেখা দেয়। এঁকে বীরমহাকালী বা উগ্রমহাকালীও বলা হয়।[৪] লোকে কলেরার হাত থেকে বাঁচবার জন্য এঁর পূজা করে।

মনে পড়ে যায় বাংলা দেশের রক্ষাকালীর পূজার কথা। যখন কলেরা প্রভৃতি কোনো রোগ মহামারীর আকারে দেখা দেয় তখন গ্রামের লোকেরা রক্ষাকালীর পূজা করে। তা ছাড়া, অকল্যাণ পরিহার করার উদ্দেশ্যে এবং কল্যাণলাভের আশায় বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের সময়ও কোথাও কোথাও রক্ষাকালীর পূজা করা হয়।

তামিল দেশে কালী-অম্মনের কোনো উৎসব নাই। এর থেকে বোঝা যায় ওখানে কালীর বিশেষ গৌরবের স্থান নাই।[৫]

কালী কেরলে—অতি প্রাচীন কাল থেকে কেরলে কালীপূজা প্রচলিত। তখন খোলা জায়গায় গাছের তলায় থাকত দেবস্থান। এই দেবস্থানের নাম কাবু (**Kavu**)।[৬] কালী, অয্যপ্পন্‌ (Ayappan) এবং সর্পদেবতার স্থান কাবু। শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাদের কাবুতে রাখা হয় না।[৭]

এর থেকে বোঝা যায় কাবু আর্যেতর দেবতার স্থান এবং কালী আর্যেতর লোকেদের দেবী। এই সিদ্ধান্তের অন্য রকম সমর্থনও পাওয়া যায়।

১ V. G. S. I., p. 82 ২ Ibid, pp. 107-108 ৩ Ibid, pp. 104-105
৪ Ibid, p. 90. ৫ Ibid, p. 92 ৬ K. W. K., p. 7 ৭ Ibid, p. 8

আদিবাসীদের দেবী—কেরলের প্রচলিত ঐতিহ্য অনুসারে কেরলে প্রথমে কালীপূজা করত চেরুমিরা। চেরুমি বুলতে বুঝায় আদিবাসী মেয়ে। তারা কালীর পূজা করত পাথরে। এই পাথরে পূজা করা সম্বন্ধে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। একদিন কয়েকজন চেরুমি গিয়েছিল ধান কাটতে। ক্ষেতের ধারে অনেক পাথর পড়েছিল। একটি চেরুমি একখণ্ড পাথরের উপর কাস্তে ধার দিচ্ছিল। হঠাৎ সে দেখল পাথর থেকে রক্ত বেরুচ্ছে। ভয়ে সে চীৎকার করে উঠল। চীৎকার শুনে কাছাকাছি যারা ছিল সবাই ছুটে এল। প্রবীণরা বুঝল এই পাথরে কালী আছেন। তখন থেকে ঐ পাথরে কালীর পূজা হচ্ছে। অবশ্য, এ রকম কালীর পাথর কেরলের অনেক জায়গাতেই আছে।[১]

প্রথমে কালীপূজা চেরুমিদের মধ্যে প্রচলিত হলেও পরে উচ্চ শ্রেণীর লোকেরাও কালী-পূজা আরম্ভ করেন এবং প্রাচীন কালীস্থানগুলি দখল করে নেন। তবে তাঁরা অনেক ক্ষেত্রে দেবীর আদি-প্রস্তরপ্রতীকের কাছে মূর্তিপ্রতিষ্ঠা করেন এবং মন্দির নির্মাণ করেন। লোকে কিন্তু আদি-প্রস্তরপ্রতীককেই বিশেষ জাগ্রত বিগ্রহ মনে করে।[২]

এই প্রসঙ্গে স্মরণ হয় প্রাচীন শক্তি-পীঠগুলিতে এমনি স্বয়ম্ভূ প্রস্তরই দেবীর প্রতীকরূপে পূজিত হত।

আরেকটা কথা, এই যে কালী প্রথমে নিম্নশ্রেণীর কাছে এবং পরে ক্রমে উচ্চশ্রেণীর লোকের কাছে পূজা পেলেন তার অনুরূপ দৃষ্টান্ত বাংলা দেশেও পাওয়া যায়; কালী সম্পর্কে নয়, অন্য একাধিক দেবী সম্পর্কে। বাংলা চণ্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গল কাব্যে দেখা যায় মা চণ্ডী প্রথমে ব্যাধের ঘরে পূজা পান এবং মা মনসা জেলেদের ঘরে। পরে ক্রমে উচ্চ শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে তাঁদের পূজার প্রচার হয়।

কল্লম-কালী—প্রাচীন কেরলে কালী, কল্লম-কালী, করিম-কালী, কুরুম্বা (অন্ত্যজ 'তীয়ন্'দের দ্বারা পূজিতা) প্রভৃতি বিভিন্ন কালীর পূজা হত। সব কালীরই রং কাল। মালয়ালম ভাষায় কালল অর্থ ভয়ংকর। কেউ কেউ মনে করেন এই কালল শব্দের থেকে কালী শব্দের উদ্ভব হয়েছে। যিনি ভয়ংকরী তিনিই কালী।[৩]

চুটল ভদ্রকালী—কেরলের সাধারণ লোকে মনে করে শ্মশানে থাকেন ভদ্রকালী। তারা শ্মশানকে বলে চুটল। সেইজন্য, ভদ্রকালীকে বলে চুটল-ভদ্রকালী। তাদের বিশ্বাস গভীর রাতে চুটল-ভদ্রকালী সঙ্গিনীদের নিয়ে নেচে বেড়ান আর মড়ার হাড়গোড় চিবিয়ে খান।[৪]

পূর্বেই বলা হয়েছে প্রাচীন কেরলে কালীপূজা হত কাবু-তে। গোড়ায় কাবু ছিল

১ K. W. K., pp. 29-30. ২ Ibid.. ৩ Ibid, pp. 1-2 ৪ K. W. K., P. 71

আদিম লোকদের পূজার স্থান। পরে নায়াররা কাবুগুলি অধিকার করেন। নায়াররা কোনো কাজে ব্রতী হওয়ার আগে কালীর পূজা করে তাঁকে তুষ্ট করতেন।[১] রাজারাও তাই করতেন। এখনও কেরলের রাজপরিবারে কালীপূজা হয়।[২] কালীপূজা করার বিশেষ অধিকার নায়ারদের। পরে ব্রাহ্মণরাও কালীপূজা সুরু করেন এবং কোনো কোনো কাবু দখল করে নেন।[৩] তবে ব্রাহ্মণের পূজায় পশুবলি হয় না।[৪]

নায়াররাই কিন্তু সাধারণতঃ কালীর পূজারী হয়ে থাকেন। কালীমন্দিরের দৈনন্দিন পূজা তাঁরাই করেন। অবশ্য কোনো কোনো মন্দিরে ব্রাহ্মণরাও করেন। আর যেখানে অন্য সময়ে নায়ার পূজা করেন সেখানেও বৎসরে অন্ততঃ একচল্লিশ দিন ব্রাহ্মণকে পূজা করতে হয়।[৫]

এখানে উল্লেখ করা যায় দক্ষিণভারতের নায়ারদের মর্যাদা উত্তর ভারতের ক্ষত্রিয়দের তুল্য।

পূরম্—কেরলে যে কালীর বিশেষ গৌরবের স্থান আছে তার অন্যতম প্রমাণ 'পূরম্' উৎসব। এটি কালীপূজার উৎসব। অনেক দিন ধরে এই উৎসবটি চলে। এই সময়ে খুব ঘটা করে কালীপূজা হয়।

'পূরম্' উৎসবের সময় পূজার স্থানটি লাল কাপড় ইত্যাদি দিয়ে সাজান হয়; চালের গুড়ি দিয়ে পূজাস্থানে আলপনা দেওয়া হয়।[৬] সারারাত ধরে দারুক-অসুর-বধের অভিনয় চলে।[৭]

উৎসবের শেষ দিনে মেয়েরা তামার সরায় চাল ভর্তি করে তার উপর প্রদীপ সাজায়। সন্ধ্যার আগে তারা এই সব সরা নিয়ে দল বেঁধে কাবু প্রদক্ষিণ করে। সন্ধ্যায় কাবুতে আলোকসজ্জা করে।[৮] এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় মালয়ালম ভাষায় কালীবিষয়ক বহু গান প্রচলিত আছে।[৯]

'পূরম্' উৎসব উপলক্ষ্যে দেবীকে খুশী করবার জন্য একদিন অশ্লীল গান করা হয়।[১০]

শাবরোৎসব—এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় দেবীপূজা উপলক্ষ্যে অশ্লীল গান প্রভৃতির বিধান ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রেও আছে। ব্যাপারটি শাবরোৎসব নামে পরিচিত। শূলপাণির দুর্গোৎসববিবেকে দেখা যায় দুর্গাপূজার সময় দশমীতে এই উৎসবের অনুষ্ঠান করতে হয়। জীমূতবাহনের কালবিবেকে এবং রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতিতত্ত্বেও শাবরোৎসবের বিধান

১ K. W. K., pp. 33-35 ২ Ibid, pp. 1-4 ৩ Ibid, p. 26 ৪ Ibid
৫ Ibid ৬ Ibid, pp. 58-59 ৭ Ibid, p. 61 ৮ Ibid, p. 68
৯ দ্রঃ Ibid, Part I, Ch. 17 ১০ Ibid, p. 89

আছে। পুরশ্চর্যার্ণবে[১] শক্তিসঙ্গমতন্ত্র থেকে শাবরোৎসবের বিবরণ উদ্ধৃত করা হয়েছে। এই বিবরণে অশ্লীলভাষণাদির একটা ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছে। কালিকাপুরাণেও শাবরোৎসবের বর্ণনা আছে।[২]

নামের থেকেই অনুমান করা যায় শাবরোৎসব শবরদের উৎসব। শবররা তাদের আরাধ্যা দেবীর পূজার সময় হয়ত পূজার অঙ্গহিসাবেই এই উৎসবের অনুষ্ঠান করত। তারপর কোনো এক সময়ে শবরারাধ্যা দেবীর সঙ্গে তাঁর পূজার এই অনুষ্ঠানটিকেও সনাতন-ধর্মের মধ্যে গ্রহণ করা হয়।

দক্ষিণভারতের আর্যেতর লোকেদের পূজিতা দেবীদের পরবর্তী কালে ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবের জন্য মা মহাদেবী বা শিবশক্তি দুর্গার রূপভেদ বলে মেনে নেওয়া হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা অনেকে ব্রাহ্মণ্য নামেও পরিচিতা হয়েছেন। কিন্তু অনেকেরই দ্রাবিড় নাম বদলায় নি এবং তাঁদের পূজা-আর্চাও হয় প্রাচীন প্রথায়।

কোট্টবৈ (কোর্‌রবৈ)—প্রাচীন তামিলদের প্রধান আরাধ্যা দেবী ছিলেন কোট্টবৈ (কোর্‌রবৈ)। কোট্টবৈ (কোর্‌রবৈ) অর্থ বিজয়িনী। এলিয়ট লিখেছেন[৩] 'পুর্‌র-পরুল বেণবা-মালৈ (Purra-porul Venba-Malai) নামক প্রাচীন তামিল কবিতায় এই দেবী এবং তাঁর পুত্র মুরুগনকে (কোর্‌রবন্) তামিলদের প্রধান আরাধ্য দেবতা বলা হয়েছে।

এল্লাম্মন্— এল্লাম্মন্ তামিলদের পূজিতা আরেকজন দেবী। এল্লাম্মন্ অর্থ সর্বজননী। এঁর পূজায় চড়ক-অনুষ্ঠান হয়।[৪]

সাত বোন মারি—মহীশূরে সাত বোন মারির পূজা হয়। কন্নড় ভাষায় মারি অর্থ শক্তি। মারিদের শিবপত্নী মনে করা হয়। এঁরা গ্রামদেবতা। মহীশূর অঞ্চলে এঁদের করুণাময়ী বলে খ্যাতি আছে। সব রকমের আপদ্‌বিপদ্ থেকে এঁরা গ্রামকে রক্ষা করেন।[৫]

তাঞ্জোর জেলাতেও দেখা যায় গ্রামদেবতাদের মধ্যে প্রধান স্থান সাত বোন শক্তির। এখানেও এঁদের শিবপত্নী মনে করা হয়।[৬]

শুধু মহীশূর বা তাঞ্জোরে নয় দক্ষিণভারতের সর্বত্রই এই সাত বোন দেবীর বিশেষ প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য করা যায়। এঁদের একটি ভাইও আছেন। তাঁর নাম পটু রাজু। ভাইটির নাম সব জায়গাতেই এক। কিন্তু বোনদের নাম স্থানভেদে ভিন্ন হয়ে যায়।[৭]

---

১ পু চ, তঃ ১১, পৃঃ ১১২১-১১২২ ২ কা পু, ৬১।১৭-২২ ৩ H. B., Vol. II, p. 218

৪ E. R. E., Vol. VI, p. 706 ৫ V. G. S. I., pp. 29, 32 ৬ Ibid, p. 124

৭ D. G. M. H., p. 19

নেল্লোর জেলায় সাত বোনের প্রচলিত নাম পলেরম্ম, অঙ্কম্ম, মুথ্যালম্ম, দিজি পোলালি, বঙ্করম্ম, মথম্ম এবং রেণুকা।[১]

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায় বিহার এবং উত্তর প্রদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে সাত বহিন কালীর পূজা হয়।

কাজেই অনুমান করা যায় এক সময়ে ভারতের উত্তর দক্ষিণ উভয় অংশেই সাধারণ লোকেদের মধ্যে সাত বোন দেবীদের পূজার প্রচলন ছিল।

লক্ষ্য করা গেছে খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীর প্রত্নলিপিতে সপ্তমাতৃকার মন্দিরপ্রতিষ্ঠার উল্লেখ আছে। কাজেই পঞ্চম শতাব্দীতে অভিজাতদের মধ্যেও সপ্তমাতৃকার পূজা যে প্রচলিত ছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

মনে হয় এই সাত বোন দেবী আর সপ্তমাতৃকা অভিন্ন। অন্য ক্ষেত্রে যেমন হয়েছে এ ক্ষেত্রেও তেমনি লোকায়ত দেবীরা ক্রমে শাস্ত্রীয় মর্যাদা লাভ করেছেন। তখন তাঁদের ধ্যান-ধারণাও বদলে গেছে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে বিপরীত ঘটনা ঘটাও সম্ভব। সপ্তমাতৃকাই সাধারণ লোকের কাছে সাত বোন দেবী হয়ে যেতে পারেন। উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না।

মাতৃদেবতা—দ্রাবিড়দের দেবীদের একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। এঁদের বেশীর ভাগেরই নামের সঙ্গে মাতৃবাচক অম্মন্ বা অম্ম শব্দ যুক্ত রয়েছে। এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় এঁদের রূপ এবং ক্রিয়াকলাপ যাই হোক না কেন এঁরা আসলে মাতৃদেবতা। কাজেই, এঁদের মা মহাদেবীর রূপভেদ বলে গ্রহণ করা কঠিন হয় নি।

এই দেবীদের পূজা সম্পর্কেও দুটি বিশেষত্ব চোখে পড়ে। এক—এঁদের পূজারীরা সাধারণতঃ অব্রাহ্মণ ; দুই—পশুবলি পূজার অপরিহার্য অঙ্গ।[২]

পশুবলি : মহিষবলি—মেষ, মোষ, ছাগ, মোরগ প্রভৃতি দেবীদের কাছে বলি দেওয়া হত। তবে সব চেয়ে গৌরব মহিষবলির। বলির যে-বিবরণ পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় বলি দেবার আগে মহিষকে মালা পরিয়ে দেওয়া হত, তাকে পূজা করা হত। বলির সময় খুব জোরে ঢাকঢোল বাজান হত। কয়েকজন লোক মোষটাকে মাটিতে পেড়ে ফেলে চেপে ধরত। বলি দিত অন্ত্যজশ্রেণীর কোনো লোক। পূজারী খড়্গের পূজা করে তা বলিদান-কারীর হাতে দিতেন। সেও আবার খড়্গের পূজা করত এবং মাটিতে লুটিয়ে তাকে প্রণাম করত। তারপর এক কোপে মহিষের মুণ্ডচ্ছেদ করত। এবার কাটা মুণ্ডটিকে অর্ঘ্যরূপে দেবীর সামনে রাখা হত। আর মোষের দুখানা পা হাটু পর্যন্ত কেটে নিয়ে আড়াআড়ি করে মুণ্ডটির মুখের কাছে রাখা হত এবং মুণ্ডটির উপর একটি প্রদীপ জালিয়ে দেওয়া হত।[৩]

১ D. G. M. H., p. 19 ২ V. G. S. I., p. 18 ৩ D. G. M. H., pp. 28, 128

বাংলাদেশেও শাস্ত্রীয় দুর্গাপূজা বা কালীপূজায় প্রায় এমনিভাবেই মহিষবলি দিতে আমরা দেখেছি। তবে এখানে অন্ত্যজশ্রেণীর লোকেরা বলি দিত না বা কাটামুণ্ডের কাছে মোষের কাটা পা-ও রাখতে দেখিনি। অন্য সব অনুষ্ঠান একই রকম।

দেখা যাচ্ছে দক্ষিণ ভারতে আর্যেতর লোকদের পূজিতা দেবীদের পূজায় যেমন করে মোষবলি দেওয়া হয় উত্তরপূর্ব-ভারতে ব্রাহ্মণ্য দেবীদের পূজাতেও তেমনি করেই হত। এর থেকে বোঝা যায় দেবীপূজায় অনুষ্ঠানেও আর্য ও আর্যেতর উপাদানের সংমিশ্রণ হয়েছে।

সব দেবীই মহাদেবীর রূপভেদ—বৈদিক সাহিত্যে, বেদপরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যাদিতে, ভারতের ও বৃহত্তর-ভারতের ঐতিহাসিক নিদর্শনে এবং আর্যেতর লোকেদের মধ্যে বিভিন্ন দেবীর সন্ধান পাওয়া গেল। এঁরা সবাই মিলে শাক্তদের আরাধ্যা মা মহাদেবীর ভাবরূপ রচনা করেছেন।

এ বিষয়ে শাস্ত্রের সমর্থনও আছে। স্কন্দপুরাণে দেখা যায় মহাদেবী বলছেন— সমস্ত দেবীই আমার রূপ বলে জানবে, এর কোনো অন্যথা নাই।[১]

নারদ পঞ্চরাত্রে বলা হয়েছে—সেই দুর্গতিনাশিনী দুর্গা সর্বশক্তিস্বরূপা, পরমাত্মা কৃষ্ণের তিনি পরমা বুদ্ধিস্বরূপিণী, স্বর্গে দেবরাজের নিকেতনে তিনি সম্পদ্‌রূপা, তিনি স্বর্গলক্ষ্মীস্বরূপিণী। মর্ত্যে রাজগৃহে তিনি রাজলক্ষ্মী, প্রতিগৃহে তিনি গৃহলক্ষ্মী আর সর্বত্র গ্রামে গ্রামে পৃথক্ পৃথক্ গ্রামদেবতা।[২]

১ দেবাঃ সর্বাশ্চ মদ্রূপাঃ নৈতজ্জ্ঞেয়মতোঽন্যথা।

—স্কন্দপুরাণ, মাহেশ্বরখণ্ডান্তর্গত কুমারিকা খণ্ড, অধ্যায় ৬৮, শ্লোক ১২৭

২ সর্বশক্তিস্বরূপা সা দুর্গা দুর্গতিনাশিনী। বুদ্ধিস্বরূপা পরমা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
সম্পদ্রূপেন্দ্রগেহে সা স্বর্গলক্ষ্মীস্বরূপিণী। মর্ত্যে লক্ষ্মী রাজগেহে গৃহলক্ষ্মীর্গেহে গেহে।
পৃথক্ পৃথক্ চ সর্বত্র গ্রামেষু গ্রামদেবতা।—নারদপঞ্চরাত্র, ২।৩।২০-২২

ষষ্ঠ অধ্যায়

দেবীপূজার ব্যাপকতা

দেখা গেল অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে এবং ভারতের বাইরেও নানা স্থানে বিভিন্ন দেবীর পূজা প্রচলিত ছিল। আর তত্ত্বদৃষ্টিতে এই-সব দেবী যে একই মহাদেবীর রূপভেদ-মাত্র তাও লক্ষ্য করা গেল।

দেবীস্থান ও শাক্তভীর্থ—সারা ভারতে ছড়িয়ে আছে দেবীস্থান ও শাক্ততীর্থ। শাক্ততীর্থমাত্রই অবশ্য দেবীস্থান কিন্তু এমন অনেক দেবীস্থান আছে যেগুলি তীর্থ বলে সাধারণতঃ গণ্য হয় না। কিন্তু সব দেবীস্থান এবং শাক্ততীর্থই দেবীপূজার ব্যাপকতার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

মহাভারতে—মহাভারতের বনপর্বে[১] দেখা যায় মহর্ষি পুলস্ত্য ভীষ্মকে বহু তীর্থের বিবরণ শুনিয়েছেন। এই-সব তীর্থের মধ্যে শাক্ততীর্থ বা দেবীতীর্থও আছে।

ভীমাস্থান—ভীমাস্থানকে একটি তীর্থ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে ভীমা-দেবীর উত্তম স্থানে তীর্থসেবীর যাওয়া উচিত। সেখানে যোনিকুণ্ডে স্নান করলে মানুষ স্বর্ণকুণ্ডলধারী দেবীপুত্র হবে এবং শতসহস্রগোদানের ফল লাভ করবে।[২] এই ভীমাস্থানই হিউয়েন সাঙ বর্ণিত প্রাচীন গান্ধারের ভীমাস্থান মনে হয়।

শঙ্খিনীতীর্থ—শঙ্খিনীতীর্থ একটি দেবীতীর্থ। বলা হয়েছে তীর্থসেবী শঙ্খিনীতীর্থে গিয়ে স্নান করলে উত্তম রূপ লাভ করবে।[৩]

মাতৃতীর্থ—মাতৃতীর্থ বলে একটি তীর্থের উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে এখানে গিয়ে স্নান করলে প্রজাবৃদ্ধি হয় আর বিপুল শ্রীলাভ হয়।[৪]

মধুবটী—মধুবটী নামে একটি দেবীতীর্থের বিষয়ে বলা হয়েছে সেখানে গিয়ে তীর্থজলে স্নান করে পবিত্র হয়ে দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ করলে দেবীর আজ্ঞায় সহস্রগোদানের ফললাভ হয়।[৫]

১ মহাভারতের সময় সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা একমত নন। তবে তার মূলরূপটি খৃঃ চতুর্থ শতকের পূর্বেই রচিত হয়েছে বলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও মনে করেন। আমাদের আলোচ্য বনপর্বের তীর্থযাত্রা-অংশও ঐ সময়ে রচিত হয়েছে মনে করা যায়। দ্রঃ Śk. P., p. 8

২ মহা ভা, (ভাণ্ডারকর প্রাচ্য-গবেষণা-প্রতিষ্ঠান সং) ৩।৮০।১০০-১০১

৩ ঐ, ৩।৮১।৪১ ৪ ঐ, ৩।৮১।৪৭ ৫ ঐ, ৩।৮১।৭৯

শাকম্ভরীস্থান—শাকম্ভরীস্থানের বর্ণনা করতে গিয়ে দেবীর নাম কি করে শাকম্ভরী হল তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। দেবী সহস্র দিব্য বৎসর ধরে মাসে মাত্র একবার করে শাক আহার করে অবস্থান করেন এবং দেবীস্থানে অভ্যাগত তপোধন ঋষিদের শুধু শাকের দ্বারাই অতিথিসৎকার করেন। এইজন্যই দেবীর নাম হয়েছে শাকম্ভরী। শাকম্ভরীস্থানে তীর্থসেবীকে তিন রাত্রি ব্রহ্মচর্য পালন করে বাস করতে হয় ও শুধু শাক আহার করতে হয়। এতে দেবীর আজ্ঞায় তার বার বৎসর কেবলমাত্র শাকাহার করে তপস্যার ফললাভ হয়।[১]

দুর্গাসপ্তশতীর টীকা গুপ্তবতী অনুসারে কৃষ্ণাবেণী ও তুঙ্গভদ্রা এই দুই নদীর মধ্যভাগে সহ্যাদ্রির কিঞ্চিৎ পূর্বে শতাক্ষী, শাকম্ভরী প্রভৃতি দেবীর স্থান প্রসিদ্ধ।[২]

ধূমাবতীস্থান—ধূম্রাবতীস্থান আরেকটি দেবীতীর্থ। সেখানে গিয়ে তিন রাত্রি উপোস করে থাকলে সমস্ত মনস্কামনা পূর্ণ হয়।[৩] ধূম্রাবতী দশমহাবিদ্যার অন্যতমা বিদ্যা। এঁর পূজাদিও সচরাচর হয় না। মহাভারতে এই দেবীস্থানের উল্লেখ তাৎপর্যপূর্ণ। মহাভারতের এই অংশ প্রক্ষিপ্ত বলে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত এ কথা বলা যায় যে ধূমাবতী একজন প্রাচীন দেবী। তাঁর পূজা খৃঃ চতুর্থ শতকের পূর্ব থেকে প্রচলিত। অবশ্য এই ধূমাবতী আর বিদ্যা ধূমাবতী এক কিনা নিশ্চয় করে বলা যায় না। কেন না, মহাভারতে ধূমাবতীর কোনো পরিচয় দেওয়া হয়নি।

উজ্জ্বৎ-পর্বত—উজ্জ্বৎ-পর্বত দেবী সাবিত্রীর স্থান। এই স্থানে আছে সাবিত্রীর পদচিহ্ন। ব্রাহ্মণ যদি এখানে যথাশাস্ত্র দৃঢ়নিয়মপরায়ণ হয়ে একবার সন্ধ্যা-আহ্নিক করেন তা হলে তাঁর বার বছর সন্ধ্যা-আহ্নিক করা হয়ে যায়। এখানেই বিখ্যাত যোনিদ্বারতীর্থ অবস্থিত। সেই যোনিদ্বারে গেলে মানুষের আর জন্ম হয় না।[৪]

ভরতাশ্রম— ভরতাশ্রম (পাঠান্তর কুশিকাশ্রম) একটি দেবীতীর্থ। সেখানে গিয়ে মহাপাতকনাশিনী দেবী কৌশিকীর সেবা করলে লোকে রাজসূয়-যজ্ঞের ফল পায়।[৫]

গৌরীশিখর—মহাদেবী গৌরীর শিখরকে ত্রিলোকবিশ্রুত তীর্থ বলা হয়েছে। সেখানে স্তনকুণ্ডে স্নান করে পিতৃগণের ও দেবগণের অর্চনা করার ফলে মানুষ অশ্বমেধের ফল পায় এবং দেহান্তে ইন্দ্রলোকে যায়।[৬] পীঠনির্ণয়ে কামরূপের এক গৌরীশিখরের কথা আছে।[৭] এটি সম্ভবতঃ সেই গৌরীশিখর।

কন্যাতীর্থ—সমুদ্রতীরে কন্যাতীর্থ। কন্যাতীর্থে গিয়ে সেখানকার তীর্থসলিল স্পর্শ করলেই মানুষ সর্বপাপমুক্ত হয়।[৮] স্পষ্টই বোঝা যায় এই তীর্থ কন্যাকুমারী।

১ মহা ভা (ভাণ্ডারকর প্রাচ্য-গবেষণা-প্রতিষ্ঠান সং) ৩।৮২।১১-১৪ ২ দু স, ১১।৪৩, গুপ্তবতী
৩ মহা ভা (ভাণ্ডারকর প্রাচ্য-গবেষণা-প্রতিষ্ঠান সং) ৩।৮২।২০ ৪ ঐ, ৩।৮২।৮১-৮৩
৫ ঐ, ৩।৮২।১১৩ ৬ ঐ, ৩।৮২।১৩১-৩২ ৭ দ্রঃ SK. P., p. 49
৮ মহা ভা (ভাণ্ডারকর প্রাচ্য-গবেষণা-প্রতিষ্ঠান সং) ৩।৮৩।২১

শৈবতীর্থে দেবী—মহাভারতবিবৃত এই তালিকায় অনেক শৈবতীর্থের উল্লেখ আছে। কিন্তু দুয়েকটি[১] তীর্থ ছাড়া অন্যগুলিতে দেবীসহ মহাদেবের উল্লেখ নাই। এটি লক্ষ্য করার মতো। কেন না পরবর্তীকালে দেখা যায় সাধারণতঃ শৈবতীর্থ মাত্রেই দেবী আছেন আর শাক্ততীর্থমাত্রেই শিব আছেন।

শাক্তপীঠ ও দেবীর অঙ্গ—দেখা যাচ্ছে ভীমাস্থান, উজ্জৎ-পর্বতের সাবিত্রীস্থান এবং গৌরীশিখর এই তিনটি দেবীতীর্থের সঙ্গে দেবীর অঙ্গবিশেষের যোগ রয়েছে। তীর্থের সঙ্গে দেবীর অঙ্গবিশেষ যুক্ত থাকার এই ধারণাটির ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায় শাক্তপীঠের ক্ষেত্রে। সাধারণভাবে বলা যায় শাক্তপীঠমাত্রেই দেবীর কোনো না কোনো অঙ্গ আছে মনে করা হয়।

পীঠ শব্দের ব্যাখ্যা—পীঠ অর্থ আসন।[২] যে স্থানে দেবীর আসন রয়েছে তাই পীঠ। অথবা ব্যাপারটির অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। কোনো দেবীস্থানে কোনো সাধক সাধন-আসন রচনা করলেন এবং সেই আসনে সিদ্ধিলাভ করলেন। তখন লোকে সেই দেবীস্থানকে সেই সিদ্ধপুরুষের আসনস্থান বা পীঠস্থান বলতে লাগল। পরে ক্রমে সিদ্ধপুরুষের পীঠস্থানের পরিবর্তে শুধু সিদ্ধপীঠ কথাটা চালু হয়ে গেল। সিদ্ধপীঠের সংখ্যাও নিতান্ত নগণ্য নয়। যে-সব দেবীস্থানে কোনো সাধকের সিদ্ধিলাভের কথা লোকের জানা নেই, অনুমান করা যায় সেইগুলিকে তারা সিদ্ধপীঠ না বলে শুধু পীঠ বলতে থাকে। তারা ভাবতে পারে যে-দেবীস্থানে সিদ্ধিলাভ হয়েছে তা যখন সিদ্ধপীঠ তখন যে-দেবীস্থানে সিদ্ধি-লাভ হয়নি তবে সাধক সাধন-আসন রচনা করে সাধনা করেছেন তা শুধু পীঠ। প্রাচীন দেবীস্থানের পীঠ নাম এইভাবে চালু হতে পারে।

পূর্বেই বলা হয়েছে শাক্তপীঠমাত্রেই দেবীর কোনো অঙ্গ আছে সাধাণতঃ এই ধারণা প্রচলিত। তবে কোনো সাধকের সিদ্ধিলাভের স্থান হলে সেখানে দেবীর অঙ্গ না থাকলেও সেই দেবীস্থান পীঠ বলে গণ্য হয়ে থাকে। সর্বানন্দতরঙ্গিণীতে ত্রিপুরা জেলার মেহারকে পীঠস্থান বলা হয়েছে। কারণ এখানে সাধক সর্বানন্দ সিদ্ধিলাভ করেন।[৩] মেহারে দেবীর কোনো অঙ্গ নেই।

দেবীভাগবতে[৪] একশ আটটি পীঠের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে অনেকগুলির সঙ্গে দেবীর কোনো অঙ্গের যোগ বর্ণিত হয়নি।

পীঠোৎপত্তির পৌরাণিক কাহিনী—কিভাবে শাক্তপীঠগুলির উদ্ভব হল কালিকা-পুরাণ[৫] দেবীভাগবত[৬] প্রভৃতিতে তার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এই কাহিনী অনুসারে

১ দ্রঃ মহা ভা, ৩।৮৪।১৩৪-৩৬ ; ৩।৮৫।১৯-২০ ২ পীঠমাসনমিতি পীঠঃ।—দ্রঃ শব্দকল্পদ্রুমঃ।
৩ ŚK. P., p. 8. note 1. ৪ দে ভা, ৭।৩০ ৫ কা পু, অঃ ১৮ ৬ দে ভা, ৭।৩০

দেখা যায় দক্ষযজ্ঞে সতীর প্রাণত্যাগের পর সতীদেহ কাঁধে (মতান্তরে মাথায়) নিয়ে শিব উন্মাদের মতো পৃথিবীময় নৃত্য করে বেড়াতে লাগলেন। এতে সৃষ্টি রসাতলে যাবার উপক্রম হল। তখন দেবতারা এই অবস্থার প্রতিকারের ব্যবস্থা করলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শনি সতীদেহে প্রবেশ করে তাকে টুকরো টুকরো করে কাটতে লাগলেন। সেই সব টুকরো ছিটকে পড়তে লাগল। যেখানে যেখানে এমনি টুকরো পড়ল তাই হল পীঠ। পীঠস্থলে দেবী ভৈরবসহ নিত্য বিরাজ করেন। এই কাহিনীর শেষ দিক্‌টার একটু রূপান্তরও আছে। তাতে আছে বিষ্ণু বাণ মেরে মেরে বা সুদর্শন চক্র দিয়ে আঘাত করে করে সতীদেহ কেটে খান খান করেন।[১]

দক্ষযজ্ঞের কাহিনী—দক্ষযজ্ঞ-নাশের কাহিনীটি প্রাচীন।[২] চতুর্থ খৃঃ শতকে গুপ্তদের অভ্যুত্থানের পূর্বেই কাহিনীটি চালু হয়ে যায়।[৩] যতটা জানা যায় দক্ষযজ্ঞের কাহিনীটি প্রথম বর্ণিত হয় মহাভারতে।[৪] এই কাহিনী সংক্ষিপ্ত এবং এতে শিবপত্নী উমা দক্ষকন্যা নন এবং তিনি দক্ষযজ্ঞে প্রাণত্যাগও করেন নি।

ব্রহ্মপুরাণেও[৫] কাহিনীটি এই আকারেই পাওয়া যায়। মৎস্যপুরাণ,[৬] পদ্মপুরাণ,[৭] কূর্মপুরাণ,[৮] স্কন্দপুরাণ,[৯] ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ[১০] প্রভৃতিতে কাহিনীটির ঈষৎ রূপান্তর ঘটে। এবার দেখা যায় শিবপত্নী দক্ষকন্যা হয়েছেন এবং দক্ষযজ্ঞে তিনি প্রাণত্যাগও করেন। কিন্তু তাঁর দেহ খণ্ড খণ্ড করার কথা এ-সব পুরাণেও নেই।

কাহিনীটির আবার রূপান্তর ঘটল দেবী ভাগবত, কালিকাপুরাণ প্রভৃতি পুরাণে। এটি হয়েছে সম্ভবতঃ মধ্যযুগের প্রথম দিকে।[১১] কালিকাপুরাণকে একাদশ শতকের পূর্ববর্তী মনে করা হয়। কাজেই খণ্ডিত সতীদেহ থেকে পীঠোৎপত্তির কাহিনী এই সময়কার।

পীঠোৎপত্তির কাহিনীর তাৎপর্য—দেশের নানা স্থানে ছিল নানা দেবীর স্থান।

১ Śk. P., pp. 6-7

২ কেউ কেউ মনে করেন দক্ষযজ্ঞের এই কাহিনীর মূলে ঋগ্বেদে (১০।৬১।৫-৭) সূচিত এবং শতপথ-ব্রাহ্মণ (মাধ্যন্দিন, ১।৭।৪।১-৮), ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ (৩।৩।৯-১০), তাণ্ড্য-মহাব্রাহ্মণ (৮।২।১০) প্রভৃতিতে বর্ণিত প্রজাপতির কন্যাগমনের কাহিনী আর গোপথ-ব্রাহ্মণে (২।১।২-৪) বর্ণিত রুদ্রকে যজ্ঞভাগ দিতে প্রজাপতির অস্বীকৃতির কাহিনী একীভূত হয়েছে। (দ্রঃ Śk. P., p. 5)

৩ Śk. P., p. 5 ৪ মহা ভা, ১২।২৮২-২৮৩ ৫ ব্রহ্মপুরাণ, অঃ ৩৯ ৬ মৎস্যপুরাণ, অঃ ১৩

৭ পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড, অঃ ৫ (দ্রঃ Śk. P., p. 5) ৮ কূর্মপুরাণ, পূর্বভাগ, অঃ ১৫

৯ স্কন্দপুরাণ, মাহেশ্বরখণ্ডান্তর্গত কেদারখণ্ড, অঃ ১-৪

১০ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, অঃ ৩১ (দ্রঃ Śk. P., p. 5) ১১ Śk. P., p. 6

মনে হয় তারই কতকগুলির সঙ্গে দেবীদেহের খণ্ডিত অংশের যোগ কল্পনা করা হয়। পূর্বোক্ত কাহিনী তারই পরিচায়ক। যে ভাব-চিন্তা শক্তি-আরাধনাকে অদ্বৈততত্ত্বের দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে কাহিনীটির মধ্যে তারই এক লোকায়ত্ত প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। তত্ত্বতঃ সকল দেবীই যেমন একই ব্রহ্মময়ী মহাদেবীর রূপভেদ তেমনি সকল দেবীস্থান একই দেবীর স্থান।

পীঠের নাম ও সংখ্যা—প্রত্যেক পীঠের দেবীর নাম পৃথক্। তা ছাড়া, পীঠের তালিকা এবং সেই তালিকাভুক্ত পীঠের সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন রকমে দেওয়া হয়েছে। এই-সব তালিকার পরস্পরের মধ্যে মিল যেমন আছে তেমনি অমিলও কম নেই।

লেখকরা অনেক সময় নিজ নিজ কল্পনা অনুসারে কোনো দেবীস্থান বা তীর্থের সঙ্গে দেবীর অঙ্গবিশেষের সম্পর্ক স্থাপন করেছেন এবং দেবীর ও ভৈরবের নাম করেছেন।[১]

মনে হয় দেবীভক্ত এই-সব লেখকদের একটিমাত্র লক্ষ্য ছিল। বিভিন্ন দেবী তত্ত্বতঃ যে একই দেবী এবং বিভিন্ন দেবীস্থান যে একই দেবীর স্থান তাই তাঁরা দেখাতে চেয়েছেন। সেইজন্য, যে-কোনো দেবীস্থানের সঙ্গে দেবীর যে-কোনো অঙ্গের সম্পর্কের কথা বলেছেন এবং এমনি পীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম দিয়েছেন মহাদেবীর যে-কোনো নামে। তবে যে-স্থানে আগে থেকেই দেবীর কোনো নাম প্রচলিত ছিল সেখানে তাঁরা সাধারণতঃ সেই নামই গ্রহণ করেছেন মনে হয়।

দেবীস্থানের সঙ্গে দেবী-অঙ্গের যোগাযোগ-কল্পনার উৎস— দেবীস্থান বা শাক্ততীর্থের সঙ্গে দেবীর অঙ্গের এ রকম যোগাযোগের কল্পনার উদ্ভব কি করে হল তা নিয়েও নানা জল্পনা কল্পনা করা হয়েছে।

বৌদ্ধরা বুদ্ধদেবের তিরোভাবের পর তাঁর নখ, কেশ, অস্থি, দাঁত প্রভৃতি দেহাংশের পূজা আরম্ভ করেন এবং নানা স্থানে এই-সবের এক একটির প্রতিষ্ঠা করে তার উপর স্তূপ রচনা করেন। যে যে স্থানে সেই-সব স্তূপ নির্মিত হয় কালে সেগুলি বৌদ্ধতীর্থে পরিণত হয়। শাক্তদের পীঠকল্পনার সঙ্গে এই ব্যাপারের একটা যোগাযোগ থাকা সম্ভবপর।[২]

হিউয়েন সাঙ উত্তর-পশ্চিম ভারতের কয়েকটি পবিত্র তীর্থস্থানের কথা লিখেছেন। এই-সব স্থানে বুদ্ধ কোনো কোনো পূর্বজন্মে আপন দেহ খণ্ড খণ্ড করে খাইয়ে দিয়ে পরের উপকার করেছিলেন বলে কাহিনী প্রচলিত।[৩] এই কাহিনী শাক্তপীঠের কাহিনীর প্রেরণা যোগাতে পারে।

মিশরীয় কাহিনী— শাক্তপীঠের উদ্ভব-কাহিনীর অনুরূপ একটি কাহিনী প্রচলিত ছিল মিশরে। এই মিশরীয় কাহিনীতে দেখা যায় ওসাইরিসের ভাই সেট ওসাইরিসের

১ ŚK. P., p. 32 ২ Ibid, p. 7 ৩ O. Y. C., Vol. I. Ch. VII

অস্থিগুলি দেশের দূর দূরান্তরে ছড়িয়ে দেয়। পরবর্তী কালে মিশরের মন্দিরগুলিতে ভক্তদের ওসাইরিসের যে-সব দেহাবশেষ দেখান হত, বলা হত এইগুলিই সেই অস্থি।[১]

আদিম মানবের ধারণা—মনে হয় উভয় দেশের কাহিনী স্বতন্ত্রভাবে গড়ে উঠেছে। সম্ভবতঃ এই ধরণের কাহিনীর মূলে আছে আদিম মানুষের একটি অতি প্রাচীন ধারণা—কোনো দেবতা বা তাঁর মানব-প্রতিনিধিকে টুকরো টুকরো করে কেটে জমিতে ছড়িয়ে দিলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়।[২]

দেবীদেহকে টুকরো টুকরো করে দেশের নানা স্থানে ছড়িয়ে দেবার কল্পনার মূলে এই আদিম ধারণা যুক্ত থাকাটাও অসম্ভব নয়।

চতুষ্পীঠ—প্রাচীন তন্ত্রগ্রন্থে[৩] চারটিমাত্র পীঠের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা—জালন্ধর, উড্ডীয়ান বা ওড্ডিয়ান, পূর্ণগিরি বা পূর্ণশৈল এবং কামরূপ।

বৌদ্ধতন্ত্রেও[৪] এই চার পীঠের উল্লেখ আছে। তবে কোনো কোনো বৌদ্ধগ্রন্থে[৫] জালন্ধরের পরিবর্তে শ্রীহট্ট বা সিরিহট্টের উল্লেখ করা হয়েছে।

তন্ত্রসারের[৬] একটি বচনে পীঠসংখ্যা দেখা যায় পাঁচ। যথা উড্ডিয়ান, জালন্ধর, কামরূপ, পূর্ণগ্রীব (পূর্ণগিরি) এবং শ্রীহট্ট।

তারপর বিভিন্ন তন্ত্রে পীঠের ক্রমবর্ধিত সংখ্যা লক্ষ্য করা যায়। কুব্জিকাতন্ত্রমতে[৭] পীঠসংখ্যা ৪২, জ্ঞানার্ণবতন্ত্রমতে[৮] ৫০ তন্ত্রসার অনুসারে[৯] ৫১, পীঠনির্ণয় অনুসারে ৫১ ইত্যাদি। এ ছাড়া, দেবীভাগবত, কালিকাপুরাণ, মৎস্যপুরাণ প্রভৃতি পুরাণেও পীঠতালিকা দেওয়া হয়েছে। পীঠের সংখ্যা ও নাম সম্বন্ধে এ-সব তালিকার মধ্যে অনেক গরমিল আছে। আমরা আগেও এ বিষয়ের উল্লেখ করেছি।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত—আমরা পূর্বেই বলেছি দেবীস্থান তথা শাক্ততীর্থ ভারতের[১০] সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। এবার বিভিন্ন অঞ্চলের দেবীস্থান তথা শাক্ততীর্থ তথা পীঠস্থানের একটা মোটামুটি বিবরণ দেওয়া যাক। এই বিবরণ থেকে দেবীপূজার ব্যাপকতা সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা করা যাবে।

১ Cambridge Ancient History, Vol. I. p. 332
২ G. B., Part V, Spirits of the Corn, Vol I., pp. 245-49
৩ দ্রঃ প্রা ভো, কা ৭, পরি ৪, ব সং, পৃঃ ৫৪৮ ; ŚK. P., p. 11
৪ হেবজ্রতন্ত্র, (৭ম পটল) Quoted in S. T.. I. p. 88
৫ সাধনমালা, G. O. S., Vol. II, p. 453 ৬ দ্রঃ প্রা ভো, কাণ্ড ১, পরি ৫, ব সং, পৃঃ ৪০
৭ ŚK. P. p., 19 ৮ Ibid, pp. 20-21 ৯ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ২৭৫-৭৬
১০ এই আলোচনায় অবিভক্ত ভারতকে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে ভারত বলতে বর্তমান ভারত-পাকিস্তান বুঝতে হবে।

হিংলাজ—উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত অঞ্চল থেকে আরম্ভ করা যাক। এদিককার সব চেয়ে বিখ্যাত শাক্তপীঠ মরুতীর্থ হিংলাজ। একে হিঙ্গুলা বা হিঙ্গুলাটও বলা হয়।[১] এখানে পড়েছিল দেবীর নাভি, মতান্তরে ব্রহ্মরন্ধ্র। দেবীর নাম কোট্টরী, কোট্টবী কুটুবী বা কোট্টরীশা। ভৈরব ভীমলোচন।[২] হিংলাজ বেলুচিস্তানে। বর্তমানে এখানকার লোকেরা সব মুসলমান। তাঁরা দেবীকে বলেন নানী বিবি। আর হিংলাজকে বলেন নানী কী হজ। হিংলাজ পীঠের কাছে অঘোর-নদী। সে-নদী পেরিয়ে পীঠস্থানে তাঁরা কখনো যান না অন্ততঃ পাকিস্তান হবার আগ পর্যন্ত যেতেন না। কেউ কেউ হিন্দু যাত্রীদের হাত দিয়ে নানী কী হজে চড়াবার জন্য মেওয়া, মোমবাতি প্রভৃতি পাঠিয়ে দিতেন।[৩]

বেলুচিস্তানে একদা যে মাতৃদেবতার পূজার প্রচলন ছিল হিংলাজ তারই স্মৃতি বহন করছে। এখানে দেবীর কোনো মূর্তি নাই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় প্রাচীন কোনো পীঠে বা দেবীস্থানে দেবীর কোনো মূর্তি নাই। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কোনো স্বয়ম্ভূ প্রস্তরখণ্ড দেবীর প্রতীক।

উড্ডিয়ান—প্রাচীন চতুষ্পীঠের অন্যতম পীঠ উড্ডিয়ান বা উড্ডীয়ান বা উডিয়ান। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকার সওয়াট (Swat) নামক স্থানে এই পীঠের অবস্থান নির্দেশ করা হয়।[৪] তবে এ বিষয়ে মতভেদ আছে। মঁশিয়ে সিলভাঁ লেভি (Sylvan Levy) মনে করেন উড্ডিয়ান ছিল কাশগড়ের কোনো স্থানে আর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় মনে করেন উড়িষ্যায়।[৫] আবার কেউ কেউ মনে করেন এটি ছিল কাশ্মীরের উত্তর-পশ্চিমে দর্দিস্তানে।[৬] এখানে পড়েছিল দেবীর উরুদ্বয়। পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবী কাত্যায়নী।

কাশ্মীর— জ্ঞানার্ণবতন্ত্রাদি গ্রন্থে কাশ্মীরকে পীঠ বলা হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবীর ভিন্ন ভিন্ন নাম পাওয়া যায়। যথা—মেধা, সরস্বতী (সারদা), মহামায়া এবং ত্রিসন্ধ্যা।[৭]

সারদাস্থান বা সারদাপীঠ—রাজতরঙ্গিণী[৮] প্রভৃতি গ্রন্থে কাশ্মীরের সারদাদেবী

---

১ পীঠস্থাননির্ণয়াদি ব্যাপারে এই আলোচনায় প্রধানতঃ ডক্টর দীনেশচন্দ্র সরকারের নিবন্ধ "The Śakta Pithas"-এর অনুসরণ করা হয়েছে।

২ ŚK. P., p. 85 ৩ দ্রঃ মরুতীর্থ হিংলাজ, পৃঃ ২০০

৪ Introduction to Sadhanmala, Vol. II, p. XXXVII

৫ Ibid ৬ Introduction to G. N. B., p. XXX

৭ দ্রঃ ŚK. P., p. 88 ৮ রাজতরঙ্গিণী, ৮।২৪৪০, ২৭০০

(শারদাদেবী) এবং তাঁর মন্দিরের উল্লেখ আছে। আলবেরুণিও[১] সারদাদেবীর কথা লিখেছেন।

কিষেণগঙ্গা ও মধুমতী-নদীর সঙ্গমস্থলে পাহাড়ের উপর ছিল প্রাচীন সারদাস্থান।[২] এই স্থানের আধুনিক নাম সার্দি। মহানীলতন্ত্রাদিতে এই স্থানকেই সারদাপীঠ বলা হয়েছে।

পরে গুসাতে (প্রাচীন ঘোষ) সারদাদেবীর নূতন মন্দির তৈরী হয়।[৩]

গন্ধর্বল—গন্ধর্বল একটি প্রসিদ্ধ দেবীস্থান। জায়গাটি শ্রীনগর থেকে মাইল পনের উত্তরে। এরই কাছে ক্ষীরভবানী বা যোগমায়ার বিখ্যাত মন্দির।[৪]

উত্তর-মানস—হরমুখ পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত গঙ্গাতত্র তীর্থ। এখানে আছেন দেবী নীলা।

অচ্ছোদ—অচ্ছোদ নামে একটি দেবীস্থানের উল্লেখ কোনো কোনো গ্রন্থে পাওয়া যায়। দেবীর বিভিন্ন নাম। যথা—শিবকারিণী, শিবধারিণী, সিদ্ধিদায়িনী এবং শক্তিধারিণী। স্থানটি কাশ্মীরের আধুনিক অচ্ছাবট।

সিন্ধুদেশ—

করবীর—তন্ত্রচূড়ামণি প্রভৃতিতে যে করবীরপীঠের উল্লেখ আছে, কেউ কেউ মনে করেন এটি সিন্ধুদেশের শর্করার (আধুনিক সুক্কুর)। কালিকাপুরাণ-মতে (অ: ৩৮-৩৯) অবশ্য করবীরপুর (করবীর আর করবীরপুর একই) ছিল ব্রহ্মাবর্তের (বর্তমান পূর্ব-পাঞ্জাব) রাজধানী। স্থানটি ছিল দৃষদ্বতী-নদীর তীরে। কিন্তু সাধারণতঃ বোম্বাই রাজ্যের কোল্‌হাপুরকে (স্থানীয় নাম করবীর) করবীরপীঠ মনে করা হয়।[৫]

করবীরপীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মহিষমর্দিনী, মতান্তরে মহালক্ষ্মী। এখানে দেবীর ত্রিনেত্র পড়েছিল।

পাঞ্জাব—

জালন্ধর—জালন্ধর প্রাচীন চতুষ্পীঠের অন্যতম। কাংড়া জেলার জ্বালামুখীর কাছে এই তীর্থ। আধুনিক জালন্ধর সহরের সঙ্গে এর কোনো যোগ নেই।

এখানে দেবীর স্তন পড়েছিল। এখানকার দেবীর নাম বিশ্বমুখী বা ত্রিপুরনাশিনী বা ত্রিপুরমালিনী। মতান্তরে এই পীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ব্রজেশ্বরী। এঁকে বিদ্যারাজ্ঞীও বলা হয়।[৬] আবার কেউ কেউ বিদ্বেশ্বরীও বলেন।

জ্বালামুখী— এটিও একটি পীঠস্থান। এখানকার দেবী সিদ্ধিদা বা অম্বিকা।

১ Alberuni's India, Vol. I, p. 117   ২ Rājataranginī (trans.), p. 10

৩ Ibid.   ৪ ক প অ, পৃঃ ৬০৯   ৫ ŚK. P, p. 44, f. n. 1   ৬ ক প অ, পৃঃ ৩৭৫

ভৈরবের নাম উন্মত্ত। এখানে পড়েছিল দেবীর জিহ্বা। স্থানীয় লোকেরা দেবীকে বলে জ্বালাজী। দেবীর মন্দির আছে কিন্তু মন্দিরে কোনো মূর্তি নেই।[১]

চিন্তপূর্ণী—চিন্তপূর্ণী কাংড়ার একটি বিখ্যাত দেবীস্থান। স্থানীয় লোকেরা একে সিদ্ধপীঠ মনে করেন। জালন্ধর ও জ্বালামুখীর মত এখানেও প্রতিবৎসর হাজার হাজার যাত্রী আসে।[২]

কাংড়ার আরেকটি পীঠ—কাংড়া রেলষ্টেশনের কাছে একটি দেবীস্থান আছে। স্থানীয় লোকেরা একে একটি প্রধান পীঠ বলে মনে করেন। এখানে নাকি দেবীর মুণ্ড পড়েছিল। এই স্থানে ভগবতী বিশ্বেশ্বরীর একটি প্রাচীন মন্দির আছে। এঁকে নগর-কোটের দেবীও বলা হয়। এখানে দেবীর শুধু মুণ্ডেরই মূর্তি আছে।[৩]

নগরকোটের দেবীস্থান, জ্বালামুখী এবং চিন্তপূর্ণী এই তিন পীঠকে নিয়ে কাংড়াতে একটি শক্তিত্রিকোণ সৃষ্টি হয়েছে।[৪]

পাঠানকোট—পাঠানকোটে প্রাচীন হিন্দু রাজাদের এক দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে। ওরই মধ্যে আছে এক অতি প্রাচীন দেবীস্থান। স্থানীয় লোকের ধারণা ত্রিগর্ত-রাজ্যের দ্বারদেশে অধিষ্ঠিতা এই দেবীর আরাধনা অনন্তকাল ধরে চলে আসছে।[৫]

পৃথূদক—কর্ণাল জেলার আধুনিক পেহোয়াতে ছিল প্রাচীন দেবীস্থান পৃথূদক। দেবীর নাম মহাবেগা। এটি ছিল প্রাচীন কুরুক্ষেত্রের সীমার মধ্যে।[৬]

কপালমোচন—কোনো কোনো পুরাণে কপালমোচন নামে তীর্থের উল্লেখ আছে। অনেকে পূর্বোক্ত পেহোয়া গ্রামের কাছে তার স্থান নির্দেশ করেন। অবশ্য ভারতের অন্যত্রও কপালমোচন নামে স্থান আছে। কপালমোচনের দেবীর নাম শুদ্ধি।[৭]

কুরুক্ষেত্র— মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্রও শাক্তপীঠ। এখানে পড়েছিল দেবীর দক্ষিণ গুল্ফ। পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম নিয়ে মতভেদ আছে। কোনো মতানুসারে সাবিত্রী; অন্যমতে সম্বরী বা বিমলা; মতান্তরে শিবা; আবার অন্য একটি মতে অরুণেক্ষণা। *পূর্ব-পাঞ্জাবের কর্ণাল অঞ্চলে প্রাচীন কুরুক্ষেত্রের স্থান নির্দেশ করা হয়।*[৮]

থানেশ্বর—থানেশ্বরও একটি দেবীস্থান। স্থানটির প্রাচীন নাম স্থানীশ্বর বা স্থানেশ্বর। প্রাচীন কুরুক্ষেত্রের মধ্যভাগে প্রাচীন স্থানেশ্বরের স্থান নির্দিষ্ট হয়। এখানকার দেবীর নাম ভবানী।[৯]

১ ভা ব্র, পৃঃ ৮৭ ; ŚK. P., p. 86 ২ ক শ অ, পৃঃ ৩৪০
৩ ঐ, পৃঃ ৩৩৯ ৪ ঐ, পৃঃ ৩৪০ ৫ ঐ, পৃঃ ৩৪১
৬ ŚK. P., p. 94 ; ভা ব্র, পৃঃ ৩৫৩ ৭ ŚK. P., p. 88 ; ভা ব্র, পৃঃ ৩৫৩-৫৪
৮ ŚK. P., p. 89 ৯ ভা ব্র, পৃঃ ৩৪৯, ক শ অ পৃঃ ৩৪৬

রুদ্রকোটী—কুরুক্ষেত্রের সীমানার মধ্যে আরেকটি দেবীতীর্থের কথা পাওয়া যায়। তীর্থের নাম রুদ্রকোটী। দেবী রুদ্রাণী, মতান্তরে কল্যাণী। নর্মদানদীর উৎসের কাছেও রুদ্রকোটীতীর্থ আছে।[১]

ব্রহ্মাবর্ত— আধুনিক পূর্বপাঞ্জাবের প্রাচীন নাম ব্রহ্মাবর্ত। ব্রহ্মাবর্তও দেবীস্থান বলে গণ্য। এখানকার দেবীর নাম ব্রজেশ্বরী।[২]

বিভিন্ন দেবীমন্দির—এই অঞ্চলে বিভিন্ন দেবীমন্দিরও আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটির উল্লেখ করা গেল।

দিল্লীতে—দিল্লীর কুতুব মীনারের কাছে যোগমায়ার একটি মন্দির আছে। জনশ্রুতি অনুসারে এই যোগমায়া ছিলেন পৃথ্বীরাজের ইষ্টদেবী। মন্দিরে কোনো মূর্তি নাই। কামাখ্যা-পীঠের মতো এখানেও যোনিরূপা দেবী অধিষ্ঠিতা।[৩] এর থেকে অনুমান হয় দেবীস্থানটি প্রাচীন। তবে বর্তমান মন্দিরটি অর্বাচীন।[৪]

দিল্লী থেকে সাতমাইল দূরে এক প্রাচীন কালিকামন্দির আছে। লোকপ্রসিদ্ধি কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের সময় শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে অর্জুন ভগবতীর স্তব করলে দেবী কালিকামূর্তিতে তাঁকে দর্শন দেন। আর বিজয়ী পাণ্ডবেরাই এখানে দেবীমন্দির নির্মাণ করিয়ে দেন। এই কিংবদন্তী থেকে এইটুকু বোঝা যায় দেবীস্থানটিকে লোকে অতি প্রাচীন বলে মনে করে। বর্তমান মন্দিরটি অবশ্য ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে তৈরি হয়। মন্দিরে দিনরাত অখণ্ড দীপশিখা জ্বলে।[৫]

মুলতানে—মুলতান সহরের যোগমায়ার মন্দিরটি এ অঞ্চলে বিশেষ বিখ্যাত ছিল। পাকিস্তান হবার পূর্ব পর্যন্ত এই মন্দিরে দিনরাত অখণ্ড দীপশিখা জ্বলত।[৬] বর্তমান অবস্থা আমাদের জানা নেই।

রোটকে—রোটক (রোহতক) জেলার বেরীতে একটি প্রাচীন দেবীমন্দির আছে। মন্দিরে দিনরাত ঘিয়ের বাতি জ্বলে। আশ্বিন এবং চৈত্রের শুক্লা সপ্তমী এবং অষ্টমী তিথিতে প্রতিবছর এখানে মেলা বসে। তখন হাজার হাজার দর্শকের ভিড় জমে।[৭]

শিমলাতে—শিমলাতে তিনটি দেবীস্থান আছে। রাজভবনের কাছে কোটিকীদেবীর স্থান; তারাদেবী ষ্টেশনের কাছে তারাদেবীর প্রাচীন স্থান আর কণ্ডাঘাট ষ্টেশনের কাছে আরেকটি প্রাচীন দেবীস্থান আছে।[৮]

১ ŚY. P., p 95 ২ Ibid, p. 88 ৩ ক শ অ, পৃঃ ৬৪১ ৪ ঐ, পৃঃ ৬৬০
৫ ঐ, পৃঃ ৬৬১ ৬ ভা অ, পৃঃ ১২৩ ৭ ক শ অ, পৃঃ ৬৭৪ ৮ ঐ, পৃঃ ৬৪৩

উত্তর প্রদেশ

কাশী—মুক্তিপুরী কাশী বা বারানসী। দেবী দুর্গা রাজা সুবাহুকে বর দিয়েছিলেন যতদিন পৃথিবী থাকবে ততদিন তিনি সর্বলোকের রক্ষার জন্য কাশীতে অবস্থান করবেন।[১]

পীঠনির্ণয় অনুসারে বারানসীর পীঠ মণিকর্ণিকা। এখানে পড়েছিল দেবীর কুণ্ডল। পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবী বিশালাক্ষী; ভৈরব কালভৈরব। মতান্তরে এই পীঠের দেবী অন্নপূর্ণা আর ভৈরব বিশ্বেশ্বর।

কাশীতে একটি শক্তিত্রিকোণ আছে। তার এক কোণে দুর্গা (মহাকালী), এক কোণে মহালক্ষ্মী এবং আরেক কোণে বাগীশ্বরী (মহাসরস্বতী)। কাশীখণ্ডে দেখা যায় এই তিন দেবীস্থানের সংলগ্ন তিনটি কুণ্ড ছিল। দুর্গাকুণ্ড এবং লক্ষ্মীকুণ্ড এখনও আছে কিন্তু বাগীশ্বরীকুণ্ড লোপ পেয়ে গেছে। আলোচ্য তিন দেবীস্থান শক্তিপীঠ বলে গণ্য।[২]

কাশী বিশ্বেশ্বরের স্থান। এখানকার প্রধানা দেবী বিশ্বেশ্বরী অন্নপূর্ণা। ইনি মহাগৌরী নামেও প্রসিদ্ধ। সমস্ত কাশীময় ছড়িয়ে আছে আরও নানা দেবীস্থান। নবদুর্গা,[৩] চতুঃষষ্টি যোগিনী, ললিতা, কালী, রাজরাজেশ্বরী, বারাহী, ত্রিপুরা, মঙ্গলা গৌরী, সংকটা, গায়ত্রী, তারা, পীতাম্বরা, যোগেশ্বরী প্রভৃতি দেবীর স্থান কাশীতে আছে। এই-সব দেবীদের মন্দির ও মূর্তি আছে।

বিন্ধ্যাচল—সুবিখ্যাত দেবীস্থান বিন্ধ্যাচল কাশী থেকে খুব বেশী দূরে নয়। এখানকার দেবী বিন্ধ্যবাসিনী। ভৈরবের নাম পুণ্যভাজন।[৪]

বিন্ধ্যাচলেও একটি শক্তি-ত্রিকোণ আছে। এক কোণে বিন্ধ্যবাসিনী, এক কোণে কালীগুহার কালী এবং অন্য কোণে অষ্টভূজা যোগমায়া। এই ত্রিকোণ ঘুরতে মাইল পাঁচেক হাঁটা পড়ে।[৫]

বিন্ধ্যপর্বতের এক উচ্চশিখরে বিন্ধ্যবাসিনীর প্রাচীন মন্দির। বিন্ধ্যাচল ষ্টেশন থেকে

১ রাজন্ সদা নিবাসো মে মুক্তিপুর্য্যাং ভবিষ্যতি
রক্ষার্থং সর্বলোকানাং যাবৎ তিষ্ঠতি মেদিনী।
—দে ভা, ৩।২৪।১১

২ ক শ অ, পৃঃ ৬৩৮

৩ শৈলপুত্রী, ব্রহ্মচারিণী, চন্দ্রঘণ্টা, কুষ্মাণ্ডা, স্কন্দমাতা, কাত্যায়নী, কালরাত্রি, মহাগৌরী এবং সিদ্ধিদাত্রী এই নবদুর্গা।—দ্রঃ বাচস্পত্য। মতান্তরে কুমারিকা, ত্রিমূর্তি, কল্যাণী, রোহিণী, কালী, চণ্ডিকা, শাম্ভবী, দুর্গা এবং ভদ্রা এই নবদুর্গা।—দ্রঃ শব্দকল্পদ্রুমঃ। নবপত্রিকাকেও নবদুর্গা বলা হয়।

৪ ŚK. P., p. 99 ৫ ক শ অ, পৃঃ ৬৪০

এটি মাইল দেড়েক দূর। বিন্ধ্যাচল-ষ্টেশনের গায়েই বিন্ধ্যবাসিনীর আরেকটি মন্দির আছে। মন্দিরে অষ্টভুজা দেবীমূর্তি অধিষ্ঠিতা। লোকে বলে বিন্ধ্যবাসিনীর দুই মূর্তি—যোগমায়া আর ভোগমায়া। ষ্টেশনের কাছের মন্দিরে আছেন ভোগমায়া আর পর্বতশিখরের মন্দিরে আছেন যোগমায়া। যোগমায়াকেই কংস আছড়ে মারতে গিয়েছিল। দুর্গম পর্বতশিখরে ভক্তদের যেতে কষ্ট হত বলে দেবী কৃপা করে সমতল ক্ষেত্রে নেমে এসে ভোগমায়ারূপে অবস্থান করছেন।[১]

যোগমায়ার মন্দিরে পাথরের উপর ক্ষোদিত অষ্টভুজা মহিষমর্দিনী মূর্তি আছে। এই মন্দিরেরই কাছে কালীখোহ বা কালীগুহা-মন্দির। মন্দিরের ভিতরে আছে পাথরের টালির উপর ক্ষোদিত কালীমূর্তি। জনপ্রবাদ ঠগীরা এই কালীর পূজা করত।

বিন্ধ্যকন্দর—বিন্ধ্যাচল থেকে পৃথক্ আরেকটি দেবীস্থান বিন্ধ্যকন্দর। এখানকার দেবীর নাম অমৃতা, নিভম্বা বা মৃগী।

চুনার—চুনার-রেলষ্টেশন থেকে আধমাইল দক্ষিণে দুর্গাকুণ্ড নামে একটি পার্বত্যকুণ্ড আছে। এরই কিছু দূরে কামাক্ষীদেবীর মন্দির।

এই মন্দির থেকে আরও খানিকটা দূরে একটি গুহা-মন্দির আছে। স্থানীয় লোকেরা একে বলে দুর্গাখোহ। মন্দিরে মহিষমর্দিনীমূর্তি বিরাজিতা। লোকে এঁকে জাগ্রতদেবী মনে করে। বিন্ধ্যবাসিনীর মতো এঁরও খুব খ্যাতি। প্রতিবৎসর নবরাত্রির পর এখানে প্রকাণ্ড মেলা বসে।[২]

মনীয়রে আদ্যাশক্তি—বালিয়া জেলায় মনীয়র নামক গ্রামে একটি প্রাচীন দেবীস্থান আছে। স্থানটি সরযূনদীর তীরে। এখানে দেবীর প্রাচীন মূর্তি আছে, মন্দিরও আছে। কমলাসনের উপর চতুর্ভুজা দেবীমূর্তি উপবিষ্টা। দেবীর হাতে শূল, অমৃতভাণ্ড, খর্পর এবং অভয়মুদ্রা। দেবীকে মহাদেবী আদ্যাশক্তি বলা হয়। লোকের বিশ্বাস এখানেই রাজা সুরথ এবং সমাধি বৈশ্য মৃন্ময়ী মূর্তি নির্মাণ করে দেবীর পূজা করেছিলেন।[৩]

ভৃগুপুরী—আনার্থবতন্ত্রাদিতে ভৃগু বা ভৃগুপুরী নামে এক দেবীতীর্থের উল্লেখ আছে। আধুনিক বালিয়াকে সেই ভৃগুপুরী মনে করা হয়। ভৃগুপুরীর দেবী ব্রজেশ্বরী।

অযোধ্যা—রামের জন্মভূমি অযোধ্যাও একটি দেবীপীঠ। স্থানটি আধুনিক ফয়জাবাদ জেলায়। এখানকার দেবী ভবানী, মতান্তরে অন্নপূর্ণা।

প্রয়াগ—এলাহাবাদের কাছে গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থল প্রয়াগ বা যুক্তত্রিবেণী একটি প্রসিদ্ধ দেবীপীঠ। এখানকার দেবী ললিতা, ভৈরব ভব; মতান্তরে দেবী কমলা, ভৈরব বেণীমাধব। এখানে দেবীর হাতের আঙুল পড়েছিল।

---

১ ভা র, পৃঃ ৩৭২-৭৩   ২ ঐ, পৃঃ ৩৭২-৭৩   ৩ ক প অ, পৃঃ ৩৮২-৮৩

এই স্থানে একটি দেবীমন্দির আছে। মন্দিরটিকে বলা হয় অলোপীমাতার মন্দির। মন্দিরে কোনো মূর্তি নেই। মন্দিরের মাঝখানে একটি মর্মরবেদী আছে। বেদীর মাঝখানে একটি চারকোণা গর্ত এবং গর্তের মধ্যে দেবীযন্ত্র ক্ষোদিত আছে। এই গর্তটিকে দেবীপীঠ মনে করা হয়।[১]

কর্কোটা—এলাহাবাদ থেকে মাইল চল্লিশ উত্তর-পশ্চিমে একটি দেবীস্থান আছে। স্থানটির প্রাচীন নাম কর্কোটা, আধুনিক নাম কয়্রা। স্থানীয় লোকে মনে করে এখানে দেবীর হাত পড়েছিল।

কান্যকুব্জ—কান্যকুব্জ বা কনৌজ একটি প্রাচীন দেবীস্থান। স্থানটি বর্তমান ফর্‌রুখাবাদ জেলায়। এখানকার দেবীর নাম গৌরী, মতান্তরে ব্রহ্মাণী।

এই জায়গায় অনেকগুলি দেবীমন্দির আছে। জনপ্রবাদ এখানকার ক্ষেমকালীর স্থানটি জয়চন্দ্রের সময়কার।

ললিতাপুর—কোনো কোনো গ্রন্থে ললিতা বা ললিতাপুর নামে দেবীস্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। অনুমান করা হয় এই স্থানটি ঝাঁসি জেলায় আধুনিক ললিতপুরা। দেবী ললিতা।

নৈমিষারণ্য—সীতাপুর জেলার বর্তমান নিমখার (নিমসার) এবং মিশ্রিখ এলাকাই প্রাচীন নৈমিষারণ্য বলে অনুমান করা হয়। এখানকার দেবী প্রজ্ঞা বা লিঙ্গধারিণী।

হস্তিনাপুর—পাণ্ডবদের প্রাচীন হস্তিনাপুরও একটি দেবীস্থান। এখানকার দেবী জয়ন্তী; মতান্তরে রাজেশ্বরী বা মহালক্ষ্মী। হস্তিনাপুর ছিল আধুনিক মীরাট জেলায়।

মথুরা—মথুরা বা মধুরা বা মধুপুরীকেও দেবীস্থান বলা হয়। এখানকার দেবী দেবকী, মতান্তরে মাধবী।

মথুরাতে 'কংকালী টীলা' নামে একটি প্রাচীন স্থান আছে। এক সময়ে এখানে বৌদ্ধ এবং জৈনদের বিহার ছিল। এই স্থানে একটি প্রাচীন দেবীমন্দির আছে। দেবীর নাম কংকালী। দেবী কংকালমালিনী, সিংহবাহিনী এবং ভীষণ-উগ্রদর্শনা। লোকপ্রসিদ্ধি ইনিই সেই যশোদা-গর্ভসম্ভূতা যোগমায়া। এই স্থানেই কংস এঁকে পাথরের উপর আছড়ে মারতে যায়। ইনি আসলে কংসকালী। কংকালমালিনী কংসকালীই লোকমুখে কংকালী হয়ে গেছেন।[২]

মথুরার একটি উঁচু টিলার উপর মহাবিদ্যার একটি প্রাচীন মন্দির আছে। মন্দিরে ভগবতীর বিশাল মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। লোকে এই স্থানটিকেও পীঠস্থান মনে করে।[৩]

১ ভা ব্র, পৃঃ ৩৪৬   ২ ক শ অ, পৃঃ ৬৮০   ৩ ঐ, পৃঃ ৩৩২

মথুরার কাছে আরেকটি প্রাচীন দেবীস্থান মহাবন। একে পুরানো গোকুলও বলা হয়। এখানকার দেবী ভদ্রা বা ভদ্রকালী বা ভদ্রেশ্বরী।

বৃন্দাবন— বৈষ্ণবের পরম তীর্থ বৃন্দাবন। কিন্তু এ স্থান শক্তিপীঠও বটে। এখানে পড়েছিল দেবীর কেশ। এখানকার দেবীর নাম উমা, ভৈরবের নাম ভূতেশ। স্থানীয় লোকেরা দেবীকে বলে চামরী। এই পীঠকে উমাবনও বলা হয়।

মহানীলতন্ত্রে আছে অখিলাম্বিকা মহাদেবী কাত্যায়নী গোবর্ধনে বিরাজ করছেন। বোঝা যাচ্ছে এখানে গিরিগোবর্ধনের কাত্যায়নীস্থানের উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমানে বৃন্দাবনেই কাত্যায়নীমন্দির আছে।

কালঞ্জর—মহানীলতন্ত্রাদিতে কালঞ্জর নামক যে-দেবীস্থানের উল্লেখ আছে আধুনিক বাঁদা জেলায় তার স্থান নির্দেশ করা হয়। এখানকার দেবী কালী।

শাকম্ভরীপীঠ— সাহারাণপুর সহর থেকে কয়েক মাইল উত্তরে একটি দেবীস্থান আছে। একে শাকম্ভরীপীঠ বলা হয়। স্থানীয় লোকেরা এই পীঠকে সিদ্ধপীঠ বলে মনে করেন। দুই পাহাড়ের মাঝখানে একটি ঝর্ণার ধারে দেবী শাকম্ভরীর মন্দির।

প্রতিবৎসর আশ্বিনের শুক্লা চতুর্দশীতে এখানে মেলা বসে। দূরদূরান্তর থেকে হাজার হাজার যাত্রী এসে ভিড় করে। তিন চারদিন ধরে খুব ধূমধাম হয়।[১]

দুর্গাপীঠ— শাকম্ভরীপীঠ থেকে কয়েক মাইল দূরে দেওবন্দে একটি দেবীস্থান আছে। লোকে একে দুর্গাপীঠ বলে। স্থানটিকে খুব প্রাচীন মনে করা হয়। লোকপ্রসিদ্ধি হাজার হাজার বছর আগে এখানে ছিল এক গভীর বন। তার নাম দেবীবন। কালে বন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় কিন্তু স্থানের নামটি দেবীবনই থেকে যায়। মুসলমান আমলে নামটি বদলে যায়, নূতন নাম হয় দেওবন্দ্। এখানে দেবী দুর্গার মন্দির আছে। চৈত্র-শুক্লা-চতুর্দশীতে এখানে প্রকাণ্ড মেলা বসে।[২]

হিমালয়—দেবতাত্মা হিমালয়। বেদের সময় থেকে দেখা যায় লোকে বিশ্বাস করেছে হিমালয়ে উমা এবং মহেশ্বর বাস করেন।

কোনো কোনো গ্রন্থে হিমালয়, হিমবান্ বা হিমাদ্রিকেই দেবীপীঠ বলা হয়েছে। দেবীর নাম কোথাও পার্বতী, কোথাও নন্দা এবং কোথাও ভীমা দেওয়া হয়েছে।

দেবী নন্দার স্থান নন্দাদেবীশৃঙ্গ। এটি গাড়োয়াল জেলার মধ্যে পড়ে।

ভীমাস্থান বর্তমান পেশোয়ারের কাছে ছিল। এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

হরিদ্বার—হিমালয়ের নানা স্থানে আছে দেবীস্থান। হরিদ্বার একটি বিখ্যাত তীর্থ।

---

১ ক প অ, পৃঃ ৩৮৩ ২ ঐ, পৃঃ ৩৮৭

এটি একটি দেবীস্থানও বটে। এখানকার দেবী ভৈরবী ; মতান্তরে নারায়ণী বা বৈষ্ণবী।

হরিদ্বারে একটি শক্তি-ত্রিকোণ আছে। এক কোণে নীলপর্বতস্থিতা চণ্ডী (স্থানটি গঙ্গার অপর পারে কনখলে), এক কোণে দক্ষেশ্বরে অধিষ্ঠিতা পার্বতী এবং অপর কোণে বিল্বপর্বত-বাসিনী মনসা বিরাজ করছেন।[1]

এখানকার আরেকটি দেবীস্থান মায়াপুরী, মায়াপুর বা মায়াবতী। দেবী কুমারী। ইনি মায়াদেবী নামেই বিখ্যাত। শিবালিকপর্বতের কাছে মায়াদেবীর মন্দিরটি প্রসিদ্ধ। হরিদ্বারেরও অপর নাম মায়াপুরী।

কনখল—কনখলও একটি দেবীস্থান। এখানকার দেবী শ্রদ্ধা, মতান্তরে শিবোগ্রা। ভৈরবের নাম উগ্র।

উত্তরকুরু—উত্তরকুরু একটি দেবীস্থান। একে আধুনিক গাড়োয়াল জেলার উত্তর অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয়। এখানকার দেবীর নাম ওষধী বা ঔষধী।

হেমকূট— হেমকূট হিমালয়ের অংশবিশেষ। এটিও একটি দেবীস্থান। হেমকূটের দেবী মন্মথা।

বদরিকাশ্রম—বিখ্যাত তীর্থ বদরিকাশ্রমকেও দেবীস্থান মনে করা হয়। এখানকার দেবীর নাম শ্রীবিদ্যা ; মতান্তরে উর্বশী।

গন্ধমাদন—বদরিকাশ্রমের কাছে গন্ধমাদনপর্বত একটি দেবীস্থান। এই স্থানের দেবী কামাক্ষী বা কামুকী বা কামুকা।

কেদার—সুপ্রসিদ্ধ শৈব তীর্থ কেদার বা কেদারনাথও দেবীস্থান বলে গণ্য। দেবী মার্গদায়িনী বা সন্মার্গদায়িনী।

কালীক্ষেত্র—কেদারনাথপর্বতে মন্দাকিনীর তীরে কালীক্ষেত্র বা কালীমঠ। লোকে এ স্থানকে একটি প্রধান সিদ্ধপীঠ মনে করে। এখানে মহাকালী, মহালক্ষ্মী এবং মহাসরস্বতীর তিনটি বিশাল মন্দির আছে। আর আছে একটি কুণ্ড। কুণ্ডের মুখ সারা বছর একখণ্ড প্রকাণ্ড পাথর দিয়ে ঢাকা থাকে। শুধু শারদীয়া এবং বাসন্তী নবরাত্রির সময় ঢাকনা সরিয়ে দেওয়া হয়। তখন হাজার হাজার যাত্রী এখানে স্নান করে। ঐ সময়ে খুব ধুমধাম করে দেবীপূজা হয়। অষ্টমীতে প্রকাণ্ড মেলা বসে। লোকের বিশ্বাস এখানে মহামায়া কালিকারূপে দেবতাদের দর্শন দিয়েছিলেন।[2]

এখান থেকে মাইল চারেক দূরে রাসী নামক স্থানে দেবী রাকেশ্বরীর এক বিশাল মন্দির আছে।[3]

---

১ ঐ, পৃঃ ৩৪৩ ২ ক শ অ, পৃঃ ৩৭৩ ৩ ঐ

কালীমঠ থেকে মাইল দুই দূরে দেবী কোটিমাহেশ্বরীর স্থান। কেদারযাত্রীরা এই স্থানে শ্রাদ্ধতর্পণাদি করেন।[১]

ললিতাস্থান— কেদারের পথে গুপ্তকাশী ছাড়িয়ে মাইল খানেক এগিয়ে গেলে পাওয়া যায় নালা নামে একটি গ্রাম। এই গ্রামে ললিতাদেবীর একটি মন্দির আছে। কিংবদন্তী এখানে রাজা নল বনবাসকালে দেবী ললিতার পূজা করে হারান রাজ্য, স্ত্রীপুত্রাদি ফিরে পেয়েছিলেন।[২]

বামসু—বামসু একটি দেবীস্থান। জায়গাটি কেদারের পথেই পড়ে। এখানে দেবী দুর্গার এক বিশাল মন্দির আছে। হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভের বৎসর এখানে শরৎ ও বসন্ত কালে বিরাট উৎসব হয়। আর অর্দ্ধকুম্ভের বৎসর সাধারণভাবে উৎসব হয়।[৩]

মৈখচণ্ডী—এই কেদারের পথেই মৈখচণ্ডী বলে একটি দেবীস্থান আছে। এখানে মহিষমর্দিনীর বিশাল মন্দির আছে। লোকপ্রসিদ্ধি এখানেই দেবী মহিষাসুর বধ করেছিলেন এবং তার দেহ খণ্ড খণ্ড করে এখানকার পর্বতের উপর ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেইজন্য, পর্বতের নাম হয়েছে মহিষখণ্ড।[৪]

পূর্ণগিরি—কেউ কেউ নৈনিতাল জেলার এক দুর্গম পর্বতের উপর প্রাচীন চতুষ্পীঠের অন্যতম পীঠ পূর্ণগিরির স্থান নির্দেশ করেন। পীঠস্থানে মন্দির, মূর্তি কিছুই নাই। পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবী পূর্ণেশ্বরী। এখানে দেবীর গ্রীবা পড়েছিল। সাধারণতঃ বাসন্তী নবরাত্রিতে যাত্রীরা এখানে তীর্থ করতে আসে।[৫]

নৈনিতাল—নৈনিতাল শহরে পাহাড়ের উপর এক প্রকাণ্ড ঝিল আছে। এই ঝিল বা সরোবরের ধারে আছে নয়নাদেবীর এক মন্দির। পাহাড় ফেটে যাওয়ায় প্রাচীন মন্দিরটি ১৮৮০ খৃঃ মাটির নীচে চলে যায়। পরে আবার নূতন মন্দির নির্মিত হয়েছে। কুমায়ুন অঞ্চলে এই নয়নাদেবীর বড় মান।[৬]

কৌষিকীস্থান— আলমোড়ার কাষায়পর্বতের উপর কৌষিকীদেবীর স্থান। এই স্থানটিকে সিদ্ধস্থান মনে করা হয়। দেবীর ভক্তরা দূরদূরান্তর থেকে এসে এখানে পুরশ্চরণাদি করেন।[৭]

কার্ত্তিকেয়—কোনো কোনো পুরাণে কার্ত্তিকেয় বলে একটি দেবীস্থানের উল্লেখ আছে। এখানকার দেবী যশস্করী, শঙ্করী বা অতিশঙ্করী। অনুমান করা হয় এই স্থানটি আলমোড়ার কাছে আধুনিক বৈদ্যনাথ।

১ ঐ, পৃঃ ৩৭৪ ২ ঐ, পৃঃ ৩৭৩ ৩ ক প অ, পৃঃ ৩৭৪ ৪ ঐ
৫ ঐ, পৃঃ ৩৭২ ৬ ঐ, পৃঃ ৩৫১ ৭ ঐ, পৃঃ ৩৩৭

কৈলাস ও মানসসরোবর—হিমালয়ের দুটি সুপ্রসিদ্ধ তীর্থ কৈলাস ও মানসসরোবর রয়েছে ভারতের রাষ্ট্রসীমার বাইরে তিব্বতে। দুটি তীর্থকেই দেবীস্থান মনে করা হয়। কৈলাসে দেবী ভুবনেশ্বরী।

মানসসরোবরের দেবীর নাম কুমুদা, মতান্তরে গৌরী, মতান্তরে দাক্ষায়ণী। এখানে পড়েছিল দেবীর দক্ষিণহস্ত বা দক্ষিণহস্তার্দ্ধ, মতান্তরে বামহস্ত।

দেবীমন্দির—উত্তরপ্রদেশের নানা স্থানে আছে বিখ্যাত দেবীমন্দির। এই-সব মন্দিরে রীতিমত পূজার্চনা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কাশীর রামনগরের দুর্গামন্দির,[১] উন্নাও জেলার বাঁগরমউ নামক স্থানের শ্রীশ্রীরাজরাজেশ্বরী শ্রীবিদ্যামন্দির,[২] হোশংগাবাদের বগলামুখীমন্দির,[৩] ফরুরুখাবাদ জেলার তিরওয়ার মহাত্রিপুরসুন্দরীর মন্দির (স্থানীয় লোকেরা বলেন অন্নপূর্ণা-মন্দির),[৪] বাঁদার মাহেশ্বরীমন্দির প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়।

নেপাল—হিমালয়ের অন্যতম স্বাধীন রাজ্য নেপাল ভারতের রাষ্ট্রসীমার বাইরে কিন্তু একে ভারতের সাংস্কৃতিক সীমার অন্তর্ভুক্ত অবশ্যই বলা যায়। কুব্জিকাতন্ত্র, জ্ঞানার্ণবতন্ত্র প্রভৃতিতে নেপালকে পীঠস্থান বলা হয়েছে। এখানে পড়েছিল দেবীর জানু, মতান্তরে দক্ষিণজঙ্ঘা। পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম পুণ্যদা, মতান্তরে মহামায়া বা নবদুর্গা।

কাটমাণ্ডু থেকে অল্পদূরে বাগমতীর তীরে একটি পীঠস্থান আছে। এখানে মন্দিরও আছে। মন্দিরটি গুহ্যেশ্বরীর মন্দির বলে পরিচিত। মন্দিরে মূর্তি নাই, আছে প্রস্তরখণ্ড। এটি দেবীর প্রতীক। স্থানীয় লোকে এই পীঠকে মহাপীঠ মনে করেন। তাঁদের ধারণা এখানে দেবীর গুহ্যস্থান পড়েছিল।[৫] সম্ভবতঃ এই পীঠই তন্ত্রবর্ণিত নেপালের পীঠ।

মিথিলা— মিথিলা একটি দেবীপীঠ। নেপাল তরাইয়ের আধুনিক জনকপুরকে প্রাচীন মিথিলাপীঠ মনে করা হয়। এখানে দেবীর বামস্কন্ধ পড়েছিল। পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবী উমা, মতান্তরে মহাদেবী।

জনকপুরে জানকীদেবীরও মন্দির আছে।

কোকামুখ—শিবচরিতে কোকামুখ নামে একটি মহাপীঠের উল্লেখ আছে। দেবী কোক বা কুব্জি বা কোকেশ্বরী। নেপালের আধুনিক বরাহক্ষেত্র বা বরাহক্ষেত্রে সেই পীঠের স্থান নির্দেশ করা হয়।

কুলকুল্যাস্থান—কৃষ্ণনগর থেকে মাইল ছয়েক দূরে আছে এক প্রাচীন বন। সেই বনের মাঝখানে কুল্যানদীর তীরে আছে একটি দেবীস্থান। এটিকে দুর্গাদেবীর স্থান

১ ক শ অ, পৃঃ ৬৮১-৮২ ২ ঐ, পৃঃ ৬৭০-৭১ ৩ ঐ, পৃঃ ৬৮৩ ৪ ঐ, পৃঃ ৬৪৪

৫ দেবতাত্মা হিমালয়, দেশ, ২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১, পৃঃ ৩৫৭-৫৮

মনে করা হয়। লোকের ধারণা কুল্যানদীর কূলে এই দেবীস্থান থাকার জন্য দেবীর নাম হয়েছে কুলহুল্যা। দেবীর কোনো মন্দির নাই, মূর্তিও নাই। তবে চারদিকে দেওয়াল গেঁথে দেবীস্থানটিকে ঘিরে দেওয়া হয়েছে।[১]

মনে হয় দেবী কুরুকুল্লা কুলহুল্যা বা দুর্গাদেবীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। কুরুকুল্লাও সম্ভবতঃ কোনো স্থানীয় দেবী বা কোনো কৌমের দেবী। বৌদ্ধরা প্রথমে তাঁকে দেবমণ্ডলে গ্রহণ করেন।

দেবীমন্দির— নেপালে কয়েকটি প্রসিদ্ধ দেবীমন্দিরও আছে। সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ক্ষীরভবানীর মন্দির।

দেবীপাটনে আছে পটেশ্বরীর মন্দির। জনপ্রবাদ মহাভারতের যুগে কর্ণ এই দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিক্রমাদিত্য পরে দেবীর মন্দির করিয়ে দেন। মন্দিরটি এক টিলার উপর নির্মিত। পাশেই আছে কুণ্ড। বাসন্তী নবরাত্রির সময় এখানে খুব বড় মেলা হয়। এ জায়গাটা কানফাটা যোগীদের একটি বড় কেন্দ্র।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় পটেশ্বরী বাংলাদেশেও একেবারে অপরিচিতা নন। শান্তিপুরে কার্তিকমাসে রাসের সময় যে-শোভাযাত্রা বেরোয় তাতে কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে পটে অঙ্কিত এক দেবীমূর্তি বের করা হয়। দেবীকে বলা হয় পটেশ্বরী। শান্তিপুরের রামনগর-পাড়াকে পটেশ্বরীতলা বা পটেশ্বরীপাড়া বলা হয়।[২]

বিহার

মগধ— দক্ষিণবিহারের পাটনা-গয়া অঞ্চলের প্রাচীন নাম মগধ। মগধ একটি দেবীপীঠ। এখানে দেবীর দক্ষিণজঙ্ঘা পড়েছিল। পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবী সর্বানন্দময়ী।

গয়া—সুবিখ্যাত তীর্থ গয়া। এটিও একটি দেবীস্থান। দেবী গয়েশ্বরী, মতান্তরে মাঙ্গল্যকোটিকা।

বোধগয়া—গয়ার কাছেই বোধগয়া। ভগবান্ বুদ্ধের বোধিলাভের স্থান। মহানীলতন্ত্রাদি গ্রন্থে এই স্থানকে মহাবোধি নামক দেবীস্থান বলা হয়েছে। দেবীর নাম মহাবুদ্ধি।

মাতঙ্গাশ্রম— বোধগয়ার পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে ফল্গুনদী। নদীর এপারে বোধগয়া, ওপারে মাতঙ্গাশ্রম। মহানীলতন্ত্রাদিতে যে-মাতঙ্গ (মাতঙ্গবাপী) বলে দেবীস্থানের উল্লেখ আছে তা এই মাতঙ্গাশ্রম। জায়গাটির আধুনিক নাম বকরৌর। এখানকার দেবী মাতঙ্গী।

মন্দার—কোনো কোনো পুরাণে মন্দার নামক দেবীস্থানের উল্লেখ আছে। ভাগলপুর

ক প অ, পৃঃ ৬৬৫ ২ দ্রঃ শান্তিপুর-পরিচয়, ২য় ভাগ, ১ম সং, ১৩৪৯ বাং, পৃঃ ১৮০

জেলার মন্দারপাহাড় সেই স্থান হতে পারে। মন্দারের দেবী কামচারিণী, মতান্তরে ভুবনেশ্বরী।

উগ্রতারাপীঠ—ভাগলপুর জেলার একটি গ্রাম মহিষী। স্থানীয় লোকে একে উগ্রতারা-স্থান বলে জানেন এবং একে প্রাচীন পীঠস্থান মনে করেন। তাঁদের বিশ্বাস এখানে পড়েছিল দেবীর নেত্র। তান্ত্রিকরা বলেন এখানে বশিষ্ঠ তারাদেবীর সাধনা করে অভীষ্ট লাভ করেছিলেন। এখানে তারা, একজটা এবং নীলসরস্বতীর মূর্তি আছে। তারাদেবীর মাথার কাছে আছে 'অক্ষোভ্য-গুরু'র মূর্তি।[১]

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে দেবী বৌদ্ধ তারা। পরে হিন্দু তান্ত্রিকদের হাতে পড়ে ইনি দ্বিতীয়া মহাবিদ্যা হয়ে পড়েছেন।

এখানে মহিষমর্দিনী দুর্গা, কালী, ত্রিপুরসুন্দরী এবং তারানাথ শিবের মূর্তিও আছে।[২]

এই স্থানে আগে কোনো মন্দির ছিল না। প্রায় পৌনে-দুশ বছর আগে দ্বারভাঙ্গার এক মহারানী এখানে মন্দির করিয়ে দেন।[৩]

চণ্ডী ও কাত্যায়নীর স্থান—এখান থেকে মাইল পঁচিশ দূরে পূবদিকে বরাহপুর নামক গ্রামে চণ্ডীদেবীর অতি প্রাচীন মন্দির আছে আর মাইল ত্রিশেক দক্ষিণে ধমারঘাট-রেলস্টেশনের কাছে আছে কাত্যায়নীর মন্দির। এই দুটি দেবীস্থানই জাগ্রত বলে লোকে মনে করে।[৪]

শোণপীঠ— পীঠনির্ণয়াদি গ্রন্থে শোণপীঠের উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানকার দেবী নর্মদা, মতান্তরে ভদ্রা, মতান্তরে কণকেশ্বরী। এখানে পড়েছিল দেবীর নিতম্ব, মতান্তরে নিতম্বাংশ। শোণনদী পাটনার কাছে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। শোণপীঠ বলতে শোণ-নদীটিকেই বুঝান হয়েছে, না নদীর সঙ্গমস্থলকে বুঝান হয়েছে কিংবা নদীর ধারে কোনো স্থানকে বুঝান হয়েছে বলা যায় না। আলোচ্য গ্রন্থাদিতে অনেক সময় গোটা নদীকেই পীঠ বলা হয়েছে। তবে কোনো কোনো পুরাণে শোণসঙ্গম নামক দেবীস্থানের উল্লেখ আছে আর দেবীর নাম দেওয়া হয়েছে সুভদ্রা। এতে অনুমান হয় শোণ আর শোণসঙ্গম একই দেবীস্থান।

বটপর্বতিকা—মহানীলতন্ত্রাদিতে বটপর্বতিকা বলে একটি দেবীস্থানের কথা পাওয়া যায়। পাটনা জেলার পাথরঘাটার কাছে বটেশ্বরপর্বতকে বটপর্বতিকা বলে মনে করা হয়। এখানকার দেবী পঞ্চবর্ণা।

১ ক শ অ, পৃঃ ৬৬৯   ২ ঐ   ৩ ঐ,   ৪ ঐ, পৃঃ ৬৭০

ত্রিহুত— শিবচরিতে ত্রিহুত-মহাপীঠের উল্লেখ আছে। পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবী ভ্রামরী। এখানে দেবীর বামপদ পড়েছিল। স্থানটির প্রাচীন নাম তীরভুক্তি।

বৈদ্যনাথধাম— বৈদ্যনাথধাম বিখ্যাত শৈব তীর্থ। এটি শাক্তপীঠও বটে। এখানে পড়েছিল দেবীর হৃদয়। দেবীর নাম অরোগা বা আরোগ্যা, মতান্তরে জয়দুর্গা বা নবদুর্গা।

আসাম

কামরূপ— গৌহাটী সহরের অনতিদূরে ব্রহ্মপুত্র নদীর ধারে পাহাড়ের উপর কামাখ্যা মহাপীঠ। এইটিই প্রাচীন চতুষ্পীঠের অন্যতম কামরূপপীঠ। একাধিক তন্ত্রে এবং পুরাণে এই মহাপীঠের গৌরব ঘোষণা করা হয়েছে। একে কামরূপ-কামাখ্যাও বলা হয়। পীঠনির্ণয়ে এই পীঠের নাম দেওয়া হয়েছে কামগিরি। এখানে পড়েছিল দেবীর মহামুদ্রা বা যোনি। বিভিন্ন গ্রন্থে পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবীর এই নামগুলি পাওয়া যায়—কামাখ্যা, নীলপার্বতী, কামেশ্বরী, কালী। ভৈরবের নাম উমানন্দ, রাবানন্দ, রামানন্দ, শিবানন্দ, কামেশ্বর।

সমগ্র কামাখ্যাপাহাড়টিই পীঠস্থান। তবে পাহাড়ের যে-অংশে যোনিপীঠ রয়েছে তার নাম নীলপর্বত বা নীলকূট। এইটিই কামগিরি। তন্ত্রচূড়ামণি-মতে কামগিরিতে মাতঙ্গী, বগলা, কমলা প্রভৃতি দেবীদেরও পীঠ আছে।

পীঠনির্ণয়ে যে-পীঠকে গৌরীশিখর এবং শিবচরিতে গৌরীশেখর বলা হয়েছে, অনুমান করা হয়, সেটি কামাখ্যা পাহাড়েরই অংশবিশেষ। কামাখ্যাতে দশমহাবিদ্যার মন্দির আছে।

জয়ন্তীপীঠ— ইংরেজ আমলের শ্রীহট্ট জেলার কলাজোর-বাউরভোগ জয়ন্তীপীঠ বা জয়ন্তাপীঠের স্থান। এই স্থানটি বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। এখানে পড়েছিল দেবীর বামজঙ্ঘা। পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবী জয়ন্তী।

মহালক্ষ্মীস্থান— শ্রীহট্ট সহরের (পূর্বপাকিস্তান) কাছে সুর্মানদীর অপর পারে একটি দেবীপীঠ আছে। এখানে পড়েছিল দেবীর গ্রীবা। পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবী মহালক্ষ্মী। ভৈরব সর্বানন্দ।

বাংলা

চন্দ্রনাথ— চাটগাঁ (পূর্বপাকিস্তান) জেলার চন্দ্রনাথপাহাড় বিখ্যাত শৈব তীর্থ। এই পাহাড়ের সীতাকুণ্ড নামক স্থান দেবীপীঠ। এখানে পড়েছিল দেবীর দক্ষিণহস্ত। পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবী ভবানী ; ভৈরব চন্দ্রশেখর।

উদয়পুর—ত্রিপুরারাজ্যের উদয়পুরে আছে একটি প্রাচীন পীঠ। এখানে পড়েছিল দেবীর দক্ষিণপদ। এখানকার দেবী ত্রিপুরা বা ত্রিপুরসুন্দরী। ১৫০১ খৃঃ মহারাজ ধর্মমাণিক্য এখানে দেবীর একটি মন্দির নির্মাণ করান।

সুগন্ধাপীঠ— শিবচরিতে সুগন্ধা-মহাপীঠের উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে পড়েছিল দেবীর নাসিকা। দেবী সুগন্ধা। স্থানটি বরিশাল (পূর্বপাকিস্তান) জেলার বর্তমান শিকারপুর।

যশোরেশ্বরীপীঠ— পীঠনির্ণয়ে আছে যশোরে পড়েছিল দেবীর পাণিপদ্ম। এই পীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী যশোরেশ্বরী। বর্তমান খুলনা (পূর্বপাকিস্তান) জেলার ঈশ্বরীপুরে এই পীঠের স্থান নির্ণয় করা হয়।

পুণ্ড্র—শিবচরিতে পুণ্ড্র নামে একটি উপপীঠের উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে পড়েছিল দেবীর লোম। পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবী সর্বাক্ষিণী। কোনো কোনো পুরাণে পুণ্ড্রবর্ধন নামে দেবীস্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। পুণ্ড্র আর পুণ্ড্রবর্ধন একই। স্থানটি আধুনিক বগুড়া (পূর্বপাকিস্তান) জেলার মহাস্থানগড়।

করতোয়াতট—করতোয়াতট একটি পীঠস্থান। এখানে পড়েছিল দেবীর বামকর্ণ। এখানকার দেবী অপর্ণা। করতোয়ানদীর তীরে বগুড়া জেলার ভবানীপুর গ্রামে এই পীঠের স্থান নির্ণয় করা হয়।

দেবীকোট্ট—একাধিক গ্রন্থে দেবীকোট্ট নামে একটি পীঠের উল্লেখ আছে। এই পীঠের দেবী মহাভাগা, মতান্তরে অখিলেশ্বরী। দিনাজপুর জেলার-বাণগড়কে এই পীঠস্থান মনে করা হয়।

জল্পেশ্বরপীঠ— মহানীলতন্ত্রাদিতে জল্পেশ্বরপীঠের উল্লেখ আছে। এখানকার দেবী ত্রিশূলিনী। অনুমান করা হয় এই জল্পেশ্বর আর জলপাইগুড়ির জল্লেশ্বর একই স্থান।

কিরীটকোণাপীঠ—মুর্শিদাবাদ জেলার লালবাগের কাছে বটনগরে একটি পীঠস্থান আছে। একে বলা হয় কিরীটপীঠ বা কিরীটকোণাপীঠ। এখানে পড়েছিল দেবীর কিরীট। পীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নানা নাম পাওয়া যায়; যথা—ভুবনেশী, বিমলা, সিদ্ধিরূপা, কিরীটেশ্বরী।

অট্টহাসপীঠ— বীরভূম জেলার আহমদপুর-কাটোয়া রেলপথের পচন্তি-ষ্টেশন থেকে মাইল কয়েক দূরে অট্টহাসপীঠ। এখানে পড়েছিল দেবীর ওষ্ঠ। পীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চামুণ্ডা, মতান্তরে মহানন্দা, মতান্তরে ফুল্লরা।

নন্দীপুরপীঠ— পূর্ব-রেলপথের লুপলাইনের সাঁইথিয়া-ষ্টেশনের কাছে নন্দীপুরপীঠ। এখানে পড়েছিল দেবীর হার। এখানকার দেবী নন্দিনী।

কংকালীপীঠ— উক্ত রেলপথের বোলপুর-শান্তিনিকেতন-ষ্টেশন থেকে মাইল

পাঁচেক দূরে কংকালীপীঠ। এখানে দেবীর কঙ্কাল[1] পড়েছিল মনে করা হয়। পীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বেদগর্ভা বা দেবগর্ভা। বাংলাদেশে রচিত কোনো কোনো গ্রন্থে এই স্থানটিকেই মনে হয় কাঞ্চী বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

তারাপীঠ—বীরভূমের সব চেয়ে বিখ্যাত পীঠ তারাপীঠ। এটি সিদ্ধ পীঠ। এ কালে বামা ক্ষেপার মতো সিদ্ধ মহাপুরুষের সাধনভূমি বলে এই পীঠের নাম বিশেষভাবে ছড়িয়েছে। রামপুরহাট থেকে কয়েক মাইল দূরে তারাপুর গ্রামে এই পীঠস্থান। এখানে পড়েছিল দেবীর 'নেত্রাংশতারা'। এখানকার দেবী তারা বা তারিণী।

নলাহাটীপীঠ— নলাহাটীপীঠ নলহাটি-রেলষ্টেশনের খুবই কাছে। এখানে পড়েছিল দেবীর নলা, মতান্তরে শিরানালী। পীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কালী, মতান্তরে শেফালিকা।

বক্রেশ্বরপীঠ—দুবরাজপুর-রেলষ্টেশন থেকে পাঁচ ছ মাইল দূরে বক্রেশ্বরপীঠ। এখানে পড়েছিল দেবীর মন (পাঠান্তর মুণ্ড); মতান্তরে দক্ষিণবাহু। এখানকার দেবী মহিষমর্দিনী, মতান্তরে বক্রেশ্বরী।

বহুলাপীঠ— বর্ধমান জেলার কাটোয়ার কাছে কেতুগ্রামে একটি পীঠস্থান আছে, নাম বহুলাপীঠ বা বাহুলাপীঠ। এখানে পড়েছিল দেবীর বামবাহু। পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবী বহুলা বা বাহুলা।

যোগাদ্যাপীঠ— কাটোয়ার কাছে ক্ষীরগ্রামে যোগাদ্যাপীঠ অবস্থিত। এখানে পড়েছিল দেবীর পৃষ্ঠ, মতান্তরে পাদাঙ্গুষ্ঠ। এখানকার দেবী যোগাদ্যা।

ভদ্রেশ্বর—মহানীলতন্ত্রাদিতে দেবীস্থান ভদ্রেশ্বরের উল্লেখ আছে। এখানকার দেবী রমা, মতান্তরে ভদ্রা বা ভদ্রেশ্বরী। সম্ভবতঃ হুগলী জেলার ভদ্রেশ্বর এই পীঠস্থান।

রাজবোলহাট— মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে হুগলী জেলার দুটি[2] পীঠস্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়; রাজবোলহাট আর বালিভাঙা। রাজবোলহাটে পড়েছিল দেবীর বামহস্ত। দেবীর নাম বিশাললোচনী। জায়গাটা শ্রীরামপুরের কাছে।

১ দেবীদেহ খণ্ড খণ্ড হয়ে ছড়িয়ে পড়লে আস্ত কঙ্কাল থাকতে পারে না। যাঁরা কঙ্কালের কথা বলেছেন মনে হয় এদিকে তাঁদের নজর পড়ে নি। তবে বাংলা ভাষায় কঙ্কাল শব্দ কাঁকাল অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। সেই অর্থ গ্রহণ করলে অবশ্য কল্পনায় কোনো অসঙ্গতি থাকে না। তবে আমাদের মনে হয় কংকালমালিনী দেবীর স্থান বলে এর নাম হয়েছে কংকালীপীঠ।

২ এই পীঠ দুটির উল্লেখ সংস্কৃত তন্ত্রাদিতে চোখে পড়ে নি। জনসাধারণের কাছে একদা পীঠের বিশেষ গৌরব ছিল। এইজন্য স্থানীয় প্রসিদ্ধ দেবীস্থানকেও পীঠ বলে প্রচার করার একটা ইচ্ছা দেবীভক্তদের মনে থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। ষোড়শ শতকের বাংলা মঙ্গলকাব্য থেকে যে-দুটি পীঠের উল্লেখ করা গেল সে-দুটিকে এই ইচ্ছার সাফল্যের দৃষ্টান্ত মনে করা যেতে পারে। অবশ্য, সংস্কৃত তন্ত্রাদিতে বর্ণিত অনেক পীঠেরও এই একই উদ্ভবকাহিনী অনুমান করা যায়।

বালিডাঙ্গা—বালিডাঙ্গায় পড়েছিল দেবীর দক্ষিণহস্ত। এখানকার দেবী রাজেশ্বরী।

কালীঘাট— দক্ষিণ-কলিকাতার কালীঘাট বিখ্যাত পীঠস্থান। এখানে পড়েছিল দেবীর দক্ষিণপদাঙ্গুলি। পীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কালী।

সাগরসঙ্গম—মহানীলতন্ত্রে সাগরসঙ্গমকেও দেবীস্থান বলা হয়েছে। এখানকার দেবী স্বাহা।

তমোলিপ্ত— মেদিনীপুর জেলার তমলুকের প্রাচীন নাম তাম্রলিপ্তি, তাম্রলিপ্ত বা তমোলিপ্ত। মহানীলতন্ত্রাদির মতে তমোলিপ্ত একটি দেবীস্থান। এখানকার দেবী তমোঘ্নী।

বিভাসপীঠ—তমলুক সহরের কাছে আছে একটি পীঠ—বিভাসপীঠ। এখানে দেবীর বামগুল্ফ পড়েছিল। পীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম ভীমরূপা।

বাংলাদেশে দেবীপূজার ব্যাপক প্রচলন। এই অঞ্চলে দেবীস্থানও অনেক। এখানে প্রধানতঃ তন্ত্র-পুরাণাদিতে নির্দিষ্ট দেবীস্থানগুলিরই শুধু উল্লেখ করা গেল।

উড়িষ্যা

পুরী— উড়িষ্যার সব চেয়ে বিখ্যাত তীর্থ পুরী বা জগন্নাথক্ষেত্র। এর প্রাচীন নাম নীলাচল, পুরুষোত্তম। এটিও একটি দেবীপীঠ। এখানকার দেবী বিমলা; ভৈরব জগন্নাথ।

জগন্নাথ-মন্দিরের হাতার মধ্যেই বিমলাদেবীর মন্দির। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় শারদীয়া দুর্গাপূজার সময় মহাষ্টমীর দিন গভীর রাত্রে বিমলার কাছে ছাগবলি হয়। পুরীর আর কোনো দেবালয়ে পশুবলি হয় না।

বিমলামন্দির থেকে কিছু দূরে নীলমাধবের মন্দিরের কাছে লক্ষ্মীমন্দির। তার পশ্চিম দিকে সর্বমঙ্গলা কালীর মন্দির। এই মন্দিরগুলিতে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত।

বিরজাক্ষেত্র—বিরজ, বিরজপুর, বিরজা বা বিরজাক্ষেত্র একটি পীঠস্থান। স্থানটি কটক জেলার বর্তমান যাজপুর। নাভিক্ষেত্র, নাভিগয়া, যাজপুর, যাগপুরী প্রভৃতি নামেও এই তীর্থস্থানটির উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানকার দেবীর নাম বিমলা বা বিজয়া বা বিরজা। এখানে দেবীর নাভি পড়েছিল।

বৈতরণীর দশাশ্বমেধঘাট থেকে মাইল আড়াই দূরে সহরের দক্ষিণ দিকে বিরজাদেবীর মন্দির। এটিকেই পীঠস্থান মনে করা হয়। মন্দিরে আছে দেবীর অষ্টাদশ-অঙ্গুলিপরিমিতা পাষাণময়ী মূর্তি।[১]

১ তন্ত্র পৃঃ ৫০৫

বৈতরণীর তীরে অষ্টমাতৃকার মণ্ডপ। মণ্ডপে আছে নীলপাথরের তৈরী মাতৃকামূর্তি। মূর্তিগুলি পূর্ণবয়স্ক মানুষের চেয়েও উঁচু। এ ছাড়া, নদীর ধারে কালী, শচী, বিমলা, লক্ষ্মী, সাবিত্রী, পার্বতী প্রভৃতির বহু মূর্তি দেখা যায়।[১]

একাম্রপীঠ—আধুনিক ভুবনেশ্বর প্রাচীন একাম্রপীঠ। এখানকার দেবী কীর্তিমতী, মতান্তরে একা।

ভুবনেশ্বরে অনেক প্রাচীন দেবীমন্দির আছে। পাদহরা-সরোবরতীরে আছে একশ আটটি যোগিনীর মন্দির।[২]

পাদহরা থেকে একটু দূরে পার্বতীমন্দির। কারুকার্যের দিক্ দিয়ে এটি ভুবনেশ্বরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মন্দির।

কটক—কটকের কটকচণ্ডীর মন্দির প্রসিদ্ধ। কটকচণ্ডীকে কটকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনে করা হয়।

ভদ্রক—ভদ্রক সহরের ভদ্রকালীর মন্দিরটি এ অঞ্চলে বিখ্যাত। বলা হয় ভদ্রকালীর নাম থেকেই স্থানের নাম হয়েছে ভদ্রক।

মধ্যপ্রদেশ

অমরকণ্টক—মধ্য প্রদেশে শোন এবং নর্মদা নদীর উৎপত্তিস্থলে দেবীস্থান অমরকণ্টক অবস্থিত। এখানকার দেবী চণ্ডী, মতান্তরে অমরেশী।

অমরেশপীঠ—নিমার জেলায় খাণ্ডোয়ার উত্তর-পশ্চিমে নর্মদানদীর তীরে অমরেশপীঠ। এখানকার দেবী চণ্ডী বা মহেশ্বরী।

অবন্তীপীঠ—মহানীলতন্ত্রে অবন্তীপীঠের উল্লেখ আছে। এই পীঠের দেবী অতিপাবনী। কিন্তু শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে[৩] অবন্তীকে কালিকার স্থান বলা হয়েছে। সম্ভবতঃ এই উভয়মতে বিরোধ নেই। দেবী কালিকার বিশেষণ অতিপাবনী হতে পারে। কাজেই, মহানীলতন্ত্রে কালিকাকেই অতিপাবনী বলে উল্লেখ করা সম্ভবপর। অথবা ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে উভয় দেবী পৃথক্‌ও হতে পারেন। বর্তমান ইন্দোর-ভূপাল-গোয়ালিয়র অঞ্চলে প্রাচীন অবন্তী দেশের অবস্থান নির্দেশ করা হয়।

উজ্জয়িনীপীঠ— অবন্তীর রাজধানী উজ্জয়িনী একটি পীঠস্থান। এখানে পড়েছিল দেবীর কূর্পর। পীঠাধিষ্ঠাত্রী মঙ্গলচণ্ডী, মতান্তরে মহাকালী। আধুনিক উজ্জয়িনী এবং প্রাচীন উজ্জয়িনী একই স্থান।

১ ভা ব্র, পৃঃ ৫০৮ ২ ক প অ, পৃঃ ৩৩২

৩ অবন্তীসংজ্ঞকো দেশঃ কালিকা তত্র তিষ্ঠতি।—সুন্দরীখণ্ড, ৭।৩২

ভৈরবপীঠ— মহানীলতন্ত্রে ভৈরব নামে একটি পীঠের উল্লেখ আছে। পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম ভৈরবী ; ভৈরবের নাম ভৈরব। অনুমান করা হয় উজ্জয়িনীর প্রসিদ্ধ মহাকাল বা কালভৈরবের স্থানই এই ভৈরবপীঠ।

উজ্জয়িনীর দেবীমন্দির— উজ্জয়িনী সহরে রুদ্রসাগর নামক দীঘির ধারে হরসিদ্ধি-দেবীর বিখ্যাত মন্দির। লোকপ্রসিদ্ধি ইনি বিক্রমাদিত্যের আরাধ্যা দেবী। লোকের এই ধারণা সত্য কিনা যাচাই করার উপায় নেই। তবে ইনি পরমারবংশীয় রাজাদের কুলদেবী বটেন। স্থানীয় লোকেরা মনে করে হরসিদ্ধি জাগ্রতদেবী। ইনি বৈষ্ণবী। এঁর কাছে পশুবলি হয় না।[১]

সহর থেকে মাইল খানেক দূরে গড়ের কালিকাদেবীর স্থান। এখানে দেবীর মন্দির আছে। মন্দিরে আছে বিরাট মূর্তি। দেবীকে লোকে বলে গড়ের কালী, মহাকালীও বলে। লোকের বিশ্বাস ইনিই মহাকবি কালিদাসের আরাধ্যা দেবী। এখানে নবরাত্রির সময় খুব ধুমধাম করে পূজা হয়।[২]

সহর থেকে মাইল দুই দূরে শিপ্রানদীর তীরে আরেকটি কালীমন্দির আছে। মন্দিরের অদূরে মহাশ্মশান। লোকে বলে এই স্থানে বিক্রমাদিত্য বীরাচারে কালিকার সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।[৩]

উজ্জয়িনীতে এ ছাড়া চামুণ্ডামন্দির, সরস্বতীমন্দির প্রভৃতি আরও দেবীমন্দির আছে। সরস্বতীমন্দিরটি খুব প্রাচীন। এই মন্দিরে অনেকগুলি মাতৃকামূর্তি আছে। জনপ্রবাদ বিক্রমাদিত্য এই মন্দিরে এসে পূজা দিতেন।[৪]

কনকাবতীর মন্দির— গড়ের কালীর মন্দির থেকে মাইল বার দূরে করেডী গ্রামে অষ্টভুজা দেবী কনকাবতী বা করেডীমাতার প্রাচীন মন্দির। জনশ্রুতি মহারাজ শিবাজী এখানে এসে দেবীদর্শন করেছিলেন।[৫]

ভগবতীমন্দির—দেওয়াসের ভগবতীমন্দির এ অঞ্চলে বিখ্যাত। কনকাবতীর মন্দির থেকে এই মন্দির বেশী দূর নয়।

কালী, কনকাবতী আর ভগবতী এই তিন দেবীর স্থান নিয়ে একটি শক্তি-ত্রিকোণ হয়েছে। অনেক যাত্রী এই ত্রিকোণ ঘুরে দেবীদর্শন করেন।

মহেশ্বরপুর—মহেশ্বরপুর একটি প্রাচীন দেবীস্থান। এই স্থানের অন্য প্রাচীন নাম মাহেশ্বরীপুরী, মাহেশ্বরপুর এবং মাহিষ্মতী। এখানকার দেবী স্বাহা। জায়গাটি ইন্দোরে।

---

১ ক শ অ, পৃঃ ৬৭৬-৬৭৭ ২ ক শ অ, পৃঃ ৬৭৭ ৩ ভা ত্র, পৃঃ ৬৮৮-৬৮৯
৪ ঐ, পৃঃ ৬৮৯ ৫ ক শ অ, পৃঃ ৬৭৮

চিত্রকূট—বুন্দেলখণ্ডের চিত্রকূট একটি প্রাচীন দেবীস্থান। এখানকার দেবী সীতা।

ভেড়াঘাট—জব্বলপুর সহর থেকে মাইল বার দূরে ভেড়াঘাট জলপ্রপাত। এখানে মর্মরপাথরের পাহাড়ের উপর গৌরীশঙ্করের মন্দির। এই মন্দিরে আছে চৌষট্টি যোগিনীর মানুষপ্রমাণ মূর্তি। মূর্তিগুলির ভগ্নদশা। এখানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়।[১]

রামগিরিপীঠ— কুব্জিকাতন্ত্রাদিতে রামগিরি নামে দেবীস্থানের উল্লেখ আছে। রামগিরি একটি পীঠস্থান। এখানে পড়েছিল দেবীর স্তন। এই পীঠের দেবী শিবানী, মতান্তরে ত্রিসন্ধ্যা। নাগপুরের নিকটবর্তী রামটেককে রামগিরিপীঠ মনে করা হয়।

শ্রীপুর—মহানীলতন্ত্রে শ্রীপুর নামে একটি দেবীস্থানের উল্লেখ আছে। অনুমান করা হয় রায়পুর জেলার শিরপুরই সেই শ্রীপুর।

দাক্ষিণাত্য

মহেন্দ্রপুর— জ্ঞানার্ণবতন্ত্রে মহেন্দ্র বা মহেন্দ্রপুর নামক দেবীস্থানের কথা আছে। গঞ্জাম জেলার বিখ্যাত মহেন্দ্রপর্বতকে এই মহেন্দ্রপুর মনে করা হয়। এখানকার দেবী মহান্তকা, মতান্তরে জগদীশ্বরী।

পীঠপুরম্—গোদাবরী জেলার পীঠপুরমে আছে কুক্কুটেশ্বর মহাদেবের মন্দির এবং তারই পাশে পার্বতীমন্দির।

এই প্রসঙ্গে দক্ষিণভারতের একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যায়। যেখানে কোনো প্রসিদ্ধ শিবমন্দির থাকে সেখানেই তার পাশে পার্বতীমন্দিরও থাকে।

সপ্তগোদাবরীপীঠ— রাজমাহিন্দ্রী বা রাজমুন্দ্রী (গোদাবরী জেলা) থেকে দশ বার মাইল দূরে গোদাবরীনদী সপ্তধারায় মিলিত হয়েছে। এইজন্য, স্থানটিকে বলা হয় সপ্তগোদাবরীসঙ্গম।[২] এইটিই নীলতন্ত্রাদিতে বর্ণিত সপ্তগোদাবরীপীঠ। পীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রী বা অখিলেশ্বরী।

মাতাপুর— অন্ধ্রের আদিলাবাদের কাছে মাহুর-এর প্রাচীন নাম মাতাপুর। এটি মহারাষ্ট্রপ্রান্তের একটি প্রাচীন দেবীস্থান। এখানকার দেবী রেণুকা, একবীরা এবং যমাঈ নামে প্রসিদ্ধ। ইনি বিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় সাধক একনাথের কুলদেবী।[৩]

কালহস্তী— নেল্লোর জেলায় নাগোরী-পর্বতমালার পাদদেশে সুবর্ণমুখীনদীর তীরে বিখ্যাত শৈবতীর্থ কালহস্তী। এখানে কালহস্তীশ্বরের মূলমন্দিরের কাছেই পার্বতী এবং 'দুর্গাম্বা' (দুর্গাখ্যা ?) দেবীর পৃথক্ পৃথক্ মন্দির আছে।[৪]

১ ক শ অ, পৃঃ ৬৪০ ২ তা ত্র, পৃঃ ৫২৩
৩ ক শ অ, পৃঃ ৪১৭ ৪ দ ভা তী, পৃঃ ৪৭

মাদ্রাজ—মাদ্রাজ সহরে একটি বিখ্যাত দেবীমন্দির আছে। মন্দিরটি দেবী মাতাকুড়ির। দেবীর প্রতি স্থানীয় লোকেদের অগাধ শ্রদ্ধাভক্তি।[১]

মহাবলিপুরম্— চিঙ্গলিপুট জেলায় সমুদ্রের ধারে প্রাচীন দেবস্থান মহাবলিপুরম্। এখানে আছে অনেকগুলি দেবমন্দির—বেশীর ভাগ শিব ও বিষ্ণুর মন্দির। একটি দুর্গামন্দিরও আছে। একটি মন্দিরে আছে শিবপার্বতীর বিগ্রহ। মহানীলতন্ত্রে যে-বলিপুরের উল্লেখ আছে কেউ কেউ অনুমান করেন সেটি সম্ভবতঃ এই মহাবলিপুরম্।

কাঞ্চী—কাঞ্চী একটি প্রাচীন পীঠ। পীঠদেবীর নাম কনককাঞ্চী, দেবগর্ভা বা বেদগর্ভা। কাঞ্চীকে দক্ষিণভারতের কাশী বলা হয়। কাঞ্চী বর্তমান কাঞ্জীভরম্।

কাঞ্জীভরমের কামাক্ষীদেবীর মন্দির প্রসিদ্ধ। দেবীমূর্তিটিও বড় সুন্দর। দক্ষিণে এই দেবীমন্দিরকে বলে কামকোটিতীর্থ। কিংবদন্তী আচার্য শঙ্কর এই মন্দিরে শ্রীযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেন।[২]

পক্ষতীর্থ— চিঙ্গলেপুট সহর থেকে কিছু দূরে পক্ষতীর্থ বা পক্ষীতীর্থ। এখানে ত্রিপুরসুন্দরী, 'চক্কুনাইকি মাতা' প্রভৃতি দেবীরা আছেন।[৩] মহানীলতন্ত্রাদিতে পক্ষতীর্থ নামে যে-দেবীস্থানের উল্লেখ আছে তা এই স্থান হতে পারে। অবশ্য হরিদ্বারেও একটি পক্ষতীর্থ আছে।

শ্রীপর্বত— উত্তর-আর্কট জেলার তিরুপতির কাছে তিরুমলয়। তামিল ভাষায় তিরু অর্থ শ্রী আর মলয় অর্থ পর্বত। কাজেই তিরুমলয় অর্থ শ্রীপর্বত বা শ্রীশৈল। পীঠনির্ণয়াদি গ্রন্থে বর্ণিত শ্রীপর্বত এই তিরুমলয় হতে পারে। শ্রীপর্বতপীঠের দেবী সুন্দরী।

অরুণাচল—এই জেলার তিরুবান্নামলয় বা শ্রীঅরুণাচল একটি বিখ্যাত তীর্থ। এখানে আছে তেজোলিঙ্গ-মহাদেবের মন্দির। এই মন্দিরের কাছে পার্বতীদেবীরও একটি সুন্দর মন্দির আছে।[৪]

চিদম্বরম্— দক্ষিণ-আর্কটের চিদম্বরম্ আরেকটি সুপ্রসিদ্ধ তীর্থ। এখানে আছে ব্যোমলিঙ্গ-মহাদেবের বিখ্যাত মন্দির। মহাদেবের মূলমন্দিরে তিনটি প্রকোষ্ঠ আছে। মধ্য-প্রকোষ্ঠে চতুর্ভুজ নটরাজমূর্তি, ডানদিকের প্রকোষ্ঠে চিদম্বরলিঙ্গ (ব্যোমলিঙ্গ) আর বাঁদিকের প্রকোষ্ঠে দ্বিভুজা দেবীমূর্তি অধিষ্ঠিত। এ ছাড়া, মূলমন্দিরের কাছে পার্বতী-দেবীর একটি বৃহৎ মন্দিরও আছে।[৫]

১ ক শ অ, পৃঃ ৩৪২ ২ S C. S. I, O. H. I, Vol. IV, p. 256
৩ ভা ব, পৃঃ ৫৫৬-৫৫৭ ৪ ম ভা তী, পৃঃ ৮২-৮৩ ৫ ঐ, পৃঃ ৮৮-৯১

শ্রীরঙ্গম্—ত্রিচিনপল্লীর কাছে শ্রীরঙ্গম্। এখানে রঙ্গনাথজীর বিখ্যাত মন্দিরের সঙ্গেই আছে জম্বুকেশ্বরের অনুরূপ বিখ্যাত মন্দির। জম্বুকেশ্বর দক্ষিণভারতের সুপ্রসিদ্ধ পঞ্চলিঙ্গের অন্যতম লিঙ্গ অপ্‌লিঙ্গ। জম্বুকেশ্বরের মন্দিরের কাছে পার্বতীর পৃথক্ মন্দির আছে।

কুম্ভকোণম্—কুম্ভকোণমে আছে কুম্ভেশ্বর শিবের প্রসিদ্ধ মন্দির। মন্দিরে শিবলিঙ্গের সঙ্গে পার্বতীমূর্তি অধিষ্ঠিত।[১]

তাঞ্জোর—তাঞ্জোর জেলার আরাটাঙ্গি থেকে আট মাইল দূরে অবড্যারকয়েল (Avadyarkoil) নামক একটি গ্রামে আছে একটি বিখ্যাত প্রাচীন মন্দির। "এই মন্দিরে শিব বা পার্বতীর মূর্তি নাই, কেবল দেবীর সুবর্ণময় পাদপদ্ম বিরাজমান আর মহাদেবের চিহ্নস্বরূপ নাগের মস্তকোপরি একটি সোনার বাটি আছে।"[২] দেবীর পাদপদ্ম শ্রীযন্ত্রের উপর স্থাপিত।[৩]

পদ্মকোট—পদ্মকোট (পুদুকোট্টৈ) ভূতপূর্ব দেশীয় রাজ্য পদ্মকোটের রাজধানী ছিল। সহরের উপকণ্ঠে রাজবংশের কুলদেবতা তিরুগোকর্ণেশ্বর এবং বৃহদম্বার মন্দির অবস্থিত মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য এখানে এসেছিলেন এবং দেবীর স্তুতি করেছিলেন।[৪]

মাদুরা—মাদুরায় আছে মীনাক্ষীদেবীর মন্দির। এইটিই সম্ভবতঃ দক্ষিণভারতের সব চেয়ে বিখ্যাত মন্দির।

রামেশ্বর— রামনাদ জেলার সেতুবন্ধ-রামেশ্বর প্রাচীন তীর্থ। মহানীলতন্ত্রে রামেশ্বরকে দেবীপীঠ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। দেবীর নাম প্রভা বা মহাসিদ্ধি বা মহাবুদ্ধি।

রামেশ্বরে আছে রামেশ্বর শিবের মন্দির এবং তারই কাছে পার্বতীদেবীর মন্দির। প্রতি শুক্রবার রাত্রে জাঁকজমক করে পার্বতীদেবীর শোভাযাত্রা বের করা হয়।[৫]

তিন্নেভেল্লী—তিন্নেভেল্লী জেলার প্রধান সহর তিন্নেভেল্লীতে একটি চমৎকার দেবালয় আছে। এর অর্ধেক শিবমন্দির আর অর্ধেক পার্বতীমন্দির।[৬]

এই জেলাতেই কোট্টালম নামক স্থানে আছে চিত্তরনদীর একটি জলপ্রপাত। একে বলা হয় আকাশগঙ্গা। এটিকে পরম পবিত্র তীর্থ মনে করা হয়। আকাশগঙ্গার ধারে শিবমন্দির ও পার্বতীমন্দির। একটি সরস্বতীমন্দিরও আছে।[৭]

কন্যাকুমারী—বঙ্গোপসাগর, ভারতমহাসাগর এবং আরবসাগরের সঙ্গমস্থলে প্রাচীন

১ দ ভা তী পৃঃ ১০৮ ২ ঐ, পৃঃ ১০৪ ৩ S. O. S. I, O. H. I, Vol. IV. p. 256

৪ দ ভা তী, পৃঃ ১০২-১০ ৫ দ ভা তী, পৃঃ ১৫০ ৬ ঐ, পৃঃ ১৬২-১৬৩ ৭ ঐ, পৃঃ ১৯১

তীর্থ কন্যাকুমারী। মনে হয় মহানীলতন্ত্রাদিতে একেই কুমারপীঠ বলা হয়েছে। পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবী কুমারী বা কৌমারী। সমুদ্রের কোল ঘেঁষে দেবীর সুন্দর একটি মন্দির আছে।

মঙ্গলোর—কেরলরাজ্যের মঙ্গলোর বা ম্যাঙ্গোলোরে মঙ্গলাদেবীর একটি প্রাচীন মন্দির আছে। লোকে বলে দেবীর নাম অনুসারে সহরের নাম হয় মঙ্গলপুর। তার থেকে মঙ্গলোর বা ম্যাঙ্গোলোর হয়েছে।

মলয়—কোনো কোনো পুরাণে মলয়কে দেবীস্থান বলা হয়েছে এবং এখানকার দেবীকে বলা হয়েছে রম্ভা। নীলগিরির দক্ষিণদিকে পশ্চিমঘাট-পর্বতমালার দক্ষিণাংশকে মলয় বলে সনাক্ত করা হয়েছে।

মহীশূর— মহীশূর নগরের ললিতাদ্রির উপর আছে চামুণ্ডাদেবীর বিরাট মন্দির। জনপ্রবাদ এখানেই মহিষাসুরের সঙ্গে দেবী চামুণ্ডার যুদ্ধ হয়েছিল। মন্দিরে আছেন অষ্টভুজা মহিষাসুরমর্দিনী চামুণ্ডা। এখানে দুর্গাপূজার সময় বিজয়াদশমীর দিন যে-শোভাযাত্রা বের হয় তার খ্যাতি ভারতব্যাপী।[১]

শৃঙ্গেরীমঠ— শঙ্করাচার্যপ্রতিষ্ঠিত শৃঙ্গেরীমঠে শ্রীযন্ত্রের উপর সর্ববেদান্তপ্রকাশিনী ব্রহ্মবিদ্যা শারদার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। ইনি মঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।[২]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় শঙ্করাচার্য এবং তাঁর শিষ্যদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণের সব ক'টি অদ্বৈতমঠেই শ্রীযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত এবং তার নিয়মিত পূজাও হয়।[৩]

কিষ্কিন্ধ্যাপর্বত—কোনো কোনো পুরাণে কিষ্কিন্ধ্যাপর্বতকে দেবীস্থান বলা হয়েছে। এখানকার দেবী তারা। তুঙ্গভদ্রার উত্তরপারে ভূতপূর্ব নিজামরাজ্যের একটি বিস্তীর্ণ পার্বত্য অঞ্চলকে কিষ্কিন্ধ্যা বলা হয়।[৪]

দেবীপুরাণমতে ত সব পর্বতেই কালিকা তথা তারা এবং উমা অধিষ্ঠিতা।[৫]

পম্পাসরোবর—বেলারি জেলার হাম্পি নামক স্থানের কাছে ছিল পম্পাসরোবর। এখন পম্পাসরোবর ছোট পুকুরের মত হয়ে গেছে। প্রাণতোষণী প্রভৃতি কোনো কোনো গ্রন্থে পম্পাসরোবরকে দেবীস্থান বলা হয়েছে। দেবীর নাম শারঙ্গা।

বিদ্যাপুর—হাম্পির অন্য নাম বিজয়নগর বা বিদ্যানগর। মহানীলতন্ত্রাদিতে বিদ্যাপুর নামে যে-দেবীস্থানের উল্লেখ আছে তা সম্ভবতঃ এই স্থান।

১ দ ভা তী, পৃঃ ২১৩-২১৪   ২ S. C. S. I, C H. I., Vol. IV, p. 256

৩ Ibid.   ৪ দ ভা তী, পৃঃ ২৩০

৫ কালিকাখ্যা তথা তারা উমা সর্বনগেষু চ—দে পু ৩৯।৩

মহারাষ্ট্র-গুজরাট অঞ্চল

গোবর্ধনপীঠ— কুব্জিকাতন্ত্রাদিতে গোবর্ধনপীঠের উল্লেখ আছে। পীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী অম্বিকা। নাসিকের কাছে এই পীঠের স্থান নির্দেশ করা হয়।

অগস্ত্যাশ্রম—প্রাণতোষণী প্রভৃতি গ্রন্থে অগস্ত্যাশ্রম নামে দেবীস্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানকার দেবী মহাবিদ্যা বা মন্ত্রমেধা। নাসিকের কাছে অগস্তিপুর বলে একটি জায়গা আছে। অনুমান করা হয় এইটিই প্রাচীন অগস্ত্যাশ্রম।

নাসিক অঞ্চলের প্রাচীন নাম জনস্থান। জনস্থান একটি পীঠ। এখানে পড়েছিল দেবীর চিবুক। পীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভ্রামরী।

পঞ্চবটী— মহানীলতন্ত্রাদিতে দেবীস্থান পঞ্চবটীর উল্লেখ আছে। এখানকার দেবী তপস্বিনী। নাসিক সহরের কাছে গোদাবরীর অপর পারে পঞ্চবটীতীর্থ ই সেই পঞ্চবটী।

সিদ্ধপুর—কোনো কোনো পুরাণে সিদ্ধপুর বা সিদ্ধবট নামে দেবীস্থানের উল্লেখ আছে। এখানকার দেবী মাতালক্ষ্মী বা উমালক্ষ্মী। আহমদাবাদ থেকে মাইল চৌষট্টি দূরে সিধপুর নামে একটি স্থান আছে। অনুমান করা হয় এইটিই প্রাচীন সিদ্ধপুর।

কায়াবরোহণ—পুরাণাদিতে কায়াবরোহণ নামে দেবীস্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। পুরাণমতে দেবীর নাম মাতা। বড়োদার কারওয়াকে কায়াবরোহণ মনে করা হয়।

শঙ্খোদ্ধার— শঙ্খোদ্ধার পুরাণবর্ণিত একটি দেবীস্থান। এখানকার দেবী ধ্বনি বা ধারা। কচ্ছ-উপসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে বটদ্বীপ নামে একটি দ্বীপ আছে। বলা হয় এই দ্বীপই শঙ্খোদ্ধার।

দ্বারাবতী—মহানীলতন্ত্রাদি গ্রন্থে দ্বারাবতীকে দেবীস্থান বলা হয়েছে। দেবী রুক্মিণী। দ্বারকাই দ্বারাবতী।

প্রভাস—নানা গ্রন্থে প্রভাসকে দেবীস্থান বলা হয়েছে। এটি একটি পীঠ। এখানে পড়েছিল দেবীর অধর। এখানকার দেবীর বিভিন্ন নাম বিভিন্ন গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে। যথা—পুষ্করাবতী, ঈশ্বরী, সুরপূজিতা, পুষ্করেক্ষণা এবং চন্দ্রভাগা।

কাথিয়াওয়াড়ের সোমনাথ প্রাচীন প্রভাস।

সোমেশ্বর—কোনো কোনো গ্রন্থে সোমেশ্বর নামে দেবীস্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। দেবীর নাম বরারোহা। প্রভাস আর সোমেশ্বর একই তীর্থ হতে পারে।

রামতীর্থ—সূর্পারকে ছিল প্রাচীন দেবীস্থান রামতীর্থ। রামতীর্থের দেবী রমণা। থানা জেলার সোপারাই সূর্পারক।

করবীর—কোলাপুরের স্থানীয় নাম করবীর। অনেকে মনে করেন পীঠনির্ণয় প্রভৃতি গ্রন্থে যে করবীর বা করবীরপুর নামে দেবীস্থানের উল্লেখ আছে তা এই করবীর বা

কোলাপুর। পীঠনির্ণয় অনুসারে এখানে দেবীর ত্রিনেত্র পড়েছিল। এখানকার দেবী মহিষমর্দিনী। মৎস্যপুরাণাদির মতে দেবী মহালক্ষ্মী। জ্ঞানার্ণবতন্ত্রে মহালক্ষ্মী বলে যে-দেবীস্থানের উল্লেখ আছে তাও সম্ভবতঃ এই কোলাপুর।

কোলাপুরে এখনও মহালক্ষ্মীর বিরাট মন্দির আছে। এটি মহারাষ্ট্রের অন্যতম মুখ্য দেবীস্থান। মহারাষ্ট্রীয়েরা একে জাগ্রত পীঠ মনে করেন।

গোকর্ণ—গোয়ার ভৌগলিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থান মহারাষ্ট্র অঞ্চলে। জ্ঞানার্ণব-তন্ত্রাদিতে গোকর্ণ নামে যে-দেবীস্থানের উল্লেখ আছে গোয়ার গেণ্ডিয়া (Gandia) সেই স্থান। বিভিন্ন গ্রন্থে গোকর্ণের দেবীর বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়। যথা—ভদ্রকর্ণিকা, কালিকা, ভদ্রা, মহাবলা এবং সর্বমঙ্গলা।

দেবীমন্দির—মহারাষ্ট্র অঞ্চলে অনেক দেবীমন্দির আছে। তার মধ্যে থেকে কয়েকটি মন্দিরের উল্লেখ করা গেল।

বোম্বাই সহরে—খাস বোম্বাই সহরে আছে তিনটি প্রসিদ্ধ দেবীমন্দির—একটি মুম্বাদেবীর, একটি কালবাদেবীর এবং অপরটি মহালক্ষ্মীর। লোকে বলে মুম্বাদেবীর নাম থেকেই সহরের নাম হয়েছে মুম্বাই বা বোম্বাই। কালবাদেবীর মূর্তিটি প্রাচীন।[১]

পুনায়—পুনা সহরে আছে পার্বতীর মন্দির। এই মন্দিরের খ্যাতি ও গৌরব সমগ্র মহারাষ্ট্র অঞ্চলে বিস্তৃত।

পুনা জেলার প্রতাপগড়ে আছে শিবাজী মহারাজের ইষ্টদেবী ভবানীর প্রাচীন মন্দির।

পন্ঢরপুরে— পন্ঢরপুরের বিঠোবামন্দিরের খ্যাতি বহুদূর বিস্তৃত। এই মন্দিরের সঙ্গে আছে রুক্মিণী, সত্যভামা এবং মহালক্ষ্মীর মন্দির।

সহ্যাদ্রিপর্বতে— নাসিক জেলার দিণ্ডোরী এবং কলবণ তালুকের সীমায় সহ্যাদ্রি-পর্বতমালার এক অংশের স্থানীয় নাম 'সপ্তশৃঙ্গী গড়'। এই সপ্তশৃঙ্গীপর্বতের উপর দেবী সপ্তশৃঙ্গীর প্রাচীন স্থান। একে জাগ্রত দেবীস্থান মনে করা হয়। এখানে দেবীর মূর্তি এবং মন্দিরও আছে। চৈত্রের শুক্লা পঞ্চমীতে সপ্তশৃঙ্গীর প্রকাণ্ড মেলা বসে। তখন দুতিন লাখ যাত্রীর সমাগম হয়। আশ্বিনমাসেও আরেকবার মেলা বসে।[২]

তুলজাপুরে—ওসমানাবাদের কাছে তুলজাপুরে আছে ভক্ত রামদাস ও ছত্রপতি শিবাজীর কুলদেবী ভবানীর বিখ্যাত মন্দির। দেবী তুলজাভবানী নামে প্রসিদ্ধ। ইনি অষ্টভুজা, ব্যাঘ্রবাহনা, মহিষাসুরমর্দিনী।[৩]

১ ক প অ, পৃঃ ৬৩৩   ২ ঐ, পৃঃ ৬৩১-৬৩২   ৩ ঐ, পৃঃ ৫৩৭

মহারাষ্ট্রে শক্তিপূজা—এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে মহারাষ্ট্রে মহাদেবীর লোকপ্রিয় নাম ভবানী। এই অঞ্চলে শক্তিপূজার ব্যাপক প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বে ত শিবপার্বতীর পূজার প্রচলনই ছিল সব চেয়ে বেশী। মহারাষ্ট্রের প্রাচীন মন্দিরগুলি প্রায় সবই শিবপার্বতীর। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে এই অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্ম প্রবল হয়। তবু মহারাষ্ট্রে কুলধর্মরূপে শক্তি-উপাসনা সর্বত্র প্রচলিত।[১]

গুরু রামদাস আপন কুলদেবী ভবানীর সাত আটটি অতি চমৎকার স্তোত্র রচনা করেন। এই স্তোত্রগুলি খুবই জনপ্রিয়, একদা ঘরে ঘরে গান করা হত, এখনও ব্যাপকভাবেই হয়।[২]

গুরু রামদাসের আগে সন্ত একনাথ আপন কুলদেবীর সম্বন্ধে বহু কবিতা রচনা করেন। এইসব কবিতা খুবই জনপ্রিয়। তাঁর আদিমায়া মহালক্ষ্মীর বীররসাত্মক স্তোত্র প্রসিদ্ধ। মহারাষ্ট্রীয়েরা অনেকে বিশ্বাস করেন শিবাজীর মতো বীর পুরুষ যে ভারতের অন্য প্রান্তের পরিবর্তে মহারাষ্ট্রে জন্মালেন তার কারণ মহারাষ্ট্রে দেবীর উপাসনা ব্যাপকভাবে চলছিল এবং মহাশক্তির বীর সন্তানের আবির্ভাবের উপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল।[৩]

আদিমায়া, ভৈরবী, ভুবনেশ্বরী, ভবানী প্রভৃতি মহাদেবীর বিভিন্ন রূপের বহু স্তোত্র মহারাষ্ট্রে রচিত হয়েছে।[৪]

গুজরাট অঞ্চলের মন্দিরাদি—এবার গুজরাট অঞ্চলের কয়েকটি মন্দির ও দেবীস্থানের উল্লেখ করা যাক।

বড়োদা সহরে আছে অম্বামন্দির। স্থানীয় লোকেরা দেবীকে বলেন অম্বামাতা। দেবীর মূর্তিটি খুব সুন্দর।[৫]

এই সহর থেকে মাইল ত্রিশেক দূরে ঈশান কোণে পাওয়াগড় নামক পাহাড়। সেই পাহাড়ের চূড়ায় মহাকালীর প্রসিদ্ধ মন্দির। এখানে আশ্বিনের শুক্লা প্রতিপদ থেকে দশমী পর্যন্ত খুব বড় মেলা হয়। দেবীর নিত্যপূজাদির ব্যবস্থাও আছে।[৬]

ভূতপূর্ব বড়োদা রাজ্যের সীমায় চুওয়াড় নামক স্থানে আছে দেবী বালা বহুচরার মন্দির। এই স্থানটিকে খুবই প্রাচীন মনে করা হয়। দেবী বহুচরা কুক্কুটবাহনা। মন্দিরে দেবীর মূর্তি আছে আবার যন্ত্রও আছে। যন্ত্রে পূজা হয়। চৈত্র, আষাঢ় এবং আশ্বিনের পূর্ণিমায় এখানে বড় মেলা বসে। বহু দূরদূরান্তর থেকে হাজার হাজার যাত্রী দেবীদর্শনে আসেন। এই অঞ্চলে দেবী বহুচরার এমনি প্রভাব যে প্রত্যেক গ্রামে দেবীস্থান আছে, সহরেও আছে, বনে পর্বতেও আছে। এক আহমদাবাদ সহরেই দেবীর কুড়িটির বেশী মন্দির।[৭] দেবী বহুচরাকে শ্রীকুলের দেবী ত্রিপুরসুন্দরী মনে করা হয়।[৮]

১ ক প অ, পৃঃ ৪১৭ ২ ঐ ৩ ঐ, পৃঃ ৪১৮-৪১৯ ৪ ঐ, পৃঃ ৪১৭ ৫ ঐ, পৃঃ ৬৭১
৬ ঐ, পৃঃ ৬৪২-৬৫০ ৭ ঐ, পৃঃ ৬৪৪-৬৪৫ ৮ ঐ, পৃঃ ৪২২

সমুদ্রের ধারে ভরোচ বা ব্রোচ। এইটিই প্রাচীন ভরুকচ্ছ। এখানকার অম্বাজী মাতা এবং বহুচরাদেবীর মন্দির বিখ্যাত।

কাথিওয়াড়ে গোণ্ডল নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। এই রাজ্যের মহালগাম-পাটনওয়াড় নামক স্থানের কাছে ওসমপাহাড়। এই পাহাড়ের এক গুহায় আছে একটি প্রাচীন দেবীস্থান। দেবীকে বলা হয় ওসমমাতা। প্রায় আড়াইশ বছর আগে এই জায়গায় দেবীর মন্দির তৈরি হয়েছে। গুজরাটে ওসমমাতার খুবই প্রতিষ্ঠা।

কাথিওয়াড়ের মোর্ভি সহর যখন ছোট ছিল তখন সহরের বাইরে পশ্চিম দিকে গ্রাম-দেবতা বালা বহুচরার একটি মন্দির ছিল। পরে এই মন্দিরের কাছে দেবীর এক বিরাট-মন্দির তৈরি হয় এবং তার মধ্যে শ্রীযন্ত্র স্থাপন করা হয়। দেবীর কোনো মূর্তি নেই। যন্ত্রেই পূজা হয়। তবে মন্দিরে দশমহাবিদ্যা, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী, মহাকালী—এঁদের চিত্র আছে।[১]

রাজস্থানের সীমানায় আবুপাহাড়। এই পাহাড়ের একটি শিখরের নাম আরাসুর বা আরাসন। এখানে আছে একটি প্রাচীন দেবীস্থান। অনেকে মনে করেন এইটিই তন্ত্রাদিতে বর্ণিত অর্বুদপীঠ। অর্বুদপীঠের দেবী কাত্যায়নী।

বর্তমানে কিন্তু এখানকার দেবীকে বলা হয় আরাসুরী অম্বিকা; অর্বুদাদেবীও বলা হয়। স্থানীয় লোকেরা বলেন 'ধোলা গড়ওয়ালী মাতা'। এঁদের বিশ্বাস এই জায়গায় দেবীর হৃদয়ের একাংশ পড়েছিল। এখানে এখন মার্বেল-পাথরের দেবীমন্দির এবং অনেক ধর্মশালা তৈরি হয়েছে। গুজরাট অঞ্চলে এই দেবীস্থানের প্রভূত মাহাত্ম্য এবং প্রতিপত্তি লক্ষিত হয়।[২]

তবে গুজরাটে সাধারণতঃ অম্বিকা, কালিকা এবং বালা বহুচরা এই তিন দেবীর স্থানই মুখ্য বলে গণ্য হয়। অন্যান্য দেবীস্থানের মধ্যে কচ্ছের আশাপুরা দেবীর স্থান, দ্বারকার কাছে অভয়ামাতার স্থান, হড়ওয়াদের কাছে সুন্দরীদেবীর স্থান, বটওয়ানে বুটমাতার স্থান, পেটলাদের কাছে আশাপুরীদেবীর স্থান এবং ঘোঘার কাছে খোডিয়ারমাতার স্থান বিখ্যাত।[৩]

গুজরাট অঞ্চলে শক্তিপূজার সাহিত্যিক নিদর্শন—গুজরাট অঞ্চলে শক্তিপূজার ব্যাপকতার অন্য নিদর্শনও আছে। গুজরাটী সাহিত্যে ভগবতীর বিবিধ রূপের অনেক স্তব পাওয়া যায়। ভগবতী বিভিন্ন রূপ ধারণ করে ক্রূরকর্মা দৈত্যদের নিধন করছেন, ভক্তকে রক্ষা করেছেন এই-সব বিষয় এই সাহিত্যে যথেষ্ট আছে।[৪]

১ ক শ অ, পৃঃ ৩৮৮-৩৯০ ২ ঐ, পৃঃ ৩৪৮

৩ ঐ, পৃঃ ৩৫৭ ৪ ঐ, পৃঃ ৪২১

গুজরাটী সাহিত্যে ভক্তিধারার মুখ্য আলম্বন তিনজন দেবতা-শ্রীকৃষ্ণ, শিব এবং শক্তি বা দেবী। শক্তিকে এখানে পরাশক্তিরূপে দেখা হয়েছে।[১]

গরবা—গুজরাটের গরবাগান বহুকাল থেকে চলে আসছে। গুজরাটী মেয়েরা এই গান করেন এবং রচনাও প্রধানতঃ তারাই করেন। শক্তির আবাহন করে তাঁরা 'চৌমুখী দীপশিখা'র পূজা করেন এবং দেবীর স্তবগান করতে করতে তার পরিক্রমা করেন। একের পর এক মেয়ে নূতন গান ধরেন আর অন্যরা হন দোহার। এমনি করে গানে গানে রাত ভোর হয়ে যায়। (নবরাত্রির সময় এমনি করে পর পর নয় রাত ধরে গান হয়।) মেয়েরা শৈব বা বৈষ্ণব যে-সম্প্রদায়েরই হউন না কেন গরবা গান বাঁধেন দুর্গা, অম্বা, কালী, ভবানী, রাধা, সীতা, গৌরী—পরাশক্তির এই-সব বিভিন্ন নাম এবং রূপ নিয়ে।[২]

শক্তিসম্বন্ধী সাহিত্য-রচয়িতা—খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে কবি ভালণ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'চণ্ডীআখ্যান' রচনা করেন। জুনাগড়ের দেওয়ান রণছোড়জীও একই বিষয় নিয়ে তাঁর কাব্য 'চণ্ডীপাঠ' রচনা করেন।[৩]

ঐ শতাব্দীতে কবি সোমেশ্বরদেব দেবীবিষয়ক কাব্য 'সুরথোৎসব' রচনা করেন।[৪]

ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে শ্রীধর রচনা করেন গৌরীচরিত্র।[৫]

গুজরাটের কবিসম্রাট্ ভট্ট প্রেমানন্দ তুলসীদাসের সমসাময়িক। তিনি দেবীচরিত্র বর্ণনা করে দেবীর প্রতি আপনার প্রেমভক্তি নিবেদন করেছেন।[৬]

ঐ সময়েই প্রসিদ্ধ শক্তি-উপাসক নাথভওয়ানের জন্ম হয়। এঁর ইষ্টদেবী ছিলেন জুনাগড়ের দেবী বাঘেশ্বরী। কিংবদন্তী এঁর ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে দেবী বাঘেশ্বরী এঁকে দেখা দেন। তখন ইনি একটি গরবা রচনা করে দেবীর স্তব করেন। এই নাথভওয়ানই পরে অনুভবানন্দ সরস্বতী নামে প্রসিদ্ধ হন। এঁর রচিত গরবা এবং গরবী খুব প্রসিদ্ধ, ঘরে ঘরে গান করা হয়।[৭]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে গুজরাটে মীঠু মহারাজ নামে একজন বিখ্যাত সামরস্যবাদী তান্ত্রিক জন্মান। তিনি 'রাসরস' নামক গ্রন্থে অর্ধনারীশ্বরতত্ত্ব মনে রেখে শ্রীচক্রের পদ্ধতি অনুসারে রাসক্রীড়ার বর্ণনা করেন।[৮] এ ছাড়া, ইনি শক্তিবিলাসলহরী এবং শ্রীলহরী নামে শক্তি-বিষয়ক আরও দুখানি গ্রন্থ রচনা করেন।[৯]

ঊনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত কবি বালাশঙ্করজী গুজরাটী ভাষায় সৌন্দর্যলহরীর পদ্যানুবাদ করেন।[১০]

১ ভ প অ, পৃঃ ৪২২ ২ ঐ, পৃঃ ৪২২ ৩ ঐ, পৃঃ ৪২২-৪২৩ ৪ ঐ, পৃঃ ৪২৩
৫ ঐ ৬ ঐ ৭ ঐ ৮ ঐ ৯ ঐ ১০ ঐ, পৃঃ ৪২৩-৪২৪

নাগর-ব্রাহ্মণ—গুজরাটপ্রান্তে একদা নাগর-ব্রাহ্মণদের বিশেষ গৌরব ও প্রতিষ্ঠা ছিল। এঁদের কুলদেবী শক্তি। দেবীর পূজা এঁদের অবশ্য কর্তব্য। কাশীতে বহুকাল থেকে অনেক নাগর-ব্রাহ্মণের বাস। এঁদের মেয়েরা দেবীবিষয়ক বহু গরবা এবং গরবী রচনা করেছেন। এই সব সংগ্রহ করে প্রকাশ করাও হয়েছে। নাগর-ব্রাহ্মণদের আত্মীয়দের মধ্যেও ত্রিপুরা, বালা, শ্রীবিদ্যা, বগলা, তারা, ললিতা প্রভৃতি মহাদেবীর বিভিন্ন রূপের পূজা প্রচলিত আছে।[১]

গুজরাটী তান্ত্রিক—গুজরাটীদের মধ্যে অনেক তান্ত্রিক সাধক ও পণ্ডিত রয়েছেন। এঁরা সংস্কৃতে শক্তিবিষয়ক গ্রন্থও রচনা করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ কাশীবাসী বিখ্যাত মন্ত্রশাস্ত্রী বামনভদ্র পাঠক, বড়োদানিবাসী পণ্ডিতশিরোমণি মন্ত্রশাস্ত্রী জটাশঙ্কর পাঠক, আচার্য গৌরীশঙ্কর, আচার্য লক্ষ্মীশঙ্কর এবং প্রাতঃস্মরণীয় আচার্য বটুকনাথের নাম করা যায়।[২]

কালীপূজা—গুজরাট অঞ্চলে সর্বত্র কালিকাদেবীর পূজা হয়। তবে এই কালী দক্ষিণাকালী। লোকে এঁকে ভদ্রকালী বলে পূজা করে।[৩]

বালা ত্রিপুরসুন্দরীর উপাসকও গুজরাট অঞ্চলে অনেক আছেন।[৪]

রাজপুতানার দেবীস্থান ও দেবী মন্দির—গুজরাটের মতো রাজপুতানায়ও দেবীস্থান ও দেবীমন্দির অনেক। এখানে কয়েকটির বিবরণ দেওয়া গেল।

অম্বর—কোনো কোনো পুরাণে অম্বর নামে দেবীস্থানের উল্লেখ আছে। পুরাণে দেবীর নাম দেওয়া হয়েছে বিশ্বকায়া বা বিশ্বমায়া। জয়পুরের অম্বরকেই পুরাণোক্ত অম্বর মনে করা হয়।

অম্বরের শিলাদেবীর মন্দিরটি বিখ্যাত। অষ্টভুজা মহিষমর্দিনী এই দেবী বাংলার বারভুঁইয়ার অন্যতম চাঁদরায় ও কেদাররায়ের ইষ্টদেবী ছিলেন। মহারাজ মানসিংহ এঁকে অম্বরে এনে প্রতিষ্ঠিত করেন।[৫]

মাতাজীস্থান—জয়পুরের সম্বরহ্রদের ধারে লবণের কারখানার কাছে আছে এক প্রাচীন দেবীমন্দির। স্থানীয় লোকেরা দেবীকে বলেন মাতাজী। রাজপুতানায় এই দেবীস্থানটির খ্যাতি ব্যাপক।[৬]

হারীত—মহানীলতন্ত্রাদিতে হারীত নামে দেবীস্থানের উল্লেখ আছে। এখানকার দেবী হরিণাক্ষী। অনুমান করা হয় উদয়পুরের নিকটবর্তী হারীতাশ্রম অবস্থিত হারীত।

চিতোর—চিতোরের ঐতিহাসিক দুর্গের মধ্যে একটি প্রাচীন কালীমন্দির আছে। আর আছে ভবানী ও অন্নপূর্ণার মন্দির।[৭]

১ ক শ অ, পৃঃ ৪২০ ২ ঐ, পৃঃ ৪২১ ৩ ঐ, পৃঃ ৪২২ ৪ ঐ
৫ ভা ব্র, পৃঃ ১২৫ ৬ ক শ অ, পৃঃ ৬৪৩ ৭ ঐ, পৃঃ ৬৪৫

পুষ্কর—প্রাচীন তীর্থ পুষ্করও একটি দেবীস্থান। পুরাণাদিতে এখানকার দেবীকে বলা হয়েছে পুরুহূতা। স্থানটি আজমীর সহর থেকে মাইল সাতেক দূরে। এখানে সাবিত্রী-পাহাড়ের উপর আছে সাবিত্রী ও সরস্বতীর মূর্তি ও মন্দির।

সব স্থানই দেবীস্থান— ভারতে দেবীস্থান অনেক। তত্ত্বের দিক্ দিয়ে দেখলে ত সব স্থানই দেবীস্থান। দেবীভাগবতে দেবী স্পষ্ট ভাষাতেই বলেছেন—সব স্থানই আমার স্থান, সব কালই ব্রতের কাল, সব সময়ই উৎসবের সময়, কারণ আমি সর্বরূপিণী।[১]

এখানে দেবীস্থানের মোটামুটি একটা বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সব দেবীস্থানের বিবরণ জানা যায় না, দেওয়াও সম্ভবপর নয়।

লক্ষণীয় বিষয়—এই বিবরণের থেকে একটি জিনিস স্পষ্ট হয়েছে— দেবীস্থান দেশের সর্বত্র ছড়ান থাকলেও সব অঞ্চলে সংখ্যায় সমান নয়। কোনো কোনো অঞ্চলে দেবীস্থানের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক, কোনো কোনো অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত কম।

সাধারণতঃ লোকের ধারণা একমাত্র বাংলাদেশে এবং বাঙ্গালীর মধ্যেই দেবীপূজা প্রচলিত। উপরের বিবরণ থেকে দেখা গেল সে-ধারণা ভ্রান্ত। দেবীপূজা ভারতের সব প্রান্তের লোকেদের মধ্যেই প্রচলিত।

সার কথা, বৈদিকযুগেরও আগে থেকে আমাদের দেশে মানুষ নানাভাবে নানা স্থানে দেবীর পূজা করে আসছে; আজও সে-পূজা সমানে চলছে। কালে কালে পূজার রূপ বদলেছে কিন্তু তার বিরতি ঘটেনি কখনো।

১ সর্বং দৃশ্যং মম স্থানং সর্বে কালা ব্রতাত্মকাঃ। উৎসবাঃ সর্বকালেষু যস্মাদহং সর্বরূপিণী।
—দে ভা, ৭।৩৮।৩

সপ্তম অধ্যায়

শিব

শিবশক্তি অভিন্ন—শাস্ত্রমতে পরমা দেবী শিবঙ্করী; শিবের থেকে অভিন্ন।[১] আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে—শিব যিনি তিনি দেবী, দেবী যিনি তিনি শিব। এই উভয়ের অভেদবুদ্ধিতেই দেবীকে শিবা বলা হয়।[২]

আমরা এ যাবৎ সাধারণভাবে জগদম্বা মহাদেবীর বিষয় আলোচনা করে এসেছি। দেবীর থেকে যিনি অভিন্ন সেই মহাদেব শিবেরও মোটামুটি একটা পরিচয় না পেলে দেবীর পরিচয় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

বৈদিক রুদ্র শিবে রূপান্তরিত— আমরা দেখেছি বাজসনেয়িসংহিতায় অম্বিকাকে রুদ্রের ভগিনী বলা হয়েছে আর তৈত্তিরীয়-আরণ্যকে অম্বিকা হয়ে গেছেন রুদ্রের পত্নী। আরও দেখা গেছে এই অম্বিকা মাতৃরূপিণী মহাদেবী অর্থাৎ মহাদেবী জগদম্বা। উক্ত আরণ্যকেই দেখা গেছে রুদ্রকে উমাপতি ও পশুপতি বলে নমস্কার করা হয়েছে।

আর অম্বিকা, উমা, পার্বতী এ-সব একই মহাদেবীর বিভিন্ন নাম তাও লক্ষ্য করা গেছে।

বেদপরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যে দেখা যায় মহাদেব মহেশ্বর শিবের পত্নী মহাদেবী দুর্গা বা হৈমবতী উমা বা পার্বতী।

শিবের ভাবরূপের উপাদান—কাজেই, বলা যায় প্রধানতঃ বৈদিক রুদ্রই শিব হয়েছেন। তবে শিবের ভাবমূর্তি রচনায় অন্যান্য দেবতাও উপাদান জুগিয়েছেন।

প্রকৃতির দুইরূপ—লক্ষ্য করা গেছে অনেকের মতে বেদের প্রধান প্রধান দেবতারা বহিঃপ্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির রূপকল্পনা। প্রকৃতির এক রূপ শান্ত, সৌম্য, কল্যাণকর, প্রাণপ্রদ; অন্যরূপ উগ্র, ভয়ঙ্কর, ধ্বংসাত্মক এবং জীবননাশক। ঋগ্‌বেদাদি বেদসংহিতায় তার পরিচয় আছে।

ধ্বংসাত্মক রূপ—ঋগ্‌বেদের সময়ে প্রকৃতির ধ্বংসাত্মক রূপের একটি প্রকাশ দেখা

১ সা দেবী পরমা দেবী শিবাভিন্না শিবঙ্করী। শিবাভিন্না তয়া হীনঃ শিবোঽপি হি নিরর্থকঃ।
সূতসংহিতাবচন, Quoted in O. R. C., p. 866, n

২ যথা শিবস্তথা দেবী যথা দেবী তথা শিবঃ। তস্মাদভেদবুদ্ধ্যৈব শিবেতি কথয়ন্ত্যমূম্‌।
সৌভাগ্যভাস্করধৃত লিঙ্গপুরাণবচন, ক্র কৌ ম, পৃঃ ১৯

যেত ভীষণ ঝড়ের আকারে। ঝড় যে কী ভীষণ, কি মারাত্মক হতে পারে তার পরিচয় এ যুগেও পাওয়া যায় সাইক্লোন, টর্নেডো, টাইফুন প্রভৃতি প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে।

রুদ্রদেবতা—একটা ভীষণ ক্রুদ্ধ উন্মত্ত শক্তিপ্রবাহ মুহূর্তের মধ্যে সব লণ্ডভণ্ড করে দেয়; গাছপালা ঘরবাড়ী ধূলিসাৎ হয়। পশু মরে, মানুষ মরে। ঝড়ের সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকায় আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত; বাজ পড়ে। তাতেও পশু মরে, মানুষ মরে। বৈদিক ঋষিরা এই ঝড় ও বজ্রপাতের মধ্যে প্রত্যক্ষ করতেন রুদ্র দেবতাকে।

রুদ্রের অস্ত্র— ঐ যে আকাশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত বিদ্যুৎ চমকাত, কড় কড় করে বাজ পড়ত, ঋষিরা মনে করতেন এ হল রুদ্রের অস্ত্র বা বাণ।[১]

মরুৎদের পিতা—ঋগ্‌বেদে দেখা যায় ঝড়বৃষ্টির দেবতা মরুৎ।[২] মরুতের সংখ্যা উনপঞ্চাশ। মরুদ্‌গণকে রুদ্রগণ (রুদ্রিয়াঃ, রুদ্রিয়াসঃ, রুদ্রাঃ) বলা হয়েছে। রুদ্র মরুৎদের পিতা।[৩]

রুদ্র ধ্বংসের দেবতা—প্রকৃতির আরেকটি ভয়ঙ্কর রূপের প্রকাশ মহামারীর আকারে। মহামারীর প্রবল আক্রমণে কত মানুষ মরে যেত। বৈদিক ঋষিরা এর মধ্যেও রুদ্রের হাত দেখতে পেতেন। মোটকথা, ঝড়ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত, মহামারী, সর্পাঘাত, সাধারণ রোগ, বিষ প্রভৃতি যা কিছু মানুষের অনিষ্টকর ও প্রাণনাশক তাই তাঁরা রুদ্রের সঙ্গে যুক্ত মনে করতেন।[৪] তাঁদের ধারণা ছিল রুদ্রের বাণাঘাতে রোগ হয়, মৃত্যু ঘটে।[৫]

রুদ্র ভয়ঙ্কর—রুদ্রের বাণকে সবাই ভয় করতেন, রুদ্রকে ভয় করতেন, ভয় করতেন এঁর ক্রোধকে।[৬] এইজন্য স্পষ্ট করে এঁর নাম উচ্চারণ করতেও তাঁরা সাহস পেতেন না।[৭]

তাই রুদ্রকে তাঁরা দূরে রাখতে চাইতেন। যজুর্বেদে একটি মন্ত্রে ত ঋষি সরলভাবে বলেই দিয়েছেন—

ওগো রুদ্র, এই রইল তোমার 'অবসম্' অর্থাৎ কি না পথ্য ভোজ্য। এইটি নিয়ে তুমি বাপু, মূজবান পর্বতে চলে যাও।[৮]

১ ঋ বে ৭।৪৬।৩ ২ ঋ বে ১।৬৪।১২, ২।৩৪।১, ২

৩ ঋ বে ১।৩৮।৭, ১।৬৪।২, ১২; ১।১১৪।৬, ২।৩৪।১০

৪ V. Ś. M. R. S., pp. 102-106

৫ ঋগ্‌বেদে (১।১১৪।১০) রুদ্রের 'গোঘ্ন' ও 'পুরুষঘ্ন' আয়ুধের কথা আছে।

৬ ঋ বে ১।১১৪।৪, ৭।৪৬।৩ ৭ ধর্মকথা, পৃঃ ৪৩ ৮ বা সং ৩।৬১

রুদ্রশব্দের ব্যাখ্যা—এই ভয়ঙ্কর দেবতাটিকে কেন রুদ্র বলা হ'ত আজকের দিনে তা নিশ্চয় করে বলা কঠিন। রুদ্রশব্দের নানা ব্যাখ্যা প্রচলিত।

বাজসনেয়িসংহিতায় রুদ্রকে বলা হয়েছে—উচ্চৈঃ ঘোষঃ[১] অর্থাৎ মহাশব্দরূপী। অন্যত্র[২] বলা হয়েছে 'শ্রব' এবং 'প্রতিশ্রব' অর্থাৎ শব্দ এবং প্রতিশব্দ। এর থেকে অনুমান হয় ঝড়ের প্রচণ্ড গর্জন শুনে লোকে তার দেবতাকে রুদ্র নাম দিয়েছিল।

যাস্ক রুদ্রশব্দের যে-ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে এই অনুমানের সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন যিনি গর্জন করেন তিনি রুদ্র।[৩]

আচার্য সায়ণ রুদ্রশব্দের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যথা— যিনি অন্তকালে সবাইকে কাঁদান তিনি রুদ্র।[৪] যিনি শত্রুদের কাঁদান তিনি রুদ্র।[৫] যিনি সংসার নামক দুঃখ গলিয়ে দেন, দূর করেন বা বিনাশ করেন তিনি রুদ্র।[৬] রুৎ অর্থাৎ শব্দরূপ উপনিষৎ, তার দ্বারা যিনি প্রতিপাদ্য তিনি রুদ্র।[৭] রুৎ অর্থ শব্দাত্মিকা বাণী অথবা তার দ্বারা প্রতিপাদ্য আত্মবিদ্যা। যিনি উপাসকদের এই আত্মবিদ্যা দান করেন তিনি রুদ্র।[৮] যা আবৃত করে তা রুৎ। রুৎ অন্ধকারাদি। তা যিনি বিদারণ করেন তিনি রুদ্র।[৯]

যজুর্বেদের ভাষ্যে মহীধর বলেছেন রুৎ অর্থ জ্ঞান, তা যিনি দেন তিনি রুদ্র। অথবা যিনি পাপীদের দুঃখভোগের দ্বারা কাঁদান তিনি রুদ্র।[১০]

রুদ্রনামের উৎপত্তি-কাহিনী—রুদ্রনামের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি কাহিনীও আছে। একবার দেবাসুরসংগ্রামের সময় দেবতারা সব ধন ফেলে রেখে যুদ্ধ করতে যান। অগ্ন্যাত্মক

১ বা সং ১৬।১৯ ২ ঐ ১৬।৩৪

৩ রুদ্রো রৌতীতি সতঃ।—নিরুক্ত ১০।৫

৪ রোদয়তি সর্বমন্তকালে ইতি রুদ্রঃ। ঋ বে ১।৪৩।১, ভাষ্য।

৫ রোদয়তি শত্রূন্ ইতি রুদ্রঃ। ঋ বে ৭।৩২ (৮৭)।১, ভাষ্য।

৬ রুৎ সংসারাখ্যং দুঃখং তৎ দ্রাবয়তি অপগময়তি বিনাশয়তি ইতি রুদ্রঃ।

—ঋ বে ১।১১৪।১, ভাষ্য

৭ রুতঃ শব্দরূপাঃ উপনিষদঃ। তাভিঃ দ্রবতে গম্যতে প্রতিপাদ্যতে ইতি রুদ্রঃ।

—ঋ বে ১।১১৪।১, ভাষ্য।

৮ রুৎ শব্দাত্মিকা বাণী তৎপ্রতিপাদ্যা আত্মবিদ্যা বা। তামুপাসকেভ্যো রাতি দদাতি ইতি রুদ্রঃ।

—ঋ বে ১।১১৪।১, ভাষ্য।

৯ রূণদ্ধি আবৃণোতি ইতি রুৎ অন্ধকারাদি। তৎ দৃণাতি বিদারয়তি ইতি রুদ্রঃ।

—ঋ বে ১।১১৪।১, ভাষ্য

১০ যদ্বা রুৎ জ্ঞানং রাতি দদাতি রুদ্রঃ। অথবা পাপিনো নরান্ দুঃখভোগেন রোদয়তি রুদ্রঃ।

—বা সং ১৬।১, মহীধরভাষ্য।

রুদ্র সেই ধন নিয়ে সরে পড়েন। যুদ্ধ জয় করে দেবতারা ফিরে এসে তাঁকে খুঁজে বের করেন আর সব ধন কেড়ে নেন। তখন ইনি কাঁদতে থাকেন। তার থেকেই এঁর নাম হল রুদ্র।[১]

এই কাহিনীতে রুদ্রের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব যে প্রকাশ পায় নি তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে।

রুদ্রের ভয়—রুদ্রনামের ব্যাখ্যা যাই হক না কেন এবং এর উৎপত্তি-কাহিনী যাই হক না কেন বেদসংহিতার সময় লোকে যে রুদ্রকে ভয় করত এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

আদিম মানুষের বেলা দেখা গেছে তারা যাকে ভয় করত তাকে স্তবস্তুতি করে নানা উপহার দিয়ে পূজা করে খুশী করবার চেষ্টা করত। বেদপন্থী সুসভ্য মানুষও রুদ্র সম্পর্কে তাই করেছেন। এটি মানুষের একটি সহজাত সংস্কার বলা যায়।

বেদে রুদ্রস্তুতি— ঋগ্‌বেদের তিনটি[২] সম্পূর্ণ সূক্তে রুদ্রের স্তুতি করা হয়েছে। আরেকটি সূক্তের[৩] প্রথম পাঁচটি ঋকে আছে রুদ্রের স্তুতি। এই-সব স্তুতির মধ্যে রুদ্রের ভয়ংকরমূর্তির যেমন ইঙ্গিত আছে তেমনি পরিচয় আছে তাঁর প্রসন্নমূর্তির। এর থেকেই পরবর্তী কল্যাণময় শিবের বিকাশ হয়েছে।

রুদ্র কল্যাণকারী— রুদ্র মীঢ়ুষ্টম[৪] অর্থাৎ অভীষ্টকামবর্ষী। তিনি উপাসকদের অভীষ্টকামনা পূর্ণ করেন। রুদ্র শুধু রোগ ছড়ান না, রোগীর আরোগ্যবিধানও করেন। তাঁর কাছে আছে ঔষধ।[৫] তিনি ভিষক্‌শ্রেষ্ঠ।[৬] শুধু তাই নয় তিনি 'জলাষভেষজ'[৭] অর্থাৎ কি না তাঁর মন্ত্রপড়া-জলও ঔষধ। অথর্ববেদেও রুদ্রকে 'জলাষভেষজ'[৮] বলা হয়েছে।

রুদ্র স্তবকারীদের ধনৈশ্বর্য, অন্ন, গৃহ, সুখ, আয়ু, বল, পুত্রপৌত্রাদি দান করেন;[৯] তাদের শত্রুদের বিনাশ করেন।[১০]

রুদ্র সুন্দর—ঋগ্‌বেদে রুদ্রের একটি সুন্দর ছবি ফুটে উঠেছে। তিনি কপর্দী,[১১] মীঢ়্‌[১২] অর্থাৎ নিত্যতরুণ, বরাহ[১৩] অর্থাৎ বরাহের মতো দৃঢ়াঙ্গ। তিনি কবি,[১৪] বভ্রু,[১৫] অজর,[১৬] সুবৃর[১৭] অর্থাৎ শোভন মুখ- ও গুণবিশিষ্ট। ঋগ্‌বেদের ঋষিদের কাছে রুদ্রের মূর্তিটি ছিল সুন্দর। তাই তাঁরা রুদ্রকে বলেছেন ধন্য[১৮] অর্থাৎ দর্শনীয়।

১ ঋ বে ১।১১৪।১, সায়ণভাষ্য। ২ ঋ বে ১।১১৪, ২।৩৩, ৭।৪৬ ৩ ঐ ১।৪৩

৪ ঐ, ১।৪৩।১ ৫ ঐ ১।১১৪।৫ ; ২।৩৩।২, ৪ ; ৫।৪২।১১ ; ৭।৪৬।৩ ; তৈ সং ৪।৫।১০।১

৬ ঋ বে ২।৩৩।৪ ; বা সং ১৬।৫ ৭ ঋ বে ১।৪৩।৪ ৮ অ বে ২।২৭।৬

৯ ঋ বে ২।৩৩।১, ২, ৪, ৯, ১২ ; ১০ ঐ ১।১১৪।১০ ; ২।৩৩।১১

১১ ঐ ১।১১৪।১ ১২ ঐ ১।১১৪।৫ ১৩ ঐ ১।১১৪।৫ ১৪ ঐ ১।১১৪।৪

১৫ ঐ। পরবর্তী কালের মঙ্গলময় শিবের মূল সম্ভবত এখানে।

১৬ ঐ ৬।৪৯।১০ ১৭ ঐ ১৮ ঐ

রুদ্র রক্ষাকারী— রুদ্রের প্রধান অস্ত্র ধনুর্বাণ। একাধিক ঋকে[১] তাঁকে সুধন্বা, স্বিষু (শোভনবাণ), স্থিরধন্বা, ক্ষিপ্রেষু (যাঁর বাণ ক্ষিপ্রগামী) বলা হয়েছে। রুদ্র ধনু এবং সায়ক নিয়ে জগৎ রক্ষা করছেন।[২]

রুদ্র ঈশ্বর—রুদ্র যে বিরাট্, তিনি যে মহাদেব, ঈশ্বর এবং জগতের ভর্তা তা ঋগ্‌বেদেই ব্যক্ত হয়েছে। একটি ঋকে[৩] তাঁকে স্পষ্ট ভাষায় সমস্ত জগতের মধ্যে ঐশ্বর্যে শ্রেষ্ঠ এবং বলবান্‌দের মধ্যে সবচেয়ে বলবান্ বলা হয়েছে। আরেকটি ঋকে[৪] তাঁকে বলা হয়েছে বৃহৎ রুদ্র। অন্য একটিতে[৫] দেখা যায় তিনি ভুবনের পিতা।

রুদ্রের মূর্তি—একটি ঋকে বলা হয়েছে—দৃঢ়-অবয়বযুক্ত রুদ্রের বহুরূপ। তিনি উগ্র (উগ্র=তেজস্বী,—সায়ণ); তিনি ভর্তা। দীপ্তসুবর্ণালঙ্কারে তিনি শোভা পাচ্ছেন। তিনি ঈশান (ঈশান=ঈশ্বর,—সায়ণ) এবং ভুবনের ভর্তা। তাঁর থেকে সকল প্রাণীর বল। এই বল থেকে আমরা যেন বিচ্যুত না হই।[৬]

ঋগ্‌বেদের রুদ্রমূর্তিটি যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ছিল অর্থাৎ ঋগ্‌বেদের ঋষিদের কাছে তিনি যে শরীরী সত্তা ছিলেন এখানে তার স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। অবশ্য নিদর্শন অন্যত্রও আছে। যেমন এক জায়গায় বলা হয়েছে— রুদ্র পূজনীয় বহুবিধরূপযুক্ত হার ধারণ করেছেন।[৭]

কেউ কেউ মনে করেন এই বহুবিধরূপযুক্ত হার (বিশ্বরূপং নিষ্কম্) পরবর্তী কালে মুণ্ডমালা কল্পনার আদি উৎস।[৮]

রুদ্রের যে বহু রূপ অর্থাৎ বহুদেবতা যে রুদ্রের মধ্যে মিশেছেন আলোচ্য ঋকে তারও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। লক্ষ্য করা গেছে ঋগ্‌বেদেই অগ্নি ও রুদ্র যে এক এবং ইন্দ্রও যে রুদ্রের সঙ্গে মিশে গেছেন তার স্পষ্ট নিদর্শন আছে।

রুদ্র ও বৃষভ—একাধিক ঋকে রুদ্রকে বলা হয়েছে বৃষভ।[৯] অনেকে মনে করেন[১০] এ ক্ষেত্রে রুদ্রের বৃষভ বা ষণ্ডরূপের কথাই সূচিত হয়েছে। দেবতার পশুরূপ-কল্পনা সে-যুগে প্রচলিত ছিল। বৃষভ পরবর্তী কালে হয়েছে শিবের লাঞ্ছন ও বাহন।

১ ঐ ৫।৪২।১১; ৭।৪৬।১ ২ ঐ ২।৩৩।১০
৩ ঐ ২।৩৩।৩ ৪ ঐ ৭।১০।৪ ৫ ঐ ৬।৪৯।১০
৬ স্থিরেভিরঙ্গৈঃ পুরুরূপ উগ্রো বভ্রুঃ শুক্রেভিঃ পিপিশে হিরণ্যৈঃ
ঈশানাদস্য ভুবনস্য ভূরের্ন বা উ যোষদ্রুদ্রাদসুর্যম্।—ঋ বে ২।৩৩।৯
৭ অর্হন্ বিভর্ষি সায়কানি ধন্বার্হন্নিষ্কং যজতং বিশ্বরূপম্।—ঋ বে ২।৩৩।১০
৮ R. Ś., p. 19 ৯ ঋ বে ২।৩৩।৫, ৬, ৭, ৮, ১৫
১০ R. Ś., p. 31

রুদ্রের কাছে প্রার্থনা— আমরা আগেই বলেছি রুদ্রের স্তবস্তুতির মধ্যেই তাঁর ভীষণ-রূপের পরিচয় আছে। রুদ্রের হাতে আছে 'পুরুষঘ্ন' এবং 'গোঘ্ন' আয়ুধ। সেইজন্য স্তবকারীরা রুদ্রের কাছে প্রার্থনা করেছেন এ-সব যেন তাঁদের থেকে দূরে থাকে।[১] প্রার্থনা করেছেন— আমাদের বৃদ্ধ, যুবক, বালক, গর্ভস্থ সন্তান, আমাদের পিতা, মাতা, আমাদের শরীর এ-সবের বিনাশ করো না। আমাদের পুত্রপৌত্র, অন্য আত্মীয়স্বজন, গো, অশ্ব এদের বিনাশ করো না।[২]

সে-যুগের লোকের ধারণা ছিল দুর্মতিও রুদ্রের দান। তাই স্তবকারীরা প্রার্থনা করেছেন রুদ্র যেন এটি তাঁদের না দিয়ে দূরে চলে যান।[৩]

তবে সুমতিও যে রুদ্রের দান তাও তাঁরা বিশ্বাস করতেন।[৪] শুধু তাই নয়, তাঁরা বিশ্বাস করতেন রুদ্র মুক্তিদাতা। তাই ঋষি প্রার্থনা করেছেন—

উর্বারুক অর্থাৎ কর্কটীফলকে যেমন বন্ধন থেকে মুক্ত করা হয় তেমনি আমাকে মৃত্যু বা সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত কর।[৫]

রুদ্র আর্যদেবতা— ঋগ্‌বেদের রুদ্র যজ্ঞবিরোধী নন। তাঁকে 'মেধপতি'[৬] অর্থাৎ যজ্ঞপালক এবং 'যজ্ঞসাধ'[৭] অর্থাৎ যজ্ঞসাধয়িতা বা যজ্ঞকারয়িতা বলা হয়েছে। ঋগ্‌বেদের ঋষিরা রুদ্রের শুধু স্তবস্তুতি করতেন না হবি, চরু, পুরোডাশাদি তাঁর উদ্দেশে আহুতি দিয়ে তাঁর পরিচর্য্যা করতেন।[৮] কাজেই ঋগ্‌বেদের রুদ্র খাটি আর্যদেবতা।

রুদ্র পিতৃদেবতা—লক্ষ্য করা গেছে একাধিক ঋকে রুদ্রকে মরুদ্‌গণের বা রুদ্রগণের পিতা বলা হয়েছে, ভুবনের পিতা বলা হয়েছে। পরবর্তী কালে জগৎপিতা বা পিতৃতত্ত্বরূপে শিবের যে-পরিচয় পাওয়া যায় পিতৃদেবতারূপে রুদ্রের এই পরিচয়ের মধ্যে তার সূচনা হয়েছে বলা যেতে পারে।

মরুদ্‌গণ বৃষ্টির দেবতা। কৃষি নির্ভর করে বৃষ্টির উপর। কাজেই, এদিক্ দিয়ে মরুদ্‌গণের পিতা রুদ্র কৃষির সঙ্গে যুক্ত। রুদ্র যে কৃষির দেবতা তা যজুর্বেদে[৯] স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে।

রুদ্র ধ্বংস ও সৃষ্টির দেবতা—প্রাচীনকালে কৃষি ও প্রজননের দেবতাকে অনেক

---

১ ঋ বে ১।১১৪।১০ ২ দ্রষ্টব্য ঋ বে ১।১১৪।৭,৮, ৭।৪৬।৩, ৪; ১০।১৬৯।১

৩ ঋ বে ২।৩৩।১৪ ৪ ঐ, ১।১১৪।৯

৫ উর্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ।—ঋ বে ৭।৫৯।১২

৬ ঋ বে ১।৪৩।৪ ৭ ঐ ১।১১৪।৪

৮ ঋ বে ১।১১৪।২, ৩; ২।৩৩।৪

৯ বা সং ১৬।১৮, ১৯, ৩৩ ইত্যাদি

ক্ষেত্রে একই দেবতা মনে করা হত। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রজনন বা সৃষ্টি এবং ধ্বংসেরও একই দেবতা কল্পনা করা হত।[১]

রুদ্র যে ধ্বংসের দেবতা তা লক্ষ্য করা গেছে। ঋগ্‌বেদে দেখা যায় রুদ্রের কাছে পুত্রলাভের জন্য প্রার্থনা করা হচ্ছে।[২] রুদ্র যে প্রজননেরও দেবতা এতে যেন তার ইঙ্গিত আছে। উপনিষদে রুদ্রকে স্পষ্টই 'দেবানাং প্রভবঃ'[৩] অর্থাৎ দেবতাদের উৎপত্তিস্থল বলা হয়েছে; বলা হয়েছে রুদ্র বিশ্বভুবন সৃষ্টি করেন।[৪]

একাধিক কারণে প্রজননের সঙ্গে রুদ্র যুক্ত হয়েছেন। পিতৃশক্তি ও মাতৃশক্তির মিলনে প্রজনন। সম্ভবতঃ এই কারণেই পিতৃদেবতা রুদ্র মাতৃদেবতা অম্বিকার পতি বলে গণ্য হয়েছেন।

ঋগ্‌বেদের সময়ে যে হয়েছেন তার কোনো প্রত্যক্ষ নিদর্শন অবশ্য নেই, তবে পরোক্ষ নিদর্শন আছে।

আমরা দেখেছি অদিতি মা মহাদেবীর অন্যতম আদিরূপ। আর ঋগ্‌বেদেই অদিতিকে রুদ্রদের মাতা বলা হয়েছে। এ দিকে রুদ্রকে বলা হয়েছে রুদ্রদের পিতা। কাজেই, জগদম্বা অদিতির সঙ্গে রুদ্রের সম্বন্ধটির কথা স্পষ্ট করে বলা না হলেও ঋষিদের অজ্ঞাত ছিল মনে হয় না।

ঋগ্‌বেদের সময়েই যে রুদ্রকে মা মহাদেবীর পতি মনে করা হত অন্যত্রও তার ইঙ্গিত আছে। একটি ঋকে রুদ্রকে বলা হয়েছে 'গাথপতি'।[৫] নিঘণ্টু অনুসারে গাথা বাক্-এর নাম।[৬] আর বাক্ মহাদেবীর অন্যতম রূপ।

কাজেই দেখা যাচ্ছে রুদ্র যে জগৎপিতা এবং জগদম্বার পতি এ ধারণা ঋগ্‌বেদের সময়ে অপরিচিত ছিল না।

যজুর্বেদে রুদ্র—রুদ্রের পরিচয় বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায় যজুর্বেদের বাজসনেয়ি-সংহিতায়। এই গ্রন্থের ষোড়শ অধ্যায়ের মন্ত্রগুলিকে বলা হয় শতরুদ্রিয়। পরবর্তী কালে শিবের যে-সব নাম, উপাধি, গুণাগুণ, কার্যকলাপ ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে তাদের অনেকগুলিই এই-সব মন্ত্রের মধ্যে পাওয়া যায়।

প্রথমেই রুদ্রের মন্যু এবং ইষুকে নমস্কার করা হয়েছে।[৭] বেদপন্থীরা রুদ্রের ক্রোধ এবং বাণকে যে ভীষণ ভয় করতেন এটিকে তার নিদর্শন বলা যায়। অবশ্য অন্যান্য মন্ত্রেও এ

১ H. B., Vol. I, pp. lxxxvi-lxxxvii

২ ঋ বে ২।৩৩।১ ৩ শ্বে উপ ৩।৪ ৪ ঐ ৩।২

৫ ঋ বে ১।৪৩।৪ ৬ নিঘণ্টু ১।১১ ৭ বা সং ১৬।১

নিদর্শন আছে।[১] একটি মন্ত্রে[২] রুদ্রের বাণকে কল্যাণকর করার জন্য ভীত অন্তরের প্রার্থনা উচ্চারিত হয়েছে।

অঘোর—রুদ্র ভয়ংকর কিন্তু তাঁর শরীরকে বলা হয়েছে অঘোর অর্থাৎ সৌম্য এবং শন্তম অর্থাৎ অতিশয় সুখকর।[৩] পরবর্তী কালে কল্যাণসুন্দর যে-শিবমূর্তির দর্শন মিলে এখানে তার পূর্বাভাস পাওয়া গেল।

নীলগ্রীব—রুদ্র তাম্রবর্ণ, রক্তবর্ণ এবং কপিলবর্ণ আর তিনি সুমঙ্গল।[৪] তিনি নীলগ্রীব,[৫] বিলোহিত[৬] অর্থাৎ বিশেষরূপে রক্তবর্ণ। এই নীলগ্রীব রুদ্রই পরে নীলকণ্ঠ শিবরূপে দেখা দিয়েছেন।

নীললোহিত— রুদ্র শষ্পিঞ্জর অর্থাৎ পীতবর্ণ এবং হরিকেশ[৭] অর্থাৎ তাঁর কেশ লোহিতবর্ণ বা নীলবর্ণ। তিনি তাম্র এবং অরুণ[৮] অর্থাৎ ঈষৎ-রক্তবর্ণ। রুদ্র নীললোহিত,[৯] তিনি শিতিকণ্ঠ।[১০]

বিবিধ রূপ—লক্ষ্য করা গেছে ঋগ্‌বেদেই রুদ্রের বিবিধ রূপের ধারণা প্রকাশ পেয়েছে। যজুর্বেদে এই ধারণাটি আরও বিশদভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

রুদ্র আদিত্য,[১১] তিনি সহস্রাক্ষ,[১২] সোম,[১৩] সূর্য,[১৪] তিনি শিপিবিষ্ট।[১৫] শিপিবিষ্ট অর্থ বিষ্ণু, অথবা পশুর মধ্যে অন্তর্যামিরূপে প্রবিষ্ট, অথবা যজ্ঞের অধিদেবতা, অথবা আদিত্যমণ্ডলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। রুদ্র ভব, শর্ব।[১৬]

আপামর সাধারণের দেবতা— রুদ্র জগৎপতি।[১৭] তিনি সকল শ্রেণীর মানুষের দেবতা। তাই একদিকে তিনি পুষ্টানাং পতিঃ[১৮] অর্থাৎ গুণী মানুষদের পালক, সত্বনাং পতিঃ[১৯] অর্থাৎ শরণাগত প্রাণীদের পালক আবার অন্যদিকে স্তেনানাং পতিঃ[২০] অর্থাৎ চোরদের পালক। তিনি নিচের[২১] অর্থাৎ অপহরণকরার বুদ্ধিতে যারা সর্বদা ঘুরে বেড়ায় তাদের দেবতা, বঞ্চন্ অর্থাৎ বঞ্চকদের দেবতা, আয়ুধের অর্থাৎ যাদের হাতটান আছে তাদের দেবতা, তস্করদের দেবতা, মুষ্ণদের পতি অর্থাৎ যারা ক্ষেতের থেকে ধান চুরি করে তাদের দেবতা, নিকৃন্তানাং পতিঃ[২২] অর্থাৎ রাত্রিচর রাহাজানদের দেবতা এবং কুলুঞ্চানাং পতিঃ[২৩] অর্থাৎ যারা লোকের ঘরবাড়ী কেড়ে নেয় তাদের দেবতা। কাজেই দেখা যাচ্ছে চোর ডাকাত সবার দেবতা রুদ্র।

---

১ দ্রঃ বা সং ১৬।৯-১৪, ৩।৩১ ইত্যাদি   ২ ঐ ১৬।৩   ৩ ঐ ১৬।২   ৪ ঐ ১৬।৬
৫ ঐ ১৬।৭, ৮   ৬ ঐ ১৬।৭   ৭ ঐ ১৬।১৭   ৮ ঐ ১৬।৩৯   ৯ ঐ ১৬।৪৭
১০ ঐ ১৬।২৮   ১১ ঐ ১৬।৬, ৭ (এই দুই মন্ত্রে আদিত্যরূপে রুদ্রের স্তব করা হয়েছে)
১২ ঐ ১৬।৮, ২৯   ১৩ ঐ ১৬।৩৯   ১৪ ঐ ১৬।৪৫   ১৫ ঐ ১৬।২৯   ১৬ ঐ ১৬।২৮
১৭ ঐ ১৬।১৮   ১৮ ঐ ১৬।১৭   ১৯ ঐ ১৬।২০   ২০ ঐ   ২১ ঐ
২২ ঐ ১৬।২১   ২৩ ঐ ১৬।২২

একটি মন্ত্রে[১] রুদ্রকে বলা হয়েছে তক্ষণ, রথকার, কুলাল অর্থাৎ কুম্ভকার, কর্মার অর্থাৎ কামার, নিষাদ, পুঞ্জিষ্ঠ অর্থাৎ পক্ষিঘাতক, শ্বনী অর্থাৎ কুকুরের গলায়-বাঁধা দড়ি ধরে যে চলে এবং মৃগয়ু অর্থাৎ লুব্ধক। অন্য একটি মন্ত্রে[২] তাঁকে ইষুকৃৎ ও ধন্বকৃৎ বলা হয়েছে। আবার তাঁকে স্থপতিও[৩] বলা হয়েছে। এর অর্থ রুদ্র ছিলেন এই-সব বিভিন্ন বৃত্তিজীবী লোকেদের দেবতা। পরবর্তী কালের কিরাতরূপী, ব্যাধরূপী শিবের পূর্বাভাস এখানে পাওয়া যাচ্ছে।

রুদ্র শুধু বিভিন্ন বৃত্তিজীবীদের বা তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকেদের দেবতা নন, তিনি উচ্চশ্রেণীর দ্বিজদেরও দেবতা। সেইজন্য, তাঁকে বলা হয়েছে উপবীতী[৪] অর্থাৎ যজ্ঞোপবীতধারী, মন্ত্রী অর্থাৎ মন্ত্রদীক্ষিত এবং বাণিজ[৫] অর্থাৎ বাণিজ্যজীবী বৈশ্য। রুদ্র শ্লোক্য[৬] অর্থাৎ বেদমন্ত্রাদিতে বিদ্যমান এবং অবসান্য[৭] অর্থাৎ বেদান্তে বিদ্যমান। তিনি প্রমৃশ অর্থাৎ পণ্ডিত এবং ধৃষ্ণু[৮] অর্থাৎ প্রগল্ভ। বেদ, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি সবই যে রুদ্রের অনুসরণ করে তা অথর্ববেদে[৯] স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে।

রুদ্রের নানা বেশ ও অবস্থা—যজুর্বেদে রুদ্রের নানা বেশ ও অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি কপর্দী এবং ব্যুপ্তকেশ[১০] অর্থাৎ মুণ্ডিতমস্তক, উষ্ণীষী,[১১] কৃত্তিবাস।[১২] তিনি হ্রস্ব, বামন, বৃহৎ, বৃদ্ধ, বর্ষীয়ান্, অগ্র্য এবং প্রথম।[১৩]

রুদ্রের স্বপ্ত, জাগ্রত, শয়ান, আসীন, অবস্থিত, ধাবমান[১৪] এমনি নানা অবস্থার উল্লেখ আছে। আবার বয়সাদি-ভেদে তাঁর বিভিন্ন অবস্থা বা রূপেরও উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ, পূর্বজ অর্থাৎ জগতের আদিতে হিরণ্যগর্ভরূপে উৎপন্ন, অপরজ অর্থাৎ প্রলয়ে কালাগ্নিরূপে জাত, মধ্যম অর্থাৎ সৃষ্টিসংহারের মধ্যে দেবতির্যকাদিরূপে জাত, অপগল্ভ (অব্যুৎপন্নেন্দ্রিয়), জঘন্য (গবাদির পশ্চাদ্ভাগ জঘন, তাতে জাত), বুধ্ন্য অর্থাৎ বৃক্ষাদির মূলে জাত।[১৫]

একাধারে দুই রূপ—রুদ্র একাধারে সভা এবং সভাপতি, অশ্ব এবং অশ্বপতি, শ্বা ও শ্বপতি, গণ এবং গণপতি, ব্রাত (উবট ব্রাত শব্দের অর্থ করেছেন গণবিশেষ। ব্রাত মনে হয় 'জন' বা tribe) এবং ব্রাতপতি, গৃৎস (মেধাবী বা বিষয়লম্পট) এবং গৃৎসপতি, বিরূপ এবং বিশ্বরূপ,[১৬] সেনা এবং সেনানী, রথী এবং অরথী, ক্ষত্তা অর্থাৎ রথাধিষ্ঠাতা এবং সংগ্রহীতা অর্থাৎ সারথি। তিনি মহান্ এবং অর্ভক।[১৭]

১ বা সং ১৬।২৭ ২ ঐ ১৬।৪৬ ৩ ঐ ১৬।১৯ ৪ ঐ ১৬।১৭ ৫ ঐ ১৬।১৯
৬ ঐ ১৬।৩৩ ৭ ঐ ৮ ঐ ১৬।৩৬ ৯ অ বে ১৫।৬-১২ ১০ বা সং ১৬।২৯
১১ ঐ ১৬।২২ ১২ ঐ ৩।৬১ ১৩ ঐ ১৬।৩০ ১৪ ঐ ১৬।২৩ ১৫ ঐ ১৬।৩২
১৬ ঐ ১৬।২৪-২৫, ২৮ ১৭ ঐ ১৬।২৬

অরণ্য পর্বতাদির সঙ্গে যোগ—গাছপালা, অরণ্য পর্বতাদির সঙ্গে রুদ্রের বিশেষ যোগ। তিনি হরিৎপর্ণ-বৃক্ষরূপী,[১] তিনি ওষধিপতি,[২] বনসমূহের অধীশ্বর,[৩] অরণ্যসমূহের অধীশ্বর,[৪] শষ্প্য,[৫] অর্থাৎ শষ্পে বিদ্যমান, উলপ্য,[৬] অর্থাৎ বল্বজাদি তৃণবিশেষে বিদ্যমান, তিনি পর্ণ।[৭]

একাধিক মন্ত্রে[৮] রুদ্রকে গিরিশন্ত, গিরিশ, গিরিত্র বলা হয়েছে।

জল আকাশ প্রভৃতির সঙ্গে যোগ—জলের সঙ্গেও রুদ্রের যোগ আছে। একটি মন্ত্রে[৯] তাঁকে বলা হয়েছে কুল্য। মহীধর কুল্য শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন কুল্যা অর্থ কৃত্রিম সরিৎ তাতে বিদ্যমান যিনি তিনি কুল্য অথবা কুল অর্থ দেহ, তাতে অন্তর্যামিরূপে বিদ্যমান যিনি তিনি কুল্য। ঐ মন্ত্রেই রুদ্রকে সরস্য অর্থাৎ সরসীতে বিদ্যমান, বৈশন্ত অর্থাৎ তড়াগে বিদ্যমান এবং কূপ্য অর্থাৎ কূপে বিদ্যমান বলা হয়েছে। অন্যত্র তাঁকে সিকত্য অর্থাৎ সিকতায় বিদ্যমান, প্রবাহ্য[১০] অর্থাৎ প্রবাহে বিদ্যমান, হ্রদ্য[১১] অর্থাৎ স্থিরজলপ্রদেশে বিদ্যমান, ঊর্ম্য অর্থাৎ কল্লোলে বিদ্যমান, অবস্বন্য অর্থাৎ স্থিরজলে বিদ্যমান, দ্বীপ্য[১২] অর্থাৎ দ্বীপে বিদ্যমান, নিবেষ্প্য[১৩] অর্থাৎ নীহারে বিদ্যমান এবং ফেন্য[১৪] অর্থাৎ ফেনায় বিদ্যমান বলা হয়েছে।

একটি মন্ত্রে[১৫] রুদ্রকে বীধ্র্য অর্থাৎ নির্মল শরদভ্রে বিদ্যমান, আতপ্য অর্থাৎ আতপে বিদ্যমান, মেঘ্য অর্থাৎ মেঘে বিদ্যমান, বিদ্যুত্য অর্থাৎ বিদ্যুতে বিদ্যমান, বর্ষ্য অর্থাৎ বৃষ্টিতে বিদ্যমান, অবর্ষ্য অর্থাৎ অবর্ষণে বিদ্যমান বলা হয়েছে। অন্যত্র[১৬] বলা হয়েছে তিনি বাত্য অর্থাৎ বাতাসে বিদ্যমান।

রুদ্র ও কৃষি—কৃষির সঙ্গেও রুদ্র যুক্ত। একটি মন্ত্রে[১৭] তাঁকে বলা হয়েছে অন্নানাং পতিঃ অর্থাৎ অন্নসমূহের অধীশ্বর এবং ক্ষেত্রাণাং পতিঃ অর্থাৎ ক্ষেত্রসমূহের অধীশ্বর। মনে হয় এই অন্নানাং পতিঃই পরবর্তীকালে অন্নপূর্ণাপতি শিবে রূপান্তরিত হয়েছেন। অন্য একটি মন্ত্রে[১৮] রুদ্রকে উর্বর্য অর্থাৎ উর্বর ভূমিতে জাত ধান্যাদিতে বর্তমান এবং খল্য অর্থাৎ খল বা খলাধানে বিদ্যমান বলা হয়েছে।

রুদ্র ও পশু—পশুর সঙ্গে বিশেষ করে গরুর সঙ্গে রুদ্রের বিশেষ যোগ লক্ষ্য করা যায়। রুদ্রকে বলা হয়েছে শংগু।[১৯] উবট শংগুশব্দের অর্থ করেছেন যিনি গরুগুলির সুখ বিধান করেন তিনি শংগু। রুদ্র ব্রজ্য[২০] অর্থাৎ গোসমূহে বিদ্যমান এবং গোষ্ঠ্য[২১] অর্থাৎ গোষ্ঠে বিদ্যমান। রুদ্র পশুপতি।[২২]

১ বা সং ১৬।১৭ ২ ঐ ১৬।১৯ ৩ ঐ ১৬।১৮ ৪ ঐ ১৬।২০ ৫ ঐ ১৬।৪২
৬ ঐ ১৬।৪৫ ৭ ঐ ১৬।৪৬ ৮ ঐ ১৬।২, ৩, ৪, ২৯ ৯ ঐ ১৬।৩৭ ১০ ঐ ১৬।৪৩
১১ ঐ ১২ ঐ ১৬।৩১ ১৩ ঐ ১৬।৪৫ ১৪ ঐ ১৬।৪২ ১৫ ঐ ১৬।৩৮
১৬ ঐ ১৬।৩৯ ১৭ ঐ ১৬।১৮ ১৮ ঐ ১৬।৩৩ ১৯ ঐ ১৬।৪০ ২০ ঐ ১৬।৪৪
২১ ঐ ২২ ঐ ১৬।১৭, ২৮, ৪০

পথের দেবতা—রুদ্রের সঙ্গে পথের একটা যোগাযোগ আছে। রুদ্র পথের দেবতা। তিনি পথীনাং পতিঃ[১] অর্থাৎ পথের অধীশ্বর। একটি মন্ত্রে আছে[২] তিনি স্রুত্য অর্থাৎ ক্ষুদ্র পথে বিদ্যমান, পথ্য অর্থাৎ রথাদিযোগ্য পথে বিদ্যমান, কাট্য অর্থাৎ বিষম পথে বিদ্যমান। অন্যত্র আছে তিনি প্রপথ্য[৩] অর্থাৎ প্রকৃষ্ট পথে বিদ্যমান।

রুদ্রের ভীষণ যোদ্ধৃমূর্তি— কিন্তু রুদ্রের অন্যতম প্রধান পরিচয় তিনি ভীষণ। একাধিক মন্ত্রে[৪] তাঁর যোদ্ধরূপের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বিল্মী অর্থাৎ শিরস্ত্রাণধারী, কবচী, বর্মী, নিষঙ্গী অর্থাৎ খড়্গধারী, তীক্ষ্ণেষু, আয়ুধী, আশুরথ, শূর, শতধন্বা, সেনানী।

একাধিক মন্ত্রে[৫] রুদ্রের ভীষণরূপ সূচিত হয়েছে। তিনি উগ্র, ভীম, অগ্রেবধ অর্থাৎ সামনে যারা আছে তাদের বধকারী, দূরেবধ অর্থাৎ দূরে যারা আছে তাদের বধকারী, হন্তা, হনীয়ান্ অর্থাৎ অতিশয় হন্তা, অভিঘ্নন্ অর্থাৎ শত্রুঘাতী, অখিদন্ অর্থাৎ অভক্তদের দৈন্যবিধানকারী এবং রেষ্ম্য অর্থাৎ প্রলয়কালে বিদ্যমান।

রুদ্র মঙ্গলময়—রুদ্র শুধু ভীষণ নন মঙ্গলময়ও বটেন। তাই তাকে বলা হয়েছে ক্ষেম্য[৬] অর্থাৎ সমস্ত কুশলের মধ্যে বিদ্যমান। তিনি 'তার'।[৭] উবট তারশব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন রুদ্র সংসার থেকে তরিয়ে দেন তাই তিনি তার। মহীধরও এই ব্যাখ্যাই করেছেন।

মহাদেবীর অন্যতম নাম তারা, তিনি ত্রাণকারিণী। যিনি ত্রাণ করেন তাঁকে পুরুষরূপে ভাবলে তিনি তার আর স্ত্রীরূপে ভাবলে তারা। তন্ত্রমতে শিবশক্তি অভিন্ন। কাজেই, 'তার'ই তারা-ভাবের আদি উৎস হতে পারেন।

রুদ্র শিব—রুদ্র শান্ত, সুখকর। একটি মন্ত্রে[৮] তাঁকে শংভব, ময়োভব, শংকর এবং ময়স্কর বলা হয়েছে। মহীধরের ভাষ্য অনুসারে রুদ্রের থেকে সুখ হয় তাই তিনি শংভব। ময়োভব অর্থ সংসারসুখ-প্রদানকারী, শংকর অর্থ লৌকিকসুখ-বিধানকারী আর ময়স্কর অর্থ যিনি মোক্ষসুখ প্রদান করেন। ঐ মন্ত্রেই রুদ্রকে বলা হয়েছে শিব এবং শিবতর।

বেদসংহিতায় এই প্রথম রুদ্রের শিব ও শংকর নাম ব্যবহৃত হল।

শিবশব্দের ব্যাখ্যা— উবট শিবশব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন শিব শান্ত নির্বিকার।[৯]

১ বা সং ১৬।১৭ ২ ঐ ১৬।৩৭ ৩ ঐ ১৬।৪৩ ৪ ঐ ১৬।১৭, ২০, ২৯, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৪০

৫ ঐ ১৬।৩৩, ৪০, ৪৬, ৪৮ ৬ ঐ ১৬।৩০ ৭ ঐ ১৬।৪০

৮ নমঃ শংভবায় চ ময়োভবায় চ নমঃ শংকরায় চ
ময়স্করায় চ নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

—বা সং ১৬।৪১

৯ শিবঃ শান্তো নির্বিকারঃ।—বা সং ১৬।৪।৪১, ভাষ্য

মহীধর বলেছেন শিব কল্যাণরূপ নিষ্পাপ।[১] ভাষ্যকারেরা শিবশব্দের অর্থ করেছেন কিন্তু ব্যুৎপত্তিনির্ণয় করেন নি। যজুর্বেদের সময়কার কোনো ব্যুৎপত্তিনির্ণয় পাওয়া যায় না। যা পাওয়া গেছে তা অনেক পরবর্তী। 'বশ কান্তৌ' এই অর্থে কেউ কেউ √বশ্ ধাতু থেকে শিব শব্দ নিষ্পন্ন করেছেন। এঁদের মতে বর্ণব্যত্যয়হেতু বশ্ ধাতু থেকে শিবশব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। আবার অন্যেরা √শী ধাতু থেকে শিবশব্দ নিষ্পন্ন করেছেন।[২]

কিন্তু কেউ কেউ এই ধরণের ব্যুৎপত্তি তেমন যুক্তিযুক্ত মনে করেন না। তাঁদের মতে শিবশব্দটি এসেছে আর্যেতর ভাষা থেকে। তামিল শিবপ্পু- বা শিবন্-শব্দের অর্থ রক্তবর্ণ। রুদ্র রক্তবর্ণ। তাই রুদ্রকে বলা হল শিব।

এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করে কিছু বলা কঠিন। কেন না, যজুর্বেদের সময়ে তামিল শিবপ্পু বা শিবন্ শব্দ যে প্রচলিত ছিল তার কোনো সাহিত্যিক বা অন্যবিধ প্রমাণ আছে বলে জানা যায় না। তবে এমনও হতে পারে যজুর্বেদের সময় শিবশব্দটি আর্য এবং আর্যেতর উভয় ভাষাতেই ব্যবহৃত হত কিন্তু ভিন্ন অর্থে। আর্যভাষায় ব্যবহৃত হত কল্যাণরূপ অর্থে আর আর্যেতর ভাষায় রক্তবর্ণ অর্থে।

কেন না, যে-মন্ত্রটিতে শিবশব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তার অন্য সব-কটি শব্দই সুখ এবং কল্যাণবাচক, একটিও বর্ণবাচক নয়। এই অবস্থায় শুধু শিবশব্দটি তামিল বর্ণবাচক শিবন্-শব্দ থেকে এসেছে এরূপ অনুমানের সপক্ষে বিশেষ কোনো যুক্তি আছে মনে হয় না।

অন্য একটি মন্ত্রে[৩] রুদ্রকে বলা হয়েছে—অহিংসন্নঃ শিবোঽতীহি। মহীধর এর ভাষ্য করেছেন—আমাদের হিংসা না করে আমাদের পূজা দ্বারা শিব্ অর্থাৎ সন্তুষ্ট ও কোপরহিত হয়ে পর্বত ডিঙিয়ে চলে যাও।[৪]

এখানেও দেখা যাচ্ছে শিব শব্দ কল্যাণবাচক, বর্ণের সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই। এতেও আমাদের পূর্ব অনুমানের সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে।

শিব-'জন'এর দেবতা শিব—এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় ঋগ্বেদে শিব[৫] নামে একটি 'জন'-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজা সুদাস পক্থ, ভলান, বিষাণী প্রভৃতি যে-সব

১ শিবঃ কল্যাণরূপো নিষ্পাপঃ।—বা সং ১৬।৫১, ভাষ্য

২ হিংসিবাস্তোশ্চিসহেণবেদ্যা বশকান্তৌ শিবস্মৃতঃ।
বর্ণব্যত্যয়তঃসিদ্ধো পশ্যকঃ কশ্যপো যথা।—দ্রঃ সৌন্দর্যলহরীর ১ম শ্লোকের লক্ষ্মীধরকৃত টীকা।

৩ বা সং ৩।৬১

৪ কঃ অস্মান্ অহিংসন্ হিংসামকুর্বন্ শিবঃ অস্মদীয়পূজয়া সন্তুষ্টঃ কোপরহিতো ভূত্বা অতীহি পর্বতমতিক্রম্য গচ্ছ।—ঐ, ভাষ্য

৫ ঋ বে ৭।১৮।৭

'জন'দের দাশরাজ্ঞ যুদ্ধে পরাভূত করেন শিব তাদের অন্যতম 'জন'। ঐতিহাসিক যুগে (মৌর্যশাসনের অব্যবহিত পূর্বে) শিবি বলে একটি জনের কথা জানা যায়। ঝং জেলার দক্ষিণ-অংশ এবং রাবিনদীর নিম্ন-উপত্যকা এই শিবিদের এবং মালবদের অধিকারে ছিল।[১] সম্ভবতঃ এরাই ঋগ্‌বেদোক্ত শিব-জন। কেন না, দেখা যায় ঐ সময়ে ঋগ্‌বেদোক্ত পুরু-জনও তক্ষশীলার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে রাজত্ব করছে।[২]

এই 'জন' আর্য কি আর্যেতর বলা যায় না। আমাদের মনে হয় শিব ছিলেন এই শিব-'জন'-এর আরাধ্য দেবতা (tribal god)। জনের নামে দেবতার নাম হয়েছে অথবা দেবতার নামেও জনের নাম হতে পারে। অনুমান করা যায় শিব-'জন'-এর শিব ছিলেন সৌম্য কল্যাণময় দেবতা। যজুর্বেদের সময় ইনি রুদ্রের সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছেন এবং সেই থেকে রুদ্রকেও শিব বা কল্যাণময় বলা হচ্ছে।

আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে রুদ্র—এবার পূর্বকথায় ফিরে আসা যাক। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও রুদ্রের অধিকার সুদৃঢ়। একটি মন্ত্রে[৩] বলা হয়েছে রুদ্র পার্য অর্থাৎ সংসারসমুদ্রের পারে জীবন্মুক্তরূপে বিরাজমান, অবার্য অর্থাৎ সংসারের মধ্যে সংসারিত্বে বিদ্যমান, উত্তরণ অর্থাৎ উৎকৃষ্ট তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা সংসার উত্তরণের হেতু। অন্যত্র তাঁকে বলা হয়েছে ভবস্য হেতিঃ[৪] অর্থাৎ সংসারনিবর্তক।

রুদ্র পাপীদের দণ্ডবিধান করেন। সেইজন্য তাঁকে বলা হয়েছে দ্রাপি[৫] অর্থাৎ তিনি পাপীদের কুৎসিংগতি বিধান করেন। তিনি যাম্য[৬] অর্থাৎ পাপীদের নরকাতিজাতা।

রুদ্রের অবস্থান—সব অদ্ভুত অদ্ভুত স্থানে রুদ্রের অবস্থান নির্দেশ করা হয়েছে। তিনি কিংশিল[৭] অর্থাৎ যে-সব জায়গায় ছোট ছোট পাথরের টুকরো বা কাঁকড় আছে সেই-সব জায়গায় থাকেন, ইরিণ্য[৮] অর্থাৎ উষর ভূমিতে বিরাজমান, গহ্বরেষ্ঠ[৯] অর্থাৎ গিরিগুহাদিতে বিরাজমান, অবট্য[১০] অর্থাৎ গর্তে বিরাজমান।

একটি মন্ত্রে[১১] রুদ্রকে শুষ্ক্য অর্থাৎ শুষ্ক কাষ্ঠে বিরাজমান, হরিত্য অর্থাৎ আর্দ্র কাষ্ঠে বিদ্যমান, পাংসব্য অর্থাৎ ধূলিতে বিদ্যমান, রজস্য অর্থাৎ পরাগে বিদ্যমান, লোপ্য অর্থাৎ অগম্য প্রদেশে বিদ্যমান এবং উর্ব্য অর্থাৎ বড়বাগ্নিতে বিদ্যমান বলা হয়েছে।

রুদ্র বাস্তব্য[১২] অর্থাৎ বাস্তুতে বিরাজমান, বাস্তুপ[১৩] অর্থাৎ বাস্তুর পালক। তিনি গেহ্য এবং তল্প্য[১৪] অর্থাৎ ঘরেও তিনি এবং শয্যায়ও তিনি বিরাজমান।

---

১ A. H. I, p. 65 ২ Ibid ৩ বা.সং ১৬।৪২ ৪ ঐ ১৬।১৮ ৫ ঐ ১৬।৪৭
৬ ঐ ১৬।২০ ৭ ঐ ১৬।৪০ ৮ ঐ ৯ ঐ ১৬।৪৪ ১০ ঐ ১৬।৩৮
১১ ঐ ১৬।৪৫ ১২ ঐ ১৬।৩৯ ১৩ ঐ ১৪ ঐ ১৬।৪৪

রুদ্র ভগবান্—ঘরে বাইরে সর্বত্র বিরাজমান রুদ্র ভগবান্।[1] তিনি হৃদয্য[2] অর্থাৎ হৃদয়ের অন্তর্যামী।

একটি মন্ত্রে[3] রুদ্রকে বলা হয়েছে দরিদ্র। তিনি দরিদ্রের দেবতা। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায় বাংলা মঙ্গলকাব্যাদিতেও শিবকে দরিদ্ররূপে চিত্রিত করা হয়েছে।

রুদ্র অনেক—রুদ্র এক আবার অনেক।[4] যজুর্বেদে বলা হয়েছে পৃথিবীতে অসংখ্য সহস্র রুদ্র বিদ্যমান ;[5] অন্নরূপী এঁদের বাণ।[6] অন্তরিক্ষেও[7] অনেক রুদ্র আছেন ; বায়ুরূপী এঁদের বাণ।[8] নীলগ্রীব শিতিকণ্ঠ রুদ্রেরা আছেন দ্যুলোকে ;[9] বৃষ্টিরূপী এঁদের বাণ।[10] নীলগ্রীব হরিদ্বর্ণ রুদ্রদের অবস্থান বৃক্ষে।[11] ভূতপতি, মুণ্ডিতমুণ্ড এবং জটাজুটধারী সব রুদ্র।[12] পথের অধিপতি, পথের রক্ষক, এবং অন্নের দ্বারা প্রাণীদের পোষণকারী সব রুদ্র।[13] সৃকাহস্ত খড়্গধারী সব রুদ্র তীর্থাদিতে ঘুরে বেড়ান।[14] অন্নাদি এবং ক্ষীরোদকাদিতে রুদ্রদের অবস্থান।[15] রুদ্রেরা সব দশদিক্ আশ্রয় করে আছেন।[16]

দেখা যাচ্ছে পরবর্তী কালের পরব্রহ্ম পরশিব মহেশ্বরের ভাবটি যজুর্বেদেই দানা বেঁধেছে।

রুদ্রের কাছে প্রার্থনা— ঋগ্‌বেদের মতো যজুর্বেদেও রুদ্রের কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে। একই ধরণের প্রার্থনা। যেমন—যাতে আমাদের দ্বিপদ ও চতুষ্পদের সুখ হয়, সবপ্রকার সমৃদ্ধি হয়, আমাদের গ্রাম আপদশূন্য হয় সেইজন্য রুদ্রকে স্মরণ করি।[17]

হে রুদ্র, তোমার শান্ত তনু আমাদের সুখে বাঁচিয়ে রাখুক, সর্বদা আমাদের কল্যাণকারী ঔষধরূপে ব্যাধি দূর করুক।[18]

আমাদের পুত্রপৌত্র, আয়ু, গো, অশ্ব, ভৃত্য—এদের বিনাশ কোরো না।[19]

আমাদের পুত্রপৌত্র ও পশুকে বধ করো না, ভয় দেখিও না।[20] যজমানদের ভয় নিবৃত্তির জন্য তোমার ধনু জ্যাযুক্ত কর, তাদের পুত্রপৌত্রদের সুখে রাখ।[21] ইত্যাদি।

তবে নূতন ধরণের একটি প্রার্থনাও পাওয়া যাচ্ছে। যথা—রাক্ষসীদের আমাদের থেকে দূর করে দাও, সব রকমের পাপ বিনাশ কর।[22]

শতরুদ্রিয়ের রুদ্রের সঙ্গে শাক্তদের আরাধ্যা মহাদেবীর নানা বিষয়ে মিল লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

১ বা সং ১৬।৫২, ৫৩ ২ ঐ ১৬।৪৪ ৩ ঐ ১৬।৪৭ ৪ ঐ ১৬।২২-২৬, ৫৪-৬৬ ইত্যাদি
৫ ঐ ১৬।৫৪ ৬ ঐ ১৬।৬৬ ৭ ঐ ১৬।৫৫ ৮ ঐ ১৬।৬৫ ৯ ঐ ১৬।৫৬
১০ ঐ ১৬।৬৪ ১১ ঐ ১৬।৫৮ ১২ ঐ ১৬।৫৯ ১৩ বা সং ১৬।৬০ ১৪ ঐ ১৬।৬১
১৫ ঐ ১৬।৬২ ১৬ ঐ ১৬।৬৩ ১৭ ঐ ১৬।৪৮ ১৮ ঐ ১৬।৪৯ ১৯ ১৬।১৫
২০ ঐ ১৬।৪৭ ২১ ঐ ১৬।৫০ ২২ ঐ ১৬।৫

১ উভয়েই সকল শ্রেণীর সকল স্তরের মানুষের দেবতা।

২ উভয়েরই দুটিরূপ—উগ্র, ভয়ংকর আর সৌম্য, কল্যাণকর।

৩ রুদ্র চোর, ডাকাত প্রভৃতির দেবতা; মা কালীও চোর ডাকাত প্রভৃতির দেবতা।

৪ রুদ্র কৃষির সঙ্গে যুক্ত; দেবীও একাধিকরূপে কৃষির সঙ্গে যুক্ত।

৫ রুদ্রের সঙ্গে জলের বিশেষ যোগ; তেমনি দেবীরও জলের সঙ্গে বিশেষ যোগ। পীঠস্থানের আলোচনার সময় তা লক্ষ্য করা গেছে।

৬ রুদ্র কৃত্তিবাস; মৃগচর্মপরিহিতা দেবীরও দর্শন মিলে।

৭ রুদ্র যোদ্ধা, দেবীও রণরঙ্গিণী। দেবীর আয়ুধগুলির মধ্যে রুদ্রের আয়ুধ লক্ষ্য করা যায়।

৮ রুদ্র ভগবান্, অন্তর্যামী; দেবী ভগবতী, অন্তর্যামিনী।

৯ রুদ্র ত্রাণ করেন তাই তিনি তার; দেবীও ত্রাণ করেন তাই তিনি তারা।

অবশ্য, দেবী যেখানে রুদ্রের শক্তি রুদ্রাণী সেখানে রুদ্রের সঙ্গে তাঁর কোনো ভেদই নেই। কেন না, দেবের যে-রূপ, যে-গুণ, যে-কর্ম, যে-আয়ুধ, যে-বাহন, দেবীরও তাই।[১]

অথর্ববেদে রুদ্র—অথর্ববেদে রুদ্রের পরিচয় আরও ব্যাপক। নানা দেবতা রুদ্রের সঙ্গে একীভূত হয়েছেন এরূপ নিদর্শনও পাওয়া যায়। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ভব, শর্ব, রুদ্র, ঈশান, মহাদেব, উগ্র, পশুপতি এঁদের অথর্ববেদে[২] পৃথক্ দেবতা বলা হয়েছে। যজুর্বেদেও দেখা যায় ভব, শর্ব, মহাদেব, পশুপতি, উগ্র, রুদ্র, ভীম এঁরা পৃথক্ দেবতা।[৩] ভব এবং শর্ব যে পৃথক্ দেবতা শতপথ-ব্রাহ্মণেও তার ইঙ্গিত আছে। তাতে[৪] দেখা যায় প্রাচ্যদেশীয়েরা রুদ্রকে বলতেন শর্ব[৫] আর পশ্চিমের বাহিকেরা বলতেন ভব।[৬]

আবার ভব এবং শর্ব যে রুদ্রের সঙ্গে একীভূত হয়ে যাচ্ছিলেন তার নিদর্শনও অথর্ববেদেই আছে। উক্তসংহিতায় ভবাশর্বৌ[৭] পদের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ঋগ্বেদাদিতে

১ পূজাপার্বণ, পৃঃ ৯১ ২ অ বে ১১।২।১৪, ১৬; ১৫।৫ ৩ বা সং ৩৯।৭-৯

তবে উক্ত সংহিতাতেই (১৬।২৮, ৪০) দেখা যায় ভব শর্বাদি দেবতা রুদ্রের সঙ্গে একীভূত হয়েছেন।

৪ শ ব্রা ১।৭।৩।৮

৫ শর্ব যে পূর্বাঞ্চলের দেবতা তার একটি পরোক্ষ নিদর্শনও আছে। শর্বের স্ত্রীরূপ শর্বাণী। পূর্বভারতে একদা যে দেবী শর্বাণী বা সর্বানীর পূজা প্রচলিত ছিল ত্রিপুরা জেলায় (পূর্বপাকিস্তান) দেউলবাড়ি গ্রামে প্রাপ্ত সপ্তম শতাব্দীর অষ্টভুজা সর্বাণীমূর্তি তার একটি ঐতিহাসিক প্রমাণ। এই মূর্তি সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

৬ ভব সম্পর্কেও অনুরূপ পরোক্ষ নিদর্শন আছে। ভবের স্ত্রীরূপ ভবানী। লক্ষ্য করা গেছে পশ্চিম-ভারতের মহারাষ্ট্র অঞ্চলে ভবানী বা অম্বা-ভবানীর প্রভাবপ্রতিপত্তি খুব বেশী। ৭ অ বে ১১।২

রুদ্রের কাছে যে-সব প্রার্থনা করা হয়েছে অথর্ববেদে ভবশর্বের কাছে সেই সব প্রার্থনাই করা হয়েছে।[১] একটি মন্ত্রে ভবকে সহস্রাক্ষ রুদ্র বলা হয়েছে।[২]

অসিত রুদ্র—অথর্ববেদে রুদ্রকে বলা হয়েছে কৃষ্ণ, অসিত।[৩] হয়ত বা এই অসিত কৃষ্ণ রুদ্রেরই স্ত্রীরূপ কালী।

মানুষ সে-যুগে অন্ধকারকে ভীষণ ভয় করত। অন্ধকারের মধ্য থেকে অতর্কিতে আক্রমণ করে বসে মৃত্যু। তাই এত ভয়। সেইজন্য যে-দেবতা ভয়ংকর, যিনি মৃত্যু ঘটান, তারা তাঁকে কালো কল্পনা করেছে। তাই রুদ্র অসিত, কৃষ্ণ; কালী অসিতা, কৃষ্ণবর্ণা।

রুদ্র কালো, অতএব, তিনি আর্যেতর লোকেদের দেবতা, কেউ কেউ এমন কথা মনে করতে পারেন। কিন্তু এরূপ মনে করার হেতু নাই। কেন না, আর্যদের মধ্যেও কালো লোকের দেখা পাওয়া যায়। কণ্বরা বেদমার্গী ব্রাহ্মণ। এঁরা অবশ্যই আর্য। কিন্তু ঋগ্‌বেদে[৪] এঁদের শ্যাব অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ বলা হয়েছে।

রুদ্র ও মৃত্যু—রুদ্র কালো, মৃত্যুও কালো।[৫] আর রুদ্র যে দ্বিপদ চতুষ্পদ সবার মৃত্যু ঘটান বেদসংহিতাতে এ কথা অনেকবার বলা হয়েছে। কাজেই, রুদ্রের সঙ্গে মৃত্যুর ও যমের একটা যোগাযোগ বেদসংহিতার সময় থেকেই দেখা যায়।

তৈত্তিরীয়সংহিতাতে[৬] আছে রুদ্র যামা; অর্থাৎ তিনি যমলোকে পাপিশিক্ষকরূপে অবস্থান করেন। অথর্ববেদের একটি মন্ত্রে[৭] যম, মৃত্যু ও শর্বকে শত্রুবধ করতে বলা হয়েছে। অন্য একটি মন্ত্রে[৮] যমদূত এবং মৃত্যুদূতদের বলা হয়েছে শত্রুদের মৃত্যুর কবলে নিয়ে যেতে। অন্যত্র[৯] আছে রুদ্রের পুত্র মরুদ্‌গণ মৃতকে যমলোকে বহন করে নিয়ে যান।

বাজসনেয়িসংহিতায় রুদ্রকে বলা হয়েছে কুকুর।[১০] অথর্ববেদের একটি মন্ত্রে[১১] রুদ্রের প্রকাণ্ডমুখ কুকুরদের কথা আছে। আবার ঋগ্‌বেদের[১২] ও অথর্ববেদের[১৩] মন্ত্রে যমের দুটি কুকুরের উল্লেখ আছে।

পরবর্তী কালে দেখা যায় ভৈরবরূপী শিবের বাহন কুকুর। মধ্যযুগে নির্মিত কুকুরসহ ভৈরবমূর্তি পাওয়া গেছে।[১৪]

কাজেই দেখা যাচ্ছে মৃত্যু বা যমের সঙ্গে রুদ্রের নানাভাবে যোগ রয়েছে। পরবর্তী কালে শিব হয়েছেন মৃত্যুঞ্জয়।

১ অ বে ১১।২ ২ ঐ ১১।২।৩ ৩ অ বে ১১।২।১৮ ৪ ঋ বে ১০।৩১।১১
৫ মৃত্যুর্বৈ তমঃ।—শ ব্রা ১৪।৪।১।৩২ ৬ তৈ সং ৪।৫।৩।৩ ৭ অ বে ৬।৯৩।১ ৮ ঐ ৮।৮।১১
৯ ঐ ১৮।২।২২ ১০ বা সং ১৩।২৮ ১১ অ বে ১১।২।৩০ ১২ ঋ বে ১০।১৪।১২
১৩ অ বে ১৮।২।১২ ১৪ D. H. I., p. 482

রুদ্র ও কাল—রুদ্রের সঙ্গে কালেরও একটা যোগ লক্ষ্য করা যায়। দেখা গেছে রুদ্র একাধারে সংহার এবং সৃষ্টির দেবতা। কালও তাই। অথর্ববেদেই[১] কালের স্রষ্টারূপ প্রকাশ পেয়েছে। পরবর্তী কালে বিশেষ করে কালের স্রষ্টারূপ ও সংহারকরূপ উভয়ই প্রকটিত হয়েছে।[২]

রুদ্র হয়ে পড়েন মহাকাল। তিনি মহাকালীর পুরুষরূপ। এখানে উল্লেখ করা যায় মহাভারতে রুদ্র তথা শিবকে কাল, অন্তকারী মৃত্যু এবং যম বলা হয়েছে[৩] এবং মহাকাল[৪] বলে তাঁকে নমস্কার করা হয়েছে।

পশুপতি—যজুর্বেদ ও অথর্ববেদের একাধিক মন্ত্রে রুদ্রকে বলা হয়েছে পশুপতি। এই পশু কারা অথর্ববেদের একটি মন্ত্রে তা পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। তাতে রুদ্রকে বলা হয়েছে, তোমার পশুগুলি পাঁচভাগে বিভক্ত—গো, অশ্ব, মানুষ, মেষ এবং ছাগ।[৫]

তন্ত্রশাস্ত্র অনুসারে সাধারণ মানুষ পশু। এই তান্ত্রিক মতের শ্রৌত সমর্থন এখানে পাওয়া যাচ্ছে।

ব্রাত্য—অথর্ববেদের সমগ্র পঞ্চদশকাণ্ড জুড়ে ব্রাত্যের স্তবগান ও মহিমা প্রচার করা হয়েছে। এই ব্রাত্য রুদ্র। উক্ত কাণ্ডের সূক্তগুলিতে ব্রাত্যের যে-রূপ চিত্রিত হয়েছে তাতে দেখা যায় তিনি উপনিষদের ব্রহ্মের মতোই পরম দেবতা বা সর্বোচ্চ দেবতত্ত্ব হয়ে পড়েছেন। শূলিকোপনিষদের[৬] মতে অথর্ববেদবর্ণিত ব্রহ্মের নানা রূপের অন্যতম রূপ ব্রাত্য।

বলা যায় অথর্ববেদের সময়েই রুদ্রশিব শৈব এবং শাক্ত দর্শনে বর্ণিত পরমশিব হয়ে গেছেন।

ধ্বংসকারী রূপ—তবে ঋগ্‌বেদ ও যজুর্বেদের মতো অথর্ববেদেও রুদ্রের ধ্বংসকারী রূপ ব্যক্ত হয়েছে। ব্রাহ্মণ- ও সূত্র-গ্রন্থাদিতেও রুদ্রের ধ্বংসকারী রূপের দর্শন পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণগ্রন্থাদিতে রুদ্রের উদ্ভবকাহিনী—ব্রাহ্মণগ্রন্থে[৭] রুদ্রের একটি উদ্ভবকাহিনীও পাওয়া যায়। প্রজাপতি পশুরূপে স্বীয় কন্যাগমনের পাপে লিপ্ত হলে সব দেবতারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেন। তাঁদের সম্মিলিত ক্রোধই রুদ্ররূপে আবির্ভূত হয়। রুদ্র বাণাঘাতে প্রজাপতিকে বধ করেন।

১ অ বে ১৯।৫৩।৫ ; ১৯।৫৪।১ ২ দ্রঃ মহা ভা ১।১।২৪৭-২৫০

৩ স কালঃ সোঽন্তকো মৃত্যুঃ স যমঃ ।—মহা ভা ৭।২০১।১০৪

৪ মহা ভা ১২।২৮৪।৪৭

৫ তবেমে পঞ্চ পশবো বিভক্তা গাবো অশ্বাঃ পুরুষা অজাবয়ঃ । অ বে ১১।২।৯

৬ Vide H. O. S., Vol. VIII, p. 769

৭ দ্রঃ ঐ ব্রা ৩।৩।৯ ; শ ব্রা ১।৭।৪।১-৪

পরবর্তী কালে কাহিনীর রূপ বদলে যায়। শিবের ক্রোধের থেকে উদ্ভব হয় বীরভদ্রের আর তাঁর হাতে দক্ষ প্রজাপতির মুণ্ডচ্ছেদ হয়।

চণ্ডিকার উদ্ভবকাহিনীর উপরও রুদ্রের উদ্ভবকাহিনীর প্রভাব পড়েছে। চণ্ডিকার উদ্ভব-কাহিনীতে দেখা যায়: ক্রুদ্ধ দেবতাদের শরীর থেকে নির্গত তেজোরাশি চণ্ডিকামূর্তি ধারণ করে।[১]

রুদ্র ব্রহ্ম—আমরা দেখেছি শৈব ও শাক্ত দর্শনে ব্যাখ্যাত পরমশিবের পূর্বরূপ অথর্ব-বেদের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে। আরণ্যকেও রুদ্রের ব্রহ্মরূপের পরিচয় আছে। তৈত্তিরীয়-আরণ্যকে[২] বলা হয়েছে—রুদ্রই সব। তিনি সর্বভূতান্তরাত্মা। তিনি বিশ্বাত্মক এবং বিশ্বোত্তীর্ণ। জাত এবং জায়মান, চিদাত্মক এবং জড়াত্মক সবই তিনি।

রুদ্র উপনিষদে—উপনিষদের যুগে রুদ্র সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদে স্পষ্ট করেই রুদ্রকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে। ব্রহ্ম সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে ঋষি বলছেন—

তুমি জন্মাদিবিহীন। এইজন্য, যে জন্মাদিতে ভয় পায় সে তোমার শরণ লয়। হে রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ তার দ্বারা নিত্য নিয়ত আমাদের রক্ষা কর।[৩]

অন্য একটি মন্ত্রে ব্রহ্মের স্থলে রুদ্রশব্দটিই ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে—রুদ্র একই, দ্বিতীয়ের জন্য অবস্থান করেন নি অর্থাৎ রুদ্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। ইনি স্বীয় শক্তিসমূহের প্রভাবে এই-সব লোক নিয়মিত করেন।[৪]

এই রুদ্র যে বেদসংহিতায় বর্ণিত রুদ্র তার প্রমাণ আছে। যজুর্বেদে বিবৃত দুটি রুদ্রমন্ত্র[৫] আলোচ্য উপনিষদে ব্রহ্ম সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে। এ ছাড়া, এই উপনিষদে রুদ্রের কাছে যে প্রার্থনা করা হয়েছে তা অবিকল বেদসংহিতায় বিবৃত প্রার্থনা। প্রার্থনাটি এই[৬]—

"হে রুদ্র, তুমি ক্রুদ্ধ হয়ে আমাদের পুত্রপৌত্র, আমাদের জীবন, গো, অশ্ব, বিনাশ করো

১ দু স, ২।৮-১২ ২ তৈ আ ১০।১৬

৩ অজাত ইত্যেবং কশ্চিদ্ভীরুঃ প্রপদ্যতে। রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।
শ্বে উপ ৪।২১

৪ একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুর্য ইমাঁল্লোকান্ ঈশত ঈশনীভিঃ।—ঐ ৩।২

৫ (i) যা তে রুদ্র শিবা তনূরঘোরাপাপকাশিনী। তয়া নস্তন্বা শন্তময়া গিরিশন্তাভিচাকশীহি।
বা সং ১৬।২, শ্বে উপ ৩।৫

(ii) যামিষুং গিরিশন্ত হস্তে বিভর্ষ্যস্তবে। শিবাং গিরিত্র তাং কুরু মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ
ঐ ১৬।৩, ঐ ৩।৬

৬ মা নস্তোকে তনয়ে মা ন আয়ুষি মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ।
বীরান্ মা নো রুদ্র ভামিতোঽবধীর্হবিষ্মন্তঃ সদমিৎ ত্বা হবামহে। শ্বে উপ ৪।২২

না, আমাদের বীর ভৃত্যদের বধ করো না। আমরা হবিযুক্ত হয়ে সর্বদা তোমাকে আহ্বান করি অর্থাৎ তোমাকে আহ্বান করে হবি প্রদান করে যজ্ঞ করি।

একাধিক মন্ত্রে[১] ব্রহ্মকে শিব বলা হয়েছে। আরও কয়েকটি মন্ত্রে[২] তাঁকে বলা হয়েছে ঈশান। এই সব মন্ত্রে অবশ্য শিব- ও ঈশান-শব্দ ব্রহ্মের উপাধিরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে এই শিবোপাধিক এবং ঈশানোপাধিক ব্রহ্ম যে রুদ্রশিবের থেকে অভিন্ন তা উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়।

একটি মন্ত্রে দেখা যায় ব্রহ্মস্থলে শিবশব্দই ব্যবহৃত হয়েছে। মন্ত্রটিতে আছে—যখন অতম অর্থাৎ অবিদ্যা থাকে না, তখন দিন থাকে না, রাত্রি থাকে না, সৎ থাকে না, অসৎ থাকে না, কেবলমাত্র শুদ্ধ শিবই থাকেন।[৩]

অতএব, দেখা যাচ্ছে শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদে রুদ্রশিবই ব্রহ্মরূপে বর্ণিত হয়েছেন।

তন্ত্রশাস্ত্রেও এই ভাবধারা অনুসৃত হয়েছে। সেখানেও শিব ব্রহ্ম। ব্রহ্ম সগুণ এবং নির্গুণ। তন্ত্রেও আছে—সনাতন শিব সগুণ এবং নির্গুণ।[৪]

উপনিষদের ব্রহ্ম সাধারণতঃ নৈর্ব্যক্তিক কিন্তু শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদের ব্রহ্ম রুদ্রশিব বৈয়ক্তিকও বটেন। আমাদের মনে হয় ঋষি শ্বেতাশ্বতর রুদ্রশিবের উপাসক ছিলেন। আপন আরাধ্যকেই তিনি ব্রহ্মরূপে জেনেছেন ও প্রকাশ করেছেন। উপনিষদেই তার ইঙ্গিত আছে। একটি মন্ত্রে[৫] বলা হয়েছে—

তপস্যার প্রভাবে আর দেবতার অনুগ্রহে ব্রহ্মকে জেনে এবং ঋষিসংঘের দ্বারা সেবিত হয়ে শ্বেতাশ্বতর এই পরম পবিত্র ব্রহ্মতত্ত্ব সন্ন্যাসীদের কাছে বলেন।

শ্বেতাশ্বতর যে-দেবতার অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন অনুমান করা যায় তিনি তাঁর আরাধ্য রুদ্রশিব।

শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদে বর্ণিত ব্রহ্ম রুদ্রশিব পরাৎপর পরমেশ্বররূপে শ্রুতি-পরবর্তী শাস্ত্রাদি এবং সংস্কৃত সাহিত্যেও বর্ণিত হয়েছেন। তবে এই-সব গ্রন্থে তাঁর রুদ্রনামের চেয়ে শিব, পশুপতি, মহাদেব, শঙ্কর প্রভৃতি নামের প্রচলন অধিক।

শিব গণদেবতা—লক্ষ্য করা গেছে রুদ্র আর্য-আর্যেতর নানা 'জন'-এর নানা স্তরের

১ শ্বে উপ ৩।১১ ; ৪।১৪, ১৬, ১৮ ২ ঐ ৩।১২, ১৫, ১৭ ; ৪।১১

৩ যদাঽতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রির্ন সন্ন চাসচ্ছিব এব কেবলঃ। শ্বে উপ ৪।১৮

৪ সগুণো নির্গুণশ্চেতি শিবো জ্ঞেয়ঃ সনাতনঃ।—উদ্ধৃত, কৌলমার্গরহস্যের ভূমিকা, পৃঃ ।০

৫ তপঃপ্রভাবাদ্দেবপ্রসাদাচ্চ ব্রহ্ম হ শ্বেতাশ্বতরোঽথ বিদ্বান্।
অত্যাশ্রমিভ্যঃ পরমং পবিত্রং প্রোবাচ সম্যগৃষিসংঘজুষ্টম্।—শ্বে উপ ৬।২১

মানুষের দেবতা। তিনি জনসাধারণের দেবতা, গণদেবতা। শিবরূপেও তাঁর এই বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়।

অনুমান করা যায় শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদ্ রচনার সময়ে[1] রুদ্রের তথা শিবের পূজার বিশেষ প্রচলন ছিল। রুদ্রশিব তখন প্রতিপত্তিশালী জনপ্রিয় দেবতা। উপনিষদের নৈর্ব্যক্তিক ব্রহ্মতত্ত্বকে লোকের বোধগম্য করার জন্য শিবকে সেই তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। তার সুযোগও ছিল। কেন না, অথর্ববেদেই দেখা গেছে, রুদ্রশিবের মধ্যে প্রায় উপনিষদোক্ত ব্রহ্মভাবই অভিব্যক্ত হয়েছে।[2]

মহাভারতের শিব—মহাভারতের যুগে রুদ্রশিব সনাতন দেবমণ্ডলের অন্যতম প্রধান দেবতা। মহাভারতের[3] নানা স্থানে তাঁর কথা আছে, তাঁর মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়েছে। বেদসংহিতাদিতে রুদ্রের যে যে নাম পাওয়া যায়, তাঁর যে-পরিচয় পাওয়া যায়, মহাভারতে সে-সব শিবের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ এই সময়ে রুদ্র শিবে রূপান্তরিত হয়েছেন।

এ কথার প্রমাণ আছে মহাভারতেই। দ্রোণপর্বের দুটি অধ্যায়ে (২০০ এবং ২০১) শিবের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। এতে শতরুদ্রিয়েরই অনুসরণ ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ সম্বন্ধে মহাভারতকার স্বয়ং সাক্ষ্য দিচ্ছেন—পার্থ, দেবদেবের ধন্য, যশ- ও আয়ু-বর্ধক, পুণ্য, বেদসম্মত শতরুদ্রিয় বর্ণনা করলাম।[4]

শিবের বেদগ্রাহ্য ও বেদবাহ্য রূপ—পূর্বেই লক্ষ্য করা গেছে, বৈদিক রুদ্র নানা স্তরের নানা মানুষের দেবতা। তিনি গণদেবতা। মহাভারতের শিবও তাই। মহাভারতে দেখা যায় শিবের এক রূপ বেদগ্রাহ্য, আরেক রূপ বেদবাহ্য বা লৌকিক।

বেদগ্রাহ্য রূপ—উপনিষদ্ পর্যন্ত রুদ্র তথা শিবের বেদগ্রাহ্য রূপের পরিচয় পাওয়া গেছে। মহাভারতে এই রূপ আরও স্পষ্ট হয়েছে। তিনি পরাৎপর মহেশ্বর, নিষ্কল এবং সকল ব্রহ্ম, অক্ষর পরমব্রহ্ম, অমেয় আত্মা,[5] বিশ্বমূর্তি।[6] তাঁকে বলা হয়েছে তোমার মধ্যে সমস্ত প্রাণী এবং সমস্ত প্রাণীর মধ্যে তুমি অবস্থিত।[7]

১ শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদ্ রচনার সঠিক সময় জানা যায় না। তবে অনুমান করা হয় খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকের আগেই উপনিষদ্খানা রচিত হয়েছে। দ্রঃ ŚK. P., p. 102

২ অনেক পরবর্তী কালে রচিত অথর্বশিরস্-উপনিষদে রুদ্রশিবের তত্ত্ব ও মাহাত্ম্য বিশেষভাবে প্রচারিত হয়েছে। উপনিষদ্খানা পাশুপতদের রচনা।—দ্রঃ V. Ś. M. R. S, pp. 111-112

৩ মহা ভা ৩।৩৮ ৪১ ; ৭।৭৮-৭৯, ২০০-২০১ ; ১০।৬, ৭, ১৭-১৮, ১২।২৮২-২৮৪ ; ১৩।১৪, ১৬০-১৬১

৪ ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং পুণ্যং বেদৈশ্চ সম্মিতম্। দেবদেবস্য তে পার্থ ব্যাখ্যাতং শতরুদ্রিয়ম্।

—মহা ভা ৭।২০১।১৪৮

৫ মহা ভা ৭।৭৮।৪৩ , ৭।২০১।৯২ ; ১০।৭।৭,১০ ; ১২।২৮৪।৫২ ; ১৩।১৪।৫ , ১৩।১৬।৮ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

৬ ঐ ৭।২০১।১৩ , ১৩।১৬০।৪২ ৭ ত্বয়ি সর্বাণি ভূতানি সর্বভূতেষু চাসি বৈ।—ঐ ১০।৭।৫৭

শিব ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং সুরেশের স্রষ্টা এবং প্রভু।[১] তিনি ধাতা, বিধাতা, বিশ্বাত্মা, বিশ্বকর্মকৃৎ। তিনি স্বয়ং বপুহীন কিন্তু সমস্ত দেবতাদের বপু ধারণ করান। সমস্ত দেবতা তাঁর স্তব করেন। তিনি এক, বহু শতসহস্র প্রকারে অভিব্যক্ত।[২]

হে ভারত, তিনিই সমস্ত প্রাণীর আদি, মধ্য এবং অন্ত। তাঁর কর্মের দ্বারাই সমগ্র জগৎ কর্মচেষ্টা করে[৩] অর্থাৎ জগতের সব কর্মই তাঁর অধীন।

বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষদ্‌সমূহ, পুরাণ, অধ্যাত্ম সিদ্ধান্তসমূহ, পরমগুহ্যতত্ত্ব সবই দেব মহেশ্বর।[৪]

এই ব্রহ্মণ্য,[৫] ব্রাহ্মণপ্রিয়[৬] শিবকে মনশ্চক্ষে দর্শন করতে পারেন ব্রাহ্মণেরা। সব ব্রাহ্মণ নয়; যাঁরা সাধুবৃত্ত, বীতশোক, যাঁদের পাপ ক্ষয় হয়েছে তাঁরা।[৭]

বেদবাহ্য রূপ—রুদ্রের তথা শিবের বেদবাহ্য রূপের ইঙ্গিত আছে দক্ষযজ্ঞ-কাহিনীতে এবং তারও আগেকার দেবতাদের এক যজ্ঞকাহিনীতে।

দক্ষ প্রজাপতি তাঁর যজ্ঞে রুদ্রশিবকে নিমন্ত্রণ করেন নি। এইজন্য যজ্ঞ পণ্ড হয়ে যাবে বলে মহামুনি দধীচি তাঁকে সতর্ক করে দিলে দক্ষ বলেন[৮]—শূলহস্ত জটাধারী বহু রুদ্রই ত আমাদের আছেন, তাঁরা একাদশ স্থানে থাকেন তা জানি কিন্তু কই মহেশ্বরকে ত চিনি নে।

দক্ষের এই উক্তির দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে। এক—যজ্ঞকারী আর্যেরা অনেক রুদ্রকে চিনতেন কিন্তু রুদ্র মহেশ্বর তাঁদের পরিচিত ছিলেন না। কাজেই, তিনি অবেদপন্থীদের দেবতা। এই অবেদপন্থীরা অবশ্য আর্যও হতে পারেন আবার আর্যেতরও হতে পারেন। দুই—যজ্ঞকারীরা একাধিক রুদ্রকে জানতেন কিন্তু যে-রুদ্র লোকপালদের পরম-মহেশ্বর এবং দেবতাদের পরমদেবতা তাঁকে জানতেন না। সহজ কথায় রুদ্র যে এক এবং তিনি যে মহেশ্বর[৯] এটা তাঁরা জানতেন না।

দক্ষের উক্তির অবশ্য একটি তৃতীয় ব্যাখ্যাও হয়। দক্ষ মোহগ্রস্ত হয়েছিলেন বলে

১ ব্রহ্মাবিষ্ণুসুরেশানাং স্রষ্টা চ প্রভুরেব চ।—মহা ভা ১৩।১৪।৪

২ ধাতা চ স বিধাতা চ বিশ্বাত্মা বিশ্বকর্মকৃৎ। সর্বাসাং দেবতানাঞ্চ ধারয়ত্যবপুর্বপুঃ॥
সর্বৈর্দেবৈস্তুতো দেবঃ সৈকধা বহুধা চ সঃ। শতধা সহস্রধা চৈব ভূয়ঃ শতসহস্রধা।—ঐ ৭।২০১।১০৫-১০৬

৩ আদিরেব হি ভূতানাং মধ্যমন্তশ্চ ভারত। বিচেষ্টতে জগচ্চেদং সর্বমস্যৈব কর্মণা।—ঐ ১০।১৭।৯

৪ বেদাঃ সাঙ্গোপনিষদঃ পুরাণাধ্যাত্মনিশ্চয়াঃ। যদত্র পরমং গুহ্যং স বৈ দেবো মহেশ্বরঃ। ঐ ৭।২০১।১০৯

৫ ঐ ৭।২০১।৪১ ৬ ঐ

৭ যং পশ্যন্তি ব্রাহ্মণাঃ সাধুবৃত্তাঃ ক্ষীণে পাপে মনসা বীতশোকাঃ।—ঐ ৭।২০০।৬৮

৮ সন্তি নো বহবো রুদ্রাঃ শূলহস্তাঃ কপর্দিনঃ। একাদশস্থানগতা নাহং বেদ্মি মহেশ্বরম্।—ঐ ১২।২৮৪।২০

৯ ঈশ্বরত্বান্মহত্বাচ্চ মহেশ্বর ইতি স্মৃতঃ।—মহা ভা ১৩।১৬১।৬

মহেশ্বরকে নিমন্ত্রণ করেন নি। তিনি যে মহেশ্বরকে চিনি নে বললেন তারও কারণ ঐ মোহ। মহাভারতে এই ব্যাখ্যাই দেওয়া হয়েছে। দক্ষযজ্ঞের কাহিনী শিবমাহাত্ম্য-প্রচারক। কাজেই, এই ব্যাখ্যাও যুক্তিসঙ্গত।

তবে প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যাখ্যার সমর্থন পাওয়া যায় দেবতাদের যজ্ঞকাহিনীতে।[১] মহাভারতে আছে[২]—

হে রাজন্, দেবতারা রুদ্রকে যথার্থতঃ অর্থাৎ স্বরূপতঃ জানতেন না, সেই কারণে তার জন্য কোনো যজ্ঞভাগের ব্যবস্থা করেন নি।

দেবতারা রুদ্রশিবকে ভাল করে চিনতেন না। সম্ভবতঃ তিনি বেদপন্থীদের দেবতা ছিলেন না। সেইজন্যই ভাল করে চিনতেন না। আর চিনতেন না বলেই তাঁর জন্য যজ্ঞভাগের ব্যবস্থা করেন নি। আলোচ্য শ্লোকের এরূপ অর্থও করা যেতে পারে।

পাশুপত ধর্ম—মহাভারতে[৩] পাশুপত ব্রত বা ধর্মের বিবরণ আছে। তাতে দেখা যায় এই ধর্ম বর্ণাশ্রমধর্মের বিপরীত। পাশুপত ধর্ম সর্বতোমুখ অর্থাৎ সকল বর্ণের সকল মানুষের এতে অধিকার আছে। বৈদিক ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে পাশুপত ধর্মের কোনো যোগ নেই। এইজন্য, কেউ কেউ পাশুপতদের আরাধ্য পশুপতিকে বা শিবের পশুপতিরূপকে বেদবাহ্য মনে করেন।

কিন্তু শতরুদ্রিয়মন্ত্রে রুদ্রকে একাধিকবার পশুপতি বলা হয়েছে। কাজেই বলতে হয় পশুপতি রুদ্রকে বৈদিকরা নিজেদের দেবতা বলে স্বীকার করতেন। আমাদের মনে হয় পশুপতি ছিলেন সবার দেবতা। বৈদিকরা তাঁদের মতো করে তাঁর আরাধনা করতেন, অন্যরা আবার নিজেদের মত করে করতেন। পাশুপত ধর্ম সেই অন্যদের ধর্ম।

মোটকথা, মহাভারতে রুদ্রশিবের বেদবাহ্য রূপের পরিচয় আছে। উক্ত গ্রন্থে শিবের এবং শিবানুচরদের যে-রূপবর্ণনা পাওয়া যায় তাতে তাঁর বেদবাহ্য রূপের পরিচয়ও সূচিত হয়েছে।

শিবের অনুচর—শিবের অনুচরদের নানা আকার ও বেশভূষা। এদের মধ্যে আছে বামন, জটাধারী মাথামোটা (মুণ্ডাঃ), ঘাড়খাট, পেটমোটা (মহোদরাঃ), কানলম্বা, প্রকাণ্ডশরীর, বিশ্রীমুখ এবং বিশ্রীপাদ সব মূর্তি।[৪] এই-সব মূর্তি বিকট, ভয়ংকর। হাতী, ঘোড়া, উট, গরু, শূকর, ছাগল, বাঘ, ভালুক, শেয়াল, কুকুর, সাপ, কচ্ছপ, কুমীর, ভেক, তিমি কাক, বাজ, শুক, হাঁস, পায়রা, প্রভৃতি স্থলচর, জলচর এবং নভচর জীবজন্তুর মুখের মতো

১ মহা ভা ১০।১৮

২ তং বৈ রুদ্রমজানন্তো যাথাতথ্যেন দেবতাঃ। নাকল্পয়ন্ত দেবস্য স্থাণোর্ভাগং নরাধিপ। —ঐ ১০।১৮।৩

৩ ঐ ১২।২৮৪।১২২-১২৪ ৪ ঐ ৭।২০১।১৯-২০

শিবের গণদের মুখ। এরা কেউ বেঁটে, কেউ লম্বা, কারও রং নীল, কারও কপিল। কুৎসিত এদের আহার। এরা মেদ, মাংস, রক্ত, নাড়ীভুঁড়ি এ সব খায়।[১]

তবে শিবের সুন্দর, সুবেশ, অনুচরও আছে। তারা সাদা কাপড় পরে, পাগড়ী মাথায় দেয়, নানা অলঙ্কার পরে, আবার মাথায় মুকুটও পরে। এরা বিদ্বান, রাগদ্বেষহীন, সর্বদা আনন্দে থাকে।[২]

শিব যে উচ্চ নীচ, সভ্য অসভ্য সব শ্রেণীর লোকের দেবতা তাঁর অনুচরদের বিবরণ থেকেই তা বোঝা যায়।

শিবের উগ্র ও সৌম্য মূর্তি—শিবের অনুচরদের যেমন তেমনি স্বয়ং শিবেরও উগ্র ভয়ংকর এবং সৌম্য শান্ত মূর্তির[৩] বিবরণ মহাভারতে আছে। শিবের উগ্রমূর্তি দেখেছিলেন অশ্বত্থামা। গভীর নিশীথে অশ্বত্থামা উপস্থিত হয়েছেন পাণ্ডবদের শিবিরদ্বারে। উদ্দেশ্য সুপ্ত পাণ্ডবদের নিধন। তিনি দেখলেন শিবিরদ্বারে দাঁড়িয়ে এক অতিকায় প্রাণী। চন্দ্রার্কের মতো তাঁর দীপ্তি। তাঁর পরিধানে মহারুধিরাক্ত ব্যাঘ্রচর্ম, উত্তরাঙ্গে কৃষ্ণাজিন, গলায় নাগযজ্ঞোপবীত। মহাসর্প তাঁর অঙ্গদ। সেই সর্পের মুখে অগ্নিজ্বালা। তিনি মুখব্যাদন করে আছেন। ভয়ানক সে-মুখ, তাতে করাল দংষ্ট্রা। সেই অতিকায় পুরুষ সহস্রচক্ষু। তাঁর সেই-সব চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা এবং মুখ থেকে অগ্নিশিখা নির্গত হচ্ছে। তাঁর দেহের তেজোদীপ্তি থেকে শতসহস্র শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী প্রাদুর্ভূত হচ্ছেন।[৪]

শিবের সৌম্যমূর্তির বর্ণনায়[৫] বলা হয়েছে শিব প্রশান্ত, চীরবাস, মুঞ্জবাস, সুবাস, উষ্ণীষী, সুবক্ত্র, হিরণ্যবাহু, সুব্রত, সুধন্বী, স্বর্ণকেশ। তিনি চন্দ্রমৌলী। আবার বলা হয়েছে তিনি জটাধারী, গৌরবর্ণ, বল্কল এবং মৃগচর্ম তাঁর বস্ত্র।[৬]

শিবের আয়ুধ—মহাভারতে শিবের নানা আয়ুধেরও উল্লেখ আছে। ঋগবেদে দেখা যায় রুদ্রের আয়ুধ ধনুর্বাণ। শতরুদ্রিয়ের মধ্যে ধনুর্বাণের সঙ্গে খড়্গও যুক্ত হয়েছে। মহাভারতে[৭] শিবের আয়ুধের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে—ধনুর্বাণ, বজ্র, শূল, পরশু, গদা, মুষল, পরিঘ, দণ্ড, ত্রিশূল,[৮] খট্বাঙ্গ[৯] এবং পাশ।[১০]

লক্ষ্য করার বিষয় এই-সব আয়ুধ দেবীরও আয়ুধ।

১ মহা ভা ১০।৭ ২ ঐ

৩ যে তনূ তস্ত দেবস্ত বেদজ্ঞা ব্রাহ্মণা বিদুঃ। ঘোরা চান্যা শিবা চান্যা তে তনূ বহুধা পুনঃ।

—ঐ ৭।২০১।১০৭

৪ ঐ ১০।৬।৩-৯ ৫ ঐ ৭।২০১।১১, ১৬, ৩২, ৩৩, ৩৬, ৪৪, ৫০; ১০।৭।২-১১; ১৩।১৪।৩০৬

৬ ঐ ৭।৭৮।৩৯ ৭ ঐ ৭।২০০।৬৪-৬৬ ৮ ঐ ১২।২৮৪।১২ ৯ ঐ ১২।২৮৪।৩১

১০ ঐ ১৩।১৪।২৭০

শিব ও দেবী—মহাভারতে শিবের এমন-সব বর্ণনা পাওয়া যায় যা দেবীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যেমন, শিবকে বলা হয়েছে রক্তমাল্যাম্বরধর।[১] আবার বলা হয়েছে তিনি পক্বাম্নমাংসলুব্ধ।[২] এক জায়গায় শিবকে দশবাহু[৩] বলে নমস্কার করা হয়েছে। দেবী দশভুজা। অন্যত্র[৪] শিবকে অষ্টাদশভুজ বলা হয়েছে। অষ্টাদশভুজা দেবীমূর্তিও আছে।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। মহাভারতের শিব সশক্তি শিব। যেখানে যেখানে শিবের উল্লেখ আছে সে-সব স্থলে তাঁর সঙ্গে দেবীরও উল্লেখ প্রায় সব ক্ষেত্রেই আছে। শিবকে বলা হয়েছে উমাপতি, গৌরীহৃদয়বল্লভ ইত্যাদি; অথবা বলা হয়েছে তিনি পার্বতীর সহিত বিরাজমান।[৫]

শিব ব্রহ্মচারী;[৬] দেবী কৌমারী ব্রহ্মচারিণী[৭]; শিব অসুরঘ্ন,[৮] দেবী অসুরনাশিনী। শিব মহিষঘ্ন,[৯] দেবী মহিষমর্দিনী।

শিব শ্মশানবাসী।[১০] এক জায়গায় শিবের বিষয়ে বলা হয়েছে—এই দেবতা শ্মশানে শ্মশানে নিত্য বাস করেন। সেখানে সেই বীরস্থানে লোকেরা এই ঈশ্বরকে পূজা করে।[১১]

অন্যত্র তাঁকে প্রণাম করা হয়েছে এই বলে—কপালহস্ত, চিতিভস্মপ্রিয়, বিভীষণ, ভীম, ভীমব্রতকে নমস্কার।[১২]

আমরা রুদ্রের সঙ্গে মৃত্যুর যোগাযোগ লক্ষ্য করেছি আর দেখেছি রুদ্র আর অগ্নি এক। অগ্নির এক রূপ ক্রব্যাদ বা চিতাগ্নি। মনে হয় এইভাবে শ্মশানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন রুদ্রশিব। দেবীর সঙ্গে ক্রব্যাদ বা চিতাগ্নির যোগাযোগের বিষয় আগেই আলোচনা করা হয়েছে। শিব শ্মশানচারী। দেবীও শ্মশানচারিণী।

শিব ত্রিপুরারি—শিব ত্রিপুরারি, ত্রিপুরঘাতী। এই ত্রিপুরধ্বংসের কাহিনী আছে মহাভারতে।[১৩] কাহিনীটির সূচনা আরও প্রাচীন। ঋগ্‌বেদে[১৪] আছে অগ্নি দুর্গ ধ্বংস করেন। ভাষ্যকারের মতে এতে অসুরদের ত্রিপুরধ্বংস সূচিত হয়েছে।

যজুর্বেদের একটি মন্ত্রে[১৫] অগ্নির অয়শয়া অর্থাৎ লোহময়ী, রজঃশয়া অর্থাৎ রজতময়ী এবং হরিশয়া অর্থাৎ হিরণ্ময়ী তনুর উল্লেখ আছে।

---

১ মহা ভা ১২।২৮৪।৭৬ ২ ঐ ১২।২৮৪।২৬ ৩ ঐ ১২।২৮৪।২৪ ৪ ঐ ১৩।১৪।২৫০

৫ দ্রঃ ঐ ৭।৭৮।৪০, ৭।২০০।৭০, ৭।২০১।২৭, ৩৮, ১০০; ১০।৭।৪৩; ১৩।১৪।২৪৪, ২৫০ ইত্যাদি।

৬ ঐ ৭।৭৮।৫৮ ৭ ঐ ৪।৩।৭ ৮ ঐ ১৩।১৪।২৪ ৯ ঐ ১৩।১৪।৩১২ ১০ ঐ ১০।৭।৪

১১ এব চৈব শ্মশানেষু দেবো বসতি নিত্যশঃ। যজন্ত্যেনং জনাস্তত্র বীরস্থান ইতীশ্বরম্।

—ঐ ৭।২০১।১১৭

১২ নমঃ কপালহস্তায় চিতিভস্মপ্রিয়ায় চ। বিভীষণায় ভীমায় ভীমব্রতধরায় চ।

—ঐ ১২।২৮৪।২৫

১৩ ঐ ৭।২০১।৬৪-৮২ ১৪ ঋ বে ৬।১৬।৩৯ ১৫ বা সং ৫।৮

শতপথ-ব্রাহ্মণে আছে—'তারপর অসুরেরা এই তিন লোকে পুর নির্মাণ করল ; পৃথিবীতে লৌহময়, অন্তরিক্ষে রজতময় এবং স্বর্গে স্বর্ণময়'।[১] এই বচনের সাহায্যে পূর্বোক্ত যজুর্বেদের মন্ত্রের অর্থ বোঝা যায়।

মহীধর আলোচ্য যজুর্বেদীয় মন্ত্রটির ভাষ্যে শতপথ-ব্রাহ্মণের সূত্র অবলম্বন করে একটি আখ্যায়িকা দিয়েছেন। তাতে দেখা যায় দেবতাদের দ্বারা পরাজিত অসুরেরা তপস্যা করে তিন লোকে তিনটি পুর নির্মাণ করে ; পৃথিবীতে লৌহময়, অন্তরিক্ষে রজতময় এবং স্বর্গে স্বর্ণময়। তখন দেবতারা সেই পুর দগ্ধ করার জন্য উপসদ-অগ্নির আরাধনা করেন। আরাধনায় তুষ্ট উপসদ-অগ্নি যখন সেই পুরত্রয়ে প্রবেশ করলেন তখন পুর তিনটি অগ্নিতন্থ হয়ে গেল।

শতপথ-ব্রাহ্মণে (৩।৪।৪।৩-১৪) কিন্তু আখ্যায়িকার উপসংহার করা হয়েছে অন্যভাবে। সেখানে আছে দেবতারা উপসদ-অনুষ্ঠান করে বজ্র নিক্ষেপ করেন এবং তাতে ত্রিপুর ধ্বংস হয়। এই বজ্রের হাতল অগ্নি, শল্য অর্থাৎ ফলকও অগ্নি এবং ফলকাগ্র বিষ্ণু।

তৈত্তিরীয়সংহিতাতেও[২] তিনটি দুর্গের উল্লেখ করা হয়েছে। সকলের নীচে আয়স, তার উপরে রাজত, সকলের উপরে হিরণ্য। দেবতারা এই দুর্গ জয় করার উদ্দেশ্যে একটি বাণ নির্মাণ করলেন। অগ্নি তার মুখ, সোম শল্য এবং বিষ্ণু তেজন বা ফলকাগ্র। তাঁরা এই বাণ নিক্ষেপ করার ভার দিলেন রুদ্রের উপর।

ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে[৩] কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে আখ্যায়িকাটি আছে। তবে এখানেও দেখা যায় অগ্নি, সোম এবং বিষ্ণুকে নিয়ে সায়ক করা হয়েছে, এঁদের সঙ্গে যোগ করা হয়েছে বরুণকে। তিনি শরের পালক।

ত্রিপুরের আখ্যায়িকার মধ্যে বিস্মৃত ঐতিহাসিক তথ্যের ইঙ্গিত আছে মনে হয়। নগরবাসী শত্রুদের সঙ্গে বেদপন্থী আর্যদের সংঘর্ষ হয়েছিল সেই ইঙ্গিত। এই শত্রু কারা? যাঁরা মহেঞ্জোদড়োকে আর্যেতর লোকেদের কীর্তি মনে করেন তাঁদের মতে মহেঞ্জোদড়োর মতো নগরের অধিবাসীরা এই শত্রু।

ঐতিহাসিক ইঙ্গিত থাকুক আর নাই থাকুক শ্রুতিতে কিন্তু ত্রিপুরের আধ্যাত্মিক অর্থই লক্ষ্য করা হয়েছে। মহাভারতে সে-অর্থ আরও পরিস্ফুট হয়েছে। ত্রিপুরস্থ অসুরদের নাশ করার জন্য রুদ্রের সাজসজ্জার যে-বর্ণনা পাওয়া যায়, বুঝতে অসুবিধা হয় না তা রূপক। রূপক যে তা আরও পরিষ্কার বোঝা যায় ত্রিপুরধ্বংসের পর রুদ্রের বালরূপ ধারণ করার বিবরণ থেকে। সংস্পৃষ্ট শ্লোকের[১] টীকায় নীলকণ্ঠ এই রূপকের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে ত্রিপুর স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ এই ত্রিবিধ শরীর।

১ শ ব্রা ৩।৪।৪।৩ ২ তৈ সং ৬।২।৩ ৩ ঐ ব্রা ১।৪।৬-৮ ১ মহা ভা ৭।২০২।৮০-৮৪

এই প্রসঙ্গে স্মরণ হয় দেবী ত্রিপুরসুন্দরীর কথা। তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁর মাহাত্ম্য ও সাধনার বিষয় বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে।

শিব ও ভক্তি—মহাভারতে[১] আছে শিব ভক্তানুকম্পী ভগবান্। প্রসন্ন হয়ে ভক্তদের তিনি বাঞ্ছিত বর দেন, তাঁদের আয়ু, আরোগ্য, ঐশ্বর্য দেন, তাঁদের সকল কামনা পূর্ণ করেন। যে-সব ভক্ত অনন্যভাবে উমাপতি রুদ্রশিবের উপাসনা করেন তাঁরা ইহলোকে সুখ পান আর অন্তে পান পরমা গতি। শিবভক্ত উপমন্যু শিবের কাছে প্রার্থনা করেছেন—হে দেব সুরেশ্বর, তোমার প্রতি আমার ভক্তি নিত্য হোক।[২]

শিব ও জ্ঞান—আবার শিব জ্ঞানাত্মা, জ্ঞানগম্য, জ্ঞানশ্রেষ্ঠ, সুদুর্বিদ।[৩] টীকায় নীলকণ্ঠ বলেছেন জ্ঞানাত্মা অর্থ জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞানগম্য অর্থ পরাবিদ্যাপ্রাপ্য, জ্ঞানশ্রেষ্ঠ অর্থ চিন্মাত্ররূপে প্রশস্যতম অর্থাৎ প্রশংসনীয়দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আর সুদুর্বিদ অর্থ দুর্জ্ঞেয়।

শিবের এই জ্ঞানমূর্তির সঙ্গে তাঁর আরেকটি রূপ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি চরাচরগুরু, সুরাসুরগুরু।[৪] তন্ত্রশাস্ত্রেও প্রধানতঃ শিবের এই জ্ঞানমূর্তি ও গুরুমূর্তির দর্শন পাওয়া যায়।

শিবমূর্তি—মহাভারতে শিবমূর্তি-পূজার কথা আছে। অশ্বত্থামাকে ব্যাসদেব বলছেন[৫]—তাঁরা দুজন (নরনারায়ণ) যুগে যুগে লিঙ্গে দেব মহেশ্বরের অর্চনা করেছেন আর তুমি করেছ অর্চাতে অর্থাৎ প্রতিমাতে।

কাহিনীটি এই—অশ্বত্থামার অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র কৃষ্ণার্জুনের কাছে ব্যর্থ হয়ে গেলে তিনি ব্যাসদেবের কাছে গিয়ে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। ব্যাস বললেন জন্মান্তরে কৃষ্ণ ছিলেন ঋষি নারায়ণ। তিনি কঠোর তপস্যায় মহাদেবকে তুষ্ট করে বরলাভ করেন। মহাদেব বর দেন কোনো অস্ত্র তাঁকে আঘাত করতে পারবে না; তিনি সমরে অজেয় হবেন। ঋষি নারায়ণের তপস্যার ফলে জন্মালেন ঋষি নর। ইনি নারায়ণতুল্য। ইনিই অর্জুন। এই নরনারায়ণ বা কৃষ্ণার্জুন মহাদেবের বর লাভ করেছিলেন বলে এঁদের কাছে তোমার ব্রহ্মাস্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। তবে ব্যাস একথাও বললেন যে অশ্বত্থামাও জন্মান্তরে কঠোর তপস্যার দ্বারা শিবকে তুষ্ট করে তাঁর কাছে বর লাভ করেছিলেন। কিন্তু নরনারায়ণ লিঙ্গে শিবার্চনা করতেন আর অশ্বত্থামা প্রতিমায় শিবার্চনা করতেন বলে তাঁর 'জন্মকর্মতপযোগ' তাঁদের মতো হলেও তিনি তাঁদের সমান ফল পেলেন না।

১ মহা ভা ৭।৭৮।৩২ ; ৭।২০১।১৮, ২৭, ১১২

২ ভক্তির্ভবতু মে নিত্যং শাশ্বতী দেব সুরেশ্বর।—ঐ ১৩।১৪।৩৫২

৩ ঐ ৭।২০১।১৮ ৪ ঐ ১৩।১৪।২, ১২

৫ তাভ্যাং লিঙ্গেঽর্চিতো দেবস্ত্বয়ার্চায়াং যুগে যুগে।—মহা ভা ৭।২০০।৯২

লিঙ্গে শিবার্চনা—কাহিনীটিতে লিঙ্গে শিবার্চনার মাহাত্ম্য প্রচার করা হয়েছে। প্রতিমায় শিবার্চনার চেয়ে লিঙ্গে শিবার্চনা যে অধিক ফলপ্রদ তা দুটি শ্লোকে আরও পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। একটিতে আছে[১] ভবকে সর্বরূপ অর্থাৎ সকল রূপই ভবের রূপ এই জেনে যিনি লিঙ্গে প্রভুর অর্চনা করেন তাঁর মধ্যে আত্মযোগ এবং শাস্ত্রযোগ শাশ্বত হয় অর্থাৎ জীব-ব্রহ্ম এক এই আত্মজ্ঞান এবং তার সহায়ক শাস্ত্রজ্ঞান তাঁর সর্বদা থাকে, তিনি জীবব্রহ্মের ঐক্য অনুভবও করেন।

অন্য শ্লোকে আছে[২] সকল প্রাণীকে শিবরূপ জেনে যিনি লিঙ্গের অর্চনা করেন অথবা লিঙ্গকে সকল প্রাণীর উদ্ভব জেনে যিনি লিঙ্গের অর্চনা করেন তাঁর প্রতি বৃষভধ্বজ অধিক প্রীত হন।

শ্লোকদুটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় শিব 'সর্বরূপ' এবং 'সর্বভূতভব' এই জ্ঞান যাঁর আছে তিনিই লিঙ্গপূজার যথার্থ অধিকারী এবং পূজার যথার্থ ফল তিনি পান। এর অর্থ এ রকম জ্ঞান যাঁর নেই তেমন ব্যক্তির পক্ষে লিঙ্গপূজা বিহিত নয়। নরনারায়ণ ও অশ্বত্থামার পূর্বোক্ত কাহিনীতেও এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করা যায়। অশ্বত্থামা নরনারায়ণের মতো উচ্চাধিকারী ছিলেন না। তাই, তিনি প্রতিমায় শিবপূজা করেন।

এই যে লিঙ্গে শিবার্চনা করার কথা হল এই লিঙ্গ কি?

আলোচ্য প্রথম শ্লোকের টীকায় নীলকণ্ঠ বলেছেন[৩] লিঙ্গে অর্থ সূক্ষ্মশরীরে এবং অর্চাতে অর্থ প্রতিমাতে। তারপর তিনি লিঙ্গে এবং প্রতিমাতে অর্চনার ফলপার্থক্যের হেতু ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দক্ষসংহিতার একটি বচন উদ্ধৃত করেছেন। তাতে আছে[৪]—

চারের সান্নিধ্যে যে-ফল তা অশাশ্বত, দুইয়ের সান্নিধ্যে শাশ্বত পদ পাওয়া যায়। টীকাকার বলেছেন প্রতিমায় শিবার্চকের 'আত্মমনইন্দ্রিয়বিষয়' এই চারের সান্নিধ্য হয় আর লিঙ্গে শিবার্চকের হয় 'আত্মমন' এই দুইয়ের সান্নিধ্য।

বোঝা যাচ্ছে নীলকণ্ঠের মতে লিঙ্গে শিবার্চক ইন্দ্রিয় ও বিষয় থেকে মন প্রত্যাহার করে ব্রহ্মস্বরূপ শিবে নিবিষ্ট করেন এবং এইভাবে মন তন্ময় হয়ে গেলে সমাধিযোগে ব্রহ্মোপলব্ধি করেন। ফলে তাঁর শাশ্বত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। এমনি উপাসকের প্রতি যে শিবের অধিক প্রীতি হবে তা সহজেই বোঝা যায়।

১ সর্বরূপং ভবং জ্ঞাত্বা লিঙ্গে যোঽর্চয়তি প্রভুম্। আত্মযোগাশ্চ তস্মিন্ বৈ শাস্ত্রযোগাশ্চ শাশ্বতাঃ।
—মহা ভা ৭।২০০।৯২

২ সর্বভূতভবং জ্ঞাত্বা লিঙ্গমর্চতি যঃ প্রভোঃ। তস্মিন্নভ্যধিকাং প্রীতিং করোতি বৃষভধ্বজঃ।
—ঐ ৭।২০০।৯৩

৩ লিঙ্গে সূক্ষ্মশরীরে অর্চায়াম্ প্রতিমায়াম। —ঐ ৭।২০০।৯২, টীকা

৪ চতুর্ণাং সন্নিধানেন যৎফলং তদশাশ্বতম্। দ্বয়োস্তু সন্নিধানেন শাশ্বতং প্রাপ্যতে পদম্। —ঐ

বলা বাহুল্য, এই ধরণের আরাধনা অর্থাৎ শিবের লিঙ্গ বা সূক্ষ্মমূর্তির অর্চনা অতি উচ্চাধিকারী ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভবপর। এ কথার সমর্থন আছে মহাভারতেই। দক্ষ প্রজাপতির মতো ব্যক্তিও শিবকে বলছেন[১]— তোমার যে-সব সূক্ষ্ম মূর্তি তাদের আমি দর্শন পাই নে। কাজেই, সিদ্ধান্ত হয় মহাভারতের সময়ে শাস্ত্রপন্থীদের মধ্যে যাঁরা অতি উচ্চাধিকারী ছিলেন তাঁরাই লিঙ্গে শিবার্চনা করতেন।

কথা উঠতে পারে নীলকণ্ঠ ত মহাভারতের সময়কার লোক নন। তিনি লিঙ্গের যে অর্থ করেছেন সেই অর্থেই শব্দটি মহাভারতে যে ব্যবহৃত হয়েছে তার নিশ্চয়তা কোথায়? নিশ্চয়তা আছে এইজন্য যে এ ছাড়া আলোচ্য শ্লোকগুলির কোনো যুক্তিসঙ্গত অর্থ করা যায় না। দেখা গেল মহাভারতেই শিবের সূক্ষ্ম মূর্তির উল্লেখ আছে। উপনিষদেও দেখা যায় সূক্ষ্মশরীরকে লিঙ্গশরীর[২] বলা হয়েছে। কাজেই, নীলকণ্ঠ যে লিঙ্গ অর্থ করেছেন সূক্ষ্মশরীর তা তাঁর স্বকপোলকল্পিত নয়। বিশেষ করে আমাদের ধর্মগ্রন্থের প্রাক্-আধুনিক যুগের টীকাকারদের একটা বিশেষত্ব এই যে এঁরা প্রাচীন পরম্পরা অনুসারে এই-সব গ্রন্থের টীকা করতেন। কাজেই, নীলকণ্ঠও তাঁর টীকায় প্রাচীন পরম্পরারই অনুসরণ করেছেন বলা যেতে পারে।

লিঙ্গ যদি শিবের সূক্ষ্মশরীর বা সূক্ষ্মমূর্তি হয় তা হলে সে-মূর্তি কি ধ্যানগম্য মানস মূর্তিমাত্র, না তার বাহ্য প্রতীকও কিছু ছিল এই প্রশ্নটি থেকে যায়।

মহাভারত থেকে উদ্ধৃত শ্লোকে দেখা যায় লিঙ্গ ও অর্চাকে পূজার আধার বলা হয়েছে। আধার মানসও হতে পারে আবার বাহ্যও হতে পারে।

অনুশাসনপর্বে আছে উপমন্যু ইন্দ্রকে বলছেন 'দেবেন্দ্র, এখানে ভগাঙ্কিত প্রত্যক্ষ লিঙ্গ দর্শন কর।'[৩] এর থেকে মনে হতে পারে উপমন্যুর সামনে শিবলিঙ্গ ছিল এবং তিনি ইন্দ্রকে তাই দেখিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু প্রসঙ্গ আলোচনা করলে তা মনে হয় না। উপমন্যু শিবের তপস্যায় রত ছিলেন। তাঁর কঠোর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে শিব ইন্দ্ররূপ ধরে তাঁর সামনে এলেন। তখন অন্য কথা প্রসঙ্গে তিনি পূর্বোক্ত কথাগুলি বলেছিলেন। উপমন্যু যে লিঙ্গে শিবার্চনা করছিলেন তার কোনো উল্লেখ কোথাও নাই। কাজেই মনে হয় ইন্দ্র তাঁর ধ্যানদৃষ্টির সামনে আবির্ভূত হয়েছিলেন আর তিনি যে প্রত্যক্ষ লিঙ্গের কথা বলেছেন তা তাঁর ধ্যানদৃষ্টির সামনে প্রত্যক্ষ ছিল। কেন না, দেখা যায় উপমন্যু এই শিবলিঙ্গের

১ যা মূর্তয়ঃ সূক্ষ্মাস্তে ন মহং যাতি দর্শনম্ ।—মহা শা ১২।২৮৪।৯৫

২ বহ্নের্যথা যোনিগতস্য মূর্তির্ন দৃশ্যতে নৈব চ লিঙ্গনাশঃ ।—শ্বে উপ ১।১৩

৩ প্রত্যক্ষমিহ দেবেন্দ্র পশ্য লিঙ্গং ভগাঙ্কিতম্ ।—মহা অ ১৩।১৪।২২৭

কথা এবং শিবের অন্যান্য রূপাদির কথা বলে বলছেন—কৃষ্ণ, সমাধি দ্বারা আমি এইরূপে দেবদেবকে দর্শন করেছিলাম।[১]

কাজেই মহাভারতে শিবলিঙ্গের বাহ্য প্রতীক বা বাহ্য শিবলিঙ্গের উল্লেখ আছে কি না নিশ্চয় করে বলা কঠিন।

লিঙ্গের অর্থ—তবে আমাদের মনে হয় শিবের সূক্ষ্মমূর্তির অর্থাৎ শিবলিঙ্গের যে একটা বাহ্য প্রতীকও ছিল লিঙ্গশব্দটির ব্যবহারেই তা সূচিত হচ্ছে। লিঙ্গশব্দের অন্যতম অর্থ চিহ্ন। এই অর্থে শব্দটি মহাভারতেও[২] ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় শৈব পাশুপতরাও এই চিহ্ন অর্থে লিঙ্গশব্দটির ব্যবহার করেছেন। পাশুপতসূত্রের একটি সূত্র—লিঙ্গধারী।[৩] ভাষ্যে কৌণ্ডিন্য বলেছেন অন্য বর্ণাশ্রমীদের আশ্রমপরিচায়ক বিভিন্ন লিঙ্গ থাকে; যেমন ব্রহ্মচারীদের লিঙ্গ দণ্ড, কমণ্ডলু, মৌঞ্জী, মেখলা, যজ্ঞোপবীত প্রভৃতি; তেমনি পাশুপতদেরও শরীরে ভস্মলেপন, নির্মাল্যধারণ প্রভৃতি লিঙ্গ।[৪] ভগবদ্গীতা,[৫] মনুসংহিতা[৬] প্রভৃতিতেও চিহ্ন বা লক্ষণ অর্থে লিঙ্গশব্দের ব্যবহার আছে।

যে বিশেষ চিহ্নটি শিবের চিহ্ন বলে মনে করা হত তাই শিবচিহ্ন বা শিবলিঙ্গ। এটি শিবের প্রতীক। আরাধকদের দৃষ্টিতে প্রতীক আর প্রতীকী অভিন্ন। তাই, শিবলিঙ্গ স্বয়ং শিব।

শিবলিঙ্গের আকার—লিঙ্গমূর্তির যে-আকার বহুল প্রচলিত এবং যে-আকারের দর্শন পাওয়া যায় দ্বিতীয়-তৃতীয় খৃষ্টপূর্বাব্দের মুদ্রায় ও গুপ্তযুগের সিলে[৭] আর সেই প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত সারা ভারতবর্ষ জুড়ে যে-আকারের লিঙ্গমূর্তির পূজা হচ্ছে তা মোটামুটি স্তম্ভ বা নলের আকারের, ইংরেজিতে যাকে বলে cylindrical. তবে অন্য আকারের শিবলিঙ্গও আছে।[৮] স্বয়ম্ভূ লিঙ্গ বলে পূজিত লিঙ্গ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষুদ্র পর্বত বা পর্বতশৃঙ্গ অথবা স্তম্ভ বা স্তূপাকৃতি প্রস্তরখণ্ড। খৃষ্টপূর্বাব্দের মুদ্রায় তিনটি পর্বতশৃঙ্গের মাথার উপরে চন্দ্রকলা উৎকীর্ণ আছে দেখা যায়। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা মনে করেন এ শিবের প্রতীক।[৯] কাজেই, বোঝা যাচ্ছে আলোচ্য মুদ্রায় স্বয়ম্ভূলিঙ্গ উৎকীর্ণ হয়েছে।

১ এবং দৃষ্টো ময়া কৃষ্ণ দেবদেবঃ সমাধিনা।—মহা ভা ১৩।১৪।৩৬৪

২ যেন লিঙ্গেন যো দেশো যুক্তঃ সমুপলক্ষ্যতে। তেনৈব নাম্না তং দেশং বাচ্যমাহুর্মনীষিণঃ।

—ঐ ১।২।১২

৩ পাশুপত সূত্র ১।৬

৪ কৌণ্ডিন্য লিঙ্গ শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন—'লীয়নাল্লিঙ্গনাচ্চ লিঙ্গম্।—ঐ, ভাষ্য

৫ ভগবদ্গীতা ১৪।২১ ৬ মনু ৮।২৫, ২৫২ ৭ D. H. I., p. 114

৮ Swami Śankarananda : Is Śivalinga A Phallus? Ch. V. ৯ D. H. I., p. 109.

প্রচলিত আকার কেন?—শিবলিঙ্গের যে বিশেষ আকারটি প্রচলিত সেইটিই কেন প্রচলিত হল এ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। কারো কারো মতে বৌদ্ধদের পূজাস্থল স্তূপ, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তূপ শিবলিঙ্গের আকারনির্ণয়ে সহায়তা করেছে এবং এই ব্যাপারে বিষ্ণুর প্রীত্যর্থে স্থাপিত স্তম্ভের (গরুড়ধ্বজের) প্রভাবও অনুমান করা হয়।[১]

স্তম্ভ—স্তম্ভ যে শিবলিঙ্গের আকারনির্ণয়ের অন্যতম কারণ তার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। কুমারস্বামী কুশানযুগের শেষের দিক্‌কার একটি শিবমূর্তির বিবরণ দিয়েছেন। মূর্তিটি চতুর্ভুজ, দণ্ডায়মান। একটি স্তম্ভসদৃশ প্রতীকের গায়ে উৎকীর্ণ।[২] এই স্তম্ভকে শিবলিঙ্গের আদিরূপ বলা যায়।

এ কথার পৌরাণিক সমর্থনও আছে। শিবপুরাণাদিতে শিবলিঙ্গের আবির্ভাব-কাহিনীতে দেখা যায় শিবের স্তম্ভমূর্তিই শিবলিঙ্গের আদিরূপ। কাহিনীটির সংসৃষ্ট অংশ সংক্ষেপে এই[৩]—ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এই নিয়ে একবার বিবাদ বাধে। কথা কাটাকাটি হতে হতে ভয়ংকর যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায়। তখন তাঁদের মোহ দূর করার জন্য পরমেশ্বর শিব নিষ্কল হলেও ভীষণ অনল-স্তম্ভরূপে উভয়ের মধ্যস্থলে আবির্ভূত হন। এই লোমহর্ষণ স্তম্ভ আদ্যন্তহীন। ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুও এর অন্ত ও আদি দর্শন করতে পারলেন না।

এই স্তম্ভই যে পূজার আধার শিবলিঙ্গের আদিরূপ এ কথা শিবপুরাণে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে। শিব ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুকে বলছেন[৪] জগৎবাসীর দর্শন ও পূজনের জন্য এই আদ্যন্তহীন স্তম্ভ ক্ষুদ্ররূপ ধারণ করবে। আবার ভোগাবহ এই লিঙ্গ একাধারে ভুক্তির ও মুক্তির সাধন। এঁর দর্শন, স্পর্শ এবং ধ্যানের দ্বারা জীবের জন্মবন্ধন ঘুচে যায়।

কেউ কেউ মনে করেন বৈদিক যূপই শিবলিঙ্গের আদিরূপ।[৫] যূপই বৈদিক যজ্ঞে ব্যবহৃত স্তম্ভ। মহাভারতে যূপস্তম্ভের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৬] প্রথম কয়েক খৃষ্টীয় শতাব্দীর মধ্যে নির্মিত যূপস্তম্ভ আবিষ্কৃতও হয়েছে।[৭] আনুমানিক দ্বিতীয় তৃতীয় খৃষ্টপূর্ব শতকের

১ H. B., Vol. II, pp. 143-144 ২ D. H. I., p. 462

৩ শি পু, বিদ্যেশ্বরসংহিতা, ৩।২৭-৩১, ৫।১১

৪ অনাদ্যন্তমিদং স্তম্ভমণুমাত্রং ভবিষ্যতি।
দর্শনার্থং হি জগতাং পূজনার্থং হি পুত্রকৌ॥
ভোগাবহমিদং লিঙ্গং ভুক্তি-মুক্ত্যেকসাধনম্।
দর্শন-স্পর্শন-ধ্যানাজ্জন্তূনাং জন্মমোচনম্॥

—শি পু, বিদ্যেশ্বরসংহিতা, ৭।১৯-২০

৫ Swami Śankarananda : Is Śivalinga A Phallus?

৬ মহা ভা ১।৯৪।২৯, ৩।১৯৮।১০ ৭ D. H. I., p. 108

আর্জুনায়নদের এবং যৌধেয়দের মুদ্রায় যূপের পাশে দণ্ডায়মান বৃষমূর্তি উৎকীর্ণ আছে মনে করা হয়।[১] ডক্টর জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এগুলিকে শূলগব-যজ্ঞের স্মারক মনে করেন। প্রাচীন কালের ভারতীয় রাজাদের এমন কি ভারতের বিদেশী শাসকদের কাঁরো কাঁরো মুদ্রায় বৃষভমূর্তি উৎকীর্ণ হয়েছে। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন এই বৃষভমূর্তি শিবের পশুমূর্তি।[২] লক্ষ্য করা গেছে রুদ্রকে বেদসংহিতাতেই বৃষ বলা হয়েছে। এইভাবে যূপের সঙ্গে বৃষভমূর্তি থাকায় যাঁরা যূপকে শিবলিঙ্গের আদিরূপ মনে করেন তাঁদের মতের একটা সমর্থন যেন পাওয়া যায়।

আদিম মানবের পূজার আধার—আমরা দেখেছি আদিম মানব বিশেষ বিশেষ গাছ, পাথর বা জন্তুকে দেবতা বলে পূজা করত। এগুলি ছিল তাদের কাছে পবিত্র পূজার আধার (Fetish things)। জগতের সর্বত্র পূজার আধার পাথর পাওয়া গেছে। এই-সব পাথর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় লম্বাটে ধরণের, গোড়ায় অন্ত পাথর দিয়ে খাড়া করে রাখা হত। এই খাড়া পাথরের মধ্যে অনেকগুলিই নোড়া বা থাম বা নলের আকারের।

লক্ষ্য করা গেছে বেদসংহিতার সময়েই আর্য অনার্য নানা 'জন'এর দেবতা রুদ্রশিবের মধ্যে মিশে যান। অনুমান করা অসঙ্গত হবে না এমনি কোনো এক বা একাধিক 'জন'-এর লোকেরা খাড়া লম্বা পাথরে দেবতার পূজা করত আর সেই দেবতা রুদ্রশিবের মধ্যে মিশে যান; অর্থাৎ তিনি রুদ্রশিব বলে স্বীকৃত হন। এইভাবে এই বিশেষধরণের পাথরকে রুদ্রশিবের পূজার আধাররূপে বেদপন্থীরাও স্বীকার করে নেন। যা দেবতার পূজার আধার তাই তাঁর প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। হয়ত এমনি করেই খাড়া লম্বা পাথর শিবের প্রতীকরূপে গণ্য হয়েছে।

আমাদের অনুমানের ঐতিহাসিক সমর্থনও আছে। যে তিনটি প্রাচীনতম মুদ্রায় শিবলিঙ্গ উৎকীর্ণ আছে মনে করা হয়, ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় সেগুলিকে স্থানীয় বা জনীয় (local or tribal) বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।[৩] এর থেকে বোঝা যায় শিবের এই বিশেষ আকারের লিঙ্গ বা মূর্তি ঐতিহাসিক সময়েও প্রথমে বিশেষ 'জন'-এর মধ্যে অর্চিত হত।

তবে এ সম্পর্কে একটি কথা আছে। অনুমান হয় অতি প্রাচীন কালে বিভিন্ন 'জন'-এর মধ্যে খাড়া লম্বা পাথরে বিভিন্ন দেবতার পূজা হত। এই কারণে পাছে লোকে ভুল করে এই জন্ত পরবর্তী কালেও দেখা যায় প্রথমে প্রথমে শিবলিঙ্গের গায়ে কোথাও কোথাও শিবমূর্তি উৎকীর্ণ করে দেওয়া হয়েছে; অথবা শিবলিঙ্গের পাশে ত্রিশূল-পরশু দেওয়া হয়েছে।

১ D. H. I., p. 109 ২ Ibid. pp. 112, 118 ৩ D. H. I., p. 114

বসারে (Basarh) প্রাপ্ত একটি সিলে শিবলিঙ্গের পাশে এমনি ত্রিশূল-পরশু উৎকীর্ণ দেখা যায়।[১]

যে-সব শিবলিঙ্গের গায়ে শিবমূর্তি উৎকীর্ণ আছে সেগুলিকে বলে মুখলিঙ্গ। শিবলিঙ্গ যখন সর্বজনপরিচিত হয়ে যায় তখন থেকে মুখলিঙ্গের আর প্রয়োজন থাকে না। এই জন্যই অর্বাচীন কালের কোনো মুখলিঙ্গ পাওয়া যায় না।

লিঙ্গের তত্ত্ব—সে যা হক, বেদপন্থীরা 'জন'-পূজিত রুদ্রশিবের প্রতীককে স্বীকার করে নিলেন বটে কিন্তু তার সঙ্গে আপনাদের অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব যোগ করে দিলেন। শিব ব্রহ্ম; স্বরূপতঃ নির্গুণ, নিষ্কল। তাঁরা বললেন অঙ্গপ্রত্যঙ্গহীন লিঙ্গমূর্তি সেই তত্ত্বই প্রকাশ করছে। কিন্তু এই গভীর তত্ত্ব সবার বোধগম্য হত না। সেইজন্য বেদপন্থীদের মধ্যে অল্প লোকেই লিঙ্গে অর্চনা করত বা করার অধিকারী ছিল। আমরা দেখেছি মহাভারতে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে।

প্রাচীন লিঙ্গমূর্তির অভাব—মহাভারতের সময়ে উচ্চশ্রেণীর লোকের মধ্যে যে লিঙ্গে শিবার্চনা ব্যাপক ছিল না বরং অর্চায় শিবার্চনা অধিকতর প্রচলিত ছিল তার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। যথা—(১) পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যে[২] শিবের প্রতিকৃতির উল্লেখ করেছেন, শিবলিঙ্গের করেন নি। (২) বিদেশী শাসক গণ্ডফরেস (Gondophares) এবং ওয়েম কড্‌ফিসেস-এর (Wema kadphises) মুদ্রায় সর্বাবয়ব শিবমূর্তি উৎকীর্ণ হয়েছে।[৩] শিবলিঙ্গের অর্চনা ব্যাপক হলে শিবলিঙ্গই উৎকীর্ণ হত। (৩) খৃষ্টের দুয়েক শতাব্দী পূর্বের এবং তাঁর দুয়েক শতাব্দী পরের অনেক মুদ্রায় শিবের সর্বাবয়ব মূর্তি পাওয়া গেছে।[৪] ঐ সময়কার তিনটি মাত্র স্থানীয় বা জনীয় মুদ্রায় শিবলিঙ্গ উৎকীর্ণ হয়েছে বলে মনে করা হয়। কিন্তু এই মুদ্রাগুলি সম্পর্কে পণ্ডিতেরা কোনো স্থিরসিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন নি এবং মুদ্রাতে উৎকীর্ণ প্রতীকটি শিবলিঙ্গ কি না সে-সম্বন্ধেও তাঁরা এক মত নন।

পৌরাণিক যুগে লিঙ্গমূর্তির প্রচার—পরে পৌরাণিক যুগে যখন শিব পরমশিব, পরব্রহ্ম এই তত্ত্ব বিশেষভাবে প্রচারিত হল এবং সেই সঙ্গে লিঙ্গে শিবার্চনার শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরব প্রচারিত হল তখন থেকে লিঙ্গমূর্তির অর্চনার ব্যাপক প্রচলন হয়েছে বলা যায়। ঐতিহাসিক বিচারে বলা যায় এটি গুপ্তযুগ থেকে হয়েছে। কেন না ঐ সময় থেকেই শিবলিঙ্গ অর্চনার সুনিশ্চিত ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। সেই গুপ্তযুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত ভারতের সর্বত্র লিঙ্গমূর্তিতেই শিব পূজিত হয়ে আসছেন। শিবের সর্বাবয়ব

১ Ibid, p. 179. ২ মহাভাষ্য ৫।৩।৯৯ ৩ D. H. I., pp. 116-11[illegible]

৪ Ibid, pp. 117-118

মূর্তি এ সময়ে খুব কমই দেখা যায়। প্রাচীন শিবমন্দির গুলিতেও লক্ষ্য করা যায় শিবের মূল বিগ্রহ লিঙ্গ। তবে অনেক মন্দিরের গায়ে মানবাকার সর্বাবয়ব শিবমূর্তি উৎকীর্ণ হয়েছে দেখা যায়।[১] মনে হয় সাধারণ লোকেদের দেবতার ধ্যানধারণার সহায়তা করার উদ্দেশ্যে এরূপ করা হয়েছে।

কিন্তু শিবলিঙ্গের এই ইতিবৃত্ত সবাই স্বীকার করেন না। কারো কারো মতে শিব-লিঙ্গ মূলতঃ জননেন্দ্রিয় (phallus)। এঁদের মতে প্রাচীন জগতের সর্বত্র সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে স্ত্রীজননেন্দ্রিয় এবং পুংজননেন্দ্রিয়ের পূজা প্রচলিত ছিল। সভ্য মানুষের মধ্যে ফিনিসীয়, মিশরী, য়িহুদী,[২] রোমক[৩] ও শিন্টোধর্মী[৪] জাপানী প্রভৃতি লোকেরা এই পূজা করতেন। রোমক মহিলা এবং কন্যারা জননেন্দ্রিয়সদৃশ পদক (medal) ও অলঙ্কার পরতেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল এতে তাঁরা সন্তানবতী হওয়ার সামর্থ্য লাভ করবেন।[৫] এঁদের মতে ভারতবর্ষেও ঋগ্‌বেদের সময় থেকে জননেন্দ্রিয়ের পূজা প্রচলিত ছিল।[৬] এঁরা ঋগ্‌বেদে যজ্ঞকারীদের শত্রুদের সম্পর্কে ব্যবহৃত 'শিশ্নদেবাঃ' শব্দটিকে' আপনাদের মতের সমর্থক প্রমাণ মনে করেন।

শিবলিঙ্গ সম্বন্ধে অন্য মত— আলোচ্য মতবলম্বী অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে জননেন্দ্রিয়ের পূজা আর্যেতর লোকেদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তাঁদের কাছ থেকেই আর্যেরা এটি গ্রহণ করেন, অবশ্য নিজেদের মতো করে।[৮] ঋগ্‌বেদে শিশ্নদেবদের নগরবাসী বলা হয়েছে। তার থেকে কেউ কেউ অনুমান করেন এঁরা মহেঞ্জোদড়োর নির্মাতা আর্যেতর লোক।[৯] স্যার জন মার্শেল মহেঞ্জোদড়ো ও হড়প্পার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পূজার আধার পুংজননেন্দ্রিয় ও স্ত্রীজননেন্দ্রিয় পাওয়া গেছে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। যে-সব প্রস্তরাঙ্গুরীয়ক বা বলয় পাওয়া গেছে সেগুলিকে তিনি যোনি মনে করেন। আর অন্ততঃ দুটি পাথরের লিঙ্গ পাওয়া গেছে বলে দাবি করেন। এই দুটির আকার কমবেশী পুংজননেন্দ্রিয়ের মতো। এইজন্য, মার্শেল মনে করেন ভারতে জননেন্দ্রিয়পূজা প্রাক্-আর্য। উত্তরবেলুচিস্তানের মুঘল ঘুণ্ডে নামক স্থানে একটি বাস্তব শিশ্নের আকারের প্রস্তরশিশ্ন (লিঙ্গ)

১ D. H. I, p. 455 ২ S. S. W., pp. 383, 884, 387, 395, 446

৩ E. R. E., Vol. IX, p. 822 ৪ Ibid, p. 819 ৫ S. S. W., p. 389

৬ R. I., p. 414 ; Antiquity of Tantricism, I. H. Q., Vol. VI, p. 121

৭ ঋ বে ৭।২১।৫ ; ১০।৯৯।৩

৮ Race Movements and Pre-historic Culture, V. A., p. 168 ; R. Ph. V. U. p. 682, f. n. 8 ; V. S. M. R. S., p. 115

৯ Pre-Indian Element in Indian Culture, I. H. Q., Vol X, pp. 19-20

এবং পেরিয়ানো ঘুণ্ডে নামক স্থানে একটি বাস্তব যোনির আকারের প্রস্তরযোনি স্যার ওরেল ষ্টাইন আবিষ্কার করেন। এগুলিকে মহেঞ্জোদড়োরও পূর্ববর্তী মনে করা হয়। মার্শেল মনে করেন এই আবিষ্কারে তাঁর মতের সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে।[১]

মাদ্রাজের সালেম জেলার শেবরয় (Shevoroy hill) পাহাড়ে একটি জননেন্দ্রিয়ের আকারের পাথর পাওয়া গেছে। একে পূজার আধার জননেন্দ্রিয় মনে করা হয়।[২] এ ছাড়া, বড়োদা রাজ্যে নবপ্রস্তর-যুগের (neolithic times) একটি পূজার আধার মৃন্ময় জননেন্দ্রিয় পাওয়া গেছে বলে দাবি করা হয়।[৩]

শিবলিঙ্গপূজা যে মূলতঃ আর্যেতর জননেন্দ্রিয়পূজা তার সমর্থনে বলা হয় জননেন্দ্রিয়বাচক লিঙ্গ শব্দটিই মূলতঃ প্রোটো-অষ্ট্রয়েড বা আদি-অষ্ট্রেলীয় ভাষার শব্দ।[৪] শব্দটি পরে আর্যভাষায় গৃহীত হয় এবং সেই সঙ্গে লিঙ্গপূজা আর্যসমাজে গৃহীত হয়।[৫]

এই মতের সমর্থক সব চেয়ে জোরাল প্রমাণ হিসাবে অন্ধ্ররাজ্যের গুডিমল্লমের শিবলিঙ্গের উল্লেখ করা হয়। সাধারণতঃ এটি খৃষ্টপূর্ব প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীর তৈরী বলে মনে করা হয়।[৬] লিঙ্গের শিরোভাগ বাস্তব জননেন্দ্রিয়ের মুখের মতো। লিঙ্গের গায়ে শিবমূর্তি খোদাই-করা। কাজেই, এঁরা বলেন শিবলিঙ্গ যে মূলতঃ বাস্তব জননেন্দ্রিয় এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না।[৭]

শিবলিঙ্গ মূলতঃ শিশ্ন নয়—পূর্বেই ইঙ্গিত করা হয়েছে এ মত পণ্ডিতেরা সবাই স্বীকার করেন না। বিরুদ্ধমতাবলম্বীরা বলেন শিবলিঙ্গ যে মূলতঃ জননেন্দ্রিয় (phallus) এ মতের পক্ষে যথার্থ কোনো যুক্তি নেই।

এঁদের মতে ঋগ্‌বেদের 'শিশ্নদেবাঃ' অর্থ জননেন্দ্রিয়পূজক এ রকম মনে করার কোনো হেতু নাই। যাস্ক শিশ্নদেবাঃ শব্দের অর্থ করেছেন অব্রহ্মচর্যাঃ অর্থাৎ অব্রহ্মচারী। সায়ণও এই অর্থ করেছেন।[৮] মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করে দেখিয়েছেন শিশ্নদেবাঃ অর্থ কামুক (lustful)।[৯]

মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পাতে প্রাপ্ত যে-সব বস্তুকে মার্শেল লিঙ্গ এবং যোনি মনে করেছেন সেগুলি

১ M. I. C., Vol. I, p. 59 ২ F. O. I. P. P. A., p. 61, ref. I. H. Q. Vol. X, p. 21

৩ F. O. I. P. P. A., p. 139, ref. I. H. Q., Vol. X, pp. 19-20

৪ শ্‌প্রিয়ে Jean Przyluski দেখিয়েছেন লিঙ্গ, লাঙ্গুল, লকুট এবং লগুড় অষ্ট্রিক শব্দ। দ্রঃ V. A. p. 163

৫ V. A., p. 163

৬ Coomarswamy : History of Indian and Indonesian Art, p. 39 ;

৭ E. H. I., Vol. II, Part I, pp. 55-63, 65-71 ৮ নিরুক্ত ৪।১৯ ; ঋ বে ৭।২১।৫, ভাষ্য

৯ I. H. Q., Vol, IX, p. 106 ; Vol. X, pp. 156-157

যে লিঙ্গ এবং যোনি তার কোনো নিশ্চিত প্রমাণ নেই। প্রস্তরবলয়- বা অঙ্গুরীয়ক-গুলিকে ত যোনি বা 'যোনিচিহ্ন' বলে প্রমাণ করা যায় না। আর যে-সব পাথরকে মার্শেল লিঙ্গ মনে করেছেন তিনি শুধু সেগুলির আকৃতি দেখেই অনুমান করেছেন পাথরগুলি লিঙ্গ হবার খুবই সম্ভাবনা (highly probable)। অথচ এই আকৃতি সম্বন্ধে তিনি নিজেই মন্তব্য করেছেন এটি প্রথাগত (conventionalized)।[১] এর অর্থ বাস্তব শিশ্নের আকৃতি নয়। যে দুটি বস্তুকে তিনি নিঃসন্দিগ্ধরূপে শিশ্ন (unquestionably phalli) মনে করেছেন সে দুটিও কমবেশি বাস্তব শিশ্নের আকারে তৈরি বলেছেন (more or less realistically modelled)।[২] অর্থাৎ এ দুটিকেও পুরোপুরি বাস্তব শিশ্ন বলতে পারেন নি।

মার্শেলের কথা থেকেই বোঝা যায় মহেঞ্জোদড়োতে প্রাপ্ত যে-পাথরগুলিকে তিনি লিঙ্গ মনে করেছেন সেগুলি শিশ্ন নয়; শিশ্ন হলে তাদের বাস্তব শিশ্নের আকৃতি থাকত। তা না হয়ে লিঙ্গগুলি হয়েছে প্রথাগত আকারের।[৩] এই প্রথাগত আকার সম্বন্ধে মার্শেল ঐ প্রসঙ্গেই মন্তব্য করেছেন মধ্যযুগের এবং আধুনিক যুগের ভারতে স্বাভাবিক শিশ্নের আকৃতির শিবলিঙ্গ কদাচিৎ দেখা যায়; শতকরা নব্বইটি লিঙ্গই প্রথাগত আকারের করা হয়েছে (conventionalized)।[৪] অবশ্য, মার্শেলের ধারণা শিশ্নের স্বাভাবিক আকৃতি যাতে ধরতে না পারা যায় সেইজন্যই এ রকম প্রথাগত আকৃতি করা হয়েছে।

কিন্তু তাঁর এই ধারণার সমর্থনে তিনি কোনো যুক্তি দেন নি। কাজেই, এটি তাঁর ব্যক্তিগত মত বলা যেতে পারে। তা ছাড়া, তিনি যে-মন্তব্য করেছেন শতকরা নব্বইটি শিবলিঙ্গ প্রথাগত আকারের এটিও তাঁর ব্যক্তিগত মত বলেই মনে হয়। কেন না অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন শিবলিঙ্গমাত্রই প্রথাগত আকারের।

যা হক, মার্শেল-পরিবেশিত তথ্য থেকেই জানা যায় মহেঞ্জোদড়োতে স্তম্ভ বা নলের আকারের পাথরের দেবতার পূজা হত এবং এই আকৃতির পাথরই পরে শিবের চিহ্ন বা প্রতীক বলে গৃহীত হয়। মার্শেল এইগুলিকেই প্রথাগত আকারের 'লিঙ্গ' বলেছেন। এগুলি লিঙ্গ বটে কিন্তু শিশ্ন নয়। কেন না, শিশ্ন নয় বলেই বাস্তব শিশ্নের আকারের হয় নি। শিবলিঙ্গের মূল স্তম্ভ বা নলাকার পাথর, সেইজন্য শিবলিঙ্গের আকার 'প্রথাগত' হয়েছে, বাস্তব শিশ্ন হলে শিবলিঙ্গের আকৃতিও সেই রকম হত।

---

১ M. I. C., Vol. I, pp 59-60 ২ M. I. C., Vol. I, p. 59

৩ শিবলিঙ্গের প্রথাগত আকার এই—লিঙ্গের নিম্নভাগ চতুরস্র (square), মধ্যভাগ অষ্টাস্র (octagonal) এবং শিরোভাগ সাধারণতঃ নলাকার (cylindrical)। সাধারণতঃ নিম্ন ও মধ্যভাগ ভূমি এবং পীঠিকার (pedestal) অভ্যন্তরে থাকে। এইজন্য শিবলিঙ্গের আকার বলতে তার শিরোভাগের আকারই বুঝায়।

৪ M. I. C., Vol. I, pp. 59-60

গুডিমল্লমের যে-শিবলিঙ্গকে তার মস্তকভাগ দেখে নিশ্চিত বাস্তবাকৃতি শিশ্ন মনে করা হয় সে-সম্বন্ধেও ভিন্নমত আছে। ভিন্নমতাবলম্বীরা বলেন,[১] এই লিঙ্গটি কেটে শিবমূর্তি করার সময় শিল্পী লিঙ্গের শীর্ষভাগে মন্দিরের আকৃতি দেবার চেষ্টা করেছেন। শিব মন্দিরের মধ্যে আছেন এইটি তিনি দেখাতে চেয়েছেন। লিঙ্গের শিরোভাগে যা দেখা যায় তা আসলে মন্দিরের সামনের দিক, একে শিশ্নমুখের আকৃতি বলা ভুল।

যাঁরা মনে করেন শিবলিঙ্গ মূলতঃ অনার্য-উপাসিত শিশ্ন (phallus) তাঁরা বলেন গোঁড়া বেদপন্থীরা শৈবদের যে ঘৃণা করতেন এটি তার অন্যতম কারণ।[২] তাই যদি হয়, তা হলে এই বেদপন্থীরা অনার্যদের পূজিত শিশ্নকে নিজেদের দেবতা রুদ্রশিবের প্রতীক বা রুদ্রশিব বলে গ্রহণ করলেন কি করে বা রুদ্রশিবের প্রতীককে অনার্য লিঙ্গশব্দের দ্বারা পরিচিত করলেন কি করে ?

আর্যেরা প্রোটো-অস্ট্রলয়েডদের কাছ থেকে শিশ্নপূজা এবং শিশ্নবাচক লিঙ্গশব্দটি গ্রহণ করেছেন বলে যে-অভিমত প্রকাশ করা হয় বাস্তব ক্ষেত্রে তার সমর্থন পাওয়া যায় না। প্রোটো-অস্ট্রলয়েডদের মধ্যে যদি শিশ্নপূজা প্রচলিত থাকত তা হলে তাদের বংশধরদের মধ্যেও তা অবশ্যই প্রচলিত থাকত, কেন না, এই-সব আদিম মানুষ অত্যন্ত রক্ষণশীল, বিশেষ করে ধর্মের ব্যাপারে এরা চরম রক্ষণশীল, পূর্বপুরুষদের ধর্মের এতটুকু পরিবর্তনও এরা স্বীকার করে না। কিন্তু ভারতের ঐতিহাসিক যুগের প্রোটো আস্ট্রলয়েডদের মধ্যে শিশ্নপূজার কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না। সাধারণভাবে বলা যায় বর্তমানেও ভারতের পার্বত্য জাতিগুলির মধ্যে শিশ্নপূজার প্রচলন নাই।[৩] কাজেই প্রোটো-অস্ট্রলয়েডদের কাছ থেকে শিশ্নপূজা আর্যসমাজে গৃহীত হয়েছে এ অভিমত সমর্থনযোগ্য নয়। শুধু ভাষার প্রমাণে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও সমীচীন হতে পারে না। বিশেষ করে এ ক্ষেত্রে ভাষার প্রমাণও টেকে না। কেন না, শিশ্নবাচক লিঙ্গশব্দের সঙ্গে শিশ্নপূজার কোনো যোগ আছে এরূপ প্রমাণ কোথায় ? শিশ্নবাচক লিঙ্গশব্দ প্রোটো-অস্ট্রলয়েড ভাষা থেকে আর্যভাষায় গৃহীত হতে পারে কিন্তু আর্যভাষায় শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। এরূপ অবস্থায় লিঙ্গপূজা অর্থ শিশ্নপূজা এ কথা নিশ্চয় করে বলা যায় না। কাজেই লিঙ্গশব্দ শিবলিঙ্গের শিশ্নমূলত্বের প্রমাণ বলে গণ্য হতে পারে না।

বিরাট্ আকারের শিবলিঙ্গ— ভারতের কয়েকটি স্থানে আছে কয়েকটি বিরাট্ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। প্রথমেই কাশ্মীর বাঙ্গীশ্বর লিঙ্গের উল্লেখ করা যায়। এটি একটি

---

১ Swami Śankarananda : Is Śiva Linga a Phallus?

২ D. H. I., p. 455 ৩ E. R. E., Vol. VI., p. 700

প্রকাণ্ড কাল নলাকার প্রস্তরখণ্ড ; এর উচ্চতা ছ ফুট এবং পরিধি বার ফুট। ভূপালের ভোজপুরে অনুরূপ একটি লিঙ্গ আছে। প্রকাণ্ড এক পীঠিকার উপর এই অতিকায় লিঙ্গটি প্রতিষ্ঠিত। এটি সাড়ে সাত ফুট উঁচু আর এর পরিধি সতের ফুট আট ইঞ্চি।

তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বরমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ, শিবকাঞ্চির ক্ষিতিলিঙ্গ এবং তিরুবন-মালয়ের জ্যোতিলিঙ্গও বিরাট্ আকারের। দেখতে বিস্তীর্ণ পরিধির প্রকাণ্ড স্তম্ভের মতো।[১]

এই সব লিঙ্গ দর্শন করলে শিবলিঙ্গ যে শিশ্ন (phallus) নয় এ বিষয়ে মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাকে না।

উপাসকদের অভিমত—কিন্তু শিবলিঙ্গ সম্বন্ধে লিঙ্গে শিবোপাসকদের অভিমত চূড়ান্ত বলে গণ্য হওয়া উচিত। কেন না, অন্যদের অভিমত নিছক জল্পনা কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু এঁদের অভিমত এঁদের ধর্মবিশ্বাসের পরিচায়ক। আর সে-বিশ্বাস শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে লক্ষ লক্ষ নরনারীর জীবনে প্রভাব বিস্তার করে আসছে। ভারতের সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এ বিশ্বাসের ফসল অনেক ফলেছে।

লিঙ্গ মহেশ্বর—শিবলিঙ্গের উপাসকদের মতে লিঙ্গ স্বয়ং পরমেশ্বর রুদ্র।[২] লিঙ্গ সাক্ষাৎ মহেশ্বর।[৩]

মহেশ্বর শিব ব্রহ্ম। ব্রহ্ম নির্গুণ, নিষ্কল আবার সগুণ সকল। শিবও তাই। নিষ্কল শিবই নিরাকার লিঙ্গ অর্থাৎ লিঙ্গ তাঁর পূজার আধার। আর সগুণ সকল শিব রূপধারী অর্থাৎ প্রতিমা তাঁর পূজার আধার।[৪]

শিবশক্তির দেহ—অন্যত্র বলা হয়েছে লিঙ্গ শিবশক্তির দেহ ; কেন না, লিঙ্গে শিবশক্তি নিত্য অধিষ্ঠিত।[৫]

তবে সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলা হয়েছে শিবশক্তি স্বতোবিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ বলে তাঁদের পরমার্থতঃ কোনো দেহ নাই, তাঁদের যে-দেহের কথা বলা হল তা পরমার্থতঃ নয়, উপচারতঃ।[৬]

---

১ শিবলিঙ্গের বিরাট্-আকার-সম্পর্কিত তথ্য বিশ্বভারতীর ভারতবিদ্যা (Indology)-বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর সুধাকর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে পাওয়া গেছে।

২ যো লিঙ্গং পরমেশানি স রুদ্রঃ পরমেশ্বরঃ।—মৎস্যসূক্তবচন, উদ্ধৃত, প্রা তো, ব সং, পৃঃ ৩৩৪.

৩ লিঙ্গবেদী মহাদেবী লিঙ্গং সাক্ষান্মহেশ্বরঃ।—শি পু, বায় সং, উ ভা, ২৭।১৩

৪ শিব একো ব্রহ্মরূপত্বান্নিষ্কলঃ পরিকীর্তিতঃ। রূপিত্বাৎ সকলস্তদ্বৎ তস্মাৎ সকলনিষ্কলঃ ॥
নিষ্কলত্বান্নিরাকারং লিঙ্গং তত্র সমাগতম্। সকলত্বাৎ তথা বেরং সাকারং তত্র সঙ্গতম্ ॥
—শি পু, বিদ্যেশ্বরসংহিতা, ৫।১১-১২

৫ লিঙ্গঞ্চ শিবয়োর্দেহস্তাভ্যাং যস্মাদধিষ্ঠিতম্।—ঐ, বায় সং, উ ভা, ২৭।১২

৬ ন তয়োর্লিঙ্গদেহত্বং বিদ্যতে পরমার্থতঃ। যতঃ স্বতো বিশুদ্ধৌ তৌ দেহস্তূপচারতঃ।—ঐ, ২৭।১৪

লিঙ্গশব্দের ব্যাখ্যা—শাস্ত্রে লিঙ্গশব্দের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তা প্রণিধানযোগ্য। স্কন্দপুরাণে বলা হয়েছে—লিঙ্গ আকাশ আর পৃথিবী তার পীঠিকা। লিঙ্গ সর্ব দেবতার আলয় অর্থাৎ লয়স্থল। লিঙ্গে সমস্ত লয়প্রাপ্ত হয় বলে তাকে লিঙ্গ বলা হয়।[1]

তন্ত্রাদিতেও লিঙ্গের এই ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কৌলজ্ঞাননির্ণয়তন্ত্রে বলা হয়েছে[2]—তাঁর ইচ্ছায় সৃষ্টি হয়, তাঁর মধ্যেই সেই সৃষ্টি লয়প্রাপ্ত হয়। যাঁর মধ্যে চরাচর লয়প্রাপ্ত হয় তাই লিঙ্গ নামে খ্যাত।

কাজেই দেখা গেল শিবোপাসকদের মতে লিঙ্গ নিরাকার নিষ্কল শিবব্রহ্ম বা তাঁর প্রতীক। শিশ্নের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নাই।

শিবলিঙ্গের পূজা সনাতনধর্মীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। তবে সম্প্রদায় হিসাবে সর্বপ্রধান লিঙ্গোপাসক লিঙ্গায়ত বা বীরশৈবেরা। কেউ কেউ মনে করেন এঁরা মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ লিঙ্গার্চনা গ্রহণ করেন।[3] লিঙ্গ যে শিবের নিষ্কলব্রহ্মস্বরূপের প্রতীক এ কথায় তার সমর্থন আছে।

লিঙ্গায়তদের ব্যাখ্যা—লিঙ্গশব্দের যে শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা দেওয়া হল লিঙ্গায়তরাও সেই ব্যাখ্যাই প্রচার করেন। তাঁদের মতে লিঙ্গ শব্দ √লী এবং √গম্ এই দুই ধাতু থেকে ব্যুৎপন্ন হয়েছে। √লী অর্থ লয় পাওয়া আর √গম্ অর্থ বহির্গত হওয়া, বিবৃত হওয়া। কাজেই লিঙ্গ সেই পরম সত্তা যাঁর মধ্যে সমস্ত সৃষ্টি লীন হয়ে যায় এবং যাঁর থেকে আবার বিবৃত হয়।[4]

লিঙ্গার্চনা এবং লিঙ্গধারণ—এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় বীরশৈব বা লিঙ্গায়তরা অতিশয় শুদ্ধাচারী, সংযত ও নৈষ্ঠিক মানুষ। তাঁদের ধর্মের সঙ্গে আদিরসাত্মক কোনো কিছুর সংস্রবই নেই। লিঙ্গার্চনা এবং লিঙ্গধারণ তাঁদের অবশ্য কর্তব্য। লিঙ্গধারণ বলতে অবশ্য ভস্মলেপন এবং ক্ষুদ্রলিঙ্গমূর্তি ধারণ উভয়ই বোঝায়। শিবলিঙ্গকে শিশ্ন মনে করলে এঁরা কখনই লিঙ্গার্চনা করতেন না, বিশেষ করে কণ্ঠে লিঙ্গমূর্তি ধারণ করতেন না।

লিঙ্গার্চনায় ধ্যান—শুধু বীরশৈব কেন কোনো শিবোপাসকই শিবলিঙ্গকে শিশ্ন মনে করেন না। করেন না যে তার সব চেয়ে বড় প্রমাণ লিঙ্গার্চনার সময় এঁরা আরাধ্যের যে ধ্যান পাঠ করেন সেই 'ধ্যান'। ধ্যানটি এই—যিনি রজতগিরিসন্নিভ, চারুচন্দ্রাবতংস,

১ আকাশং লিঙ্গমিত্যাহুঃ পৃথিবী তস্য পীঠিকা। আলয়ঃ সর্বদেবানাং লয়নাল্লিঙ্গমুচ্যতে।

—স্কন্দপুরাণবচন, উদ্ধৃত, প্রা তো, ৫ সং পৃঃ ৩২৮

২ তস্যেচ্ছয়া ভবেৎ সৃষ্টির্লয়স্তত্রৈব গচ্ছতি। তেন লিঙ্গন্তু বিখ্যাতং যত্র লীনং চরাচরম্।—কৌ জ্ঞা নি, ৩।১০

৩ Ś. B. C. M., Vol. IV, p. 68 ৪ Vira-Śaivism, H. Ph. E. W., p. 399

রত্নালঙ্কারের দ্বারা যাঁর অঙ্গ উজ্জ্বল, যাঁর হাতে পরশু, মৃগ, বর ও অভয় মুদ্রা, যিনি প্রসন্ন, পদ্মাসীন, চারদিক্ থেকে অমরগণ যাঁর স্তব করেছেন, যিনি ব্যাঘ্রচর্মাচ্ছাদিত, বিশ্বের আদি যিনি, যিনি বিশ্বের বীজ, নিখিলের ভয়হরণকারী, পঞ্চমুখ এবং ত্রিনেত্র সেই মহেশকে নিত্য ধ্যান করি।[১]

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীতি হয় শিবলিঙ্গ শিশ্ন নয় বা লিঙ্গার্চনার মূল শিশ্নপূজা নয় এই মতই সমীচীন।

পৌরাণিক শিশ্নকাহিনী— তবু প্রশ্ন থেকে যায়। কোনো কোনো পৌরাণিক কাহিনীতে দেখা যায় শিবলিঙ্গকে শিশ্ন প্রতিপন্ন করা হয়েছে। তার অর্থ কি? উত্তরে বলা হয় এ-সব কাহিনী অন্য সম্প্রদায়ের লোকেদের উদ্ভাবিত। কেউ কেউ মনে করেন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবুদ্ধিতে এই-সব কাহিনীর মাধ্যমে কুৎসা রটান হয়েছে। আমাদের কিন্তু মনে হয় কাহিনীগুলি 'নহি নিন্দা ন্যায়' অনুসারে প্রচারিত হয়েছে। এর অর্থ এই-সব কাহিনীর উদ্দেশ্য অপর সম্প্রদায়ের উপাস্যের নিন্দা-রটনা নয়, উদ্দেশ্য আপন সম্প্রদায়ের উপাস্যের প্রতি সম্প্রদায়ের লোকেদের ভক্তি ও নিষ্ঠা অবিচলিত রাখা।

তন্ত্রে লিঙ্গ ও যোনি—এই-সব কাহিনীর কথা বাদ দিলেও খাঁটি শৈব ও শাক্ত তন্ত্রাদিতে দেখা যায় শিবকে লিঙ্গরূপী এবং দেবীকে যোনিরূপা বলা হয়েছে এবং তাঁদের সম্পর্কে যৌনসম্বন্ধসূচক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। কি তার অর্থ? এখানে কি লিঙ্গ শিশ্ন অর্থে এবং যোনি নারীর অঙ্গবিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয় নি?

এ সম্পর্কে আলোচনার গোড়াতেই স্মরণ রাখা আবশ্যক আমাদের দেশে প্রাক্-আধুনিক যুগে লিঙ্গ এবং যোনি শব্দ অশ্লীল বলে গণ্য হত না এবং সেকালের লোকেরা জীবোৎপত্তির ব্যাপারটাকেও অশ্লীল মনে করতেন না। এই-সব ব্যাপারকে তাঁরা সহজ স্বাভাবিক বলে মনে করতেন। সেইজন্য, ধর্মতত্ত্বের আলোচনাতেও তাঁরা অনায়াসে লিঙ্গ, যোনি প্রভৃতি শব্দ এবং যৌনসম্পর্কসূচক ভাষা ব্যবহার করতেন।

রূপক—আরেকটা কথা। বেদের সময় থেকেই দেখা যায় আমাদের দেশের মুনি ঋষিরা, তত্ত্ববিদেরা ধর্মবিষয়ক ব্যাপারে রূপক ব্যবহারের, 'সন্ধ্যা'-ভাষা ব্যবহারের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। 'পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ'[২] অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তিরা পরোক্ষভাষা ব্যবহার করতে ভালবাসেন।

---

১ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্।
—তোড়লতন্ত্রোক্ত ধ্যান, উদ্ধৃত, প্রা তো, ৫ম সং, পৃঃ ৩৩৪

২ গোপথ-ব্রাহ্মণ ১।১

তন্ত্রোক্ত লিঙ্গ ও যোনির ব্যাখ্যা—শাস্ত্রমতে লিঙ্গ ব্রহ্মস্বরূপ সাক্ষাৎ মহেশ্বর। যোনি ব্রহ্মাত্মিকা জগন্ময়ী মহামায়া।[১] নিরুত্তরতন্ত্রে বলা হয়েছে[২]—লিঙ্গরূপী মহাকাল, যোনিরূপা কালিকা। যে-সব যোগী সাধক স্বদেহে মহাকাল-মহাকালীর যোগসাধন করতে পারেন তাঁরা ধন্য, তাঁদের যোগ মহান্ এবং শ্রেষ্ঠ।

উপনিষদে মাতৃগর্ভ[৩] এবং উৎপত্তিস্থল[৪] অর্থে যোনি শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এ দিক্ দিয়ে দেখলেও ব্রহ্মময়ী জগদম্বা যোনি। কেন না, তাঁর গর্ভ থেকেই ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রসূত, চরাচর সকল লোকের তিনিই ত উৎপত্তিস্থল।[৫] এই অর্থে শিবও যোনি। মহাভারতে তাঁকে সেইজন্য বিশ্বের যোনি,[৬] জগদ্‌যোনি ও জগদ্‌বীজ[৭] বলা হয়েছে।

ঋগ্‌বেদেই পিতৃদেবতারূপে রুদ্রের দর্শন পাওয়া গেছে; অর্থাৎ পিতৃভাব বা পিতৃত্বের তিনিই দেবরূপ আর অদিতি প্রভৃতি দেবীর মধ্যে মহাশক্তি মহামায়া জগজ্জননীরও দর্শন পাওয়া গেছে। এই ভাবধারা সেই থেকে বরাবরই চলে এসেছে। মহেশ্বর ও মহামায়া জগতের পিতা ও মাতা। এই কথাটাই অন্যভাবে বলা হয় লিঙ্গ ও যোনি জগতের পিতা ও মাতা।

নিরুত্তরতন্ত্রে বলা হয়েছে[৮]—জগতের জনিকা মাতা যোনি, জনক পিতা লিঙ্গ। উভয়ের মধ্যেই মাতৃভাব ও পিতৃভাবের চিন্তা করতে হবে। এর অর্থ লিঙ্গে মাতৃভাব এবং যোনিতে পিতৃভাব আছে এই চিন্তা করতে হবে। পিতৃশক্তি ও মাতৃশক্তি যে মূলতঃ অভিন্ন এখানে সেই তত্ত্বটিই সূচিত হয়েছে।

তা ছাড়া, তন্ত্রমতে শিবশক্তির অবিনাভাবসম্বন্ধ। অর্থাৎ শিব ছাড়া শক্তি নাই আর শক্তি ছাড়া শিব নাই। সেইজন্য, নারদপঞ্চরাত্রে বলা হয়েছে[৯]—যেখানে লিঙ্গ সেখানেই যোনি, যেখানে যোনি সেখানেই শিব।

১ (ক) ওঁ যোনিরূপে মহামায়ে সর্বসম্পৎপ্রদে শুভে। কৃপয়া সর্বসিদ্ধিং মে দেহি দেবি জগন্ময়ি।
—প্রা তো, ব সং পৃঃ ৫৫৩

(খ) ব্রহ্মাত্মিকা মহাযোনিঃ সর্বান্ কামান্ প্রযচ্ছতু।—ঐ, পৃঃ ৫৫৪

২ লিঙ্গরূপো মহাকালো যোনিরূপা কালিকা। তয়োর্যোগপরা ধন্যা তয়োর্যোগঃ পরো মহান্।
—নিরু ত, পৃঃ ১৪

৩ কে উপ ২।২।৭ ৪ বৃহ উপ ১।৪।৩, শ্বে উপ ১।১৩, ৪।১১

৫ দেবী পরা ভগবতী জগদাধাররূপিণী। ব্রহ্মাদিভুবনানাঞ্চ যোনিরুৎপত্তিকারিণী।
সা যোনিঃ সর্বভূতানাং স্থিতিস্থিতিলয়াত্মিকা।—কৌ নি ৮।২৭-২৮

৬ মহা ভা ৭।২০০।৩১ ৭ ঐ ৭।২০১।১৩

৮ যোনিস্ত জনিকা মাতা লিঙ্গস্ত জনকঃ পিতা। মাতৃভাবং পিতৃভাবমুভয়োরপি চিন্তয়েৎ।
—নিরুত্তরতন্ত্রবচন, উদ্ধৃত, প্রা তো, ব সং, পৃঃ ৫৫১

৯ যত্র লিঙ্গস্তত্র যোনির্যত্র যোনিস্ততঃ শিবঃ।—নারদপঞ্চরাত্রবচন, উদ্ধৃত, ঐ, পৃঃ ৩৩১

কাজেই, দেখা যাচ্ছে লিঙ্গ এবং যোনি একটি গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্বের প্রতীক, লিঙ্গ শিবের অর্থাৎ পিতৃভাবের এবং যোনি মহাদেবীর অর্থাৎ মাতৃভাবের প্রতীক।

আবার বাস্তব ক্ষেত্রেও দেখা যায় শিশ্ন পিতৃত্বের লিঙ্গ এবং যোনি মাতৃত্বের লিঙ্গ। জ্ঞানের দৃষ্টিতে শুদ্ধ ভাবের দৃষ্টিতে শিশ্ন এবং যোনি অশ্লীল নয়, অপবিত্র নয়।

এইজন্য একটি ভাবধারায় লিঙ্গ এবং যোনি যথাক্রমে শিব ও শক্তির অঙ্গবিশেষরূপেই কল্পিত হয়েছে। ব্যষ্টির ক্ষেত্রে যা প্রত্যক্ষ তার সমষ্টিরূপই শিবশক্তির ক্ষেত্রে কল্পনা করা হয়েছে।

কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন এটি একটি স্বতন্ত্র ভাবধারা, শিবের লিঙ্গমূর্তির বেদপন্থী ভাবচিন্তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। সাধারণভাবে একে তান্ত্রিক ভাবধারা বলা যায়। এই ভাবধারায় শিবের লিঙ্গমূর্তিকে তাঁর বিশ্বপিতৃত্বের প্রতীক অঙ্গবিশেষ (লিঙ্গ) এবং শিবলিঙ্গের পীঠিকা বা গৌরীপট্টকে দেবীর বিশ্বমাতৃত্বের প্রতীক অঙ্গবিশেষ (যোনি) মনে করা হয়।

গৌরীপট্ট বা যোনি—বেদমার্গী অপর ভাবধারায় লিঙ্গমূর্তির ধারণা অন্য রকম এবং লিঙ্গপীঠিকাকে গৌরীপট্ট বা যোনি বলার হেতুও সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমরা দেখেছি ঋগ্‌বেদে যজ্ঞবেদীকে দক্ষতনা বলা হয়েছে এবং পরবর্তী কালে এই দক্ষতনা দক্ষতনয়া উমা তথা গৌরীর সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। বৈদিক যুগে এই যজ্ঞবেদীর উপর অগ্নি প্রজ্বলিত হত। ঋগ্‌বেদেই অগ্নি রুদ্রের সঙ্গে একীভূত হয়ে যাওয়ার নিদর্শন আছে।

ঋগ্‌বেদে যজ্ঞবেদীকে যোনিও[১] বলা হয়েছে। কাজেই, যজ্ঞবেদী গৌরী এবং যোনি এবং তার উপরে প্রজ্বলিত অগ্নি রুদ্রশিব।

শিবের লিঙ্গমূর্তিকে এর পর বৈদিক যজ্ঞের এই আনুষ্ঠানিক রূপের সঙ্গে সহজেই যুক্ত করা সম্ভবপর। রুদ্রশিব হলেন লিঙ্গ আর যজ্ঞবেদী তার পীঠিকা, তার নাম হল গৌরীপট্ট বা যোনি। এক্ষেত্রে প্রাচীন নামই বজায় রইল।

এ কথার পরোক্ষ সমর্থন পাওয়া যায় লিঙ্গপুরাণে। তাতে আছে[২] সুরাসুর যত্ন করে পীঠাকৃতি উমাদেবী ও লিঙ্গরূপ শঙ্করের প্রতিষ্ঠা করে পূজা করেন।

যজ্ঞবেদীই যে শিবলিঙ্গের পীঠিকা হয়েছে শিবের মানুষলিঙ্গ[৩] রচনায় তার নিদর্শন

১ ঋ বে ১।১০৪।১ ; তাতে সায়ণ বলেছেন যোনিঃ বেত্যাখ্যং স্থানম্।

২ পীঠাকৃতিরুমাদেবী লিঙ্গরূপশ্চ শঙ্করঃ। প্রতিষ্ঠাপ্য প্রযত্নেন পূজয়ন্তি সুরাসুরাঃ॥

লিঙ্গপুরাণ, উত্তরভাগ ১১।৩১

৩ বিবিধ প্রকারের শিবলিঙ্গ আছে। যথা বাণলিঙ্গ, ইন্দ্রলিঙ্গ, আগ্নেয়লিঙ্গ, যাম্যলিঙ্গ, নৈঋতলিঙ্গ, বারুণলিঙ্গ, বায়ুলিঙ্গ, কুবেরলিঙ্গ, রৌদ্রলিঙ্গ, ধাতালিঙ্গ, মুখলিঙ্গ, মানুষলিঙ্গ, আর্ষকলিঙ্গ, গাণপত্যলিঙ্গ, স্বায়ম্ভুবলিঙ্গ, দৈবিকলিঙ্গ প্রভৃতি। দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৫ পরিঃ ১ ; In Sivalinga A Phallus, Ch. V; D. H. I., p. 458

আছে। মানুষলিঙ্গের তিনভাগ—ব্রহ্মভাগ (সর্বনিম্ন), বিষ্ণুভাগ (মধ্য) এবং রুদ্রভাগ (সর্বোচ্চ)। ব্রহ্মভাগ চতুরস্র।[১] এটি চতুরস্র যজ্ঞবেদীরই স্মারক নিদর্শন।

অনুশাসনপর্বে শিবলিঙ্গের বিবরণ— আমরা মহাভারতবর্ণিত শিবলিঙ্গের বিষয় আলোচনা করছিলাম। শিবলিঙ্গের কিছুটা বিস্তৃত বিবরণ অনুশাসনপর্বেই[২] পাওয়া যায়। অবশ্য আধুনিক পণ্ডিতেরা অনেকেই এই অংশকে অর্বাচীন মনে করেন। অনুশাসন-পর্বে শিবভক্ত উপমন্যু ইন্দ্রের কাছে (ইন্দ্রের ছদ্মবেশে শিব) শিবমাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে শিবলিঙ্গ সম্বন্ধে যে-সব কথা বলেছেন তাতে পূর্বোক্ত তাত্ত্বিক ভাবেরই সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়। স্মরণ রাখা প্রয়োজন উপমন্যু শিববিষয়ক গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বর্ণনা করতে করতে কথাগুলি বলেছেন।

তিনি প্রথমেই বলেছেন—হে দেবেন্দ্র, সৃষ্টি ও সংহারের হেতু দেবদেব রুদ্র। তাঁর দ্বারা স্বাত্মাভিব্যক্ত এই ভগাঙ্কিত লিঙ্গ প্রত্যক্ষ কর।[৩]

এই শ্লোকের ঠিক আগের শ্লোক দুটিতেই শিবকে কারণ, জনক, সর্বকারণ বলা হয়েছে। সৃষ্টির মূল কারণ পিতৃশক্তি ও মাতৃশক্তির সমবায়। লিঙ্গ পিতৃশক্তির এবং যোনি মাতৃশক্তির প্রতীক। দেবদেবের ভগাঙ্কিত লিঙ্গ উভয় শক্তির সংযুক্ত রূপের প্রতীক। সৃষ্টির মূল কারণের এই অভিব্যক্তি উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবের অভিব্যঞ্জক বৈ কি।

উপমন্যু শিবলিঙ্গের কথা সমাপ্ত করেছেন এই বলে—সমস্ত পুরুষ ঈশান এবং সমস্ত স্ত্রীলোক উমা। শিবশক্তির পুরুষ এবং স্ত্রী এই দুই তনুদ্বারা এই জগৎ ব্যাপ্ত।[৪]

মানুষের জৈবসত্তাকে অতিক্রম করে রয়েছে তার অধ্যাত্মসত্তা। পুরুষমাত্রকেই শিব এবং নারীমাত্রকেই দেবী বলায় এই তত্ত্বটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এ ছাড়া, আরও গভীরে গেলে দেখা যাবে আলোচ্য শ্লোক দুটিতে সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে। ভগাঙ্কিত লিঙ্গ অর্থাৎ মায়োপহিত ব্রহ্ম দেবদেব রুদ্রশিব সৃষ্টিসংহারের হেতু। আর তাঁর শিব এবং শক্তি এই দুই তনুদ্বারা অর্থাৎ মায়োপহিত ব্রহ্মের দ্বারা চরাচর জগৎ ব্যাপ্ত।

শিবের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত—মহাভারতেই দেখা যায় সনাতন দেবমণ্ডলের অন্যতম প্রধান দেবতারূপে শিবের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। তখনই শিবোপাসকরা দলে বেশ

১ D. H. I., p. 458.

২ মহা ভা ১৩।১৪।২২৭-২৩৫

৩ প্রত্যক্ষমিহ দেবেন্দ্র পশ্য লিঙ্গং ভগাঙ্কিতম্। দেবদেবেন রুদ্রেণ সৃষ্টিসংহারহেতুনা।
মহা ভা ১৩।১৪।২২৭

৪ পুংলিঙ্গং সর্বমীশানং স্ত্রীলিঙ্গং বিদ্ধি চাপ্যুমাম্।
দ্বাভ্যাং তনুভ্যাং ব্যাপ্তং হি চরাচরমিদং জগৎ। —মহা ভা ১৩।১৪।২৩৫

ভাবী। তখন থেকে আরম্ভ করে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নানা পুরাণ এবং তন্ত্রে শিবমাহাত্ম্য প্রচারিত হয়েছে, শুধু শৈব ও শাক্ত পুরাণাদিতে নয়, শ্রীমদ্ভাগবত, বামনপুরাণ প্রভৃতি বৈষ্ণব পুরাণাদিতেও শিবমাহাত্ম্য ঘোষিত হয়েছে। আবার আগম ও তন্ত্রে শিবারাধনার একটি বিশেষ তত্ত্বের দিক প্রকাশিত হয়েছে।

শিবোপাসনার ঐতিহাসিক নজির—শিবোপাসনার ঐতিহাসিক নজির পাওয়া যাচ্ছে খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দী থেকে। চন্দ্রগুপ্তের সভায় গ্রীক রাজদূত ছিলেন মেগাস্থিনিস্। তিনি ডায়নিসাস্ (Dionysus) এবং হেরাক্লেস্ (Herakles) নামক দুজন দেবতার কথা লিখে গেছেন। মেগাস্থিনিস এঁদের যে-বিবরণ দিয়েছেন তা থেকে অনুমান করা হয় এই দেবতা দুজন বিষ্ণু (কৃষ্ণ) এবং শিব। কিন্তু দুজনের মধ্যে কে বিষ্ণু (কৃষ্ণ) এবং কে শিব তা তাঁর বিবরণ থেকে বোঝা যায় না।[১] তবে সাধারণতঃ ডায়নিসাস্‌কে শিব মনে করা হয়।[২]

অবশ্য, মহেঞ্জোদড়োর একটি সিলের উপর যোগাসনে উপবিষ্ট, হস্তিব্যাঘ্রগণ্ডারমহিষ-পরিবৃত, ত্রিমুখ যে-মূর্তিটিকে মার্শেল[৩] শিব-পশুপতির আদিরূপ বলে অনুমান করেছেন সেই মূর্তিটিকে শিবের মূর্তি ধরলে খৃষ্ট জন্মাবার কমপক্ষে তিন হাজার বছর আগে থেকে শিবপূজার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে বলা যায়।

কহ্লনের রাজতরঙ্গিণীতে আছে সম্রাট অশোক বৌদ্ধ হওয়ার আগে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় দেবতা ছিলেন শিব।[৪] অন্যভাবে বলা যায় অশোক ছিলেন শৈব।[৫]

মুদ্রায় শিবমূর্তি—খৃষ্টজন্মের দুয়েক শতাব্দী পূর্বের বলে স্বীকৃত মুদ্রায় শিবের সর্বাবয়ব মূর্তি[৬] ও লিঙ্গ উৎকীর্ণ আছে। লিঙ্গ-উৎকীর্ণ মুদ্রার কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

ঐ সময়কার ঔডুম্বর রাজা শিবদাস, রুদ্রদাস এবং ধরঘোষের তাম্রমুদ্রায় দেখা যায় একটি ঘেরাও-করা জায়গার পার্শ্বে ত্রিশূল ও কুঠার উৎকীর্ণ হয়েছে। এই ঘেরাও-করা জায়গাটিকে শিবদেউল মনে করা হয়।[৭] রাজাদের শিবদাস, রুদ্রদাস প্রভৃতি নামও লক্ষণীয়।

ভারতের বিদেশী শাসক শক, পহ্লব এবং কুশান রাজাদের কারো কারো মুদ্রায় শিবমূর্তি উৎকীর্ণ রয়েছে। শক-পহ্লবরাজ মোয়েসের (Maues) কয়েকটি চতুষ্কোণ তাম্রমুদ্রায় উৎকীর্ণ মূর্তিকে শিবমূর্তি মনে করা হয়।[৮]

১ H. B., Vol. II, pp. 187-188 ২ D. H. I., p. 89, f. n. 1
৩ M. I. C., Vol. I, pp. 52-55 ৪ A. H. I., pp. 104-106
৫ Smith. E. H. I., p. 176 ৬ D. H. I., pp. 117-118
৭ Ibid. ৮ Ibid, p. 120

তেমনি পহ্লবরাজ গণ্ডফারনেসের (Gondophernes: 1st Century B. C or A. D.) মুদ্রায় ত্রিশূলহস্ত যে-মূর্তি দেখা যায় তাকে শিবমূর্তি বলে সনাক্ত করা হয়। মনে হয় 'দেবব্রত' গণ্ডফারনেস্ শৈব ছিলেন।[১]

কুশানরাজ ওয়েম কডফিসেসের (Wema Kadphises) মুদ্রায় (১ম খৃষ্ট শতক) শিবমূর্তি উৎকীর্ণ রয়েছে। ইনি শৈবধর্ম গ্রহণ করেন।[২]

কুশানরাজ কনিষ্ক (২য় খৃষ্ট শতক), হুবিষ্ক (২য় খৃষ্ট শতক) এবং বাসুদেবের (২য়-৩য় খৃঃ শতক) মুদ্রায়ও শিবমূর্তি উৎকীর্ণ হয়েছে। বিভিন্ন মুদ্রায় আছে দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ প্রভৃতি বিভিন্ন মূর্তি। মূর্তিগুলির প্রহরণাদিরও প্রকারভেদ আছে।[৩] এর থেকে বোঝা যায় শিবের বিভিন্ন মূর্তির আরাধনা তখন প্রচলিত ছিল।

তক্ষশীলার কাছে সিরকাপে (Sirkap) একটি গোলাকার তামার সিল পাওয়া গেছে। এই সিলে ত্রিশূল- ও দণ্ড-ধারী শিবমূর্তি উৎকীর্ণ আছে। প্রথম খৃষ্ট শতক বা তার একটু আগেকার ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী হরফের পরিচয়লিপিতে আছে—'শিবরক্ষিতস'।[৪] এই শিবরক্ষিত শিবভক্ত ছিলেন অথবা যিনি তাঁর নাম রেখেছিলেন তিনি শিবভক্ত ছিলেন এ রকম অনুমান করা যায়। শিবারাধনা যে ঐ সময়ে জনপ্রিয় ছিল এই সিলটিকে তার অন্যতম নিদর্শন মনে করা হয়।

এই সম্পর্কে আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো। খৃষ্টজন্মের দুয়েক শতাব্দী পূর্বের বা তার দুয়েক শতাব্দী পরের যে-সব মুদ্রা পাওয়া গেছে তাতে শিবের মূর্তি বা প্রতীক অনেক আছে কিন্তু বাসুদেবমূর্তি খুবই কম।[৫] শিবের জনপ্রিয়তার এটিও একটি নিদর্শন বলা যায়।

এই-সব মুদ্রাদির প্রমাণের উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত করা হয় খৃষ্ট জন্মাবার দুয়েক শতাব্দী আগে এবং পরে শিব ছিলেন ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের প্রধান আরাধ্য।[৬]

প্রসঙ্গতঃ এখানে কুশানযুগের একটি অর্দ্ধনারীশ্বর-মণ্ডনমূর্তির[৭] উল্লেখ করা যায়। এই মূর্তিটির একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। কুশানযুগেই (১ম-৪র্থ খৃঃ শতক) যে তন্ত্রের একটি গভীর তত্ত্ব—শিবশক্তির অবিনাভাবসম্বন্ধ-তত্ত্বটি—দেশে প্রচারিত হয়েছিল মূর্তিটি তারই সুস্পষ্ট নিদর্শন।

সিলে শিবপূজার নিদর্শন—মুদ্রা ছাড়া কতকগুলি সিলেও প্রাচীন যুগে শিবপূজার নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। বসার এবং ভিটাতে অনেকগুলি সিল পাওয়া গেছে। এগুলি

১ D. H. I., p. 119 ২ A. H. I., p. 190 ৩ D. H. I., pp. 121-127

৪ Ibid, pp. 119-120 ৫ Ibid, p. 128 ৬ Ibid, p. 129 ৭ Ibid, p. 182

বেশীর ভাগই পূর্বগুপ্তযুগের এবং উত্তরগুপ্তযুগের। এ ছাড়া কাশীর কাছে রাজঘাটে অনেক গুলি পোড়ামাটির (terracotta) সিল পাওয়া গেছে।[১]

বসারে প্রাপ্ত দুটি সিলে শিবলিঙ্গ আছে। একটিতে লিখিত হয়েছে 'আম্রাতকেশ্বর'; অন্যটিতে 'নম পশুপতেঃ'।[২] মৎস্যপুরাণে আটটি গুহ্য লিঙ্গের উল্লেখ আছে। আম্রাতকেশ্বর তার অন্যতম।[৩]

বসারের একটি সিলে অর্দ্ধনারীশ্বরমূর্তি উৎকীর্ণ রয়েছে বলে অনুমান করা হয়।[৪]

ভিটাতে প্রাপ্ত অনেকগুলি সিলে আছে শিবের প্রতীক লিঙ্গ, ত্রিশূল-পরশু, নন্দীপাদ এবং বৃষভ। শিবের সর্বাবয়ব নরাকারমূর্তি কদাচিৎ দেখা যায়। এই সব সিলে শিবের কালেশ্বর, কালঞ্জর-ভট্টারক, ভদ্রেশ্বর, মহেশ্বর প্রভৃতি নাম উৎকীর্ণ হয়েছে।[৫]

ভিটাতে এমনি তিনটি সিল পাওয়া গেছে যাতে শিবের বৃষভমূর্তির পাশে একটি দেবীমূর্তি লক্ষ্য করা যায়। এটিকে দুর্গামূর্তি মনে করা হয়।[৬]

অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন—গুপ্তযুগের অনেক শিবলিঙ্গ আবিষ্কৃত হয়েছে।[৭] এই যুগে সাধারণতঃ একমুখ-লিঙ্গের প্রচলন অধিক লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তী কালে সমধিক প্রচলিত চতুর্মুখ-লিঙ্গের দর্শন কদাচিৎ মিলে।[৮] এই যুগের একটি চতুর্মুখ মুখলিঙ্গ আজমীড় মিউজিয়ামে আছে। লিঙ্গের গায়ে শিব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং সূর্যের মূর্তি উৎকীর্ণ রয়েছে।[৯]

গুপ্ত সম্রাটরা প্রধানতঃ বৈষ্ণব। তবে তাঁদের অমাত্যাদি অতি-উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা অনেকেই শৈব ছিলেন।[১০] গুপ্তযুগের শেষের দিককার একজনমাত্র গুপ্তনৃপতি বৈন্যগুপ্তকে গুণৈঘর (Gūnaighar) প্রত্নলিপিতে 'ভগবন্মহাদেবপাদানুধ্যাতো মহারাজ-শ্রীবৈন্যগুপ্তঃ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[১১]

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়কার মথুরা শিলালিপি (৩৮০ খৃঃ) থেকে জানা যায় পাশুপত আচার্য উদিতাচার্য একটি গুর্বায়তনে তাঁর গুরু কপিল এবং গুরুর গুরু উপমিতের নামে কপিলেশ্বর ও উপমিতেশ্বর নামক দুটি শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করেন।[১২]

এই সম্রাটের উদয়গিরি গুহালিপিতে আছে—পাটলিপুত্রনিবাসী বীরসেন নামে তাঁর একজন অমাত্য একটি গুহামন্দির নির্মাণ করিয়ে শিবকে উৎসর্গ করেন।[১৩]

প্রত্নলিপি থেকে জানা যায় প্রথম কুমারগুপ্তের সেনাপতি 'পৃথিবীষেণ' পৃথিবীশ্বর নামক একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করেন।[১৪]

১ D. H. I, p. 177 ২ Ibid, p. 179 ৩ Ibid ৪ Ibid pp. 181-182
৫ Ibid, pp. 182-185 ৬ Ibid, p. 184
৭ The Age of the Imperial Guptas, pp. 115, 124-125 ৮ Ibid ৯ Ibid, p. 124
১০ A. H. I., pp. 202, 205 ১১ S. I., p. 331
১২ E. I., Vol. XXI, pp. 8-9; S. I., pp. 269-270
১৩ S. I., pp. 271-272 ১৪ S. I., pp. 282-283

গুপ্তদের সমসাময়িক শালঙ্কায়ন,[১] বাকাটক (Vakataka)[২] প্রভৃতি কোনো কোনো রাজবংশ শৈব ছিল।

এই-সব তথ্য আলোচনা করলে পরিষ্কার বোঝা যায় দেশে শৈবধর্ম তখন বেশ প্রবল ছিল। গুপ্তযুগের প্রথম দিক্‌টাতেই উচ্চতম রাজপুরুষদের মধ্যেও শিবপূজা প্রচলিত হয়ে যায়।[৩] বলা যেতে পারে ষষ্ঠ ও সপ্তম খৃষ্ট শতকে শৈব ধর্ম বৈষ্ণব ধর্মের স্থলে উত্তরভারতের সার্বভৌম রাজকীয় ধর্ম হয়ে দাঁড়ায়।[৪] এই সময়কার কয়েকজন প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতি শৈব ছিলেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে মিহিরকুল বা মিহিরগুল, যশোধর্মা, শশাঙ্ক ও হর্ষবর্ধনের নাম করা যায়।[৫]

গ্রন্থ-নিদর্শন—প্রত্নতাত্ত্বিক দলিল ছাড়াও গুপ্তযুগ বা তার পরবর্তী যুগে রচিত বিভিন্ন লেখকের গ্রন্থে শৈবধর্ম, বিশেষ করে, পাশুপত মত ও তার আচার্যদের কথা পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বরাহমিহির (বৃহৎসংহিতা), বাণভট্ট (হর্ষচরিত), মহেন্দ্রবর্মা পল্লব (মত্তবিলাস প্রহসন) এবং হিউয়েন সাঙ[৬] প্রভৃতি লেখকের নাম করা যায়।

শিবভক্তি—মহাভারতে ভক্তির মাহাত্ম্য ঘোষিত হয়েছে। গুপ্তযুগ এবং তার পরবর্তী কালের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ধর্মের ক্ষেত্রে ভক্তির ক্রমবর্ধমান গৌরব ও গুরুত্ব।[৭] এই সময়কার পুরাণাদিতে সম্প্রদায়-আরাধ্য দেবতার প্রতি ভক্তি বিশেষভাবে প্রচারিত হয়। শিবভক্তি-প্রচারে দক্ষিণ ভারতে অগ্রণি ছিলেন শিবভক্ত নায়নাররা। এঁদের অনেকে পল্লবদের রাজত্বকালে[৮] (৫ম থেকে ৮ম খৃঃ শতক) আবির্ভূত হন। কিন্তু মনে হয় আসমুদ্রহিমাচল সমগ্র ভারতবর্ষে শিবভক্তিকে জনপ্রিয় করে তুললেন আচার্য শঙ্কর। অষ্টম খৃষ্ট শতক[৯] শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব কাল ধরা হয়। অবশ্য, অদ্বৈতবেদান্তী এই সন্ন্যাসী স্বয়ং কোনো শৈবসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন কি না নিশ্চয় করে বলা যায় না। তবে তাঁর শিষ্যপ্রশিষ্যেরা তাকে শিবাবতার মনে করেন। শঙ্কর-প্রবর্তিত দশনামী সন্ন্যাসীদের উপর শিবের প্রভাব খুব বেশী। এঁরা বিভূতি প্রভৃতি শৈবচিহ্ন ধারণ করেন। এঁদের কাছে শিব ব্রহ্ম।[১০]

শৈবতীর্থ—অষ্টম খৃঃ শতক থেকে শিবারাধনার ঐতিহাসিক এবং অন্তরকম নিদর্শন অনেক পাওয়া যায়। শিবারাধনা যে সারা ভারতবর্ষে কিরূপ ব্যাপক হয়েছিল তার সাক্ষ্য দিচ্ছে শৈবতীর্থগুলি। মহাভারতের সময়েই শৈবতীর্থ বিখ্যাত হয়ে পড়েছে। এই উপ-মহাদেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত শৈবতীর্থ ছড়িয়ে আছে। উত্তর প্রান্তে

১ D. C. Sarkar : Successors of the Satavahanas in Lower Deccan, pp. 83-84

২ C. C. I., p. 248 ৩ A. H. I., p. 202 ৪ Ibid p. 203 ৫ Ibid p. 203.

৬ Ibid. ৭ Ibid, p. 199 ৮ Ibid, p. 175 ৯ Ibid, p. 203

১০ ভা উ স, ২য় ভাগ, পৃঃ ২৯-৩০

শৈবতীর্থ কেদারনাথ, দক্ষিণ প্রান্তে সেতুবন্ধ রামেশ্বর, পূর্ব প্রান্তে চন্দ্রনাথ এবং পশ্চিম প্রান্তে সোমনাথ শিবারাধনার ব্যাপকতার পরিচয় দিচ্ছে।

বৃহত্তর ভারতে শিবারাধনা—এই প্রসঙ্গে বলা যায় পঞ্চম খৃঃ শতাব্দী থেকে শিবারাধনা ভারতের ভৌগলিক সীমার বাইরে বৃহত্তর ভারতেও ছড়িয়ে পড়ে। তার ঐতিহাসিক নিদর্শন আছে।

চম্পার প্রাচীন হিন্দু রাজারা শৈব ছিলেন।[১] রাজা ভদ্রবর্মার খৃঃ পঞ্চম শতকের প্রত্নলিপিতে শিবপার্বতীর বন্দনা আছে।[২] সেই থেকে আরম্ভ করে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত চম্পা এবং কম্বুজের নানা প্রত্নলিপিতে শিবারাধনার প্রমাণ পাওয়া যায়।[৩]

সুবর্ণদ্বীপেও সনাতনধর্মীয় দেবতাদের মধ্যে প্রাধান্য ছিল শিবের।[৪] এখানে শিবারাধনার নির্দেশক কোনো প্রত্নলিপি পাওয়া যায় নি বটে তবে শিবলিঙ্গ, শিবমূর্তি এবং শিবমন্দির সে-অভাব পূরণ করেছে।

ভারতের বাইরে অন্যত্র—আমরা লক্ষ্য করে এসেছি কুষাণ নৃপতিরা শিবের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তাঁদের সাম্রাজ্য মধ্য-এশিয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ছিল। মনে হয় কুষাণদের সময়ে ঐ অঞ্চলের লোকেরা শিবের এবং শিব-পরিবারের দেবতাদের সঙ্গে পরিচিত হন। কেন না, কুষাণ সম্রাট্‌দের পরবর্তী কালে মধ্য এশিয়ায় পঞ্চমুখ বৃষবাহন শিবের, হরপার্বতীর ও শ্মশ্রুমান্‌ ইন্দ্রের চিত্র পাওয়া গিয়েছে।[৫]

আরও দূরে চীনেও বৃষভবাহন শিব, ময়ূরবাহন ষড়ানন স্কন্দ এবং গণেশের মূর্তি পর্বতগাত্রে ক্ষোদিত আছে।[৬]

শৈব সম্প্রদায়—প্রাচীন কালেই শিব যেমন দেশে বিদেশে পূজিত হয়েছেন তেমনি তাঁর উপাসকদের নিয়ে সম্প্রদায়ও গড়ে উঠেছে। পাণিনির একটি সূত্র আছে 'শিবাদিভ্যোঽণ্‌'।[৭] অনুমান করা হয় এই সূত্র অনুসারে গঠিত শৈবশব্দে শিবোপাসকদের কথাই বলা হয়েছে।[৮]

তবে পাণিনির যে-সূত্রটিতে শৈব সম্প্রদায়ের সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে তা হল 'অয়ঃশূলদণ্ডাজিনাভ্যাং ঠক্‌ঠঞৌ'।[৯] পতঞ্জলি এই সূত্রের ভাষ্যে শিবভাগবতদের কথা বলেছেন; এঁরাই

১ A Historical Sketch of Śaivism, Ś. R. C. M., Vol. II, p. 28

২ A. I. C. F. E., Vol. I, Book III, p. 5

৩ দ্রঃ I. K. ; A. I. C. F. E., Vol. I

৪ দ্রঃ A. I. C. F. E., Vol. II, Parts I and II. p. 101   ৫ ভা গ সা, পৃ, ১৩৬

৬ ঐ   ৭ পাণিনি ৪।১।১১২   ৮ D. H. I., P. 449   ৯ পাণিনি ৫।২।৭৬

ছিলেন আয়ঃশূলিক অর্থাৎ লৌহশূলধারী। পতঞ্জলি অবশ্য তাঁদের দণ্ডাজিনাভ্যাম্ কথার ব্যাখ্যা করেন নি। কিন্তু মনে হয় দণ্ড ও অজিন ঐ শিবভাগবতদেরই লাঞ্ছন।[১]

পাশুপত—মহাভারতে পাশুপত মতের[২] উল্লেখ আছে। মনে হয় এই পাশুপত-মতাবলম্বীরাই প্রাচীনতম শিবোপাসক সম্প্রদায়। পতঞ্জলি যাদের শিবভাগবত বলেছেন অনুমান করা যায় তাঁদের সঙ্গে এই পাশুপতদের একটা যোগাযোগ ছিল।[৩]

লকুলীশ— আরেকটি প্রাচীন শৈব সম্প্রদায় লকুলীশ বা নকুলীশ সম্প্রদায়। এটি পাশুপত সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত। মাধবাচার্য তাঁর সর্বদর্শনসংগ্রহে পাশুপত মতকে বলেছেন নকুলীশ-পাশুপত মত। কাজেই দেখা যাচ্ছে তিনি নকুলীশ মতকে পাশুপত মত থেকে পৃথক করেন নি। লকুলী বা লকুলীশ বা নকুলীশ পাশুপত মতের আদি আচার্য। তবে কেউ কেউ লকুলীশকে পাশুপত মতের প্রতিষ্ঠাতা বলতে চান না। অবশ্য তারাও স্বীকার করেন এই মতকে তিনিই প্রথম সংগঠিত রূপ দেন।[৪] পঞ্চাধ্যায়ী বা পঞ্চার্থবিদ্যা নামে গ্রন্থ লকুলীশের রচনা মনে করা হয়। বায়বীয়সংহিতায়[৫] এই গ্রন্থের উল্লেখ আছে। মাধবাচার্য তাঁর সর্বদর্শনসংগ্রহে নকুলীশ-পাশুপত অধ্যায়ে পঞ্চার্থভাষ্যদীপিকার উল্লেখ করেছেন।[৬]

পুরাণে লকুলীশ শিবের অবতার বলে বর্ণিত হয়েছেন। বায়ুপুরাণে[৭] শিবের অষ্টাবিংশ অবতারের বিবরণ আছে। অষ্টাবিংশতম অবতারে শিব লকুলীশরূপে কায়াবরোহণে আবির্ভূত হন। লকুলীশের চার শিষ্য কুশিক, গর্গ, মিত্র এবং কৌরুষ্য।

লিঙ্গপুরাণেও[৮] শিবের লকুলী নামে অবতীর্ণ হবার কথা আছে এবং তার কুশিকাদি এই চার শিষ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে এঁরা যোগাত্মা, মহাত্মা, বেদপারগ ব্রাহ্মণ, ঊর্ধ্বরেতা এবং পাশুপতসিদ্ধ। এঁদের দেহ ভস্মাচ্ছাদিত। অন্তে এঁরা রুদ্রলোকে যান। সেখান থেকে পুনরাবৃত্তি দুর্লভ।

দশম থেকে ত্রয়োদশ খৃঃ শতকের মধ্যেকার একাধিক প্রস্তরলিপিতে লকুলীর উল্লেখ আছে। উদয়পুরের নাথজীর মন্দিরগাত্রের একটি শিলালিপিতে (৯৭১ খৃঃ) এবং চিত্রা প্রশস্তি নামে খ্যাত শিলালিপিতে (খৃঃ ১২৭৪-১২৯৬) শিবের কায়াবরোহণে লকুলীরূপে

১ D. H. I., p. 449

২ সাংখ্যং যোগঃ পাঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাশুপতং তথা।
জ্ঞানান্যেতানি রাজর্ষে বিদ্ধি নানামতানি বৈ।—মহা ভা ১২।৩৪৯।৬৪

৩ D. H. I., p., 450 ৪ Ibid, pp. 450-51

৫ শি পু, বায় সং, উ ভা, ২৪।১৬৯ ৬ স দ স ৬।৭৫ ৭ বায়ুপুরাণ, অধ্যায় ২৩

৮ লিঙ্গপুরাণ, পূর্বভাগ, ২৪।১২৯-১৩৩

অবতীর্ণ হওয়ার কথা আছে।[১] নাথজীর মন্দিরলিপিতে কুশিকাদি মুনিকে জটাধারী বল্কলপরিহিত পাশুপত যোগী বলা হয়েছে।[২]

ঐতিহাসিক ব্যক্তি—প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ ও গ্রন্থাদির প্রমাণের উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত করা হয় লকুলীশ এবং তাঁর কুশিকাদি শিষ্য ঐতিহাসিক ব্যক্তি। লকুলীশ খৃঃ দ্বিতীয় শতকে আধুনিক কাথিওয়াড়ের কারওয়ান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।[৩] পরে কালে কালে তিনি শিবাবতাররূপে পূজিত হন।

এখানে উল্লেখ করা যায় প্রাচীনকালে শিবোপাসকদের সাধারণ নাম ছিল মাহেশ্বর এবং একাধিক শৈব সম্প্রদায়কে পাশুপত বলা হত।[৪]

পাশুপত বেদবিরোধী ও বেদানুসারী—লক্ষ্য করা গেছে মহাভারতে পাশুপত মতকে বর্ণাশ্রমবিরোধী বলা হয়েছে। আচার্য রামানুজও পশুপতিমতানুসারী কাপাল বা কাপালিক, কালামুখ, পাশুপত এবং শৈব এই চারটি শৈব সম্প্রদায় সম্বন্ধে বলেছেন যে এরা সবাই বেদবিরুদ্ধ তত্ত্বপ্রণালী এবং ঐহিক ও পারলৌকিক মোক্ষসাধন কল্পনা করে।[৫]

কিন্তু পাশুপতদের পাশুপতসূত্র নামক প্রামাণ্য গ্রন্থে অন্যরকম মত প্রকাশ করা হয়েছে। এই গ্রন্থখানা ১ম-২য় খৃঃ শতকের রচনা বলে অনুমান করা হয়।[৬] পাশুপতসূত্রের একটি সূত্র এই—স্ত্রীলোক এবং শূদ্রদের সঙ্গে কথা বলবে না।[৭] আরেকটি সূত্রে আছে—রুদ্রসামীপ্য লাভ করলে কোনো ব্রাহ্মণ সংসারে পুনরাবৃত্ত হন না।[৮] এই সব সূত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায় পাশুপতসূত্রানুসারী পাশুপতরা বর্ণাশ্রম মেনে চলতেন।[৯]

পাশুপতসূত্রধৃত পাশুপত মত যে বেদানুসারী তার সুনিশ্চিত প্রমাণ এই যে এই মতের ভিত্তি তৈত্তিরীয় আরণ্যকের[১০] পাঁচটি মন্ত্র।[১১] মন্ত্রগুলি কোথাও অবিকল কোথাও একটু পরিবর্তিত আকারে পাশুপতসূত্রে সূত্ররূপে বর্ণিত হয়েছে।

---

১ V. Ś. M. R. S., p. 116. ২ Ibid. ৩ D. H. I., p. 450 ৪ V. Ś. M. R. S., p. 119

৫ সর্বে চৈতে বেদবিরুদ্ধাং তত্ত্বপ্রক্রিয়াং ঐহিকামুষ্মিকনিঃশ্রেয়স-সাধনকল্পনাঞ্চ কল্পয়ন্তি।— 'পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ' এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে। ৬ P. S., Intro., p. 15

৭ স্ত্রীশূদ্রং নাভিভাষেৎ।—পা সূ, ১।১৩ ৮ ন কশ্চিদ্ ব্রাহ্মণঃ পুনরাবর্ততে।—ঐ, ৫।২০

৯ P. S., Intro., p. 7 ১০ তৈ আ, ১০।৪৩-৪৭; নারায়ণীয়োপনিষদ্, ১৭-২১

১১ (ক) সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমো নমঃ। ভবে ভবে নাতিভবে ভজস্ব মাং ভবোদ্ভবায় নমঃ। (পা সূ ১।৪০-৪৪)

(খ) বামদেবায় নমো জ্যেষ্ঠায় নমঃ শ্রেষ্ঠায় নমো রুদ্রায় নমঃ কালায় নমঃ। কলবিকরণায় নমো বলবিকরণায় নমো বলায় নমো বলপ্রমথনায় নমঃ সর্বভূতদমনায় নমো মনোন্মনায় নমঃ। (পা সূ ২।২২-২৭)

(গ) অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যো ঘোরঘোরতরেভ্যঃ। সর্বেভ্যঃ সর্বশর্বেভ্যো নমস্তে অস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ। (পা সূ ৩।২১-২৬)

(ঘ) তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি। তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ। (পা সূ ৪।২২-২৩)

(ঙ) ঈশানঃ সর্ববিদ্যানামীশ্বরঃ সর্বভূতানাং ব্রহ্মাধিপতি ব্রহ্মণোঽধিপতির্ব্রহ্মা শিবো মে অস্তু সদাশিবোম্। (পা সূ ৫।৪২-৪৭)

বেদানুসারী পাশুপত মতের আরও নিদর্শন আছে। লিঙ্গপুরাণে দেখা গেল পাশুপত লকুলীর শিষ্যদের বলা হয়েছে বেদপারগ ব্রাহ্মণ (ব্রাহ্মণাঃ বেদপারগাঃ)।

বৃহৎসংহিতাতে[১] আছে সভস্ম দ্বিজরা শম্ভুর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করবেন। ভাষ্যকার উৎপল বলেছেন সভস্ম দ্বিজ অর্থ ভস্মসহিত ব্রাহ্মণ অর্থাৎ পাশুপত।[২]

কূর্মপুরাণেও[৩] বেদমার্গী পাশুপতদের কথা আছে। এঁরা স্মার্ত শৈব। এই পাশুপতরা শতরুদ্রিয় এবং অন্যান্য বেদসম্ভূত শাম্ভব স্তোত্রের দ্বারা শিবের স্তব করতেন।[৪]

অন্যান্য সম্প্রদায়—শারীরক ভাষ্যের টীকাকার আনন্দগিরি, বাচস্পতিমিশ্র ও গোবিন্দানন্দ 'পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ'[৫] এই সূত্রের ভাষ্যের টীকায় চারটি মহেশ্বরোপাসক সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন। যথা—শৈব, পাশুপত, কারুণিকসিদ্ধান্তী এবং কাপালিক।

আনন্দগিরি শঙ্করবিজয়ে শৈব, রৌদ্র, উগ্র, ভট্ট, জঙ্গম এবং পাশুপত এই ছটি শিবোপাসক সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন। এঁদের বেশভূষা লিঙ্গলাঞ্ছন আচার-অনুষ্ঠান দেখে এঁদের পরস্পরের পার্থক্য বোঝা যেত।[৬]

লক্ষ্য করা গেছে আচার্য রামানুজের মতেও পশুপতিমতানুসারী সম্প্রদায় চারটি। যথা—কাপাল বা কাপালিক, কালামুখ, পাশুপত এবং শৈব।[৭] কেশব কাশ্মীরীও এই চার সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন।[৮]

হরিভদ্র সূরির (৮ম খৃঃ শতক) ষড়্দর্শনসমুচ্চয়ের টীকা বৃহতীতে গুণরত্নসূরি (পঞ্চদশ খৃঃ শতক) লিখেছেন ক্রিয়াকর্ম ও আচারভেদে শিবোপাসক সম্প্রদায় চারটি—শৈব, পাশুপত, মহাব্রতধর এবং কালামুখ।[৯] কেউ কেউ মনে করেন মহাব্রতধর আর কাপালিক একই সম্প্রদায়।[১০]

কাপালিক—যে-সব সম্প্রদায়ের নাম করা হল তার মধ্যে কাপালিক নামটি বাঙালী শিক্ষিত সাধারণের বিশেষ পরিচিত। এটি সম্ভবপর হয়েছে প্রধানতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার কল্যাণে। কপালকুণ্ডলার কাপালিক শক্তি-উপাসক। কিন্তু দুঃখের বিষয় কি শিবোপাসক কি শক্তি-উপাসক কোনো কাপালিক সম্বন্ধেই বিস্তৃত কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। পূর্বোক্ত ভাষ্যাদি ভিন্ন পঞ্চতন্ত্র, মত্তবিলাস প্রহসন এবং মালতীমাধবে

---

১ বৃহৎসংহিতা ৫৯।১৯ ২ দ্বিজান্ ব্রাহ্মণান্ সভস্মান্ ভস্মসহিতান্ পাশুপতানিত্যর্থঃ।

৩ কূর্মপুরাণ ১।১৪।৩৮-৪৯, ১।২৫।৮-১১ ৪ ঐ ১।১৪।৩০

৫ ব্র সূ ২।২।৩৭ ৬ H. I. Ph., Vol. V, pp. 14-15

৭ 'পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ' এই সূত্রের ভাষ্য। ৮ V. Ś. M. R. S., p. 121

৯ Bhāskarī, Vol. III, Intro., p. XIII. ১০ V. Ś. M. R. S., p. 128

কাপালিকের কথা কিছু কিছু পাওয়া যায়।[১] এ ছাড়া স্কন্দপুরাণে কাপালিকবেশী শিবের যে-বর্ণনা পাওয়া যায় তার থেকে কাপালিকের বেশভূষার পরিচয় মিলে। উক্ত পুরাণে দেখা যায় কাপালিকবেশী শিব জীর্ণকন্থাবৃত, মুণ্ড, খট্বাঙ্গধারী। তাঁর অঙ্গে চিতাভস্ম। তিনি বিকৃত ও বিকৃতানন। তাঁর হাতে কপাল। কপাল তাঁর ভূষণ।[২]

কাপালেশ্বর শিব—৬৩৯ খৃষ্টাব্দের একটি চালুক্য প্রস্তরলিপিতে কাপালেশ্বর শিবের উল্লেখ আছে।[৩] এ ছাড়া মহাসামন্ত মহারাজ সমুদ্রসেনের তাম্রফলকলিপিতে (সপ্তম খৃঃ শতক) কপালেশ্বর শিবের উল্লেখ আছে।[৪] অনুমান হয় ইনি কাপালিকদের পূজিত। হয়ত এঁরই নাম অনুসারে এঁর উপাসকদের নাম হয়েছে কাপাল বা কাপালিক। অথবা উপাসকদের নাম অনুসারে দেবতার নামও হতে পারে।

মত্তবিলাস প্রহসন—মত্তবিলাস প্রহসন পল্লবরাজ প্রথম মহেন্দ্রবর্মা আনুমানিক ৬০০ থেকে ৬৩৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচনা করেন। এই গ্রন্থে এক কাপালিকের নারীসহ মত্ততা, ভণ্ড শাক্য ভিক্ষুর সঙ্গে ঝগড়া ইত্যাদির বিবরণ আছে। এই গ্রন্থ থেকে জানা যায় ব্রাহ্মণের পক্ষে যেমন উপবীত কাপালিকের পক্ষে তেমনি কপাল অপরিহার্য। কপাল হারিয়ে গেলে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাপালিককে অন্য কপাল অবশ্যই সংগ্রহ করতে হত। কাপালিক গায়ে ভস্ম মাখতেন, নিজেকে ভয়ংকরদর্শন করে তুলতেন, নরকপালে মদ্যপান করতেন। কাপালিকের বিশ্বাস কারণ যেমন কার্যও তেমনি হবে। কাজেই তাঁর মতে ইহলোকে কৃচ্ছ্রসাধন করলে পরলোকে আনন্দ পাওয়া যাবে না; কেন না উভয়ের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ নাই, উভয় পরস্পরবিরোধী। কপাল ছাড়া কাপালিকের হাতে থাকত শিঙা। পূজার সময় এটি বাজান হত, অন্য সময় এটিতে করে কাপালিক জল খেতেন। নারী কাপালিকের সঙ্গে পুরুষ কাপালিকের অবাধ মেলামেশা ছিল।[৫]

এই বিবরণ থেকে মনে হয় কপাল ধারণ করার জন্য এই সম্প্রদায়ের লোকেদের কাপালিক বলা হত।

মালতীমাধব—মালতীমাধবে দেখা যায় কাপালিক যোগী অঘোরঘণ্ট করালচামুণ্ডার উপাসক। তাঁর শিষ্যার নাম কপালকুণ্ডলা। সে কপালমালিনী। যাঁর গুরু অঘোরঘণ্ট রাজকন্যা মালতীকে করালচামুণ্ডার কাছে বলি দেবেন এই উদ্দেশ্যে সে একদিন গভীর

---

১ ŚK. P., p. 10, n. I.

২ জীর্ণকন্থাবৃত দেবি মুণ্ডঃ খট্বাঙ্গধারকঃ। চিতাভস্মবিলিপ্তাঙ্গো বিকৃতো বিকৃতাননঃ।
কপালঞ্চ করে কৃত্বা কপালকৃতভূষণঃ।—স্কন্দপুরাণান্তর্গত অবন্তাখণ্ড ৮।৩

৩ ŚK. P., p. 10. n. 1 ৪ C. C. I., Vol. III, p. 286-291

৫ History of the Pallavas of Kanchi, pp. 94-95.

রাত্রে রাজপ্রাসাদ থেকে নিদ্রিতা রাজকন্যাকে অন্যের অজ্ঞাতসারে করালচামুণ্ডার মন্দিরে নিয়ে আসে। বলি অবশ্য শেষ পর্যন্ত দেওয়া হয় নি।

এই বিবরণ থেকে ভবভূতির সময়ে (খৃঃ অষ্টম শতক) শক্তিপূজক কাপালিকের অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে।

শঙ্করবিজয়—শঙ্করবিজয়ে কাপালিকদের যে-বিবরণ পাওয়া যায় তা মোটামুটি এই—আচার্য শঙ্করের সঙ্গে কাপালিকদের দেখা হয় উজ্জয়িনীতে। আচার্য তাঁদের জিজ্ঞাসা করেন তোমাদের আচার এবং কুলাগত বিধি কি বল দেখি। যতিশ্রেষ্ঠ এই প্রশ্ন করলে স্ফটিক, অর্ধচন্দ্র এবং জটা দ্বারা পরিশোভিত কাপালিকেরা উত্তর দেন—প্রভু, আমাদের আচার সকল মানুষের সন্তোষকর। কর্মের দ্বারা মুক্তি হয় না এই বাক্য অনুসারে আমাদের আচার কর্মহীন। আমাদের উপাস্য ভৈরব এক অর্থাৎ অদ্বিতীয়; তিনি জগৎকর্তা। তাঁর থেকেই প্রলয় হয়। তিনি সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের কর্তা।[১]

এই কাপালিকদের মতে সমস্ত দেবতা ভৈরবের অংশ। দেবতারা ভৈরবের আজ্ঞা শিরোধার্য করে তাঁরই আজ্ঞাবলে আপন আপন অধিকারের কার্য করেন।[২]

শঙ্করবিজয়ে যে-কাপালিকদের বিবরণ দেওয়া হয়েছে তাঁরা ছিলেন অবেদপন্থী। তাঁরা মদিরাসেবন ও মত্তপান করতেন এবং এই-সব দ্রব্যসেবনজনিত বোধের পরবশ ছিলেন অর্থাৎ তাঁরা মনে করতেন এই-সব দ্রব্য সেবনে জ্ঞানের উদ্ভব হয়। এই কাপালিকেরা নরকপালে সুরাপান করতেন।

তাঁদের বলা হয়েছে 'সদাযোদ্ভূতপরামৃতপানপরাঃ' অর্থাৎ তাঁরা শিবশক্তির মিলনোদ্ভূত পরম অমৃত পান করতেন। এর থেকে বোঝা যায় এই কাপালিকদের মধ্যে গূঢ় যোগ-সাধনা প্রচলিত ছিল।

তাঁরা মন্ত্রবলে আপনাদের আরাধ্য সংহারভৈরবকে আবির্ভূত করতে পারতেন। শঙ্করবিজয়ে বলা হয়েছে আচার্য শঙ্করও তাঁর শিষ্যদের সংহার করার জন্য কাপালিক গুরু মন্ত্রবলে খড়্গ-কপাল-খট্বা-শূল-ধারী, দিগম্বর, জটাকিরীটধর, সংহারভৈরবের আবির্ভাব

১ আচারঃ প্রোচ্যতাং যুষ্মৎকুলাগতবিধিশ্চ কঃ। ইতি পৃষ্টা যতীশভর্তুঃ কাপালিকাঃ পরে। স্ফাটিকৈরর্ধচন্দ্রৈশ্চ জটাভিঃ পরিশোভিতাঃ। অস্মিন্নাচারঃ সর্বপ্রাণিসন্তোষকরঃ কর্মহীনঃ কর্মণা ন মুক্তিরিতি বচনাৎ। অস্মদুপাস্যো ভৈরব এক এব জগৎকর্তা। ততঃ প্রলয়ো ভবতীতি যো বা প্রলয়কর্তা স এব স্থিত্যুৎপত্ত্যোরপীতি।—শঙ্করবিজয়, ত্রয়োবিংশ প্রকরণ।

২ তদংশা এব সর্বে দেবাঃ তত্তদধিকারসম্পন্নাঃ শ্রীমদ্ভৈরবাজ্ঞাং শিরসা ধৃত্বা তদ্ভক্তিপ্রত্যাসন্নাস্তত্তৎকার্যপরাঃ বভূবুঃ।—ঐ।

ঘটান। কিন্তু ভৈরব প্রণত আচার্যের কথা শুনে প্রসন্ন হন এবং স্বীয় বেদবিরুদ্ধ-আচারপরায়ণ শিষ্যদের ব্রাহ্মণ্য-আচারপরায়ণ করার ভার আচার্যের উপর ন্যস্ত করে অন্তর্ধান করেন।[১]

শ্রীভাষ্য— রামানুজাচার্য ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্যে (২।২।৩৫) কাপালিকদের উক্তি বলে শৈবাগম-বচন[২] উদ্ধৃত করেছেন। বচনটির আক্ষরিক অনুবাদ এই—ষট্‌মুদ্রিকাতত্ত্বজ্ঞ পরমুদ্রাবিশারদ ভগাসনস্থ-আত্মধ্যানকারী ব্যক্তি নির্বাণ লাভ করেন। কণ্ঠিকা (মালা-বিশেষ), রুচক (হারবিশেষ), কুণ্ডল, শিখামণি, ভস্ম এবং যজ্ঞোপবীত ষট্‌মুদ্রিকা। এই সব মুদ্রিকা দ্বারা মুদ্রিতদেহ ব্যক্তির আর পুনর্জন্ম হয় না।[৩]

উদ্ধৃত বচন থেকে বোঝা যাচ্ছে কাপালিকরা বাহ্য ষট্‌মুদ্রিকা ধারণ করতেন কিন্তু তাঁদের সাধনার বিষয়ে স্পষ্ট কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। যেটুকু ইঙ্গিত আছে তার থেকে অনুমান হয় তাঁদের সাধনা ছিল গুহ্য যোগসাধনা।

আচার্য রামানুজ পশুপতিমতানুসারীদের সম্বন্ধে আরেকটি শৈবাগমবচন উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে[৪]—মানুষ দীক্ষাগ্রহণমাত্র তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণ হয়ে যায় আর কাপালব্রত ধারণ করার পর যতি হয়।

অনুমান করা যায় কাপালব্রত-ধারণ কাপালিকদের সাধনার অন্তর্ভুক্ত।

গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহ— গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে শঙ্করাচার্যের সঙ্গে কাপালিকের সংঘর্ষের কাহিনী দেওয়া হয়েছে। একদা শঙ্করাচার্য চার জন শিষ্যসহ এক নদীতীরে অবস্থান করছিলেন। তখন উগ্রভৈরব নামক এক কাপালিকের রূপ ধরে স্বয়ং ভৈরব শঙ্করাচার্যের কাছে গিয়ে বললেন—ওহে, তুমি ত সন্ন্যাসী, শত্রুমিত্র তোমার কাছে তুল্য, তুমি সুখদুঃখের দ্বন্দ্বরহিত। আমার অভিপ্রায় তোমার মাথাটি কেটে নিয়ে ভৈরবের কাছে নিবেদন করব; তা হলে আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হবে। অতএব, তোমার মাথাটা দাও।

শঙ্করাচার্য ভারী মুস্কিলে পড়ে গেলেন। ভাবলেন যদি কাপালিকের কথায় রাজি না হই তা হলে শত্রুমিত্রভেদ করা হবে এবং তা হলে অদ্বৈতহানি হবে আর আমার পরাজয় হবে আর যদি রাজি হই তা হলেও কাপালিকের কাছে আমার পরাজয় হয়। রাজি হব কি হব

১ দ্রঃ শঙ্করবিজয়, ত্রয়োবিংশ প্রকরণ।

২ মুদ্রিকাষট্‌কতত্ত্বজ্ঞঃ পরমুদ্রাবিশারদঃ। ভগাসনস্থমাত্মানং ধ্যাত্বা নির্বাণমৃচ্ছতি।
কণ্ঠিকা রুচকং চৈব কুণ্ডলং চ শিখামণিঃ। ভস্ম যজ্ঞোপবীতঞ্চ মুদ্রাষট্‌কং প্রচক্ষতে।
আভির্মুদ্রিতদেহস্তু ন ভূয় ইহ জায়তে।

৩ বচনের আক্ষরিক অনুবাদ দেওয়া হল। তবে আমাদের মনে হয় এর সম্প্রদায়বেত্ত গূঢ় অর্থ আছে।

৪ দীক্ষাপ্রবেশমাত্রেণ ব্রাহ্মণো ভবতি ক্ষণাৎ। কাপালং ব্রতমাস্থায় যতির্ভবতি মানবঃ।

না এই বিচার করলেও আমার পরাজয় হয়। এই সব ভেবে শঙ্করাচার্য চুপ করে রইলেন। কিন্তু তাঁর শিষ্য পদ্মপাদাচার্য নৃসিংহকে স্মরণ করলেন। স্মরণমাত্র নৃসিংহ এসে উগ্রভৈরবকে বেদম প্রহার করলেন। মহাসিদ্ধ উগ্রভৈরব তখন সেই শরীর ত্যাগ করে সবার চোখের উপর অন্য শরীর গ্রহণ করে প্রসন্নমুখে শঙ্করাচার্যের সামনে দাঁড়িয়ে মেঘগম্ভীরস্বরে বললেন— ওহে সন্ন্যাসী, অদ্বৈতের ত পরাজয় হল। তুমি যে বলতে শত্রুমিত্রে ভেদ নেই তা এখন কোথায় গেল? মল্ল যেমন নিজে মাটিতে পড়ে প্রতিপক্ষকে ভূমিসাৎ করে আমিও তেমনি আপন শরীর ত্যাগ করে তোমার সিদ্ধান্তের খণ্ডন করেছি। এবার তোমাকেও বিনাশ করব। এই বলে কাপালিক যোগমায়ার সৃষ্টি করলেন এবং তার দ্বারা চারজন শিষ্যসহ আচার্যের মস্তক ছিন্ন করলেন তারপরে আবার তাঁদের বাঁচিয়ে দিলেন।[১]

শঙ্করবিজয়ে আচার্য কর্তৃক কাপালিকবিজয়ের যে-কাহিনী দেওয়া হয়েছে এই কাহিনী হয়ত তারই পাল্টা জবাব অথবা এই কাহিনীরই পাল্টা জবাব হয়ত শঙ্করবিজয়ে দেওয়া হয়েছে। সে যাক, এই কাহিনী থেকে জানা যায় কাপালিকরা যোগসাধনা করতেন এবং তার দ্বারা অলৌকিক যোগবল লাভ করতেন। আর আভাস পাওয়া যায় সিদ্ধান্তের দিক দিয়ে তাঁদের মত ছিল অদ্বৈতবিরোধী।

কাপালিক গুরু—গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে বলা হয়েছে নাথের দ্বারাই কাপালিক মত প্রকটীকৃত হয়। নাথই এই মার্গের প্রবর্তক। তারপর শাবরতন্ত্রের বচন উদ্ধার করে বার জন কাপালিক গুরু এবং তাঁদের বার জন শিষ্যের নাম দেওয়া হয়েছে। গুরু যথা— আদিনাথ, অনাদি, কাল, অতিকালক, করাল, বিকরাল, মহাকাল, কালভৈরবনাথ, বটুক, ভূতনাথ, বীরনাথ এবং শ্রীকণ্ঠ।[২] শিষ্য যথা—নাগার্জুন, জড়ভরত, হরিশ্চন্দ্র, সত্যনাথ, ভীমনাথ, গোরক্ষ, চর্পট, অবদ্য, বৈরাগ্য, কন্থাধারী, জলন্ধর এবং মলয়ার্জুন। এই শিষ্যদের মার্গপ্রবর্তক অর্থাৎ সম্প্রদায়-প্রবর্তক বলা হয়েছে।[৩]

কাপালিককেন্দ্র—দক্ষিণভারতের কাঞ্চি, তিরুবর্রিয়ুর, মেলপাডি এবং কোডুম্বালুর ছিল কাপালিক ও কালামুখদের শক্তিশালী কেন্দ্র।[৪] এর থেকে অনুমান হয় কাপালিক সম্প্রদায় মূলতঃ এবং প্রধানতঃ দক্ষিণ ভারতের উপাসক সম্প্রদায়।

১ গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহ, পৃঃ ১৬-১৭

২ আদিনাথো হ্যনাদিশ্চ কালশ্চৈবাতিকালকঃ। করালো বিকরালশ্চ মহাকালশ্চ সপ্তমঃ।
কালভৈরবনাথশ্চ বটুকশ্চানন্তরম্। ভূতনাথো বীরনাথঃ শ্রীকণ্ঠো দ্বাদশো মতঃ।
শাবরতন্ত্রবচন, উদ্ধৃত, ঐ, পৃঃ ১৮-১৯

৩ নাগার্জুনো জড়ভরতো হরিশ্চন্দ্রস্তৃতীয়কঃ। সত্যনাথো ভীমনাথো গোরক্ষশ্চর্পটস্তথা।
অবদ্যশ্চৈব বৈরাগ্যঃ কন্থাধারী জলন্ধরঃ। মার্গপ্রবর্তকা হ্যেতে তদ্বচ্চ মলয়ার্জুনঃ।—ঐ, পৃঃ ১৯

৪ A Historical Sketch of Śaivism, C. Her. I., S. R. C. M. Vol. II., p. 27

গ্রন্থ—কাপালিকদের কোনো গ্রন্থ পাওয়া যায় কি। তাঁদের ক্রিয়াকর্ম আচার-অনুষ্ঠান বেদবিরোধী বলে অন্যমতাবলম্বীদের গ্রন্থে তাদের অপবাদ ঐতিহ্যের আকারে বরাবর চলে এসেছে।[১] এমন কি শিবোপাসক অন্য সম্প্রদায়ও তাঁদের অতিমার্গিক অর্থাৎ বিপথগামী বা ঠিক পথ থেকে অনেক দূরবর্তী বলে নিন্দা করেছেন।[২]

কিন্তু কাপালিকদেরও যে গ্রন্থ ছিল তার পরোক্ষ প্রমাণ আছে। সূতসংহিতায় (ষষ্ঠ খৃঃ শতক) কামিকাদি-আগমের উল্লেখ করা হয়েছে।[৩] এই কামিকাদি-আগমের মধ্যে কাপাল-আগমও আছে।[৪] এটি কাপালিকদের গ্রন্থ হতে পারে। তবে অনুমান হয় কাপালিকদের গ্রন্থাদি বেশী ছিল না। কারণ, কাপালিকদের সম্বন্ধে যেটুকু তথ্য পাওয়া যায় তার থেকে প্রতীতি হয় তাঁরা প্রধানতঃ সাধক যোগী। লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য সাধনার উপরই তাঁরা অধিক গুরুত্ব আরোপ করতেন। কোনো সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করার দিকে তাঁদের লক্ষ্য ছিল মনে হয় না। থাকলে সেই উদ্দেশ্যে অবশ্যই নানা গ্রন্থ রচনা করতেন।

সিদ্ধান্ত— তবে সিদ্ধান্ত তাঁদের অবশ্যই ছিল। গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহ অনুসারে দেখা গেল কাপালিক মত শঙ্করব্যাখ্যাত অদ্বৈতের বিরোধী। এদিকে আচার্য রামানুজ কাপালিকদের পশুপতিমতানুসারী বলেছেন। এ কথায় যায় অবশ্য স্পষ্ট কিছুই বোঝা যায় না। তবে রামানুজ পাশুপতসূত্রবর্ণিত পাশুপত মতের কথা মনে রেখে এ কথা বলতে পারেন। তা যদি হয় তা হলে বলতে হয় কাপালিকদের সিদ্ধান্ত পাশুপতসূত্রবর্ণিত সিদ্ধান্ত অথবা তারই অনুরূপ সিদ্ধান্ত।

সাধনা—কিন্তু তাঁদের সাধনা ছিল স্বতন্ত্র। সে-সাধনার গূঢ় মর্ম বাইরের লোকের জানা ছিল না। কাজেই কাপালিকদের নামে যে-অপবাদ অন্যেরা প্রচার করেছেন তাঁরা সত্যসত্য সেই অপবাদের পাত্র কি না নিশ্চয় করে বলা যায় না।

বিকার—আরেকটা কথা। দেখা যায় সব ধর্মসম্প্রদায়েই কালে কালে বিকার উপস্থিত হয়। অযোগ্য অনধিকারীর দল সম্প্রদায়ে ঢুকে পড়ে। এটা অনেক সময় হয় সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা বাড়াবার দিকে নজর দেওয়ার জন্য। ফল এই হয়, এই-সব অযোগ্য ব্যক্তি গুহ্য সাধনার গভীর তত্ত্ব আয়ত্ত করতে পারে না। কাজেই তারা বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানকেই ধর্ম বলে মনে করে আর এখানেই সাধনা বিকৃত হয়। বাইরের লোকেরা এই-সব বিকৃতি দেখে সম্প্রদায়ের নিন্দা করে। কিন্তু বিকৃতিটাইত সম্প্রদায়ের সত্যিকারের পরিচয় নয়।

---

১ H. I. Ph., Vol. V, p. 10. ২ V. Ś. M. R. S., p. 128

৩ সূতসংহিতা, ১।১।১২ ৪ H. I. Ph., Vol. V., p. 16, n. 1

একপেশে ধারণা— সাধারণ লোকের মধ্যে কাপালিকদের সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা এই যে এঁরা মদ, নারী, মাংস, এমন কি নরমাংসেরও যথেচ্ছ ব্যবহার করেন।[১] আমাদের এই ধারণা একপেশে বলে মনে হয়; কেন না এতে কাপালিক সম্প্রদায়ের যথার্থ পরিচয় সূচিত হয় না।

নানা প্রশ্ন—অবশ্য কাপালিকদের সম্পর্কে যে-সামান্য তথ্যাদি পাওয়া যায় তার উপর নির্ভর করে তাঁদের সম্বন্ধে পরিষ্কার কোনো ধারণা করাও কঠিন। কাপালিকের বিষয়ে নানা প্রশ্ন মনে জাগে। শিবোপাসক কাপালিক ও শক্তি-উপাসক কাপালিকের সন্ধান পাওয়া যায়। উভয় কি একই সম্প্রদায়ভুক্ত? কপালী ভৈরব শিবের উপাসক কাপালিকরা কি দেবীর পূজাও করতেন? না এঁরা পৃথক্ সম্প্রদায়ভুক্ত? পৃথক্ সম্প্রদায়-ভুক্ত হলে এঁদের পরস্পরের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছিল কি? থাকলে, কি তার পরিচয়? ইত্যাদি ইত্যাদি।

উত্তর—কিন্তু নির্ভরযোগ্য যথেষ্ট তথ্যের অভাবে এ-সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া বর্তমানে সম্ভবপর নয়। শুধু জল্পনা কল্পনা চলতে পারে। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। মালতীমাধবে দেখা যায় কাপালিক যোগী অঘোরঘণ্ট দেবী করালচামুণ্ডার উপাসক। যদি ইনি শৈব কাপালিক সম্প্রদায়ভুক্ত হন তা হলে দেখা যাচ্ছে অন্ততঃ সপ্তম খৃঃ শতকে শৈব কাপালিকরা দেবীর পূজাও করতেন। আর যদি ইনি শৈব কাপালিক সম্প্রদায়ভুক্ত না হন তা হলে ঐ সময় থেকে শাক্ত কাপালিক সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে।

তবে সূতসংহিতায় যে-কাপালাগমের পরোক্ষ উল্লেখ আছে সে-রকম কোন গ্রন্থ পাওয়া গেলে এই-সব প্রশ্নের হয়ত যুক্তিযুক্ত উত্তর মিলবে।

---

১ H. I. Ph., Vol. V, p. 3.

অষ্টম অধ্যায়

শৈব দর্শন

শৈব দর্শনের উপযোগিতা—শাক্ত মত তথা দর্শন সম্যক্‌রূপে অবগত হতে হলে শৈব মত বা দর্শনের সঙ্গে একটা মোটামুটি পরিচয় থাকা আবশ্যক। সেইজন্য এখানে সাধারণভাবে সেই পরিচয় লওয়ার চেষ্টা করা গেল।

বিভিন্ন মত—মাধবাচার্য (খৃঃ চতুর্দশ শতক) তাঁর 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' নামক গ্রন্থে শৈব দার্শনিক মতকে চার শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। যথা—নকুলীশ-পাশুপত, শৈব, প্রত্যভিজ্ঞা এবং রসেশ্বর।

নকুলীশ-পাশুপত বা পাশুপত—এ যাবত পাশুপত মতের সব চেয়ে পুরনো যে বইখানা পাওয়া গেছে তার নাম 'পাশুপতসূত্রম্' (খৃঃ প্রথম-দ্বিতীয় শতক)। এই মতের আদিগুরু নকুলীশকে এই গ্রন্থের সূত্রগুলির রচয়িতা মনে করা হয়।[১] পাশুপতসূত্রম্ এবং কৌণ্ডিণ্যকৃত তার ভাষ্যে (খৃঃ চতুর্থ-ষষ্ঠ শতক) প্রধানতঃ পাশুপত যোগবিধি বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে। এইজন্য এই গ্রন্থকে খাঁটি দার্শনিক গ্রন্থ মনে করা হয় না।[২]

তবে সর্বদর্শনসংগ্রহে যে-নকুলীশ-পাশুপত মতের কথা বলা হয়েছে পাশুপতসূত্রে এবং কৌণ্ডিণ্যের ভাষ্যে খুব সম্ভব প্রসঙ্গতঃ সেই মতই ব্যক্ত হয়েছে। ব্রহ্মসূত্রের শারীরক ভাষ্যে যে-পাশুপত মতের উল্লেখ আছে তাও এই পাশুপতসূত্রোক্ত মত হতে পারে।[৩]

পাশুপত মতের লক্ষ্য— কৌণ্ডিণ্য বলেছেন[৪] আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক সকল প্রকার দুঃখের ঐকান্তিক এবং আত্যন্তিক ব্যপোহ অর্থাৎ অন্ত আছে কি না শিষ্যের এই প্রশ্নের উত্তরে গুরু পাশুপতসূত্রগুলি বলেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে এই পাশুপত মতের লক্ষ্য সকল প্রকার দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক অন্ত অর্থাৎ ধ্বংস।

যিনি পাশুপত যোগবিধির যথাযথ অনুসরণ করতে পারবেন পশুপতির প্রসাদে তাঁর দুঃখান্ত হবে। এই দুঃখান্ত শুধু জ্ঞান, বৈরাগ্য, ধর্ম, ঐশ্বর্যত্যাগাদির দ্বারা হয় না, পশুপতির প্রসাদেই হয়।

পশুপতির ব্যাখ্যা—এই যে পশুপতির প্রসাদের কথা বলা হল এই পশুপতির পরিচয় কি? পশু শব্দের ব্যাখ্যায় কৌণ্ডিণ্য বলেছেন[৫] সিদ্ধেশ্বরদের অর্থাৎ জীবন্মুক্তদের বাদ দিয়ে

---

১ পা সূ পৃঃ ৪, পাদটীকা ৩ ২ H. I. Ph., Vol. V, p. 130 ৩ Ibid, p. 143

৪ পা সূ ১।১-এর ভাষ্য ৫ অত্র পশবো নাম সিদ্ধেশ্বরবর্জং সর্বে চেতনাবন্তঃ।—পা সূ ১।১-এর ভাষ্য

চেতনাবান্ আর সবাই পশু। পাশুপতদের মতে সাংখ্যযোগানুসারে মুক্ত ব্যক্তিও পশু। ব্রহ্মা থেকে আরম্ভ করে তির্যগ্ পর্যন্ত সব জীবই পশু।[১]

সেই পশুদের যিনি ব্যাপ্ত করে আছেন, রক্ষা করছেন তিনি পতি। পতি জ্ঞানশক্তি দ্বারা পশুদের ব্যাপ্ত করে আছেন এবং প্রভুত্বশক্তি দ্বারা রক্ষা করছেন।

পাশুপত মতের আলোচ্য— কৌণ্ডিণ্য বলেন[২] পাশুপত মতের আলোচ্য পাঁচটি পদার্থ। যথা—কারণ, কার্য, যোগ, বিধি এবং দুঃখান্ত।

কারণ—কারণপদার্থ পতি।[৩] পতির অনেক নাম বা উপাধি। যথা—বাম, দেব, জ্যেষ্ঠ, রুদ্র, কাম, শঙ্কর, কাল, কলবিকরণ, বলবিকরণ, অঘোর, ঘোরতর, সর্ব, তৎপুরুষ, মহাদেব, ওঁকার, ঋষি, বিপ্র, মহানীশ, ঈশান, ঈশ্বর, অধিপতি, ব্রহ্মা এবং শিব।[৪] তিনি ব্রহ্ম।[৫]

এই পতি (কারণ) উৎপাদক-অনুগ্রাহক-তিরোভাবক-ধর্মী। তিনি বিদ্যাকলাপশু নামক কার্য অর্থাৎ বিশ্ব উৎপাদন করেন, রক্ষা করেন এবং তার তিরোভাব ঘটান। এ সব তাঁর ক্রীড়া।[৬]

তিনি ইচ্ছা করেন বলে কার্যের অর্থাৎ বিশ্বের সৃষ্টি করেন তাঁর আপন শক্তির মধ্যে (স্বশক্তিস্থং কার্যম্); এবং স্বশক্তি দ্বারাই বিশ্বে অবস্থান (স্বশক্ত্যা অধ্যাস্তে) করেন।[৭]

ভগবান্ মহেশ্বরের শক্তি সনাতনী।[৮] এই শক্তির বিবিধ রূপ। তার মধ্যে প্রধান ইচ্ছাশক্তি,[৯] জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি।[১০]

ভগবান্ কার্যের উৎপত্তি যেমন ইচ্ছা তেমনি করেন। কারণ, তাঁর ইচ্ছা স্বতন্ত্র এবং অপরিমিত। তিনি জগতে বা জীবনে যেমন খুশি পরিবর্তন ঘটাতে পারেন। ব্যক্তি বা তার কর্মের অপেক্ষা তাঁকে করতে হয় না। অর্থাৎ জীবের কর্ম যাই হোক না কেন ভগবান্ ইচ্ছামত তার বন্ধমোক্ষাদি যে-কোনো গতি বিধান করতে পারেন। তবে একটি ক্ষেত্রে তাঁর ইচ্ছাকে তিনি পরিমিত করেছেন। মুক্ত জীবকে তিনি আর দুঃখযুক্ত করার ইচ্ছা করেন না।[১১] মোক্ষাবস্থায় জীব স্বতন্ত্র, তার আর ঈশ্বরপারতন্ত্র্য থাকে না।[১২]

সম্প্রদায়বিদ্‌দের মতে ঈশ্বর কর্মাদিনিরপেক্ষ স্বেচ্ছাচারী।[১৩] ঈশ্বর কর্মনিরপেক্ষ কিন্তু

---

১ সাংখ্যযোগেন যে যুক্তাঃ সাংখ্যযোগেশ্বরাশ্চ যে।
ব্রহ্মাদয়স্তির্যগন্তাঃ সর্বে তে পশবঃ স্মৃতাঃ।—উদ্ধৃত, ঐ

২ পা সূ ১।১-এর ভাষ্য, পৃঃ ৩ ৩ পা সূ ৫।৪৭-এর ভাষ্য ৪ ঐ ৫ পা সূ:১।৪৩, ২।২১ ইত্যাদি

৬ ঐ ১।৪৪ এবং ২।২-এর ভাষ্য ৭ ঐ ২।৫-এর ভাষ্য ৮ ঐ, ২।৬-এর ভাষ্য

৯ ঐ ১০ ঐ ৫।২৩-এর ভাষ্য ১১ পা সূ ২।৬-এর ভাষ্য ১২ স দ স ৬।৩-৭ এবং ভাষ্য

১৩ কর্মাদিনিরপেক্ষস্ত স্বেচ্ছাচারী যতো হ্যয়ম্।—স দ স ৬।১২৮

কর্ম ঈশ্বরসাপেক্ষ। জীবের স্বকর্ম তাকে সুখদুঃখরূপ ফল দেয় কিন্তু দেয় ঈশ্বরানুগ্রহে, ঈশ্বরনিরপেক্ষভাবে দিতে পারে না।[১]

কার্য—বিদ্যা, কলা এবং পশুকে বলা হয় কার্য।[২] সাংখ্যমতে প্রধান এবং পুরুষ কারণ কিন্তু পাশুপত মতে কার্য। এই মতে একমাত্র পতিই কারণ। কারণ নিত্য বলে কার্যও নিত্য।[৩]

বিদ্যা—কৌণ্ডিন্য বিদ্যার একাধিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি সংবিৎ বা সম্বোধকে বলেছেন বিদ্যাভিব্যক্তি।[৪] যা উৎপাদ্য-অনুগ্রাহ্য-তিরোভাব্য-কার্য্য-বিকার্য-পদার্থের বোধের অধিষ্ঠান তাই বিদ্যা।[৫] যা গ্রহার্থবর্তিপদার্থের অভিব্যঞ্জিকা জ্ঞানলক্ষণা তাই বিদ্যা।[৬] বিদ্যা ধর্মার্থকামকৈবল্যের সাধন।[৭]

'সর্বদর্শনসংগ্রহ'-এ[৮] বিদ্যাকে বলা হয়েছে পশুগুণ। বিদ্যা দ্বিবিধা—বোধস্বভাবা (বোধাত্মিকা) এবং অবোধস্বভাবা (অবোধাত্মিকা)। বোধাত্মিকা বিদ্যাকে বলা হয় চিত্ত।[৯] যে-ধর্মাধর্ম পশুত্বপ্রাপ্তি ঘটায় সেই ধর্মাধর্ম যে-বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত সেই বিদ্যাকে বলে অবোধাত্মিকা বিদ্যা।

কলা—কার্য এবং করণের নাম কলা। এখানে কার্য বলতে বুঝায় ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু এবং আকাশ এবং যথাক্রমে তাদের গুণ গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ। আর করণ বলতে বুঝায় শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ (নাসিকা), পাদ, পায়ু, উপস্থ, হস্ত, বাক্ মন, অহংকার এবং বুদ্ধি।[১০]

পশু—কৌণ্ডিন্য বলেন পশনহেতু এবং পাশনহেতু জীবকে পশু বলা হয়।[১১] কথাটা ব্যাখ্যা করে বলেছেন জীবের বিভুত্ব এবং চেতনসমবেতত্ব থাকা সত্ত্বেও সে কেবলমাত্র শরীরই দেখে, তার বাইরে কিছুই দেখে না। এই রকম 'পশন'হেতু অর্থাৎ দেখার জন্য জীব পশু। আর পাশ বলতে বুঝায় পূর্বোক্ত কলা। এই পাশের দ্বারা বদ্ধ হওয়ার জন্য অর্থাৎ পাশনহেতু জীব পশু।[১২]

পশু ত্রিবিধ—দেবতা, মনুষ্য এবং তির্যক। দেবতা ব্রহ্মাদি অষ্টবিধ, মনুষ্য ব্রাহ্মণাদি অনেকবিধ এবং তির্যগ্‌যোনি পশুমৃগাদি পঞ্চবিধ।[১৩]

যোগ—কৌণ্ডিন্যের মতে আত্মা এবং ঈশ্বরের সংযোগ যোগ।[১৪] আত্মার ব্যাখ্যায়

১ স দ স ৬।১২৮ এবং ভাষ্য   ২ পা সূ ২।২ এবং ৫।৪৭-এর ভাষ্য   ৩ ঐ ৫।৪৭-এর ভাষ্য

৪ ঐ ১।১-এর ভাষ্য   ৫ ঐ ৫।৪৭-এর ভাষ্য   ৬ ঐ ৫।১৯-এর ভাষ্য   ৭ ঐ ৫।২৫-এর ভাষ্য

৮ স দ স ৬।৩৩   ৯ কৌণ্ডিন্য বলেন (পা সূ ৫।৩৭-এর ভাষ্য) যা গৃহ্যমাণ-পদার্থ বোধ করায় এবং ধর্মাধর্ম অর্জন করে তাই চিত্ত।   ১০ পা সূ ২।৫৪-এর ভাষ্য

১১ পশনাৎ পাশনাচ্চ পশবঃ।—ঐ ১।১-এর ভাষ্য   ১২ ঐ।   ১৩ পা সূ ৫।৪৭-এর ভাষ্য

১৪ আত্মেশ্বরসংযোগো যোগঃ।—ঐ ১।১-এর ভাষ্য

বলেছেন যিনি কার্যকরণ দ্বারা জীবকে বিষয়সমূহ বোধ করান তিনি আত্মা।[১] আত্মা চেতন, ক্ষেত্রজ্ঞ, জীবাত্মা, পুরুষ, পুদ্গল, ভোক্তা, অণু, বেদ, অমৃত, সাক্ষী, পরিভূ এবং পর।[২] ইনি শ্রোতা, দ্রষ্টা, স্রষ্টা, রসয়িতা, ঘ্রাতা, মন্তা (মননকারী), বক্তা এবং বোদ্ধা।[৩] জীব যখন ইন্দ্রিয়জয় করতে পারে এবং ইচ্ছাদ্বেষপ্রবৃত্তিরহিত হয়ে সর্বভূতস্থিত মহেশ্বরে স্থিতচিত্ত হতে পারে তখনই ঈশ্বর ও জীবের সংযোগ হয়।

ইন্দ্রিয়গুলিকে যখন ইচ্ছা করে অকুশল কর্মের থেকে ফিরিয়ে এনে কুশলকর্মে যুক্ত করা যায় তখনই ইন্দ্রিয়জয় হয়।[৪]

লক্ষ্য করা গেল পাশুপত মতে যোগ আত্মা ও ঈশ্বরের সংযোগ, পাতঞ্জল মতের চিত্তবৃত্তি-নিরোধ নয়। চিত্তবৃত্তি বিষয় থেকে প্রত্যাহার করে হৃদয়ে মহেশ্বরের ধারণা করতে হবে। এই মতানুসারে প্রত্যাহারের উপর বেশী জোর দেওয়া হয়।[৫]

মহেশ্বরের ধারণার সময় চিত্তবৃত্তি হৃদয়ে ওঁকারে নিবিষ্ট করতে হবে।[৬] এর অর্থ ওঁকার ধ্যেয় বস্তু। ওঁকার নিষ্কল শিব।[৭]

বিধি—স্থূল সূক্ষ্ম বাহ্যাভ্যন্তর নানা কর্মকে বলা হয় বিধি।[৮] পাশুপত সূত্রে প্রথমে ভস্মস্নানাদি স্থূলবিধি তারপর ক্রমশঃ সূক্ষ্মবিধি বিবৃত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি বিধির উল্লেখ করা যাচ্ছে।

পাশুপতমতাবলম্বী যোগসাধককে ভস্মস্নান, ভস্মে শয়ন, ভস্মানুস্নান, শিবনির্মাল্যধারণ করতে হবে ; হাসি, নৃত্য, গীত, হুং হুং শব্দ, জপ, নমস্কার প্রভৃতি কায়িক, বাচিক ও মানসিক কর্ম ঈশ্বরে নিবেদন করতে হবে ; প্রাণায়াম করতে হবে, রৌদ্রী গায়ত্রী জপ করতে হবে, মনকে কলুষমুক্ত করতে হবে।[৯] সাধনপথে আরও অগ্রসর সাধককে ব্রহ্মজপ করতে হবে।[১০]

সাধককে সংগ্রহপ্রতিগ্রহহিংসারহিত হতে হবে।[১১] তাঁর চিত্ত যাতে মান প্রভৃতি সকল প্রকার সঙ্গবর্জিত হয় সেইজন্য তিনি এমনভাবে চলবেন যাতে লোকে তার নিন্দা করে। তিনি প্রেতের মতো আচরণ করবেন অর্থাৎ অত্যন্ত নোংরা পাগলের মতো থাকবেন।[১২] এমনি

১ অপূর্ব কার্যকরণং বিষয়াণ্ডেক্তরমাত্মা।—পা সূ ৫।৩-এর ভাষ্য

২ পুরুষশ্চেতনো ভোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞঃ পুদ্গলো বসঃ
অপূর্বোঽমৃতঃ সাক্ষী জীবাত্মা পরিভূঃ পরঃ।—উদ্ধৃত, ঐ ৩ পা সূ ৫।৩-এর ভাষ্য

৪ তস্মাদকুশলেভ্যো ব্যাবর্ত্তিতা কামতঃ কুশলে যোজিতানি (স্মা), তদা জিতানি ভবন্তি।—ঐ ৫।৭-এর ভাষ্য ৫ H. I. Ph., Vol. V, p. 140, ৬ পা সূ ৫।২৪, ৫।২৫ ৭ ঐ ৫।২৭-এর ভাষ্য

৮ ঐ ১।১-এর ভাষ্য ৯ ঐ প্রথম অধ্যায় দ্র ১০ ঐ ২।২৫ ১১ ঐ ৩।১৩-এর ভাষ্য

১২ পা সূ ৩।১০, ৩।১১, ৪।১৪ এবং ভাষ্য

করে নিন্দিত হয়ে তিনি অনিন্দিতকর্মা হবেন অর্থাৎ ধর্মাচরণ করবেন।[১] অধ্যয়ন, জপ, ধ্যান তাঁর ধর্মচর্যার অঙ্গ। এ ছাড়া প্রত্যেক সাধকের থাকবে শঙ্করের প্রতি অনন্তভক্তি।[২] পাতঞ্জলযোগসূত্রোক্ত যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গের চর্যা এই পাশুপত মতেও বিহিত।[৩] তবে এই মতের ধারণা ধ্যান অন্যরকমের আর সমাধি অর্থ রুদ্রসাযুজ্যলাভ।

দুঃখান্ত—পাশুপত মত অনুসারে চরম দুঃখান্ত হয় রুদ্রসাযুজ্যলাভে। রুদ্রসাযুজ্যলাভেই চরম সিদ্ধি। এই চরম সিদ্ধিলাভ হয় ঈশ্বরপ্রসাদে।[৪] রুদ্রসাযুজ্য সাংখ্য-পাতঞ্জল মতের কৈবল্য নয়। কৈবল্য-অবস্থায় মুক্ত জীব স্বাত্মপরমাত্মজ্ঞানরহিত মূর্চ্ছিতের মতো অবস্থান করে। কিন্তু রুদ্রসাযুজ্যলাভে এই স্বাত্মপরমাত্মজ্ঞান থাকে। পাশুপত মতে মুক্ত হওয়া অর্থ যুক্ত হওয়াও বটে ; মহেশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। যুক্ত হওয়া কিন্তু মিশে যাওয়া নয়।[৫]

মাহেশ্বর ঐশ্বর্য—সিদ্ধ যোগী নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ বাহ্যাভ্যন্তর সকল প্রকার ক্রিয়াশূন্য, ক্ষেমী অর্থাৎ সকল প্রকার শঙ্কাশূন্য, বীতশোক, ধর্মাধর্মরহিত এবং প্রমাদশূন্য হন। তাঁর গর্ভ-জন্ম-অজ্ঞান-জরা-মরণ প্রভৃতি সকল প্রকার আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখের অন্ত হয়ে যায়।[৬] রুদ্রসাযুজ্যপ্রাপ্ত যোগীর আর সংসার অর্থাৎ জন্ম নাই।[৭] তিনি মাহেশ্বর ঐশ্বর্যলাভ করেন।[৮] এখানে ঐশ্বর্য অর্থ অলৌকিক শক্তি।[৯] মাহেশ্বর ঐশ্বর্য দৃক্‌শক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি। দৃক্‌শক্তি বিষয়ভেদে পঞ্চবিধ। যথা—দর্শন, শ্রবন, মনন, বিজ্ঞান এবং সর্বজ্ঞতা।[১০]

দর্শন অর্থ সূক্ষ্ম, ব্যবহিত (ব্যবধানযুক্ত), বিপ্রকৃষ্ট (দূরস্থ) ও চাক্ষুষ রূপবিষয়ক জ্ঞান। এই জ্ঞান স্পর্শরসগন্ধবিষয়কও সিদ্ধিজ্ঞান। দূরস্থ সূক্ষ্মাদি-অশেষশব্দবিষয়ক সিদ্ধিজ্ঞান শ্রবণ। সমস্ত চিন্তাবিষয়ক সিদ্ধিজ্ঞান অর্থাৎ চিন্তামাত্রই মনন। সর্ববিধ বিষয়ে শাস্ত্রাদি সাধনের অপেক্ষা না রেখে যে-জ্ঞান হয় তাই মনন। বিজ্ঞান অর্থ অশেষশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থগত এবং অর্থগত জ্ঞান। সিদ্ধ যোগীর অপরিমিত জ্ঞান সর্ববিষয়ে ব্যাপ্ত থাকাকে বলে সর্বজ্ঞতা। যিনি সব জানেন তিনি সর্বজ্ঞ। তাঁর ভাব সর্বজ্ঞত্ব বা সর্বজ্ঞতা।[১১]

ক্রিয়াশক্তি বলতে বোঝায় মনোজবিত্ব, কামরূপিত্ব এবং বিকরণধর্মিত্ব।[১২] মনোজবিত্ব অর্থ

১ ঐ ৪।১৫ ২ ঐ ২।২০

৩ ঐ ১।১৬ ; ৩।১৯-এর ভাষ্য ; ৫।২৪, ২৫, ৩১, ৩৩ ইত্যাদি এবং ভাষ্য ৪ পা সূ ৫।৪০

৫ ঐ ৫।৩৯-এর ভাষ্য ৬ ঐ ৫।৩৯, ৫।৪০ এবং ভাষ্য ৭ ঐ ৫।৩৩-এর ভাষ্য

৮ পা সূ ৫।৪০-এর ভাষ্য ৯ H. I. Ph., Vol. V, p. 182 ১০ স দ স ৬।৪৯-৫১

১১ স দ স ৬।৫১-৫৩ ও ভাষ্য ১২ স দ স ৬।৫৩-৫৭

সিদ্ধ যোগীর নিরতিশয় শীঘ্রকারিত্ব অর্থাৎ কিছু বলামাত্র বা ভাবামাত্র তৎক্ষণাৎ তা করার ক্ষমতা। সিদ্ধ যোগীর কর্মাদিনিরপেক্ষ হয়ে স্বেচ্ছায় অনন্তরূপের অধিষ্ঠাতৃত্বকে কামরূপিত্ব বলা হয়।[১] সিদ্ধ যোগীর ইন্দ্রিয়াদি সঙ্কুচিত হয়ে গেলেও তাঁর নিরতিশয় ঐশ্বর্য অর্থাৎ শক্তি থাকাকে বলে বিকরণধর্মিত্ব।[২] এই শক্তি স্থানশরীরাদির দ্বারা জীবকে সংযুক্ত করার শক্তি।[৩]

মাধবাচার্য মাহেশ্বর ঐশ্বর্যলাভকে বলেছেন সাত্মক দুঃখান্ত। তাঁর মতে দুঃখান্ত দ্বিবিধ—অনাত্মক এবং সাত্মক। সমস্ত দুঃখের অত্যন্ত উচ্ছেদ অনাত্মক দুঃখান্ত।[৪]

আলোচ্য পাশুপত মত দ্বৈত এবং একেশ্বরবাদী। সূত্রগুলি আলোচনার সময় লক্ষ্য করা যায় এতে দেবতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরও মাহাত্ম্য ঘোষিত হয়েছে। মানুষ সাধনার দ্বারা কত বড় হতে পারে সূত্রগুলিতে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

পৌরাণিক পাশুপত মত—'পাশুপতসূত্রম্' ছাড়া পুরাণাদিতেও পাশুপত মতের কথা পাওয়া যায়। শিবপুরাণের অন্তর্গত বায়বীয় সংহিতায় পাশুপত মতের বিবরণ আছে। পাশুপতসূত্র-নির্দিষ্ট মত আর এই মত এক নয়।[৫]

পাশুপতসূত্রম্ এবং কৌণ্ডিণ্যভাষ্যে বিবৃত পতি, পাশ এবং পশু এখানেও আছে। পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিরা ব্রহ্মার আদেশে বায়ুর কাছ থেকে শিববিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন। তাঁরা প্রথমেই বায়ুকে জিজ্ঞাসা করেন কি সেই পরমজ্ঞান আপনি লাভ করেছেন যাতে পরম নিষ্ঠা রেখে মানুষ সুখলাভ করে? উত্তরে বায়ু বললেন আমি পূর্বে পশু-পাশ-পতি-বিষয়ক জ্ঞান লাভ করেছি। সুখার্থী পুরুষের তাতে পরম নিষ্ঠা করা কর্তব্য।[৬]

পশু-পাশ-পতি—পাশুপতসূত্রে যেমন এখানেও তেমনি দুঃখান্তের কথা আছে; তবে অন্যভাবে। বলা হয়েছে অজ্ঞান (অবিদ্যা) থেকে উৎপন্ন দুঃখ জ্ঞানের অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হয়। জ্ঞান অর্থ বস্তুপরিচ্ছেদ অর্থাৎ বস্তুনির্ধারণ। বস্তু ত্রিবিধ।[৭] যথা—অজড়, জড় এবং তাদের নিয়ন্তা। পশু অজড়, পাশ জড় আর তাদের নিয়ন্তা পতি।[৮] তত্ত্ববেত্তারা আবার পশুকে অক্ষর, পাশকে ক্ষর এবং পতিকে ক্ষরাক্ষরপর বলে থাকেন।[৯]

১ ঐ ৩।৫৮-৬০

২ সঙ্কুচিতকারেন্দ্রিয়স্যাপি নিরতিশয়ৈশ্বর্যসম্বন্ধিত্বম্।—পা সূ, অঃ ১, পৃঃ ৪৫, পাদটীকা ২

৩ দ্রঃ ঐ, অঃ ২, পৃঃ ৭৫, পাদটীকা ৪ স দ স ৩।৪৮-৫০

৫ শি পু, বায় সং, পূ ভা, ৪।৩-১০ ৬ ঐ ৪।১০

৭ অজ্ঞানপ্রভবং দুঃখং জ্ঞানেনৈব নিবর্ততে। জ্ঞানং বস্তুপরিচ্ছেদো বস্তু চ ত্রিবিধং স্মৃতম্।—ঐ ৪।১১

৮ ঐ ৪।১২, ১৪ ৯ ঐ ৪।১৩

অক্ষর ও ক্ষরের ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে প্রকৃতি ক্ষর আর পুরুষ অক্ষর। এই উভয়কে যিনি চালিত করেন সেই পরমেশ্বর পর অর্থাৎ ক্ষরাক্ষরপর অর্থাৎ কি না ক্ষর এবং অক্ষর এই উভয় থেকে ভিন্ন।[১]

তা হলে দাঁড়াল পশু পুরুষ, পাশ প্রকৃতি এবং পতি পরমেশ্বর।

আবার প্রশ্ন হল এই প্রকৃতি কে? পুরুষ কে? তাদের সম্বন্ধ কি রকম? তাদের প্রেরক ঈশ্বর কে?[২]

পাশ—প্রকৃতি মায়া। পুরুষ মায়াবৃত জীব। মল-কর্মের দ্বারা উভয়ের সম্বন্ধ হয়। তাদের প্রেরক ঈশ্বর শিব।[৩]

ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে মায়া মাহেশ্বরী শক্তি; চিদ্রূপ পুরুষ মায়াবৃত হন। মল চিৎ-ছাদক।[৪] আর পূর্বোক্ত মলশূন্যতা অর্থাৎ স্বাভাবিক বিশুদ্ধি শিবতা।[৫]

আবার প্রশ্ন জাগে মায়া কেমন করে সর্বব্যাপী চিদ্রূপ পুরুষকে আবৃত করে? কেনই বা পুরুষের এই আবরণ? কেমন করে এর নিবৃত্তি হয়?[৬]

উত্তরে বলা হয়েছে মায়া সর্বব্যাপী পুরুষেরও আবরণ হতে পারে, কেন না কলাদিও (মায়ার বিভিন্ন রূপ) সর্বব্যাপী। ভোগার্থ কর্মই আবরণের হেতু। মলক্ষয় হলেই আবরণ নিবৃত্ত হয়।[৭]

কলাদি বলতে বোঝায় কলা, বিদ্যা, রাগ, কাল এবং নিয়তি।[৮] এই পাঁচটিকে পঞ্চ তত্ত্ব বলা হয়। বিদ্যা আর কলা পুরুষের দিকৃক্রিয়া-ব্যঞ্জক, রাগ অর্থাৎ বিষয়ানুরাগ প্রবর্তক, কাল সকল বস্তুর অবচ্ছেদক আর নিয়তি নিয়ামিকা।[৯]

কর্ম দ্বিবিধ— পুণ্যাত্মক এবং পাপাত্মক। তার ফল যথাক্রমে সুখ এবং দুঃখ। মল অনাদি। আর ভোগ পর্যন্ত অর্থাৎ মলক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত কর্ম থাকবে। কর্মের আশ্রয় অজ্ঞান পুরুষ।[১০]

১ শি পু, বায় সং, পূ ভা, ৪।১৬ ২ ঐ ৪।১৭ ৩ ঐ ৪।১৮

৪ সর্বদর্শনসংগ্রহে মল সম্বন্ধে বলা হয়েছে 'আত্মাশ্রিতো দুষ্টভাবো মলঃ' অর্থাৎ পুরুষ-আশ্রিত দুষ্টভাব মল। মল পঞ্চবিধ—মিথ্যাজ্ঞান, অধর্ম, সক্তি (বিষয়াসক্তি), হেতু (বিষয়সন্নিধানাদি) এবং চ্যুতি অর্থাৎ সদাচার-ভ্রষ্টতা।—স দ স ৬।১৯-২১

৫ মায়া মাহেশ্বরী শক্তিশ্চিদ্রূপো মায়য়াবৃতঃ। মলশ্চিচ্ছাদকো নৈজো বিশুদ্ধিঃ শিবতা স্বতঃ।

—শি পু, বায় সং, পূ ভা, ৪।২০

৬ ঐ ৪।২১ ৭ ঐ ৪।২২ ৮ শি পু, বায় সং, পূ ভা, ৪।২৫

৯ দৃক্‌ক্রিয়াব্যঞ্জিকে বিদ্যাকলে রাগঃ প্রবর্তকঃ। কালোঽবচ্ছেদকস্তত্র নিয়তিস্তু নিয়ামিকা—ঐ ৪।৩১

১০ ঐ ৪।২৩

ভোক্তা পুরুষ।[১] অব্যক্ত ভোগ্য। বাহ্- ও অন্তরিন্দ্রিয়-বিশিষ্ট শরীর ভোগসাধন।[২] কর্মক্ষয়ের জন্য ভোগ প্রয়োজন

অব্যক্ত কারণ। তার থেকে ত্রিগুণের উদ্ভব হয় এবং তাতেই লয়প্রাপ্ত হয়। তত্ত্ব-চিন্তকগণ এই অব্যক্তকেই প্রধান এবং প্রকৃতি বলেন।[৩]

কিন্তু লক্ষ্য করা গেছে পাশুপতসূত্র অনুসারে প্রধান এবং পুরুষ উভয়ই কার্য।

শিবপুরাণ অনুসারে কলাতত্ত্ব থেকে অনভিব্যক্তলক্ষণ প্রকৃতি অভিব্যক্ত হয়।[৪]

পূর্বেই বলা হয়েছে অব্যক্ত বা প্রকৃতি থেকে সত্ত্ব, রজ, তম এই তিন গুণের উদ্ভব হয়। তিলে তৈলের মতো প্রকৃতিতে গুণত্রয় সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত।[৫]

সমস্ত সুখ এবং সুখহেতু সাত্ত্বিক অর্থাৎ সত্ত্বগুণোদ্ভূত, দুঃখ এবং দুঃখহেতু রাজস অর্থাৎ রজোগুণোদ্ভূত আর অন্ধমোহ তামস অর্থাৎ তমোগুণোদ্ভূত।[৬]

পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ ভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, প্রধান, বুদ্ধি, অহংকার ও মন—এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বকে সবিকার অব্যক্ত বলা হয়।[৭]

অব্যক্ত যখন কারণদশাপন্ন থাকে তখন তাকে বলা হয় অব্যক্ত আর যখন শরীরাদি-কার্যদশাপন্ন হয় তখন তাকে বলা হয় ব্যক্ত।[৮] ঘটাদি যেমন মৃত্তিকা থেকে ভিন্ন নয়, তেমনি শরীরাদিকার্যরূপ ব্যক্ত (প্রকৃতি) কারণরূপ অব্যক্ত (প্রকৃতি) থেকে অভিন্ন।[৯]

পশু—পুরুষকে বলা হয়েছে আত্মা। বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও শরীরের অতিরিক্ত ধ্রুব এবং বিভু (সর্বব্যাপী) এই আত্মা। এঁর অস্তিত্বের হেতুনির্দেশ কঠিন।[১০]

সমস্তই তাঁর মধ্যে অবস্থিত এবং তিনি সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে আছেন। তিনি শাশ্বত। তথাপি কেউ তাঁকে কোথাও ব্যক্ত দেখতে পায় না।[১১]

এই আত্মা বা পুরুষ অশরীরী। তবে নশ্বর দেহে তিনি অব্যয় স্থাণুরূপে বিরাজমান। দেহ থেকে পুরুষ পৃথক্। যারা তাঁকে দেহের সঙ্গে অভিন্ন দেখে তারা ঠিক দেখে না।[১২]

সব বিপদের বীজভূত নিজের কর্মের দ্বারা পুরুষ দেহের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সুখী, দুঃখী এবং মূঢ় হন।[১৩]

জলপ্লাবিত ক্ষেত্র যেমন অঙ্কুর উৎপাদন করে তেমনি অজ্ঞানপ্লাবিত কর্ম দেহ উৎপাদন করে।[১৪]

১ শি পু, বায় সং, পূ ভা, ৪।২৫ ২ ঐ ৪।২৭ ৩ ঐ ৪।৩২ ৪ ঐ ৪।৩৩
৫ ঐ ৪।৩৪ ৬ ঐ ৪।৩৫ ৭ ঐ ৪।৩৭-৩৮ ৮ ঐ ৪।৩৯ ৯ ঐ ৪।৪০
১০ ঐ ৪।৪৩ ১১ ঐ ৪।৪৬ ১২ ঐ ৪।৪৯-৫০ ১৩ ঐ ৪।৫২
১৪ অদ্ভিরাপ্লাবিতং ক্ষেত্রং জনয়ত্যঙ্কুরং যথা। অজ্ঞানাপ্লাবিতং কর্ম দেহং জনয়তে তথা। ঐ ৪।৫৩

দেহ অন্তশীল, অসুখের আবাস, রুগ্ন। পুরুষের মরণশীল, অনাগত এবং অতীত হাজার হাজার শরীর আছে। সেই-সব শরীর বার বার উৎপন্ন এবং শীর্ণ হয়। কিন্তু কোথাও কখনও কোনো শরীরের সঙ্গে ইনি চিরযুক্ত হয়ে থাকেন না। আকাশে চন্দ্রবিম্ব যেমন তরল মেঘের দ্বারা কখনো আচ্ছাদিত কখনো মুক্ত লক্ষিত হয় তেমনি পুরুষও শরীরসমূহের দ্বারা কখনো আচ্ছাদিত কখনো মুক্ত লক্ষিত হন।[১]

পাশাখেলায় বিভিন্ন দানে পাশার চিহ্নভেদে যেমন ঘুঁটির চাল ভিন্ন হয় তেমনি বিভিন্ন-দেহভেদে আত্মার বিভিন্ন বৃত্তি হয়ে থাকে।[২] পুরুষ বা আত্মা এক। বিভিন্নদেহযুক্ত হওয়ায় তাঁকে বিভিন্ন মনে হয়। এই জন্যই ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে পুরুষ অনেক।

পূর্বেই বলা হয়েছে পুরুষ পশু। শিবপুরাণের অভিমত ব্রহ্মা থেকে স্থাবর পর্যন্ত সবই পশু। এখানে যে-সব নিদর্শন বর্ণিত হল সে-সব পশুরই নিদর্শন।[৩]

পাশবদ্ধ হয়ে পশু সুখদুঃখ ভোগ করে। জ্ঞানী ব্যক্তিরা একে ঈশ্বরের লীলাসাধন অর্থাৎ লীলার উপকরণ বা ক্রীড়নক মনে করেন। এই জীব অজ্ঞ। নিজের সুখদুঃখের উপর এর কোনো কর্তৃত্ব নেই। ঈশ্বরপ্রেরিত হয়ে স্বর্গে বা নরকে যায়।[৪]

পতি—এই ঈশ্বরই পতি। ইনি অনন্ত রমণীয় গুণের আশ্রয়, বিশ্বের স্রষ্টা এবং পশুপাশ-বিমোচক। প্রধান (প্রকৃতি) এবং পরমাণু প্রভৃতি যা কিছু সবই অচেতন, পশু অজ্ঞান। কাজেই তাদের দ্বারা সৃষ্টি হতে পারে না। জগৎ সাবয়ব এবং কার্য। অতএব তার এক জন কর্তা অবশ্যই আছেন। সেই কর্তা পতি। পশুরও যেটুকু কর্তৃত্ব দেখা যায় তা পতিপ্রেরিত, তার নিজের নয়।[৫]

মহাদেব মহেশ্বর জগতের কর্তা। প্রধানের পরিণাম এবং পুরুষের প্রবৃত্তি সেই সত্যব্রতের শাসনে প্রবর্তিত হয়—সাধু ব্যক্তিদের মনে এই শাশ্বতী নিষ্ঠা বিদ্যমান।[৬]

স্রোতে যেমন জল এবং অরণিতে অগ্নি ব্যাপ্ত হয়ে আছে তেমনি আত্মার মধ্যে আত্মা

১ অত্যন্তমসুখাবাসং রুগ্নৈকান্তমৃত্যবঃ। অনাগতা অতীতাশ্চ তনবোঽস্য সহস্রশঃ।
আগত্যাগত্য শীর্ণেষু শরীরেষু শরীরিণঃ। অত্যন্তবসতিঃ কাপি ন কেনাপি চ লভ্যতে।
ছাদিতশ্চ বিযুক্তশ্চ শরীরৈরেষু লক্ষ্যতে। চন্দ্রবিম্ববদাকাশে তরলৈরভ্রসঞ্চয়ৈঃ।
—শি পু, বায় সং. পূ ভা ৪।৫৪-৫৬

২ ঐ, ৪।৫৭

৩ ব্রহ্মাদ্যাঃ স্থাবরান্তাশ্চ পশবঃ পরিকীর্তিতাঃ। পশূনামেব সর্বেষাং প্রোক্তমেতন্নিদর্শনম্।—ঐ ৪।৬১

৪ স এব বধ্যতে পাশৈঃ সুখদুঃখাশনঃ পশুঃ। লীলাসাধনভূতো য ঈশ্বরস্যেতি সূরয়ঃ।
অজ্ঞো জন্তুরনীশোঽয়মাত্মনঃ সুখদুঃখয়োঃ। ঈশ্বরপ্রেরিতো গচ্ছেৎ স্বর্গং বা শ্বভ্রমেব বা।—ঐ ৪।৬২-৬৩

৫ ঐ ৪।৬৪-৬৯ ৬ ঐ ৭।১২-১৩

থেকে বিলক্ষণ এই মহাত্মা (পতি) ব্যাপ্ত হয়ে আছেন। সত্য এবং তপস্যার দ্বারা নিত্যযুক্ত ব্যক্তি তাঁকে এইভাবে দর্শন করেন।[১]

এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় বায়বীয়সংহিতার পূর্বভাগের চতুর্থ অধ্যায়ের শেষার্ধের যে-শ্লোকগুলিতে (৪।৭০-১৪১) পতির মহিমা বর্ণিত হয়েছে সেই শ্লোকগুলি শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদের মন্ত্রগুলিকে সামান্য অদলবদল করে রচনা করা হয়েছে। কাজেই বোঝা যায় শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদের রুদ্রশিবই এই পতি।

সৃষ্টি ঈশ্বরের ক্রীড়া বা লীলা। তিনি স্বশক্তি দ্বারা বিধান অনুসারে বিশ্বসৃষ্টি করে ক্রীড়া করেন।[২] আমরা লক্ষ্য করে এসেছি পশুকে তাঁর লীলাসাধন বা ক্রীড়নক বলা হয়েছে।

কর্মবিধান সৃষ্টিবিধানের অন্তর্গত। মল-কর্মের দ্বারা পুরুষ বদ্ধ হয় শিবের সৃষ্টিবিধান অনুসারেই। আবার একমাত্র তাঁরই প্রসাদে এই মলের (অজ্ঞানের) ক্ষয় হয়। আত্মনিষ্ঠ মলের ক্ষয় হয়ে গেলে পুরুষ শিবতুল্য হয়ে যায়।[৩]

শিবের এই প্রসাদ বা অনুগ্রহ তাঁর স্বভাবগত। সমস্ত জগৎই তাঁর অনুগ্রহ লাভ করে। সাধুরা বলেন পরিপূর্ণ শিবের পরানুগ্রহ ছাড়া আর কোনো কর্তব্য নাই।[৪] তিনি সবাইকে অনুগ্রহ করেন, কাউকে নিগ্রহ করেন না। কেন না নিগ্রহকারীদের যে-সব দোষ থাকে শিবের সে-সব দোষ থাকা অসম্ভব।[৫]

অনুগ্রহশব্দের ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে শিবের আজ্ঞাপালন হিত। যা হিত তাই অনুগ্রহ। শিব সকলকে হিতে নিযুক্ত করেন, এইজন্য তিনি সর্বানুগ্রাহক।[৬]

আবার বলা হয়েছে উপকার শব্দের যে-অর্থ অনুগ্রহ শব্দেরও সেই অর্থ। উপকারও হিতস্বরূপ বলে শিব সকলের উপকারক। চিৎ অচিৎ সমস্ত পদার্থ শিবকর্তৃক হিতে নিযুক্ত হলেও স্ব স্ব স্বভাবের প্রতিবন্ধকতার জন্য সমানভাবে হিত লাভ করে না। যেমন সূর্যের কিরণের দ্বারা সকল পদ্মের বিকাশ হলেও নিজ নিজ স্বভাবের জন্য সকল পদ্ম সমানভাবে বিকশিত হয় না।[৭] কাজেই বলা হয় যে-পুরুষের যেরূপ যোগ্যতা সে সেরূপ অনুগ্রহ লাভ করে।[৮]

১ শি পু. বায় সং, পূ ভা, ৪।৭৪-৭৫ ২ ঐ ৭।১

৩ ক্ষীণে চাত্মমলে তস্মিন্ পুমান্ শিবসমো ভবেৎ ।—ঐ ৪।২৮

৪ শিবস্য পরিপূর্ণস্য পরানুগ্রহমেবতু। ন কিঞ্চিদপি কর্তব্যমিতি সাধুবিনিশ্চিতম্ ।—ঐ ২৭।৩

৫ ঐ ২৭।২৩ ৬ ঐ ২৭।৫৪ ৭ ঐ ২৭।৫৫-৫৭

৮ যাদৃশী যোগ্যতা পুংসস্তস্য তাদৃগনুগ্রহঃ ।—ঐ ২।৭৭

জীবাত্মারা স্বভাবমলিন।[১] জীবের কর্মমায়াবন্ধনকেই পণ্ডিতেরা সংসার বলেন। এই বন্ধনই তার স্বাভাবিক মল।[২]

লক্ষ্য করা গেছে শিবের প্রসাদ বা অনুগ্রহে মলক্ষয় হয় এবং এই প্রসাদ বা অনুগ্রহ সবার প্রতিই বর্ষিত হচ্ছে।

প্রসাদলাভের উপায়—ধর্মসাধনার দ্বারা পুরুষ নিজেকে সেই প্রসাদজনিত সিদ্ধি-লাভের যোগ্য করে তুলবে। শিবের প্রসাদের সাধন ধর্ম। এই ধর্ম বেদে প্রদর্শিত হয়েছে।[৩] ধর্মের অভ্যাসবশে পূর্বজন্মার্জিত পুণ্যাপাপের সাম্য হয়। সাম্য থেকে প্রসাদসম্পর্ক হয়; তার থেকে হয় ধর্মাতিশয্য। ধর্মাতিশয্য হলে পশুর পাপক্ষয় হয়। বহু জন্মজন্মান্তরে এরূপ প্রক্ষীণপাপ জীবের জগজ্জননীসহ সর্বেশ্বরে জ্ঞানপূর্বা ভক্তি জন্মে। জীব ঈশ্বরের যেরূপ ভাবনা করে সেই মতো তাঁর প্রসাদ লাভ করে। প্রসাদ লাভ করলে জীব কর্মত্যাগ করে। ত্যাগ করে ফলের দিক্ থেকে স্বরূপতঃ নয়। অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে কর্ম করে। কর্মফল ত্যাগ করলে তবে শুভ শিবধর্ম গ্রহণ করতে পারে।[৪]

শিবধর্ম—শিবধর্ম দ্বিবিধ—গুরুনিরপেক্ষ আর গুরুসাপেক্ষ। গুরুনিরপেক্ষ অপেক্ষা গুরুসাপেক্ষ ধর্ম শতগুণে মুখ্য।[৫] শিবধর্মযুক্ত পুরুষের শিবজ্ঞান জন্মে। জ্ঞান জন্মালে পুরুষ সংসারে দোষ দর্শন করে। তার পর তার বিষয়বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। বৈরাগ্য থেকে ভাবসাধন হয়। ভাবসিদ্ধি যে লাভ করে তার আর কর্মে নিষ্ঠা থাকে না, তার নিষ্ঠা হয় ধ্যানে। জ্ঞান- এবং ধ্যান-সম্পন্ন পুরুষের যোগ প্রবর্তিত হয়। যোগের দ্বারা পরা ভক্তি লাভ হয় এবং তার পরেই আসে শিবের প্রসাদ। সেই প্রসাদবলে জীব মুক্ত হয়ে শিবতুল্য হয়।[৬]

১ স্বভাবমলিনা হ্যাত্মানো জীবসংজ্ঞিতাঃ।—শি পু, বায় সং, পূ ভা, ২৭।৩১ ২ ঐ ২৭।৩৩

৩ প্রসাদসাধনং ধর্মঃ স চ বেদেন দর্শিতঃ।—ঐ ২।৬৭

৪ অভ্যাসবশাৎ সাম্যং পূর্বয়োঃ পুণ্যপাপয়োঃ। সাম্যাৎ প্রসাদসম্পর্কো ধর্মস্যাতিশয়স্ততঃ।
ধর্মাতিশয়মাসাদ্য পশোঃ পাপপরিক্ষয়ঃ। এবং প্রক্ষীণপাপস্য বহুভির্জন্মভিঃ ক্রমাৎ।
সাম্বে সর্বেশ্বরে ভক্তির্জ্ঞানপূর্বা প্রজায়তে। ভাবানুগুণমীশস্য প্রসাদো ব্যতিরিচ্যতে।
প্রসাদাৎ কর্মসন্ত্যাগঃ ফলতো ন স্বরূপতঃ। তস্মাৎ কর্মফলত্যাগাচ্ছিবধর্মাধিকারতঃ শুভঃ।—ঐ ২।৬৮-৭১

৫ ঐ ২।৭২

৬ শিবধর্মান্বয়াত্তস্য শিবজ্ঞানসমন্বয়ঃ। জ্ঞানাভ্যাসবশাৎ পুংসঃ সংসারে দোষদর্শনম্।
ততো বিষয়বৈরাগ্যং বৈরাগ্যাদ্ভাবসাধনম্। ভাবসিদ্ধ্যা পশ্যস্য ধ্যানে নিষ্ঠা ন কর্মণি।
জ্ঞানধ্যানাভিযুক্তস্য পুংসো যোগঃ প্রবর্ততে। যোগেন তু পরা ভক্তিঃ প্রসাদস্তদনন্তরম্।
প্রসাদান্মুচ্যতে জন্তুর্মুক্তঃ শিবসমো ভবেৎ।—ঐ ২।৭৩-৭৬

অবশ্য কার কোন অবস্থায় মুক্তি হবে তা নির্ভর করে যার যার জ্ঞান এবং ভাবের উপর।

পাশুপতসূত্রে মুখ্য স্থান যোগের কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যোগের চেয়ে ভক্তির গৌরব বেশী, যোগ ভক্তির সহায়ক। লক্ষণীয় এই ভক্তি সশক্তি শিবের প্রতি ভক্তি।

বায়বীয়সংহিতার উত্তরভাগেও পাশুপত মতের আলোচনা আছে। পূর্বভাগে আলোচিত দার্শনিক বিচারেরও কিছু পরিবর্তন এখানে লক্ষ্য করা যায়।[১]

পতি পশুকে বাঁধেন—পূর্বভাগে বলা হয়েছে পশু স্বভাবমলিন। এই ভাগে দেখা যায় পতি মলমায়াদিপাশসমূহের দ্বারা পশুদের বাঁধেন।[২] চতুর্বিংশতিতত্ত্ব মায়ার কর্ম এবং গুণ। এইগুলিকে বলা হয় বিষয়। এইগুলিই জীবের বন্ধনপাশ।[৩]

পতি দেব মহেশ্বর ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্ত পশুদের এই-সব পাশের দ্বারা বেঁধে নিজের কাজ করান।[৪]

চতুর্বিংশতি তত্ত্ব শিবের আজ্ঞায় উদ্ভূত হয়েছে এবং স্ব স্ব নির্দিষ্ট ধর্ম পালন করছে। তাঁর আজ্ঞায় ব্রহ্মাবিষ্ণুপ্রমুখ দেবতা থেকে আরম্ভ করে সৃষ্টির সব পদার্থই অধিষ্ঠিত আছে এবং নিজ নিজ ধর্মানুযায়ী চলছে।[৫]

শিবের আজ্ঞা শিবের শক্তি স্বয়ং দেবী। শিবনির্দেশে তিনি এই চরাচর প্রসব করেন।[৬]

পতির মূর্তি—পরমাত্মা মহেশ শিব বিভিন্ন মূর্তিতে চরাচর সমুদয় জগৎ ব্যাপ্ত করে রয়েছেন।[৭] ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, মহেশান (মহেশ্বর) সদাশিব—এঁরা শিবের মূর্তি। এই মূর্তিদের দ্বারা এই বিশ্ব ব্যাপ্ত।[৮]

শিবের পঞ্চ ব্রহ্ম নামে খ্যাত পঞ্চ তনু। এই পঞ্চ তনুর দ্বারা অব্যাপ্ত কিছুই জগতে নাই। পঞ্চ তনু বা মূর্তির নাম—ঈশান, পুরুষ (তৎপুরুষ), অঘোর, বাম (বামদেব) এবং সদ্য (সদ্যোজাত)।[৯]

ঈশান-মূর্তি প্রকৃতির সাক্ষাৎ ভোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞে অর্থাৎ পুরুষে অধিষ্ঠিত। তৎপুরুষ-মূর্তি গুণাশ্রয় ভোগ্য অব্যক্তে অধিষ্ঠিত। ঘোর-মূর্তি ধর্মাদি-অষ্টাঙ্গসংযুক্ত বুদ্ধিতত্ত্বে অধিষ্ঠিত। বামদেব-মূর্তি অহংকারে অধিষ্ঠিত এবং সদ্যোজাত-মূর্তি মনে অধিষ্ঠিত।[১০]

---

১ H. I. Ph., Vol. V, p. 118

২ মলমায়াদিভিঃ পাশৈঃ স বধ্নাতি পশূন্ পতিঃ।—শি পু, বায় সং, উ ভা, ২।১০

৩ চতুর্বিংশতিতত্ত্বানি মায়াকর্মগুণা অমী। বিষয়া ইতি কথ্যন্তে পাশা জীবনিবন্ধনাঃ।—ঐ ২।১২

৪ ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্তান্ পশূন্ বদ্ধা মহেশ্বরঃ। পাশৈরেতৈঃ পতির্দেবঃ কার্যং কারয়তি স্বকম্।—ঐ ২।১৩

৫ ঐ ২।১৪-৩৪

৬ তস্যৈব পরমা শক্তিঃ শিবস্য পরমাত্মনঃ। শক্তিরাজ্ঞা মহাভাগা প্রসূতে তচ্চরাচরম্।—ঐ ২৭।১৫

৭ ঐ ৩।২ ৮ ঐ ৩।৩ ৯ ঐ ৩।৫ ১০ ঐ ৩।৬-১০

আবার দেবাদিদেবের অষ্টমূর্তির কথাও বলা হয়েছে। জগৎ এই অষ্টমূর্তিময়। অষ্টমূর্তি যথা—শর্ব, ভব, রুদ্র, উগ্র, ভীম, পশুপতি, ঈশান এবং মহাদেব। মহেশ্বরের এই শর্বাদি অষ্টমূর্তি ভূমি, অম্ভ (জল), অগ্নি, মরুৎ, ব্যোম, ক্ষেত্রজ্ঞ, অর্ক এবং নিশাকরে যথাক্রমে অধিষ্ঠিত।[১] এ ছাড়া শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে শর্বের বিশ্বম্ভরাত্মিকা শর্বা নামক মূর্তি চরাচরাত্মক বিশ্বকে ধারণ করে আছেন।[২]

এই চরাচর বিশ্ব দেবদেবের বিগ্রহ।[৩] তিনি এক কিন্তু মহর্ষিরা এই অবিকল্প পরম ভাব অর্থাৎ পরম তত্ত্ব না জেনে তাঁকে বহুপ্রকারে বর্ণনা করেন।[৪]

এই মতে শিব ব্রহ্মের অধিপতি। ব্রহ্মের দুই রূপ—অপর ব্রহ্ম আর পর ব্রহ্ম। ভূত-ইন্দ্রিয়-অন্তঃকরণ-প্রধান-বিষয়াত্মক অপর ব্রহ্ম। পরব্রহ্ম চিদাত্মক। এই উভয়ই শিবের রূপ।[৫]

আবার কেউ কেউ ঈশকে বিদ্যা-অবিদ্যারূপী বলে বর্ণনা করেন। বিদ্যা চেতনা, অবিদ্যা অচেতনা। বিদ্যা-অবিদ্যাত্মক বিশ্ব বিশ্বগুরু পরমেশ্বরের রূপ।[৬]

বায়বীয়সংহিতার এই ভাগে শিবশক্তিতত্ত্ব বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

শক্তি—শক্তি সাক্ষাৎ মহাদেবী, মহাদেব শক্তিমান্‌। এই সমুদয় চরাচর তাদের উভয়ের বিভূতিলেশ।[৭] কতক বস্তু চিৎ এবং কতক বস্তু অচিৎ। যে চিৎচক্র অচিৎ-চক্র-সমন্বিত হয়ে অর্থাৎ অচেতন বস্তুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে অথবা অজ্ঞানসমন্বিত হয়ে আবর্তিত হয় তা অশুদ্ধ, অপর; আর যা সে রকম হয় না তা পর, শুদ্ধ।[৮] এই পর এবং অপর চিদচিদাত্মক, এই উভয় স্বভাবতঃ শিবশিবার স্বাম্য।[৯]

শিব যা দেবীও তাই, দেবী যা শিবও তাই। চন্দ্র ও চন্দ্রিকার মধ্যে যেমন কোনো ভেদ নেই, তেমনি শিব ও দেবীর মধ্যে কোনো ভেদ নেই। চন্দ্র যেমন চন্দ্রিকা ছাড়া প্রকাশিত হতে পারে না তেমনি শিব বিদ্যমান থাকলেও শক্তি ছাড়া প্রকাশিত হতে

১ শি পু, বায় সং, উ ভা, ৪।১৭-১৯   ২ ঐ ৪।২০

৩ বিগ্রহং দেবদেবস্য বিশ্বমেতচ্চরাচরম্‌।—ঐ ৬।১   ৪ ঐ ৬।২   ৫ ঐ ৬।৪-৫

৬ বিদ্যাবিদ্যাস্বরূপীতি কৈশ্চিদীশো নিগদ্যতে।
বিদ্যেতি চেতনাঃ প্রাহুস্তথাবিদ্যামচেতনাম্‌।
বিদ্যাবিদ্যাত্মকঞ্চৈব বিশ্বং বিশ্বগুরো র্বিভো।
রূপমেব ন সন্দেহো বিশ্বং তস্য বশে যতঃ।—ঐ ৬।৬-৭

৭ শক্তিঃ সাক্ষান্মহাদেবী মহাদেবঃ স শক্তিমান্‌। তয়োর্বিভূতিলেশো বৈ সর্বমেতচ্চরাচরম্‌।—ঐ ৫।৪

৮ ঐ, ৫।৫-৬

৯ অপরঞ্চ পরঞ্চৈব দ্বয়ং চিদচিদাত্মকম্‌। শিবস্য চ শিবায়াশ্চ স্বাম্যঞ্চৈতৎ স্বভাবতঃ।—ঐ ৫।৭

পারেন না। সূর্য যেমন তার প্রভা ছাড়া থাকে না এবং প্রভাও সূর্য ছাড়া থাকে না তেমনি শিবশক্তি পরস্পরসাপেক্ষ, শক্তি বিনা শিব থাকেন না এবং শিব বিনা শক্তি থাকেন না।[১]

শিব যে-শক্তির দ্বারা দেহীদের ভুক্তি ও মুক্তি দিতে নিত্য সমর্থ শিবাশ্রয়া সেই অদ্বিতীয়া চিন্ময়ী পরা শক্তি আদ্যা শক্তি। ইনি পরমাত্মা শিবের সমানধর্মিণী। এই অদ্বিতীয়া চিদ্রূপা পরা শক্তি প্রসবধর্মিণী। তিনি শিবেচ্ছায় বহু প্রকারে বিভাগ করে বিশ্বের বিধান করেন। তিনিই মূলপ্রকৃতি ত্রিগুণা ত্রিবিধা মায়া।[২]

সৃষ্টি—শিবের ইচ্ছায় পরা শক্তি শিবতত্ত্বের সঙ্গে একতা প্রাপ্ত হন। তার পর আদি-সৃষ্টিতে তিল থেকে তৈলের মতো শিব থেকে প্রকাশিত হন। এর পর শিবোত্থিতা ক্রিয়া-শক্তির দ্বারা সেই আদ্যা শক্তি ক্ষুব্ধ হলে প্রথমে নাদের উদ্ভব হয়। নাদের থেকে বিন্দু এবং বিন্দুর থেকে সদাশিবের উদ্ভব হয়। তাঁর থেকে মহেশ্বর এবং মহেশ্বরের থেকে উদ্ভূত হন শুদ্ধবিদ্যা। এই শুদ্ধবিদ্যা বাক্যের অধীশ্বরী। ইনি শিবের বাগীশা নামক শক্তি। ইনি বর্ণস্বরূপে মাতৃকা নামে পরিচিতা।[৩]

তার পর অনন্তের সমাবেশ হেতু শুদ্ধবিদ্যারূপিণী মায়া কাল, নিয়তি, কলা এবং বিদ্যার সৃষ্টি করেন। কলা থেকে সৃষ্টি করেন রাগ এবং পুরুষের। আবার মায়া থেকে ত্রিগুণাত্মক অব্যক্তের উদ্ভব হয়। তার পর অব্যক্ত থেকে সত্ত্ব, রজ, তম এই তিন গুণ পৃথক্ হয়ে গিয়ে অখিল জগৎ ব্যাপ্ত করে। এই গুণত্রয় ক্ষোভিত হলে তার থেকে মহদাদিতত্ত্ব যথাক্রমে উদ্ভূত হয়।[৪] এই তত্ত্বগুলি সাংখ্যোক্ত তত্ত্ব থেকে অভিন্ন।

এইভাবে শিবের ইচ্ছানুযায়িনী পরা শক্তি চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করছেন—এইটি শাস্ত্র সিদ্ধান্ত।[৫]

১ যথা শিবস্তথা দেবী যথা দেবী তথা শিবঃ। নানয়োরন্তরং বিদ্যাচ্চন্দ্রচন্দ্রিকয়োরিব॥
চন্দ্রো ন খলু ভাত্যেষ যথা চন্দ্রিকয়া বিনা। ন ভাতি বিদ্যমানোঽপি তথা শক্ত্যা বিনা শিবঃ॥
প্রভয়া হি বিনা যদ্বদ্ভানুরেষ ন বিদ্যতে। প্রভা চ ভানুনা তেন সুতরাং তদপাশ্রয়া॥
এবং পরস্পরাপেক্ষা শক্তিশক্তিমতোঃ স্থিতিঃ। ন শিবেন বিনা শক্তির্ন শক্ত্যা চ বিনা শিবঃ॥
—শি পু, বায়ু সং, উ ভা, ৫।৯-১২

২ শক্তো যয়া শিবো নিত্যং ভুক্তৌ মুক্তৌ চ দেহিনাম্। আদ্যা সৈকা পরা শক্তিশ্চিন্ময়ী শিবসংশ্রয়া॥
যামাহুরখিলেশস্য তৈস্তৈরনুগুণৈর্গুণৈঃ। সমানধর্মিণীমেব শিবস্য পরমাত্মনঃ॥
সৈকা পরা চ চিদ্রূপা শক্তিঃ প্রসবধর্মিণী। বিভজ্য বহুধা বিশ্বং বিদধাতি শিবেচ্ছয়া॥
সা মূলপ্রকৃতির্মায়া ত্রিগুণা ত্রিবিধা স্মৃতা।—ঐ ৫।১৩-১৬

৩ ঐ ৫।১৮-২১ ৪ ঐ ৫।২২-২৫ ৫ ঐ ৫।৩০-৩১

কাজেই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ শক্তিময়।[১]

নিজের জ্ঞান, ক্রিয়া এবং ইচ্ছা এই তিন শক্তির দ্বারা শক্তিমান্ শিব নিত্য বিশ্বব্যাপী হয়ে অবস্থান করছেন এবং বিশ্বকে শাসন করছেন।[২] এইভাবে শক্তিসমাযোগের জন্যই শিবকে শক্তিমান্ বলা হয়।[৩]

শক্তিশিবোত্থিত এই জগৎ শাক্ত এবং শৈব। পিতামাতা ছাড়া যেমন পুত্রের জন্ম হয় না তেমনি ভবভবানী ছাড়া এই চরাচর জগতের উদ্ভব হয় না।[৪]

স্ত্রীপুরুষপ্রভব বিশ্ব স্ত্রীপুরুষাত্মক, স্ত্রীপুরুষের বিভূতিস্বরূপ এবং স্ত্রীপুরুষের দ্বারা অধিষ্ঠিত।[৫]

সব পুরুষ শিব, সব স্ত্রীলোক মহেশ্বরী। কাজেই সকল স্ত্রীপুরুষ শিবশক্তির বিভূতি।[৬]

শুধু তাই নয়, পুংচিহ্নিত সবই শিব এবং স্ত্রীচিহ্নিত সবই দেবী।[৭]

জগৎ শিবশক্তিময়। কাজেই যে যে পদার্থের যে যে শক্তি, সেই সেই শক্তি বিশ্বেশ্বরী এবং সেই সেই শক্তিমান্ পদার্থ মহেশ্বর।[৮]

দেখা যাচ্ছে এই মত অনুসারে শিব সশক্তি শিব। তাই দুঃখনিবৃত্তি বা মুক্তি ঘটে শিবশক্তির প্রসাদে।[৯]

শৈবদর্শন—মাধবাচার্যের সময়ে দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত আগমাদি গ্রন্থে বিবৃত শৈব মতকে তিনি 'শৈবদর্শন' নাম দিয়েছেন।[১০] ভোজদেবপ্রণীত (খৃঃ একাদশ শতক) তত্ত্বপ্রকাশ এবং শ্রীকুমারকৃত ও অঘোর শিবাচার্যকৃত তার দুই ব্যাখ্যায় এই মত ব্যাখ্যাত হয়েছে।[১১] মাধবাচার্য সর্বদর্শনসংগ্রহে এই মতের আলোচনায় মৃগেন্দ্রাগম, পৌষ্করাগম, ভোজকৃত তত্ত্বপ্রকাশ, সোমশম্ভুকৃত তত্ত্বপ্রকাশের টীকা, কালোত্তরাগম, কিরণাগম, তত্ত্বসংগ্রহ,

১ তস্মাচ্ছক্তিময়ং সর্বং জগৎ স্থাবর-জঙ্গমম্।—শি পু, বায় সং, উ ভা, ৫।২৯   ২ ঐ ৫।৩২

৩ এবং শক্তিসমাযোগাচ্ছক্তিমানুচ্যতে শিবঃ।—ঐ ৫।৩৬

৪ শক্তি-শক্তিমদুত্থন্তু শাক্তং শৈবমিদং জগৎ। যথা ন জায়তে পুত্রঃ পিতরং মাতরং বিনা।
তথা ভবং ভবানীঞ্চ বিনা নৈতচ্চরাচরম্।—ঐ ৫।৩৭-৩৮

৫ ঐ ৫।৩৮-৩৯

৬ শঙ্করঃ পুরুষাঃ সর্বে স্ত্রিয়ঃ সর্বা মহেশ্বরী। সর্বে স্ত্রীপুরুষাস্তস্মাৎ তয়োরেব বিভূতয়ঃ।—ঐ ৫।৫৫

৭ পুংলিঙ্গমখিলং ধত্তে ভগবান্ পুরশাসনঃ। স্ত্রীলিঙ্গমখিলং ধত্তে দেবী দেবমনোরমা।—ঐ ৫।৬৬

৮ যস্য যস্য পদার্থস্য যা যা শক্তিরুদাহৃতা। সা সা বিশ্বেশ্বরী দেবী স স সর্বো মহেশ্বরঃ।—ঐ ৫।৬৮

৯ তস্মাচ্ছক্তেঃ শক্তিমতঃ প্রসাদান্নির্বৃতির্ভবেৎ। —ঐ ৮।২১

১০ P. S., Intro., p. 8

১১ H. I. Ph., Vol, V, p. 10

কিরণাগম, সৌরভেয়াগম প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে প্রমাণ উদ্ধার করেছেন।[১] এই-সব গ্রন্থ উক্ত মতের প্রতিপাদক।

শৈব মতের আলোচ্য—তবে আলোচ্য শৈব মতের মূল ভিত্তি শৈবাগম। সর্বদর্শন-সংগ্রহে এই মতের যে-বিবরণ দেওয়া হয়েছে তাতে দেখা যায় এর প্রধান আলোচ্য বিষয় ত্রিপদার্থ এবং চতুষ্পাদ। ত্রিপদার্থ—পতি, পাশ এবং পশু। চতুষ্পাদ—বিদ্যা, ক্রিয়া, যোগ এবং চর্যা।

পতি—শিব পতি। তিনি স্বতন্ত্র পরমেশ্বর। অন্য সব ঈশ্বরপরতন্ত্র। এই মতে মুক্ত জীবেরও স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করা হয়। পরমেশ্বর প্রাণিকৃত কর্মানুযায়ী জগৎ উৎপাদন করেন অর্থাৎ এই মতে সৃষ্টি ব্যাপারে শিবের প্রাণিকৃতকর্মসাপেক্ষত্ব স্বীকার করা হয়। এতে তাঁর স্বাতন্ত্র্যের হানি হয় না। ভৃত্যাদির সেবানুসারে নৃপতি তাদের পুরস্কারাদি দেন। এতে যেমন নৃপতির স্বাতন্ত্র্যের হানি হয় না তেমনি প্রাণিকৃতকর্মানুযায়ী সৃষ্টিবিধান করাতেও শিবের স্বাতন্ত্র্যহানি হয় না।

শিব সকল কার্যের প্রযোজক। তিনি সর্বজ্ঞ। জীবের কর্মানুসারে তার ভোগ, ভোগ্য এবং ভোগসাধন তিনি বিধান করেন। ভোগ বলতে বুঝায় সুখদুঃখের সাক্ষাৎকার।[২] শিব জগদুৎপত্তির কর্তা; সর্বকর্তৃত্ব তাঁরই।[৩]

শিবের শরীর—শিব মলকর্মাদিপাশবদ্ধ নন। তিনি অনাদিমুক্ত। তাই তাঁর কোনো প্রাকৃত শরীর নাই। কেন না, প্রকৃতি পাশের অন্তর্গত।[৪]

তবে শিবের মন্ত্রময় শরীর আছে। একে বলা হয় শাক্ত শরীর। কেন না মাতৃকা অর্থাৎ বর্ণমালা শক্তি। মন্ত্রগুলি সবই মাতৃকাতে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ বর্ণময়। কাজেই মন্ত্রের শক্তি-রূপত্ব সিদ্ধ হয়।[৫]

মন্ত্রময় শরীরের অবয়বও মন্ত্র। 'তত্রেশানঃ' দিয়ে যে-মন্ত্রটির আরম্ভ সেটি শিবের মস্তকস্থানীয়। 'তৎপুরুষায়' দিয়ে যার আরম্ভ সেটি তাঁর মুখস্থানীয়। 'অঘোরেভ্য' দিয়ে যে-মন্ত্রটির আরম্ভ সেটি তাঁর হৃদয়স্থানীয়। যার আরম্ভে আছে 'বামদেবায়' সেই মন্ত্রটি তাঁর গুহ্যস্থানীয় আর 'সদ্যোজাত' দিয়ে যে-মন্ত্রটির আরম্ভ সেই মন্ত্রটি শিবের পাদস্থানীয়।[৬]

কোনো কোনো আগমে শিবের ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত শরীরের কথা আছে। নিরাকারের ধ্যান-

১ দ্রঃ স দ স, শৈবদর্শনম্, পৃঃ ১৭৪-১৮৯

২ ভোগঃ সুখদুঃখসাক্ষাৎকারঃ।—স দ স ৭।৪৪-এর ব্যাখ্যা

৩ স দ স ৭।৩৯-৪১ এবং ব্যাখ্যা ৪ ঐ ৭।৫৮-৫৯ এবং ব্যাখ্যা

৫ ঐ ৭।৫৯-৬০ এবং ব্যাখ্যা ৬ ঐ

পূজাদি সম্ভব নয়। সেইজন্য ভক্তকে অনুগ্রহ করবার উদ্দেশ্যে শিব এ রকম শরীর গ্রহণ করেন। পুষ্করাগম-মতে সাধকের রক্ষার জন্য তাঁর এই রূপ।[১]

পঞ্চকৃত্য—লক্ষ্য করা গেছে মন্ত্র শক্তি, শিবেরই শক্তি। পূর্বোক্ত মন্ত্রপঞ্চক তাঁর শক্তিপঞ্চক। এই পঞ্চ শক্তির দ্বারা তিনি পঞ্চকৃত্য সম্পাদন করেন। পঞ্চকৃত্য বলতে বুঝায় সৃষ্টি (ঈশানাদি মন্ত্র), স্থিতি (তৎপুরুষাদি মন্ত্র), সংহার (অঘোরাদি মন্ত্র), তিরোভাব (বামদেবাদি মন্ত্র) এবং অনুগ্রহ (সদ্যোজাতাদি মন্ত্র)।[২] শ্রীকুমার তিরোভাব অর্থ করেছেন পাশসমূহের দ্বারা আত্মপ্রচ্ছাদন।[৩]

শিবশক্তি—শিবের শক্তি অদ্বিতীয়া, চিদ্রূপা, আদ্যা।[৪] ক্রিয়াভেদে তাঁকে ভিন্ন মনে হয়। শিবও এক অর্থাৎ অদ্বিতীয়।[৫] এখন প্রশ্ন হল দুই অদ্বিতীয় কি করে হয়? উত্তরে বলা হয় মহেশ্বরীমহেশ্বরের মধ্যে ভেদ নেই। সেইজন্য মহেশ্বরকে যেমন অদ্বিতীয় বলা যায় তেমনি মহেশ্বরীকেও অদ্বিতীয়া বলা যায়।[৬]

আলোচ্য মতে একই শিবতত্ত্ব পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ এবং ক্লীবলিঙ্গ শব্দের দ্বারা সূচিত হয়। তাই বলা হয়েছে—শিব দেব, শিবা দেবী, শিবং জ্যোতি এইভাবে তিন প্রকার লিঙ্গভেদ করে যে-তত্ত্ব অলিঙ্গ তাকে বর্ণনা করা হয়।[৭] নৈর্দে স্বরূপতঃ শিব স্ত্রীও নন, পুরুষও নন, নপুংসকও নন।[৮]

শিব স্বয়ংপ্রকাশ, কেবলমাত্রচৈতন্য, পরিপূর্ণ, নির্ব্যাপার, উদাসীন, সাক্ষিস্বরূপ। তিনি স্বশক্তির দ্বারাই সৃষ্ট্যাদি করতে পারেন, পশুদের ভুক্তিমুক্তি দিতে পারেন। সশক্তি শিবই অনুগ্রহ করেন।[৯]

পশু—জীবাত্মা পশু। তাঁকে ক্ষেত্রজ্ঞও বলা হয়। পশু অনণু অর্থাৎ ব্যাপক (পাঠান্তরে অণু অর্থাৎ সূক্ষ্ম)। ইনি পুরুষ। চার্বাকমতের দেহমাত্র নন, নৈয়ায়িক মতের 'প্রকাশ্য' অর্থাৎ বোধনীয় বা জ্ঞেয় নন, জৈনমতসম্মত অব্যাপক বা বৌদ্ধমতসম্মত ক্ষণিকও

১ সাধকস্য তু রক্ষার্থং তস্য রূপমিদং স্মৃতম্।—পুষ্করাগমবচন, উদ্ধৃত, স দ স, পৃঃ ১৭৯

২ স দ স ৭।৩৬-৭৮ এবং ব্যাখ্যা

৩ আত্মনাং পাশৈঃ প্রচ্ছাদনং তিরোভাবঃ।-তত্ত্বপ্রকাশের (১।৭) শ্রীকুমারকৃত ব্যাখ্যা

৪ ত প্র ১।৩ ৫ ঐ ১।১

৬ ঐ ১।৩-এর শ্রীকুমারকৃত ব্যাখ্যা

৭ শিবো দেবঃ শিবা দেবী শিবং জ্যোতিরিতি ত্রিধা। অলিঙ্গমপি যত্তত্ত্বং লিঙ্গভেদেন কথ্যতে।
—লঘুস্তুতির পরমেশ্বরাচার্যকৃত ভাষ্য লঘুবৃহতীর বচন, ত প্র ১।৩-এর শ্রীকুমারকৃত ব্যাখ্যায় উদ্ধৃত

৮ নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ নৈব চায়ং নপুংসকঃ।—শ্বে উপ, ৫।১০

৯ ত প্র ১।৩ ও ব্যাখ্যা

ইনি নন। ইনি দেশকালের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন অর্থাৎ ব্যাপক ও নিত্য। কিন্তু ইনি বেদান্ত-মতের এক নন। ভোগের নিয়মে অর্থাৎ ভোগের বিভিন্নতার জন্য পুরুষ বহু।[১]

সাংখ্য মতে পুরুষ অকর্তা। কিন্তু শৈব দর্শনে পুরুষকে কর্তা বলা হয়েছে। পুরুষ অর্থাৎ জীব শিবস্বভাব। শিবানুগ্রহে পাশমুক্ত জীব শিবত্বপ্রাপ্ত হন। নিত্যনিরতিশয়-দৃক্‌ক্রিয়ারূপচৈতন্যাত্মক শিবত্ব। এর অর্থ মুক্ত জীবের জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি নির্বাধ। কাজেই মুক্ত জীব কর্তা।[২]

ত্রিবিধ পশু—ত্রিবিধ পশু—বিজ্ঞানাকল, প্রলয়াকল, আর সকল।

বিজ্ঞানাকল—বিজ্ঞানাকল অর্থ বিজ্ঞানের দ্বারা অকল। বিজ্ঞান অর্থ পরমেশ্বরের স্বরূপবিজ্ঞান।[৩] যার কলা নেই সে অকল। বিজ্ঞান, যোগ, সন্ন্যাস বা ভোগের দ্বারা কর্মক্ষয় হলে ক্ষীণকর্মা জীবের আর কর্মফল ভোগ করতে হয় না। কাজেই তাঁর আর ভোগায়তন শরীরের প্রয়োজন হয় না এবং সেইজন্য শরীরের প্রযোজক কলাদির সঙ্গে তিনি যুক্ত থাকেন না। বিজ্ঞানাকল শুধু মলযুক্ত অর্থাৎ মল নামক পাশের দ্বারা বদ্ধ থাকেন।[৪]

বিজ্ঞানাকল দ্বিবিধ—সমাপ্তকলুষ আর অসমাপ্তকলুষ। মলশক্তি কালুষ্য। তা যাঁর সমাপ্ত অর্থাৎ নষ্ট হয়ে গেছে তিনি সমাপ্তকলুষ। আর যাঁর মলশক্তি নষ্ট হয় নি তিনি অসমাপ্তকলুষ।[৫] মলশক্তি বলতে বুঝায় জীবস্বরূপের আবরণশক্তি, এইটিকে পৃথক্ পাশও বলা হয়।

সমাপ্তকলুষ বিজ্ঞানাকলদের শিব বিদ্যেশ্বরপদে অধিষ্ঠিত করেন। বলা হয়েছে বিদ্যেশ্বর আটজন। যথা—অনন্ত, সূক্ষ্ম, শিবোত্তম, একনেত্র, একরুদ্র, ত্রিমূর্তিক, শ্রীকণ্ঠ এবং শ্রীখণ্ড। আর অসমাপ্তকলুষ বিজ্ঞানাকলদের তিনি মন্ত্রপদে অধিষ্ঠিত করেন। মন্ত্র কর্ম- এবং শরীর-বিযুক্ত শুধু মলযুক্ত জীববিশেষ। মন্ত্রসংখ্যা বলা হয়েছে সাত কোটি।[৬]

প্রলয়াকল—মল এবং কর্ম এই দুই পাশবদ্ধ জীবাত্মা প্রলয়াকল।[৭] শ্রীকুমার বলেছেন কলাদিক্ষিত্যন্ততত্ত্বাত্মক শরীর যাদের প্রকৃষ্টরূপে লয়প্রাপ্ত হয়েছে তারা প্রলয়াকল।[৮] প্রলয়াকলও দুই প্রকারের—পক্বমলকর্ম এবং অপক্বমলকর্ম। প্রথমোক্তদের মলকর্ম পক্ব

১ স দ স ৭।৮৭-৯৬ এবং ব্যাখ্যা   ২ ঐ ৭।৯৭-১০২ এবং ব্যাখ্যা

৩ বিজ্ঞানং পরমেশ্বরস্বরূপবিজ্ঞানম্।—ঐ ৭।১০৬-এর ব্যাখ্যা

৪ ঐ ৭।১০৬-১০৭ এবং ব্যাখ্যা   ৫ ত প্র ১।৯ ও শ্রীকুমারকৃত ব্যাখ্যা

৬ স দ স ৭।১১২-১২৩ এবং ব্যাখ্যা   ৭ ঐ ৭।১২১

৮ প্রকর্ষেণ লয়ং গতং কলাদিধরান্ততত্ত্বাত্মকং শরীরং যেষাং তে প্রলয়াকলাঃ।

—ত প্র ১।১১-এর শ্রীকুমারকৃত ব্যাখ্যা

অর্থাৎ জীর্ণ হয়ে গেছে ; ফলে তারা আর স্বকার্য করতে পারে না। সেইজন্য তারা থেকেও নেই। পক্কমলকর্ম প্রলয়াকলরা মোক্ষলাভ করেন।

অপক্কমলকর্ম প্রলয়াকলেরা পুর্যষ্টকযুক্ত হয়ে কর্মবশে নানাবিধ জন্মগ্রহণ করেন। পুর্যষ্টক কথাটির একাধিক ব্যাখ্যা আছে। কোনো কোনো মতে পঞ্চতন্মাত্র, মন, অহংকার এবং বুদ্ধির সংঘাতাত্মক সূক্ষ্ম শরীর পুর্যষ্টক।[১] অন্য মতে কলা, কাল, নিয়তি, বিদ্যা, রাগ, মন, বুদ্ধি এবং অহংকার পুর্যষ্টক।[২] অঘোরশিবাচার্য পুর্যষ্টক শব্দের অর্থ করেছেন পৃথিব্যাদি-কলাপর্যন্ত-ত্রিংশৎতত্ত্বাত্মক সূক্ষ্ম দেহ।[৩] এই সূক্ষ্ম দেহ প্রত্যেক জীবের সৃষ্টি থেকে কল্পান্ত বা মোক্ষান্ত পর্যন্ত থাকে।[৪]

পক্কমলকর্ম প্রলয়াকলদের মহেশ্বর ভুবনপতিত্ব প্রদান করেন।

সকল—মল, কর্ম এবং মায়া এই তিন প্রকার পাশযুক্ত পশুকে বলা হয় সকল।[৫] সকলও দ্বিবিধ—পক্ককলুষ এবং অপক্ককলুষ। পক্ককলুষ সকলদের পরমেশ্বর শিব মন্ত্রেশ্বরপদ প্রদান করেন এবং তাদের পাশগুলি পূর্ণপক্ক হলে গুরুমূর্তিতে তাঁদের দীক্ষা সম্পাদন করে মোক্ষ প্রদান করেন।[৬] এই মোক্ষও দ্বিবিধ—মুখ্য বা পর এবং গৌণ বা অপর।[৭]

তত্ত্বপ্রকাশেও আছে যাঁরা পরিপক্কমল তাঁদের উপর শিবনিয়োগে সংসারবিনাশের হেতুভূত শক্তিপাত হয় এবং শিব তখন তাঁদের গুরুমূর্তিতে দীক্ষা দিয়ে পরমেশ্বরতত্ত্বে যুক্ত করে দেন অর্থাৎ মোক্ষ প্রদান করেন।[৮]

এই শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীকুমার লিখেছেন পরমেশ্বরের শক্তি দ্বিবিধা—বন্ধনকারিণী এবং মোচনকারিণী। বন্ধনকারিণী শক্তি অনাদি কাল ধরে পশুদের পাশজালে বদ্ধ করছেন আর মোচিকাশক্তি তাদের উপর নিপতিত হবার সুযোগ খোঁজেন। কালবশে প্রথমোক্তশক্তি নিষ্ক্রিয় হলেই মোচিকাশক্তি জীবে নিপতিত হন এবং তখন শিব আচার্যমূর্তিতে তাকে দীক্ষা দিয়ে পরমেশ্বরতত্ত্বে সংযোজিত করেন।

অপক্ককলুষ সকলদের শিব যার যার কর্মানুসারে ভোগমুক্তির জন্য বিষয়ভোগে নিযুক্ত করেন।[৯]

১ তন্মাত্রমনোঽহংকৃৎবুদ্ধীনাং সংঘাতাত্মকমষ্টকং সূক্ষ্মশরীরম্।—প্র স্ত, পৃঃ ৬৩

২ Philosophy of Śaivism, C. Her. I., Ś. R. C. M. Vol. II, p. 39, n. 2.

৩ ত্রিংশৎতত্ত্ব—কলা, কাল, নিয়তি, বিদ্যা, রাগ, প্রকৃতি, গুণ, মন, বুদ্ধি, অহংকার, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র, এবং পঞ্চ মহাভূত।—দ্রঃ স দ স ৭।১৫৩-৫৭

৪ স দ স ৭।১৩৮-৩৯ ৫ মলমায়াকর্মযুতঃ সকলঃ।—ত প্র, ১।৯

৬ স দ স ৭।১৫৮-৬০, ১৬৪-৬৬ ৭ ঐ ৭।১৮১-৮৩

৮ ত প্র ১।১৫ ৯ ঐ ১।১৬

পাশ—পশুর আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা তিন প্রকার পাশের উল্লেখ করেছি। আলোচ্য মতে চার প্রকার পাশের কথাও বলা হয়েছে। যথা—মল, কর্ম, মায়া আর রোধশক্তি।[১]

মল—পৌরাণিক পাশুপত মতের আলোচনা প্রসঙ্গে মলের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। আলোচ্য মতেও একই অর্থে মল শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। শ্রীকুমার বলেছেন মল অবিদ্যাসংস্কারাত্মক।[২]

কর্ম—কর্ম দ্বিবিধ—ধর্মাত্মক এবং অধর্মাত্মক। কর্ম বীজাঙ্কুরের মতো প্রবাহরূপে অনাদি।[৩]

মায়া—সব কিছুর মূল কারণ মায়া। একেই অবিদ্যা, প্রধান এবং প্রকৃতি বলা হয়।[৪] তত্ত্বপ্রকাশে (১।১৭) তৃতীয় পাশকে বলা হয়েছে মায়ীয়। তাতে শ্রীকুমার সূক্ষ্মস্থূলাত্মক শরীরাদিরূপ পাশকে বলেছেন মায়ীয়।

রোধশক্তি—চতুর্থ পাশ রোধশক্তি। পুরুষের স্বাভাবিক দৃক্‌ক্রিয়াশক্তির আবরণ-সামর্থ্য রোধশক্তি। রোধশক্তি মলগত। তত্ত্বপ্রকাশে (১।১৭) চতুর্থ পাশকে বলা হয়েছে তিরোধায়ক।

বস্তুমাত্রের যে-সামর্থ্য তাকে শিবশক্তি বলা হয়। অগ্নির দাহজননসামর্থ্য, জলের শৈত্যোৎপাদনসামর্থ্য ইত্যাদি শিবশক্তি। এই শক্তি আশ্রয়ানুসারে কোথাও গুণের, কোথাও দোষের হেতু হয়। পাশগত হওয়ায় শিবশক্তি আচ্ছাদনকারিণী। তবে শক্তির এই পাশত্ব ঔপচারিক।[৫]

পতি-পশু-পাশ ও ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্ব—তত্ত্বপ্রকাশে[৬] পতি, পশু এবং পাশ এই তিন পদার্থকে ষট্‌ত্রিংশৎতত্ত্বে প্রকাশ করা হয়েছে। উক্ত গ্রন্থ অনুসারে যা প্রলয় অবধি স্থায়ী সর্বভূতের ভোগদায়ী তাই তত্ত্ব, শরীরঘটাদি তত্ত্ব নয়। তত্ত্ব দেশকালব্যাপী।

শিব, শক্তি, সদাশিব, ঈশ্বর ও শুদ্ধবিদ্যা এই পাঁচটি তত্ত্ব পতিরূপ; শিবস্বরূপত্বহেতু এই তত্ত্বগুলিকে বলা হয় শুদ্ধ তত্ত্ব।

মায়া, কাল, নিয়তি, কলা, বিদ্যা, রাগ এবং পুরুষ এই সাতটি তত্ত্ব পশুরূপ। পশুরূপত্বহেতু এই গুলিকে বলা হয় শুদ্ধাশুদ্ধ তত্ত্ব।

অব্যক্ত থেকে আরম্ভ করে পৃথিবী পর্যন্ত চব্বিশটি তত্ত্ব পাশরূপ। এইগুলি অশুদ্ধ তত্ত্ব। এই তত্ত্বগুলির উদ্ভব এই ভাবে বর্ণিত হয়েছে মায়া থেকে অব্যক্ত; অব্যক্ত থেকে গুণতত্ত্ব; গুণতত্ত্ব থেকে বুদ্ধি; বুদ্ধি থেকে অহংকার; অহংকার থেকে মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়,

---

১ স দ স ৭।১৩৩-৩৭ ২ ত প্র ১।১৭-এর ব্যাখ্যা ৩ স দ স ৭।১৩৬-৩৭
৪ ঐ ৭।১৩৩-এর ব্যাখ্যা ৫ ঐ ৭।১৩২ এবং ব্যাখ্যা ৬ ত প্র ২।১-৩

পঞ্চ তন্মাত্র; পঞ্চ তন্মাত্র থেকে পঞ্চ মহাভূত। অব্যক্ত আর গুণতত্ত্বে ভেদ নেই। কাজেই সংখ্যাগণনায় গুণতত্ত্বকে আর পৃথক্ ধরা হয় না। তাই অব্যক্ত থেকে পৃথিবী পর্যন্ত তত্ত্বসংখ্যা চব্বিশ।[১]

শক্তিতত্ত্ব—তত্ত্বপ্রকাশে শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে বলা হয়েছে চেতন এবং জড়ের প্রতি অনুগ্রহের জন্য সিসৃক্ষু শিবের প্রথম উন্মেষ (উন্মেষ = উন্মিদ্রভাব, ঈক্ষণ—শ্রীকুমার) শক্তিতত্ত্ব। শক্তিতত্ত্ব শিবতত্ত্ব থেকে অভিন্ন। শিব থেকে অভিন্ন এই পরা শক্তির বিকার ইচ্ছাদি শক্তি। এই-সব শক্তি পরা শক্তি থেকে অভিন্ন।[২]

পরা শক্তির বিকার ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াশক্তি পরমার্থতঃ শিবতত্ত্ব থেকে অভিন্ন। এই ত্রিশক্তির ভেদানুসারে শিবের সদাশিবাদি বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে।[৩]

সহজ কথায় শিবের জগৎসৃষ্ট্যাদি যাবতীয় ব্যাপার নির্ভর করে এই শক্তির উপর। শক্তি ছাড়া তিনি কিছুই করতে পারেন না।[৪]

তত্ত্বপ্রকাশাদিতে ব্যাখ্যাত এই শৈব দর্শন দ্বৈত। তত্ত্বপ্রকাশের ভাষ্যকার অঘোর শিবাচার্য এই মতই তাঁর ভাষ্যে প্রকাশ করেছেন। তবে অন্য ভাষ্যকার শ্রীকুমার কখনো দ্বৈতপক্ষে আবার কখনো অদ্বৈতপক্ষে ভাষ্য করেছেন। কাজেই তিনি এই দর্শনকে অবিমিশ্র দ্বৈত বলেন নি।[৫]

শৈব-সিদ্ধান্ত বা তামিল-শৈব মত—শৈবদর্শনের একটি শাখা বা সম্প্রদায় শৈব-সিদ্ধান্ত বা তামিল-শৈব মত। এই মতের মূল অষ্টাবিংশতি শৈবাগম। আগমগুলি সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং তামিলাদি স্থানীয় ভাষায় লিখিত।[৬] কৌণ্ডিণ্য আগমশব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন মহেশ্বর থেকে আরম্ভ করে গুরুপরম্পরায় আগত শাস্ত্র আগম।[৭]

শিবপুরাণমতে[৮] আগম দ্বিবিধ—শ্রৌত এবং অশ্রৌত। অশ্রৌত কামিকাদি অষ্টাবিংশতি আগম। এইগুলিকে সিদ্ধান্তও বলা হয়। এইজন্যই আলোচ্য মতকে শৈব-সিদ্ধান্ত বলা হয়। এই মতের গ্রন্থাদি প্রধানতঃ তামিল ভাষায় রচিত বলে এবং তামিল দেশে এই মতের প্রচলন বলে একে তামিল-শৈব মতও বলা হয়।

নায়নার—দক্ষিণ ভারতে শৈব ধর্মের প্রাবল্য দেখা যায় নায়নার বলে পরিচিত শৈব সাধকদের সময় (সপ্তম খৃঃ শতক থেকে এয়োদশ খৃঃ শতক)। এদের মধ্যে অপ্পর,

১ ত প্র ২।১-৩-এর শ্রীকুমারকৃত ব্যাখ্যা ২ ঐ ২।৭ এবং ব্যাখ্যা ৩ দ্রঃ ঐ ২।৮, ৯

৪ ঐ ২।৭-এর ব্যাখ্যা ৫ H. I. Ph., Vol. V, p. 160 ৬ Ibid, p. 15

৭ আগমো নাম আমহেশ্বরাৎ গুরুপারম্পর্যাগতং শাস্ত্রম্। পা সূ ১।১-এর ভাষ্য।

৮ শি পু, বায় সং, পূ ভা, ২৮।১১-১২

তিরুজ্ঞান সম্বন্ধ, সুন্দরমূর্তি এবং মাণিক্কবাশগর শৈব ধর্মের মহান্ আচার্য বলে সম্মানিত। এঁদের বলা হয় সময়াচার্য। এঁরা কিন্তু শৈব-সিদ্ধান্ত মতকে দর্শনরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে-চেষ্টা করেন নি। এ কাজ করেন এঁদের পরবর্তী আচার্যেরা। এই আচার্যেরা সন্তানাচার্য নামে পরিচিত। মেকণ্ডদেব, অরুণন্দি-শিবাচার্য, মরই-জ্ঞান সম্বন্ধ এবং উমাপতি-শিবাচার্য এঁদের মধ্যে সবিশেষ প্রসিদ্ধ। মেকণ্ডদেবের 'শিবজ্ঞানবোধম্' (ত্রয়োদশ খৃঃ শতক) নামক গ্রন্থকে শৈব সিদ্ধান্ত মতের ভিত্তি মনে করা হয়। দ্বাদশ সূত্রে সমাপ্ত এই গ্রন্থের বার্তিক রচনা করেছেন মেকণ্ডদেব নিজেই। আচার্য অরুণন্দির 'শিবজ্ঞানসিদ্ধিয়ার' শৈব-সিদ্ধান্ত মতের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। মরই-জ্ঞান-সম্বন্ধের শিষ্য উমাপতি-শিবাচার্য এই মতের ব্যাখ্যা করে বিবিধ গ্রন্থ রচনা করেছেন।[১] শৈব-সিদ্ধান্ত মতের আরও দুজন খ্যাতনামা গ্রন্থকার নম্বি-আণ্ডার-নম্বি এবং সেক্কিলার। প্রথমোক্ত ব্যক্তি পূর্বোক্ত চার জন সময়াচার্য এবং অন্যান্য শৈব কবি ও মনীষীদের রচনার একখানি সংকলনগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থখানিকে তামিল-বেদ বলা হয়। সেক্কিলারের গ্রন্থ 'পেরিয়পুরাণম্'। এতে নায়নারদের জীবনী আলোচিত হয়েছে।

প্রধান তত্ত্ব—তত্ত্বপ্রকাশাদিতে ব্যাখ্যাত শৈবাগমমূলক শৈব দর্শনের সঙ্গে শৈব-সিদ্ধান্ত মতের বহু মিল আছে। এই মতেরও প্রধান তত্ত্ব পতি, পশু এবং পাশ।

পতি শিব। শিব বিশ্বরূপ এবং বিশ্বাতীত; মূর্ত এবং অমূর্ত; নির্মল এবং নির্গুণ অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত। সৃষ্ট্যাদিব্যাপারে শিব হেতুকর্তা; তাঁর শক্তি নিমিত্ত-কারণ আর মায়া উপাদান-কারণ। শিব মায়া থেকে জগতের সৃষ্টি করেন তাঁর শক্তির দ্বারা। এই শক্তি না থাকলে জগৎসৃষ্টি অসম্ভব হত।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে শৈব-সিদ্ধান্তীরা শিবের অবতার স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন কর্ম ছাড়া অবতার হয় না। শিবের কর্ম নাই। কাজেই শিবের অবতারও নাই। জীবের মতো তিনি শরীর ধারণ করেন না। তবে ভক্তকে অনুগ্রহ করার জন্য তিনি মূর্তি ধারণ করেন। ভক্ত তাঁকে যে-মূর্তিতে আরাধনা করেন তিনি সেই মূর্তি ধারণ করেন, কিংবা জীবাত্মাকে মুক্ত করবার জন্য যে-মূর্তি প্রয়োজন সেই মূর্তি ধারণ করেন।[২]

এ ব্যাপারে এঁদের সঙ্গে শাক্তদের মিল আছে। শাক্তরাও সাধারণতঃ দেবীর অবতার স্বীকার করেন না। তবে সাধকের হিতের জন্য তাঁর বিভিন্ন মূর্তি স্বীকার করেন।

আবার পূর্ব কথার ফিরে আসা যাক। শৈব-সিদ্ধান্তীদের মতে মায়া অচিৎ। কাজেই

---

১ Saiva Siddhānta, H. Ph. E. W., pp. 370, 379

২ H. Ph. E. W., p. 378

মায়া স্বধর্ম পালন করতে পারে না। মায়া শিবের পরিগ্রহ-শক্তি, স্বাভাবিকী শক্তি নয়।[১] মায়া শিব থেকে ভিন্ন বলে অচিৎ। শিব স্বীয় চিৎশক্তির দ্বারা মায়াকে স্বধর্ম পালনে সক্ষম করেন। চিৎশক্তিপ্রেরিত মায়া জগদুপাদান তত্ত্বসমূহ প্রসব করে।[২]

শৈব-সিদ্ধান্তীরা তত্ত্বোৎপত্তির দুটি ক্রম স্বীকার করেন—একটি শুদ্ধ অপরটি অশুদ্ধ। এইজন্য এঁদের মতে মায়াও শুদ্ধাশুদ্ধভেদে দ্বিবিধ।[৩] আণবমল- ও কর্মমল-মুক্ত মায়া শুদ্ধ আর এই দুই মলযুক্ত মায়া অশুদ্ধ।

মল—এখানে উল্লেখ করা যায় শৈব-সিদ্ধান্ত-মতানুসারে মল এবং পাশ সমার্থক। সিদ্ধান্তীরা সাধারণতঃ তিনটি মল বা পাশ স্বীকার করেন। যথা—আণবমল, কর্ম এবং মায়া। পাশুপত মতে যাকে মল নামক পাশ বলা হয়েছে এঁরা তাকেই বলেন আণবমল। পাশুপত মতের কর্ম- এবং মায়া-পাশ আর এঁদের কর্ম- এবং মায়া-মল একই।

তত্ত্বোৎপত্তি—শৈব-সিদ্ধান্ত মতে শুদ্ধ মায়াকে মহামায়াও বলা হয়। শিব স্বয়ং স্বীয়শক্তির দ্বারা শুদ্ধমায়ার প্রেরক। শিবশক্তি-প্রেরিত শুদ্ধমায়া থেকে উদ্ভূত হয় নাদ, বিন্দু, সাদাখ্য, মাহেশ্বরী এবং শুদ্ধবিদ্যা এই পাঁচটি তত্ত্ব। শিবশক্তি জ্ঞান-ক্রিয়া-ইচ্ছাত্মিকা। শুদ্ধ মায়ার উপর জ্ঞানশক্তির ক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত হয় নাদতত্ত্ব। নাদতত্ত্ব শিবতত্ত্ব। শিবতত্ত্ব আর শিব কিন্তু এক নয়। শিব বা তাঁর স্বাত্মশক্তি পরা শক্তি অপরোক্ষভাবে কোনো তত্ত্বের কারণ হতে পারেন না।[৪]

নাদতত্ত্বের উপর ক্রিয়াশক্তির ক্রিয়ার ফলে বিন্দুতত্ত্বের উদ্ভব ঘটে। বিন্দুতত্ত্ব শক্তিতত্ত্ব। শক্তিতত্ত্ব আর শক্তি এক নয়।[৫] জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি সমভাবে বিন্দুতত্ত্বের উপর ক্রিয়া করলে তার ফলে উদ্ভূত হয় সাদাখ্যতত্ত্ব। সাদাখ্যতত্ত্বের উপর যখন জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি বিষমভাবে ক্রিয়া করে এবং ক্রিয়াশক্তির প্রাধান্য হয় তখন উদ্ভূত হয় মাহেশ্বরীতত্ত্ব। মাহেশ্বরীতত্ত্বের উপর জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির ক্রিয়ায় যদি জ্ঞানশক্তির প্রাধান্য হয় তা হলে শুদ্ধবিদ্যাতত্ত্বের উদ্ভব হয়। শুদ্ধ মায়া থেকে উদ্ভূত এই পাঁচটি তত্ত্বকে বলা হয় শিবতত্ত্ব বা প্রেরককাণ্ড।[৬] শুদ্ধ মায়া থেকে এইভাবে অর্থপ্রপঞ্চের সৃষ্টি হয়।

শব্দপ্রপঞ্চ—আবার শুদ্ধ মায়া থেকে শব্দপ্রপঞ্চেরও সৃষ্টি হয়। শব্দ চতুর্বিধ—পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা এবং বৈখরী। বৈখরী আবার দ্বিবিধ—স্থূল এবং সূক্ষ্ম। স্থূল বৈখরীশব্দের

১ Philosophy of Śaivism, C. Her. I., S. R. C. M. Vol. II, p. 40

২ Śaiva-Siddhānta, H. Ph. E. W., p. 374 ৩ Ibid

৪ Philosophy of Śaivism, C. Her. I., S. R. C. M. Vol. II, p. 40

৫ Ibid, p. 41

৬ Śaiva-Siddhānta, H. Ph. E. W., p. 374

অধিষ্ঠান শুদ্ধবিদ্যাতত্ত্ব এবং সূক্ষ্ম বৈখরীশব্দের ঈশ্বর-(মাহেশ্বরী) তত্ত্ব। মধ্যমার অধিষ্ঠান সদাশিব-(সাদাখ্য)তত্ত্ব, পশ্যন্তীর শক্তি-(বিন্দু)তত্ত্ব এবং পরাশব্দের অধিষ্ঠান শিব-(নাদ)তত্ত্ব।[১]

পঞ্চ কঞ্চুক ও পঞ্চ ক্লেশ—অশুদ্ধ মায়া থেকে অর্থপ্রপঞ্চের অন্য তত্ত্বগুলির উদ্ভব হয়। অশুদ্ধ মায়ার প্রেরক শিব নন, প্রেরক সদাশিব ও রুদ্র। সদাশিব স্বীয় শক্তির দ্বারা অশুদ্ধ মায়া থেকে কাল, নিয়তি, কলা এই তিন তত্ত্বের এবং কলা থেকে বিদ্যা ও রাগ এই দুই তত্ত্বের উদ্ভব ঘটান। এই পাঁচটি তত্ত্বকে আত্মার পঞ্চ কঞ্চুক বলা হয়। পঞ্চকঞ্চুকযুক্ত এবং পঞ্চক্লেশযুক্ত আত্মাকে বলা হয় পুরুষতত্ত্ব। পঞ্চ ক্লেশ বলতে বুঝায় অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ। এই গুলিকে পুংস্ত্বমলও বলে।

বিদ্যাতত্ত্ব—কলা থেকেই রুদ্র স্বীয় শক্তির দ্বারা পুরুষতত্ত্বের প্রতিরূপ প্রকৃতিতত্ত্বের উদ্ভব ঘটান। পঞ্চ কঞ্চুক এবং প্রকৃতি এই সাতটি তত্ত্বকে বিদ্যাতত্ত্ব বা ভোজয়িতৃকাও বলা হয়।[২]

অব্যক্ত প্রকৃতি[৩] থেকে চিত্ত এবং বুদ্ধি, আর বুদ্ধি থেকে অহংকারের উদ্ভব হয়। অহংকার ত্রিগুণভেদে ত্রিবিধ। সাত্ত্বিক অহংকারকে বলা হয় তৈজস, রাজসিক অহংকারকে বৈকৃত এবং তামসিক অহংকারকে ভূতাদি।[৪]

তৈজস অহংকার থেকে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মনের উদ্ভব হয়। বৈকৃত অহংকার থেকে পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং ভূতাদি অহংকার থেকে পঞ্চ তন্মাত্র উদ্ভূত হয়। পঞ্চ তন্মাত্র থেকে উদ্ভূত হয় পঞ্চ মহাভূত।[৫]

শৈব-সিদ্ধান্তীরাও জীবের সকল, প্রলয়াকল এবং বিজ্ঞানাকল এই তিনটি ভেদ স্বীকার করেন। এঁরা জীবের ত্রিবিধ অবস্থার কথাও বলেন। সকলের সকলাবস্থা, প্রলয়াকলের কেবলাবস্থা এবং বিজ্ঞানাকলের শুদ্ধাবস্থা।[৬]

মল-পরিপাক হলে জীবের উপর শিবের শক্তিনিপাত হয়। তখন শিব জীবের কাছে আত্মপ্রকাশ করেন এবং তাকে মোক্ষদায়ক জ্ঞান দেন। বিজ্ঞানাকলের কাছে তিনি তারই অন্তর্জ্যোতিরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। প্রলয়াকলের কাছে শিব দেখা দেন অতিপ্রাকৃত রূপ

১ Philosophy of Śaivism, C. Her. I., Ś. R. C. M. Vol. II, p. 41

২ Śaiva-Siddhānta, H. Ph. E. W., pp. 374-375

৩ শৈব-সিদ্ধান্ত মত অনুসারে প্রকৃতি অনিত্য (transient)। প্রত্যেক পুরুষের প্রকৃতি ভিন্ন। কাজেই প্রকৃতি অনেক।—দ্রঃ Bhāskarī, Vol. III, Intro., p. CIV

৪ Śaiva-Siddhānta, H. Ph. E. W., p. 375

৫ Ibid ৬ Ibid. p. 377

ধারণ করে আর সকলের কাছে আসেন মানব গুরুরূপে। দৃষ্টিদীক্ষা, স্পর্শদীক্ষা প্রভৃতি কোনো দীক্ষা দিয়ে তিনি জীবকে শিবত্ববোধক্ষম করে দেন। এরই নাম মোক্ষ।[১]

শৈব-সিদ্ধান্তীরা মোক্ষ বা মুক্তির চারটি প্রকারভেদ স্বীকার করেন। যথা—সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য এবং সাযুজ্য। সাযুজ্যমুক্তিই চরম মুক্তি। এরই নাম শিবত্বপ্রাপ্তি। জীব স্বরূপতঃ শিবত্বযুক্ত, শিবস্বভাব। মল দূর হয়ে গেলেই জীব স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয় অর্থাৎ শিবস্বভাবপ্রাপ্ত হয়। এরই নাম শিবত্বপ্রাপ্তি। শিবত্বপ্রাপ্তি অর্থ শিবের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া নয়। সিদ্ধান্তীদের মতে জীব ও শিবের সম্বন্ধ অদ্বৈত। কিন্তু এঁদের অদ্বৈত অর্থ অভেদ নয়, অনন্যত্ব। অর্থাৎ এঁরা বলেন মোক্ষাবস্থায়ও জীবের শিব থেকে ভিন্ন অস্তিত্ব থাকে, স্বভাবের দিক্ দিয়ে শিবের সঙ্গে তার কোনো পার্থক্য থাকে না।

বদ্ধ জীবের থাকে পশুদৃষ্টি। অর্থাৎ বদ্ধ জীব পশুর দিক্ থেকে দেখে। আর মুক্ত জীবের দৃষ্টি পতিদৃষ্টি অর্থাৎ তিনি শিবের দিক্ থেকে দেখেন।[২]

পতিদৃষ্টিযুক্ত মুক্ত জীবের প্রারব্ধ কর্ম শেষ না হওয়া পর্যন্ত আধিভৌতিক দেহ থাকে। এ রকম অবস্থায় তাঁকে বলা হয় জীবন্মুক্ত। জীবন্মুক্তদের পালনীয় কোনো বিধিনিষেধ নাই।

শৈব-সিদ্ধান্ত বা তামিল-শৈব মত দ্বৈত। এই মতেও দেখা গেল শক্তিকে অতি গৌরবের স্থান দেওয়া হয়েছে।

শ্রীকণ্ঠ শিবাচার্যের শৈব দর্শন—শৈব দর্শনের বিভিন্ন প্রকারভেদ আছে। তার মধ্যে শ্রীকণ্ঠ-ব্যাখ্যাত মত অন্যতম। শ্রীকণ্ঠ বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করে তাঁর মত প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং এই ব্যাপারে তিনি কতকগুলি শৈবাগমের অনুসরণ করেছেন।[৩] তবে তাঁর মতের প্রধান ভিত্তি উপনিষদ্।[৪]

শিব—শ্রীকণ্ঠ-দর্শনের শিব সগুণ ব্রহ্ম, বৈয়ক্তিক ঈশ্বর। তিনি অহং-পদার্থ, সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, পরমাত্মা। বিশ্বোত্তীর্ণ আবার ভৌতিক বিশ্বের উপাদান-কারণ। তবে অপ্পয়দীক্ষিতের মতে শিব বিশ্বরূপে রূপান্তরিত হন না, হন তাঁর শক্তি।[৫] শ্রীকণ্ঠ বলেন শিব নিজশক্তির ভিত্তির উপর নিখিলজগজ্জালচিত্র নির্মাণ করেন।[৬]

শক্তি—শ্রীকণ্ঠের মতে শিবের শক্তি উমা পরমপ্রকৃতিরূপা পরা শক্তি, তিনি প্রণব।[৭]

ব্রহ্মকে শ্রীকণ্ঠ বলেছেন পরম শিব। ব্রহ্মের নিরতিশয়-জ্ঞান-আনন্দাদি-শক্তিকে নিয়েই

১ Śaiva-Siddhānta, H. Ph. E. W., p. 378

২ Philosophy of Śaivism, C. Her. I., Ś. R. C. M. Vol. II, p. 44

৩ H. I. Ph., Vol. V, p. 66   ৪ Ibid p. 71   ৫ Ibid, p. 68

৬ নিজশক্তিভিত্তিনির্মিতনিখিলজগজ্জালচিত্রনিকুরম্ব:।—শ্রীকণ্ঠভাষ্যের অবতরণিকা, শ্লোক ২

৭ প্রণবপর্যায়েণোমাশব্দেন পরপ্রকৃতিরূপা পরা শক্তিরুচ্যতে।—ব্রহ্মসূত্রের (৪।৪।২২) ভাষ্য

তাঁর ব্রহ্মত্ব।[১] শ্রীকণ্ঠভাষ্যের টীকাকার অপ্পয়দীক্ষিত কথাটা অন্যভাবে বলেছেন। তিনি বলেছেন শক্তিশব্দের দ্বারা শিবস্বরূপা পরা শক্তিকে বুঝায়।[২] অর্থাৎ শিবের শিবত্বই তাঁর পরা শক্তি। পরা শক্তি ও পর শিবের মধ্যে কোনো ভেদ নেই, যেমন চাঁদ চাঁদনীর মধ্যে কোনো ভেদ নেই তেমনি। শ্রীকণ্ঠের মতে কিন্তু শক্তি শিব থেকে অভিন্নও বটে, ভিন্নও বটে।[৩]

শক্তি দ্বিবিধ—চিৎশক্তি ও জড়শক্তি। শিবনিয়মিত চিৎশক্তি ও জড়শক্তি চেতনাচেতন প্রপঞ্চরূপে পরিণত হন।[৪] শ্রীকণ্ঠ বলেন চিদচিৎপ্রপঞ্চরূপ-শক্তিবিশিষ্টত্ব ব্রহ্মের বা শিবের পক্ষে স্বাভাবিক।[৫] অর্থাৎ চিৎশক্তি ও জড়শক্তি শিবের স্বাভাবিক শক্তি। এই দুই শক্তিকে শিবের গুণও বলা যায়।[৬]

উপনিষদে ব্রহ্মকে বলা হয়েছে আকাশশরীর।[৭] শ্রীকণ্ঠের মতে এই আকাশ চিদাকাশ। অপ্পয়দীক্ষিত কূর্মপুরাণের বচন উদ্ধৃত করে বলেছেন এখানে আকাশ অর্থ চিৎশক্তি।[৮] কাজেই চিৎশক্তিই ব্রহ্মের শরীর। এই চিৎশক্তি সর্ববস্তুতে পরিব্যাপ্ত; বিশ্বসৃষ্টিতে এঁরই রূপান্তর হয়। পূর্বে যে সৃষ্টিরূপে শিবশক্তির রূপান্তরের কথা বলা হয়েছে ইনিই সেই শক্তি। এই শক্তি আদি প্রাণশক্তি।[৯]

জড়শক্তি মায়া।[১০] মায়া প্রকৃতি।[১১] প্রকৃতি জড়বিশ্বের উপাদান-কারণ। মহেশ্বর মায়ী।[১২] শ্রীকণ্ঠের মতে মহেশ্বর যখন মায়ী তখন মায়া ঈশ্বরাত্মিকা।[১৩] এর অর্থ মায়া শিবে নিত্য-অধিষ্ঠিতা বা শিব নিত্য-মায়াযুক্ত। তা হলে ত শিবকেও পরোক্ষভাবে বিশ্বের উপাদান কারণ বলতে হয়।[১৪]

---

১ নিরতিশয়জ্ঞানানন্দাদিশক্তিমহিমাতিশয়বৰং হি বৃহত্বম্।—ব্র সূ ১।১।১-এর ভাষ্য, প্রথমসম্পুট, পৃঃ ৮৯

২ শক্তিশব্দেন শিবস্বরূপা পরা শক্তিরুচ্যতে।—ব্র সূ ২।২।৩৮-এর শিবার্কমণিদীপিকা।—
দ্রঃ শ্রীকণ্ঠাচার্যকৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, দ্বিতীয়সম্পুট, পৃঃ ১১০

৩ Bhāskarī, Vol. III, Intro., p. CLIV

৪ ব্র সূ ১।১।১-এর শিবার্কমণিদীপিকা।—দ্রঃ শ্রীকণ্ঠাচার্যকৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, প্রথমসম্পুট, পৃঃ ৬৮

৫ চিদচিৎপ্রপঞ্চরূপশক্তিবিশিষ্টত্বং স্বাভাবিকমেব ব্রহ্মণঃ।—ব্র সূ ১।১।২-এর ভাষ্য

৬ H. I. Ph., Vol. V, p. 76   ৭ আকাশশরীরং ব্রহ্ম।—তৈ উপ ১।৬।২

৮ যত্র সা পরমা দেবী শক্তিরাকাশসংজ্ঞিতা।—ব্র সূ ১।১।২-এর শিবার্কমণিদীপিকা।—দ্রঃ শ্রীকণ্ঠাচার্যকৃত
ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, প্রথমসম্পুট, পৃঃ ১২৩

৯ H. I. Ph., Vol. V, p 82

১০ ব্র সূ ১।১।১-এর শিবার্কমণিদীপিকা।—দ্রঃ শ্রীকণ্ঠাচার্যকৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, প্রথমসম্পুট, পৃঃ ৬৮

১১ শ্বে উপ ৪।১০   ১২ ঐ   ১৩ ব্র সূ, ১।১।২-এর ভাষ্য   ১৪ H. I. Ph., Vol. V, pp. 82-83

শ্রীকণ্ঠ বলেন সূক্ষ্ম-চিদচিদ্-বিশিষ্ট ব্রহ্ম (শিব) কারণ এবং স্থূল-চিদচিদ্-বিশিষ্ট ব্রহ্ম তাঁর কার্য।[১] তিনি কথাটার ব্যাখ্যা করে বলেছেন অন্তঃস্থিত অর্থাৎ নিজের মধ্যে সঙ্কুচিত চিদাত্মা শিব সূক্ষ্মরূপে কারণ। তিনি ইচ্ছা করে অন্য উপাদানের অপেক্ষা না করে অর্থাৎ স্বয়ং উপাদান হয়ে অর্থজাত অর্থাৎ বিষয়সমূহ প্রকাশ করেন। এর অর্থ দাঁড়ায় পরম কারণ পরব্রহ্ম শিব থেকে কার্যরূপ জগৎ অভিন্ন।[২]

শ্রীকণ্ঠ বলতে চান তিনি ব্রহ্মকে পরম উপাদান-কারণ বলেছেন এই অর্থে যে, যে-প্রকৃতি থেকে বিশ্বের উদ্ভব সেই প্রকৃতি নিজে ব্রহ্মে অধিষ্ঠিত। আর যেহেতু ব্রহ্ম বা শিব তাঁর শক্তিরহিত হয়ে থাকেন না সেইজন্য তাঁকে জগতের উপাদান-কারণ বলা যায়। এর অর্থ এই নয় যে শিব স্বয়ং জগদ্রূপে পরিণত হন, তিনি বিশ্বোত্তীর্ণ। তাঁর মায়াই জগতের উপাদান কারণ, তাই জগদ্রূপে পরিণত হয়।[৩] শ্রীকণ্ঠের মত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।[৪]

শ্রীপতি পণ্ডিতের শৈব দর্শন— শ্রীপতিও ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করে তাঁর মত প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রীপতির ভাষ্যের নাম শ্রীকরভাষ্য। এই ভাষ্যকে বীরশৈব মতের দার্শনিক ভিত্তি মনে করা হয়।[৫]

শিব ও সৃষ্টি— শ্রীপতির মতে শিব তাঁর শক্তিকে প্রসারিত করে জগৎসৃষ্টি করেন। জগৎ শিবস্বভাব। শ্রীকণ্ঠের মতো শ্রীপতিও শিবকে জগতের উপাদান-কারণ মনে করেন।[৬] তাঁর মতে শিব নিরাকার এবং সাকার। তিনি কোনো বাহ্যকরণের অপেক্ষা না করেই সৃষ্টি করতে পারেন। আর ভক্তকে অনুগ্রহ করার জন্য জমাট ঘিয়ের মতো তিনি দিব্যমঙ্গল-মূর্তি ধারণ করেন।[৭]

শিব জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ উভয়ই। কেন না, শিবের অংশমাত্র জগদ্রূপে রূপান্তরিত হয়। শ্রীপতির মতে নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ অভিন্ন কিন্তু এক নয়।[৮]

শিব নির্গুণ এবং সগুণ। শ্রীপতি বলেন সৃষ্টির পূর্বে শক্তিসঙ্কোচহেতু শিব বা ব্রহ্ম নির্গুণ। তখন কেবল মাত্র শিব থাকেন আর কিছু থাকে না। এই শিব সশক্তি শিব। শিবের এই শক্তি পরা শক্তি। সৃষ্টির পূর্বে জগৎ প্রপঞ্চ পরা শক্তিতে অবস্থিত থাকে।

১ ব্র সূ ১।১।২-এর ভাষ্য ২ ঐ ২।১।১৮-এর ভাষ্য ৩ H. I. Ph., Vol. V, p. 84

৪ ভেদাভেদকল্পনং বিশিষ্টাদ্বৈতং সাধয়ামঃ।—ব্র সূ ২।১।২২-এর ভাষ্য

৫ H. I. Ph., Vol. V, p. 178

৬ ব্র সূ ১।১।১-এর ভাষ্য।—দ্রঃ শ্রীকরভাষ্য, দ্বিতীয়ভাগ, পৃঃ ৬

৭ ব্র সূ, ১।১।২-এর ভাষ্য।—দ্রঃ শ্রীকরভাষ্য, দ্বিতীয়ভাগ, পৃঃ ৩০ ৮ ঐ

এই শক্তি বা শক্তিরূপী শিব জগতের উপাদান-কারণ আর শিবরূপী শিব নিমিত্ত-কারণ অর্থাৎ কর্তা।[১] শিব স্বীয় শক্তি প্রসারিত করে নিজের মধ্য থেকেই জগৎ সৃষ্টি করেন; যেমন করে মাকড়সা তার নিজের মধ্য থেকেই জাল বিস্তার করে তেমনি করেই করেন।

শিবের শক্তি শিব থেকে অভিন্ন। শ্রীপতি শক্তিশক্তিমানের অভেদ স্বীকার করে বলেন শিব একাধারে শক্তি ও শক্তির অধিষ্ঠান; শক্ত্যাত্মক এবং শক্তির অধিপতি।[২] শিব ও শক্তির সম্বন্ধ তাদাত্ম্যসম্বন্ধ। চুম্বক এবং তার আকর্ষণীশক্তির, বহ্নি এবং তার দাহিকাশক্তির যে-সম্বন্ধ শিব এবং শক্তিরও সেই সম্বন্ধ। শিব এবং শক্তির এই অভেদ শ্রীপতিব্যাখ্যাত বীরশৈব-দর্শনের কেন্দ্রীয় তত্ত্ব।[৩]

শিবের শক্তি চেতনাচেতনজগৎপ্রপঞ্চরূপে রূপান্তরিত হন। কাজেই শুধু চেতন নয়, অচেতন বস্তুরও অধিষ্ঠান শিব; চেতন অচেতন উভয়ই শিবের রূপ। তাই শ্রীপতির মতে শিবের চিন্ময় এবং ভৌতিক উভয়বিধ রূপের আরাধনা করলে পরে মোক্ষলাভ হবে।

মোক্ষলাভ হয় ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হলে। শ্রীপতি বলেন শুধু উপনিষদাদি অধ্যয়ন করলে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয় না। তার জন্য চাই শিবের এবং গুরুর অনুগ্রহ।[৪] জ্ঞান ও ভক্তির পথে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়।

শ্রীপতির মতে মোক্ষাবস্থায় জীব শিবে মিশে যায়; যেমন করে নদী মিশে যায় সমুদ্রে তেমনি করে মিশে যায়।

শ্রীপতিও জীবন্মুক্তের কথা বলেছেন। তাঁর মতে সাধক যখন সাধনমার্গে এতটা অগ্রসর হয়ে যান যে তাঁর পক্ষে আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম-পালন বা সমাধিমগ্ন হওয়া প্রভৃতি কোনো কিছুরই প্রয়োজন হয় না তখন তিনি জীবন্মুক্ত হন। এই জীবন্মুক্ত অবস্থায় তিনি প্রাকৃত শরীরে অবস্থান করবেন কি না এটা তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।[৫]

শ্রীপতির মতকে এক রকমের ভেদাভেদবাদ বলা যায়[৬]। একে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বা বিশেষাদ্বৈতবাদ বা সগুণব্রহ্মবাদও বলা হয়।[৭] আবার কেউ কেউ একে শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদও বলেন।[৮]

প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন—মাধবাচার্য যাকে প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন বলেছেন বর্তমানে তা কাশ্মীর

---

১ ব্র সূ ১।১।৭-এর ভাষ্য।—দ্রঃ শ্রীকরভাষ্য, দ্বিতীয়ভাগ, পৃঃ ১৩৪-৩৬; Bhāskari, Vol. III, pp. CLXXIII-CLXXIV

২ ব্র সূ ১।১।৪-এর ভাষ্য।—দ্রঃ শ্রীকরভাষ্য, দ্বিতীয়ভাগ, পৃঃ ৪৫

৩ H. I. Ph., Vol. V, p. 184. ৪ H. I. Ph., Vol. V, p. 182

৫ Ibid., pp. 189-190 ৬ Ibid., p. 188

৭ Bhāskari, Vol III, Intro., p. CLXI ৮ H. Ph. E.W., p. 398

শৈব মত এই সাধারণ নামে পরিচিত। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে প্রত্যভিজ্ঞা ভিন্ন ক্রম এবং কুল এই দুটি অদ্বৈত শৈব মতও কাশ্মীর শৈব মতের অন্তর্ভুক্ত।[১]

প্রত্যভিজ্ঞার সংজ্ঞা—ঈশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞা নামক গ্রন্থে প্রত্যভিজ্ঞার সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয়েছে এইভাবে—অনাত্মবস্তুপ্রতিকূল আত্মাভিমুখী যে-জ্ঞান তাই প্রকাশ, তাই প্রত্যভিজ্ঞা।[২] সহজ কথায় বলা যায় আমি ঈশ্বর, অন্য কেউ নয়, এই প্রকার যে-সাক্ষাৎকার অর্থাৎ অপরোক্ষ অনুভব তাকে বলে প্রত্যভিজ্ঞা।[৩]

প্রত্যভিজ্ঞার ব্যাখ্যা—কৌলমার্গরহস্যে বিষয়টির ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে অনুভব ও অনুভবমূলক জ্ঞান ত্রিবিধ—অনুভব, স্মৃতি এবং প্রত্যভিজ্ঞা। ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ জন্য সম্যক্ জ্ঞানের নাম অনুভব বা প্রত্যক্ষ। যেমন সম্মুখবর্তী ঘট প্রত্যক্ষ করলে 'এই ঘট' ইত্যাকার ঘটবিষয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা অনুভব হয়। কোনো বস্তু প্রত্যক্ষ করলে মনে তার বাসনা থাকে, এই বাসনার নাম সংস্কার। উদ্বোধক বস্তুর দর্শনাদিতে সেই সংস্কার উদ্বুদ্ধ হলে পূর্বানুভূত বস্তুর স্মরণ হয় এরই নাম স্মৃতি। পূর্বানুভূত বিষয়ের সংস্কার ও প্রত্যক্ষ উভয়ে মিলে যে-জ্ঞান জন্মায় তাকেই বলে প্রত্যভিজ্ঞা। যেমন পূর্বে একটি ঘট দেখেছিলাম, তার সংস্কার আমার অন্তঃকরণে আছে আবার সেই ঘটটি দেখে পূর্বে যে-ঘটটি দেখেছিলাম এটি সেই ঘট এমনি জ্ঞান হয়, এরই নাম প্রত্যভিজ্ঞা। অবিদ্যাবদ্ধ জীব নিজের শিবত্ব বিস্মৃত হয়ে অণুত্ব লাভ করে; পরে সাধনার দ্বারা অবিদ্যাপাশ ছিন্ন করে আবার শিবত্ব লাভ করে এবং সোঽহম্ আমি সেই শিব, এই প্রত্যভিজ্ঞা লাভ করে।[৪]

বিভিন্ন নাম—এই প্রত্যভিজ্ঞা যে-দর্শনের অন্যতম আলোচ্য বিষয় তারই নাম হয়ে যায় প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন। একে স্পন্দবাদও বলা হয়। আবার স্বাতন্ত্র্যবাদ, আভাসবাদ এবং ত্রিক নামেও এই দর্শন পরিচিত।[৫]

এই মতের গ্রন্থাদিতে ত্রিকশাসন, ত্রিকশাস্ত্র, বা শুধু ত্রিক নামেই মতটির পরিচয় দেওয়া হয়েছে। কুল-মতকেও ত্রিক বলা হয় আবার একে ষড়র্ধশাস্ত্রও বলা হয়।[৬]

ষড়র্ধ শাস্ত্র—কাশ্মীর শৈবমতে (কুল-মতে) দেবনাগরী বা সারদালিপি জ্ঞানের উদয়ক্রমের (পরামর্শোদয়ক্রম) দ্যোতক। বর্ণমালার প্রথম ছটি স্বরবর্ণ অ আ ই ঈ উ ঊ যথাক্রমে পরমশিবোদ্ভূতা অনুত্তরশক্তি, আনন্দশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, ঈশনশক্তি, উন্মেষশক্তি

---

১ Abbi., 2nd Ed., p. 295

২ প্রতীপমাত্মাভিমুখ্যেন জ্ঞানং প্রকাশঃ প্রত্যভিজ্ঞা।—ঈ প্র, প্র ভা, পৃঃ ১৯-২০

৩ অহমীশ্বর এব নান্য ইত্যেবং যঃ সাক্ষাৎকারঃ স প্রত্যভিজ্ঞেত্যুচ্যতে।—স হ স, পৃঃ ১৯০, ব্যাখ্যা

৪ কৌ র, পৃঃ ১৩৪-১৩৫, পাদটীকা ৫ H. Ph. E. W., p. 381

৬ Abhi., 2nd Ed.. p. 296

এবং উর্মিশক্তির দ্যোতক।[১] এদের মধ্যে দীর্ঘস্বরত্রয়দ্যোতিত শক্তিত্রয় হ্রস্বস্বরত্রয়দ্যোতিত শক্তিত্রয়ে লীন রয়েছে বলে এই দর্শনে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে এবং সেইজন্য শেষোক্ত শক্তিত্রয়ের অর্থাৎ অনুত্তর, ইচ্ছা এবং উন্মেষ এই তিন শক্তির প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে। ছয়ের অর্ধেকের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে বলে কুল-মতকে বলা হয় ষড়র্ধশাস্ত্র।[২]

ত্রিকদর্শন—অনুত্তর, ইচ্ছা এবং উন্মেষ এই তিন শক্তিকে ত্রিক বলা হয় এবং যথাক্রমে চিৎশক্তি, ইচ্ছাশক্তি এবং জ্ঞানশক্তিও বলা হয়।[৩] আবার পরা, পরাপরা এবং অপরাশক্তিও বলা হয়ে থাকে।[৪] এই পরাদি শক্তিত্রয়বিষয়ক শাস্ত্র ত্রিকশাস্ত্র বা ত্রিকদর্শন।[৫] অবশ্য ত্রিকশব্দের অন্যান্য ব্যাখ্যাও আছে।

অবৈদিক—ত্রিক মত শিবাদ্বয়বাদ। এই মত আগমসম্মত, অবৈদিক। এই মতে দ্বিনবতি আগম স্বীকৃত। তার মধ্যে আবার সিদ্ধা, নামক এবং মালিনী এই তিনখানি আগমকে মুখ্য প্রামাণ্যগ্রন্থ মনে করা হয়।[৬]

শিব—ত্রিকদর্শন অনুসারে পরম শিবের দুই রূপ—বিশ্বময় বা বিশ্বাত্মক এবং বিশ্বোত্তীর্ণ। তাই তাঁকে বলা হয়েছে সর্বাকৃতি এবং নিরাকৃতি।[৭] সর্বাকৃতি বিশ্বময় এবং নিরাকৃতি বিশ্বোত্তীর্ণ।[৮] পরম শিব একই সময়ে কি করে বিশ্বময় এবং বিশ্বোত্তীর্ণ হতে পারেন? আচার্য জয়রথ বিষয়টির ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন দর্পণাদি থেকে ভিন্ন ঘটাদি বস্তু যেমন দর্পণাদিতে প্রতিবিম্বিত হলে দর্পণাদি থেকে অভিন্নরূপে প্রকাশমান হয় তেমনি পরম শিবের ইচ্ছাবশতঃ তাঁর স্বরূপ থেকে ভিন্নরূপে তাঁরই স্বরূপে অবভাসিত স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব তাঁর স্বরূপ থেকে অভিন্নরূপে প্রকাশিত হচ্ছে। এইজন্যই তিনি বিশ্বময় হয়েও বিশ্বোত্তীর্ণ এবং বিশ্বোত্তীর্ণ হয়েও বিশ্বময়।[৯]

পরম শিব বিশ্বময় বা বিশ্বাকৃতি বলে চিৎ ও অচিতের এবং তাদের নানা বৈচিত্র্যের অবভাসক।[১০] সেইজন্য শৈবাগমে শিবের বহুরূপত্বের কথা আছে। আবার বলা হয়েছে

---

১ ত সা, পৃঃ ১২-১৩ ২ Abhi., 2nd Ed ; p. 296

৩ অতঃ ষণ্ণাং ত্রিকং সারং চিদিচ্ছোন্মেষাত্মকম্।—ত আ ৩।১৯১, চিদনুত্তরম্, ইদিতিরিচ্ছা।—ত আ, তু আ, পৃঃ ১৮৬; উন্মেষশক্তি জ্ঞানাখ্যা।—ঐ ৩।২৪৯

৪ অনুত্তরা পরেচ্ছা চ পরাপরতয়া স্থিতা। উন্মেষশক্তি জ্ঞানাখ্যা হ্যপরেতি নিগদ্যতে।—ত আ ৩।২৪৯

৫ ত্রিকং পরাদিশক্তিত্রয়াভিধায়কং শাস্ত্রম্।—ত আ, প্র আ, পৃঃ ১৫০

৬ Abhi., 2nd Ed., pp. 280-95 ৭ ত আ ১।০৬

৮ সর্বাকৃতিঃ বিশ্বময়ঃ নিরাকৃতিঃ বিশ্বোত্তীর্ণঃ।—ত আ, প্র আ, পৃঃ ১০৫

৯ ঐ পৃঃ ১০৪-১০৫

১০ বিশ্বাকৃতিশ্চাচিচ্চিদ্বৈচিত্র্যাবভাসকঃ।—ঐ, পৃঃ ৯৯

ভুবন, বিগ্রহ, জ্যোতি (বিন্দু), খ (ব্যোম), শব্দ (নাদ) এবং মন্ত্র—এই ষড়্‌বিধ রূপ শিবের ধ্যেয় রূপ।[১] এইগুলিকে উপলক্ষণ মনে করতে হবে, কেন না শিব বিশ্বাকৃতি।[২]

আসল কথা, শিবকে যে-সাধক যে-ভাবে ভাবনা করেন তিনি সেইভাবেই তাঁকে প্রাপ্ত হন। কেন না, যিনি যে-ভাবনিষ্ঠ তিনি সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়ে থাকেন।[৩] যেমন কেউ যদি শিবের ভুবনরূপের ধ্যানে নিবিষ্ট হন তা হলে ভুবনতন্ময়তার দ্বারা তিনি ভুবনেশ্বরত্ব লাভ করেন। কিন্তু যেহেতু ভুবনাদি শিবেরই রূপ সেইজন্য ভুবনাদিতন্ময়তার দ্বারা সাধকের শিবাত্মক স্বস্বরূপ লাভই হয় অর্থাৎ মোক্ষ লাভ হয়।[৪]

যাঁরা বোধস্বরূপ পরম শিব থেকে ভিন্নরূপে ইন্দ্রাদি দেবতাকে সেই সেই নামরূপে অর্থাৎ ইন্দ্রাদিরূপে আরাধ্য দেবতা বলে মনে করেন তাঁরাও আপন আপন আরাধ্যকে বোধস্বরূপ থেকে অভিন্ন বলে জানেন।[৫]

তবে কথা হচ্ছে আরাধ্যের প্রাধান্যভাবনার জন্য বস্তুতঃ অনেকেই তা জেনেও জানেন না। অবশ্য যাঁরা আপন আরাধ্যকেই বোধস্বরূপ বলে জানেন তাঁরা পরম শিবকেই প্রাপ্ত হন।[৬]

শক্তি—এই যে ইন্দ্রাদি দেবতার কথা বলা হল শিবের শক্তি থেকেই এঁদের প্রকাশ। শাস্ত্রে আছে পরম শিবের শক্তি থেকেই দেবতাদের প্রকাশ হয়েছে। স্বপ্রকাশা অহংরূপা নিত্যা সংবিৎই উপাসকের দেবতারূপে স্ফুরিত হন।[৭]

মোট কথা, এই দর্শনের অভিমত পরম শিবের বিশ্বময় রূপ তাঁর শক্তিরূপ আর বিশ্বোত্তীর্ণ রূপ তাঁর শিবরূপ।[৮]

প্রকাশ—পরম শিবের বিশ্বময়রূপ প্রকাশবিমর্শময়।[৯] যা প্রকাশিত হয় তা প্রকাশ আবার যা অন্যকে প্রকাশিত করে তাও প্রকাশ। শেষোক্ত বিচারে শিবই প্রকাশস্বরূপ।

---

১ ভুবনং বিগ্রহো জ্যোতিঃ খং শব্দো মন্ত্র এব চ। বিন্দুনাদাদিসংভিন্নঃ ষড়্‌বিধঃ শিব উচ্যতে।
—ত আ, প্র আ পৃঃ ১০০

২ বিশ্বাকৃতিত্বে দেবস্য তদেতচ্চোপলক্ষণম্।—ঐ, পৃঃ ১০৩

৩ যো যদাত্মকতানিষ্ঠস্তদ্ভাবং স প্রপদ্যতে।—ঐ, পৃঃ ১০১ ৪ ঐ, পৃঃ ১০১-১০৩

৫ যে বোধাদ্ব্যতিরিক্তং হি কিঞ্চিদারাধ্যতয়া বিদুঃ।
তেঽপি বেদ্যং বিবিক্তানা বোধাভেদেন মন্বতে।—ঐ, পৃঃ ১০৩-১০৪ ৬ ঐ পৃঃ ১৭০ ১৭১

৭ যেয়া হি দেবতাসৃষ্টিঃ শর্কে হেতোঃ সমুত্থিতা।
অহংরূপা তু সংবিত্তির্নিত্যা স্বপ্রথনাত্মিকা।—ঐ, পৃঃ ১৭২

৮ বিশ্বোত্তীর্ণাৎ শৈবাৎ রূপাৎ...বিশ্বময়াৎ শাক্তাত্মরূপাৎ।—ত আ, তৃ আ, পৃঃ ৮২

৯ Abhi., 2nd Ed., p. 323

কারণ, বস্তুতঃ তিনিই বিশ্বের প্রকাশমানতা প্রদান করেন। আর যিনি প্রকাশস্বরূপ তিনিই সকল বস্তুর প্রকাশত্ব প্রদান করেন।[১]

শ্রুতিতেও আছে তিনি প্রকাশমান বলেই সব প্রকাশিত, তাঁর প্রকাশের দ্বারাই সব কিছু প্রকাশিত হয়।[২]

কাজেই প্রকাশ স্বতন্ত্র, এক, ব্যাপক, নিত্য এবং সর্বাকার-নিরাকারস্বরূপ। প্রকাশই সংবিৎ।[৩]

বিশ্বও প্রকাশাতিরিক্ত আর কিছু নয়।[৪] বস্তুর প্রকাশই তার স্বরূপ।[৫] কাজেই বিশ্বেরও স্বরূপ প্রকাশ।

বিমর্শ—কিন্তু বিমর্শ ছাড়া প্রকাশ নেই।[৬] কেন না, প্রকাশের ধর্মই বিমর্শ। এ কথার অর্থ বিমর্শই প্রকাশের প্রকাশত্ব বা প্রকাশমানতা। বিমর্শের দ্বারা স্বরূপ সুনির্দিষ্ট না হলে প্রকাশ অসৎ-প্রায় হয়ে যায়। এইজন্য বলা হয়েছে বিমর্শ ব্যতীত প্রকাশের নিজ বা অন্য বস্তুর প্রকাশরূপতায় প্রতিষ্ঠা হয় না।[৭] কাজেই যা প্রকাশের প্রকাশত্ব-প্রতিষ্ঠাপক তাই বিমর্শ অর্থাৎ বিমর্শশক্তি। জড়ের প্রতিষ্ঠাস্থান চেতন, চেতনের প্রতিষ্ঠাস্থান প্রকাশাত্মত্ব এবং প্রকাশাত্মত্বের প্রতিষ্ঠাস্থান বিমর্শশক্তি।[৮]

ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞায় প্রকাশ অর্থাৎ শিবকে বলা হয়েছে বিমর্শসার[৯], বিমর্শশরীর[১০] এবং বিমর্শকে বলা হয়েছে তাঁর প্রধান রূপ।[১১]

বিমর্শশক্তি স্বাতন্ত্র্যশক্তি— বিমর্শশক্তি স্বাতন্ত্র্যশক্তি।[১২] কর্তা স্বতন্ত্র।[১৩] কাজেই স্বতন্ত্রশক্তি কর্তৃত্বশক্তি। স্বাতন্ত্র্যের লক্ষণ অনন্যমুখাপেক্ষিতা। স্বাতন্ত্র্য আত্মার স্বরূপ।[১৪]

---

১ যঃ প্রকাশঃ স সর্বস্য প্রকাশত্বং প্রযচ্ছতি।—ত আ, তৃ আ পৃঃ ২

২ তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।—শ্বে উপ ৬।১৪   ৩ ত সা, পৃঃ ৬

৪ নহি বিশ্বং নাম প্রকাশমানতাত্তত্ত্বাতিরিক্তং কিঞ্চিৎ সম্ভবতি।—ত আ, তৃ আ, পৃঃ ২

৫ সর্বভাবানাং প্রকাশরূপ এব।—ত সা, পৃঃ ৫

৬ নহি নির্বিমর্শঃ প্রকাশঃ সম্ভবতি উপপদ্যতে বা।—ত আ, তৃ আ, পৃঃ ২

৭ প্রকাশো বিমর্শরূপতাং বিনা নার্থস্য আত্মনো
বা প্রকাশরূপতায়াং প্রতিষ্ঠাপকঃ স্যাৎ।—ত আ, প্র আ, পৃঃ ৯৪

৮ ঈ প্র, প্র ভা, পৃঃ ২১১   ৯ স চ প্রকাশো বিমর্শসার ইতি।—ঈ প্র, প্র ভা, পৃঃ ২১৭

১০ বিমর্শশরীর এব প্রকাশো যুক্তঃ।—ঐ, পৃঃ ২১৩, পাদটীকা

১১ বিমর্শ এব প্রধানম্ আত্মনো রূপম্।—ঐ, পৃঃ ২০০

১২ স্বাতন্ত্র্যং হি বিমর্শ ইত্যুচ্যতে।—ত আ, তৃ আ, পৃঃ ৭৩   ১৩ স্বতন্ত্রঃ কর্তা।—পাণিনি ১।৪।৫৪

১৪ স্বাতন্ত্র্যমেব চ অনন্যমুখপ্রেক্ষিত্বলক্ষণম্ আত্মনঃ স্বরূপম্।—ঈ প্র, প্র ভা, পৃঃ ২১৫

ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞার মতে ঐশ্বর্যাত্মিকা বিমর্শরূপা কর্তৃত্বশক্তি সমস্ত শক্তিকে সব দিকে বিক্ষুরিত করেন।[১]

পরম শিব তাঁর বিমর্শশক্তিবলে স্বাতন্ত্র্যহীন নীলাদিবস্তুরূপে এবং স্বাতন্ত্র্যযুক্ত ঈশ্বরাদিরূপে আভাসিত হন।[২] কাজেই ত্রিকমতানুসারে সব পদার্থ ভগবান্ শিবেরই রূপ।[৩]

ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞাতে আছে পরমেশ্বরের বিমর্শশক্তি আত্মার মতো অহংরূপে অখণ্ডভাবে প্রকাশিত হন।[৪]

বিভিন্ন নাম—তবে বিমর্শশক্তি অখণ্ড হলেও মায়াশক্তির দ্বারা ভিন্নরূপে সংবেদ্য এবং জ্ঞান, সংকল্প, অধ্যবসায়, সংশয়, স্মৃতি ইত্যাদি নামে আখ্যাত হন।[৫]

আচার্য অভিনবগুপ্তের মতে মহেশ্বর শিবের বিমর্শশক্তি তাঁর শুদ্ধ অর্থাৎ নিরুপাধিক পারমার্থিক জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি।[৬] শিবের প্রকাশমানতা জ্ঞানশক্তি এবং স্বেচ্ছাবশতঃ জগৎ-নির্মাতৃতা ক্রিয়াশক্তি।

দেখা গেল শিবের বিমর্শক্তিকে তাঁর স্বাতন্ত্র্যশক্তি বলা হয়েছে। এই স্বাতন্ত্র্যশক্তি এক এবং অভিন্ন।[৭] শিবের ইচ্ছাদি বহুশক্তির কথা বলা হলেও তিনি সর্বদা সেই এক স্বাতন্ত্র্য-শক্তিযুক্ত।[৮] এ কথার অর্থ সেই এক স্বাতন্ত্র্যশক্তিই বিভিন্ন অর্থোপাধিযোগে অনন্ত-শক্তিরূপে প্রকাশিত হন।[৯]

ত্রিকমতের বিভিন্ন শাখার দার্শনিকেরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে এই স্বাতন্ত্র্যশক্তিকে বিভিন্ন নাম দিয়েছেন। 'শিবসূত্র'-এ এঁকে বলা হয়েছে চৈতন্য, স্পন্দশাস্ত্রে বলা হয়েছে স্ফুরত্তা বা স্পন্দ, মহাসত্তা এবং পরা বাক্।[১০] আবার এঁকে অহংপ্রত্যবমর্শও বলা হয়েছে।[১১]

পরাশক্তি—পরমেশ্বরের স্বাতন্ত্র্যশক্তিই পরাশক্তি।[১২] অবিকল্পসংবিৎমাত্ররূপা যে-শক্তির

১ সর্বাঃ শক্তীঃ কর্তৃত্বশক্তিঃ ঐশ্বর্যাত্মা সমক্ষিপতি। সা চ বিমর্শরূপা।—ঈ প্র, প্র অা, পৃঃ ২১৪

২ ঐ, পৃঃ ২১৫-২১৭ ৩ যথা সর্বপদার্থানাং ভগবচ্ছিবরূপতা।—শি দৃ, পৃঃ ৯১

৪ পরমেশ্বরশক্তিঃ বিমর্শরূপা আত্মবৎ এব অহমিত্যনবচ্ছিন্নত্বেন ভাতি।—ঈ প্র, প্র অা, পৃঃ ২৩১-২৩১

৫ মায়াশক্ত্যা বিভোঃ সৈব ভিন্নসংবেদ্যগোচরা।
কথিতা জ্ঞানসংকল্পাধ্যবসায়াদিনামভিঃ।—ঐ, পৃঃ ২২২-২২৩

৬ বিমর্শ এব দেবস্য শুদ্ধে জ্ঞানক্রিয়ে যতঃ।—দ্রঃ স প স, পৃঃ ১২৬

৭ তস্য চাভিন্না একৈব স্বাতন্ত্র্যাখ্যা শক্তিঃ।—ত অা, প্র অা, পৃঃ ১৫১

৮ বহুশক্তিত্বমপ্যস্য তচ্ছক্ত্যৈবাবিযুক্ততা।—ত অা, ১।৬৮

৯ ত অা, প্র অা, পৃঃ ১০৮-১০৯ ১০ Abhi., 2nd Ed., p. 829

১১ বস্তুতঃ পুনরপ্যহংপ্রত্যবমর্শাখ্যা স্বাতন্ত্র্যশক্তিরেবাস্তাদি।—ত অা, প্র অা, পৃঃ ১০৮

১২ পরাশক্তি পারমেশ্বরী স্বাতন্ত্র্যশক্তিঃ।—প্র হৃ, পৃঃ ৬৮

দ্বারা পরমেশ্বর শিবাদিক্ষিত্যন্ত বিশ্বকে ভরণ করেন, দর্শন করেন এবং অবভাসিত করেন তিনি তাঁর পরাশক্তি।[১]

এই পরাশক্তিই চিতি বা চৈতন্য বা চিৎ নামে আখ্যাত হয়েছেন। ভগবতী স্বতন্ত্রা চিৎশক্তিই অনন্তজগদ্রূপে স্ফুরিতা।[২] ইনি শিবভট্টারক থেকে অভিন্না।[৩]

শক্তি অসংখ্য—পরম শিবের স্বাতন্ত্র্যশক্তি বা চিতিশক্তিই অনন্তশক্তিরূপে স্ফুরিতা হন। এইজন্যই বলা হয় শিবের শক্তি অসংখ্য।[৪] এই-সব শক্তির নানা নাম ও রূপ। আগম-শাস্ত্রে শক্তির কুল, সামর্থ্য, ঊর্মি, হৃদয়, সার, স্পন্দ, বিভূতি, ত্রীশিকা (ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া এই তিন শক্তির ঈশিকা অর্থাৎ ঈশ্বরী ত্রীশিকা), কালী, কর্ষণী, চণ্ডী, বাণী, ভোগ, দৃক্, নিত্যা ইত্যাদি নাম ব্যবহৃত হয়েছে।[৫]

লক্ষ্য করা গেছে ত্রিকমতে পরম শিবের বিশ্বময়রূপ তাঁর শক্তিরূপ। তাই বলা হয়েছে বিশ্ব শিবের শক্তিপ্রচয়।[৬] আচার্য জয়রথ বলেন জড়াত্মক এবং অজড়াত্মক বিশ্ববৈচিত্র্য, সৃষ্টি স্থিতি সংহার তিরোধান এবং অনুগ্রহ এই পঞ্চকৃত্য, জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এবং তুরীয় এই অবস্থাচতুষ্টয়—এই সবই পরমেশ্বরের শক্তিস্ফুরণ।[৭]

শিব ও শক্তি—পূর্বেই বলা হয়েছে শিবাদ্বয়বাদীরাও শক্তিশক্তিমানের অর্থাৎ শক্তি ও শিবের স্বরূপতঃ ভেদ স্বীকার করেন না।[৮] শিব শক্তিরহিত নন এবং শক্তিও শিবাতিরিক্তা নন।[৯]

শিব শক্ত।[১০] শক্তের শক্তস্বরূপ ধর্ম শক্তি।[১১] বৈশেষিকদর্শনের মতে ধর্মের আশ্রয় ধর্মী কিন্তু শৈবাগমমতে ধর্মরূপা শক্তিসমূহের কোনো আশ্রয় নাই।[১২] কারণ আগমমতে

১ যয়া ইদং শিবাদিধরণ্যন্তম্ অবিকল্পসংবিন্মাত্ররূপতয়া বিভর্তি চ পশ্যতি চ ভাসয়তি চ পরমেশ্বরঃ সা অস্য শ্রীপরাশক্তিঃ।—ত সা, পৃঃ ২৮ ২ প্র হৃ, পৃঃ ৩ ৩ ঐ, পৃঃ ২

৪ শক্তয়শ্চ অস্য অসংখ্যেয়াঃ।—ত সা, পৃঃ ২৮ ৫ ঐ, পৃঃ ২৭-২৮

৬ স্বশক্তিপ্রচয়োঽস্য বিশ্বম্।—শিবসূত্র ৩।৩০ দ্রঃ শিবসূত্রবার্তিকম্, পৃঃ ৭১

৭ এবং যৎকিঞ্চন জড়াজড়াত্মকবিশ্ববৈচিত্র্যং, যচ্চ তদ্বিষয়ং সৃষ্ট্যাদি জাগ্রদাদ্যবস্থাদি বা তৎসর্বং পরমেশ্বরস্য শক্তিস্ফার এব।—ত আ, প্র আ, পৃঃ ১২১

৮ শক্তিশক্তিমতোর্ভেদঃ শৈবে জাতু ন বর্ণ্যতে।—শি দৃ ৩।৩

৯ ন শিবঃ শক্তিরহিতো ন শক্তির্ব্যতিরেকিণী।—ঐ ৩।২

১০ শিবঃ শক্তঃ।—শি দৃ, পৃঃ ৯৬

১১ (ক) শক্তেঃ শক্তস্য শক্তস্বরূপধর্মভূতত্বাৎ।—ঈ প্র, প্র ভা, পৃঃ ২৭৪, পাদটীকা ১

(খ) শক্ত্যাধর্মাঃ শক্তয়ঃ স্যুঃ।—ত আ, প্র আ, পৃঃ ১৯৩

১২ পরমেশ্বরশাস্ত্রে হি ন চ কাণাদদৃষ্টিবৎ। শক্তীনাং ধর্মরূপাণামাশ্রয়ঃ কোঽপি কথ্যতে।—ত আ ১।১৫৮

পূর্ণ স্বতন্ত্র বোধস্বরূপ পরম শিবই সেই সেই উপাধিবশে সেই সেই শক্তিরূপে খ্যাত হন। কাজেই শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে বস্তুতঃ কোনো ভেদ নাই।[১] ভেদটা কল্পিত।

এইজন্য ত্রিকমতাবলম্বীরা স্বতন্ত্র শক্তিস্বরূপ স্বীকার করেন না।[২] এঁদের মতে বিশ্ব শক্তিরূপ হলেও বস্তুতঃ শিবাত্মক।[৩]

শক্তির অন্য ব্যাখ্যা—আলোচ্য দর্শনে শক্তির সংজ্ঞা অন্যভাবেও নির্দেশ করা হয়। ভাব বা সংপদার্থের স্বরূপকেই প্রমাতারা শক্তিরূপে কল্পনা করেন।[৪] কথাটা অন্যভাবেও বলা যায়—ফলভেদের জন্য পদার্থের আত্মা বা স্বরূপে ভেদ আরোপিত হয়। এইভাবে আরোপিতভেদ পদার্থাত্মাকে শক্তি বলা হয়।[৫] দাহাদিসমর্থ বহ্নির স্বরূপই তার শক্তি বলে কল্পিত হয়। আবার দাহপাকাদি ফলভেদের জন্য তার দাহিকা পাচিকা প্রভৃতি শক্তির কল্পনা করা হয়। বস্তুতঃ বহ্নি এবং তার শক্তির মধ্যে কোনো ভেদ নেই। তেমনি পরমেশ্বরের অনন্তশক্তি কল্পিত হলেও পরমেশ্বর আর তাঁর শক্তির মধ্যে বস্তুতঃ কোনো ভেদ নেই। আবার শক্তিমান্ এক হওয়াতে বিভিন্ন শক্তিও বস্তুতঃ পরস্পর অভিন্ন।[৬] এ বিষয় পূর্বেও লক্ষ্য করা গেছে। দেখা গেছে একই স্বাতন্ত্র্যশক্তি অনন্তশক্তিরূপে স্ফুরিত হচ্ছেন।

শক্তি ও সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়—লক্ষ্য করা গেছে এই স্বাতন্ত্র্যশক্তি অনন্তজগদ্রূপে প্রকাশিতা। প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়ে বলা হয়েছে এই স্বতন্ত্র চিতিশক্তি বিশ্বের প্রকাশন (সৃষ্টি), অবস্থিতি এবং সংহারের হেতু।[৭] যখন ইনি আপনাকে প্রসারিত করেন তখন হয় জগতের উন্মেষ ও স্থিতি আর যখন আপনাকে সংকুচিত করেন তখন হয় জগতের লয়।[৮]

শুধু একটি জগৎ নয় ভগবতী চিতিশক্তি অনন্ত জগতের কারণ। তিনি অনাদি অনন্ত কাল ধরে অনন্তজগদ্রূপে অবভাসিত হচ্ছেন।

সৃষ্টির পর প্রলয়, প্রলয়ের পর সৃষ্টি চক্রাকারে আবর্তিত হচ্ছে। এই আবর্তন অনাদি এবং অনন্ত। অর্থাৎ শক্তির উন্মেষণ ও নিমেষণ শাশ্বত।[৯]

---

১ পর এব হি স্বতন্ত্রো বোধস্তত্তদুপাধিবশাৎ তত্তচ্ছক্তিরূপতয়া ব্যপদিশ্যতে ইতি ন বস্তুতঃ কশ্চিৎ শক্তি-তদ্বতোর্ভেদঃ।—ত আ, প্র আ, পৃঃ ১২৪

২ নহি স্বতন্ত্রং শক্তিস্বরূপং ভবিতুমর্হতীতি।—ই প্র, প্র ভা, পৃঃ ২৭৪, পাদটীকা ১

৩ বস্তুতস্তু ভগবদ্ভৈরবাত্মকমেব সর্বম্।—ঐ

৪ শক্তিশ্চ নাম ভাবস্য স্বং রূপং মাতৃকল্পিতম্।—ত আ, ১।৬৯

৫ ফলভেদাদারোপিতভেদঃ পদার্থাত্মা শক্তিঃ।—ত আ, প্র আ, পৃঃ ১১০ ৬ ঐ, পৃঃ ১১০-১১১

৭ চিতিঃ স্বতন্ত্রা বিশ্বসিদ্ধিহেতুঃ।—প্র হৃ, পৃঃ ২

৮ অস্যাং হি প্রসরন্ত্যাং জগৎ উন্মিষতি ব্যবতিষ্ঠতে চ, নিবৃত্তপ্রসরায়াং চ নিমিষতি।—ঐ

৯ K. Sh., p. 46

শক্তির গৌরব—লক্ষ্য করার বিষয় শিবাদ্বৈতবাদীরা শক্তিকে অতি গৌরবের স্থান দিয়েছেন। এঁদের মতে শক্তিই শিবকে জানার উপায়।[১] কথাটার ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে আলোকের দ্বারা প্রদীপের, কিরণ সমূহের দ্বারা সূর্যের দিগ্‌বিভাগাদি যেমন জানা যায় তেমনি শক্তি দ্বারা শিবকে জানা যায়।[২]

শক্তি ভুবনাদিরূপে অনন্ত। যে-কোনো শক্তিদ্বার দিয়ে শিব মানসপ্রত্যক্ষ হতে পারেন। আচার্য জয়রথ বলেন নাদ, বিন্দু প্রভৃতিরূপ শক্তিজ্ঞানের দ্বারা শিবজ্ঞান হতে পারে।[৩]

স্রোতমানা শক্তিতেই মহাপ্রকাশবপু নিষ্কম্প (স্বরূপে অবস্থিত) অচলমূর্তি শিব অধিষ্ঠিত। এই শক্তি পরা, সূক্ষ্মা, চিন্মাত্ররূপা, নিত্যা, পরপ্রমাতা শিবের সঙ্গে একরূপা। আবার ইনি স্থাবরজঙ্গমাত্মকজগদ্রূপিণী বলে চিত্রস্বভাবা অর্থাৎ বিভেদবৈচিত্র্যরূপা। (এ সব বিষয় অবশ্য পূর্বেও লক্ষ্য করা গেছে)। এই শক্তি অনিত্য বস্তুরও আত্যন্ত উপরতা হলেও অনিত্যাদি দোষকালুষ্য এঁকে স্পর্শ করে না।[৪]

ত্রিকমতাবলম্বীরা বলেন শিবকে পেতে হলে আগে শক্তিকে পাওয়া চাই। শক্তিমান্ উপেয়; শক্তি তাঁকে লাভ করার উপায়। উভয়ের মধ্যে উপায়-উপেয়ত্ব-সম্বন্ধ বিদ্যমান। ধর্মিস্বরূপ পরম শিবে শীঘ্র শীঘ্র তন্ময়তাস্থিতির নাম স্ফুটতা। শক্তিই এই স্ফুটতার উপায়। অর্থাৎ শক্তিকে লাভ করলেই শক্তিমান্ শিবকেও লাভ করা যায়।[৫]

অণু—শিব এবং শক্তি ছাড়া ত্রিকদর্শনের আরেকটি প্রধান আলোচ্য অণু বা জীব। একে পশুও বলা হয়। এই দর্শন অনুসারে জীব এবং শিবে স্বরূপতঃ কোনো ভেদ নেই। শিবই ভোক্তা (জীব) এবং প্রভু (শিব); যাজ্য (শিব) এবং যাজক (জীব)।[৬] শিবই পশুভাব গ্রহণ করেন।[৭] অবিদ্যা-অস্মিতা প্রভৃতির দ্বারা বদ্ধ জীবকে পশু বলে।[৮]

শিব যখন স্বীয় স্বাতন্ত্র্যহেতু নিজেকে সঙ্কুচিতরূপে অবভাসিত করেন তখন তাঁকে অণু বলা হয়।[৯] আসল কথা স্বতন্ত্র শিব জীবরূপে অবভাসিত হয়েছেন আপন খেয়ালখুশি অনুসারে, হয়েছেন নটের মত লীলাচ্ছলে।[১০] আলোচ্য মত অনুসারে জড়ও শিব। শিবই স্বস্বরূপগোপনাত্মিকা মায়াশক্তি দ্বারা নিজেকে আবৃত করে জড়রূপে অবস্থান করেন।[১১]

---

১ শক্তিরেব তদুজ্জ্বলতাবুপায়ঃ।—ত আ, প্র আ, পৃঃ ২২৯
২ 'যথালোকেন দীপস্য কিরণৈর্ভাস্করস্য বা। জ্ঞায়তে দিগ্বিভাগাদি তদ্বচ্ছক্ত্যা শিবঃ প্রিয়ে।'—দ্রঃ ঐ
৩ ঐ, পৃঃ ১২১ ৪ ঐ, পৃঃ ২২৮-২৩০ ৫ ত আ, ১।২০৫
৬ স ভোক্তৃপ্রভুশব্দাভ্যাং যাজ্যযাজ্‌ তয়োদিতঃ।—ঐ ১।১৩২
৭ 'শিব এব গৃহীতপশুভাবঃ'।—দ্রঃ ত আ, প্র আ, পৃঃ ২৪৪
৮ অবিদ্যাস্মিতাদিভিঃ পাশিতো জীবঃ পশুঃ।—প্র হৃ, পৃঃ ৬৮
৯ স এব স্বাতন্ত্র্যাৎ আত্মানং সংকুচিতম্ অবভাসয়ন্ অণুরিতি উচ্যতে।—ত সা, পৃঃ ৩
১০ নটবল্লীলয়া ভিন্নঃ অণু ইত্যাচার্যাঃ সংপশ্যন্তে।—ত সা, ভূমিকা, পৃঃ ১
১১ সোঽহমাত্মানমাবৃত্য স্থিতো জড়পদং গতঃ।—ত আ ১।১৩৪

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় শিবই যে জীব এটি তন্ত্রশাস্ত্রেরও অভিমত। যেমন কৌলজ্ঞান-নির্ণয়তন্ত্রে জীব সম্বন্ধে বলা হয়েছে—জীব স্বরূপতঃ পর, নিষ্কল, নিরাময়, নিরঞ্জন, পরমাণু, ব্যাপক, নাথ, শিব। জীব হংস, শক্তিপুদ্গল, মন, প্রাণ, বুদ্ধি, চিত্ত, সর্বজীবসংস্থিত বায়ু। তিনি যতদিন দেহে অবস্থান করেন ততদিন জীব, দেহত্যাগ করা মাত্র পর শিব।[১]

সে যা হক। ত্রিকমতে জীবে শিবে স্বরূপতঃ ভেদ না থাকলেও ব্যবহারতঃ আছে। জীবাত্মা যদিও চৈতন্যরূপে সর্বদা প্রকাশিত তথাপি পূর্ণচৈতন্যরূপে প্রকাশিত নয়।[২] একমাত্র শিবই পূর্ণচৈতন্যরূপে প্রকাশিত।

শিবের মতো জীবও ঈশ্বর। কেমন করে? ত্রিকমতে যার জ্ঞত্ব ও কর্তৃত্ব আছে অর্থাৎ যিনি জ্ঞানক্রিয়াশক্তিযুক্ত তিনি ঈশ্বর। যার জীবন আছে সেই জীব। জীবন অর্থ জীবন-কর্তৃত্ব। আর জীবনকর্তৃত্ব জ্ঞানক্রিয়াত্মক। অর্থাৎ যে জানে ও করে সে-ই জীবন ধারণ করে অর্থাৎ সে-ই জীব। কাজেই জীব জ্ঞানক্রিয়াযুক্ত। অতএব জীব ঈশ্বর।[৩]

তবে জীবের জ্ঞানক্রিয়া সংকুচিত।[৪] যে-জীব যে পর্যন্ত জ্ঞাতা ও কর্তা সে সেই পর্যন্ত ঈশ্বর।[৫] কিন্তু শিবের জ্ঞানক্রিয়া অসংকুচিত। তাই তিনি পূর্ণজ্ঞ ও পূর্ণকর্তা। তিনি পূর্ণ ঈশ্বর।

মল—যার জ্ঞানক্রিয়াশক্তি সংকুচিত সেই জীব বদ্ধ, স্বস্বরূপবিস্মৃত। জীবের বন্ধনের হেতু অজ্ঞান। অজ্ঞান অর্থই স্বস্বরূপভ্রষ্টতা।[৬] এই অজ্ঞানকেই শৈবশাস্ত্রে মল বলা হয়েছে।[৭] ত্রিকমতে অজ্ঞান অপূর্ণ জ্ঞান, জ্ঞানের অভাব নয়।[৮]

অজ্ঞান দ্বিবিধ—বুদ্ধিগত এবং পৌরুষ। বুদ্ধিগত অজ্ঞান আবার দ্বিবিধ—অনিশ্চয়স্বভাব আর বিপরীতনিশ্চয়াত্মক।[৯] তাত্ত্বিক স্বরূপের অপূর্ণজ্ঞানকে বলে অনিশ্চয় আর অনাত্মায় আত্মাভিমানকে বলে বিপরীতনিশ্চয়।[১০] পৌরুষ অজ্ঞান সংকুচিতপ্রথাত্মক বিকল্পস্বরূপ।

---

১ সঃ পরঃ নিষ্কলঃ নিত্যঃ নিরাময়নিরঞ্জনঃ। পরমাণুরুচ্যতে নাথো স শিবো ব্যাপকঃ পরঃ।
সঃ জীবঃ পরতরো বস্তু সঃ হংসঃ শক্তিপুদ্গলঃ। স মনো মৎপরঃ প্রাণঃ স বুদ্ধিশ্চিত্তমেব চ॥
সমীরপূরকো বায়ুঃ সর্বজীবেষু সংস্থিতঃ। দেহস্থিতঃ যাবত্তাবজ্জীবোঽপি গীয়তে।
স দেহত্যক্তমাত্রেণ পরঃ শিবো নিগদ্যতে।—কৌ জ্ঞা নি ৯। ৪-৭

২ যদ্যপি চৈতন্যরূপেণ জীবাত্মা সদা প্রকাশতে
তথাপি পূর্ণচৈতন্যরূপেণ ন প্রকাশতে।—স দ স, পৃঃ ১৯৪, টীকা।

৩ ঈ প্র, প্র জ্ঞা, পৃঃ ৪৩-৪৪ ৪ ত আ, প্র আ, পৃঃ ৩৪০

৫ যো যাবতি জ্ঞাতা কর্তা চ স তাবতি ঈশ্বরঃ স্যাদেব।—ঈ প্র, প্র, জ্ঞা, পৃঃ ৪৪

৬ অজ্ঞানং স্বস্বরূপপ্রচ্যুতিঃ।—ত সা, পৃঃ ৭, পাদটীকা

৭ অজ্ঞানং কিল বন্ধহেতুরুদিতঃ শাস্ত্রে মলঃ তৎস্মৃতম্।—ঐ, পৃঃ ৫

৮ অপূর্ণং জ্ঞানং তদেব অজ্ঞানং ন পূর্ণজ্ঞানাভাবমাত্রম্।—ত আ, প্র আ, পৃঃ ৫৮ ৯ ত সা, পৃঃ ২-৩

১০ তাত্ত্বিকস্বভাবস্যাজ্ঞানমনিশ্চয়ঃ। অনাত্মনি আত্মাভিমানো বিপরীতনিশ্চয়ঃ।—ত সা, পৃঃ ৩, পাদটীকা ৬, ৭

এই পৌরুষ অজ্ঞানই সংসারের মূল কারণ।[১] পৌরুষ অজ্ঞানকেই বলা হয় আণব মল।[২] তাই তন্ত্রালোকে আণব মলকেও সংসারের মূল কারণ বলা হয়েছে।[৩]

আণব মল— ত্রিকমতেও মল ত্রিবিধ—আণব, কার্ম এবং মায়ীয়। "মল শিবনিষ্ঠ অর্থাৎ শিবদ্বারাই প্রকাশিত।"[৪] পরমেশ্বর শিব স্বীয় স্বাতন্ত্র্যশক্তি দ্বারা স্বীয় পূর্ণজ্ঞত্ব-কর্তৃত্বাদি তিরোহিত করে অখ্যাতি-আত্মক (স্বরূপ-অখ্যাতি) আণব মলের উদ্ভব ঘটান এবং তার দ্বারা নিজের শিবত্বস্বরূপ আবৃত করেন।[৫] এই অবস্থায় শিব জীবভাব প্রাপ্ত হন। এখানে উল্লেখ করা যায় ত্রিকমতে মল মুক্ত জীবকে আবৃত করতে পারে না আর অনাদি-শুদ্ধবোধস্বরূপ শিবকে ত পারেই না।[৬]

আণব মলকে 'অপূর্ণম্মন্যতা' বলা হয়েছে।[৭] শিবের অপ্রতিহতস্বাতন্ত্র্যরূপা ইচ্ছাশক্তি জীবে সংকুচিতা হলে অপূর্ণম্মন্যতারূপ আণব মলের উদ্ভব হয়।[৮]

আণব মলে স্বস্বরূপের হানি হয় বলে আণব মলও দ্বিবিধ—বোধের স্বাতন্ত্র্যহানি এবং স্বাতন্ত্র্যের অবোধতা।[৯] প্রথম প্রকারের আণবমলযুক্ত জীবের স্বাতন্ত্র্য থাকে না কিন্তু বোধ থাকে আর দ্বিতীয় প্রকারের আণবমলযুক্ত জীবের স্বাতন্ত্র্য থাকে কিন্তু বোধ থাকে না।[১০]

কার্ম মল—শিবের অসংকুচিতা ক্রিয়াশক্তি জীবে সংকুচিতা হলে শিবের সর্বকর্তৃত্ব জীবে কিঞ্চিৎকর্তৃত্ব প্রাপ্ত হয় এবং তখন শক্তি এই কর্মেন্দ্রিয়রূপসংকোচগ্রহণপূর্বক অত্যন্ত পরিমিততা প্রাপ্ত হওয়ায় শুভাশুভ অনুষ্ঠানময় কার্ম মলের উদ্ভব হয়।[১১]

মায়ীয় মল—শিবের অসংকুচিতা জ্ঞানশক্তি জীবে সংকুচিত হওয়ায় শিবের সর্বজ্ঞত্ব জীবে কিঞ্চিৎজ্ঞত্ব প্রাপ্ত হয়। এই শক্তি তখন অন্তঃকরণবুদ্ধীন্দ্রিয়ত্বপ্রাপ্তিপূর্বক অত্যন্ত সংকুচিত

---

১ পৌরুষং তু বিকল্পস্বভাবং সংকুচিতপ্রথাত্মকং তদেব চ মূলকারণং সংসারস্য।—ত সা, পৃঃ ৩

২ ত আ, প্র আ, পৃঃ ৪৪

৩ সংসারকারণত্বেনোক্তমাণবং মলম্।—ত আ, ন আ, পৃঃ ১৬৬

৪ শিব এব…ইত্যস্যাসৌ মলো ভবেৎ।—ঐ ৯।৭৩ (পৃঃ ৬৬)

৫ ত আ, প্র আ, পৃঃ ৭৪ ৬ ঐ, ন আ, পৃঃ ৬২ ৭ ঐ ৯।৬২

৮ তথা চ অপ্রতিহতস্বাতন্ত্র্যরূপা ইচ্ছাশক্তিঃ সংকুচিতা সতী
অপূর্ণম্মন্যতারূপম্ আণবং মলম্।—প্র হৃ, পৃঃ ২১

৯ স্বাতন্ত্র্যহানির্বোধস্য স্বাতন্ত্র্যস্যাপ্যবোধতা। দ্বিধাণবং মলমিদং স্বস্বরূপাপহানিতঃ।—ঈ প্র ৩।২।৪

১০ H. Ph. E. W., p. 427, n. 20

১১ ক্রিয়াশক্তিঃ ক্রমেণ ভেদে সর্বকর্তৃত্বস্য কিঞ্চিৎকর্তৃত্বাপ্তেঃ কর্মেন্দ্রিয়রূপসংকোচগ্রহণপূর্বম্ অত্যন্তং
পরিমিততাং প্রাপ্তা শুভাশুভানুষ্ঠানময়ং কার্মং মলম্।—প্র হৃ, পৃঃ ২১-২২

হন এবং এইভাবে ভিন্নবেদ্যপ্রথারূপ মায়ীয় মলের উদ্ভব হয়।[১] মায়ীয় মল শরীর-ভুবনাকার।[২]

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন শিবের ইচ্ছাদিশক্তি বস্তুতঃ সংকুচিতা হন না, তাঁকে সংকুচিতার মতো দেখায়।[৩]

ত্রিবিধ মলের পরস্পর সম্বন্ধ—আণব মল কার্ম মলের কারণ আর কর্ম মল মায়ীয় মলের কারণ বলে এই দর্শনে ব্যাখ্যাত হয়েছে।[৪] অর্থাৎ ত্রিকমতে মায়ীয় মলের অস্তিত্ব কার্ম মলের উপর এবং কার্ম মলের অস্তিত্ব আণব মলের উপর নির্ভরশীল।[৫]

মোক্ষ—যে পর্যন্ত মল থাকে সেই পর্যন্ত জীব বদ্ধ। যখন আত্মসংবিদের উদয় হয় অর্থাৎ জীব নিজেকে শিব বলে জানেন তখন সমস্ত মল বিধ্বস্ত হয়ে যায়। জীবের এই অবস্থাকেই বলে মোক্ষ।[৬] মুক্ত ব্যক্তি সর্বভেদবর্জিত।[৭]

ত্রিকদর্শন অনুসারে মোক্ষ আত্মস্বরূপের যথাতত্ত্ব জ্ঞান, অন্য কিছু নয়। আত্মার স্বরূপ সংবিৎ বা চৈতন্য।[৮] এই জন্যই বলা হয়েছে আত্মসংবিদের উদয়ে মোক্ষ লাভ হয়।

জ্ঞান—ত্রিকমতে অজ্ঞান যেমন দ্বিবিধ জ্ঞানও তেমনি দ্বিবিধ—বুদ্ধিগত বা বৌদ্ধ এবং পৌরুষ বা পৌংস্ন।

পৌরুষ জ্ঞান—জীবের পশুসংস্কার বা আণবাদি মল ক্ষয়প্রাপ্ত হলে তিনি পরস্থিতি প্রাপ্ত হন অর্থাৎ পরম শিবের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। তখন তিনি পরহন্তাবিমর্শাত্মক নির্বিকল্পক (কৃত্রিম অহংকারাদিবিকল্পশূন্য) যে-জ্ঞান লাভ করেন তাকেই বলে পৌরুষ জ্ঞান।[৯]

দীক্ষা, সন্ধ্যা, উপাসনা এই সবের দ্বারা পৌরুষ অজ্ঞান নষ্ট হলেও দেহান্ত না হলে পৌরুষ জ্ঞান স্ফুরিত হয় না।[১০] পৌরুষ অজ্ঞান বিনষ্ট হলে পৌরুষজ্ঞান শুধু প্রকাশোন্মুখ হয়।[১১] এইজন্য ত্রিকমতাবলম্বীরা বলেন দেহপাত হলে শিবের সঙ্গে একাত্মতা হয়।[১২]

১ জ্ঞানশক্তিঃ ক্রমেণ সংকোচাৎ ভেদে সর্বজ্ঞত্বস্য কিঞ্চিজ্জত্বাপ্তেঃ অন্তঃকরণবুদ্ধীন্দ্রিয়তাপত্তি-পূর্বম্ অত্যন্তং সংকোচগ্রহণেন ভিন্নবেদ্যপ্রথারূপং মায়ীয়ং মলম্।—প্র, পৃঃ ২১

২ শরীরভুবনাকারং মায়ীয়ং পরিকীর্তিতম্।—দ্রঃ ত আ, ন আ, পৃঃ ৭৫

৩ সংকোচবত্যো ভান্তি।—প্র হৃঃ পৃঃ ২১   ৪ ত আ, ন আ, পৃঃ ৭৫   ৫ Abhi., 2nd Ed., p. 306

৬ ধ্বস্তাশেষ মলাত্মসংবিদুদয়ে মোক্ষশ্চ।—ত সা, পৃঃ ৫

৭ মুক্তস্তু সর্বাবচ্ছেদবর্জিতঃ।—ত আ, প্র আ, পৃঃ ৭২

৮ মোক্ষো হি নাম নৈবান্যঃ স্বরূপপ্রথনং হি সঃ। স্বরূপং চাত্মনঃ সংবিন্নান্যত্তত্র তু যাঃ পুনঃ।—ত আ ১।১৫৬

৯ ক্ষীণে তু পশুসংস্কারে পুংসঃ প্রাপ্তপরস্থিতেঃ। বিকস্বরং তদ্বিজ্ঞানং পৌরুষং নির্বিকল্পকম্।—ত আ ১।৪১

১০ তত্র দীক্ষাদিনা পৌংস্নমজ্ঞানং ধ্বংসি যদ্যপি। তথাপি তচ্ছরীরান্তে তজ্জ্ঞানং ব্যজ্যতে স্ফুটম্।—ঐ ১।৪৩

১১ ঐ, প্র আ, পৃঃ ৮০   ১২ দেহপাতে শিবং ব্রজেৎ।—ঐ

শিবাদ্বয়বাদী এই দার্শনিকদের মতে বুদ্ধিগত অনধ্যবসায়াত্মক অজ্ঞান থাকতে দীক্ষাও সম্ভবপর হয় না।[১] অধ্যবসায়াত্মক বুদ্ধিনিষ্ঠ জ্ঞানের উদয়ে বুদ্ধিগত অজ্ঞানের নাশ হয় এবং শিবাদ্বয়শাস্ত্র শ্রবণাদি দ্বারা বুদ্ধিনিষ্ঠ জ্ঞানের উদয় হয়।[২] এই বুদ্ধিগত জ্ঞান 'অভ্যস্যমান' হয়ে পৌরুষ অজ্ঞানকেও নাশ করে।[৩]

শরীরাদি বিকল্পের দ্বারা অসঙ্কুচিত সংবিৎরূপ আত্মা শিবস্বরূপ—সর্বপ্রকারে সর্ববস্তুনিষ্ঠ সম্যক্‌নিশ্চয়াত্মক এই জ্ঞান বুদ্ধিগত জ্ঞান।[৪] অর্থাৎ সমস্ত বস্তুর অন্তর্নিহিত জ্ঞেয় শিবস্বরূপ শিবাদ্বয়শাস্ত্র শ্রবণাদির দ্বারা লব্ধ এই আত্মনিশ্চয়াত্মক জ্ঞানই বুদ্ধিগত বা বৌদ্ধ জ্ঞান।

এই মতে বুদ্ধিগত জ্ঞানের প্রাধান্য স্বীকৃত। কারণ বুদ্ধিগত জ্ঞানের উদয়ে জ্ঞানী পুরুষ জীবন্মুক্ত হয়ে যান।[৫] দীক্ষাদির দ্বারা পৌরুষ জ্ঞান অভিব্যক্ত্যুন্মুখ হলেও দেহ থাকতে মুক্তিপ্রদ হয় না।[৬]

মুক্তির উপায়—ত্রিকদর্শনমতে জীবের মুক্তির মার্গ বা উপায় চতুর্বিধ। এই চতুর্বিধ মুক্তিমার্গকে জ্ঞানচতুষ্কও বলা হয়।[৭] এই উপায় চারটিকে অনুপায়, শাম্ভবোপায়, শাক্তোপায় এবং আণবোপায় নাম দেওয়া হয়েছে।

আণবোপায়ের বিশ্রান্তিস্থান শাক্তোপায়, শাক্তোপায়ের বিশ্রান্তিস্থান শাম্ভবোপায়[৮] এবং শাম্ভবোপায়ের পরাকাষ্ঠা অনুপায়।[৯]

ত্রিকশাস্ত্রে উপায়শব্দের স্থলে আবেশশব্দের ব্যবহার দেখা যায়।[১০] অস্বতন্ত্র জীবের পরতন্ত্ররূপতা অর্থাৎ শিবরূপতার নাম আবেশ।[১১]

অনুপায়—এই উপায় বা জ্ঞানকে বলা হয়েছে পরম জ্ঞান। এ জ্ঞান আনন্দশক্তি-বিশ্রান্ত। 'আনন্দো ব্রহ্মণঃ রূপম্'—আনন্দ ব্রহ্মের রূপ। কাজেই এই জ্ঞান উপেয়ের সঙ্গে একরূপ (উপেয়ৈকরূপত্বাৎ)। এটি উপায়াদিবিবর্জিত অনুত্তর শিবাদ্বৈত জ্ঞান।[১২]

একবারমাত্র গুরুর উপদেশ শ্রবণেই এই জ্ঞানের উদ্ভব হয়, তখন আর অন্য উপায়ের

১ দীক্ষাপি বুদ্ধিগতে অনধ্যবসায়াত্মকে অজ্ঞানে সতি ন সম্ভবতি।—ত সা, পৃঃ ৩

২ ত আ, প্র আ, পৃঃ ৮১-৮২

৩ তদেব চ অভ্যস্যমানং পৌরুষমপি অজ্ঞানং নিহন্তি।—ত সা, পৃঃ ৩

৪ ঐ, পৃঃ ৩-৭ ৫ ত আ ১।৪৪

৬ এবং দীক্ষাদিনা পৌংস্নং জ্ঞানমভিব্যক্ত্যুন্মুখমপি ন তদৈব মুক্তিপ্রদম্।—ত আ, প্র আ, পৃঃ ৮২

৭ ঐ, পৃঃ ২৫৮ ৮ ঐ, পৃঃ ২৫৫

৯ ঐ, পৃঃ ১৮২ ১০ ঐ, পৃঃ ২০৫

১১ অস্বতন্ত্রস্য পরতন্ত্ররূপতা নামাবেশঃ ইতি।—ত আ, প্র আ, পৃঃ ২০৯

১২ ততোঽপি পরমং জ্ঞানমুপায়াদিবিবর্জিতম্। আনন্দশক্তিবিশ্রান্তমনুত্তরমিহোচ্যতে।—ত আ ১।২৪২

প্রয়োজন হয় না। এইজন্যই এই উপায়ের নাম অনুপায়। সিদ্ধ যোগীর দর্শনাদির দ্বারাও এই জ্ঞানের উদয় হতে পারে।[১]

কাজেই অনুপায় বলতে উপায়ের নিষেধ বুঝায় না,[২] অল্পত্ব বুঝায়।[৩]

অনুপায় শাম্ভবোপায়ের পরাকাষ্ঠা বলে একে আর পৃথক্ উপায় না ধরে ত্রিবিধ উপায়ের কথাও বলা হয়। উপায় ত্রিবিধ হলেও উপেয়ভূত অপবর্গ অর্থাৎ মোক্ষ একই, তাতে কোনো ভেদ নেই।[৪]

শাম্ভবোপায়—এই উপায় ইচ্ছাশক্ত্যাত্মক।[৫] একে ইচ্ছোপায়ও বলা হয়। উপায়ান্তরনিরপেক্ষ বলে ইচ্ছাশক্তির অব্যবহিতস্ফুরণরূপ উপায়কে শাম্ভব উপায় বলা হয়।[৬]

তন্ত্রালোকে বলা হয়েছে "প্রাথমিক নির্বিকল্প জ্ঞান হইতে প্রকাশমাত্ররূপে যাহা স্ফুরিত হয় তাহার সেই স্ফুরণকে ইচ্ছা নামে অভিহিত করা হয়।"[৭]

এই ইচ্ছা বা ইচ্ছাশক্তি শিবেরই ইচ্ছাশক্তি। তাই তাকে বলা হয়েছে পরা ভট্টারিকা।[৮]

জীবের ইচ্ছাও বস্তুতঃ শিবেরই ইচ্ছা। জীবপক্ষে শিবাত্মতাস্ফুরণ এই ইচ্ছা।[৯]

যে-উপায়ে ইচ্ছাশক্তির প্রাধান্য তাই ইচ্ছোপায়। একে সাক্ষাৎ-উপায়ও বলা হয়। এই উপায়ে শিবের পূর্ণরূপের এককালীন (ক্রমে ক্রমে নয়) সাক্ষাৎকার হয়।[১০]

এই ইচ্ছোপায় বা শাম্ভবোপায়কে শাম্ভব আবেশও বলা হয়। "যিনি পরমার্থ চিন্তা ব্যতীত কোনও চিন্তা করেন না গুরুকৃপায় তাহাতে যে-আবেশ উপস্থিত হইয়া থাকে সেই আবেশকে শাম্ভব আবেশ বলা হয়"।[১১] আচার্য জয়রথ বলেন অবিকল্প সংবিত্তিই শিবাত্মতা বা শাম্ভব আবেশ প্রাপ্ত হয়।[১২] শাম্ভবোপায় বা শাম্ভব আবেশ অখণ্ড-বস্তু-অবভাসাত্মক নির্বিকল্পস্বভাব অর্থাৎ অভেদাত্মক।[১৩]

শাক্তোপায়—শাক্তোপায়কে জ্ঞানোপায়ও বলা হয়। যে-উপায়ে বিকল্প জ্ঞান ক্রমে ক্রমে নির্বিকল্প জ্ঞানে পরিণত হয় এবং সেই নির্বিকল্প জ্ঞানের দ্বারা শিবের পূর্ণরূপের সাক্ষাৎকার হয় তাকে জ্ঞানোপায় বলে।[১৪]

১ ত আ, দ্বি আ, পৃঃ ২-৪
২ অত এব অনুপায়ঃ ইতি নোপায়নিষেধমাত্রম্ ইতি বক্ষ্যতে।—ত আ, প্র আ, পৃঃ ১৮২
৩ অনুপায়ত্বম্…অল্পোপায়ত্বমিত্যর্থঃ।—ঐ, দ্বি আ, পৃঃ ৩
৪ ত আ, প্র আ, পৃঃ ২০২ ৫ ঐ, পৃঃ ১৮৪
৬ উপায়ান্তরনিরপেক্ষত্বাৎ অব্যবধানেচ্ছাশক্তিস্ফাররূপঃ শাম্ভবাখ্য উপায় উক্তঃ।—ঐ, পৃঃ ১৮৬
৭ ত আ ১।১৪৬
৮ পরা ভট্টারিকারূপা চ অসৌ ইচ্ছাশক্তিঃ।—ত আ, প্র আ, পৃঃ ২০৫
৯ ঐ ১০ ঐ, পৃঃ ২৩৪-২০৫
১১ অকিঞ্চিচ্চিন্তকস্যৈব গুরুণা প্রতিবোধতঃ। উৎপদ্যতে য আবেশঃ শাম্ভবোঽসাবুদীরিতঃ।—ত আ ১।১৬৮
১২ অবিকল্পকস্যৈব সংবিত্ত্যা শিবাত্মতাধিগমঃ।—ঐ, প্র আ, পৃঃ ২১০ ১৩ ঐ, পৃঃ ২০৩ ১৪ ঐ, পৃঃ ১৮৭

ত্রিকদর্শন অনুসারে পরাপরভেদে জ্ঞান দ্বিবিধ। বিশ্বের সমস্ত বস্তুর প্রকাশমানতারূপ একটি অভিন্ন সত্তা আছে। সেই প্রকাশমানতা শিবেরই প্রকাশমানতা। শিবের এই প্রকাশাত্মক রূপের (চিৎস্বরূপের) যে-সাক্ষাৎকরণ তাই জীবের পরজ্ঞান অর্থাৎ পূর্ণজ্ঞান। এই জ্ঞান নির্বিকল্প পারমেশ্বর অর্থাৎ শাম্ভব জ্ঞান। এই জ্ঞান থেকেই বিকল্পাত্মক শাক্তাদি জ্ঞানের উদ্ভব হয়।[১] পরজ্ঞান ইচ্ছাত্মক।[২]

পূর্ণজ্ঞান পর, এ ছাড়া অন্য জ্ঞান অপর। অপর জ্ঞানে চিৎস্বরূপের সাক্ষাৎকার হয় না বলে তা অপূর্ণ। এই জ্ঞান সবিকল্প, বহুপ্রকার।[৩] এই সবিকল্প অপরজ্ঞানই জ্ঞানোপায় বা শাক্তোপায়ের বিষয়।

আত্মৈবেদং সর্বম্—আত্মাই অর্থাৎ শিবই এই সব কিছু অর্থাৎ জগৎ। এই সব কিছু বা জগৎ শিবের বিকল্প[৪] অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকারের প্রকাশ। যাঁর পূর্ণজ্ঞান হয় নি অথচ যিনি চিন্তা করেন 'আত্মৈবেদং সর্বম্' তিনি মনে করেন প্রত্যেক বস্তুতেই আত্মা এবং অনাত্মা এই অংশদ্বয় আছে। অবশ্য এরূপ বিভাগ বস্তুতঃ নেই, বিভাগ আছে এটি কল্পনামাত্র। সে যা হক, উক্ত ব্যক্তি যদি বার বার অনাত্মাংশ বাদ দিয়ে আত্মাংশই নিশ্চয় করেন অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুতে তাঁর আত্মস্বরূপ-সাক্ষাৎকার হয় তা হলে তাঁর অবলম্বিত উপায়কে বলা হবে জ্ঞানোপায়।[৫]

তন্ত্রালোকে বলা হয়েছে 'অহমেব সর্বত্র স্থিতঃ'—আমিই সর্বত্র অবস্থিত, 'সর্বং বা ময্যেব স্থিতম্'—সব কিছুই আমাতে অবস্থিত, প্রত্যেক বস্তুতে এরূপ আত্মসাক্ষাৎকারের পর অভ্যাসবশে ক্রমে ক্রমে নির্বিকল্পক শাম্ভব সমাবেশ হয়।[৬]

লক্ষ্য করা গেছে এই সমুদয় জগৎ বা সংসার শিবের শক্তিরূপ। কাজেই আলোচ্য উপায়ে শক্তিরূপ বিকল্পকে প্রধানতঃ অবলম্বন করা হয়। এইজন্য একে শাক্তোপায়ও বলা হয়।

শাক্তোপায়ের বিকল্পজ্ঞানে[৭] ক্রমে ক্রমে অখণ্ডবস্তুর (শিবের) প্রকাশ হয়।[৮]

তন্ত্রালোকে আছে "বিকল্পে প্রথমতঃ বস্তুর তত্ত্বনিরপেক্ষ সামান্যাকার জ্ঞানই হয়। সেই সামান্য জ্ঞানমুখেই ক্রমশঃ বিশেষ ধর্মীর জ্ঞান হইয়া থাকে—ইহাই শাক্ত উপায়ের ক্রম।"[৯]

---

১ ত আ ১।১৪১ ও টীকা ২ ঐ ১।১৪৪ ৩ ঐ ১।১৪১ ও টীকা।
৪ সর্বো বিকল্পঃ সংসারঃ।—দ্রঃ ত আ, প্র ভা, পৃঃ ২৩৭;
৫ ত আ ১।১৪৮ ও টীকা ৬ ঐ ১।২১৫ ও টীকা
৭ বিকল্পো হি ভেদপ্রথাত্মকঃ।—ত আ, প্র আ, পৃ : ৮৭
৮ বিকল্পে হি ক্রমেণ অখণ্ডবস্তুবভাসো ভবতি।—ঐ, পৃঃ ২৩৭
৯ ঈশ্বর-ভাবে চ শাক্তাখ্যো বৈকল্পিকপথক্রমঃ।
ইহ ভূতো যতস্তস্মাৎ প্রতিযোগ্যবিকল্পকম্।—ত আ ১।২১০

শাক্তোপায়ে বিকল্প বস্তুনিরপেক্ষ।[১] অর্থাৎ কোনো বাহ্য বস্তুকে অবলম্বন না করে শুধু চিন্তনের দ্বারা বিকল্পজ্ঞানের উদয় হয়।

শাক্ত উপায় ভেদাভেদাত্মক।[২]

আণব উপায়—আণব উপায়কে ক্রিয়া-উপায়ও বলা হয়। শাক্তোপায়ের জ্ঞান এবং আণবোপায়ের ক্রিয়ার মধ্যে বস্তুতঃ কোনো ভেদ নাই। তন্ত্রালোকে বলা হয়েছে—এই জ্ঞানই শব্দের যোগরূঢ়শক্তিবশতঃ ক্রিয়া নামে অভিহিত হয়।[৩]

এখানে ক্রিয়াশব্দ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তন্ত্রালোকে বলা হয়েছে—নিজের চিত্তের বাসনা শান্ত হলে তত্ত্বারূঢ় যে-বুদ্ধির উদয় হয় তাকে ক্রিয়া বলা হয়।[৪]

ক্রিয়োপায়ের জ্ঞানও বিকল্পাত্মক। তবে এই বিকল্প উচ্চারাদি বাহ্যবস্তুর উপর নির্ভরশীল, শাক্তোপায়ের বিকল্প কিন্তু তা নয়।[৫]

ক্রিয়োপায় বা আণবোপায়ে ভেদের প্রাধান্য।[৬] অণুশব্দের অর্থই পরিস্ফুট ভেদ। সেইজন্য এই উপায়ের নাম আণবোপায়।[৭]

শাক্তোপায়ের মতো এই উপায়েও বিকল্প জ্ঞানের সমাপ্তি নির্বিকল্প শাম্ভব জ্ঞানে; দার্শনিক ভাষায় বলা যায় আণব সমাবেশের বিশ্রান্তি শাম্ভব সমাবেশে।[৮]

ষট্‌ত্রিংশতত্ত্ব— শৈব-সিদ্ধান্তাদির মতো ত্রিকদর্শনেরও অন্যতম আলোচ্য বিষয় ষট্‌ত্রিংশতত্ত্ব। এই দর্শন অনুসারে বৈচিত্র্যযুক্ত জগৎ ষট্‌ত্রিংশতত্ত্বাত্মক।[৯] আর জগৎ শিবের শক্তিরূপ। কাজেই ষট্‌ত্রিংশতত্ত্ব শিবেরই শক্তি।

তন্ত্রালোকে বলা হয়েছে পঞ্চত্রিংশতত্ত্বকে শিবেরই শক্তি বলা হয়।[১০] শিবতত্ত্ব আর শক্তিতত্ত্বকে অভিন্ন ধরে তত্ত্বসংখ্যা পঞ্চত্রিংশৎ। আচার্য সোমানন্দ শক্তিতত্ত্বকে শিবতত্ত্ব থেকে অভিন্ন গণ্য করেছেন।[১১] কেন না সংখ্যাগণনার সময় পৃথক্ ধরলেও শিবতত্ত্বে ও শক্তিতত্ত্বে বস্তুতঃ কোনো ভেদ নেই। তবে সংখ্যাগণনার সময় শিবতত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্বকে পৃথক্‌ই ধরা হয়। এইজন্য তন্ত্রালোকেই শিবকে ষট্‌ত্রিংশতত্ত্বরূপ বলা হয়েছে। বলা

১ বিকল্পানাং বস্ত্বনপেক্ষিত্বম্।—ত আ, প্র আ, পৃঃ ২১৩

২ ভেদাভেদৌ হি শক্তিতা।—ত আ ১।২২০

৩ যতো নাম্না ক্রিয়া নাম জ্ঞানমেব হি তত্তথা। রূঢ়ের্যোগাদ্বহঃ প্রাপ্তমিতি শ্রীশম্ভুশাসনে।—ত আ ১।১৫০

৪ তত্ত্বারূঢ়া হি যা মতিঃ স্বচিত্তবাসনাশান্তৌ সা ক্রিয়েত্যভিধীয়তে।—ঐ ১।১৫১ ৫ ঐ ১।২১৯ ও টীকা

৬ আণবে পুনর্ভেদস্যৈব প্রাধান্যম্।—ঐ ১।২২০ ও টীকা।

৭ অণুর্নাম স্ফুটো ভেদস্তদুপায় ইহাণবঃ।—ঐ ১।২২১ ৮ ঐ ১।২২১ ও টীকা

৯ ত আ, প্র আ, পৃঃ ১২৩

১০ পঞ্চত্রিংশত্তত্ত্বো শিবনাথস্যৈব শক্তিরূপত্বেন।—দ্রঃ ঐ, ন আ, পৃঃ ৩ ১১ দ্রঃ শি দৃ, পৃঃ ৬-৭

হয়েছে—"ষট্‌ত্রিংশৎ-তত্ত্বরূপ পরমেশই একমাত্র পদার্থ। ভুবনাদি অপর সকল বস্তুও তৎস্বরূপ। এই বিশ্ব পরমেশ্বরের শক্তিচক্র ব্যতীত কিছুই নয়। সর্বব্যাপিকা এই মহাদেবী রুদ্রশক্তি সর্বতোভাবে অপ্রতিহতা হইয়া বিরাজমান।"[১]

তত্ত্বশব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিচার করলেও দেখা যাবে তত্ত্ব ব্রহ্ম বা শিবেরই ধর্ম বা শক্তি। "তন্ ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ক্বিপ্ প্রত্যয়ে 'তৎ' এই পদ সিদ্ধ হইয়াছে। তন্ ধাতুর অর্থ বিস্তার। বিস্তৃতিই ব্যাপ্তি। যিনি সর্বদেশ এবং সর্বকাল ব্যাপিয়া আছেন তাহারই নাম 'তৎ'। ব্রহ্ম সর্বদেশ ও সর্বকাল ব্যাপিয়া আছেন এই জন্য ব্রহ্মের নাম 'তৎ'। 'তৎ'-এর যে ভাব বা ধর্ম, তাহার নাম তত্ত্ব। শিবাদি পৃথিব্যন্ত ষট্‌ত্রিংশৎ পদার্থ ব্রহ্মের ভাব বা ধর্ম। এইজন্য ইহাদের নাম তত্ত্ব।"[২]

তত্ত্বের লক্ষণ—তত্ত্বের বিশেষ লক্ষণ আছে। কোন বস্তুকে তত্ত্ব বলা হবে এ সম্বন্ধে শিবাদ্বয়বাদীরা শৈবাগমের অনুসরণ করেন। শৈবাগমমতে স্বধর্মপ্রকটাত্মক যে-বস্তুরূপ তাই তত্ত্ব।[৩] যেমন ধৃতি, কাঠিন্য, গরিমাদি গুণের অভিন্নরূপতা পৃথ্বীর স্বধর্ম পৃথ্বীত্ব। পৃথ্বীর যে-অখণ্ডরূপ এই পৃথ্বীত্ব প্রকট করে তাই পৃথ্বীতত্ত্ব। পৃথিবীতে গিরি, বৃক্ষ, নগর প্রভৃতি আছে। এই-সব নিয়ে তার অখণ্ড পৃথিবীরূপ।

তত্ত্ব বিস্তৃতদেশকালব্যাপী। যা সৃষ্টির আদি থেকে মহাপ্রলয় পর্যন্ত স্থায়ী থেকে সর্বপ্রাণীর উপভোগকর হয় তাকে জ্ঞানী ব্যক্তিরা তত্ত্ব বলেন, শরীর ঘট প্রভৃতি তত্ত্ব নয়।[৪] তার কারণ শরীরঘটাদি বিস্তৃতদেশকালব্যাপী নয়।

এ বিষয়ে সাংখ্যেরও অনুরূপ অভিমত। "বহুর মধ্যে যাহা সাধারণভাব, তদ্বিষয়ক সত্তার নাম তাত্ত্বিক সত্তা বা তত্ত্ব। সাংখ্যীয় তত্ত্ব জাতিমাত্র বা সামান্যমাত্র নহে, কারণ জাতি বৈকল্পিক পদার্থও হয়, যথা 'কাল ত্রিজাতীয়'। কিন্তু মূল নিমিত্ত এবং সামান্য উপাদানস্বরূপ ভাবপদার্থই তত্ত্ব। তাত্ত্বিক সত্তা অতাত্ত্বিক সত্তা অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপী অর্থাৎ দীর্ঘতর কাল এবং বৃহত্তর দেশ অথবা অধিক সংখ্যক মানসিক ভাব ব্যাপিয়া স্থিতিশীল"।[৫]

আচার্য অভিনবগুপ্ত তত্ত্বের আরেকটি লক্ষণ নির্দেশ করেছেন। তিনি লিখেছেন[৬]

---

১ যাবান্ ষট্‌ত্রিংশকঃ সোঽয়ং যদন্যদপি কিংচন। এতাবতী মহাদেবী রুদ্রশক্তিরনর্গলা।—ত আ ১।১৯৫

২ কৌ র, পৃঃ ১২৯, পাদটীকা

৩ তত্ত্বং যদ্বস্তুরূপং স্যাৎ স্বধর্মপ্রকটাত্মকম্।—দ্রঃ ত আ, ন আ, পৃঃ ৬

৪ আ মহাপ্রলয়স্থায়ি সর্বপ্রাণ্যুপভোগকৃৎ। তত্ত্বমিত্যুচ্যতে তজ্ঞৈর্ন শরীরঘটাদ্যতঃ।—দ্রঃ ত আ, ন আ, পৃঃ ৬

৫ সাংখ্যীয় প্রকরণমালা, কপিলাশ্রমীয় পাতঞ্জল যোগদর্শন, ১৯৩৮, পৃঃ ৫০৮

৬ ত আ ৯।১৬১, ১৬২ এবং টীকা

"তত্ত্বসমূহে দেহ এবং ভুবনাদি রহিয়াছে। চেতনাধিষ্ঠিত বাহ্য দেহ না থাকিলে তাহাকে তত্ত্ব বলা যায় না। উদাহরণস্বরূপ ঘটকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। ঘট তত্ত্ব নহে। যেহেতু ঘটের চেতনাধিষ্ঠিত বাহ্য দেহ নাই।

সকল তত্ত্বেরই অনুরূপ বিশিষ্ট ভুবন রহিয়াছে। যেমন পৃথিবীতে পার্থিবদেহ চৈত্রাদি। অনুরূপ-বিশিষ্টভুবনযুক্ত না হইলে তাহাকে দেহী বলা যায় না। যেমন পর শিব দেহী নহেন।"

ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বের ভাগ—শিবাদ্বয়বাদীরা ষটত্রিংশত্তত্ত্বের আবার আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব এবং শক্তিতত্ত্ব এই তিন ভাগ করেন। আবার নরতত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব এইভাবেও তিন ভাগ করা হয়।[১]

আরোহক্রমে মায়াতত্ত্ব পর্যন্ত আত্মতত্ত্ব বা পুরুষতত্ত্বের ব্যাপ্তি, সদাশিবতত্ত্ব পর্যন্ত বিদ্যাতত্ত্বের এবং শিবতত্ত্ব পর্যন্ত শক্তিতত্ত্বের ব্যাপ্তি।[২] এর অর্থ ক্ষিতিতত্ত্ব থেকে মায়াতত্ত্ব পর্যন্ত আত্মতত্ত্ব, শুদ্ধবিদ্যা থেকে সদাশিবতত্ত্ব পর্যন্ত বিদ্যাতত্ত্ব আর শক্তিতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব শক্তিতত্ত্ব বলে গণ্য হয়।

আত্মতত্ত্ব বা পুরুষতত্ত্ব অশুদ্ধ, কেন না আত্মা বা পুরুষ ভেদময়। বিদ্যাতত্ত্ব অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ, কারণ এই তত্ত্ব ভেদাভেদময়। শক্তিতত্ত্ব বিশুদ্ধ, কেন না এই তত্ত্ব অভেদময়।[৩]

ত্রিবিধ তত্ত্বের প্রকারভেদ—এই ত্রিবিধ তত্ত্বের আবার প্রকারভেদ স্বীকার করা হয়েছে। পুরুষতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব চতুর্বিধ—সকল, প্রলয়াকল, বিজ্ঞানাকল এবং শুদ্ধ।[৪]

বিদ্যাতত্ত্ব দশবিধ—বর্ণ, বিন্দু, অর্দ্ধচন্দ্র, নিরোধিনী, নাদ, নাদান্ত, শক্তি, ব্যাপিনী, সমনা এবং উন্মনা।[৫]

শক্তিতত্ত্ব ত্রিবিধ—ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি।[৬]

পরম শিব ও ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্ব— ত্রিকমতে ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বময় এই বিশ্ব অখণ্ডবোধরূপে পরমশিবসংবিদে অবস্থিত।[৭] সহজ কথায় বলা যায় শিবাদি-ধরণ্যন্ত ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বময় বিশ্ব পরম শিবের সঙ্গে অভিন্নভাবে স্ফুরিত।[৮]

পরম শিবই বিশ্বকে বাইরে অবভাসিত করেন। পরম শিব পূর্ণস্বরূপ। তাঁর কোনো

১ নরশক্তিশিবাত্মকত্বেন ত্রৈবিধ্যম্।—ত আ, ন আ, পৃঃ ২৪৪

২ ত আ ১১।১৮৮ ও টীকা ৩ ঐ ১১।১৮৯ ও টীকা

৪ ত আ, প্র আ, পৃঃ ২১৬ ৫ ঐ ৬ ঐ

৭ ইদং বিশ্বং...একস্যাং বা পরস্যাং পারমেশ্বর্যাং ভৈরবসংবিদি অবিভাগেন বোধাত্মকেন রূপেণ আস্তে।—দ্রঃ K. Sh., p. 55, n 1

৮ শ্রীমৎপরমশিবস্য পুনঃ বিশ্বোত্তীর্ণ-বিশ্বাত্মক-পরমানন্দময়-প্রকাশৈকঘনস্য এবংবিধমেব শিবাদিধরণ্যন্তম্ অখিলম্ অভেদেনৈব স্ফুরতি।—প্র হৃ. পৃঃ ৮

অভাব নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই। তবু যে তিনি বিশ্বকে বাইরে আভাসিত করেন সে তাঁর স্বীয় স্বাতন্ত্র্যমাহাত্ম্যে।[১]

পঞ্চশক্তি—পরম শিবকে বলা হয়েছে 'পঞ্চশক্তিসুনির্ভর'[২] অর্থাৎ পঞ্চশক্তিদ্বারা পূর্ণ। চিৎ, আনন্দ, ইচ্ছা, জ্ঞান এবং ক্রিয়া এই পঞ্চশক্তি। এই পঞ্চশক্তিকে শিবের পঞ্চমহাতনুও বলা হয়।[৩] শিব, শক্তি, সদাশিব, ঈশান (ঈশ্বর) এবং বিদ্যা নামক পঞ্চতত্ত্বরূপে পরম শিবের এই পঞ্চশক্তিরই প্রকাশ হয়।[৪] অর্থাৎ এই পাঁচটি তত্ত্বে পরম শিব আলোচ্য পঞ্চশক্তিরূপে প্রকাশিত হন। এই পঞ্চশক্তি বস্তুতঃ একই শক্তির প্রকারভেদমাত্র। এইজন্য এই পাঁচটি তত্ত্বের প্রত্যেকটিতে আলোচ্য পঞ্চশক্তি বিদ্যমান। তবে এক এক তত্ত্বে এক এক শক্তির প্রাধান্য আর এর দ্বারাই এদের পরস্পরভেদ নিরূপিত হয়।[৫]

শিবতত্ত্ব—অবরোহক্রমে ষটত্রিংশত্তত্ত্বের আদি তত্ত্ব শিবতত্ত্ব। শিবতত্ত্ব চিৎশক্তিপ্রধান। আচার্য জয়রথ বলেন চিন্মাত্রস্বরূপ পরম শিবই এই বিশ্ব।[৬] লক্ষ্য করা গেছে চিৎশক্তিকে প্রকাশতা বলা হয়েছে। আর প্রকাশকে বলা হয়েছে 'অনন্যোন্মুখবিমর্শাত্মা অহম্'।[৭] এর অর্থ প্রকাশের বিশ্রান্তি স্বাত্মপ্রকাশতা। কাজেই ত্রিকমতে পরম শিবের শুদ্ধ-অহংবোধরূপে শক্তিদশাগত স্ফুরণ শিবতত্ত্ব।[৮] অর্থাৎ এই তত্ত্বে শুধু শুদ্ধ-অহংবোধ আছে 'ইদম্' নেই। ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞায় বলা হয়েছে যে-অন্যোন্মুখ তাকে বলে 'ইদম্'।[৯]

সব তত্ত্বেই প্রকাশরূপ শিবতত্ত্ব 'অনুগত', সেইজন্য শিবতত্ত্বকে বলা হয় সর্বতত্ত্বময়।[১০]

শিবতত্ত্বকে সৃষ্টির প্রথম স্পন্দও বলা হয়। অনুত্তরমূর্তি পরম শিব নিজ ইচ্ছাদ্বারা এই নিখিল জগৎ সৃষ্টি করবার জন্য স্পন্দিত হন। জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাঁর সেই প্রথম স্পন্দকে শিবতত্ত্ব বলেন।[১১]

শক্তিতত্ত্ব—পরম শিবের সঙ্গে এক হয়ে অবস্থিত বিশ্ব শিবতত্ত্বে থাকে না। যে-শক্তি

১ ঈ প্র, প্র ভা, পৃ ১ ২ ত আ ৯।৪৯

৩ চিদানন্দেষাজ্ঞানক্রিয়াপঞ্চমহাতনুঃ।—দ্রঃ ত আ, ন আ, পৃঃ ৪৯

৪ চিদানন্দেষণাজ্ঞানক্রিয়াণাং সুস্ফুটত্বতঃ শিবশক্তিসদেশানবিদ্যাখ্যং তত্ত্বপঞ্চকম্।—ঐ ৯।৫০

৫ ঐ ৯।৫১ ৬ ত আ, ন আ, পৃঃ ৫০-৫১

৭ প্রকাশস্যানন্যোন্মুখবিমর্শাত্মা অহমিতি।—ঈ প্র, বি ভা, পৃঃ ১৯৮

৮ পরমশিব এব…প্রথমম্ অহমিতিপরামর্শতয়া শক্তিদশামধিশয়ানঃ
প্রস্ফুরেৎ প্রস্ফুরতি ইতি সম্ভাব্যতে।—ঈ প্র, প্র ভা, পৃঃ ১

৯ যদন্যোন্মুখঃ স ইদম্।—ঈ প্র, বি ভা, পৃঃ ১৯৬ ১০ শি দৃ, পৃঃ ২২

১১ যদয়মনুত্তরমূর্তির্নিজেচ্ছয়া নিখিলমিদং জগৎ স্রষ্টুম্। পস্পন্দে স স্পন্দঃ প্রথমঃ শিবতত্ত্বমুচ্যতে তজ্জ্ঞৈঃ।
—তন্ত্রসদ্ভাববচন, দ্রঃ K. Sh., p. 65, n

বা শক্তির যে-রূপ বিশ্বের এই তিরোধান ঘটান তাঁর সেই নিষেধব্যাপাররূপতাকে শক্তিতত্ত্ব বলা হয়।[১] এইজন্য শিবতত্ত্ব এবং শক্তিতত্ত্বের কোনো পৌর্বাপর্য অনেকে স্বীকার করেন না। তাঁরা মনে করেন উভয় তত্ত্বের সামরস্য অর্থাৎ একত্রস্ফুরণ হয়। আবার লক্ষ্য করা গেছে অনেকে শক্তিতত্ত্বকে শিবতত্ত্ব থেকে পৃথক্ তত্ত্বও মনে করেন না।

তবে যাঁরা শক্তিতত্ত্বকে পৃথক্ তত্ত্ব মনে করেন তাঁদের মতে শক্তিতত্ত্ব আনন্দশক্তিপ্রধান। শিবের স্বাতন্ত্র্যকে বলা হয় আনন্দশক্তি।[২] লক্ষ্য করা গেছে স্বাতন্ত্র্য অর্থ অনন্যমুখাপেক্ষিতা। কাজেই আনন্দশক্তি অনন্যাপেক্ষ। চিৎশক্তির মতো আনন্দশক্তিরও স্বরূপবিশ্রান্তি।

এই তত্ত্বে আছে শুধু আনন্দবোধ। এতেও 'ইদম্' স্ফুট নয়। বলা হয় শিবতত্ত্বের 'অহম্'-এর সঙ্গে এই তত্ত্বে 'অস্মি' যুক্ত হয়েছে অর্থাৎ এই তত্ত্বাবস্থিত প্রমাতার 'অহম্ অস্মি' আমি আছি এরকম বোধ হয়।[৩]

শক্তিতত্ত্বকে বলা হয়েছে ইদংতা-প্রবর্তনে উন্মুখিতা অর্থাৎ বিচিত্রবিশ্বের স্ফুরণোন্মুখিতা। কিন্তু শক্তিতত্ত্ব অন্যনিরপেক্ষ বলে এই উন্মুখিতা অন্তর্মুখী।[৪] এই জন্য শক্তিতত্ত্বকে বিশ্বের যোনি বা বীজাবস্থাও বলা হয়।[৫]

সদাশিবতত্ত্ব—সদাশিবতত্ত্ব বা সাদাখ্যতত্ত্ব ইচ্ছাশক্তিপ্রধান।[৬] আচার্য উৎপলদেব সদাশিবকে বলেছেন 'নিমেষোঽন্তঃ'।[৭] নিমেষ অর্থ প্রলীন অবস্থা বা দশা। অহংতার মধ্যে ইদংতার প্রলীন অবস্থা বা অস্ফুট অবস্থা নিমেষ।[৮] প্রলীন অবস্থাকে আন্তরদশাও বলা হয়। এই আন্তর দশা বস্তুতঃ শিবত্বের আন্তরদশা। এর উদ্রেকে সাদাখ্য বা সদাশিবতত্ত্বের স্ফুরণ হয়।[৯]

আচার্য অভিনবগুপ্ত সদাশিবতত্ত্বকে বলেছেন পরম শিবের নিমেষশক্তি।[১০] স্মরণ রাখা প্রয়োজন তত্ত্বের নাম সদাশিব আবার তত্ত্বের অধিষ্ঠাতৃদেবতার নামও সদাশিব। সংহারক্রমে সদাশিবতত্ত্ব থেকেই জগতের প্রলয় হয়।[১১]

১ K. Sh., pp. 63, 64 ২ তস্য চ স্বাতন্ত্র্যম্ আনন্দশক্তিঃ।—ত সা, পৃঃ ৬

৩ Abhi., 2nd Ed., p 364 ৪ দ্রঃ শি সূ ১।১৮ ও টীকা ৫ K. Sh., p. 64, n. 3

৬ এ বিষয়ে সোমানন্দ প্রমুখ আচার্যেরা ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁদের মতে সদাশিবতত্ত্ব জ্ঞানশক্তিপ্রধান (এই তত্ত্বে ক্রিয়াশক্তিও বিদ্যমান) আর শিবতত্ত্ব ইচ্ছাশক্তিপ্রধান। দ্রঃ শি দৃ, পৃঃ ৩৬-৩৭

৭ নিমেষোঽন্তঃ সদাশিবঃ।—ঈ প্র ৩।১।৩

৮ ঈ প্র, বি ভা, পৃঃ ১৯৩, ১৯৪ ও পাদটীকা ৩০

৯ কিংত্বান্তরদশোদ্রেকাৎ সাদাখ্যং তত্ত্বমাদিতঃ।—ঐ, পৃঃ ১৯০

১০ এবং নিমেষোন্মেষশক্তী এব সদাশিবেশ্বরৌ।—ঈ প্র, বি ভা, পৃঃ ১৯৫

১১ সদাশিবতত্ত্বম্ যতো জগতঃ প্রলয়ঃ।—ঈ প্র, বি ভা, পৃঃ ১৯৫

ঈশ্বরতত্ত্ব—ঈশ্বরতত্ত্বে জ্ঞানশক্তির প্রাধান্য। এই তত্ত্বে স্ফুটীভূত ইদংতার মধ্যে অহংতার প্রক্ষেপ হয়। অন্যভাবে বলা যায় এতে ইদংতা প্রবল।

আচার্য উৎপলদেব বলেছেন ঈশ্বর বহিরুন্মেষ।[১] উন্মেষ কথাটার অর্থ বিশ্বের (ইদংতার) স্ফুটত্ব বা বাহ্যত্ব।[২] যেমন শিবত্বের আন্তরদশার আভাসনকে বলে সদাশিবতত্ত্ব তেমনি তার ঐশ্বর্যের পরিস্ফুরণে 'বহীরূপতা'র প্রকাশকে বলে ঈশ্বরতত্ত্ব।[৩]

আচার্য অভিনবগুপ্ত ঈশ্বরতত্ত্বকে বলেছেন শিবের উন্মেষশক্তি।[৪] ঈশ্বরতত্ত্বের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতার নামও ঈশ্বর।

ক্ষিতি থেকে সদাশিবতত্ত্ব পর্যন্ত প্রত্যেক তত্ত্বেই উন্মেষ এবং নিমেষ আছে। কাজেই সদাশিবতত্ত্ব এবং ঈশ্বরতত্ত্ব এই-সব তত্ত্বের প্রত্যেকটিতেই বিদ্যমান।[৫]

শুদ্ধবিদ্যাতত্ত্ব—শুদ্ধবিদ্যাতত্ত্ব বা সদ্‌বিদ্যাতত্ত্ব ক্রিয়াশক্তিপ্রধান। সদাশিব এবং ঈশ্বর এই উভয় তত্ত্বের স্বরূপে অভেদপরামর্শকে বলে বিদ্যাতত্ত্ব বা শুদ্ধবিদ্যাতত্ত্ব।[৬] এই তত্ত্বে অহংতা এবং ইদংতার সমান প্রাধান্য, একের মধ্যে অন্যের প্রক্ষেপ নেই। আচার্য উৎপলদেব বলেন অহংবুদ্ধি এবং ইদংবুদ্ধির সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ সমানস্বরূপতাকে বলে সদ্‌বিদ্যা।[৭] আবার একে পরমেশ্বরস্বাতন্ত্র্যোপজীবিনী বিশ্বেশ্বরশক্তিও বলা হয়।[৮]

এই তত্ত্বে 'অহম্' এবং 'ইদম্'-এর তুল্য প্রাধান্য বলে একে পরাপরদশাও বলা হয়। কেন না, পর অর্থ পূর্ণ অনন্যাপেক্ষ 'অহম্' আর অপর অর্থ অপূর্ণ অন্যাপেক্ষ 'ইদম্'।[৯] শ্রীরৌরব প্রভৃতি আচার্যেরা শুদ্ধবিদ্যাকে বলেন মহামায়া।[১০]

শিবতত্ত্ব থেকে শুদ্ধবিদ্যাতত্ত্ব পর্যন্ত পাঁচটি তত্ত্বকে শুদ্ধ অধ্বা বলা হয়। এইগুলি সাক্ষাৎভাবে শিবের ইচ্ছাতেই আভাসিত এবং অন্য তত্ত্বগুলি থেকে এখানেই এগুলির পার্থক্য।[১১] এই পাঁচটি ছাড়া অপর তত্ত্বগুলিকে অশুদ্ধ অধ্বা বলা হয়।

১ ঈশ্বরো বহিরুন্মেষঃ।—ঈ প্র, বি ভা, পৃঃ ১৯৩

২ বিশ্বস্য হি স্ফুটত্বং বাহ্যত্বমুন্মেষণম্।—ঐ, পৃঃ ১৯৪

৩ ত আ, ৯ আ, পৃঃ ৫০   ৪ ঈ প্র, বি ভা, ১৯৫   ৫ ঐ, পৃঃ ১৯৪, পাদটীকা ২৮

৬ সদাশিবেশ্বরোভয়রূপস্য যঃ স্বরূপাবভেদপরামর্শস্তদ্বিদ্যা
নাম তত্ত্বমিত্যর্থঃ।—ঈ, প্র, বি ভা, পৃঃ ১৯৭, পাদটীকা ৩৬

৭ সামানাধিকরণ্যং চ সদ্বিদ্যাহমিদংধিয়োঃ।—ঐ, পৃঃ ১৯৬

৮ শুদ্ধবিদ্যেতি পরমেশ্বরস্বাতন্ত্র্যোপজীবিনী বিশ্বেশ্বরশক্তিঃ।—ঐ, পৃঃ ২০১, পাদটীকা ৫২

৯ ঐ, পৃঃ ১৯৯   ১০ ঐ, পৃঃ ২০০

১১ তদেবং পঞ্চকমিদং শুদ্ধোঽধ্বা পরিভাষ্যতে।
তত্র সাক্ষাচ্ছিবেচ্ছৈব কর্ত্র্যাভাসিতভেদিকা।—ত আ ৯।৩০

"অনুলোমক্রমে প্রাগুক্ত শিবাদি পাঁচটি তত্ত্বে যথাক্রমে শাম্ভবগণ, শক্তিজগণ, মন্ত্রমহেশগণ মন্ত্রনায়কগণ এবং মন্ত্রগণ অবস্থিত।"[১]

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় শিবাদ্বয়বাদীদের মতে এই সব 'গণ' গ্রাহক বা প্রমাতা (experiencer)। এই পাঁচ প্রকারের প্রমাতা ছাড়া আরও তিন প্রকারের প্রমাতা আছেন। যথা—বিজ্ঞানাকল, প্রলয়াকল এবং সকল।[২] মতান্তরে প্রমাতা সাত রকমের। যথা—শিব, মন্ত্রমহেশ্বর, মন্ত্রেশ্বর, মন্ত্র, বিজ্ঞানাকল, প্রলয়াকল এবং সকল।[৩]

শুদ্ধ অধ্বার কর্তা শিব আর অশুদ্ধ অধ্বার কর্তা অনন্ত।[৪] অনন্তকে অঘোরেশও বলা হয়। অঘোরেশ মন্ত্রমহেশ্বরগণের প্রথম।[৫] তন্ত্রালোকে বলা হয়েছে "তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছাবশতঃ ক্ষুব্ধ ভোগপ্রবণ সঙ্কুচিত আত্মবর্গের (জীবগণের) ভোগসাধনের নিমিত্ত তত্ত্বগুলিকে প্রকাশ করিয়া থাকেন।"[৬] মায়াকে বিক্ষুব্ধ করে তিনি এই কাজ করেন। অশুদ্ধ তত্ত্বগুলি প্রকাশ করা আর সংসার নির্মাণ করা একই কথা। তাই বলা হয়েছে তিনি মায়াকে বিক্ষুব্ধ করে বিচিত্র সংসার নির্মাণ করেন।[৭]

মায়াতত্ত্ব—তন্ত্রালোকে বলা হয়েছে "মায়াও শিব হইতে অতিরিক্ত বস্তু নহে। ইহা শিবের স্বাতন্ত্র্যশক্তিমাত্র এবং শিব হইতে অভিন্ন। এই মায়া হইতেই সর্বত্র ভেদের অবভাস হয়।"[৮]

এই মায়াশক্তি কেমন? বলা হয়েছে তিনি একা, ব্যাপিনী, সূক্ষ্মা, নিষ্কলা, জগতের নিধি, অনাদি, অনন্তা, অশিবা, ঈশানী এবং নিত্যা।[৯]

মায়া তিরোধানশক্তি।[১০] এখানে তিরোধান অর্থ বিলয় নয়। তিরোধান অর্থ আবরণ বা স্বরূপ-অপ্রকাশন বা মল বা অজ্ঞান।[১১] মায়া বেদ্য বা গ্রাহ্য বা প্রমেয় এবং বোধক বা

১ শাম্ভবাঃ শক্তিজা মন্ত্রমহেশা মন্ত্রনায়কাঃ। মন্ত্রা ইতি বিশুদ্ধাঃ স্যুরমী পঞ্চগণাঃ ক্রমাৎ।—ত আ, ৯।৫৩-৫৪

২ Abhi, 2nd Ed., pp. 309·3.0 ৩ প্র হৃ, পৃঃ ৬, পাদটীকা

৪ শুদ্ধেঽধ্বনি শিবঃ কর্তা প্রোক্তোঽনন্তোঽসিতে প্রভুঃ।—দ্রঃ ত আ, ৯ আ, পৃঃ ৫৩

৫ অঘোরেশো মন্ত্রমহেশানাং প্রথমঃ।—ঐ, পৃঃ ৫৫

৬ ঈশ্বরেচ্ছাবশক্ষুব্ধভোগলোলিকচিদ্গণান্। সংবিভক্তুমঘোরেশঃ সৃজতীহ সিতেতরম্।—ত আ ৯।৬১

৭ মায়াং বিক্ষোভ্য সংসারং নির্মিমীতে বিচিত্রকম্।—ঐ ৯।১৪৪ (পৃঃ ১১৩)

৮ মায়া চ নাম দেবস্য শক্তিরব্যতিরেকিণী। ভেদাবভাসস্বাতন্ত্র্যং তথাহি স তয়া কৃতঃ।—ত আ ৯।১৪৯

৯ সা চৈকা ব্যাপিনী সূক্ষ্মা নিষ্কলা জগতো নিধিঃ।
অনাদ্যন্তাশিবেশানী ব্যয়হীনা চ কথ্যতে।—দ্রঃ ত আ, ৯ আ, পৃঃ ১১৭

১০ তিরোধানকরী মায়াভিধা পুনঃ।—ঈ প্র ৩।১।৭

১১ ঈ প্র, বি ভা. পৃঃ ২০৩, পাদটীকা ৫৮

গ্রাহক বা প্রমাতা উভয়ের স্বরূপ আবৃত করেন।[১] তিরোধানশক্তি মায়াকে মোহও বলা হয়।[২] ভেদাবভাসকেও মায়া বলা হয়ে থাকে।[৩]

"আগু যে ভেদাবভাস তাহাকে বলা হয় পরা নিশা অর্থাৎ মহতী মায়া। মায়ার সকল প্রকার ভেদই এই মহতী মায়ার অন্তর্গত।"[৪]

তন্ত্রালোকে অন্যত্র বলা হয়েছে মায়া জীবকে চিন্ময় শিব থেকে পৃথক্ করে দেন অর্থাৎ জীবের স্বরূপ গোপন করে দেন। কাজেই তখন জীবের অচিন্ময়তা প্রকাশ পায় এবং জীব সুষুপ্তের মত অবস্থান করে। এই অবস্থায় তার পূর্ণজ্ঞানক্রিয়া তিরোহিত হয়।[৫]

ত্রিকমতে মায়া বিশ্বের হেতু। এইজন্য তাঁকে বলা হয়েছে ব্যাপিনী।[৬] এঁরা মায়াকে জড়ও বলেন। জড় বস্তু মায়া থেকে উৎপন্ন হয়েছে, এইজন্য মায়া জড়। পরিচ্ছিন্ন-প্রকাশতা জড়ের লক্ষণ।[৭] অর্থাৎ 'এইটে এখানে এখন প্রকাশিত হচ্ছে' এমনি দেশকালের দ্বারা যার প্রকাশ পরিচ্ছিন্ন বা খণ্ডিত তাই জড়। মায়া এই ভেদ প্রকাশ করেন বলে মায়া অশিবা।[৮]

কিন্তু মায়া শিবশক্তি। তাই শিবের সঙ্গে তাঁর অবিনাভাবসম্বন্ধ। সেইজন্য তিনি নিত্যা অর্থাৎ অনাদি, অনন্ত এবং এক। তিনিই বিশ্বের মূল কারণ।[৯]

শিবের অব্যভিচারিণী শক্তি মায়াই ভেদনিরূপণকারী তত্ত্বভাব প্রাপ্ত হন।[১০] মায়া কলাদি-তত্ত্বের উপাদান-কারণ এবং তাঁর কার্য কলাদি আবার অব্যক্তাদির উপাদান-কারণ।[১১]

তন্ত্রালোকে বলা হয়েছে "সেই মায়া ক্ষুব্ধ হইলে নিখিল বিশ্ব প্রসব করিয়া থাকে। দণ্ডাহত আমলকী ফলের ন্যায় চতুর্দিকে তাহার সৃষ্টি প্রসৃত হইয়া থাকে। এরূপ অক্রমিক সৃষ্টিতেও পৌর্বাপর্যের জ্ঞান হয় বলিয়া তত্ত্বসমূহের মধ্যে কার্যকারণতার কল্পনা করা হয়।

১ K. Sh., p 76

২ মোহয়তি অনেন শক্তিবিশেষেণ ইতি বা মোহো মায়াশক্তিঃ।—ঈ প্র, প্র ভা, পৃঃ ৩৫, পাদটীকা ৬৭

৩ শৈব ভেদাবভাস ইত্যুচ্যতে।—ত আ, ন আ, পৃঃ ১১৬

৪ আগ্যো ভেদাবভাসো যো বিভাগমনুপেয়িবান্। গর্ভীকৃতানন্তভাবিবিভাগা সা পরা নিশা।—ত আ ৯।১৫০

৫ মায়া হি চিন্ময়াদ্ ভেদং শিবাদ্বিবিদতী পশোঃ। সুষুপ্তাভিধাবত্ত্বে তত এব লুপ্তক্রিয়ঃ।—ঐ ৯।১৭৫

৬ ব্যাপিনী বিশ্বহেতুত্বাৎ।—ঐ, পৃঃ ১১৭

৭ পরিচ্ছিন্নপ্রকাশত্বং জড়স্য কিল লক্ষণম্।—দ্রঃ ঐ

৮ ...অশিবা ভেদপ্রথাপ্রদা। দ্রঃ ঐ, পৃঃ ১১৮

৯ শিবশক্ত্যবিনাভাবান্নিত্যৈকা মূলকারণম্।—ঐ ৯।১৫২

১০ যথা চ মায়া দেবস্য শক্তিরভ্যেতি ভেদিতাম্। তত্ত্বভাবম্... । ঐ ৯।১৪৪

১১ উপাদানং স্মৃতা মায়া কচিত্তত্ত্বকার্যকমেব চ।—ত আ ৯।১৪৮

কলাদিক্ষিত্যন্ত তত্ত্বসমূহ মায়ারূপ কারণের কার্য হইলেও কার্যগুলির মধ্যে পুনরায় কার্য-কারণভাব প্রদর্শিত হইয়াছে।"[১]

কাজেই দেখা যাচ্ছে কলাদিক্ষিত্যন্ত তত্ত্বগুলি মায়ার অন্তর্গত।[২] এই তত্ত্বগুলি জীবের ভোগসাধন।[৩] প্রত্যেক জীবের কর্মানুসারে সুখদুঃখাদি ভিন্ন হয়। সুখদুঃখাদির এই ভেদের জন্য প্রত্যেক জীবে উক্ত তত্ত্বগুলি ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়।[৪]

কলাতত্ত্ব—মায়াতত্ত্ব থেকে কলাতত্ত্বের উদ্ভব হয়। কলাতত্ত্বের লক্ষণ কিঞ্চিৎকর্তৃত্ব অর্থাৎ জীবের সঙ্কুচিতকর্তৃত্ব।[৫]

কলাও বস্তুতঃ শিবেরই কর্তৃত্বপ্রকাশিকা শক্তি। তন্ত্রালোকে বলা হয়েছে "নিরুদ্ধশক্তি শিবের কর্তৃত্বপ্রকাশিকা শক্তি সংকুচিত হইয়া জীবে অবস্থান করিলে সেই শক্তিকেই কলা বলা হয়।"[৬] সহজ কথায় শিবের জীবনিষ্ঠ সংকুচিতকর্তৃত্বশক্তি কলা।

কলাসমাযুক্ত জীবই ভোগকর্তা।[৭] কলা বিদ্যাদির মতো করণ নয়, জীবের কর্তৃত্বব্যাপারে প্রযোজককর্ত্রী।

শিবাদ্বয়বাদীদের মতে জীব এবং কলার পার্থক্যজ্ঞান হলে জীব বিজ্ঞানাকল হন। তাঁরা বলেন "কলা ও জীব এককর্তৃকারকীভূত হইয়া এরূপভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে যে, তাহাদের পার্থক্য লক্ষ্য করা কঠিন। ভগবদনুগ্রহে যদি কাহারও জীব ও কলার পার্থক্যজ্ঞান উৎপন্ন হয় তবে তাঁহার মায়া এবং জীববিষয়ক জ্ঞানও হইয়া থাকে। ইহাতে তাঁহার সর্বকর্ম ক্ষয় হইয়া যায়, তিনি বিজ্ঞানাকল হন এবং মায়ার নিম্নে তাঁহাকে আর দেহ ধারণ করিতে হয় না।"[৮]

বিদ্যাতত্ত্ব—কলাতত্ত্বের লক্ষণ নির্দেশ করা হয়েছে কিঞ্চিৎকর্তৃত্ব। কিন্তু জ্ঞান ছাড়া

১ সা মায়া ক্ষোভমাপন্না বিশ্বং সূতে সমন্ততঃ। যণ্ডাহপ্যেতবাস্তকো কলাদি কিল বস্তুপি।
তথাপি তু তথা চিত্রপৌর্বাপর্যাবভাসনাৎ। মায়াকার্যেঽপি তত্ত্বৌঘে কার্যকারণতাস্থিতিঃ।—ঐ ৯।১৬৬-১৬৭

২ কলাদিবসুধান্তং যন্মায়ান্তঃ সংপ্রচক্ষ্যতে।—ঐ ৯।১৬৭

৩ কলাদিবসুধান্তং ভোগসাধনম্।—ত আ, ব আ, পৃঃ ১৩১

৪ প্রত্যাত্মভিন্নমেবৈতৎ সুখদুঃখাদিভেদতঃ।—ঐ ৯।১৬৭

৫ মায়াতত্ত্বাৎ কলা জাতা কিঞ্চিৎকর্তৃত্বলক্ষণা।—ত আ ৯।১৭৪

৬ নিরুদ্ধশক্তের্যা কিঞ্চিৎকর্তৃতোচ্ছলনাত্মিকা।
নাথস্য শক্তিঃ সাধ্বাৎ পুংসঃ ক্ষেপ্ত্রী কলোচ্যতে।—ঐ ৯।১৫৫

৭ ততঃ কলাসমাযুক্তো ভোগেষু কর্তৃকারকম্।—প্রঃ ঐ, পৃঃ ১৩৩

৮ অলক্ষ্যান্তরয়োরিথং যদা পুংকলয়োর্ভবেৎ। মায়াগর্ভেশশক্ত্যাদেরজ্ঞানমথাভবৎ।
তদা মায়াপুংবিবেকঃ সর্বকর্মক্ষয়াৎ ভবেৎ। বিজ্ঞানাকলতা মায়াধস্তান্নো যাত্যয়ং পুমান্।
—ঐ ৯।১৮৪-১৮৫

কর্তৃত্ব হয় না।[১] কাজেই কিঞ্চিৎকর্তৃত্বের সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎজ্ঞত্বও স্বীকার করা হয়। কিঞ্চিৎজ্ঞত্ব শিবের জীবনিষ্ঠ সংকুচিতসর্বজ্ঞত্ব। এই কিঞ্চিৎজ্ঞত্বশক্তিই বিদ্যা। একে অশুদ্ধ বিদ্যাও বলা হয়। তন্ত্রসারে বলা হয়েছে কিঞ্চিৎজ্ঞত্বদায়িনী অশুদ্ধবিদ্যা কলা থেকে জাত।[২]

তন্ত্রালোকের মতে "বিদ্যা কলা থেকে উদ্ভূত হইলেও গৃহাভ্যন্তরস্থ দীপপ্রভার ন্যায় কিঞ্চিৎপ্রকাশস্বরূপা।"[৩]

ইন্দ্রিয়প্রণালী দ্বারা বুদ্ধিতে প্রতিসংক্রান্ত সুখদুঃখাদিরূপ বিষয়গুলিকে জীব বিদ্যা দ্বারা পরস্পর পৃথক্‌রূপে জানতে পারে।[৪]

কাজেই বিদ্যা করণ। সেইজন্য তন্ত্রালোকে বলা হয়েছে বুদ্ধিগত ভাব বা বিষয় বিদ্যারূপ করণের দ্বারা জীবের গোচর হয়।[৫]

রাগতত্ত্ব— কিঞ্চিৎজ্ঞত্ব এবং কিঞ্চিৎকর্তৃত্ব সর্বজীবসাধারণ। তা হলে প্রত্যেক জীবের জানা ও করার বিষয় অর্থাৎ ভোগ্য পৃথক্ হয় কেমন করে? ত্রিকমতে এটি হয় রাগতত্ত্বের জন্য। বিশেষ বিশেষ বস্তুর প্রতি জীববিশেষের যে-আসঙ্গ বা আসক্তি তাই রাগ। রাগ জীবকে এমন কি অশুচি ভোগবিশেষেও অনুরক্ত করে।[৬]

তন্ত্রালোকে আছে "জীব শুদ্ধ বস্ত্রের মত। কলাতত্ত্ব হইতে উৎপন্ন রাগ তাঁহাকে আসক্তিযোগে রঞ্জিত করিয়া থাকে। এই হেতু জীব সংসারসুখের আনন্দ পরিত্যাগ করিতে চায় না।"[৭]

অন্যত্র বলা হয়েছে "শিবের নিত্যতৃপ্তি সংকুচিত হইয়া অপূর্ণ জীবে আশ্রয় লাভ করে। জীবের তৃপ্তি অসম্পূর্ণ। সর্বদা জীবের ভোগ্যবিষয়ে আসক্তি থাকে। শিবের এই সঙ্কুচিত তৃপ্তিকেই রাগ বলা হয়।"[৮] শিবের জীবনিষ্ঠ সংকুচিতপূর্ণত্ব রাগ।[৯]

ত্রিকদর্শনের এই রাগ সাংখ্যমতের বুদ্ধিধর্ম অবৈরাগ্যমাত্র নয়। কেন না, এঁদের মতে তৃপ্ত জীবের বৈরাগ্যেও সূক্ষ্মভাবে রাগ থাকে।[১০] রাগ জীবধর্ম। "আমার বিষয় উপভোগ

১ জ্ঞানং বিনা ন কর্তৃত্বং কস্যচিদ্ যুজ্যতে যতঃ।—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ১৫০

২ কিঞ্চিজ্‌জ্ঞত্বদায়িন্যশুদ্ধবিদ্যা কলাতো জাতা।—ত সা, পৃঃ ৮১

৩ বিদ্যা চাত্র কলাতঃ গর্ভাগারদীপকপ্রভেবাস্ফুটং।—ত আ ৯।২০৩ ৪ ত আ, ন আ, পৃঃ ১৫৩

৫ তস্মাদ্‌ বুদ্ধিগতো ভাবো বিদ্যাকরণগোচরঃ।—ত আ, ন আ, ৯।১৯৮

৬ রাগোঽনুরঞ্জয়ত্যেনং স্বভোগেষ্বশুচিষ্বপি।—দ্রঃ ত আ, ন আ, পৃঃ ১৫৭

৭ রাগশ্চ কলাতত্ত্বাচ্ছুচিবস্ত্রকষায়বৎ সমুৎপন্নঃ। ত্যক্তুং বাঞ্ছতি ন যতঃ সংসৃতিসুখসংবিদানন্দম্।—ঐ ৯।২১০

৮ দ্রঃ ত আ ৯।১৯৯ ও টীকা ৯ প্র হ, পৃঃ ২২

১০ ন চাবৈরাগ্যমাত্রং তত্ত্বালাভ্যাসক্তিবুদ্ধিতঃ। বিরক্তাবপি তৃপ্তস্য সূক্ষ্মরাগব্যবস্থিতেঃ।—ত আ, ৯।২০০

হউক—এই প্রকার নিরবচ্ছিন্ন সামান্যাকার বিষয়মাত্রাবচ্ছিন্ন অভিলাষকে লোলিকা বলা হয়। এই লোলিকাই জীবধর্মরূপে রাগসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।" এই রাগই তত্ত্ব। সাংখ্যোক্ত "বুদ্ধিধর্ম রাগ সামান্যাকারে পরিব্যাপ্ত হয় না। সেই রাগ বিষয়ের ভেদবৈচিত্র্যে বুভুক্ষা, পিপাসা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে।"[১]

কালতত্ত্ব—"কলাদ্বারা অপূর্ণকর্তৃত্ব, বিদ্যাদ্বারা বিবেক বা বিবিক্তবিষয়ককর্তৃত্ব, রাগের দ্বারা নির্দিষ্টবস্তুবিষয়ককর্তৃত্ব জীবে আশ্রয় লাভ করে। কর্তৃত্বের সহিত সম্বন্ধ থাকিলেই ভূত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কালের প্রতীতিও অবশ্যই থাকিবে। এই প্রতীতির উপপত্তি-নিমিত্ত কালতত্ত্ব স্বীকার করিতে হয়।"[২]

শিবের জীবনিষ্ঠ সঙ্কুচিতনিত্যত্বশক্তিই কালতত্ত্ব।[৩]

নিয়তিতত্ত্ব—এই কারণের থেকে এই কার্যই হবে—এমনি কার্যকারণনিয়মনশক্তিকে বলে নিয়তি। বিশেষ প্রয়োজন সাধনের জন্য জীব বিশেষ বস্তুকে গ্রহণ করে। যেমন রন্ধনের জন্য অগ্নিকে গ্রহণ করে, লোষ্ট্রকে নয়। এ রকম যে করে তার কারণ নিয়তি। নিয়তি জীবকে তার বিশিষ্ট কার্যে নিয়োজিত করে।[৪] শিবের জীবনিষ্ঠ সঙ্কুচিতব্যাপকত্বশক্তি নিয়তি।[৫]

বিশ্বের দুইভাগ—ভোক্তা এবং ভোগ্য।[৬] কলা থেকে নিয়তি পর্যন্ত তত্ত্বগুলি ভোক্তৃ-ভাবে অবস্থিত।[৭] তন্ত্রালোকে বলা হয়েছে "এই তত্ত্বসমূহের যোগে পরাসংবিদে ভোক্তৃস্বরূপ পরিমিতভাবের উদয় হইয়া থাকে।"[৮]

মায়া, কলা, বিদ্যা, রাগ, কাল এবং নিয়তি এই ছয়টি তত্ত্বকে সংবিদের কঞ্চুক বলা হয়। এই কঞ্চুক অর্থাৎ আবরণ থাকার জন্য সংবিৎ (শিব) পরিমিত হয়ে পশু হয়ে যান।[৯] এই ষট্‌কঞ্চুক অন্তরঙ্গ আবরণ।[১০] অনেক সময় কঞ্চুকের তালিকা থেকে মায়াকে বাদ দিয়ে পঞ্চকঞ্চুক বলা হয়।[১১]

১ ত আ, ন আ, পৃঃ ৫৮-৫৯ ২ ঐ, পৃঃ ১৫৮-১৫৯ ৩ প্র হৃ, পৃঃ ২২

৪ (i) নিয়তির্যোজনাং ধত্তে বিশিষ্টে কার্যমণ্ডলে।—ত আ, ৯।২০২

(ii) নিয়তির্যোজয়ত্যেনং স্বকে কর্মণি পুদ্গলম্।—দ্রঃ ত আ, ন আ পৃঃ ১৩০ ৫ প্র হৃ, পৃঃ ২২

৬ ভোক্তৃভোগ্যরূপতয়া বিশ্বং তাবৎ দ্বিবিধম্।—ত আ, ন আ, পৃঃ ১৩২

৭ কলাদি ভোক্তৃভাবে স্থিতং।—ঐ, পৃঃ ১৩৩

৮ এতত্তত্ত্বযোগাদেব হি পরস্যাঃ সংবিদঃ পরং ভোক্তৃস্বরূপং পারিমিত্যং সমুদিয়াৎ।—ঐ

৯ মায়া কলা রাগবিদ্যে কালো নিয়তিরেব চ। কঞ্চুকানি ষড়ুক্তানি সংবিদস্তৎস্থিতো পশুঃ।—ত আ ৯।২০৪

১০ মায়াসহিতং কঞ্চুকষট্‌কমণোরন্তরঙ্গমিদমুক্তম্।—দ্রঃ ঐ, ন আ, পৃঃ ১৩৪

১১ কঞ্চুকপঞ্চকাত্মঃ।—ঐ, পৃঃ ৫৮

পুরুষতত্ত্ব—পূর্বোক্ত পশুই পুরুষ।[১] একে অণুও বলা হয়। আচার্য অভিনবগুপ্ত বলেন "দেহাদি বেদ্যবস্তুর মধ্যে যাহা একমাত্র প্রমাতৃস্বরূপ এবং অবেদ্য, মায়াদি ছয়টি কঞ্চুকের দ্বারা যাহার যথার্থ স্বরূপ আবৃত রহিয়াছে—আগমশাস্ত্রে তাহাকেই অণু বলা হয়।"[২]

এই অণুই পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্ব পুরুষতত্ত্ব। অণু, পুরুষ, জীব, এই-সব পর্যায়বাচক শব্দ। অণু সম্বন্ধে পূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে। লক্ষ্য করা গেছে অণু শিব ভিন্ন অন্য কেউ নয়।[৩] পশুভাবগৃহীত শিবই অণু।[৪]

মল—তন্ত্রালোকে আছে "সকল জীবেই কঞ্চুক বা আবরণ রহিয়াছে। এই আবরণই অশুদ্ধি বা আণব মল। সংসারের কারণ বলিয়া ইহাকে আণব মল বলা হয়।"[৫]

অথচ অন্যত্র কার্মমলকে সংসারের মুখ্য কারণ বলা হয়েছে।[৬] লক্ষ্য করা গেছে আণব মল কার্মমলেরও কারণ। কাজেই আণব মল সংসারের কারণ। আণব মল বস্তুতঃ মায়া।

যাক সে কথা। পুরুষ ত্রিবিধ মলবিদ্ধ ষট্‌কঞ্চুকাবৃত। পুরুষ মলাবৃত, মল আবার কঞ্চুকাবৃত। মল তণ্ডুলকণার ভিতরের আবরণ কম্বুকের মতো আর কঞ্চুক তার বাইরের আবরণ তুষের মতো।[৭]

বিভিন্ন প্রকারের মলযুক্ত পুরুষেরই সকল প্রভৃতি বিভিন্ন সংজ্ঞা হয়। আমরা দ্বৈতবাদী 'শৈব দর্শন'-এর আলোচনা প্রসঙ্গে সকল, প্রলয়াকল, বিজ্ঞানাকল প্রভৃতির সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। এ বিষয়ে ত্রিকদর্শনের একই রকম মত।

সকল—প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়ে সকল সম্বন্ধে বলা হয়েছে মায়াতত্ত্বান্তরালবর্তী, দেবাদিস্থাবরান্ত নানা বিচিত্ররূপে অবস্থানকারী, মলত্রয়ভাগী, কার্মমলের প্রাধান্যহেতু সংসারী, কার্যকারণ-সংবদ্ধ জীবেরা সকল।[৮]

১ মায়াপরিগ্রহবশাদ্ বোধো মলিনঃ পুমান্ পশুর্ভবতি।—পরমার্থসারবচন, দ্রঃ ত আ, প্র আ, পৃঃ ৭৪

২ দেহপুর্যষ্টকাদ্যেষু বেদ্যেষু কিল বেদনম্। এতৎষট্‌কসংকোচং বদবেদ্যমসাবণুঃ।—ত আ ৯।২০৫

৩ অণবো নাম নৈবান্যৎ প্রকাশাত্মা মহেশ্বরঃ।—ত আ ৯।১৪৪

৪ শিব এব গৃহীতপশুভাবঃ।—দ্রঃ ত আ, ন আ, পৃঃ ১১৩

৫ আবরণং সর্বাত্মগমশুদ্ধিরজ্ঞানাদ্যরূপেব।—ত আ ৯।২০৬;
আবরণং সংসারকারণত্বেনোক্তমাণবং মলম্।—ঐ, টীকা

৬ তত্রাপি কার্মমেবৈকং মুখ্যং সংসারকারণম্।—দ্রঃ ত আ, ন আ, পৃঃ ৫৩

৭ এবং চ পুংসো মলতাবর্জনঃ কম্বুকবৎ স্থিতঃ। তুষবৎ কঞ্চুকানি স্যুঃ...।—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ১৭০

৮ মায়াতত্ত্বান্তরালবর্তিনো দেবাদিস্থাবরান্তা মলত্রয়ভাজঃ কার্মমলপ্রাধান্যাৎ সংসারিণঃ কার্যকারণসংবদ্ধা জীবাঃ।—প্র হৃ, পৃঃ ৭২

প্রলয়াকল—প্রলয়াকল সম্বন্ধে বলা হয়েছে মায়াতত্ত্বে অবস্থিত শূন্যপ্রমাতা জীবেরা প্রলয়াকল।[১] শূন্যপ্রমাতা বলতে বুঝায় কলাতত্ত্বোপলক্ষিত কিঞ্চিৎকর্তৃত্ববিশিষ্ট অবোধরূপ সেই-সব জীবদের যাঁরা শূন্য অর্থাৎ জড়ত্বহেতু প্রাণ বা বুদ্ধিকে অহম্ এবং কর্তা মনে করেন।[২]

প্রলয়াকলেরা 'আমি কর্তা, এই আমার কাজ' এরকম ভাবনা করেন বলে কার্মমলাবৃত হন।[৩]

বিজ্ঞানাকল— বিজ্ঞানাকলের সম্বন্ধ বলা হয়েছে কর্তৃতাশূন্যশুদ্ধবোধাত্মা প্রমাতৃবর্গ বিজ্ঞানাকল।[৪] বিজ্ঞানাকলেরা 'আমি আমার' এই রকম ভাব ত্যাগ করেন এবং 'আমি কর্তা নই' এই ভাবনা করে কার্মমলমুক্ত হন।[৫] বিজ্ঞানাকলেরা শুধু আণবমলাবৃত থাকেন।

শিবাদ্বয়বাদীরা আণব মলের পাঁচটি বিভিন্ন অবস্থা স্বীকার করেন। যথা—দিধ্বংসিষু (ভবিষ্যতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে), কিঞ্চিৎধ্বংসমান, ধ্বংসমান, কিঞ্চিৎধ্বস্ত এবং ধ্বস্ত। এমনি এক এক অবস্থার মলাবৃত জীবই বিজ্ঞানাকল, মন্ত্রেশ, মন্ত্রমহেশ্বরাদি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন।[৬]

ত্রিকমতে শিবের ইচ্ছাতেই অণুতে মল প্রবৃদ্ধ হয়।[৭] এই মত অনুসারে 'পুরুষ' বহু। শিবের সংকুচিতরূপ বলে পুরুষ সাংখ্যের পুরুষের মতো স্বতন্ত্র নন। উভয় মতেই অবশ্য পুরুষ চেতন। কিন্তু সাংখ্যের পুরুষের মতো ত্রিকমতের পুরুষ সব সময়ে সকল অবস্থাতেই নির্লিপ্ত নন।[৮]

প্রকৃতিতত্ত্ব—কলা থেকে বেদ্যমাত্ররূপে স্ফুট প্রধান বা প্রকৃতি উদ্ভূত হয়।[৯] মায়া থেকেও প্রকৃতি বা অব্যক্তের উদ্ভবের কথাও পাওয়া যায়।[১০]

যে-বস্তু সুখাদিদ্বারা অনুমিত হয় তাই বেদ্য। সব বেদ্য বস্তুই প্রকৃতি বা প্রধান।[১১]

১ মায়াতত্ত্বাবস্থিতাঃ শূন্যপ্রমাতারঃ প্রলয়াকলাঃ।—ঐ, পৃঃ ৬৯

২ শূন্যে জড়ত্বাদবোধরূপে প্রাণে বুদ্ধৌ বা যেযামহমিতি চমৎকারযোগাৎ কর্তৃত্বম্,
কলাতত্ত্বোপলক্ষিতকরণকার্যরহিতা অবোধরূপাঃ কর্তারস্ত প্রলয়াকলাঃ।—ঐ, পৃঃ ৭১, ৭২

৩ Abhi., 2nd Ed., p. 443

৪ কর্তৃতাশূন্যশুদ্ধবোধাত্মা প্রমাতৃবর্গঃ।—প্র হৃ, পৃঃ ৭০   ৫ ত আ, ন আ, পৃঃ ৮৪   ৬ ঐ, পৃঃ ৮০-৮১

৭ তেষামণনাং স মল ঈশ্বরেচ্ছাবশাদ্বৃতঃ। প্রবৃধ্যতে···।—ঐ ৯।১৪৭

৮ Abhi., 2nd Ed., p. 377

৯ বেদ্যমাত্রং স্ফুটং ভিন্নং প্রধানং সূয়তে কলা।—ত আ ৯।২১৪

১০ ত আ, ন আ, পৃঃ ১৭৪   ১১ ঐ ৯।২২০

তবে প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত ভাবী বিশেষবেদ্যসমূহের তুলনায় প্রকৃতিকে বলা হয় বেদ্যসামান্যাত্মক বা সাধারণবেদ্য।[১]

প্রকৃতি পুরুষের সুখদুঃখমোহাত্মক ভোগ্য। ত্রিকমতে ভোক্তা এবং ভোগ্য পরস্পর অবিযুক্ত। বস্তুতঃ এদের মধ্যে কোনো ভেদ নেই। 'ভোক্তৈব ভোগ্যভাবেন সদা সর্বত্র সংস্থিতঃ।'—ভোক্তাই ভোগ্যভাবে সর্বদা সর্বত্র অবস্থিত। তবে উভয়ের মধ্যে মায়ীয় ভেদ স্বীকার করা হয়।[২]

প্রকৃতির সংজ্ঞা—তন্ত্রালোকের মতে সত্ত্বরজস্তমোগুণের সাম্যাত্মক অক্ষুব্ধ রূপ প্রকৃতি বা প্রধান।[৩] এই গুণত্রয় ক্ষুব্ধ হলেই মহৎ-আদি কার্য উৎপন্ন করে। অক্ষুব্ধ অবস্থায় এরূপ কার্য উৎপন্ন করতে পারে না। আচার্যেরা অবশ্য গুণত্রয়কেও পৃথক্ তত্ত্ব মনে করেছেন। তবে গুণ পৃথক্ তত্ত্ব হলেও প্রকৃতিরই কার্যজননোন্মুখ দ্বিতীয়রূপ মাত্র।[৪]

প্রকৃতি সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মিকা বলেই তাকে সুখদুঃখমোহাত্মক পুরুষভোগ্য বলা হয়েছে। তন্মধ্যে আছে সুখ প্রকাশাত্মক ভোগ্যরূপ সত্ত্বগুণ, দুঃখ প্রকাশাপ্রকাশ-আন্দোলনাত্মক ক্রিয়ারূপ রজোগুণ এবং মোহ প্রকাশের অভাবরূপ তমোগুণ।[৫] কাজেই সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মিকা প্রকৃতি সুখদুঃখমোহাত্মক পুরুষভোগ্য।

জীব অপূর্ণ। সেইজন্য তার মনে ভোগেচ্ছা জাগে। অবশ্য শিবের ইচ্ছাতেই জীবের এই ভোগেচ্ছা জন্মে।[৬] জীবের এই ভোগেচ্ছা চরিতার্থ করবার জন্যই স্বতন্ত্রেশ শ্রীকণ্ঠনাথরূপে শিব প্রকৃতিকে ক্ষুব্ধ করেন।[৭]

প্রকৃতি জড় ও বহু—ত্রিকমতে প্রকৃতি জড় এবং অনেক। প্রত্যেক পুরুষের প্রকৃতি ভিন্ন। পুরুষ অনেক, কাজেই প্রকৃতিও অনেক।[৮]

বুদ্ধিতত্ত্ব—গুণতত্ত্ব থেকে উৎপন্ন হয় বুদ্ধিতত্ত্ব।[৯] অর্থাৎ গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা ক্ষুব্ধ হলে তার থেকে উৎপন্ন হয় বুদ্ধি। বুদ্ধিতত্ত্ব সব চেয়ে নির্মল বলে তাতে 'পুংপ্রকাশ' অর্থাৎ আত্মসংবিদের প্রকাশ (আবির্ভাব) হয় এবং বাহ্য বেদ্যবস্তু প্রতিবিম্বিত হয়।[১০]

---

১ Abhi., 2nd Ed., p. 377   ২ ত আ, ন আ, পৃঃ ১৭২-৭৩

৩ তদেবং সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাত্মকমক্ষুব্ধং রূপং প্রধানমিত্যুক্তম্।—ত আ, ন আ, পৃঃ ১৭৮

৪ ঐ, পৃঃ ১৭৮-১৭৯   ৫ ত সা, পৃঃ ৮৪

৬ ঈশ্বরেচ্ছাবশাদস্য ভোগেচ্ছা সংপ্রজায়তে।—ত আ, ন আ, পৃঃ ১১৫   ৭ ঐ, পৃঃ ১৮০

৮ তচ্চ ভিন্নং প্রতিপুংনিয়মাদনেকমিতি যাবৎ।—ঐ, পৃঃ ১৭২

৯ ততো গুণতত্ত্বাৎ বুদ্ধিতত্ত্বম্।—ত সা, পৃঃ ৮৫

১০ গুণেভ্যো বুদ্ধিতত্ত্বং তৎ সর্বতো নির্মলং ততঃ। পুংপ্রকাশঃ স বেদ্যোঽত্র প্রতিবিম্বিতমাহৃতি।
—ত আ ৯।২২১

বুদ্ধি জড়। কিন্তু প্রকাশরূপ আত্মসংবিদের প্রতিবিম্বাধার বলে বেদ্যবস্তু বা বিষয় প্রকাশ করতে পারে।[১]

বুদ্ধি করণ। করণ বলেই সংবেদ্য।[২]

অহংকারতত্ত্ব— বুদ্ধিতত্ত্ব থেকে অহংকারের উদ্ভব হয়। অনাত্মরূপা (জড়) বুদ্ধি আত্মপ্রতিবিম্বের আধার হওয়াতে বেদ্যকলুষ বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত আত্মার ও বুদ্ধির একপরিণামত্ব হয় এবং তার জন্য 'আমি ইহা করি, আমি ইহা জানি' বুদ্ধিগত এই রকম অহমাত্মাভিমান হয়। এরই নাম অহংকার।[৩] এই অভিমান শুক্তিতে রজতাভিমানের মতো।[৪] শুদ্ধচিৎস্বাতন্ত্র্যময় স্বাত্মবিশ্রান্ত অহংভাব থেকে এই অহংকার পৃথক্ বস্তু।[৫]

ত্রিবিধ অহংকার—অহংকার থেকেই প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর প্রকাশ। অহংকারের কার্য এই পঞ্চবায়ুর প্রেরণ বা অপ্রেরণ। এই কার্যের দ্বারা সকলের জীবন রক্ষা পায় বা মৃত্যু ঘটে। অহংকারের প্রকৃতিত্ব (কারণরূপতা) অর্থাৎ 'অন্যবস্তুর উৎপাদকত্বস্বভাব' সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভেদে ত্রিবিধ।[৬]

সাত্ত্বিক অহংকার—সাত্ত্বিক অর্থাৎ "সত্ত্বপ্রধান অহংকার হইতে ভোক্তৃস্বভাব মন এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়-পাঁচটির উৎপত্তি হয়। শ্রোত্র (শ্রবণেন্দ্রিয়), ত্বক (স্পর্শেন্দ্রিয়), চক্ষু (দর্শনেন্দ্রিয়), জিহ্বা (রসনেন্দ্রিয়) ও নাসিকা (ঘ্রাণেন্দ্রিয়) এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়।"[৭]

বাহ্যেন্দ্রিয়গুলির অধিষ্ঠাতা মন। অর্থাৎ মনই বাহ্যেন্দ্রিয়গুলিকে স্ববিষয়ে প্রবর্তিত করে। তাই মনকে বলা হয়েছে 'সমস্তেন্দ্রিয়সঞ্চারচতুর'।[৮]

দেখা যায় একই সাত্ত্বিক অহংকার থেকে উৎপন্ন হলেও জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি প্রত্যেকে শুধু একটি নির্দিষ্ট বস্তুকে গ্রহণ করতে পারে কিন্তু সমস্ত বস্তুই মনের বিষয় হতে পারে। মনের এই সর্ববিষয়ত্ব থেকে জানা যায় অহংকার সর্বতন্মাত্রের কারণ।[৯]

অন্তঃকরণ—আবার বুদ্ধি, অহংকার এবং মন এই তিনকে অন্তঃকরণ বলা হয়। বুদ্ধির কাজ শব্দাদির বিষয়ে জ্ঞান। অহংকারের কাজ 'অহং' এই অভিমান আর মনের কাজ এষণ বা সঙ্কল্প।[১০]

১ ত আ, ন আ পৃঃ ১৮৩ ২ ঐ, পৃঃ ১৯২ ৩ ঐ, পৃঃ ১৮৩-১৮৪

৪ ত সা, পৃঃ ৮৬ ৫ ত আ, ন আ, পৃঃ ১৮৫

৬ ত্রিধাস্য প্রকৃতিত্বঃ সাত্ত্বরাজসতামসঃ।—ত আ ৯।২৩৩

৭ সত্ত্বপ্রধানাহংকারাদ্ ভোক্তৃস্পর্শিনঃ স্ফুটম্। মনোবৎ জ্ঞানষট্কং তু জাতং তেভ্য কথ্যতে।—ঐ ৯।২৩৭

৮ ত আ, ন আ, পৃঃ ২২০

৯ মনো যৎসর্ববিষয়ং তেনোত্র প্রবিবক্ষিতম্। সর্বতন্মাত্রকর্তৃত্বং বিশেষাদহংকৃতেঃ।—ত আ ৯।২৪১

১০ বুদ্ধ্যহংকৃন্মনঃ প্রাহুর্বোধসংরম্ভণৈষণে।—ঐ ৯।২৩৬

রাজসিক অহংকার—রাজসিক বা রজোগুণপ্রধান অহংকার থেকে বাক্, পাণি, পায়ু, উপস্থ এবং পাদ এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়।[১]

আমি বলি (বাক্‌সাহায্যে), আমি গ্রহণ করি (পাণিসাহায্যে), আমি ত্যাগ করি (পায়ুসাহায্যে), আমি বিসর্জন করি (উপস্থসাহায্যে) এবং আমি চলি (পাদসাহায্যে)—এরূপ কার্যকর্ম যে-অহংক্রিয়া তাই প্রকৃতপক্ষে কর্মেন্দ্রিয়।[২]

মন ও ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ—ত্রিকশাস্ত্রে মন এবং ইন্দ্রিয়াদির উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। এক মতে রাজস অহংকার থেকে মন এবং সাত্ত্বিক অহংকার থেকে ইন্দ্রিয়গুলির উৎপত্তি হয়েছে।[৩] আবার অন্য মতে সাত্ত্বিক অহংকার থেকে মন এবং রাজসিক অহংকার থেকে ইন্দ্রিয়গুলির উৎপত্তি হয়েছে।[৪]

ত্রিকমত অনুসারে জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয়গুলি কেবলমাত্র ভৌতিক (physical) নয়।[৫] এই গুলিকে বরং জীবনিষ্ঠ বিশেষ বিশেষ সংকুচিত শক্তি বলা যায়। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় যথাক্রমে শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, রসাস্বাদন ও গন্ধগ্রহণ এই পঞ্চবিধ মানস ব্যাপার বলে এইগুলিকে সংকুচিতজ্ঞানশক্তিরূপ শুদ্ধবিদ্যার প্রকাশ বলা যায়। তেমনি কর্মেন্দ্রিয়গুলিও যথাক্রমে বাচন, গ্রহণ, ত্যাগকরণ, বিসর্জন এবং চলন এই পঞ্চবিধ শারীরক্রিয়া বলে এগুলিকে সঙ্কুচিতক্রিয়াশক্তিরূপ কলার বিভিন্ন রূপ বলা যায়।[৬]

তামসিক অহংকার— তামসিক বা তমোগুণপ্রধান অহংকার থেকে ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের কারণ পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি হয়েছে। এইগুলির মধ্যে আছে ভোগ্যাংশের প্রাধান্য এবং ভোক্তৃংশের প্রচ্ছাদকতা। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি তন্মাত্রের এক একটি যথাক্রমে ব্যোমাদি এক একটি ভূতের প্রকাশক।[৭]

তন্মাত্রের ব্যাখ্যা—পৃথিবীতে আছে এক গন্ধমণ্ডল। তাতে আছে সৌরভ প্রভৃতি কত বিচিত্র রকমের গন্ধ। এই গন্ধমণ্ডলের কোনো বিশেষ গন্ধ নয়, অবিশেষ গন্ধত্বই গন্ধতন্মাত্র।[৮]

১ বাণী পাণী তথা পায়ুঃ পাদৌ চেতি রজোভবাঃ ।—উদ্ধৃত, ত আ, ন আ, পৃঃ ২০৩

২ বচ্ম্যাদদে ত্যজাম্যাশু বিসৃজামি ব্রজামি চ ।
ইতি যাহংক্রিয়া কার্যকর্মা কর্মেন্দ্রিয়ং তু তৎ ।—ত আ ৯।২৪৪ ৩ ঐ ৯।২৭৬ ৪ ত সা, পৃঃ ৮৯

৫ তন্মাত্র ভৌতিকানীন্দ্রিয়াণি ।—ত আ, ন আ, পৃঃ ১৯৫

৬ Abhi., 2nd Ed, p. 381

৭ তমঃপ্রধানাহংকারাৎ ভোক্তৃংশাচ্ছাদনাত্মনঃ । ভূতাদিনামতন্মাত্রপঞ্চকং ভূতকারণম্ ।—ত আ ৯।২৭১

৮ পৃথিব্যাং সৌরভাদ্যাদিবিচিত্রে গন্ধমণ্ডলে । যৎসামান্যং হি গন্ধস্য গন্ধতন্মাত্রনাম তৎ ।—ঐ ৯।২৮০

রস, রূপ, স্পর্শ এবং শব্দ সম্বন্ধেও ঐ একই কথা।[১] অবিশেষ রসত্ব রসতন্মাত্র, অবিশেষ রূপত্ব রূপতন্মাত্র, অবিশেষ স্পর্শত্ব স্পর্শতন্মাত্র এবং অবিশেষ শব্দত্ব শব্দতন্মাত্র।

পঞ্চ মহাভূত— তন্মাত্র থেকে পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি হয়েছে। কার্যজননোন্মুখ শব্দতন্মাত্র, থেকে অবকাশরূপ আকাশের উৎপত্তি। শব্দ অবকাশাত্মক। এইজন্য তার কার্য অবকাশরূপ আকাশ।[২] সমস্ত বস্তুতেই আকাশ বা অবকাশ আছে।[৩]

শব্দতন্মাত্র স্পর্শতন্মাত্রের যোগে ক্ষুব্ধ হলে অর্থাৎ কার্যজননোন্মুখ হলে বায়ুতা প্রাপ্ত হয়। সেইজন্য বায়ু শব্দ ও স্পর্শ এই উভয়াত্মক।[৪]

"পর পর ভূতবর্গে পূর্ব পূর্ব ভূতসমূহের গুণ যুক্ত থাকে। সেইহেতু, আকাশ ও বায়ুর পরস্পর অবিয়োগ শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। শব্দ ও স্পর্শ রূপের সহিত অবিযুক্ত অবস্থায় থাকে বলিয়া কার্যজননোন্মুখ শব্দস্পর্শবিশিষ্ট রূপতন্মাত্র হইতে তেজস্তত্ত্বের উৎপত্তি। বায়ুতে যেরূপ গৌণভাবে শব্দগুণের সত্তা রহিয়াছে, সেইরূপ তেজেও মুখ্য গুন রূপের সহিত গৌণভাবে শব্দ ও স্পর্শ অনুস্যূত আছে। এইভাবে মুখ্যতঃ অবস্থিত রসতন্মাত্রের সহিত গৌণতঃ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ জলে অবস্থিত এবং মুখ্যতঃ অবস্থিত গন্ধতন্মাত্রের সহিত শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস পৃথিবীতে অবস্থিত। এইহেতু, ভূমি বা পৃথিবী সর্বগুণযুক্তা।"[৫]

আলোচ্য দর্শনের মতে গুণ এবং গুণবিশিষ্ট বস্তু অভিন্ন।[৬]

"গন্ধাদি গুণসমূহ হইতে পৃথিব্যাদি তত্ত্ব ভিন্ন বস্তু নহে। এই কারণে গন্ধাদিগুণের অভিন্নরূপেই পৃথিব্যাদির প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। গন্ধকে বাদ দিয়া শুধু পৃথিবীর কখনও প্রত্যক্ষই হয় না।[৭]

তত্ত্বসমূহের পরস্পর সম্বন্ধ— "ত্রিকদর্শনে তত্ত্বসমূহের ক্রমিকতা যে-ভাবে নিরূপিত হইয়াছে সেই ভাবে লক্ষ্য করিলে জানা যাইবে, পূর্ব পূর্ব তত্ত্বে পর পর তত্ত্ব অপেক্ষা গুণেরও আধিক্য রহিয়াছে এবং পূর্ব পূর্ব তত্ত্বগুলি সমধিক ব্যাপক।"[৮]

আচার্য জয়রথ এখানে গুণশব্দের অর্থ করেছেন প্রকাশময়-চিৎধর্মতা।[৯] পূর্ব পূর্ব তত্ত্ব

---

১ এবং রসাদিশব্দান্তন্মাত্রেষপি যোজনা।—ঐ ৯।২৮২ ২ ত সা, পৃঃ ৯০

৩ আকাশোঽপি সর্বস্থেতি।—ত আ, ন আ, পৃঃ ২২৯

৪ তদেতৎস্পর্শতন্মাত্রযোগাৎ প্রক্ষোভমাগতম্।
বায়ুতামেতি তেনাত্র শব্দস্পর্শোভয়াত্মতা।—ঐ ৯।২৮৪

৫ শব্দস্পর্শৌ তু রূপেণ সমং প্রক্ষোভমাগতৌ। তেজস্তত্ত্বং ত্রিভির্ধর্মৈঃ প্রাহুঃ পূর্ববদেব তৎ।
তৈস্ত্রিভিঃ সরসৈরাপঃ সগন্ধৈর্ভূরিতি ক্রমঃ।—ত আ ৯।২৮৭, ২৮৮

৬ ত আ, ন আ, পৃঃ ২৩৩-২৩৪

৭ নহি গন্ধাদিধর্মেভ্যো ব্যতিরিক্তা বিভাতি ভূঃ।—ঐ ৯।২৮৯ ও টীকা ৮ ত আ ৯।৩০০

৮ প্রকাশময়চিদ্ধর্মতাখ্যো গুণঃ।—ত আ, ন আ, পৃঃ ২৪৪

ব্যাপক এবং পর পর তত্ত্ব ব্যাপ্য। এটি হয় গুণাধিক্যের জন্য, কার্যকারণভাবের জন্য নয়।[১]

অতএব তত্ত্বসমূহের মধ্যে শিবতত্ত্বই সর্বাপেক্ষা ব্যাপক এবং ক্ষিতিতত্ত্বই সর্বাপেক্ষা ব্যাপ্য। শক্তিতত্ত্ব থেকে জলতত্ত্ব পর্যন্ত তত্ত্বগুলিতে আপেক্ষিক ব্যাপকতা ও ব্যাপ্যতা উভয় ধর্মই অবস্থিত।[২]

এইভাবে বিচার করলে দেখা যাবে ক্ষিতিতত্ত্ব শিবাদিতেজান্ত তত্ত্বের দ্বারা ব্যাপ্ত; এমনিভাবে শক্তিতত্ত্ব পর্যন্ত পূর্বতত্ত্বের দ্বারা উত্তরতত্ত্ব ব্যাপ্ত।[৩]

শক্তিমান্-শক্তি-সম্বন্ধ—ত্রিকশাস্ত্র অনুসারে পূর্বতত্ত্ব ও উত্তরতত্ত্বের মধ্যে শক্তিমান্-শক্তি-সম্বন্ধ।[৪] আরোহক্রমে ধরাতত্ত্ব শক্তিরূপ আর জলতত্ত্ব শক্তিমদ্রূপ; ধরাতত্ত্বসহ জলতত্ত্ব শক্তিরূপ আর তেজস্তত্ত্ব শক্তিমদ্রূপ। এমনিভাবে শক্তিতত্ত্ব পর্যন্ত সমস্ত তত্ত্ব শক্তি এবং শিব শক্তিমান্।[৫] সেইজন্যই বলা হয়েছে পঞ্চত্রিংশৎতত্ত্বী শক্তি প্রভু শিবেরই শক্তি।[৬]

কুল-মত—কুল-মত[৭] কাশ্মীর শৈব মতের অন্তর্ভুক্ত একটি পৃথক্ মত এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

কুলশব্দের অর্থ—কুলশাস্ত্রে কুলশব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যথা—(ক) কুল বলতে বুঝায় সমূহাত্মকভাবে এবং কার্যকারণসম্বন্ধযুক্ত স্থূলসূক্ষ্ম-পর-প্রাণ-ইন্দ্রিয় ভূতাদি।[৮] (খ) কুল বোধের অর্থাৎ শিবাত্মা প্রকাশের শক্তিসদাশিবাদিভূতপঞ্চকপর্যন্ত স্ত্যানীভূত অর্থাৎ স্থূলীভূত রূপ। একে বন্ধন মনে করা হয়।[৯] (গ) কুল পরমেশ্বর ভৈরবভাস্বর রশ্মিচক্র।[১০] (ঘ) কুল অনুত্তর। পরপরামর্শাত্মা এই অনুত্তর পর অর্থাৎ ইনি শিবতত্ত্বেরও পরে। ইনি স্বস্বাতন্ত্র্যবশতঃ বিশ্ব অবভাসিত করতে ইচ্ছুক হয়ে প্রথমে নিজের মধ্যে শিবশক্তিরূপ

১ ব্যাপ্যব্যাপকতা যৈষা তত্ত্বানাং বর্ণিতা কিল।
সা গুণাধিক্যতঃ সিদ্ধা ন হেতুত্বান্ন নাথবৎ।—ত আ ৯।৩০৭   ২ ঐ ৯।৩১১

৩ তেন পৃথিবীতত্ত্বং শিবতত্ত্বাৎ প্রভৃতি জলতত্ত্বেন ব্যাপ্তম্, এবং জলং তেজসা ইত্যাদি যাবচ্ছক্তিতত্ত্বম্।—ত সা, পৃঃ ৯১

৪ কিং ভূত্তরং শক্তিতত্ত্বৈব তত্ত্বং পূর্বং তু তত্ত্বমতয়েতি জ্ঞেয়ঃ।—ত আ ৯।৩১২   ৫ ঐ, ব আ, পৃঃ ২৪৯

৬ পঞ্চত্রিংশত্তত্ত্বী শিবনাথস্যৈব শক্তিরুক্তেয়ম্।—ত্রঃ ঐ

৭ এই শৈব কুলমত সম্বন্ধে ডক্টর কান্তিচন্দ্র পাণ্ডে তাঁর ইংরেজি ভাষায় রচিত সদ্যঃপ্রকাশিত অভিনবগুপ্ত (২য় সং) নামক গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। আমরা এই আলোচনায় প্রধানতঃ ডক্টর পাণ্ডের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছি এবং তাঁর গ্রন্থ থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছি।

৮ পরাত্রিংশিকা, পৃঃ ৩২, Abhi., 2nd Ed., p. 594

৯ ঐ পৃঃ ৩৩, Ibid   ১০ ঐ পৃঃ ৩৫; Ibid

অবভাসিত করেন। এই কুল থেকে শিবলক্ষণ অকুল যা অবভাসিত হয় তা অকুল। কাজেই শিব অকুল।[১] তবে কোথাও কোথাও অনুত্তরকেও অকুল বলা হয়েছে।[২] (ঙ) শাক্তপ্রসরাত্মক জগৎকে কুল বলা হয়।[৩] (চ) কুল পরমেশ্বরের লয়োদয়কারিণী স্বাতন্ত্র্যশক্তি। কারণের দিক্ দিয়ে বিচারে ইনি সমস্তের ঊর্ধ্ববর্তিনী। ইনি পিণ্ড অর্থাৎ জগৎ এঁর সঙ্গে সামরস্যে অবস্থিত।[৪] (ছ) কুল পরমা শক্তি।[৫] কুল সর্বব্যবস্থিত সর্বেশ এবং সর্ব[৬] অর্থাৎ যা-কিছু সমস্ত। (ঝ) কুল পরমানন্দ।[৭] (ঞ) কুল শরীর।[৮] (ট) কুল আত্মস্বরূপ।[৯] (ঠ) কুল শিবশক্ত্যাত্মক।[১০] (ড) কুল অনুত্তর ও অনুত্তরার যামলরূপ।[১১]

কুল এবং কৌল—আগমশাস্ত্রে কুল এবং কৌল এই উভয় নামেই কুল-মতের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১২]

যাঁরা কুলকে পরমেশ্বর বা পরম সত্তা বলে মনে করেন, পরিণামে কুলৈকাত্ম্য লাভ যাঁদের লক্ষ্য তাঁদের বলা হয় কৌল এবং তাঁদের অনুসৃত মতকে বলা হয় কৌল-মত। যাঁরা শিবকে পরমেশ্বর বা পরম সত্তা মনে করেন তাঁদের অনুসৃত মতকে যেমন শৈব-মত বলা হয় তেমনি যাঁরা কুলকে পরমেশ্বর মনে করেন তাঁদের মত কৌল-মত।[১৩] এই যুক্তিতে কুল-মত আর কৌল-মত এক। তবে আগমশাস্ত্রে[১৪] এই উভয়কে পৃথক্ পৃথক্ মত বলে ধরা হয়েছে মনে হয়। আচার্য অভিনবগুপ্তও তাই মনে করেছেন।[১৫] উপযুক্ত তথ্যের অভাবে এই শঙ্কা নিরসন করা বর্তমান অবস্থায় সম্ভবপর মনে হয় না।

ত্রিক ও কুল-মত—লক্ষ্য করা গেছে কুল-মতকেও ত্রিক বলা হয়। তার কারণ এই—কুল-মতে অনুত্তর (চিৎ), আনন্দ, ইচ্ছা, এষণা, উন্মেষ এবং ঊনতা এই ছয় শক্তির মধ্যে চিৎ, ইচ্ছা এবং উন্মেষ এই তিন শক্তিকে অর্থাৎ ত্রিককে সার মনে করা হয়। এই

১ ত আ, তৃ আ, পৃঃ ৭৫ ; Ibid, p 595 ২ Abhi., 2nd Ed., p. 595

৩ ত আ, ন আ, পৃঃ ৭৬ ; Abhi , 2nd Ed., p, 595 ৪ ত আ, আহ্নিক ২৯, পৃঃ ৩ ; Ibid

৫ কুলং হি পরমা শক্তিঃ··· ।—ত আ, আহ্নিক ২৯, পৃঃ ৩

৬ ঐ পৃঃ ৪ ৭ কুলং স পরমানন্দঃ··· ।—ঐ

৮ কুলং শরীরমিত্যুক্তং··· ।—ঐ ৯ কুলমাত্মস্বরূপং তু··· ।—ঐ

১০ পরাত্রিংশিকা, পৃঃ ৩৬ ; Abhi , 2nd Ed., p. 596 ১১ Abhi., 2nd Ed., p. 542

১২ ত আ, প্র আ, পৃঃ ৪৮-৪৯ ; Abhi., 2nd Ed., p. 542

১৩ Abhi., 2nd Ed , p. 543

১৪ বামমার্গাভিষিক্তোঽপি দৈশিকঃ পরতত্ত্ববিৎ।
সংস্কার্যো ভৈরবে সোঽপি কুলে কৌলে ত্রিকেঽপি সঃ।—দ্রঃ ত আ, প্র আ, পৃঃ ৪৯

১৫ Abhi., 2nd Ed., p. 603

ত্রিক পরমেশ্বরের স্বাতন্ত্র্যশক্তির পূর্ণসংঘটিত রূপ। এই ত্রিক বাচ্যবাচ্যাত্মক বিশ্বের সর্ব আক্ষেপে বর্তমান।[১]

আবার স্বাতন্ত্র্যশক্তিমাত্রপরমার্থ উক্ত ত্রিশক্তিকে বা ত্রিককে 'শৈবীমুখ' বা পরমেশ্বরে সমাবেশের দ্বার বলা হয়। কারণ এঁরা অনবচ্ছিন্ন স্বভাব বলে এঁদের যে-কোনো একে সমাবেশ হলে পূর্ণ শক্তিমান্ পরমেশ্বরে অনায়াসে সমাবেশ হয়।[২]

এইভাবে ত্রিকের স্বীকৃতির জন্যও এই মতকে ত্রিক বলা হয়।[৩]

কুল-মতকে ত্রিক বলা হয়েছে বটে কিন্তু আবার ত্রিক-মত ও কুল-মতের কিঞ্চিৎ পার্থক্যও নির্দেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে কুল-মত অদ্বৈত আর ত্রিক-মত পরমাদ্বৈত।[৪] এ ছাড়া উপাসনাদির ব্যাপারেও উভয়মতে পার্থক্য আছে।[৫]

কুল-মত ও প্রত্যভিজ্ঞা-মত—উভয় মতকেই ত্রিক বলা হয় কিন্তু তা বলে উভয় মত এক নয়, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। একটি প্রধান পার্থক্য এই যে প্রত্যভিজ্ঞা-মতে ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্ব স্বীকৃত কিন্তু কুল-মতে স্বীকৃত চতুস্ত্রিংশত্তত্ত্ব। শেষোক্ত মতে কাল এবং নিয়তি এই দুই তত্ত্বের পৃথক স্বীকৃতি নাই।[৬] প্রত্যভিজ্ঞা-মতের সঙ্গে কুল-মতের পার্থক্য নির্দেশ করার জন্য অনেক সময় কুল-মতকে অনুত্তর ত্রিক বলা হয়। তার কারণ অনুত্তরের প্রখ্যাপনই কুল মতের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলা যায়। আচার্য অভিনবগুপ্ত কুল-মতকে অনুত্তর ষড়র্ধ বলেছেন।[৭]

কুল-মতের ইতিহাস— ডক্টর পাণ্ডের অভিমত ইতিহাসের বিচারে কুল-মত প্রত্যভিজ্ঞা-মতের পূর্ববর্তী।[৮] কালীকুল, পঞ্চশতিক প্রভৃতি গ্রন্থে কুলমতের আচার্যদের শুধু নামের তালিকা পাওয়া যায়। এ ছাড়া এই মতের বিশেষ কোনো নির্ভরযোগ্য ইতিহাস এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। তবে ডক্টর পাণ্ডে অনুমান করেন খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীতে ত্র্যম্বকের দৌহিত্র মচ্ছন্দ কামরূপে কুল-মতের প্রবর্তন করেন।[৯]

কুল-মত বা কুলমার্গ এবং অর্ধত্র্যম্বকমঠিকা অভিন্ন।[১০]

অনুমান করা যায় কুল-মত এক সময়ে সারা ভারতে এমন কি চীনদেশে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল।[১১]

কুল মতের পৌরাণিক ইতিবৃত্ত থেকে জানা যায় সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই চার যুগে

১ ত আ, তু আ, পৃঃ ১৮৬-৮৭, Abhi, 2nd Ed., p. 665 ২ ঐ পৃঃ ১৮৮, Ibid
৩ Abhi., 2nd Ed., p. 665 ৪ Abhi., 2nd Ed., p. 603 ৫ Ibid, pp. 603-604
৬ পরাত্রিংশিকা, পৃঃ ১১৯-২০ ৭ ত আ ১।১৪ ৮ Abhi., 2nd Ed., p. 543.
৯ Ibid, p. 548 ১০ Ibid, p. 546 ১১ Ibid, p. 577.

যথাক্রমে খগেন্দ্র কূর্ম, মেষ এবং মচ্ছন্দ এই চার জন সিদ্ধা এই মতের আদি প্রচারক। এঁরা ছিলেন গৃহী গুরু। এঁদের স্ত্রীপুত্রাদির নামও পাওয়া যায়।[১]

গুরু মচ্ছন্দ আর নাথসম্প্রদায়ের গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ ওরফে মীননাথ এক ব্যক্তি কি না এই প্রশ্ন মনে জাগে।

মচ্ছন্দের ছয় পুত্র। যথা অমরনাথ, বরদেব, চিত্রনাথ, অলিনাথ, বিন্ধ্যনাথ এবং গুড়িকানাথ।[২] ডকটর পাণ্ডে এঁদের ঘর, পল্লী অর্থাৎ ভিক্ষার স্থান এবং পীঠ অর্থাৎ সাধনার স্থান সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ দিয়েছেন[৩]—

নাম	ঘর	পল্লী	পীঠ
অমরনাথ	পট্টিল্ল	দক্ষিণাবর্ত্ত	ত্রিপুর
বরদেব	করবিল্ল	কুন্তরিকা	কামরূপ
চিত্রনাথ	অম্বিল্ল	বিল্ল	অট্টহাস
অলিনাথ	শবর বা পুলিন্দ	অড়বী	দেবীকোট্ট
বিন্ধ্যনাথ	শরবিল্ল	অক্ষর	দক্ষিণাবর্ত্ত
গুড়িকানাথ	অড়বিল্ল	ডোম্বী	কুলগিরি

আমাদের ধারণা এই বিবরণের মধ্যে গুহ্য সাধনার সঙ্কেত আছে। আর এই সঙ্কেতের রহস্য একমাত্র সম্প্রদায়বিদ্‌দেরই অধিগত।

কুল-মতের আলোচ্য— এই মতের প্রধান আলোচ্য শিব, শক্তি এবং তাঁদের যামল। এই তিনকে বলা হয় ত্রিক।[৪]

তবে ব্যাপক অর্থে ত্রিক বলতে বুঝায়[৫] পর, পরাপর এবং অপর। পর অর্থ পূর্বোক্ত শিব, শক্তি এবং তাঁদের যামল। পরাপর অর্থ পরা, পরাপরা এবং অপরা এই তিন শক্তি। পরা অভেদাত্মিকা, পরাপরা ভেদাভেদাত্মিকা আর অপরা ভেদাত্মিকা।[৬] অপর বলতে বুঝায় নর, শক্তি এবং শিব। এর মধ্যে নর বা নরতত্ত্ব বহু-আত্মক, শক্তি বা শক্তিতত্ত্ব দ্বি-আত্মক আর শিব বা শিবতত্ত্ব এক-আত্মক।[৭]

আচার্য সোমানন্দ ও আচার্য অভিনবগুপ্ত পরাত্রিংশিকা নামক গ্রন্থের নিজ নিজ টীকায় কাশ্মীরে প্রচলিত এই শৈব কুল-মত সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছেন তাতেই এই মতটির পরিচয় পাওয়া যায়। এঁদের আলোচনায় কুল-মতের দুটি বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। এক— পরার ব্যাখ্যান ; অপর—কুল-মতের তত্ত্বরূপে বর্ণমালার ব্যাখ্যা।[৮]

---

১ Abhi., 2nd, pp. 544-45 ২ Ibid, p. 545 ৩ Ibid, p. 602

৪ Abhi., 2nd Ed., p. 602 ৫ Ibid, pp. 602-603 ৬ পরাত্রিংশিকা, পৃঃ ২৪ পাদটীকা

৭ Abhi., 2nd Ed., p. 624 ৮ Ibid, p. 624

এখানে বলা আবশ্যক কুল-মত অতি দুরূহ, অধিকারী ব্যক্তিদের আলোচ্য। আমরা অধিকারী নই। সেইজন্য মতটির একটা মোটামুটি পরিচয়মাত্র দেবার চেষ্টা করা যাচ্ছে।

পরা—পরার বিষয় নিয়ে শুরু করা যাক। পরা ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াশক্তির ঈশ্বরী, এই শক্তিভেদত্রয়োত্তীর্ণা এবং এই শক্তিত্রয়-অবিভাগময়ী ভগবতী ভট্টারিকা সংবিৎ।[১] ইনি স্বয়ং অনর্গলা অনপেক্ষপ্রথাচমৎকারসারা।[২]

অবিকল্পসংবিৎ-মাত্র যে-শক্তির দ্বারা পরমেশ্বর শিবাদিধরণ্যন্ত বিশ্বকে ধারণ করেন, দর্শন করেন ও অবভাসিত করেন সেই শক্তি তাঁর পরাশক্তি।[৩]

পরা পরমেশ্বরের বা পরম সত্তার নিরতিশয়স্বাতন্ত্র্য-ঐশ্বর্যচমৎকারময়ী শক্তি।[৪] এটি তাঁর বিমর্শরূপ। এই পরাকে পরা প্রতিভা এবং অনুত্তরাও বলা হয়। আর পরমেশ্বরের বা পরম সত্তার প্রকাশরূপকে বলা হয় অনুত্তর।[৫]

অনুত্তর—অনুত্তরশব্দটি কিন্তু কুলশাস্ত্রে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যথা—(১) যাঁর থেকে উত্তর অর্থাৎ অধিক আর কিছু নাই তিনি অনুত্তর।[৬] শিবাদিধরণ্যন্ত ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্ব অনুত্তর থেকে অবভাসিত হয়। কাজেই অনুত্তর এই-সব তত্ত্বের অধিক। ইনি স্বপ্রকাশ এবং স্বতন্ত্র।[৭] (২) যাঁর সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর চলে না তিনি অনুত্তর।[৮] (৩) সর্বমলবিধ্বস্ত মুক্ত জীবের অধিগম্য যে-পরমেশ্বর বা পরম সত্তা তিনি অনুত্তর।[৯] (৪) উত্তর অর্থ ঊর্ধ্বক্রমণ। যোগী নাভি হৃদয় কণ্ঠ তালু প্রভৃতি বিভিন্ন চক্র ভেদ করে ক্রমশঃ ঊর্ধ্বভূমিতে আরোহণ করতে করতে এমন এক ভূমি প্রাপ্ত হন যার ঊর্ধ্বে আর কিছু নাই। এই ভূমিই অনুত্তর।[১০] (৫) যার থেকে উত্তরণ ইচ্ছা করা হয় তা উত্তর অর্থাৎ বন্ধন। কাজেই অনুত্তর সম্পূর্ণরূপে বন্ধনমুক্ত অবস্থা।[১১] (৬) উত্তরণকে বলা হয় উত্তর অর্থাৎ মোক্ষ। কাজেই অনুত্তর তাই যাতে এ রকম উত্তর নাই।[১২] (৭) উত্তর বলতে বুঝায় শব্দব্যবহার। কাজেই যাঁর সম্বন্ধে কোনো শব্দব্যবহার সম্ভব নয় তাই অনুত্তর। ইহা উহা এরূপ সেরূপ কিছুই তাঁকে বলা চলে না। তিনি অনির্বাচ্য।[১৩] (৮) অনুত্তর শব্দবাচ্য নন। এর থেকে বোঝা যায় তিনি অবিকল্পিত অর্থাৎ নির্বিকল্প।[১৪] (৯-১২) উত্তর অর্থ পরবর্তী। যা অন্য কিছু থেকে উদ্ভূত হয় তা উত্তর। এই অর্থে পশ্যন্তী মধ্যমা বৈখরী এই শক্তিত্রয়, অঘোরা

১ পরাত্রিংশিকা, পৃঃ ১৬-১৭ ২ ঐ পৃঃ ১৯ ৩ ঐ পৃঃ ২৪, পাদটীকা
৪ ত আ, দ্বি আ, পৃঃ ৭৪ ৫ Abhi., 2nd Ed., pp. 653-54
৬ পরাত্রিংশিকা পৃঃ ১৯ ৭ Abhi., 2nd Ed., pp. 686-87
৮ পরাত্রিংশিকা, পৃঃ ১৯, Abhi., 2nd Ed., p. 687 ৯ Abhi., 2nd Ed., p. 687
১০ Ibid ১১ Ibid, পরাত্রিংশিকা, পৃঃ ২১ ১২ Ibid, ঐ
১৩ Ibid ; ঐ পৃঃ ২১-২২ ১৪ Ibid, ঐ

ঘোরাঘোরা ঘোরা এই শক্তিত্রয়, পরা পরাপরা অপরা এই শক্তিত্রয় উত্তর। এঁদের উদ্ভব অনুত্তর থেকে। এই পশ্বন্ত্যাদি অঘোরাদি পরাদি শক্তিরা যাঁর মধ্যে বিকল্পিত নন তিনি অনুত্তর।[১] (১৩) গুরু দীক্ষাদানের দ্বারা স্বীয় প্রবুদ্ধ চৈতন্য শিষ্যের অপ্রবুদ্ধ চৈতন্যে প্রেরণ করতে পারেন এ কথা শৈবাগমসম্মত। একে বলে 'নুত্তর'। 'নুৎ' অর্থ প্রেরণ (নুদ প্রেরণে)। তার দ্বারা যে তরণ তা 'তর'। উভয়ে মিলে নুত্তর (নুৎ + তর)। এর অর্থ গুরু স্বীয় চৈতন্য শিষ্যচৈতন্যে প্রেরণ করে তার দ্বারা শিষ্যের তরণ অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করে দেন। যেখানে এমনি গুরুচৈতন্যপ্রেরণের দ্বারা তরণ হয় না তা অনুত্তর।[২] (১৪) আচার্য অভিনবগুপ্ত 'অন্'কে বলেছেন শূন্যপ্রমাতা।[৩] এখানে শূন্য অর্থ সর্বালম্বনধর্মশূন্য, সর্বক্লেশাশয়শূন্য, পরমার্থতঃ শূন্য নয়।[৪] কিঞ্চিৎ স্পষ্ট করে বলা হয়েছে শূন্য প্রকাশতত্ত্ব। মাতৃমানমেয়ত্রয়াত্মক বিশ্ব এর সঙ্গে অভিন্নরূপে এতেই অবভাসিত। এটি ইচ্ছাদিশক্তি-অবিশেষিত, স্বাতন্ত্র্যবশতঃ স্বাত্মাতে এটি স্ব-অবিভাগে অবস্থিত, মেয়বিশ্বকে অবভাসিত করতে ইচ্ছুক এ সব-কিছু থেকে আপনাকে পৃথক্ করে নেয় এবং বিশ্বোত্তীর্ণ মনে করে।[৫] এই অন্-এর উত্তরত্ব অর্থাৎ পরমার্থতঃ সর্বপ্রকারে আধিক্য যেখানে ভৈরব-একময়ত্বহেতু হয় তাই অনুত্তর।[৬]

(১৫) যে-শক্তি অমায়ীয়, অশ্রৌত, নৈসর্গিক, মহাপ্রকাশবিশ্রান্ত, নিস্তরঙ্গচিৎসমুদ্রের স্বাত্মচমৎকাররূপা, যিনি শাক্তোল্লাসময়ী প্রথমভূমি 'অহম্', আবার বিশ্বামর্শময়ী পূর্ণাহংভাবভূমি, তাঁকে বলা হয় অ। এই অ-এর যে নুৎ অর্থাৎ বিসর্গাস্তিতা অর্থাৎ কি না সৃষ্টিপ্রবণতা তার তর অর্থাৎ প্লবন যেখানে তা অনুত্তর। প্লবন বলতে বুঝায় সর্বোপরিবৃত্তিত্ব, সহজ কথায় প্রাধান্য।[৭]

(১৬) নুৎ অর্থ ক্রমাত্মকক্রিয়াময়ী প্রেরণা। এই প্রেরণা দেশকাল-গমনাগমনাদি-সাপেক্ষ। এটি যেখানে অবিদ্যমান তা অনুৎ। এর জনপ্রিয় দৃষ্টান্ত আকাশ। কেন না আকাশে ক্রমাত্মকক্রিয়ার অবকাশ নাই। কিন্তু আকাশ সম্পর্কেও সমবায়িত্বাদি যোগে ক্রমাত্মকক্রিয়ার কথা বলা যায়। কাজেই এই আকাশের চেয়েও যা সাতিশয় তা অনুত্তর। এই অনুত্তর সংবিৎ। এঁর সম্পর্কে সক্রমক্রিয়ার কথা বলা সম্ভবপর নয়।[৮]

১ Abhi., 2nd Ed., p. 637 ; পরাত্রিংশিকা পৃঃ ২৫ ২ Ibid ; ঐ পৃঃ ২৪-২৫

৩ পরাত্রিংশিকা, পৃঃ ২৬

৪ সর্বালম্বনধর্মৈশ্চ সর্বতত্ত্বৈরশেষতঃ।
সর্বক্লেশাশয়ৈঃ শূন্যং ন শূন্যং পরমার্থতঃ।—দ্রঃ ঐ পাদটীকা

৫ ঐ ৬ ঐ, পৃঃ ২৬

৭ ঐ, পৃঃ ২৭-২৮ ; Abhi., 2nd Ed., pp. 640-41.

৮ ঐ পৃঃ ২৮ ; Ibid

এ ছাড়া আরও কয়েকটি অর্থেও অনুত্তরশব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।[১] কিন্তু গ্রন্থবিস্তারভয়ে আমরা তার আলোচনা থেকে বিরত হলাম।

প্রাণও অনুত্তর— কুল-মত অনুসারে প্রাণক্রিয়ার দ্বারা অর্থাৎ প্রাণায়ামের দ্বারা অনুত্তরের উপলব্ধি হয়। প্রাণ ষট্‌প্রকার। তার দুই ভাগ—সামান্য ও বিশেষ। সামান্য আন্তর। এরই জন্য সেন্দ্রিয়জীব জীবিত থাকে। সমাধিমগ্ন যোগীর বিশেষপ্রাণাদির ক্রিয়া যখন রুদ্ধ হয়ে যায় তখনও যে তিনি জীবিত থাকেন তা ঐ সামান্য প্রাণের জন্য। বিশেষ প্রাণ বলতে বুঝায় প্রাণ, অপান, উদান, সমান এবং ব্যান।[২] এই পঞ্চ প্রাণ এবং সামান্য প্রাণ মিলে ষট্‌প্রাণ।

এইজন্য কুল-মতে প্রাণক্রিয়ায় অনুভূতির ক্রমাত্মক ষট্‌ভূমির বা স্থিতির কথা বলা হয়েছে। তার মধ্যে প্রথমটি শূন্যের[৩] সঙ্গে যুক্ত আর অপর পাঁচটি পঞ্চ প্রাণের সঙ্গে। এই ষট্‌ভূমি বা স্থিতির অন্তে এবং তাদের অতিক্রম করে আছে অনুত্তর- ভূমি বা-স্থিতি। পূর্বোক্ত ভূমি- বা স্থিতি-ক্রমেই সেখানে পৌঁছাতে হয়।[৪]

প্রত্যেক ভূমিতে বা স্থিতিতে আনন্দের একটা বিশিষ্ট অনুভূতি আছে এবং তার একটা বিশেষ নামও আছে। নামগুলি যথাক্রমে—নিজানন্দ, নিরানন্দ, পরানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, মহানন্দ, চিদানন্দ এবং জগদানন্দ।[৫] পূর্বোক্ত ভূমি বা স্থিতিসমূহের ক্রম আরোহক্রম। কাজেই আনন্দের ক্রমও আরোহক্রম।

জগদানন্দ শিবশক্তিসামরস্যময়। এটি শান্ত অর্থাৎ বিশ্বোত্তীর্ণ নয় আবার উদিত অর্থাৎ বিশ্বময়ও নয়। শান্ত বা উদিত কোনো শব্দের দ্বারা বাচ্য নয় বলে এটি রহস্যময়। এটি শান্ত ও উদিত এই স্থিতিদ্বয়ের হেতুভূত অনবচ্ছিন্ন সংবিন্মাত্রসতত্ত্ব।[৬] কুল-মতে এটি চরম অনুভূতি। এতে যে-সম্যক্‌ বিশ্রান্তি তাকেই বলে অনুত্তর স্থিতি।[৭]

ব্রহ্ম ও অনুত্তর—পূর্বেই নর-শক্তি-শিব এই ত্রিকের কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে তৃতীয়টি অর্থাৎ শিব অনুত্তর। কুল-মতে এই তৃতীয় ব্রহ্ম। কিন্তু এই ব্রহ্ম আর বেদান্তের

১ দ্রঃ Abhi., 2nd Ed., pp 641-43

২ ত আ, আহ্নিক ৫, পৃঃ ৩৫৭, Abhi., 2nd Ed. p. 645

৩ অনুত্তরং শূন্যমিত্যাহুঃ শূন্যং চাভাব উচ্যতে। অভাবঃ স সমুদ্দিষ্টো যত্র ভাবাঃ ক্ষয়ং গতাঃ। (দ্রঃ ত আ আহ্নিক ৫, পৃঃ ৩৫০)—অনুত্তরকে শূন্য বলা হয়। শূন্য বলতে বুঝায় অভাব। যেখানে ভাবসমূহ অর্থাৎ বিষয়সমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে তাই অভাব।

৪ Abhi., 2nd Ed., p. 645 ৫ ত আ আহ্নিক ৫, পৃঃ ৩৯৮-৫৫, Ibid, pp. 645-46

৬ ঐঃ আহ্নিক ২৯, পৃঃ ৮৪ ৭ Abhi., 2nd Ed., p. 649

ব্রহ্ম এক নয়। ইনি নিষ্ক্রিয় নন, সক্রিয়। এই ব্রহ্ম আনন্দশক্ত্যৈকঘন পূর্ণতাময় স্বাত্মান্তর্গত-বিশ্বসৃষ্টিশক্তির দ্বারা সমুজ্জ্বল।[১]

নররূপের সার শক্তিরূপ, শক্তিরূপের সার শিবরূপ। কাজেই এই ব্রহ্ম ত্রিকের শীর্ষস্থানীয়।[২] বর্ণমালার ষোড়শ স্বরবর্ণের দ্বারা অন্বিত এঁর ষোড়শ অবস্থা বা রূপ। আবার সপ্তদশী অনুত্তরকলান্বিত হলে এঁর সপ্তদশ রূপ বা অবস্থার কথাও বলা হয়।[৩]

এই তৃতীয় ব্রহ্ম বিশ্বোত্তীর্ণ এবং বিশ্বময়। যখন বিশ্বোত্তীর্ণ তখন ইনি নিস্তরঙ্গ জলধি। তখন ইনি প্রকাশৈকঘন চিদ্‌বিমর্শপর স্বাত্মমাত্রপরামর্শনতৎপর-অহংপরামর্শ। এঁর মধ্যে বেদ্যবেদকের এবং সেইজন্য ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া-প্রসংখ্যান এই চতুষ্কের ভেদ অবভাসিত নয়।[৪]

তৃতীয় ব্রহ্মের একটি ব্যাখ্যা এই ভাবে করা হয়েছে—অনুত্তর-আনন্দ-ইচ্ছা। এই ইচ্ছা তৃতীয় ব্রহ্ম। বর্ণিত ক্রমানুসারে ইচ্ছা তৃতীয়। আবার ইচ্ছাকে ব্রহ্ম বলা হয় তার কারণ ইচ্ছা বৃংহিত অর্থাৎ বৃহৎ আর নিজের থেকে অভিন্ন ইষ্যমাণের দ্বারা পূর্ণ। ব্রহ্ম বৃংহিত এবং পূর্ণ। কাজেই ইচ্ছা ব্রহ্ম। ইচ্ছা চত্বারিংশত্তত্ত্বযুত, চত্বারিংশত্তত্ত্বৈকাত্ম। চত্বারিংশত্তত্ত্ব বলতে বুঝায় পরভৈরব, শিব, শক্তি তাঁদের যামল এই চার এবং শিবাদিধরণ্যন্ত ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্ব। ইচ্ছা বোধস্বরূপ, অবভাসনক্রমানুসারে আনন্দের পশ্চাদ্‌বর্তী।[৫]

তৃতীয় ব্রহ্ম সকৃদ্‌বিভাত। ইনি যোগাভ্যাসসাপেক্ষ-ধ্যানগম্য। কিন্তু যাঁরা পরশক্তি-পাতের দ্বারা পবিত্র তাঁদের পক্ষে যোগাভ্যাসের প্রয়োজন নাই।[৬]

অনুত্তর বিজ্ঞাতমাত্র—যাঁর দ্বারা মাত্রা বিশেষভাবে জ্ঞাত তিনি বিজ্ঞাতমাত্র। ইনি অনুত্তর। মাত্রার ব্যাখ্যা এই ভাবে করা হয়েছে—মানের দ্বারা অর্থাৎ প্রমাত্মা দ্বারা প্রমাতৃ-প্রমাণ-প্রমেয়-প্রমিতিরূপ যাদের ত্রাণ অর্থাৎ পালন তথা পতিত্ব সম্পাদিত হয় তাদের বলা হয় মাত্রা।[৭]

যা বিজ্ঞাত অর্থাৎ বিশেষরূপে জ্ঞাত তা বিভাত। বিজ্ঞাতমাত্র যে-অনুত্তর তিনি সকৃদ্‌বিভাত। কাজেই ইনি ভাবনীয় নন। ইনি জ্ঞাত্রেকরূপ স্বপ্রকাশ। এঁর মধ্যে জ্ঞেয়রূপা ভেদময়ী মায়া নাই।[৮]

কুল-মত ও বর্ণমালা—কুল-মতে শারদা লিপির অ থেকে ক্ষ পর্যন্ত বর্ণমালার দার্শনিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

১ পরাত্রিংশিকা, পৃঃ ২২১ ; Abhi., 2nd Ed., p. 650

২ Abhi, 2nd Ed., p. 650 ৩ Ibid

৪ পরাত্রিংশিকা, পৃঃ ২০৫, পাদটীকা, পৃঃ ২২৫ , Abhi, 2nd Ed., p. 650

৫ ঐ, পৃঃ ২২৫-২৩ ; Abhi,, 2nd Ed. p. 651. ৬ ঐ

৭ ঐ, পৃঃ ৩৮-৩৯ ৮ ঐ, পৃঃ ৩৩

অ—অ-কে অনুত্তর বলা হয়। তবে অ পরমার্থতঃ অনুত্তর ও অনুত্তরার যামলরূপ। পরম সত্তার বা পরমেশ্বরের প্রকাশরূপ অনুত্তর আর বিমর্শরূপ অনুত্তরা।[১] পূর্বেও এ কথার উল্লেখ করা হয়েছে।

আ—আনন্দশক্তি। প্রকাশবিমর্শাত্মা অনুত্তর-অনুত্তরার সংঘট্ট থেকে আনন্দশক্ত্যাত্মা আ-বর্ণের উদয়। তার থেকে ইচ্ছাদি-আত্মক বিশ্বের সৃষ্টি হয়। এই আনন্দশক্তি পর ও অপর থেকে পর অর্থাৎ পূর্ণ। পর অর্থ বিশ্বোত্তীর্ণ শৈব রূপ আর অপর বিশ্বময় শাক্ত রূপ।[২] আনন্দশক্তি বিশ্বময় হয়েও বিশ্বোত্তীর্ণ। সেইজন্য এর মধ্যে নিয়ত অবচ্ছেদের অভাব। কাজেই ইনি পূর্ণ।[৩]

ই—ইচ্ছাশক্তি। অনুত্তর-অনুত্তরার সংঘট্টে পরপ্রমাতার যে-সিসৃক্ষা জাগে তাকেই বলে ইচ্ছাশক্তি। ইনি দ্বৈতবর্জিতা, স্বতন্ত্রা, বহিরৌন্মুখ্যমাত্ররূপিণী। এঁর গর্ভে অনন্তশক্তিব্রাত বিরাজমান। এঁদের বলা হয় অঘোরা। এঁরা শুদ্ধস্বাতন্ত্র্যমাত্ররূপা এবং ভেদাতীতা। ইচ্ছাশক্তি এঁদের প্রভু। ইনি এঁদের সকলের চেয়ে অধিক। অতএব পরা। এটি ইচ্ছাশক্তির অক্ষুভিত রূপ।[৪]

ঈ—ঈ ঈশিত্রী। ইচ্ছাশক্তি প্রক্ষুব্ধরূপা হলেই হন ঈশিত্রী। তখন অঘোরা দেবীরা বহীরূপতায় প্রস্ফুরিতা হন। এই অঘোরা দেবীরা মুক্তিমার্গ রুদ্ধ করেন না।[৫]

উ—উ উন্মেষ। উন্মেষ জ্ঞানশক্তি, সৃষ্টির আদি স্পন্দ। জ্ঞানশক্তি অবিরত ঘোরা দেবীদের অবভাসিত করছেন। এই-সব দেবীরা একাধারে শুদ্ধাশুদ্ধমার্গ-প্রদর্শিকা। অর্থাৎ এঁরা জীবকে অশুদ্ধ তত্ত্বের দিকে নাবিয়ে দিতে পারেন আবার শুদ্ধ তত্ত্বের দিকে উঠিয়ে দিতে পারেন। জ্ঞানশক্তির এই রূপে জ্ঞানের আধিক্য, জ্ঞেয়ের অনাধিক্য।[৬]

ঊ—ঊ ঊনতা। এটি জ্ঞানশক্তির আরেকটি রূপ। এই রূপে জ্ঞেয়ের আধিক্য। জ্ঞানশক্তিতে জ্ঞেয়াংশের আধিক্যের জন্য তাঁর জ্ঞানমাত্র-রূপতায় ঊনতার অর্থাৎ অপূর্ণতার আভাসন হয়। সহজ কথায় বলা যায় জ্ঞানশক্তি সঙ্কুচিতা হন। এই জ্ঞানশক্তিকে জ্ঞেয়বর্গের স্থিতির প্রারম্ভ বলা হয়। এই স্থিতি কিন্তু সাক্ষাৎ স্থিতি নয়। কেন না এখানে জ্ঞানের অতিরিক্ত জ্ঞেয় কিছু নাই।[৭]

অ থেকে ঊ পর্যন্ত ছটি স্বরবর্ণকে বর্ণমালার মূল বলা হয়।[৮] কারণ ঋকারাদি অন্য দশটি স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণ বস্তুতঃ এদের থেকেই উদ্ভূত হয়। এই ছটি স্বরবর্ণকে যথাক্রমে দহনী,

---

১ Abhi, 2nd Ed., pp. 653-54. ২ ত আ, তু আ, পৃঃ ৮২ ৩ ঐ পৃঃ ৮১

৪ ঐ পৃঃ ৮৩-৮৪, Abhi, 2nd Ed., pp. 654-55 ৫ ত আ, তু আ, পৃঃ ৮৪-৮৫.

৬ ঐ পৃঃ ৮৩ ৭ ঐ, পৃঃ ৮৬-৮৭

৮ স্বরাণাং ষট্কমেবেহ মূলং স্যাদ্বর্ণসন্ততৌ ।—ত আ ৩।১৮৪

পচনী, ধূম্রা, কর্ষিণী, বর্ষিণী এবং রসা এই ষড়্ দেবতা বলা হয়। এদের সূর্যরশ্মিও বলা হয়। সূর্যরশ্মি বলার অর্থ এদের সৌরবপু। এদের মধ্যে আবার আ ঈ ঊ এই তিনের চান্দ্র বপু।[1]

ঋ—ঋ জ্বলনশক্তি-চুরিতা অক্ষুব্ধা ইচ্ছা।[2]

ৠ—ৠ জ্বলনশক্তি-চুরিতা ক্ষুব্ধা ইচ্ছা।[3]

ঌ—ঌ ধরাশক্তি-চুরিতা অক্ষুব্ধা ইচ্ছা।[4]

ৡ—ৡ ধরাশক্তি-চুরিতা ক্ষুব্ধা ইচ্ছা।[5]

এ—অনুত্তর এবং আনন্দ ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত হলে ত্রিকোণ এ (শারদালিপির এ ত্রিকোণ △) উদ্ভূত হয়। একে বলা হয়েছে বিসর্গামোদসুন্দর। বিসর্গ পরাশক্তি। তাঁর আমোদ অর্থ ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াশক্তিরূপ উল্লাস। তার দ্বারা যে সুন্দর সে বিসর্গামোদসুন্দর। সহজ কথায় এ-কার ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াশক্তির অভিব্যঞ্জক।[6]

ঐ—অনুত্তরের সঙ্গে এ-কার যুক্ত হলে ঐ-কারের উদ্ভব হয়। অনুত্তরেও রৌদ্রী জ্যেষ্ঠা বামা এই শক্তিত্রয়াত্মক একটি ত্রিকোণ আছে। এই ত্রিকোণ এবং এ-কারের ত্রিকোণ উভয়ের সংযোগে ষট্‌কোণ ঐ-কার উদ্ভূত হয়। লিপিতে অবশ্য এই সংযোগ দেখান হয় না। শুধু এ-কারের মাথায় একটি রেখা দিয়ে ঐ-কার লেখা হয়।[7]

ও—ও-কারের উদ্ভব হয় অনুত্তর এবং আনন্দশক্তির সঙ্গে উন্মেষণের যোগে।[8]

ঔ—অনুত্তর এবং আনন্দশক্তির সঙ্গে ও-কারের যোগে সম্ভূত হয় ঔ-কার।[9]

এখানে উল্লেখ করা যায় এ ঐ ও ঔ এই সন্ধ্যক্ষরগুলিতে ক্রিয়াশক্তি যথাক্রমে অস্ফুট, স্ফুট, স্ফুটতর এবং স্ফুটতম।[10]

ক্রিয়াশক্তির স্ফুটতম বপু ঔ-কার। এর থেকে ঘোরতরী শক্তিসমূহের উদ্ভব হয়। এই-সব শক্তি অশুদ্ধ অধ্বার অধিষ্ঠাত্রী এবং এদের জন্য বিষয়াসক্ত জীবদের ক্রমাধঃপতন হয়।[11]

ঔ-কারে ইচ্ছা জ্ঞান ক্রিয়া এই শক্তিত্রয় স্ফুটীভূত হওয়ায় একে ত্রিশূলও বলা হয়।[12]

একে নিরঞ্জনও বলা হয়। কারণ শক্তি পরিমিতপ্রমাতার নিকট শক্তিমান্‌কে ব্যক্ত করেন কিন্তু শক্তিকে কেউ অঞ্জিত অর্থাৎ প্রকাশিত করতে পারে না। তাই তিনি নিরঞ্জন।[13]

ঔ-কারের পর বিন্দু (ং)। অনুত্তরশক্তি পরা সংবিৎ নানারূপে আপনাকে পরিস্ফুরিত করলেও তাঁর স্বরূপ বিলুপ্ত হয় না ; বিন্দুরূপ তারই দ্যোতক।[14] বিন্দু স্বতন্ত্র পরপ্রমাত্রেকরূপ পরমেশ্বর শিব।[15] অনুত্তরশক্তি বিন্দুরূপিণী।[16]

১ ত আ, তু আ, ১৮০-১৮১ ২ ঐ পৃঃ ৯০ ৩ ঐ ৪ ঐ ৫ ঐ
৬ ঐ পৃঃ ১০৩-১০৪ ৭ পৃঃ ১০৫ ৮ ঐ, পৃঃ ১০৬ ৯ ঐ ১০ ঐ
১১ ঐ পৃঃ ১১১ ১২ ত আ ৩।১০৪ ১৩ ঐ, তু আ ; পৃঃ ১১২-১১৩ ১৪ ঐ পৃঃ ১১৩
১৫ ঐ পৃঃ ১১৭ ১৬ ঐ পৃঃ ১১৩

নয়েছে বিন্দুর স্থান তিনটি—দ্বাদশান্ত অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্র (দ্রঃ Abhi., 2nd Ed., p. 657), ভ্রূমধ্য এবং হৃদয়। বিন্দু নর শক্তি শিব এই তত্ত্বত্রয়রূপে তথা আত্ম বিদ্যা শিব এই তত্ত্বত্রয়রূপে প্রস্ফুরিত। কিন্তু এরূপ হলেও ইনি স্বস্বরূপবিচ্যুত হন না।[১]

বিন্দু সর্বপ্রাণীতে অবস্থিত নাদাত্মক শব্দ। যা নিজের থেকে অভিন্নরূপে বিশ্বকে অবভাসিত করে তা শব্দ।[২] এই শব্দ পরাবাগ্‌রূপ বিমর্শ। তা নাদাত্মক। যা সমস্তেরই জীবকলারূপে পরিস্ফুরিত তাই নাদ।[৩] বিন্দুরূপিণী অনুত্তরশক্তি পরা জীবকলা।[৪]

বিন্দু অ থেকে হ পর্যন্ত অধউর্ধ্ববিভাগক্রমে সমস্ত বর্ণের প্রাণনরূপে অবস্থিত এবং বিন্দুই সমস্ত প্রাণীদের অধউর্ধ্ববিভাগক্রমে সূর্যচন্দ্রাত্মক প্রাণ-অপানপ্রবাহরূপে অবস্থিত।[৫]

বিন্দু পর প্রকাশ, চন্দ্রসূর্যাদির প্রকাশনিরপেক্ষ। সোম সূর্য অগ্নি এই ধামত্রয়ের বিন্দু অনুপ্রাণক। এই পর প্রকাশই সূর্যাদি আত্মকরূপে প্রস্ফুরিত।[৬]

বিসর্গ (:)— কৌলিকী চিন্মাত্রস্বভাবা পরা শক্তি বিসর্জনীয় শব্দবাচ্য বিন্দুদ্বয়রূপ অর্থাৎ : আকারে প্রস্ফুরিতা। এই বিন্দুদ্বয় পরাপরস্বরূপ। এর অর্থ বিন্দুদুটি পর অর্থাৎ আনন্দাত্মক বিসর্গ এবং অপর অর্থাৎ হকারাত্মক বিসর্গ অর্থাৎ কি না স্থূল বিসর্গ এই উভয়ের আত্মভূত।[৭] সহজ করে বলা যায় কৌলিকী পরা শক্তি প্রমাতৃপ্রমাণপ্রমেয়াত্মক বস্তুসমূহের থেকে অনতিরিক্তা হলেও অতিরিক্তভাবে সেই সেই বস্তুনিয়ত প্রকাশাত্মিকা। এটি তাঁর পরাপরবিসর্গরূপ। এখানে বিসর্গ অর্থ বহির্ভাবোন্মুখতা।[৮]

পরা সংবিৎ-মাত্ররূপে শক্তি বহির্ভাবমুখে প্রথমে প্রাণরূপে অবভাসিতা হন। এই অবস্থায় এঁকে বলা হয় প্রাণকুণ্ডলিনী। প্রত্যাবৃত্তিক্রমে অন্তর্ভাবোন্মুখ্যরূপা এই শক্তি শেষপ্রান্তে উপস্থিত হলে পরা কুণ্ডলিনী নামে খ্যাত হন। তখন ইনি স্বাত্মবিশ্রান্তা পরসংবিৎ-মাত্ররূপা। এই অবস্থায় এঁকে সপ্তদশী কলা, শিবব্যোম, পরম ব্রহ্ম ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়।[৯]

দেখা যাচ্ছে পরা পারমেশ্বরী সংবিৎই প্রমাতৃপ্রমেয়াত্মক বিশ্বের সৃষ্টিসংহারবিভ্রমের আবির্ভাবকারণ।[১০]

পরা সংবিৎ এক এবং অখণ্ড। কাজেই তাঁর থেকে অতিরিক্ত কিছু থাকতে পারে না। তবে তিনি সৃষ্টি বা সংহার করবেন কার?[১১]

১ ত আ, তু ভা, পৃঃ ১১৮-১১৯ ২ শব্দয়তি স্বাভেদেন বিশ্বং পরামৃশতীতি ইতি শব্দঃ।—ঐ পৃঃ ১১৯
৩ নদতি সর্বধামেষু জীবকলাত্বেন পরিস্ফুরতীতি নাদঃ।—ঐ ৪ ঐ, পৃঃ ১২০
৫ ঐ পৃঃ ১২০ ৬ ত আ, তু ভা, পৃঃ ১২০-১২১ ৭ ঐ পৃঃ ১৩১-৩২ ৮ ঐ পৃঃ ১৩২
৯ ঐ ১০ ঐ পৃঃ ১৩৩ ১১ ঐ পৃঃ ১৩৪

উত্তরে বলা হয় পরা সংবিৎ নিজের মধ্যে মায়া-প্রকৃত্যাদি-উপাদাননিরপেক্ষভাবে নিজেরই সৃষ্টিসংহারকারিত্বলক্ষণ স্থিতির বিধান করেন।[১] এর অর্থ আন্তর্বহীরূপতায় মায়া প্রভৃতি আভাসবৈচিত্র্যে তাঁরই পরিস্ফুরণ হয়। এই পূর্ণা পরা সংবিৎই কাদিহান্তরূপে অর্থাৎ ক থেকে হ পর্যন্ত বর্ণরূপে পরিস্ফুরিতা হন।[২] এই কৌলিকী পরা শক্তিকে বিসর্গ বা বিসর্গশক্তি বলা হয়।[৩]

কুল-মতে বর্ণমালার বিসর্গকে উচ্চারণের দিক্ দিয়ে হকারার্ধার্ধভাগ বলা হয়েছে।[৪] এটি নাদমাত্র এবং উচ্চারণেচ্ছার অপেক্ষা রাখে না। অর্থাৎ কোনো জীব একে উচ্চারণ করতে পারে না। জীবের অন্তরে থেকে পরমেশ্বর স্বয়ং এর উচ্চারণ করেন।[৫]

তন্ত্রালোকে আছে এই বিসর্গকে কুলগহ্বর নামক শাস্ত্রে কামতত্ত্ব বলা হয়েছে। কাম অর্থ ইচ্ছা আর তত্ত্ব অর্থ সর্বত্র অপ্রতিহতস্বভাব পূর্ণ রূপ।[৬]

কুল-মতের গুহ্য সাধনার ক্ষেত্রে এই কামতত্ত্ব-সিদ্ধান্তটির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। উক্ত সাধনায় যৌনব্যাপার যুক্ত হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ এই সিদ্ধান্ত।

কামতত্ত্ব সহজ, স্বয়ম্ভু, নিত্যোদিত, অব্যক্ত। এটি সর্বভূতে অবস্থিত নাদ নামক পর বীজ।[৭] এটি সূক্ষ্ম, ব্যাপক, শুদ্ধ এবং প্রাণতত্ত্বের বাচক।[৮]

এ রকম হওয়ার জন্য স্থূলধ্যেয়াদিনিষ্ট যেরূপ ধ্যান হয় এর সেরূপ ধ্যান হতে পারে না। অথচ শাস্ত্রে আছে এই কামতত্ত্বে চিত্ত সমাহিত করলে যুগপৎ জগৎকে বশীভূত করা যায়।[৯]

কুল-মতাবলম্বীরা যৌনব্যাপারযুক্ত গুহ্য সাধনার ব্যপদেশসহায়ে এই সমস্যার সমাধান করেছেন। কামতত্ত্ব স্থূলধ্যেয়নির্দিষ্ট ধ্যানবর্জিত হলেও একটি বিশেষ ক্ষেত্রে তার কিঞ্চিৎ উচ্ছূনতাপ্রাপ্তি হয়। সেই উচ্ছূনতাপ্রাপ্ত কামতত্ত্বে চিত্ত সমাহিত করা যায়। উচ্ছূনতাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রটি এই— স্ত্রীপুরুষের উপভোগকালে রতিসৌখ্যসমাবেশজনিত

১ যামলঃ যামলি যামলরূপো বৈসর্গিকী স্থিতিঃ ।—ত আ ৩।১৪১

২ ত আ, তৃ আ, পৃঃ ১৪৪

৩ বিসর্গতত্ত্ব নাথস্য কৌলিকী শক্তিরুচ্যতে ।—ঐ ৩।১৪৩

৪ Abhi., 2nd Ed., p. 659 ; ত আ, তৃ আ, পৃঃ ১৪৭-১৪৮

৫ নাস্যোচ্চারয়িতা কশ্চিৎ প্রতিহন্তা ন বিদ্যতে ।
স্বয়মুচ্চরতে দেবঃ প্রাণিনামুরসি স্থিতঃ ।—দ্রঃ ত আ, তৃ আ, পৃঃ ১৪৯

৬ ত আ, তৃ আ, পৃঃ ১৪৮

৭ নাদাখ্যং যৎ পরং বীজং সর্বভূতেষ্ববস্থিতম্ ।—দ্রঃ ঐ পৃঃ ১৪৯

৮ সূক্ষ্মো ব্যাপকঃ শুদ্ধঃ প্রাণতত্ত্বস্য বাচকঃ ।—ঐ

৯ তত্র চিত্তং সমাধায় বশয়েদ্‌যুগপৎ জগৎ ।—ত আ ৩।১৪৭

বিবশতাহেতু যখন কান্তার অন্তঃকরণ বেদ্যরহিত অর্থাৎ বাস্তবভাবনামুক্ত হয়ে যায় এবং তার সব বৈকল্য নিরস্ত হয় তখন তার কণ্ঠদেশে কামতত্ত্ব বা বিসর্গ 'হা-হা' এরূপ স্ফুটত্ব প্রাপ্ত হয়। এই 'হা-হা কামতত্ত্বের উচ্ছূনতাপ্রাপ্তি। এই 'হা—হা' কেবল যোগিমাত্রগম্য নয়, অন্য লোকের দ্বারাও উপলব্ধ হতে পারে।[১]

এইভাবে যৌনব্যাপারসংযুক্ত গুহ্য সাধনায় কামতত্ত্বসিদ্ধান্তের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

কুল-মতের গুহ্য সাধনায় যৌনব্যাপারকে যে কত উচ্চ আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত করা হয়েছে আলোচ্য দৃষ্টান্তে তার স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। যৌনব্যাপার সাধনা, পশুসুলভবৃত্তির চরিতার্থতা নয়। এইজন্য একে বলা হয়েছে আদিযাগ।[২]

আলোচ্য দৃষ্টান্তের যৌনব্যাপার সম্বন্ধে শাস্ত্রের অভিমত এই—অঙ্গনাসঙ্গমোৎসবে অতিসৌখ্যসমাবেশের দ্বারা যাঁদের চিত্ত বিবশ হয়েছে অর্থাৎ যাঁদের চিত্তে ঐ সৌখ্য ভিন্ন অন্য কোনো বেদ্যভাবনা নাই এবং যাঁরা 'হা-হা' এই সহজ নাদ অবিচ্ছিন্নভাবে জপ করেন অর্থাৎ এর সঙ্গে চিত্তকে অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত করে রাখেন সেই-সব যোগীশ্বর পরম যোগ লাভ করেন।[৩]

লক্ষণীয় এখানে যৌনব্যাপার অতি উচ্চাঙ্গের যোগসাধনা। শুধু যোগীশ্বররা এটি করতে পারেন, সাধারণ যোগীরাও নয় আর সাধারণ মানুষের ত কথাই নাই।

এবার আলোচ্য ক থেকে হ পর্যন্ত ব্যঞ্জনবর্ণ। তন্ত্রালোকে আছে অনুত্তর থেকে পঞ্চাত্মক অর্থাৎ পঞ্চ বর্ণবিশিষ্ট কবর্গের উদ্ভব। অনুত্তর অ-বর্ণ। অনুত্তর চিৎশক্তিপ্রধান। তবে 'সর্বত্র সর্বমস্তি'—সর্বত্র সব আছে এই ন্যায়ানুসারে অনুত্তর পঞ্চশক্তিময় অর্থাৎ এতে আনন্দ-ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া-শক্তিও আছে। আনন্দাদি অন্যান্য শক্তি সম্বন্ধেও ঐ একই ন্যায় প্রযোজ্য।[৪]

এইভাবে ইচ্ছাশক্তি (ই ঈ) থেকে উদ্ভূত হয়েছে চ বর্গ।[৫]

বহ্নিজুষ্ট ইচ্ছাশক্তি (ঋ ৠ) থেকে উদ্ভূত হয়েছে ট বর্গ। আর ধরাজুষ্ট ইচ্ছাশক্তি (ঌ ৡ) থেকে ত বর্গের উদ্ভব হয়েছে।[৬]

উন্মেষশক্তি (উ ঊ) থেকে উদ্ভূত হয়েছে প বর্গ।[৭]

আলোচ্য মত অনুসারে ক্ষিতিতত্ত্ব থেকে আরম্ভ করে পুরুষতত্ত্ব পর্যন্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বে যথাক্রমে ক থেকে ম পর্যন্ত বর্ণ অবস্থিত।[৮]

১ ত আ, তৃ আ, পৃঃ ১৫০ ২ ঐ পৃঃ ১৩৫
৩ অতিসৌখ্যসমাবেশবিবশীকৃতচেতসঃ। অবিচ্ছিন্নং জপন্তোহনঙ্গনাসঙ্গমোৎসবে।
অত্রাসক্তধিয়ো যান্তি যোগং যোগীশ্বরাঃ পরম্।—দ্রঃ ত আ, তৃ আ, পৃঃ ১৫১
৪ ঐ পৃঃ ১৫২-৫৩ ৫ ত আ, তৃ আ, পৃঃ ১৫৩ ৬ ঐ পৃঃ ১৫৩-৫৪ ৭ ঐ পৃঃ ১৫৪ ৮ ঐ

ক্ষিত্যাদিপুরুষান্ত বিশ্ব স্ফুটত্বহেতু জ্ঞেয়। আর জ্ঞেয় বলে ইন্দ্রিয়সমূহ তাদের স্পর্শ করতে পারে। এই জন্য ক থেকে ম পর্যন্ত বর্ণকে স্পর্শবর্ণ বলা হয়।[১]

ইচ্ছাশক্তি বিজাতীয় শক্ত্যংশ-উন্মুখী হলে য-কাররূপে প্রস্ফুরিতা হন। বিজাতীয় শক্ত্যংশ অনুত্তর অ। 'ইকো যণচি' এই সন্ধিসূত্র অনুসারেও ইকার এবং অকার মিলিত হলে ইকার য হয়ে যায়।[২]

তেমনি বহ্নিজুষ্টা ও ধরাজুষ্টা ইচ্ছাশক্তি বিজাতীয় শক্ত্যংশ-উন্মুখী হলে যথাক্রমে র-কার এবং ল-কার-রূপে প্রস্ফুরিতা হন। এর অর্থ ঋ ৠ থেকে র এবং ঌ ৡ থেকে ল উদ্ভূত হয়।[৩]

সেইভাবে দ্বিরূপা উন্মেষশক্তি বা জ্ঞানশক্তি বিজাতীয় শক্ত্যংশ-উন্মুখী হলে ব-কার রূপে প্রস্ফুরিতা হন।[৪]

য র ল ব এই বর্ণচতুষ্টয়কে অন্তঃস্থ বর্ণ বলা হয়। এই বর্ণচতুষ্টয় ইচ্ছাশক্তি ও উন্মেষ-শক্তির অন্তঃ অর্থাৎ শক্তিদ্বয়ের সঙ্গে অভিন্নভাবে প্রমাতৃরূপ আত্মার সঙ্গে একাত্ম হয়ে বর্তমান বলে এরা অন্তঃস্থ।[৫]

ইচ্ছাশক্তি ত্রিরূপা। এক রূপে ইনি কেবল ইচ্ছামাত্র। এটি শুদ্ধ রূপ। এতে ইষ্যমাণ অনুল্লসিত। এইরূপে ইনি ই-কার। দ্বিতীয় রূপে ইনি দীপ্ত্যাত্মক ইষ্যমাণের দ্বারা আরূষিতা। এতে ইষ্যমাণ উল্লসিত। এইরূপে ইনি ঋ-কার। আর তৃতীয় রূপে ইনি স্থৈর্যাত্মক ইষ্যমাণের দ্বারা আরূষিতা, এতেও ইষ্যমাণ উল্লসিত। এই রূপে ইনি ঌ-কার।[৬]

ই ঋ ঌ এই ত্রিরূপা ইচ্ছাশক্তিই স্বীয় উষ্মা দ্বারা অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্যলক্ষণ স্বাত্মতেজের দ্বারা যথাক্রমে শ ষ স এই তিন বর্ণরূপে প্রস্ফুরিতা হন।[৭]

এই তিন বর্ণের মধ্যে স-এর গুরুত্ব কুল-মতে অধিক। এই মতে স অমৃতবীজ। গুরুরা একে বলেছেন পর অমৃত ধাম।[৮]

এই পর অমৃতধামের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আবার আদিযাগের কথা এসেছে। আদিযাগে ক্রিয়ানিষ্পত্তিকালে করণচক্রের প্রথম ক্ষোভজনিত সীৎকারাদিতে এবং ক্রিয়ানিষ্পত্তির অন্ত্যাবস্থায় বিরামসীৎকারাদিতে যে 'স' স্ফুট হয় অনাহতনাদ সেই 'স' পর অমৃত ধাম।[৯]

পূর্বোক্ত ব্যাপারে যে পর-আনন্দ বা পরসৌখ্যরসের উদ্ভব হয় তাতে দেহাদিপ্রমাতৃতা নিমগ্ন হয়ে গিয়ে চিৎপ্রমাতৃতার উন্মেষ হয়। সহজ কথায় বলা যায় তখন পরিমিত দেহজ্ঞান লোপ পেয়ে যায় এবং এক চিন্মাত্রবোধ থাকে। এই বোধে বেদ্যবেদকভেদ থাকে না।

১ ত আ, তু আ, পৃঃ ১৫৫ ২ ঐ পৃঃ ১৫৭ ৩ ঐ ৪ ঐ ৫ ঐ পৃঃ ১৫৯
৬ ঐ পৃঃ ১৬২-৬৩ ৭ ঐ পৃঃ ১৬৩-৬৪ ৮ ঐ পৃঃ ১৬৪
৯ ঐ পৃঃ ১৬৪-৬৫, ১৬৭

এরূপ আনন্দস্থানে 'স'-এর অভিব্যক্তি হয়।[১] আর অন্যোন্যসংঘট্টাত্মক সামরস্য-অবসরেই এটি অনুভবগোচরতা প্রাপ্ত হয়।[২] কারণ স সততোদিত অনাহত নাদ। এটি ধ্যান-নিরপেক্ষ।[৩] সেইজন্য উক্ত সামরস্য-অবসরেই এটি অনুভবগোচর হয়।

সাধনার দিক দিয়ে বলা যায় আদিযাগে উপরে বিবৃত অবস্থায় পরসামরস্যাত্মক সৌখ্যসমাবেশে সাধকের চিত্ত লীন হলে তাঁর সমাধিলাভ হয়।

স অবিভক্ত পরম ব্রহ্ম।[৪] পূর্বেই বলা হয়েছে স পর ধাম। এই পর ধাম ক্রিয়াশক্ত্যাত্মক বিশ্বময় এবং নিরঞ্জন। অর্থাৎ শক্তিরূপে ইনি নিরঞ্জন। কারণ পূর্বেই বলা হয়েছে শক্তি শক্তিমানকে অঞ্জিত অর্থাৎ ব্যক্ত করেন কিন্তু তিনি কারো দ্বারা অঞ্জিত হন না।[৫] এই যুক্তি অনুসারে এই নিরঞ্জন পর ধামের যে তত্ত্ব অর্থাৎ পারমার্থিক রূপ তা সাঞ্জন। এই পারমার্থিক রূপ তাঁর পরমপ্রকাশাত্মক শক্তিমৎ-লক্ষণ স্বাত্মবিশ্রান্তিস্থান।[৬]

এর পর হ। পূর্বেই বলা হয়েছে হ বিসর্গের স্থূল রূপ।[৭]

অনুত্তরের উষ্মা দ্বারা অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্যলক্ষণ স্বাত্মতেজের দ্বারা শ ষ স হ এই বর্ণচতুষ্টয়ের অবভাসন হয় বলে এদের উষ্মবর্ণ বলা হয়। পরমার্থতঃ এই বর্ণচতুষ্টয় অনুত্তর থেকেই জাত।[৮] সকলের শেষে ক্ষ। এটি পঞ্চাশত্তম বর্ণ। ক্ষ-কারকে বলা হয়েছে কূটবীজ। এটি অনুত্তরবিসর্গানুপ্রাণিত ক-কার ও স-কারের প্রত্যাহারতার দ্বারা প্রাপ্ত রূপ। সহজ কথায় ক্ষ ব্যঞ্জনবর্ণগুলির সংঘটিত রূপ।[৯]

ক থেকে হ পর্যন্ত বর্ণগুলি অভিব্যক্তির পূর্বে স্বরময় অর্থাৎ স্বরবর্ণের মধ্যে শক্ত্যাত্মরূপে অনুস্থিত। এই সব বর্ণ বহিরভিব্যক্ত হয় বলে এবং হলে, তাদের ব্যঞ্জনবর্ণ বলা হয়।[১০]

ব্যঞ্জনবর্ণগুলি যেমন স্বরময় তেমনি স্বরবর্ণগুলিও পরমার্থতঃ অনুত্তরের অবভাসন। কাজেই দেখা যাচ্ছে অনুত্তরই পরমার্থতঃ পঞ্চাশৎ বর্ণরূপে অবভাসিত। তন্ত্রালোকে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে—অনুত্তরই স্বীয় বিসর্গশক্তিযুক্ততার জন্য বিশ্বরূপ হয়েছেন।[১১]

এই পঞ্চাশৎ বর্ণকে বলা হয় মাতৃকাবর্ণ। কারণ এদের থেকেই শব্দার্থময় সৃষ্টির উদ্ভব। প্রত্যেকটি বর্ণ এক একটি শক্তি। অনুত্তর ভৈরবের শক্তি বহু।[১২] তার মধ্যে মুখ্য উক্ত পঞ্চাশৎ। অন্য সব এঁদের মধ্যে নিষ্ঠিতা। কেন না এই পঞ্চাশের অতিরিক্ত কোনো শক্তিপরামর্শ হয় না।[১৩]

---

১ ত আ, তু আ, পৃঃ ১৬৪-৬৫   ২ ঐ পৃঃ ১৬৭   ৩ ঐ   ৪ ত আ ৩।১৬৭

৫ শক্তিমানঞ্জ্যতে যস্মাৎ শক্তিৰ্জাতু কেনচিৎ।—ত আ ৩।১০২

৬ ত আ ৩।১৭১ এবং টীকা।   ৭ ত আ, তু আ, পৃঃ ১৫৫   ৮ ঐ পৃঃ ১৭৬

৯ ঐ পৃঃ ১৭৮   ১০ ঐ পৃঃ ১৮৬   ১১ ঐ পৃঃ ১৮৮-৮৯

১২ ঐ পৃঃ ১৮৭   ১৩ ঐ পৃঃ ১৮৯-৯০

তবে এই-সব শক্তি অনুত্তরের একই স্বাতন্ত্র্যশক্তির বিভিন্ন রূপ। আর এই স্বাতন্ত্র্যশক্তির সঙ্গে তিনি নিত্য অবিযুক্ত।[১]

কৌলিকী শক্তি—বর্ণের আলোচনা প্রসঙ্গে কৌলিকী শক্তির কথা এসেছে। বিভিন্ন বিচারে এঁকে অনুত্তরা, পরা প্রতিভা, খেচরী প্রভৃতি বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছে।[২]

পরাত্রিংশিকার মতে যে-শক্তি হৃদয়স্থা তিনি কৌলিকী কুলনায়িকা।[৩] ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে বাহ্যান্তরগ্রাহ্য এবং গ্রাহক এই উভয়ের প্রতিষ্ঠাস্থান সংবিদাত্ম হৃদয়। সেই হৃদয়স্থিতা যে-স্ফুরণময়ী শক্তি তিনি কৌলিকী। আর প্রাণসুখাদিকে বলা হয় কুল। সেই কুলের নায়িকা অর্থাৎ স্ফুরত্তাদায়িনী বলে তিনি কুলনায়িকা।[৪]

তন্ত্রালোকে বলা হয়েছে—অকুলের কুলপ্রথনশালিনী শক্তি কৌলিকী পরা শক্তি। এঁর সঙ্গে প্রভু অবিযুক্ত।[৫]

আবার বলা হয়েছে— অনুত্তর পর ধাম। তাঁকে বলা হয় অকুল। সেই নাথ অকুলের যে-বিসর্গ অর্থাৎ শক্তি তাঁকে কৌলিকী শক্তি বলা হয়।[৬]

আচার্য অভিনবগুপ্ত পরাত্রিংশিকাবিবৃতিতে বলেছেন কৌলিকী শক্তি পরা প্রতিভা। পরা অর্থ সঙ্কোচকলঙ্ককালুষ্যলেশশূন্যা।[৭] আর পরমেশ্বরের নিরতিশয় স্বাতন্ত্র্যৈশ্বর্যচমৎকারময়ী শক্তি প্রতিভা।[৮]

খেচরী—কৌলিকী শক্তিকে খেচরীও বলা হয়।[৯] আচার্য অভিনবগুপ্ত খেচরীশব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন খ অর্থ ব্রহ্ম। তাতে যিনি অভেদরূপে অবস্থান করে বিচরণ করেন তিনি খেচরী। এর অর্থ খেচরী পরিমিতপ্রমাতাকে বেদ্যবিষয় জানান, তার গ্রহণ-বর্জনাদিচেষ্টার বিধান করেন এবং স্বরূপেও অবস্থান করেন।[১০]

খেচরী পরমেশ্বরের স্বরূপাভিন্না শক্তি। তিনি এক হলেও নানারূপে বিভক্ত হয়ে অবভাসিত হন। আন্তর এবং বাহ্য ইন্দ্রিয়াদিরূপে তিনিই অবভাসিত, কামক্রোধাদি তাঁরই রূপ।[১১]

১ বহুশক্তিত্বমপ্যস্য তচ্ছক্ত্যৈবাবিযুক্ততা।—শ্রীঃ ত আ. ভূ আ, পৃঃ ১৮৭ ২ Abhi., 2nd Ed., p. 660

৩ হৃদয়স্থা তু যা শক্তিঃ কৌলিকী কুলনায়িকা।—পরাত্রিংশিকা ২ ৪ ঐ পৃঃ ৪১

৫ অকুলস্যাস্য দেবস্য কুলপ্রথনশালিনী।
কৌলিকী সা পরা শক্তিরবিযুক্তো যয়া প্রভুঃ।—ত্রী আ ৩।৬৭

৬ অনুত্তরং পরং ধাম তদেবাকুলমুচ্যতে।
বিসর্গস্তস্য নাথস্য কৌলিকী শক্তিরুচ্যতে।—ঐ ৩।১৪০

৭ পরাত্রিংশিকা, পৃঃ ১০২ ৮ ত আ. ভূ আ, পৃঃ ৭৪

৯ Abhi, 2nd Ed., p 685 ১০ পরাত্রিংশিকা, পৃঃ ৩৯

১১ ঐ পৃঃ ৪০, Abhi., 2nd Ed., p. 683

খেচরীসমতা—এই খেচরীর সহিত সমতা কুল-মতের অন্যতম লক্ষ্য। এই মতে মোক্ষকে খেচরীসমতা বা খেচরীসাম্য বলা হয়। জীবন্মুক্তিকেও খেচরীসমতা বলা হয়।[১]

সমতা বৈষম্যের বিপরীত। কাম ক্রোধ সুখ দুঃখাদিরূপে খেচরী অবভাসিতা আবার খেচরী পরম শিব থেকে অভিন্ন। কাজেই কাম ক্রোধ সুখ দুঃখ মোহ প্রভৃতিতে পরম শিবই অবস্থিত, পরমার্থতঃ এ-সব তিনিই। এ-সবকে পরমার্থতঃ তাঁর থেকে ভিন্নজ্ঞানই বৈষম্য।[২]

কাজেই খেচরীসমতা বলতে বুঝায় পরিমিত প্রমাতা এবং তার চিত্তের বিভিন্ন অবস্থা, কামক্রোধাদি বিভিন্নচিত্তবৃত্তি, তাদের উৎপাদক বিভিন্ন বেদ্য, এই-সব অনুত্তর থেকে অভিন্ন—এই জ্ঞান। আণবাদি ত্রিবিধ মলের অভাব হলে পরে এ রকম জ্ঞান সম্ভবপর। খেচরী যেমন অনুত্তরাভিন্ন তেমনি পরিমিতপ্রমাতাও পরপ্রমাতা থেকে অভিন্ন খেচরীসমতায় এই বোধ হয়।[৩] এই খেচরীসমতা জীবন্মুক্তি।

আবার খেচরীসমতা মোক্ষও বটে।[৪] মোক্ষ অর্থ অনুত্তরস্বরূপ-পরিজ্ঞান। সূক্ষ্মতম-বিমর্শরূপা খেচরীর সহিত অবিযুক্ত প্রকাশাত্ম যে-অনুত্তর তাঁর স্বরূপপরিজ্ঞান এখানে লক্ষিত হয়েছে।[৫] কাজেই মোক্ষ বা মুক্তিতে জীব অনুত্তরের সঙ্গে তেমনিভাবে যুক্ত হয় যেমনভাবে অনুত্তরা অনুত্তরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছেন।[৬]

ভৈরবৈকাত্ম্য—কুল-মতে মোক্ষকে ভৈরবৈকাত্ম্যও বলা হয়েছে। আবার ভৈরবৈকাত্ম্য বলতে জীবন্মুক্তিও বোঝায়।[৭]

ভেদাবভাসিত যে-সব তত্ত্বকে বন্ধন মনে করা হয় সেই-সবকে সর্বসঙ্কোচমুক্ত স্বাত্মাভিন্ন অবগত হওয়া জীবন্মুক্তি। স্বাত্মা পরমার্থতঃ স্বাত্মচমৎকার পূর্ণাহন্তাতাদাত্ম্য-ভৈরবস্বরূপ।[৮] কাজেই জীবন্মুক্তিতে জীবের ভৈরবের সঙ্গে ঐকাত্ম্য সাধিত হয়। বলাই বাহুল্য এরূপ ভৈরবৈকাত্ম্য সাধারণ জীবের লভ্য নয়। যিনি যোগিনীগর্ভসম্ভূত অর্থাৎ শিবভাবে-ভাবিত পুরুষ ও শক্তিভাবে ভাবিত নারীর মিলনোদ্ভূত যোগী পুরুষ তিনি ভৈরবৈকাত্ম্য লাভ করতে পারেন।[৯]

ভৈরবৈকাত্ম্য-মোক্ষ আর খেচরীসাম্য-মোক্ষ এই উভয়ের মধ্যে বহু মিল আছে।[১০] গ্রন্থবিস্তারভয়ে এ সম্বন্ধে আর আলোচনা করা গেল না।

---

১ Abhi., 2nd Ed., p. 682 ২ পরাত্রিংশিকা, পৃঃ ৪০—৪১.

৩ ঐ পৃঃ ৪০, Abhi., 2nd Ed., p. 683 ৪ খেচরীসাম্যমেব মোক্ষঃ।—পরাত্রিংশিকা, পৃঃ ৪৫

৫ ঐ এবং পাদটীকা। ৬ Abhi., 2nd Ed., p. 685-86 ৭ Ibid, p. 686.

৮ পরাত্রিংশিকা, পৃঃ ১৮, Abhi., 2nd Ed., p. 686

৯ ঐ পৃঃ ২৪০, Ibid, p. 687 ১০ Abhi., 2nd Ed. p. 686

কৌলিকী সিদ্ধি—কুল-মতে মোক্ষকে কৌলিকী সিদ্ধিও বলা হয়। লক্ষ্য করা গেছে কুলশব্দের এক অর্থ প্রকাশের শক্ত্যাদিক্ষিত্যন্ত-স্থূলীভূত রূপ। 'কুলে ভবা কৌলিকী সিদ্ধিঃ' —উক্ত প্রকার কুলে জাত সিদ্ধি কৌলিকী সিদ্ধি। ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে পূর্বোক্ত স্থূলীভূত রূপকে পরিবৃত করে আছে আনন্দরূপ। এই আনন্দরূপ স্পন্দস্বভাব-পরসংবিদাত্মক শিবের বিমর্শতাদাত্ম্য অর্থাৎ বিমর্শের সঙ্গে একরূপ। অনুত্তরস্বরূপ-তাদাত্ম্যের জন্য অর্থাৎ পরমার্থতঃ অনুত্তরের সঙ্গে একরূপ হওয়ার জন্য কুল ঐ রকম হয়। কুল সম্বন্ধে জীবন্মুক্তের এরূপ অনুভবই (experience) কৌলিকী সিদ্ধি।[১] দেহপ্রাণাদি কুল। এইজন্য এই দেহপ্রাণাদি থেকে আগত অর্থাৎ দেহপ্রাণাদির দ্বারা লব্ধ সিদ্ধি কৌলিকী সিদ্ধি।[২]

মোক্ষলাভের উপায়—কুল-মতে মোক্ষলাভের উপায় শাম্ভবোপায়।[৩] একে সাক্ষাদুপায়ও বলা হয়।[৪]

কুল-মতের সাধনা—কুল-মতের সাধনা গুহ্য সাধনা। কুলমার্গে বামমার্গ ও দক্ষিণ-মার্গের সমন্বয় হয়েছে। এইজন্য এই মার্গের সাধনাতেও এই সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। বামমার্গের সাধনায় পঞ্চমকার বিহিত আর দক্ষিণমার্গের সাধনায় এ-সব নিষিদ্ধ। আলোচ্য কুলমার্গে মৎস্য এবং মুদ্রা বাদ দিয়ে অন্য মকারত্রয়ের বিধান আছে।[৫]

পঞ্চমকার সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হবে। তবে এখানেও বলা আবশ্যক যে এই মকারসেবন সাধনার অঙ্গ। বীরব্রতী, জপরত, নিয়মরত, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা শান্তমানস যোগী সাধক কুলমতবিহিত মকারত্রয়সেবনের অধিকারী।[৬]

ক্রম-মত—ক্রম-মত[৭] কুল-মত এবং প্রত্যভিজ্ঞা থেকে ভিন্ন অপর একটি মত। এর ইতিহাস, গুরুপরম্পরা এবং গ্রন্থাদিও ভিন্ন। তবে কুল-মতের সঙ্গে এই মতের অনেক মিলও আছে। এইজন্য একে কুল-মতের সোদর মত মনে করা হয়।[৮]

ক্রম-মতকে নিশাটনতন্ত্রে কৌলিকী বিদ্যা বলা হয়েছে। কালী বাগেশ্বরীরূপে এই বিদ্যা প্রকাশ করেন।[৯]

আচার্য অভিনবগুপ্তের মতে ক্রম-মতের আরম্ভ কুল-মতে এবং কুল-মতেই তার সমাপ্তি।[১০] তবে আগেই বলা হয়েছে এই উভয় মতের মধ্যে পার্থক্য আছে। যেমন কুল-মতে মুক্তির

১ Abhi., 2nd Ed., p. 688 ২ পরাত্রিংশিকা, পৃঃ ৩৬; Abhi., 2nd Ed., pp. 688-89

৩ Ibid, p. 689-90 ৪ ত আ, প্র আ, পৃঃ ১৮২

৫ Abhi., 2nd Ed., p. 614 ৬ ত আ, আহ্নিক ২৯, পৃঃ ৩৭

৭ ক্রম-মতের আলোচনাতেও আমরা প্রধানতঃ ডক্টর কান্তিচন্দ্র পাণ্ডের সম্প্রতি-প্রকাশিত অভিনবগুপ্ত (২য় সং) নামক গ্রন্থের অনুসরণ করেছি।

৮ Abhi., 2nd Ed., p. 461; ত আ, চ আ, পৃঃ ১৫৭

৯ Ibid, p. 506; ঐ পৃঃ ২০৭ ১০ Ibid, p. 464.

উপায় শাম্ভবোপায়; কাজেই এতে শাম্ভবোপায়ের প্রাধান্য স্বীকৃত। কিন্তু ক্রম-মতে মুক্তির উপায় শাক্তোপায়; কাজেই এতে শাক্তোপায়ের প্রাধান্য।[১] শাম্ভবোপায় এবং শাক্তোপায় সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

নামের ব্যাখ্যা—ক্রম-মত বা ক্রমনায় বা ক্রমদর্শন নামে এই মতটি পরিচিত। ক্রমশব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে এই মতে বিকল্পের সংস্কারের দ্বারা নির্বিকল্প স্বরূপে অনুপ্রবেশ হয় বলে একে ক্রমনয় বা ক্রম-মত বলা হয়। সংস্কার বলতে বুঝায় পুনঃ পুনঃ শ্রুতচিন্তনাদিবশতঃ অস্ফুটত্বাদি থেকে ক্রমে স্ফুটতমত্ব-আদি পর্যন্ত গুণান্তর-আধান।[২] ক্রমটি এই—অস্ফুটত্ব-স্ফুটনযোগ্যত্ব-উদ্‌গচ্ছৎস্ফুটত্ব-সিদ্ধস্ফুটত্ব-স্ফুটতরত্ব-স্ফুটতমত্ব।[৩]

এই মতকে কালীনয়ও বলা হয়। কারণ এই মতে পরমেশ্বরী পরা সংবিৎ দেবী কালী। তিনি ক্ষেপ, জ্ঞান, সংখ্যান, গতি এবং নাদ এই পঞ্চবিধ কলন করেন।[৪]

ক্ষেপ বহিরুল্লাস, জ্ঞান বহিরুল্লসিতের স্বাত্মাভেদজ্ঞান, উল্লসিত প্রমাতৃ প্রমেয় পরস্পর থেকে পৃথক্ এরূপ বিকল্প অর্থাৎ 'ইদমিদং নানিদম্' ইহা ইহা, ইহা ভিন্ন নহে, এরূপ ভেদজ্ঞান সংখ্যান আর আভাসিত জগতের সংবিল্লক্ষণ-স্বরূপপ্রাপ্তি গতি। প্রতিবিম্বের সঙ্গে প্রতিবিম্বকুড্যের যে-সম্বন্ধ আভাসিত জগতের সঙ্গে আভাসনকারিণী পরা সংবিতের সেই সম্বন্ধ। আভাসিত জগৎ লোপ পেয়ে গেলে যে-নদনমাত্ররূপতা অর্থাৎ সংবিদের প্রকাশমাত্ররূপতা থাকে তাই নাদ।[৫]

এ ছাড়া দেবীনয়, মহানয় বা অতিনয়, মহার্থদর্শন, উত্তরাম্নায় বা উত্তর ক্রম এই-সব নামেও মতটির উল্লেখ করা হয়েছে।[৬]

ইতিহাস—যতটা জানা যায় খৃঃ সপ্তম শতকের শেষের দিকে বা অষ্টম শতকের প্রারম্ভে কাশ্মীরে এই মতের উদ্ভব হয়। এটি কাশ্মীরের অন্যতম প্রাচীন অদ্বৈত মত। এই মতের আদি গুরু শিবানন্দনাথ ওরফে অবতারকনাথ। শিবানন্দের তিন শিষ্যা— কেয়ূরবতী, মদনিকা এবং কল্যাণিকা। এঁদের শিষ্যদের মধ্যে বিখ্যাত তিনজন গোবিন্দরাজ, ভানুক এবং এরক। গোবিন্দরাজের প্রখ্যাত শিষ্য সোমানন্দ। ভানুকের শিষ্যদের মধ্যে প্রধান উজ্জট এবং উদ্ভট। এরকের কোনো শিষ্য ছিল না। তিনি বিবিধ স্তোত্র রচনা করে এই মত প্রচার করেন।[৭]

ক্রম-মতের গ্রন্থ—তন্ত্রালোক ও মহার্থমঞ্জরীতে ক্রম-মতের বিবিধ আকরগ্রন্থ আগম

---

১ Abhi., 2nd Ed., p. 584   ২ ত আ, চ আ, পৃঃ ২   ৩ ঐ পৃঃ ৪-৫

৪ ঐ পৃঃ ২০৩-২০৫   ৫ ঐ পৃঃ ২০৪-২০৫

৬ ঐ পৃঃ ১৯৫-৯৬ ; Abhi., 2nd Ed., p. 468

৭ Abhi., 2nd Ed., pp. 465-66 ; ত আ, চ আ, পৃঃ ১৯১-৯৩

এবং প্রাচীন গুরুদের রচনার উল্লেখ আছে। কিন্তু এ সব গ্রন্থ পাওয়া যায় নি, মনে হয় লোপ পেয়ে গেছে।[১]

ক্রমসদ্ভাব, ক্রমসিদ্ধি, ব্রহ্মযামল এবং তন্ত্ররাজ ভট্টারক এই কখানা আকরগ্রন্থ আগম।[২] নিম্নলিখিত গ্রন্থের নাম পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু গ্রন্থকারদের নাম জানা যায় না। যথা—ক্রমসূত্র, ক্রমোদয়, পঞ্চশতিক, সার্ধশতিক, ক্রম-স্তোত্র, মহানয়-প্রকাশ (কাশ্মীরী ভাষায় শিতিকণ্ঠাচার্য-রচিত মহানয়প্রকাশ ভিন্ন গ্রন্থ) এবং মহানয়-পদ্ধতি।[৩]

এ ছাড়া শিবানন্দনাথ, এরক, ভুবনাথ, সোমরাজ প্রভৃতি প্রাচীন গুরুরা ক্রম-মতের গ্রন্থ রচনা করেছিলেন বলে জানা যায় কিন্তু তাঁদের গ্রন্থের নাম পর্যন্ত লোপ পেয়ে গেছে।[৪]

আচার্য অভিনবগুপ্ত ক্রম-মত সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গ্রন্থ রচনা করেন[৫]—(১) ক্রমকেলি, (২) ক্রম-স্তোত্র এবং (৩) দেহস্থ-দেবতাচক্র-স্তোত্র।

অভিনবগুপ্তপাদের শিষ্য ক্ষেমরাজ ক্রমসূত্রের টীকা রচনা করেন।[৬] মহার্থমঞ্জরীর রচয়িতা মহেশ্বরানন্দের পরমগুরু ক্রমবাসনা এবং ঋজুবিমর্শিনী নামক দুখানি গ্রন্থ রচনা করেন।[৭] আচার্য মহেশ্বরানন্দ মহার্থমঞ্জরী ছাড়া মহার্থোদয় নামে আরেকখানি গ্রন্থও রচনা করেন। আচার্য জয়রথ তন্ত্রালোকের বিবেক নামক যে-টীকা রচনা করেছেন তার মধ্যেও ক্রম-মত সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়।[৮]

ক্রম-মতের দুই ধারা—ক্রম-মতে দুটি ধারা বা সম্প্রদায় লক্ষ্য করা যায়। এক সম্প্রদায় অনুসারে শিব পরমেশ্বর। তিনিই পরম সত্তা। ব্যোমবামেশ্বরী প্রভৃতি তাঁরই বিভিন্ন রূপ। অন্য সম্প্রদায় অনুসারে কালী বা কালসংকর্ষিণী পরমেশ্বরী। তিনিই পরম সত্তা। ব্যোমবামেশ্বরী প্রভৃতি তাঁরই রূপ।[৯] অবশ্য এই সম্প্রদায়ের লোকেরাও নিজেদের শৈবই বলতেন।[১০]

ক্রম-মত ও শাক্ত ভাব—ক্রম-মতে কালীকে যেমন পরম সত্তা পরমেশ্বরী মনে করা হয় তেমনি এই মতের গুহ্য সাধনায় পঞ্চমকার বিহিত। এই উভয়ই শাক্তমতের ভাব।[১১]

সাধনায় পঞ্চমকার ব্যবহার সম্বন্ধে ক্রম-মতে যে-যুক্তি দেওয়া হয়েছে তা এই—সাধারণতঃ লোকে পঞ্চমকারকে জুগুপ্সিত, গর্হিত, অশুদ্ধ মনে করে। কিন্তু বস্তুমাত্রই পরমার্থতঃ পরা সংবিৎ।[১২] কাজেই পঞ্চমকার পরমার্থতঃ পরা সংবিৎ। অতএব জুগুপ্সিত বা নিন্দনীয় হতে পারে না। প্রকৃত প্রস্তাবে শুদ্ধি-অশুদ্ধি এ-সব বস্তুর ধর্ম নয়, প্রমাতার ধর্ম। প্রমাতা

১ Abhi., 2nd Ed., p. 466 ২ Ibid, pp. 467-71 ৩ Ibid, pp. 478-81
৪ Ibid, pp. 471-78 ৫ Ibid, pp. 482-86 ৬ Ibid, p. 486
৭ Ibid, pp. 486-87 ৮ Ibid, p. 487 ৯ Ibid, p. 489-90
১০ Ibid, p. 488 ১১ Ibid, p. 491 ১২ ত আ, চ আ, পৃঃ ২৬০

যে-বস্তুকে সংবিদেকাত্ম বলে জানেন তা-ই শুদ্ধ, যাকে তা বলে জানেন না তা অশুদ্ধ।[১] কাজেই দেখা যাচ্ছে প্রমাতার চিত্তই বস্তুর শুদ্ধি-অশুদ্ধির মূলে। প্রমাতার চিত্ত সংবিদেকাগ্রীভূত হলে তাঁর কাছে সবই সংবিৎ।[২]

প্রমাতার বিকল্পবুদ্ধি ধ্বংস না হলে তাঁর চিত্ত সংবিদেকাগ্রীভূত হতে পারে না। পঞ্চমকারবিষয়ে বিকল্পবুদ্ধি সাধারণতঃ প্রবল থাকে। সাধনায় অগ্রসর সাধকের চিত্ত সংবিদেকাগ্রীভূত হয়েছে কি না, তাঁর বিকল্পবুদ্ধির নিরসন হয়েছে কি না এটি পর্যবেক্ষণের জন্য সাধনায় লোকগর্হিত সাধারণশাস্ত্রবিরুদ্ধ জুগুপ্সিত বস্তুর ব্যবহার তাঁর পক্ষে ক্রম-মতে বিহিত হয়েছে।[৩]

কুল-মতের মতো ক্রম-মতেও উচ্চ স্তরের সাধকই এরূপ সাধনার অধিকারী। অর্থাৎ সাধনার উচ্চ স্তরে আরোহণ করার ফলে যাঁদের চিত্ত সংবিদেকাগ্রীভূত হয়েছে এবং সেইজন্য যাদের শুদ্ধি-অশুদ্ধি পুণ্য-পাপ এরূপ বিকল্প লোপ পেয়েছে একমাত্র তাঁদের জন্যই এই গুহ্য সাধনা বিহিত।[৪]

পঞ্চ-নির্ভরতা— ক্রম-মত পঞ্চ-নির্ভর। অর্থাৎ এই মতের প্রখ্যাপনে বিভিন্ন পঞ্চ স্বীকার করা হয়েছে। যথা—(১) পঞ্চবাহ। ব্যোমবামেশ্বরী, খেচরী, দিক্‌চরী, গোচরী ও ভূচরী পরমেশ্বরের বা পরম সত্তার এই পঞ্চ স্ফুরণধারা পঞ্চবাহ।[৫] (২) পঞ্চশক্তি। সৃষ্টিশক্তি, স্থিতিশক্তি, সংহারশক্তি, অনাখ্যশক্তি এবং ভাসাশক্তি এই পঞ্চশক্তি।[৬] (৩) পঞ্চবাক্—পরা, সূক্ষ্মা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী।[৭] (৪) পঞ্চধেয়—শ্রীপীঠ, পঞ্চবাহ, নেত্রত্রয়, বৃন্দচক্র এবং গুরুপংক্তি।[৮] (৫) বেদকাত্ম পঞ্চশক্তি—চিৎ, আনন্দ, ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া। এই পঞ্চ শক্তি পরা সংবিতেরই পাঁচটি বিভিন্ন রূপ।[৯]

ক্রম-মতে পর তত্ত্ব কালী। তাঁর ক্ষেপ, জ্ঞান, সংখ্যান, গতি এবং নাদ এই পঞ্চ ক্রিয়া। হয়ত এই পঞ্চের ধারণা থেকে অন্যান্য পঞ্চের কল্পনা এসেছে অথবা শিবের পঞ্চ মুখ এই ধারণা থেকেও আসতে পারে।[১০]

উপরে বর্ণিত বিভিন্ন পঞ্চক পরা সংবিতেরই বিভিন্ন রূপ। বিভিন্ন বিচারে এই বিভিন্ন রূপ লক্ষিত হয়েছে।[১১]

ক্রম-মতে কালী—পূর্বেই বলা হয়েছে ক্রম-মতে কালী পরম সত্তা বা পরমেশ্বরী। তিনি পরা সংবিৎ। ক্ষেপ গতি প্রভৃতি তাঁরই কাজ। তিনি বিভিন্ন রূপে স্ফুরিতা হলেও

---

১ ত আ, চ আ, পৃঃ ২৭১ ২ দ্রঃ ঐ পৃঃ ২৬৮-২৬৯ ৩ ঐ পৃঃ ২৬৯

৪ ঐ পৃঃ ২৭০, Abhi., 2nd Ed., p. 493 ৫ Abhi., 2nd Ed., p. 494 ৬ Ibid

৭ Ibid ৮ Ibid ৯ Ibid ১০ Ibid, pp. 495-96 ১১ Ibid, p. 496

পরমার্থতঃ নির্বিকল্পা। এই মতে তাঁর (১) মাতৃসদ্ভাব, (২) ব্যোমবামেশ্বরী এবং (৩) কালসংকর্ষিণী এই তিনটি নাম প্রধানতঃ প্রচলিত।

(১) মাতৃসদ্ভাব—দার্শনিক বিচারে কালীকে মাতৃসদ্ভাব বলা হয়। পরা সংবিৎ স্বতন্ত্র, স্বপ্রকাশ। তিনি প্রমাতার সংবিত্তিতে ক্রমে ক্রমে দ্বাদশ কালীরূপে স্ফুরিতা হন। এর ফলে প্রমাতা পরা সংবিতের সঙ্গে ঐকাত্ম্য অনুভব করেন অর্থাৎ দ্বাদশ কালীর উপলব্ধি হলে তিনি মুক্তি লাভ করেন। এই জন্যই কালীকে মাতৃসদ্ভাব অর্থাৎ প্রমাতৃসদ্ভাব বলা হয়েছে।[১]

আচার্য অভিনবগুপ্ত নিম্নলিখিত দ্বাদশ কালীর নাম করেছেন— সৃষ্টিকালী, রক্তকালী, স্থিতিনাশকালী, যমকালী, সংহারকালী, মৃত্যুকালী, রুদ্রকালী, ভদ্রকালী, মার্তণ্ডকালী, পরমার্ককালী, কালাগ্নিরুদ্রকালী, মহাকালকালী এবং মহাভৈরবচণ্ডোগ্রঘোরকালী বা মহাভৈরবকালী।[২]

পরা সংবিতের যখন সিসৃক্ষা জাগে এবং তাঁর নিজেরই মধ্যে বহিরাসূত্রিতপ্রায় ভাবসমূহ অর্থাৎ প্রমেয়বিশ্ব অবভাসিত হয় তখন তাঁকে বলা হয় সৃষ্টিকালী। এটি তাঁর প্রমেয়গত সৃষ্টিস্বরূপ।[৩]

সৃষ্টিকালীরূপে উদিতা হওয়ার পর প্রমাত্রেকরূপা পরা সংবিৎ বহির্মুখী হয়ে স্বস্বাতন্ত্র্যহেতু চক্ষুরাদি-ইন্দ্রিয়সম্বন্ধিপ্রমাণদশা প্রাপ্ত হন অর্থাৎ জ্ঞানের উপায়রূপে স্ফুরিতা হন এবং আভাসিত বিশ্বের দ্বারা রঞ্জিতা হন। এইজন্য এঁকে বলা হয় রক্তকালী। এটি তাঁর প্রমেয়গত স্থিতিস্বরূপ।[৪]

পরা সংবিৎ যখন বহির্মুখিতায় অবভাসিত স্বীয় প্রমাণদশাপ্রাপ্ত রূপ আত্মসাৎ করতে অর্থাৎ প্রতিসংহার করতে ইচ্ছুক হন তখন তাঁকে বলা হয় স্থিতিনাশকালী। 'জ্ঞাতোময়ার্থঃ' মৎকর্তৃক অর্থ অর্থাৎ বিষয় বা প্রমেয় জ্ঞাত হয়েছে এইরূপ সংবিত্তিতে স্বাত্মবিশ্রাম তিনি ইচ্ছা করেন বলে পূর্বোক্ত প্রমাণদশাপ্রাপ্ত রূপ আত্মসাৎ করতে ইচ্ছুক হন। এটি তাঁর প্রমেয়গত সংহারস্বরূপ।[৫]

স্থিতিনাশকালীরূপে উদয়ের পরও পরা সংবিৎ পরিমিতপ্রমাতার ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং বহিরৌন্মুখ্যাত্মক অংশে প্রমেয়কক্ষ্যাপর্যন্ত উল্লাসিত করেন আর তখন 'এটা করা উচিত কি উচিত নয়' প্রমাতার মনে নিয়ত এরূপ শঙ্কার অর্থাৎ সংশয়ের সৃষ্টি করেন। শাস্ত্র অনন্ত বলে একই বিষয়ে কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে বিভিন্ন শাস্ত্রের পরস্পরবিরোধী নির্দেশ থাকার জন্য এ রকম হয়। আবার তার পরই স্বীয় অন্তরৌন্মুখ্যাত্মক অংশে কেবলমাত্র-সংবিদাত্মক রূপেই

---

১ Abhi., 2nd Ed., pp. 504-06 ; ত আ, ৮ আ, পৃঃ ২০৬-০৭

২ ত আ, ৮ আ, পৃঃ ১৫৭-১৮৯ ৩ ঐ পৃঃ ১৫৭-৫৮, Abhi., 2nd Ed., p. 513

৪ ঐ পৃঃ ১৫৯-৬০ ; Ibid, p. 514 ৫ ঐ পৃঃ ১৬২-৬৩, Ibid, pp. 514-15

পরিস্ফুরিতা হন। এইরূপ নিয়তি, সংকোচ এবং বিধিনিষেধের বিষয় নয়। অনবরত এই প্রকার সংকোচ এবং বিকাশ অনিয়তরূপে চলতে পারে না বলে পরা সংবিৎ এর 'যম' বিধান করেন অর্থাৎ একে নিয়মিত করেন। এইজন্যই ইনি যমকালী নামে অভিহিতা হন। এটি তাঁর প্রমেয়গত অনাখ্যস্বরূপ।[১] আচার্য জয়রথ বলেন উপরে বর্ণিত চার কালী প্রমেয়াংশ-গ্রাসরসিক।[২]

পূর্বোক্তরূপ শঙ্কা বা তার কার্যাকার্যরূপ বিষয়সমূহ সংহার করে সেই পরা সংবিৎ প্রমাণগত বহীরূপতার অর্থাৎ প্রমাণগত সৃষ্টির বিলোপ সাধন করেন এবং উক্ত সৃষ্টি বা অর্থজাত নিজের মধ্যে নিজের সঙ্গে অভিন্নভাবে অবভাসিত করেন। এইজন্য এঁকে সংহারকালী বলা হয়। এটি দেবীর প্রমাণগত সৃষ্টিস্বরূপ।[৩]

স্থিতিনাশকালী ও সংহারকালীর প্রভেদ এই যে স্থিতিনাশকালীতে প্রমাতৃত্ব ও প্রমেয়ত্ব ভিন্ন আর সংহারকালীতে উভয় অভিন্ন।[৪]

পরা সংবিৎ নিখিল অর্থজাত অর্থাৎ প্রমেয় সংহার করেন বলে তিনি মৃত্যুরূপা। আবার তিনিই নিখিল অর্থজাত স্বাত্মাভিন্নরূপে অবভাসিত করেন। এই অর্থজাত বা প্রমেয় যখন নিরুপাধি সংশুদ্ধ প্রমাতায় অর্থাৎ প্রমাত্রাত্মক পরা সংবিতে বিশ্রান্তি লাভ করে তখনই স্থিতি প্রাপ্ত হয়। এই প্রমাতা প্রমাণের বিশ্রান্তি অর্থাৎ প্রমাণবিশ্রান্তি প্রমাতাতেই প্রমেয়ের স্থিতি। প্রমেয় সংবিদ্রূপে অস্তমিত হয়। এইভাবে পরা সংবিতের সংহারকারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কাজেই ইনি মৃত্যুরূপা। এই মৃত্যুরূপা-সংহারকালীর কলন করেন বলে ইনি মৃত্যুকালী। এটি দেবীর প্রমাণগত স্থিতিস্বরূপ।[৫]

পূর্বোক্ত অর্থজাত বিলুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরা সংবিৎ পরিমিতপ্রমাতার বুদ্ধিতে কোনো একটি ভাব বা অর্থ অবভাসিত করেন। এই ভাব বা অর্থ পূর্বকৃত কর্মের সংস্কাররূপে বর্তমান। এর সম্বন্ধেই উপরে বর্ণিত শঙ্কা থাকে। এটি ধর্ম কি অধর্ম এই নিয়ে শঙ্কা। ধর্মাধর্মের নিশ্চয়তা অনুসারে উক্ত ভাব ইহলোকে এবং পরলোকে শুভাশুভ ফল প্রদান করে। সহজ কথায় বলা যায় এই ভাব অনুসারে জীব সুখদুঃখাদি ভোগ করে।[৬] ভাবটি ধর্ম কি অধর্ম যার মনে যেমন প্রতিভাত হয় সে তেমনি ফললাভ করে।[৭]

কার্যাকার্য এবং তার ফল সম্বন্ধে পূর্বশ্রুতি অনুসারে পরিমিত প্রমাতার একটা সংস্কার জন্মে যায় এবং সেইজন্য কোনো কিছু করার আগেই কাজটা করা উচিত কি না এই

১ ত আ, চ আ, পৃঃ ১৬৩-৬৫ ; Abhi., 2nd Ed., p. 515   ২ ঐ পৃঃ ১৬৫

৩ ঐ পৃঃ ১৬৬-৬৮ , Abhi., 2nd Ed., pp. 515-16

৪ Ibid, p. 516   ৫ ত আ, চ আ, পৃঃ ১৬৮-৬৯ , Abhi., 2nd Ed., p. 516

৬ ঐ পৃঃ ১৬৯-৭১ , Ibid, p. 517   ৭ Ibid

সংশয় তার মনে জাগে। পূর্বসংস্কার অনুসারে কিছু একটা স্থির করে সে কাজ করে এবং শুভ বা অশুভ ফল সুখ বা দুঃখ পায়। অনেক সময় দেখা যায় কর্তব্য বলে শুভ ফলের প্রত্যাশায় যা করে তার ফল শুভ হয় না। তখন আবার 'কার্য মনে করে আমি অকার্য করেছি' এই শঙ্কা তার মনে জাগে।[১] উক্তরূপ শঙ্কাসম্বন্ধিসংস্কাররূপে অবস্থিত অর্থের রোধন ও দ্রাবণ করেন বলে পরা সংবিৎকে বলা হয় রুদ্রকালী।[২] তাঁকে ভদ্রকালীও বলা হয়েছে। এ শুধু নামের পার্থক্য। বস্তুতে কোনো ভেদ নেই।[৩] এটি দেবীর প্রমাণগত সংহারস্বরূপ।[৪]

অর্থের পরিচ্ছেদকারী পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধি এই দ্বাদশ ইন্দ্রিয় বা করণ। এদের বলা হয় মার্তণ্ড। মার্তণ্ড প্রকাশ করে আর দ্বাদশ করণও ভিন্ন ভিন্ন প্রমেয়কে প্রকাশ করে। এইজন্যই এদের মার্তণ্ড বলা হয়েছে।

অহংকারকেও অন্তঃকরণ গণ্য করা হয়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে হয় নি। 'আমি শুনি, আমি করি' এইরূপ অভিমানের একসাধন হওয়ার জন্য এখানে অহংকার প্রমাতা থেকে অভিন্ন এবং সমস্ত অর্থের পরামর্শনশীল করণ, শুধু অন্তঃকরণ নয়। এইজন্য পূর্বোক্ত করণবর্গ অর্থাৎ দ্বাদশ করণ অহংকারে লীন হয়।[৫]

পরা সংবিৎ স্বস্বাতন্ত্র্যবশতঃ প্রমাতৃ-অভিন্ন যে-অহংকার তার মধ্যে দ্বাদশ মার্তণ্ডকে কলন করেন অর্থাৎ অহংকারের সঙ্গে তাদের একময়তা সম্পাদন করেন। এইজন্য তাঁকে মার্তণ্ডকালী বলা হয়।[৬] এটি দেবীর প্রমাণগত অনাখ্যস্বরূপ।[৭]

আচার্য জয়রথ বলেন সংহারকালী থেকে মার্তণ্ডকালী পর্যন্ত দেবীচতুষ্টয় প্রমাণাংশ-ভক্ষণপ্রবণ।[৮]

দ্বাদশ করণ অহংকারে সংহৃত হলে সেই অহংকার নামক ত্রয়োদশ করণ কর্তার সঙ্গে একরূপতা প্রাপ্ত হয়। এই অহংকার পূর্ণকল্প এবং একে বলা হয় পরমাদিত্য বা পরমার্ক।[৯]

কর্তা দ্বিবিধ— সঙ্কুচিত আর অসঙ্কুচিত। প্রথমোক্ত দেহবুদ্ধ্যাদির দ্বারা সঙ্কুচিত আর দ্বিতীয়োক্ত সেরূপ নয়। সঙ্কুচিত কর্তাকে শাস্ত্রে কালাগ্নিরুদ্র বলা হয়েছে। কারণ এটি কালের দ্বারা ব্যবচ্ছিন্ন এবং অগ্নি অর্থাৎ ভোক্তা। ভোগ্যসংস্কার প্রবুদ্ধ না হওয়ার জন্য 'মমৈতন্মা ভূৎ'-আমার এটি যেন না হয় এই ভাবে কিছু রুদ্ধ করে আবার ভোগ্যসংস্কার প্রবুদ্ধ হওয়ার জন্য কিছু দ্রাবিত করে অর্থাৎ ভোগের দ্বারা স্বাত্মসাৎ করে। এই রোধন এবং দ্রাবণের জন্য এটি রুদ্র। এইভাবে ভোগোন্মুখতায় সংকুচিত কর্তা আণবমলযুক্ত।

১ ত আ, চ আ, পৃঃ ১৭১ ; Abhi, 2nd Ed., p. 517 ২ ঐ পৃঃ ১৭২
৩ ঐ পৃঃ ১৭৩ ৪ ঐ পৃঃ ১৭৪ ৫ ঐ পৃঃ ১৭৪-৭৬
৬ ঐ পৃঃ ১৭৭-৭৮ ৭ ঐ পৃঃ ১৭৪ ৮ ঐ পৃঃ ১৭৯ ৯ ঐ

পরা সংবিৎ এমনি কর্তাতেই পূর্বোক্ত পরমার্ক নামক অহংকারের কলন করেন অর্থাৎ প্রলীন করেন বলে তাঁকে পরমার্ককালী বলা হয়।[১] এটি দেবীর প্রমাতৃগত সৃষ্টিস্বরূপ।[২]

কালাগ্নিরুদ্র বা সঙ্কুচিত প্রমাতা সঙ্কুচিত বলেই মহাকালে প্রলীন হয়। মহাকাল 'অহমিদংময়ঃ।' 'অহম্' বেদক, 'ইদম্' বেদ্য। কাজেই মহাকাল অহমিদংময় বলতে বুঝায় বেদকবেদ্যরূপ জগৎ মহাকালোদ্ভূত। এইজন্য মহাকাল বিশ্ব-অভেদৈকশালী অর্থাৎ মহাকালই বিশ্ব। মহাকাল বিশ্বের বিকাশকারী। ইনিই অসঙ্কুচিত পরপ্রমাতা পূর্ণাহংতা। এরই মধ্যে কালাগ্নিরুদ্ররূপ সঙ্কুচিত কর্তাকে কলন করেন অর্থাৎ প্রলীন করেন বলে পরা সংবিৎকে বলা হয় কালাগ্নিরুদ্রকালী। এটি দেবীর প্রমাতৃগত স্থিতিস্বরূপ।[৩]

'সর্বমিদমহমেব'—আমিই এই সব, মহাকালসম্বন্ধী এই সংবিত্তি। মহাকাল পরপ্রমাতা। মহাকালে ভাবসমূহ অর্থাৎ অর্থসমূহ প্রমাতার সঙ্গে এক হয়ে অবস্থিত। মহাকালে অহংতার মধ্যে ইদংতার বিশ্রান্তি। মহাকালসম্বন্ধী সংবিত্তি সর্বাত্মরূপ ভাবসমূহ আত্মসাৎ করেন বলে সংহৃত-একস্বভাবা, অতএব পরিপূর্ণা। মহাকাল অকুলধামে লীন হন। অকুলধাম অব্যয় অমেয় সদসদ্‌বিবেকরহিত প্রকাশবিভবস্ফীত। এটি কালীর পর ধাম। এটি স্বাত্মবিশ্রান্তিচমৎকার-অহংপরামর্শদশা। পরা সংবিৎ মহাকালের এই প্রকার কলন করেন বলে অর্থাৎ তাঁকে অকুলধামে লীন করেন বলে তিনি মহাকালকালী।[৪] এটি দেবীর প্রমাতৃগত সংহারস্বরূপ।[৫]

অহংপরামর্শাত্মক অকুল ধামে প্রমেয় প্রমাণ প্রমাতা প্রমা এই-সব নানারূপে বিকাশমান চিৎ-মাত্র। এই প্রকার প্রমাত্রাদি-রূপবৈচিত্র্যধারিণী স্বপ্রকাশ পরা সংবিৎকে বাক্যে প্রকাশ করা যায় না। তাই তিনি অনাখ্য। প্রমাত্রাদিরূপে যখন অবভাসিত হন না তখন ইনি পরবোধস্বরূপ দেবাত্তিদেবের সর্বজ্ঞানশালিনী পরমা বিমর্শশক্তি।

প্রমাতাকে বলা হয় মহাভৈরব, প্রমেয়কে চণ্ড, প্রমাকে উগ্র আর প্রমাণকে ঘোর। পরা সংবিৎ উক্ত চতুষ্টয়ের কলন করে বলে তিনি মহাভৈরবচণ্ডোগ্রঘোরকালী। এটি দেবীর প্রমাতৃগত অনাখ্যস্বরূপ।[৬]

দেবীকে যে পরা বলা হয় তার কারণ পূর্বোক্ত দ্বাদশ দেবী তাঁরই রূপভেদ। এইজন্য পূর্বোক্ত প্রত্যেক কালীই দ্বাদশাত্মিকা অর্থাৎ প্রত্যেক কালীর মধ্যে অন্য একাদশ কালী বিদ্যমান। অতএব সাধনার সময় মোট এক শ চুয়াল্লিশ কালীর পূজার নির্দেশ আছে।[৭]

(২) **ব্যোমবামেশ্বরী**—এর আগে যে-সব পঞ্চকের উল্লেখ করা হয়েছে কালী সে-সব

১ ত আ, চ আ, পৃঃ ১৭৯-৮১ ২ ঐ পৃঃ ১৮২

৩ ঐ পৃঃ ১৮২-৮৩ ৪ ঐ পৃঃ ১৮৩-৮৪ ৫ ঐ পৃঃ ১৮৩

৬ ঐ পৃঃ ১৮৬-৮৭, Abhi., 2nd Ed., p. 521 ৭ ঐ পৃঃ ১৮৮ ; Ibid

স্ফুরিত করেন বলে তাঁকে ব্যোমবামেশ্বরী বলা হয়। ব্যোম বলতে বুঝায় এই-সব পঞ্চক। তাদের বাম অর্থাৎ বমন অর্থাৎ স্ফুরণের যিনি ঈশ্বরী তিনি ব্যোমবামেশ্বরী।[১] তিনি সর্বোর্ধ্ববর্তিনী। সর্ববিভাগস্বভাবত্বহেতু তিনি সর্বসাধারণভাবে সব বস্তুতে স্ফুরিতা।[২] এই দেবী পরমেশ্বরের পরমস্বাতন্ত্র্যময়ী অবিকল্পভূমি-অনুপ্রবিষ্টা চিৎ-শক্তি।[৩]

ব্যোমবামেশ্বরী বা বামেশ্বরী সম্বন্ধে দুটি অভিমত লক্ষ্য করা যায়। আচার্য মহেশ্বরানন্দ-প্রমুখদের মতে ইনি পরমেশ্বরের ব্যোমবামেশ্বরী খেচরী প্রভৃতি শক্তিধারার অন্যতমা। ইনি পরম সত্তা বা পরমেশ্বরী নন। আবার আচার্য অভিনবগুপ্ত-প্রমুখদের মতে ব্যোম-বামেশ্বরী আর কালী অভিন্ন এবং কালী পরম সত্তা, পরমেশ্বরী।[৪]

(৩) কালসঙ্কর্ষিণী—কালী কালসঙ্কর্ষিণী।[৫] কারণ তিনি কালের দ্বারা অবচ্ছিন্না নন। কাল ব্যবচ্ছেদকারী। পৌর্বাপর্যক্রম কালের স্বভাবগত। পৌর্বাপর্যক্রমভাসিত বিভিন্ন রূপ কালীরই রূপ হলেও তাতে তাঁর স্বরূপহানি হয় না।

পূর্বেই বলা হয়েছে ক্রম-মতে সৃষ্টিশক্তি-আদি পঞ্চশক্তি স্বীকার করা হয়। এই পঞ্চশক্তির পঞ্চম শক্তি ভাসা। ভাসাকে প্রতিভাও বলা হয়। ইনি সর্বগর্ভিণী স্বাতন্ত্র্যরূপা চিৎ-শক্তি।[৬] এই ভাসা-শক্তি কালের দ্বারা অকলিত। কাজেই ইনি আর কালসঙ্কর্ষিণী এক। কুল-মত এবং ক্রম-মত উভয় মতেই কালসঙ্কর্ষিণী স্বীকৃতা।

ক্রম-মত ও চক্র—চক্রকল্পনা ক্রম-মতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আচার্য অভিনবগুপ্ত কস্ চক্ কৃৎ এবং কৃ এই চার ধাতু থেকে চক্রশব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করেছেন। যেমন—দীপ্তি পায় এইজন্য চক্র (কসি বিকাসে), তৃপ্তি প্রদান করে এইজন্য চক্র (চক তৃপ্তৌ), বন্ধন ছেদন করে তাই চক্র (কৃতী ছেদনে) এবং কর্মশক্তি আছে বলে চক্র (ডুকৃঞ্ করণে)।[৭]

আলাতচক্র দেখে চক্রের ধারণা করা হয়েছে। যে বিভিন্ন কলা (শক্তি) নিয়ে চক্র গঠিত তারা পর পর এত দ্রুত আবর্তিত হয় যে তাদের কোনো বিচ্ছেদ লক্ষিত হয় না, মনে হয় এক অবিচ্ছিন্ন ধারা চলেছে। শক্তির অন্তহীন আবর্ত। চক্র এই ভাবটির প্রতীক।[৮]

১ Abhi., 2nd Ed., pp. 506, 882 ২ Ibid, p. 506

৩ ব্যোমবামেশ্বরী। সা চ পরমেশ্বরস্বাতন্ত্র্যবিকল্পভূম্যনুপ্রবিষ্টা চিচ্ছক্তিঃ।

—মহার্থমঞ্জরীবচন। দ্রঃ Ibid, pp. 507, 839

৪ Ibid, pp. 508-09 ৫ Ibid, pp. 509-512

৬ ভাসা চ নাম প্রতিভা মহতী সর্বগর্ভিণী।

—মহার্থমঞ্জরীবচন। দ্রঃ Ibid, p. 894

৭ ত আ, আহ্নিক ২৯, পৃঃ ৭৬ ; Abhi., 2nd Ed., p. 625

৮ Abhi., 2nd Ed., p. 626

পূর্বে যে সৃষ্ট্যাদি পঞ্চশক্তির কথা বলা হয়েছে তাদের প্রত্যেকটিকে একটি চক্র মনে করা হয়। একটি শক্তি-আবর্তের সঙ্গে আরেকটি শক্তি-আবর্তের যোগ অবিচ্ছিন্ন। এইজন্য সব মিলে একটি বৃহত্তর চক্রের সৃষ্টি করে।[১]

ক্রম-মতে পঞ্চবাহচক্রকে মূল চক্র মনে করা হয়। এটি সর্বপ্রপঞ্চের দ্যোতক। প্রমিতি বা জ্ঞান প্রমাতা-প্রমাণ-প্রমেয়-সাপেক্ষ। প্রমাতা দ্বিবিধ—পরপ্রমাতা ও পরিমিতপ্রমাতা। প্রমাণও দ্বিবিধ—আন্তর ও বাহ্য। এই দুই প্রমাতা, দুই প্রমাণ এবং প্রমেয়, দার্শনিক বিচারের দিক্ দিয়ে এই পাঁচটি নিয়ে পঞ্চবাহচক্র রচিত। আবার ব্যোমবামেশ্বরী, খেচরী, দিক্‌চরী, গোচরী এবং ভূচরী এই পঞ্চবাহ যথাক্রমে পরপ্রমাতা, পরিমিতপ্রমাতা, আন্তর প্রমাণ, বাহ্যপ্রমাণ এবং প্রমেয় এই পঞ্চকের প্রতিনিধি বা স্থলাভিষিক্ত। সাধনার দিক্ দিয়ে এই পঞ্চবাহকে নিয়ে পঞ্চবাহচক্র। ব্যোমবামেশ্বরী-আদি চক্রের পঞ্চ অর বা শলাকা। পঞ্চবাহচক্র যেমন মুক্তির সাধন তেমনি বন্ধনেরও।[২]

চক্র কালীরই রূপ। তাই ক্রম-মতের সাধনায় চক্রপূজা বিহিত। ক্রমশাস্ত্রে বলা হয়েছে চক্র আনন্দজনক পূজাযোগ্য চিত্তাকর্ষক।[৩]

সপ্ততি তত্ত্ব—ক্রম-মতে তত্ত্বসংখ্যা সত্তর। ব্যোমবামেশ্বরী, খেচরী, দৃক্‌চরী, গোচরী ও ভূচরী এই পঞ্চবাহের দ্বারা দ্যোতিত আদি তত্ত্ব পাঁচটি। বৃন্দচক্রের দ্বারা দ্যোতিত অনুগত চক্র চৌষট্টি। এদের আবার পাঁচভাগ—জ্ঞানসিদ্ধ, মন্ত্রসিদ্ধ, মেলাপসিদ্ধ, শাক্তসিদ্ধ এবং শাম্ভবসিদ্ধ। এই পাঁচটি যথাক্রমে ভূচরী, গোচরী, দৃক্‌চরী, খেচরী এবং ব্যোমবামেশ্বরীর সঙ্গে একরূপ।

প্রমেয়রূপ ষোড়শ বিকার মিলে জ্ঞানসিদ্ধ। একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ মহাভূত এই ষোড়শ বিকার।

আবার পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, মন এবং অহংকার এই দ্বাদশ প্রমাণ। প্রমাণ দ্বিবিধ—বিষয়ব্যাপৃত আর বিষয়প্রত্যাবৃত স্বাত্মবিশ্রান্তিব্যাপৃত। কাজেই উভয় প্রকারে মিলে মোট প্রমাণ চব্বিশ। এই চতুর্বিংশ-প্রমাণময় তত্ত্ব নিয়ে মন্ত্রসিদ্ধ।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, মন এবং অহংকার প্রমাণাত্মক এই দ্বাদশ তত্ত্ব নিয়ে মেলাপসিদ্ধ। এখানে প্রমাতৃকৃত্যে প্রমাণের প্রাধান্য।

পঞ্চ তন্মাত্র, মন, বুদ্ধি ও অহংকার এই পুর্যষ্টক নিয়ে শাক্তসিদ্ধ। কাজেই শাক্তসিদ্ধের তত্ত্বসংখ্যা আট। শাক্তসিদ্ধ তত্ত্বপ্রমাতৃগত।

১ Abhi., 2nd Ed., p. 526 ২ Ibid, pp. 527-29

৩ আনন্দজনকং পূজাযোগ্যং মনোহারি বং।—ত আ, আহ্নিক ২৯, পৃঃ ৭০

অম্বা, বামা, রৌদ্রী এবং জ্যেষ্ঠা এই শক্তিচতুষ্টয় নিয়ে শাম্ভবসিদ্ধ। শাম্ভবসিদ্ধ পূর্ণসংবিৎস্বাতন্ত্র্যময় পরমশিবভট্টারকগত।

সকলের উপরে রুদ্ররৌদ্রেশ্বরী বা কালকর্ষিণী বা কালী। এঁকেও এক তত্ত্ব ধরা হয়।

তা হলে দাঁড়াল আদি তত্ত্ব পাঁচ, অনুগত তত্ত্ব চৌষট্টি আর কালী এক, মোট সত্তর।[১]

ক্রম-মত ও শাক্তোপায়—ক্রম-মতে শাক্তোপায়ের বিশেষ গৌরব। বিকল্পের যাতে নির্বিকল্পস্বরূপে অনুপ্রবেশ হয় সেইভাবে বিকল্পের সংস্কার শাক্তোপায়। এটি হয় ক্রমে ক্রমে। বিকল্প সংস্কৃত হয়ে স্বাত্মবৎ- সংস্কৃত দ্বিতীয় বিকল্পের সৃষ্টি করে। দ্বিতীয় বিকল্প অনুরূপভাবে অধিকতর সংস্কৃত তৃতীয় বিকল্পের সৃষ্টি করে। এইভাবে ক্রমশঃ সংস্কৃত হতে হতে বিকল্প পরিশেষে শুদ্ধ নির্বিকল্প স্বরূপ লাভ করে অর্থাৎ পূর্ণ নির্বিকল্প জ্ঞানরূপে পরিস্ফুরিত হয়।[২]

ক্রম-মত ও যোগ— ক্রম-মতে যোগসাধনার নির্দেশ আছে। তবে এ যোগ পতঞ্জলিপ্রোক্ত যোগ থেকে ভিন্ন। এটি ষড়ঙ্গ-যোগ। ষড়ঙ্গ যথা— প্রাণায়াম, ধ্যান, প্রত্যাহার, ধারণা, তর্ক এবং সমাধি।[৩] পতঞ্জলিপ্রোক্ত অষ্টাঙ্গ যোগের যম, নিয়ম এবং আসন এর মধ্যে নাই। তবে এই অঙ্গত্রয়কে তত্ত্বজ্ঞান লাভের বাহ্য বা পরোক্ষ উপায় বলে স্বীকার করা হয়েছে। প্রাণায়ামও পরোক্ষ উপায়।[৪]

যোগের ষড়ঙ্গের মধ্যে তর্ককে বিশেষ গৌরবের স্থান দেওয়া হয়েছে। তর্ক উত্তম অন্তরঙ্গ যোগাঙ্গ। কেন না তর্কের দ্বারাই যোগী এইটি হেয়, এইটি উপাদেয়, এমনি বিচার করে এবং হেয় বর্জন ও উপাদেয় গ্রহণ করে ঝটিতি তত্ত্বজ্ঞ হতে পারেন।[৫]

তর্ক দ্বিবিধ—সত্তর্ক আর অসত্তর্ক। হেয় উপাদেয় বিচার করার দ্বারা সত্যনির্ণয় যে-তর্কের লক্ষ্য তাই সত্তর্ক। এতে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করার জন্য ছল প্রভৃতি থাকে না। এটি ন্যায়শাস্ত্রের বাদের মতো। অসত্তর্কের লক্ষ্য প্রতিপক্ষকে পরাজিত করা। এইজন্য এতে ছল প্রভৃতির প্রাধান্য এবং বস্তুনির্ণয়ের অর্থাৎ সত্যনির্ণয়ের চেষ্টা নাই।[৬]

যোগাঙ্গ তর্ক সত্তর্ক। সত্তর্ক তত্ত্বজ্ঞান লাভের সাক্ষাৎ উপায়।[৭]

মুক্তির উপায়—ক্রম-মতে মুক্তিলাভ হয় পরমেশ্বরের অনুগ্রহে। পরমেশ্বর স্বতন্ত্র। জীবের প্রতি অনুগ্রহের কারণ তাঁর ইচ্ছা।[৮] আচার্য জয়রথ বলেছেন পরমেশ্বরের এই ইচ্ছা

১ সপ্ততি তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা দ্রঃ Abhi., 2nd Ed., pp. 529-30 ২ Ibid, p. 534

৩ প্রাণায়ামস্তথা ধ্যানং প্রত্যাহারোঽথ ধারণা।
তর্কশ্চৈব সমাধিশ্চ ষড়ঙ্গো যোগ উচ্যতে।—ত আ, চ আ, পৃঃ ১৫

৪ ঐ পৃঃ ২৪ ৫ ঐ পৃঃ ১৫-১৬

৬ ঐ পৃঃ ১৯ ৭ Abhi., 2nd Ed., p. 588 ৮ ত আ, চ আ, পৃঃ ৩২

তাঁর অনুগ্রহরূপে সদ্গুরুপ্রাপ্তিতে পর্যবসিত হয়।[১] পরমেশ্বর শিব বদ্ধ জীবদের স্বেচ্ছায় মুক্তি প্রদান করেন।[২]

কিন্তু এই-সব অনুগ্রহযোগ্য সংসারী জীব বিভিন্ন প্রকৃতির; তাদের রুচি বিভিন্ন। এইজন্য পরমেশ্বর তাদের আশয় অনুসারে ভক্তি কর্ম বিদ্যা জ্ঞান ধর্মোপদেশ মন্ত্র দীক্ষা প্রভৃতি নানা প্রকারে তাদের মুক্তিবিধান করেন। কাজেই ক্রম-মতে পূর্ণজ্ঞানপ্রাপ্তি বা মুক্তির উপায় অনেক।[৩]

রসেশ্বরদর্শন— মাধবাচার্য বলেন[৪] একদল মাহেশ্বর অর্থাৎ শিবোপাসক পরমেশ্বর-তাদাত্ম্যবাদী; অর্থাৎ এঁরা জীবাত্মাকে স্বরূপতঃ পরমেশ্বর থেকে অভিন্ন মনে করেন। এঁদের অভিমত এই যে জীবন্মুক্তিকে প্রায় সর্বসম্মত বলা যায়, কিন্তু তা নির্ভর করে একমাত্র পিণ্ডস্থৈর্য অর্থাৎ দেহস্থৈর্যের উপর এবং এই দেহস্থৈর্য-বিধানের উপায় পারদাদি নামে পরিচিত রস। এঁদেরই দার্শনিক মত রসেশ্বরদর্শন নামে পরিচিত।

রস ও পরব্রহ্ম—এই দর্শনে পারদ বা রস এবং পরব্রহ্ম বা পরশিবের সাম্য প্রদর্শন করা হয়েছে। নিজের মতের সমর্থনে এঁরা এই শ্রুতিবচন উদ্ধার করেন—তিনি রসস্বরূপ। জীব এই রসস্বরূপকে লাভ করে আনন্দিত হয়।[৫]

পারদশব্দের ব্যাখ্যা—এঁরা পারদকে মোক্ষের সাধনও মনে করেন।[৬] বলেন পারদ সংসারের পার প্রদান করে, সেইজন্যই তাকে পারদ বলা হয়।[৭]

পারদকে রস বলা হয় কেন এই প্রশ্নের উত্তরে এঁরা বলেন পারদ শিবসম, শিবের প্রত্যঙ্গ-সম্ভূত দেহরস। এই জন্যই একে রস বলা হয়।[৮]

রস জীবন্মুক্তির সাধন—রসেশ্বরদর্শন-প্রোক্ত মোক্ষ জীবন্মুক্তি। এঁদের কাছে অন্য মুক্তি অনাদৃত। এঁরা মনে করেন ষড়্দর্শনে জীবন্মুক্তির কথা থাকলেও যে-মুক্তির কথা প্রধানতঃ বলা হয়েছে তা দেহত্যাগের পর লভ্য। এরূপ বিদেহমুক্তির প্রত্যক্ষ উপলব্ধি সম্ভব নয়। কাজেই মানুষের এরূপ মুক্তির প্রবৃত্তি নিঃসংশয় হয় না। কিন্তু জীবন্মুক্তি বিষয়ে কোনো সংশয় নাই। কেন না, এই মুক্তি প্রত্যক্ষ উপলব্ধ হয়। রস এই জীবন্মুক্তির সাধন।

১ ইচ্ছেতি সদ্গুরুপ্রাপ্তিপর্যবসায়িনী অনুগ্রহরূপা।—ত আ, চ আ, পৃঃ ৩৩

২ তয়া বদ্ধাহিবো অণূন্ স্বেচ্ছয়া মোচয়ত্যতঃ।—ঐ পৃঃ ৩২

৩ ঐ পৃঃ ৩০-৩১   ৪ স দ স ৯।১-৩

৫ রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।—তৈ উ ২।৭

৬ পারদো গদিতো যস্মাৎ পরার্থং সাধকোত্তমৈঃ।—রসার্ণবম্, দ্রঃ স দ স ৯।৭

৭ সংসারস্য পরং পারং দত্তেঽসৌ পারদঃ স্মৃতঃ।—দ্রঃ স দ স ৯।৫

৮ সুতোঽয়ং মৎসমো দেবি মম প্রত্যঙ্গসম্ভবঃ। মম দেহরসো যস্মাদ্রসস্তেনায়মুচ্যতে।—ঐ ৯।৮-৯

জীবন্মুক্তি কি—যিনি আত্মতত্ত্ব অবধারণ করেছেন, নিরতিশয় অভ্যাসের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞান দূর করেছেন এবং প্রারব্ধ কর্মের ফল ভোগ করছেন সেই রকম জীবিত ব্যক্তির যে-মুক্তি তাই জীবন্মুক্তি।[১]

বিদেহমুক্তি অযৌক্তিক— আলোচ্য দর্শনের মতে বিদেহমুক্তির বিচার ভ্রান্ত। এই দর্শনের অনুসরণকারীরা উক্ত মত খণ্ডন করেন এই ভাবে :—জিজ্ঞাসা করেন মুক্তি জ্ঞেয় বস্তু কি না। যদি উত্তরে বলা হয় জ্ঞেয় বস্তু; তা হলে তার জ্ঞাতা স্বীকার করতে হয় আর মুক্ত ব্যক্তির জ্ঞাতৃত্বও স্বীকার করতে হয়। জ্ঞাতৃত্ব জীবিত ব্যক্তিতেই সম্ভব এবং মুক্তির জ্ঞাতৃত্ব মুক্ত ব্যক্তিতেই সম্ভব। অতএব জীবিত ব্যক্তির মুক্তি অর্থাৎ জীবন্মুক্তিই যুক্তিযুক্ত।

আর যদি বলা হয় মুক্তি জ্ঞেয় বস্তু নয় তা হলে তা শশশৃঙ্গাদির মতো অসম্ভব হয়ে পড়ে। অতএব জীবন্মুক্তিই মুক্তি, বিদেহমুক্তি অযৌক্তিক।

জীবন্মুক্তি ও স্থিরদেহ— জীবন্মুক্তির জন্য প্রয়োজন দেহের। কিন্তু দেহ ত অনিত্য। দেহ, দৈহিক ভোগ, ধন এই সব অনিত্য জেনেই ত লোকে মুক্তির জন্য যত্ন করে। এঁরা বলেন খুব সত্য কথা। কিন্তু মুক্তি হয় জ্ঞানে। সেই জ্ঞান অভ্যাসসাপেক্ষ। আর স্থির দেহ না হলে জ্ঞানের অভ্যাস হয় না।[২]

রসেশ্বরদর্শননির্দিষ্ট সাধনা— সেইজন্যই রসেশ্বরদর্শনে মুক্তির জন্য স্থিরদেহ বা দিব্য-দেহের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। কিন্তু দিব্যদেহ লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ্য। কেন না, কেবলমাত্র দিব্যদেহ লাভ করলেই মুক্তি মিলে না। এই দর্শনের মতে শাস্ত্রনির্দিষ্ট উপায়ে দিব্যদেহ লাভ করার পরও যোগাভ্যাস করতে হয়। সেই যোগাভ্যাসের ফলে পরতত্ত্বের দর্শন হয় এবং তার ফলে মুক্তিলাভ হয়।

কাজেই আলোচ্য-দর্শননির্দিষ্ট সাধনা মুখ্যতঃ যোগসাধনা। রসহৃদয়ে আছে যথাশাস্ত্র যোগাভ্যাসের ফলে কোনো কোনো পুণ্যবান্ সাধকের ভ্রূমধ্যে চিন্ময় জ্যোতির স্ফুরণ হয়। সাধক এই চিন্ময় জ্যোতিতে মন নিবিষ্ট করলে অখিল জগৎকে চিন্ময় দর্শন করেন, তাঁর কর্মবন্ধন ছিন্ন হয়ে যায় এবং তিনি এই জীবনেই ব্রহ্মত্বলাভ করেন।[৩]

১ দ্রঃ স দ স ৯।২ ও বাসুদেব শাস্ত্রীকৃত টীকা।

২ ইতি ধনশরীরভোগান্মত্বানিত্যান্ সদৈব যতনীয়ম্।
মুক্তৌ সা চ জ্ঞানাত্তচ্চাভ্যাসাৎ স চ স্থিরে দেহে।
— গোবিন্দভগবৎপাদাচার্যকৃত-রসহৃদয়বচন, দ্রঃ স দ স ৯।১৮-১৯

৩ ভ্রূযুগমধ্যগতং যচ্ছিখিবিদ্যুৎসূর্যবজ্জগদ্ভাসি।
কেষাংচিৎপুণ্যদৃশামুন্মীলতি চিন্ময়ং জ্যোতিঃ।
পরমানন্দৈকরসং পরমং জ্যোতিঃ স্বভাবমবিকল্পম্।
বিগলিতসকলক্লেশং জ্ঞেয়ং শান্তং স্বসংবেদ্যম্।
তস্মিন্নাধায় মনঃ স্ফুরদখিলং চিন্ময়ং জগৎ পশ্যন্।
উৎসন্নকর্মবন্ধো ব্রহ্মত্বমিহৈব চাপ্নোতি।—রসহৃদয়বচন, দ্রঃ স দ স ৯।১২২-১২৭

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় এই রসসাধনা শাক্তদের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। শৈব ও শাক্ত রসসাধকদের দার্শনিক বিচার এক, শুধু উপাসনার বৈশিষ্ট্য অনুসারে এঁদের মধ্যে ভেদ দেখা যায়।

কাজেই রসেশ্বরদর্শনের অনুসরণকারী রসসাধকদের প্রধান লক্ষ্য দেহকে সুরক্ষিত করা। এঁরা বিশ্বাস করেন পারদ এবং রসায়নের দ্বারা দেহকে সুরক্ষিত করা যায়।[১]

ষট্‌কৌশিক দেহ—কিন্তু ষট্‌কৌশিক দেহ অর্থাৎ ত্বক্, অসৃক্, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা এই ছয়টি কোশের দ্বারা নির্মিত দেহ বিনশ্বর। কাজেই এই দেহ সুরক্ষিত হতে পারে না। সেইজন্য এঁরা বলেন সুরক্ষিত হয় হরগৌরীসৃষ্টিজাত দেহ; এই দেহই নিত্য, এইটিই দিব্যদেহ।

হরগৌরীসৃষ্টি বলতে বুঝায় পারদ ও অভ্রের সংযোগ। কেন না, অভ্রকে বলা হয় দেবীবীজ এবং পারদকে শিববীজ।[২]

দিব্যদেহ— পারদাভ্রকের দ্বারা ষট্‌কৌশিক দেহই দৃঢ় ও দিব্যদেহে পরিণত হয়। দিব্যদেহ লাভ করতে হলে ভৌতিক দেহ ত্যাগ করার প্রয়োজন হয় না। রসহৃদয়ে বলা হয়েছে—যে-সব রসসিদ্ধ শরীর ত্যাগ না করে পারদাভ্রকজনিত দিব্যদেহ প্রাপ্ত হয়েছেন তাঁরা মুক্ত এবং মন্ত্রগণ তাঁদের কিঙ্কর।[৩]

স্পষ্টই বোঝা যায় এঁদের মতে এমনি দিব্যদেহেই জীবন্মুক্তি-লাভ সম্ভবপর।

দিব্যদেহের প্রয়োজনীয়তা— সচ্চিদানন্দাত্মক পরতত্ত্বস্ফুরণেই ত মুক্তি লাভ হয়। যদি তাই হয় তা হলে আর দিব্যদেহ-লাভের প্রয়োজনীয়তা কোথায়?

উত্তরে রসেশ্বরদর্শন-অনুসরণকারীরা বলেন দিব্যদেহ না হলে সচ্চিদানন্দের স্ফুরণই হয় না। কেন না, সচ্চিদানন্দের স্ফুরণ হয় সমাধিতে। কিন্তু যে-দেহ জরাজর্জরিত রোগাক্রান্ত এবং সেইজন্য যার জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গতি প্রতিহত সে-দেহ সমাধিযোগ্য হতে পারে না।[৪] অতএব মুক্তিলাভের জন্য দিব্যদেহের প্রয়োজন।

১ তস্মাত্তং রক্ষয়েৎ পিণ্ডং রসৈশ্চৈব রসায়নৈঃ।—রসার্ণবচনম্, দ্রঃ স দ স ৯।১৫

২ অভ্রকস্তব বীজং তু মম বীজং তু পারদঃ।—দ্রঃ ঐ ৯।২৮

৩ যে চাত্যক্তশরীরা হরগৌরীসৃষ্টিজাং তনুং প্রাপ্তাঃ।
মুক্তাস্তে রসসিদ্ধা মন্ত্রগণঃ কিংকরো যেষাম্।—দ্রঃ ঐ ৯।২৩-২৪

৪ বজরয়া জর্জরিতং কাসশ্বাসাদিদুঃখবিশদং চ।
যোগ্যং তন্ন সমাধৌ প্রতিহতবুদ্ধীন্দ্রিয়প্রসরম্।—রসহৃদয়বচনম্, দ্রঃ ঐ ৯।৭৫-৭৬

নবম অধ্যায়

শক্তিরহস্য

শিব ও শক্তি—লক্ষ্য করা গেছে শৈবরা শিব ও শক্তিকে স্বরূপতঃ অভিন্ন মনে করেন। কিন্তু যেখানে উভয়ের ভেদ কল্পনা করেন সেখানে শক্তিকে শিবেরই রূপ মনে করেন।

শিব শক্তিরই রূপ—শিব ও শক্তি যে স্বরূপতঃ অভিন্ন এ সম্বন্ধে শাক্তরাও শৈবদের সঙ্গে একমত। কিন্তু উভয়ের ভেদকল্পনার ক্ষেত্রে এঁরা শিবকে শক্তিরই রূপ মনে করেন।

সেইজন্য শক্ত্যদ্বয়বাদী বলেন—মা, নিরুপধিজ্যোতিরূপা পরা শক্তি, তোমারই শিবসংজ্ঞা দেওয়া হয়। নিত্য তোমার উপাসনা করি।[১]

শক্তি ব্রহ্মস্বরূপিণী—শাক্তদের মতে শক্তি ব্রহ্মস্বরূপিণী। দেব্যুপনিষদে আছে—সব দেবতা দেবীর কাছে উপস্থিত হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন মহাদেবি! কে তুমি? দেবী বল্লেন আমি ব্রহ্মস্বরূপিণী। আমার থেকে প্রকৃতিপুরুষাত্মক জগৎ উৎপন্ন হয়েছে। আমি শূন্য ও অশূন্য, আনন্দ ও অনানন্দ, বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান।[২]

ব্রহ্মের থেকেই যে জগতের সৃষ্টি এবং তাঁর মধ্যেই স্থিতি ও লয় হয় এ কথার অন্য শ্রৌত এবং অপর প্রমাণও আছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে—যাঁর থেকে এই ভূতসমূহ জাত হয়, জাত ভূতসমূহ যাঁর দ্বারা জীবিত থাকে এবং বিনাশকালে যাঁতে বিলীন হয়, তাঁকে জানতে ইচ্ছুক হও, তিনিই ব্রহ্ম।[৩]

ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে আচার্য শঙ্করও লিখেছেন—যে সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি কারণ থেকে এই জগতের জন্মস্থিতিভঙ্গ অর্থাৎ সৃষ্টিস্থিতিলয় হয় তা ব্রহ্ম।[৪]

দুর্গাসপ্তশতীতে দেখা যায় ব্রহ্মা আদ্যাশক্তির স্তবে বলছেন—দেবি! তুমিই বিশ্ব ধারণ করে রয়েছ, তুমি এর সৃষ্টি, পালন এবং সংহার করছ।[৫]

১ যস্যা নিরুপধিজ্যোতীরূপায়াঃ শিবসংজ্ঞয়া।
ব্যপদেশঃ পরাং তাং ত্বামম্বাং নিত্যমুপাস্মহে।—ব্রঃ শি দৃ, পৃঃ ৯৪

২ সাব্রবীদহং ব্রহ্মস্বরূপিণী। মত্তঃ প্রকৃতিপুরুষাত্মকং জগচ্ছূন্যং চাশূন্যং চ
অহমানন্দানানন্দা বিজ্ঞানাবিজ্ঞানে অহম্।—দেব্যুপনিষৎ, মন্ত্র ১

৩ যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।
তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্ ব্রহ্মেতি।—তৈ উপ ৩।১

৪ অস্য জগতঃ…জন্মস্থিতিভঙ্গং যতঃ সর্বজ্ঞাৎ সর্বশক্তেঃ
কারণাদ্ভবতি তদ্ব্রহ্ম।—ব্র সূ (১।১।২), ভাষ্য।

৫ ত্বয়ৈতদ্ধার্যতে বিশ্বং ত্বয়ৈতৎসৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎপাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্বদা।—দু স ১।৫৬

দেবীভাগবতেও বলা হয়েছে—শক্তি স্বেচ্ছায় এই চরাচর অখিল জগতের সৃষ্টি, পালন এবং সংহার করেন।[১]

দেখা যাচ্ছে তৈত্তিরীয় উপনিষদাদিতে যে-ব্রহ্মলক্ষণ নির্দিষ্ট হয়েছে শাক্তশাস্ত্রে শক্তিরও সেই লক্ষণ নির্দিষ্ট হয়েছে। কাজেই শক্তি ব্রহ্মস্বরূপিণী।

শক্তিশব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ— শক্ ধাতুর উত্তর ক্তিন্ প্রত্যয় যোগে শক্তিশব্দ নিষ্পন্ন হয়। শক্ ধাতুর অর্থ হওয়া বা করার সামর্থ্য।[২] কাজেই শক্ ধাতু জ্ঞানসামর্থ্যবাচী অতএব জ্ঞানবাচীও বটে।[৩] হওয়া বা করার মূলে আছে ইচ্ছা। সেইজন্য শক্তি ইচ্ছা-জ্ঞানক্রিয়ারূপিণী।

"সংস্কৃত ভাষার ব্যুৎপাদন অনুসারে শক্তি শব্দের অর্থ বহুল ভাবগর্ভ। যদ্দ্বারা কোন কার্য সম্পন্ন হয়, অথবা যাহা কার্যরূপে পরিণত হইবার যোগ্য, যাহা কোন প্রকার পরিবর্তনের সাধক, যাহা যোগ্যতাবিশিষ্ট ধর্মী, বা যাহা কোন দ্রব্যের ধর্ম, অথবা যাহা কারণের আত্মভূত তাহাই শক্তি।"[৪]

আদ্যাশক্তি—কাজেই দেখা যাচ্ছে শক্তি বিভিন্ন। কিন্তু সবই এক আদ্যাশক্তির বিভিন্ন রূপ। এই আদ্যাশক্তিই মহাশক্তি। ইনি পরব্রহ্মস্বরূপিণী।

মহাকালসংহিতায় মহাশক্তিকে স্পষ্টই বলা হয়েছে—দেবি! তুমি অচিন্ত্যা, অমিতাকারা অর্থাৎ তোমার পরিমাপ করা যায় না, তুমি শক্তিস্বরূপিণী, প্রত্যেক ব্যক্ত বস্তুর তুমি অধিষ্ঠান-সত্তা অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্ত বস্তু তোমাতেই অধিষ্ঠিত। তুমি গুণাতীতা, দ্বন্দ্বাতীতা, অদ্বিতীয়া, পরব্রহ্মস্বরূপিণী।[৫]

শক্তিসঙ্গমতন্ত্রেও বলা হয়েছে— সর্বাদ্যা শক্তি আনন্দঘনরূপে অনুভূত হন। তিনি চিদানন্দলক্ষণ কেবল পরব্রহ্মই বটেন।[৬]

১ শক্তিঃ করোতি ব্রহ্মাণ্ডং সা বৈ পালয়তেঽখিলম্।
ইচ্ছয়া সংহরত্যেষা জগদেতচ্চরাচরম্।—দেবীভাগবতবচন, দ্রঃ কৌ র, পৃঃ ১৯১

২ শক্‌ল্‌, শক্তৌ।—সিদ্ধান্তকৌমুদী, বেঙ্কটেশ্বর প্রেস, ১৮৩৩ শকাব্দ, পৃঃ ৩৩৯

৩ শক বিভাষিতো মর্ষণে।—মাধবীয়া ধাতুবৃত্তি, দিবাদি, ৭৯; বিদ্যাসু শিক্ষতে-'শিক্ষের্জিজ্ঞাসায়াম্' ইতি তঙ্।
বিদ্যাবিষয়ে জ্ঞানে শক্তো ভবিতুমিচ্ছতীত্যর্থঃ।—দ্রঃ মাধবীয়া ধাতুবৃত্তি, (শক্‌ল্‌, শক্তৌ) স্বাদি, ১৫

৪ বিশ্বকোষ, বিংশভাগ, পৃঃ ১২৬

৫ অচিন্ত্যামিতাকারশক্তিস্বরূপা প্রতিব্যক্ত্যধিষ্ঠানসত্ত্বৈকমূর্তিঃ।
গুণাতীতনির্দ্বন্দ্ববোধৈকগম্যা ত্বমেকা পরব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা।—দ্রঃ কর্পূরাদিস্তোত্রম্,
(T. T., Vol. IX), পৃঃ ১৫ পাদটীকা

৬ সর্বাদ্যা তু ভবেচ্ছক্তিরানন্দঘনগোচরা।
স্বরূপচিদানন্দা পরব্রহ্মৈব কেবলম্।—শ স ত, কা খ, ১।৯৯

আচার্য ভাস্কররায় সৌভাগ্যভাস্করে বলেছেন এই পরব্রহ্মস্বরূপিণী মহাশক্তি পরশিব থেকে অভিন্না, লোকাতীতা। ঘনীভূত ঘৃতের মতো রজস্তমসম্পর্কশূন্য-শুদ্ধসত্ত্বঘনীভূত তাঁর শরীর।[১]

এই আদ্যাশক্তিকে শ্রীকুলের উপাসকেরা বলেন ত্রিপুরা বা ত্রিপুরসুন্দরী বা শ্রীবিদ্যা। বামকেশ্বর তন্ত্রে আছে—ত্রিপুরা পরমা শক্তি। তিনি জ্ঞান-জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-রূপ জগতের আদ্যা। তিনি স্থূল ও সূক্ষ্ম ত্রৈলোক্যের উৎপত্তিকারিণী মাতৃকা।[২]

কালীকুলের উপাসকদের মতে পরব্রহ্মস্বরূপিণী আদ্যাশক্তি কালী। নির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে—আদ্যা শক্তি মহাকালী দেবতাদের স্রষ্টিকারিণী।[৩]

শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে আছে আদ্যা নির্গুণা কালী। তিনি বাক্যের অতীতা, পরাৎপরা।[৪]

কর্পূরাদিস্তোত্রে কালীকে বলা হয়েছে হরি, হর, বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবতাদের আরাধ্যা আদ্যা।[৫] কালী শুদ্ধসত্ত্বগুণাত্মক-ঘনীভূততেজোময়ী।[৬]

নির্গুণা ও সগুণা—ব্রহ্ম যেমন সগুণ এবং নির্গুণ, শক্তিও তেমনি সগুণা এবং নির্গুণা। নিরুত্তরতন্ত্রে বলা হয়েছে—শিবশক্তি দ্বিবিধা—নির্গুণা এবং সগুণা। নির্গুণা জ্যোতির্ময়ী পরব্রহ্মসনাতনী।[৭]

দেবীভাগবতে আছে—শক্তি সর্বগতা, তাঁকেই ব্রহ্ম বলা হয়। মনীষীরা সগুণা নির্গুণা দ্বিবিধা শক্তির কথা বলেন। সগুণা শক্তি সংসারে অনুরক্ত সাধকদের পূজ্যা এবং নির্গুণা শক্তি সংসারবিরাগী সাধকদের পূজ্যা। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ প্রদানের ব্যাপারে সেই নিরাকুলা শক্তিই কর্ত্রী। এই চতুর্বর্গের মধ্যে যে যা কামনা করে, যথাবিধি তাঁর অর্চনা করলে, তিনি তাকে তাই দেন।[৮]

১ ল স, পৃঃ ৪

২ ত্রিপুরা পরমা শক্তিরাদ্যা জ্ঞানাদিতঃ প্রিয়ে।
স্থূলসূক্ষ্মবিভেদেন ত্রৈলোক্যোৎপত্তিমাতৃকা।—বা নি ৪।৪

৩ আদ্যাশক্তি মহাকালী দেবনির্মাণকারিণী।—নি ত, ১০ম পটল।

৪ আদ্যা শ্রীনির্গুণা কালী বাচ্যাতীতা পরাৎপরা।—শ স ত, কা খ, ১।১০৪

৫ সমারাধ্যামাদ্যাং হরিহরবিরিঞ্চাদিবিবুধৈঃ।—কর্পূরাদিস্তোত্রম্, শ্লোক ১৩

৬ দ্রঃ কর্পূরাদিস্তোত্রের প্রথম শ্লোকের বিমলানন্দ স্বামীকৃত স্বরূপব্যাখ্যা।

৭ শিবশক্তির্দ্বিধা দেবি! নির্গুণা সগুণাপি চ। নির্গুণা জ্যোতিষাং পুঞ্জঃ পরব্রহ্ম সনাতনী।—নিরু ত, পঃ ২

৮ এবং সর্বগতা শক্তিঃ সা ব্রহ্মেতি বিবিচ্যতে। সগুণা নির্গুণা চেতি দ্বিবিধোক্তা মনীষিভিঃ।
সগুণা রাগিভিঃ পূজ্যা নির্গুণা তু বিরাগিভিঃ। ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং স্বামিনী সা নিরাকুলা।
দদাতি বাঞ্ছিতানর্থানর্চিতা বিধিপূর্বকম্।—ত্রিপুরামহোপনিষদের সপ্তম মন্ত্রের
ভাস্কররায়কৃত টীকায় উদ্ধৃত দেবীভাগবতবচন। দ্রঃ দে ভা ১।৮।৪০-৪১

দেবীভাগবতে নির্গুণা শক্তিকে সংসারবিরাগী সাধকদের পূজ্যা বলা হয়েছে। কিন্তু সাধারণতঃ শাস্ত্রের অভিমত নির্গুণের পূজা-উপাসনা হয় না।[১] তা হলে এই শাস্ত্রবচনের অর্থ কি? এখানে পূজ্যা অর্থ জ্ঞেয়া, ভাবনীয়া। দেবীভাগবতেই আছে নির্গুণা শক্তি দুরধিগম্যা, তেমনি দুরধিগম্য নির্গুণ শিব। এই শিবশক্তি শুধু জ্ঞানগম্য এবং ভাবনীয়।[২]

আলোচ্য গ্রন্থ অনুসারে শক্তির নির্গুণরূপ মায়ামুক্ত এবং সগুণরূপ মায়াযুক্ত।[৩]

মায়া শক্তি—এই মায়াও শক্তি। আদ্যা শক্তির দুই ভাগ। এক ভাগ সচ্চিদানন্দ, অপর ভাগ মায়াপ্রকৃতি। মায়া শক্তি আর দেবী মহামায়া শক্তিমতী ঈশ্বরী। চন্দ্রিকা যেমন চন্দ্রের থেকে ভিন্ন নয় তেমনি মায়াও দেবী থেকে ভিন্ন নয়।[৪]

আদ্যাশক্তির এই "শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ অংশকেই সর্বশাস্ত্র আত্মা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।"[৫] কারণ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মলক্ষণ। আত্মা ব্রহ্ম।[৬]

ব্রহ্ম স্ত্রীপুরুষাদি-লিঙ্গবর্জিত—ব্রহ্মকে বলা হয়েছে 'অকায়ম্'[৭] অর্থাৎ অশরীরী। যিনি অশরীরী তাঁকে স্ত্রীপুরুষাদি কিছুই বলা যায় না। জীবভূত ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপনিষদ্ বলছেন—ইনি স্ত্রী নন, পুরুষ নন, নপুংসকও নন।[৮] জীবভূত ব্রহ্ম আর পরব্রহ্মে স্বরূপতঃ কোনো ভেদ নেই। কাজেই ব্রহ্ম স্ত্রী, পুরুষ, নপুংসক কিছুই নন।

সেইজন্য শক্তি সম্বন্ধেও বলা হয়েছে—ইনি স্বরূপতঃ স্ত্রীও নন, পুরুষও নন ক্লীবও নন।[৯]

ব্রহ্মকে স্ত্রীরূপিণী কল্পনা করা হয় কেন?—শক্তি তা হলে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের দ্বারা নির্দিষ্টা হন কেন? তাঁকে স্ত্রী কল্পনা করা হয় কেন? উত্তরে তন্ত্রশাস্ত্রে বলা হয়েছে "তথাপি কল্পবল্লীবৎ স্ত্রীশব্দেন যুজ্যতে"।[১০] অর্থাৎ যদিও তিনি স্ত্রী পুরুষ নপুংসক কোন রূপেই বদ্ধ নন "তথাপি কল্পলতা যেমন স্ত্রীত্ববাচক নামেই ব্যবহৃত, তিনিও তদ্রূপ স্ত্রী (শক্তি) শব্দেই কীর্তিতা। অর্থাৎ কল্পলতার নিকটে লতার ফল, বৃক্ষের ফল

১ দ্রঃ কৌ র, পৃঃ ১৯২-১৯৩

২ নির্গুণা দুর্গমা শক্তির্নির্গুণশ্চ তথা পুমান্। জ্ঞানগম্যৌ মুনীনাঞ্চ ভাবনীয়ৌ তথা পুনঃ।—দে ভ ৩।৭।১০

৩ নির্গুণং মায়য়া হীনং সগুণং মায়য়া যুতম্।—দে ভা ১২।৮।৭৫

৪ ভাগদ্বয়বতী যস্মাৎ সৃজামি সকলং জগৎ। তত্রৈকভাগঃ সম্প্রোক্তঃ সচ্চিদানন্দনামকঃ।
মায়াপ্রকৃতিসংজ্ঞস্তু দ্বিতীয়ো ভাগ ঈরিতঃ। সা চ মায়া পরাশক্তিঃ শক্তিমত্যহমীশ্বরী।
চন্দ্রস্য চন্দ্রিকেবেয়ং মমাভিন্নত্বমাগতা।—দে ভা, ১২।৮।৩৫-৩৬ ৫ ত ত, পৃঃ ৩১৯

৬ অয়মাত্মা ব্রহ্ম।—বৃহ উপ ২।৫।১৯, স বা অয়মাত্মা ব্রহ্ম।—বৃহ উপ ৪।৪।৫ ৭ ঈ উপ, ৮

৮ নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।—শ্বে উপ ৫।১০

৯ নেয়ং যোষিন্ন চ পুমান্ ন ষণ্ঢো ন জড়ঃ স্মৃতঃ।—নবরত্নেশ্বর-বচন, দ্রঃ ত ত, পৃঃ ৩৫৪

১০ দ্রঃ ত ত, পৃঃ ৩৫৪

যে যাহা প্রার্থনা করে সে তাহাই প্রাপ্ত হয়, তাহাতে লতা বা বৃক্ষের শক্তি অতিক্রম করিয়া দৈব শক্তিই প্রকাশ পায়। তথাপি কল্পলতা যেমন লতারূপিণী তদ্রূপ নিখিলমূর্তিস্বরূপা এবং নিখিল মূর্তির অতীতা হইলেও তিনি স্ত্রীরূপধারিণী।"[১]

শাক্তরা ব্রহ্মকে স্ত্রীরূপিণী ভাবেন তার কারণ তাঁরা মনে করেন জগতে ব্রহ্মের মাতৃরূপই পূর্ণপ্রকাশিত।[২] তা ছাড়া, তাঁদের মতে স্ত্রীবাচক শব্দ কল্পলতার মত সর্বফলপ্রদ। এই-জন্য তাঁরা স্ত্রীবাচক শব্দে ব্রহ্মের খ্যাপন করেন ও স্ত্রীমূর্তিতে তাঁর উপাসনা করেন।[৩]

পরশক্তি যেমন স্ত্রী, পুরুষ, নপুংসক কোনো লিঙ্গবাচ্যা নন তেমনি স্ত্রী, পুরুষ, নপুংসক যে-কোনো লিঙ্গবাচ্যা। রাঘবভট্ট লিখেছেন যদিও পরশক্তি লিঙ্গত্রয়বাচ্যা তথাপি অচলভক্তিভারে পরিশ্রান্ত ভক্তদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা কল্পলতার মত শীঘ্র পূর্ণ করেন বলে তিনি 'পরশক্তি' এই স্ত্রীলিঙ্গ শব্দবাচ্যা।[৪]

লক্ষণীয় ব্রহ্মবাচক শিব শব্দ পুংলিঙ্গ, শক্তিশব্দ স্ত্রীলিঙ্গ এবং ব্রহ্মশব্দ ক্লীবলিঙ্গ। কাজেই উক্ত তিন শব্দের বাচ্য পদার্থ অভিন্ন।

গন্ধর্বতন্ত্রে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে—শক্তি, মহেশ্বর এবং ব্রহ্ম এই তিন শব্দই তুল্যার্থবাচক। স্ত্রী, পুরুষ এবং নপুংসক এই যে ভেদ এ শুধু শব্দগত, পরমার্থতঃ এই তিনের বাচ্য পদার্থে কোনো ভেদ নেই।[৫]

এইজন্য পরব্রহ্মস্বরূপিণী শক্তি সম্বন্ধে তন্ত্রশাস্ত্রের বিধান—দেবীকে স্ত্রীরূপে বা পুরুষরূপে চিন্তা করবে অথবা তাঁর সচ্চিদানন্দলক্ষণ নিষ্কল রূপের ধ্যান করবে।[৬]

অরূপা রূপধারিণী—ব্রহ্ম অরূপ। ব্রহ্মময়ী শক্তিও অরূপা। তবে তাঁর আবার স্ত্রীরূপ পুংরূপাদি কেমন করে হবে?

উত্তরে বলা হয় পরব্রহ্ম মহাশক্তি স্বরূপতঃ অরূপাই বটেন। তবে স্বীয় মায়াশক্তিকে অবলম্বন করে বহুরূপে প্রতিভাত হন।[৭] কাজেই তিনি যেমন অরূপা তেমনি অনন্তরূপিণী। অরূপা সাধকের হিতের জন্যই রূপ ধারণ করেন।[৮]

১ ত ত, পৃঃ ৩৫৮ ২ T. T. Vol. IX. p. 13 ৩ কৌ র, পৃঃ ২০১

৪ যদ্যপি লিঙ্গত্রয়বাচ্যা তথাপি তূর্ণমেবাচলভক্তিভারপরিশ্রান্তজনসমস্তাকাঙ্ক্ষাকল্পবল্লী পরশক্তিশব্দবাচ্যা।—শা তি ১।৫২ শ্লোকের টীকা।

৫ শক্তির্মহেশ্বরো ব্রহ্মত্রয়স্তুল্যার্থবাচকাঃ।
স্ত্রীপুংনপুংসকো ভেদঃ শব্দতো ন পরার্থতঃ।—গ ত ৩৪। ৩৪-৩৫

৬ পুংরূপাং বা স্মরেদ্দেবীং স্ত্রীরূপাং বা বিচিন্তয়েৎ।
অথবা নিষ্কলং ধ্যায়েৎ সচ্চিদানন্দলক্ষণম্।—কুলার্ণবতন্ত্রবচন, ত্রিপুরামহোপনিষদের ৮ম মন্ত্রের ভাস্কররায়-কৃত টীকায় উদ্ধৃত।

৭ সাকারাপি নিরাকারা মায়য়া বহুরূপিণী।—মহা ত ৪।৩৪

৮ সাধকানাং হিতার্থায় অরূপা রূপধারিণী।—নবরত্নেশ্বরবচন, প্রাঃ ত ত, পৃঃ ৩৫৪

লীলামূর্তি—যাঁরা ভাগবতী লীলায় বিশ্বাসী তাঁরা মনে করেন ব্রহ্মময়ীর বিভিন্ন রূপ-ধারণ তাঁর লীলা। মহাভাগবতে আছে সেই অরূপা মহাদেবী লীলাচ্ছলে দেহধারণ অর্থাৎ রূপপরিগ্রহ করেন।[১]

তন্ত্রতত্ত্বের মতে লীলা তারই নাম যা স্বরূপতঃ সত্য না হলেও আত্ম-আনন্দের উল্লাসে সত্যের ন্যায় অভিনীত হয়। অভিনেতা পুরুষ অভিনেতা হয়েও স্বরূপতঃ তাতে সম্বন্ধহীন, ভগবান্ বা ভগবতীও তদ্রূপ নানা আকারে লীলামূর্তি পরিগ্রহ করলেও তাতে সম্বন্ধহীন। নির্গুণ ক্লীবভাবে লীলামূর্তি অসম্ভব। তাই দ্বৈতপ্রপঞ্চের সৃষ্টিস্থিতিসংহারের এবং লীলামাধুর্য সর্ম্বনে সাধকের সাধনা-পূরণের জন্য সগুণরূপে তাঁর স্ত্রীপুরুষমূর্তি পরিগ্রহ।[২]

সব বস্তু শক্তিস্বরূপ—শাক্ত মতে সব বস্তুই শক্তিস্বরূপ। কোনো বস্তুর তদ্‌বস্তুত্ব তার ধর্ম। এই ধর্মই তার শক্তি, তার স্বরূপ। যেমন একটি ঘটের কথা ধরা যাক। ঘটের যে-গুণ বা ধর্ম থাকলে তাকে আমরা ঘট বলে চিনতে পারি, যা না থাকলে আর তাকে ঘট বলা যেতে পারে না, তার নাম ঘটত্ব, এই ঘটত্বরূপ ধর্মই ঘটের শক্তি। এমনি বিষ্ণুত্বই বিষ্ণুর শক্তি, এই বিষ্ণুত্ব বা বিষ্ণুর শক্তি না থাকলে আর তাঁকে বিষ্ণু বলা যেতে পারে না। ব্রহ্মের শক্তি সম্বন্ধেও এই কথা।[৩]

ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব তাঁর স্বভাবধর্ম, তাই তাঁর শক্তি। কাজেই শক্তিই ব্রহ্মের স্বরূপ। প্রসঙ্গ-ক্রমে বলা যায় ব্রহ্মের ধর্ম দ্বিবিধ—স্বভাব ধর্ম আর ঔপাধিক ধর্ম। স্বভাব ধর্ম ব্রহ্মের শক্তি আর ঔপাধিক ধর্ম তাঁর গুণ।[৪]

শাক্তরা বলেন সূর্য স্বরূপতঃ তেজঃপদার্থ হলেও লোককে বুঝাবার জন্য যেমন 'সূর্য তেজস্বী এবং সূর্যের তেজ' বলা হয়, তেমনি আত্মপদার্থ (ব্রহ্ম) স্বয়ং শক্তিরূপ হলেও লোকের যাতে বুঝতে সুবিধা হয় সেইজন্য শাস্ত্র 'আত্মা শক্তিমান্ এবং আত্মার শক্তি' বলে বুঝিয়েছেন এই মাত্র।[৫]

শাস্ত্রে আত্মার বা ব্রহ্মের শক্তির বহুল উল্লেখ আছে। শাক্তদের মতে এ-সব আত্মার স্বরূপকথন মাত্র।[৬]

সব দেবতা শক্তির রূপ—শাক্তরা মনে করেন সব দেবতা শক্তিরই রূপ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি তাঁরই পুংরূপ। বামকেশ্বরতন্ত্রে বলা হয়েছে ত্রিপুরাদেবী ব্রহ্মাবিষ্ণু-

১ অরূপা সা মহাদেবী লীলয়া দেহধারিণী।—মহাভাগবত ২।৪৪, শ্রঃ ত ত, পৃঃ ২৩৯

২ ঐ পৃঃ ৩২০ ৩ কৌ র, পৃঃ ২৩০, পাদটীকা

৪ শক্তিসম্বন্ধী সাহিত্য, ক শ অ, পৃঃ ৩২০ ৫ ত ত, পৃঃ ৩৫১ ৬ ঐ পৃঃ ৩১৩-৩১৪

মহেশ্বররূপিণী।[১] ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর উপলক্ষণ। মোটকথা স্ত্রীদেবতাই হোন আর পুরুষ-দেবতাই হোন, সবাই শক্তিরই রূপ।[২]

কথাটাকে অন্যভাবে বলা যায় "নাম ও গুণের সহিত পরব্রহ্মের যে রূপ কল্পিত হয়, তাহার নামই শক্তি।"[৩]

তাই, শাক্তমতচন্দ্রিকায় বলা হয়েছে—ব্রহ্মা শক্তি, শিব শক্তি, বিষ্ণু শক্তি, বাসব শক্তি, অন্য যে বহু দেবতা আছেন তাঁদের সবার মূল শক্তি। শক্তি বিনা এঁদের 'আত্ম-অস্তিত্ব'-রক্ষারও সামর্থ্য নাই। কাজেই, মহামতি, শক্তিকেই তাঁদের সকলের চেয়ে প্রধান বলে জানবে।[৪]

শিবাগমে বলা হয়েছে—শক্তি শিব, শিব শক্তি, শক্তি ব্রহ্মা, শক্তি জনার্দন, শক্তি ইন্দ্র, শক্তি রবি, শক্তি চন্দ্র, গ্রহেরা শক্তি—এ সুনিশ্চিত। সমগ্র জগৎই শক্তিরূপ এ তত্ত্ব যে না জানে সে নারকী।[৫]

শাক্ত শাস্ত্রের অভিমত— কীট থেকে ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত সমস্ত জগৎ শক্তিময়। কাজেই শক্তির পূজার দ্বারাই ব্রহ্মাণ্ড পূজিত হয়।[৬]

জগৎ শক্তিময়—জগৎ শক্তিময় এ কথার অর্থ জগতে যা কিছু আছে সবই শক্তির রূপ। বিষয়টি দেবীভাগবতে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে। হিমালয়কে দেবী বলছেন—এই সমস্ত জগৎ আমাতেই ওতপ্রোত রয়েছে। আমি ঈশ্বর, আমি সূত্রাত্মা বা হিরণ্যগর্ভ। আমি বিরাট্। আমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, গৌরী, ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী। আমি সূর্য, তারা, চন্দ্র। আমি পশুপক্ষিস্বরূপা। আমি চণ্ডাল। তস্কর আমি। ক্রূরকর্মা ব্যাধ, সৎকর্মা মহাজন আমি। আমিই স্ত্রী, পুরুষ এবং নপুংসকরূপা সন্দেহ নাই। যা কিছু বস্তু দেখা যায় বা শোনা যায় সে-সবের অন্তরে এবং বাইরে সর্বদা আমিই ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছি। চরাচর এমন কোনো বস্তু নেই যার মধ্যে আমি নেই।[৭]

১ ত্রিপুরা ত্রিবিধা দেবি ব্রহ্মবিষ্ণ্বীশরূপিণী।—বা নি, পৃঃ ১০৯ ২ ত ত, পৃঃ ৩২৭ ৩ কৌ র, পৃঃ ১৯০

৪ শক্তির্ব্রহ্মা শিবঃ শক্তিঃ শক্তির্বিষ্ণুস্ত বাসবঃ। অন্যে চ বহবো দেবাঃ শক্তিমূলাঃ প্রকীর্তিতাঃ।
শক্তিং বিনা যতো দেবাঃসামর্থ্যং প্রকীর্তিতম্। অতস্তেভ্যঃ প্রধানং হি শক্তিং বিদ্ধি মহামতে।
—শাক্তমতচন্দ্রিকাবচন, দ্রঃ ত ত, পৃঃ ৩৪০

৫ শক্তিঃ শিবঃ শিবঃ শক্তিঃ শক্তির্ব্রহ্মা জনার্দনঃ। শক্তিরিন্দ্রো রবিঃ শক্তিঃ শক্তিশ্চন্দ্রো গ্রহা ধ্রুবম্।
শক্তিরূপং জগৎ সর্বং যো ন জানাতি স নারকী।—দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৬১৯

৬ কীটাৎ ব্রহ্মাণ্ডপর্যন্তং সর্বশক্তিময়ং জগৎ। শক্তিসংপূজনাদেবি ব্রহ্মাণ্ডং পূজিতং ভবেৎ।
—শ ম ত, দ্বি খ, ১।২০১

৭ ময়ি সর্বমিদং প্রোতমোতঞ্চ ধরণীধর। ঈশ্বরোঽহঞ্চ সূত্রাত্মা বিরাডাত্মাহমস্মি চ।
ব্রহ্মাহং বিষ্ণুরুদ্রৌ চ গৌরী ব্রাহ্মী চ বৈষ্ণবী। সূর্যোঽহং তারকাশ্চাহং তারকেশস্তথাস্ম্যহম্।

গন্ধর্বতন্ত্রেও দেখা যায় দেবী শিবকে বলছেন—তুমি আমিই, অন্য কেউ নয়, ব্রহ্মা আমি, বিষ্ণুও আমি। আমিই সমস্ত জগৎ, আমি ছাড়া আর কিছু নেই। বৎস, ব্রহ্মা থেকে কীট পর্যন্ত জগতে যা কিছু দেখছ সে-সবই আমি এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।[১]

এই বিচারে কাম, ক্রোধ প্রভৃতি যা বর্জনীয় বলে গণ্য তাও দেবীর রূপ। বরাহপুরাণে আছে—কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্য, পৈশুন্য এবং অসূয়া এই আটটি অষ্ট মাতৃকা। কাম যোগেশ্বরী, ক্রোধ মাহেশ্বরী, লোভ বৈষ্ণবী, মদ ব্রহ্মাণী, মোহ স্বয়ম্ভূ কল্যাণী, মাৎসর্য ইন্দ্রজা, পৈশুন্য যমদণ্ডধরা আর অসূয়া বরাহাখ্যা দেবী।[২]

শিবশক্ত্যাত্মক সৃষ্টি—শাক্ত শাস্ত্রে বলা হয়েছে জগৎ শক্তিময়। শাক্তরা মনে করেন সৃষ্টির জন্য মহাশক্তি আপনাকে স্ত্রী ও পুরুষরূপে দ্বিধা বিভক্ত করেন। মহাভাগবতের অন্তর্গত ভগবতীগীতায় দেবী বলছেন— পিতঃ নগশ্রেষ্ঠ! সৃষ্টির জন্য আমিই স্বেচ্ছাক্রমে নিজরূপ স্ত্রীপুরুষভেদে দ্বিধা বিভক্ত করেছি। শিব প্রধান পুরুষ এবং শিবা পরমা শক্তি। মহারাজ! তত্ত্বদর্শী যোগীরা আমাকে শিবশক্ত্যাত্মক পরাৎপর ব্রহ্মতত্ত্ব বলেন।[৩]

কাজেই জগৎ শক্তিময় অর্থ শিবশক্তিময়। কথাটা গন্ধর্বতন্ত্রে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে—চেতনাচেতন জগৎকে শিবশক্তিময় জানবে।[৪]

পশুপক্ষিস্বরূপাহং চাণ্ডালোঽহঞ্চ তস্করঃ। ব্যাধোঽহং ক্রূরকর্মাহং সৎকর্মাহং মহাজনঃ।
স্ত্রীপুংনপুংসকাকারোঽপ্যহমেব ন সংশয়ঃ। যচ্চ কিঞ্চিৎ কচিদ্ বস্তু দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা।
অন্তর্বহিশ্চ তৎ সর্বং ব্যাপ্যাহং সর্বদা স্থিতা। ন তদস্তি ময়া ত্যক্তং বস্তু কিঞ্চিচ্চরাচরম্।

—দে ভা ৭।৩৩।১২-১৭

১ ত্বমেবাহং ন চান্যোঽসি ব্রহ্মাহং বিষ্ণুরপ্যহম্।
অহমেব জগৎ সর্বং নাস্তি কিঞ্চিৎ ময়া বিনা।
যত্ত্ পশ্যসি হে বৎস যৎ কিঞ্চিজ্জগতীতলে
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্তমহমেব ন সংশয়ঃ।—গ ত ৩৮।৪৪-৪৫

২ কামঃ ক্রোধস্তথা লোভো মদো মোহশ্চ পঞ্চমঃ। মাৎসর্যং ষষ্ঠমিত্যাহুঃ পৈশুন্যং সপ্তমং তথা।
অসূয়া ত্বষ্টমী জ্ঞেয়া ইত্যেতা অষ্টমাতরঃ। কামং যোগেশ্বরীং বিদ্ধি ক্রোধং মাহেশ্বরীং তথা।
লোভস্তু বৈষ্ণবী প্রোক্তা ব্রহ্মাণী মদ এব চ। মোহঃ স্বয়ম্ভূঃ কল্যাণী মাৎসর্যং চেন্দ্রজাং বিদুঃ।
যমদণ্ডধরা দেবী পৈশুন্যং স্বয়মেব চ। অসূয়া চ বরাহাখ্যা ইত্যেতাঃ পরিকীর্তিতাঃ।

—বরাহপুরাণবচন, দ্রঃ শ স, শো ১৪৬, সৌ ভা

৩ সৃষ্ট্যর্থমাত্মনোরূপং ময়ৈব স্বেচ্ছয়া পিতঃ। কৃতং দ্বিধা নগশ্রেষ্ঠ! স্ত্রীপুমানিতি ভেদতঃ।
শিবঃ প্রধানঃ পুরুষঃ শক্তিশ্চ পরমা শিবা। শিবশক্ত্যাত্মকং ব্রহ্ম যোগিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।
বদন্তি মাং মহারাজ তত্ত্বমেব পরাৎপরম্।—দ্রঃ ত ত, পৃঃ ১৫৭

৪ শিবশক্তিময়ং বিদ্ধি চেতনাচেতনং জগৎ।—গ ত ৩৬।২৯

বস্তুমাত্রই যে শিবশক্ত্যাত্মক এ কথা বামকেশ্বরতন্ত্রেও বলা হয়েছে—যে যে পদার্থের যে যে শক্তি সেই সেই শক্তি দেবী সর্বেশ্বরী আর সেই সেই পদার্থ মহেশ্বর।[১]

বামকেশ্বরতন্ত্রের এই বচনের ব্যাখ্যায় আচার্য ভাস্কররায় লিখেছেন বস্তুমাত্রেই স্ব স্ব প্রয়োজন সাধনের উপযুক্ত সামর্থ্য আছে। এই সামর্থ্যই শক্তি। এই শক্তিই বিমর্শশক্তি বা আত্মাশক্তির বিভূতি। শক্তি শক্তিমান্‌কে পরিত্যাগ করে থাকতে পারেন না। অতএব, শক্তির আধার শিব প্রত্যেক বস্তুতেই প্রকাশরূপে অবস্থান করছেন। বস্তুতঃ প্রত্যেক বস্তুর ধর্ম বা গুণ বিমর্শশক্তির এবং বস্তুর স্বরূপ প্রকাশরূপ-শিবের বিভূতি। অতএব, প্রত্যেক বস্তুতেই আছে শিবশক্তির অধিষ্ঠান।[২]

জীবগত শিবশক্তির অস্তিত্ব সবাই অনুভব করতে পারে। "আমার ইহা করিবার শক্তি আছে অথবা শক্তি নাই এই কথা সকলেই বলিয়া থাকে, ইহাতেই জীবগত শক্তির অনুভূতি হয়। চৈতন্যই শিব, জীবে চৈতন্যের অস্তিত্বও সকলের অনুভবযোগ্য।"[৩]

শিবশক্তি অভিন্ন—শিবশক্তি যে অভিন্ন এ রকম বচন তন্ত্রশাস্ত্রে ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত হিসাবে দুয়েকটি বচনের উল্লেখ করা গেল। গন্ধর্বতন্ত্রে বলা হয়েছে যিনি শক্তি তিনিই শিব। এঁদের মধ্যে কোনো ভেদ নেই। শিবছাড়া শক্তি নেই, শক্তি ছাড়া শিব নেই।[৪]

শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে শিব বলছেন—দেবীই আমি পুরুষরূপে, স্ত্রীরূপে আমিই দেবী। আমাদের মধ্যে ভেদ নেই। যে-ভেদ কল্পিত হয় তা অজ্ঞানের জন্য হয়।[৫]

পরশুরামকল্পসূত্রে[৬] দেবীকে সংবিন্ময়ী এবং পরমশিবভট্টারকের স্বাত্মাভিন্না বলা হয়েছে। এর তাৎপর্য লক্ষ্য করা যাক। "শক্তি সংবিন্ময়ী, সংবিৎশব্দের অর্থ নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্য, ইহারই অপর নাম প্রকাশ। সংবিৎশব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, এইজন্য শক্তির বাচক; প্রকাশ শব্দ পুংলিঙ্গ, এইজন্য, শিবের বাচক। শক্তিমান্‌ ও শক্তি অভিন্ন অর্থাৎ শিব ও শিবা উভয়ই প্রকাশস্বরূপ অতএব কোনো ভেদ নাই।"[৭]

১ যস্য যস্য পদার্থস্য যা যা শক্তিরুদীরিতা।
সা তু সর্বেশ্বরী দেবী স চ সর্বো মহেশ্বরঃ।—বা নি ৭।৩১ ২ দ্রঃ কৌ র পৃঃ ১৯

৩ কৌ র, পৃঃ ১২৪, পাদটীকা; প ক সূ, পৃঃ ২১৮

৪ নানয়োর্বিদ্যতে ভেদো যা শক্তিঃ স শিবো ধ্রুবম্।
ন শিবেন বিনা শক্তির্ন শক্তিরহিতঃ শিবঃ।—গ ত ৪০।৪-৫

৫ সৈবাহং পুংস্বরূপেণ স্ত্রীরূপেণাহমেব হি।
আবাভ্যাং নহি ভেদোঽস্তি ভেদস্ত্বজ্ঞানসম্ভবম্।—শ স ত, সু খ ৩।৮৫-৮৬

৬ ভগবান্‌ পরমশিবভট্টারক…সংবিন্ময্যা ভগবত্যা ভৈরব্যা স্বাত্মাভিন্নয়া পৃষ্টঃ…।—প ক সূ ১।২

৭ কৌ র, পৃঃ ১২১

অর্ধনারীশ্বর মূর্তি—একই অদ্বয়বস্তু যে শিবশক্তিরূপে কল্পিত এই তত্ত্বটি সাধকশিল্পীর ধ্যানে এক অপূর্ব মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। অর্ধনারীশ্বর মূর্তি। মূর্তির অর্ধেক শিব, অর্ধেক শক্তি ; অর্ধেক পুরুষ, অর্ধেক নারী। কি তত্ত্বের বিচারে কি রসের বিচারে এ মূর্তি অতুলনীয়। পরম তত্ত্ব পুংস্তত্ত্ব ও স্ত্রীতত্ত্বের সম্মিলিত অখণ্ড তত্ত্ব। একাকী পুংস্তত্ত্ব বা স্ত্রীতত্ত্ব কোনোটিই সম্পূর্ণ নয়। রসের বিচারে পুরুষ ও স্ত্রীর একাত্মতায় প্রেমের পরিপূর্ণতা, তাই পরম আনন্দ।

এক দুইরূপ অবলম্বন করে অবস্থান করেন। এই দুইরূপ নিত্য-অবিযুক্ত। অর্থাৎ শিবশক্তির নিত্যসামরস্য,[১] নিত্য অবিনাভাবসম্বন্ধ।[২]

শিবশক্তির নিত্যসামরস্যের তত্ত্বটি তন্ত্রশাস্ত্রে বড় সুন্দর করে প্রকাশ করা হয়েছে। তন্ত্র বলেন "মহাকালী এবং মহাকাল চনকাকারে অবস্থিত। চনকের যেমন উপরিভাগে আবরণ এবং অভ্যন্তরে সমভাগে বিভক্ত পরস্পরাশ্লিষ্ট দ্বিদল, পরব্রহ্মতত্ত্বও তদ্রূপ বহির্ভাগে মায়ার আবরণে আবৃত এবং অভ্যন্তরে শিবশক্তিরূপে সমভাগে উভয়ে পরস্পর সংশ্লিষ্ট।"[৩]

যুগলমূর্তি—যেখানে শিব ও শক্তির পৃথক্ রূপ কল্পিত সেখানেও যে উভয়ে নিত্য-অবিযুক্ত এই তত্ত্বটির শিল্পরূপ লক্ষ্য করা যায় শিবশক্তির যুগলমূর্তিতে। শিব-উরুতে সুখাসীনা উমা, শিবকণ্ঠবিলগ্না উমা এমনি ধরণের অনেক প্রাচীন যুগলমূর্তি পাওয়া গেছে।[৪]

শিবশক্তিতত্ত্ব বৌদ্ধমতে— শিবশক্তির তত্ত্ব একদা ভারতের ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। সেইজন্য দেখা যায় এটি মূলতঃ বৈষ্ণব এবং মহাযানী বৌদ্ধদের মধ্যেও স্বীকৃত। বৌদ্ধদের উপায় ও প্রজ্ঞা, আদিবুদ্ধ ও আদিপ্রজ্ঞা, করুণা ও শূন্যতা শিবশক্তিরই বৌদ্ধরূপ বলা যায়। বৌদ্ধতন্ত্রে কোথাও কোথাও উপায় ও প্রজ্ঞাকে শিবশক্তি বলেই বর্ণনা করা হয়েছে।[৫]

সনাতনধর্মী শাস্ত্রে যেমন বলা হয়েছে সব পুরুষ শঙ্কর আর সব স্ত্রীলোক মহেশ্বরী,[৬] তেমনি বৌদ্ধতন্ত্রমতেও সব নর এবং নারী উপায় ও প্রজ্ঞার রূপ।[৭]

তবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন শিবশক্তির ধারণার সঙ্গে উপায় প্রজ্ঞার ধারণার

১ আচার্য ভাস্কর রায় সৌভাগ্যভাস্করে (ল স, পৃঃ ১৩১) সামরস্য শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন—সমোঽন্যূনানধিকো রসো যয়োস্তয়োঃ শিবশক্ত্যোর্ভাবঃ সামরস্যম্—সম অর্থাৎ কিনা অন্যূন অনধিক রস যাঁদের সেই শিবশক্তির ভাব সামরস্য। সহজ কথায় "শিবশক্তির পরস্পর অত্যন্ত সংশ্লিষ্ট এবং সমপ্রধানরূপে মেলনের নাম সামরস্য।"—কৌ র, পৃঃ ৪৫, পাদটীকা।

২ অবিরহঃ শিবয়োঃ স্বভাবঃ।—মাতৃকাচক্রবিবেকবচন, দ্রঃ ক শ অ, পৃঃ ৩৪৭

৩ মহাকালী মহাকালশ্চনকাকাররূপতঃ মায়য়াচ্ছাদিতাবনাং তন্মধ্যে সমভাগতঃ।—দ্রঃ ত ত, পৃঃ ১০৮

৪ বা ই, পৃঃ ৬৬৪ ৫ I. T. B., pp. 111, 112 n 1

৬ শ্রুত্বা বাক্যং শিবস্তাপি হসিত্বোবাচ তারিণী। তদ্রূপাঃ পুরুষাঃ সর্বে মদ্রূপাঃ সকলাঃ স্ত্রিয়ঃ।—তা র, পৃঃ ১

৭ I. T. B., p. 118,

একটি বৈলক্ষণ্যও আছে। তন্ত্রে সাধারণতঃ শিব নিষ্ক্রিয় এবং শক্তি সক্রিয় বলে বর্ণিত হন কিন্তু বৌদ্ধরা উপায়কে সক্রিয় এবং প্রজ্ঞাকে নিষ্ক্রিয় বলেন।[১]

তবে শিবশক্তির মতো উপায় ও প্রজ্ঞাও নিত্য অবিযুক্ত। তাঁদের যুগনদ্ধমূর্তি।[২]

শিবশক্তিতত্ত্ব বৈষ্ণবমতে— বৈষ্ণবের বিষ্ণুলক্ষ্মীর আর শৈব-শাক্তের শিবশক্তির ভাবচিন্তা একই রকম। বৈষ্ণব পুরাণাদিতে এর বহু নিদর্শন আছে। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। লক্ষ্য করা গেছে শৈবশাক্ত-শাস্ত্র অনুসারে সব পুরুষ শিব আর সব স্ত্রীলোক মহেশ্বরী। ঠিক এই কথাটাই ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে। যথা— দেবতা, তির্যক, মনুষ্য প্রভৃতির মধ্যে যারা পুরুষ তারা ভগবান্ হরি আর যারা স্ত্রী তাদের লক্ষ্মী বলে জানবে। এই উভয়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ নেই।[৩]

কিন্তু এহ বাহ্য। সারকথা শিবশক্তির মতো লক্ষ্মী ও বিষ্ণুরও অবিনাভাবসম্বন্ধ। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে বলা হয়েছে—পরমাত্মা শ্রীহরি, তাঁর শক্তি শ্রী। শ্রীদেবী প্রকৃতি, কেশব পুরুষ। বিষ্ণু ছাড়া শ্রী নাই, শ্রী ছাড়া হরি নাই।[৪]

শিবশক্তির মতো বিষ্ণু ও লক্ষ্মীও স্বরূপতঃ অভিন্ন। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী ভগবৎসন্দর্ভে বলেছেন—একই স্বরূপ শক্তিত্ব ও শক্তিমত্ত্ব এই দুইরূপে বিরাজমান। শক্তিমত্ত্বপ্রাধান্যে বিরাজমান হলে ইনি ভগবান্ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন আর শক্তিত্বপ্রাধান্যে বিরাজমান হলে লক্ষ্মী সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন।[৫]

লক্ষ্মী ও বিষ্ণু স্বরূপতঃ রাধা ও কৃষ্ণ। উভয়ের অবিনাভাবসম্বন্ধ। সচ্চিদানন্দ ভগবান্ কৃষ্ণের অন্যতমা স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী শক্তি। ইনিই রাধা।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় ভগবানের স্বরূপশক্তি পরাশক্তি ত্রিবিধা—হ্লাদিনী, সন্ধিনী এবং সম্বিৎ।[৬] ভগবানের সদংশের স্বরূপশক্তি সন্ধিনী—সত্তাকরী শক্তি; চিদংশের স্বরূপশক্তি সংবিৎ—জ্ঞানশক্তি এবং আনন্দাংশের স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী—আনন্দশক্তি।

১ Ibid., pp. 110-111

২ দেবদেবীর পরস্পর-আশ্লিষ্ট মূর্তিকে বলা হয় যুগনদ্ধ মূর্তি; তিব্বতী ভাষায় বলা হয় য়বয়ুম (yab-yum) ভঙ্গীর মূর্তি। য়ব অর্থ উপায় এবং য়ুম অর্থ প্রজ্ঞা।

৩ দেবতির্যঙ্‌মনুষ্যাদৌ পুংনাম্নি ভগবান্ হরিঃ।
স্ত্রীনাম্নি লক্ষ্মীর্মৈত্রেয় নানয়োর্বিদ্যতে পরম্।—বি পু ১।৮।৩২

৪ পরমাত্মা হরির্দেবঃ তচ্ছক্তিঃ শ্রীরিহোদিতা। শ্রীদেবী প্রকৃতিঃ প্রোক্তা কেশবঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ।
ন বিষ্ণুনা বিনা দেবী ন হরিঃ পদ্মজাং বিনা।—হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রবচন, দ্রঃ ভগবৎসন্দর্ভ, ১১৯

৫ অথৈকমেব স্বরূপং শক্তিত্বেন শক্তিমত্ত্বেন চ বিরাজতীতি যস্য শক্তেঃ স্বরূপভূতত্বং নিরূপিতং তচ্ছক্তিমত্ত্বপ্রাধান্যেন বিরাজমানং ভগবৎসংজ্ঞামাপ্নোতি তচ্চ ব্যাখ্যাতং। তদেব চ শক্তিত্বপ্রাধান্যেন বিরাজমানং লক্ষ্মীসংজ্ঞামাপ্নোতীতি।—ভগবৎসন্দর্ভ, ১১৭

৬ হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেকা সর্বসংস্থিতৌ।—বি পু ১।১২।৬৯

কৃষ্ণ কখনও স্বরূপশক্তিবিযুক্ত হতে পারেন না এবং রাধাও কখনো কৃষ্ণবিযুক্ত হতে পারেন না ; হলে তাঁকে আর স্বরূপশক্তি বলা যায় না। সেইজন্য বলা হয় মাধব রাধার সঙ্গে অবিযুক্ত এবং রাধা মাধবের সঙ্গে অবিযুক্ত।[১]

তবে পরমার্থতঃ কৃষ্ণ আর তাঁর স্বরূপশক্তি অভিন্ন হলেও তাঁদের ভিন্নমূর্তি কল্পিত হয়, যেমন হয় শিবশক্তির ক্ষেত্রে। স্বরূপদামোদর তাঁর কড়চায় লিখেছেন— রাধা কৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তি, তাঁর প্রণয়বিকৃতি। রাধা কৃষ্ণ একাত্ম হলেও পুরাকালে পৃথিবীতে দেহভেদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অধুনা সেই উভয়ের ঐক্যপ্রাপ্ত রাধাভাবদ্যুতিসবলিত চৈতন্য নামক কৃষ্ণস্বরূপকে প্রণাম করি।[২]

ব্যবহারতঃ শিব ও শক্তির কিঞ্চিৎ ভেদ—শিবশক্তির কথায় ফিরে আসা যাক। শিবশক্তি স্বরূপতঃ অভিন্ন হলেও ব্যবহারতঃ তাঁদের মধ্যে কিঞ্চিৎ ভেদ স্বীকার করা হয়। আর তা হলে উভয়ের কার্যাদির ভেদ স্বীকারও করতে হয়। লক্ষ্য করা গেছে শাক্ত শাস্ত্রাদিতে জগৎকে শক্তিময় বলা হয়েছে। জগৎ কার্য। কারণ ছাড়া কার্য হয় না। অতএব জগতের কারণ অনুসন্ধান করতে হয়। এ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। শক্তিকারণতাবাদীরা অর্থাৎ শাক্তেরা বলেন জগতের কারণ শক্তি।

জগতের কারণ—কারণ প্রধানতঃ দ্বিবিধ—নিমিত্ত কারণ আর উপাদান কারণ। তন্ত্রতত্ত্বে বলা হয়েছে—"এই জগৎ-কার্যের প্রতি সেই মহাশক্তি নিজেই নিমিত্ত কারণ এবং নিজেই উপাদান কারণ, অর্থাৎ যখন সেই ইচ্ছাময়ী নিজ আনন্দময় সত্যসঙ্কল্পে ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির ইচ্ছা করিয়াছেন, তখনই তিনি নিমিত্ত কারণ, আবার যখন আত্মবিভূতিরূপিণী মায়ার বিস্তার করিয়া তাহা হইতে এই প্রপঞ্চ চরাচর বিরচিত করিয়াছেন তখনই তিনি উপাদান কারণ।"[৩]

শক্তিই জগদ্রূপে পরিণত হন এবং তিনিই প্রলয়কালে ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বাত্মক জগৎকে নিঃশেষে কবলীকৃত করে অব্যক্তরূপে অবস্থান করেন।[৪] তারপরে সূক্ষ্মরূপে অব্যক্ত অবস্থায় অবস্থিত বিশ্বকে তিনি স্থূলরূপে ব্যক্ত অবস্থায় প্রকটিত করেন।[৫]

১ রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা।—ইতি ঋক্ পরিশিষ্টোক্ত
—ব্রহ্মসংহিতার ৫ম শ্লোকের জীবগোস্বামীকৃত টীকায় উদ্ধৃত।

২ রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মাদেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্।
—চৈতন্যচরিতামৃত ১।১।৫

৩ ত ত, পৃঃ ২৯০   ৪ কবলীকৃতনিঃশেষতত্ত্বগ্রামস্বরূপিণী।—বা নি, (৩।৫) পৃঃ ১৩৪

৫ কৌ র, পৃঃ ১৯৬

শাক্তরা জগতের কারণরূপে পরশিবের কল্পনা অনাবশ্যক মনে করেন। বামকেশ্বরতন্ত্রে বলা হয়েছে[১] "সেই শক্তিই জগৎরূপে পরিণত হয়েন। এই অবস্থায় পরশিব নামক কোনো পদার্থের আকাঙ্ক্ষা থাকে না।"

সৃষ্টি চিদ্রূপ—এই শক্তি চিন্ময়ী পরমানন্দময়ী বিজ্ঞানঘনরূপিণী।[২] তাই সেতুবন্ধে[৩] বলা হয়েছে সৃষ্টি চিৎসমুদ্রের লহরীলীলা। সমুদ্রলহরী আর সমুদ্রে যেমন অত্যন্ত অভেদ তেমনি চিৎসমুদ্র (চিন্ময়ী শক্তি) এবং তার লহরীলীলা সৃষ্টিতেও অত্যন্ত অভেদ, ভাসমান ভেদটা কাল্পনিক।

কাজেই শাক্তমতে জগৎ প্রপঞ্চ চিদ্রূপ। যা চিৎশক্তির পরিণাম[৪] বা চিৎসমুদ্রের লহরী তা ত চিদ্রূপ হবেই।

সমস্তই চেতন—অতএব সবই স্বরূপতঃ চেতন ; অচেতন বা জড় বলে কিছু নেই।[৫] ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যাকে জড় বলা হয় সেও অনভিব্যক্ত চৈতন্য ছাড়া আর কিছুই নয়। চিদ্রূপিণী মহাশক্তি মায়াশক্তিরূপে আপনাকে যেখানে যতটা আবৃত করেন সেখানে তিনি ততটাই অনভিব্যক্ত। ঔপনিষদিকেরাও পরচিন্নিষ্ঠ চিৎশক্তি স্বীকার করেন। তান্ত্রিকরা বলেন এই চিৎশক্তিই অনন্তরূপত্বের জন্য মায়া নামে আখ্যাত হন।[৬]

চিৎশক্তি ও জড়শক্তি—কাজেই বাহ্যতঃ যা চেতন তা যেমন শক্তিস্বরূপ, যা জড় তাও শক্তিস্বরূপ। এই জন্য শক্তিকে চিৎশক্তি ও জড়শক্তিরূপে কল্পনা করা হয়। ললিতাসহস্রনামে বলা হয়েছে চিৎশক্তি চেতনরূপা আর জড়শক্তি জড়াত্মিকা।[৭] এর ব্যাখ্যায় আচার্য ভাস্কররায় লিখেছেন[৮] চিৎশক্তিই সর্বভূতে চৈতন্যরূপে বিরাজ করছেন। জড়শক্তি মায়ার পরিণামবিশেষ। মায়া চিৎশক্তি কাজেই জড়শক্তি চিৎশক্তিরই এক বিশেষ পরিণাম। দৃশ্যমাত্র জড়। এই জড় যে-মায়ার রূপ তাকে বলা হয় জড়াত্মিকা।[৯]

১ তস্যাং পরিণতায়ান্তু ন কশ্চিৎ পর ইষ্যতে।—বা নি ৪।৫

২ চিন্ময়ী পরমানন্দা বিজ্ঞানঘনরূপিণী।—ল স, ১১২

৩ সৃষ্টেস্তরঙ্গস্থানীয়ত্বোক্ত্যা চিৎতোয়ধেস্তস্যাশ্চাত্যন্তাভেদো ভাসমানো ভেদস্তু কল্পিত ইতি সূচিতম্।—বা নি, পৃঃ ১৯০

৪ তৎপরিণাম এব প্রপঞ্চঃ। অত এব চ চিদ্রূপঃ। চিদ্বিলাসঃ প্রপঞ্চোঽয়মিতি জ্ঞানবাসিষ্ঠাৎ।—বা নি, পৃঃ ১৩৫

৫ দ্রঃ ব্রহ্মসূত্র, ২।১।৪, শক্তিভাষ্য।

৬ পরচিন্নিষ্ঠা যা চিচ্ছক্তিরৌপনিষদানামপি সংমতা সৈবানন্তরূপত্বান্মায়েত্যুচ্যতে।—বা নি ৩।৪, সে ব।

৭ চিচ্ছক্তিশ্চেতনরূপা জড়শক্তির্জড়াত্মিকা।—ল স, ১৫১,

৮ ল স, সৌ ভা পৃঃ ১০৮-১০৯

৯ জড়ং দৃশ্যমাত্রমায়া স্বরূপং যস্যা মায়ায়াঃ সা জড়াত্মিকা।—ল স, পৃঃ ১০৯

কাজেই বলা যায় শক্তি চিজ্জড়াত্মিকা। আত্মাশক্তি মহামায়া চিদ্রূপিণী। আর সব শক্তি তাঁরই রূপভেদমাত্র। এই মহাশক্তি বিশ্বাত্মিকা এবং বিশ্বোত্তীর্ণা।[১] চিদ্বল্লীতে বলা হয়েছে—তিনিই শিবাদিক্ষিত্যন্ত-ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বময়সর্বপ্রপঞ্চাত্মিকা এবং তদুত্তীর্ণা।[২]

শিবের কল্পনা অনাবশ্যক—শক্তিসূত্রে বলা হয়েছে— বিশ্বসিদ্ধির হেতুভূতা চিতি অর্থাৎ চিৎশক্তি স্বতন্ত্রা।[৩] যিনি স্বতন্ত্র, তিনি অনন্যমুখাপেক্ষী, অনন্যনির্ভর। এইজন্যই শক্তিকারণতাবাদীদের মতে পরশিবের কল্পনা না করলেও কার্যের অনুপপত্তি হয় না। যদি বলা হয় শক্তি ধর্ম। কাজেই ধর্মী পরশিবের কল্পনা না করলে ধর্মের অনুপপত্তি হয়। এর উত্তরে এঁরা বলেন "এক শক্তিরই ধর্ম ও ধর্মী এই উভয়াত্মকত্ব কল্পনা করিলে ধর্মিরূপ পরশিবের কল্পনা না করিলেও শক্তির ধর্মত্বের অনুপপত্তি হয় না।"[৪]

শক্তিকারণতাবাদীরা যে শুধু সৃষ্টির ব্যাপারে পরশিবের কল্পনা অনাবশ্যক মনে করেন তা নয়, কর্মফলদান, মোক্ষদান ইত্যাদি ব্যাপারেও পরশিবের অনাবশ্যকতা প্রতিপন্ন করেন।

বামকেশ্বরতন্ত্রে আছে—পরশিব শক্তিরহিত হলে কোনো কিছুই করতে পারেন না, শক্তিযুক্ত হলেই কিছু করতে পারেন।[৫]

এই সম্পর্কে সৌন্দর্যলহরীর প্রখ্যাত প্রথম শ্লোকটি স্মরণীয়—শিব যদি শক্তিযুক্ত হন তা হলেই প্রপঞ্চ সৃষ্টি করতে পারেন আর তা না হলে স্পন্দিতও হতে পারেন না।[৬]

শক্তিহীন শিব শব—এইজন্য শক্তিবিযুক্ত শিবকে জড় বলা হয়।[৭] তাঁকে শবও বলা হয়। যে কেউ শক্তিহীন হয় সে আর কিছু করতে পারে না।[৮] সে শবের মতো হয়ে যায়।[৯]

শক্তিবর্জিত হলে শিব যে শব হয়ে যান শাক্ত পণ্ডিতেরা শিবশব্দের থেকেই তা প্রতিপন্ন

১ শক্তিসাধনা, ক শ ভ, পৃঃ ৪৭

২ সৈব শিবাদিক্ষিত্যন্তষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বময়সর্বপ্রপঞ্চাত্মিকা তদুত্তীর্ণা চেতি।—কা বি, পৃঃ ৯

৩ চিতিঃ স্বতন্ত্রা বিশ্বসিদ্ধিহেতুঃ।—দ্রঃ বা বি, পৃঃ ১৩৬

৪ নৈবং শক্তিকারণতাবাদিনামস্মাকং পরশিবস্যাকল্পনে কার্যত্বানুপপত্তেরপরিকল্পোঽস্তি।
ধর্মত্বানুপপত্তিরেকস্যৈব বস্তুনো ধর্মধর্ম্যুভয়াত্মকত্বকল্পনয়াঽপি সুপরিহরা।—বা বি, সে ব, পৃঃ ১৩৬

৫ পরো হি শক্তিরহিতঃ শক্তঃ কর্তুং ন কিঞ্চন।
শক্তস্তু পরমেশানি শক্ত্যা যুক্তো যদা ভবেৎ।—বা বি ৪।৬

৬ শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং
ন চেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি।—সৌ ল, ১

৭ শক্তিঃ সচেতনা প্রোক্তা জড়ঃ পরশিবো মতঃ।—শ স ত, তা খ, ৮।২৮

৮ শিবোঽপি শবতাং যাতি কুণ্ডলিন্যা বিবর্জিতঃ
শক্তিহীনো হি যঃ কশ্চিদসমর্থঃ স্মৃতো বুধৈঃ।—দ্রঃ বা বি, সে ব, পৃঃ ১৩৭

৯ শববচ্ছক্তিহীনস্তু প্রাণী ভবতি সর্বথা।—দেবীভাগবতবচনম্, দ্রঃ ল স, পৃঃ ১০৯

করেন। ক থেকে ক্ষ পর্যন্ত বর্ণসমূহকে বলা হয় শিব আর অকারাদি ষোড়শ স্বরবর্ণকে শক্তি। শিবশব্দে ই-কার থাকায় অর্থাৎ শিব শক্তিযুক্ত থাকায় তিনি ঈশ্বর। ই-কার সরিয়ে নিলেই শিবশব্দ শবশব্দে পরিণত হয় অর্থাৎ শক্তিবর্জিত হলেই শিব শব হয়ে যান।[১]

শক্তিহীন অকর্মণ্য—শক্তিহীন হলে শুধু যে শিব শব হয়ে যান তা নয়, ব্রহ্মাদি দেবগণও শিবের মতো জড়, শব হয়ে যান। তন্ত্রের অভিমত সৃষ্টি প্রভৃতি কার্যও ব্রহ্মাদি দেবগণ করেন না, করেন ব্রহ্মাণী প্রভৃতি শক্তি। কুব্জিকাতন্ত্রে বলা হয়েছে—ব্রহ্মা কখনও সৃষ্টি করেন না, করেন ব্রহ্মাণী। অতএব মহেশানি! ব্রহ্মা প্রেত সন্দেহ নাই। বিষ্ণু কখনও রক্ষা করেন না, করেন বৈষ্ণবী। অতএব মহেশানি! বিষ্ণু প্রেত সংশয় নেই। রুদ্র কখনও গ্রাস করেন না, করেন রুদ্রাণী। অতএব মহেশানি! রুদ্র প্রেত সংশয় নাই। শক্তিহীন ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশাদিকে কার্যে অক্ষম জড় বলা হয়। দেবি! শক্তিবিহীন হলে সবাই নিশ্চয়ই কার্যে অক্ষম হয়।[২]

শক্তিই যে সব কার্যের কারণ তা প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারাই জানা যায়।[৩] যে-মানুষ কিছুই করতে পারে না লোকে সেই অধমকে শক্তিহীন বলে, বিষ্ণুহীন বা রুদ্রহীন বলে না।[৪] কাজেই সিদ্ধান্ত হয় সব কার্যের শক্তিই কারণ। এইজন্যই শক্তিকারণতাবাদীরা পরশিবাদি অন্য কারণ অনাবশ্যক মনে করেন।

শক্তিবর্জিত শিব কর্তৃত্বহীন—এঁরা বলেন পরশিবের কর্তৃত্ব নির্ভর করে শক্তির উপর। কারণ "স্বতন্ত্রঃ কর্তা" এই পাণিনি-সূত্রানুসারে স্বাতন্ত্র্যই কর্তৃত্ব। এই স্বাতন্ত্র্য শক্তিগত।[৫] অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্যশক্তিই কর্তৃত্ব। সহজ কথায় বলা যায় স্বাতন্ত্র্যশক্তিবর্জিত পরশিবের কর্তৃত্ব থাকে না।

ত্রিক-দর্শনের আলোচনার সময় লক্ষ্য করা গেছে স্বাতন্ত্র্যশক্তিই বিমর্শশক্তি। বিমর্শশক্তি

১ দ্রঃ আনন্দলহরীর (সৌন্দর্যলহরী) ১ম শ্লোকের অচ্যুতানন্দকৃত টীকা।

২ ব্রহ্মাণী কুরুতে সৃষ্টিং ন তু ব্রহ্মা কদাচন। অতএব মহেশানি ব্রহ্মা প্রেতো ন সংশয়ঃ।
বৈষ্ণবী কুরুতে রক্ষাং ন তু বিষ্ণুঃ কদাচন। অতএব মহেশানি বিষ্ণুঃ প্রেতো ন সংশয়ঃ।
রুদ্রাণী কুরুতে গ্রাসং ন তু রুদ্রঃ কদাচন। অতএব মহেশানি রুদ্রঃ প্রেতো ন সংশয়ঃ।
—কুব্জিকাতন্ত্রবচন, দ্রঃ শা তো, ৭ স্, পৃঃ ৮

৩ সৈব কারণং কার্যেষু প্রত্যক্ষেণাবগম্যতে।—দে ভা ১।৮।৩১

৪ রুদ্রহীনং বিষ্ণুহীনং ন বদন্তি জনাঃ কিল।
শক্তিহীনং যথা সর্বে প্রবদন্তি নরাধমম্।—ঐ ৩।৬।১৯

৫ কিং চ স্বাতন্ত্র্যং হি কর্তৃত্বম্। 'স্বতন্ত্রঃ কর্তে'তি পাণিনিসূত্রাৎ। তচ্চ শক্তিগতমেব।—শ স্, পৃঃ ৭৬

আর চিৎশক্তি এক।[১] যিনি চিৎশক্তিহীন তিনি জড়, শব। তাঁর কর্তৃত্ব থাকতে পারে না।

শক্তিবিরহিত শিবের যে কর্তৃত্ব থাকতে পারে না এই বিষয়টি অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করা হয়। কোনো কাজ করতে হলে সেই কাজের চিকীর্ষা, কাজের উপাদান সম্বন্ধে অপরোক্ষ জ্ঞান এবং কাজের কৃতিমত্ত্ব এই তিনটি বস্তু থাকা চাই। এই তিনটির উপর কর্তৃত্ব নির্ভর করে। কিন্তু এই তিনটি ইচ্ছা, জ্ঞান এবং ক্রিয়া এই শক্তিত্রয়ঘটিত ব্যাপার। পরশিব এই শক্তিত্রয়যুক্ত হলেই কার্যক্ষম হন।[২] অর্থাৎ কেবলমাত্র তখনই তাঁর কর্তৃত্ব থাকে।

মোক্ষ দেন শক্তি—শক্তিকারণতাবাদীরা বলেন শিবের কর্তৃত্ব যখন শক্তির উপর নির্ভরশীল তখন শিব মুক্তিও দিতে পারেন না। মুক্তি দেন শক্তি। এঁদের যুক্তি এই—"মোচকত্ব একটি ধর্ম বা শক্তি, সেই শক্তি ভিন্ন শিব মোচক হইতে পারেন না। অতএব শক্তির মোচনকর্তৃত্ব স্বীকার করাই যুক্তিসঙ্গত।"[৩]

শৈবরাও প্রকারান্তরে শক্তির মোচনকর্তৃত্ব স্বীকার করেন। তত্ত্বপ্রকাশে আছে—"যে শক্তির দ্বারা সেই শম্ভু পশুগণের ভুক্তি ও মুক্তি বিষয়ে শক্ত অর্থাৎ সমর্থ, সেই চিদ্রূপা আদ্যা শক্তিকে আমি সর্বাত্মভাবে প্রণাম করি।"[৪]

পরশিব নির্গুণ এবং সগুণ। গুণই ধর্ম বা শক্তি।[৫] প্রলয়কালে 'কবলীকৃতনিঃশেষ-তত্ত্বগ্রামস্বরূপিণী' পরশিবে বিলীন থাকেন। এই অবস্থায় শক্তির কোনো কার্য থাকে না বলে শক্তি অনুভূত হন না। সেইজন্য মনে হয় পরশিব শক্তিবিবর্জিত। বস্তুতঃ শিব কখনো শক্তিবিবর্জিত হন না। যে-পরশিবকে শক্তিবিবর্জিত মনে হয় তিনিই নির্গুণ শিব।[৬]

এই শক্তিবিবর্জিত পরশিব সম্বন্ধে বামকেশ্বরতন্ত্রে বলা হয়েছে "শক্তিরহিত সূক্ষ্ম অর্থাৎ দুর্জ্ঞেয় শিবে নাম (অর্থাৎ বাচকশব্দ) এবং ধাম (প্রকাশ, অর্থাৎ বাচকশব্দজন্য জ্ঞান)

১ "বিমর্শশক্তির অপর নাম চিৎ, চৈতন্য, সংবিৎ, স্বরসোদিতা পরা বাক্, স্বাতন্ত্র্য, পরমাত্মার ঐশ্বর্য, মুখ্য কর্তৃত্ব, স্ফুরত্তা, সার, স্পন্দ ইত্যাদি।"—কৌ র, পৃঃ ১২৪

২ উপাদানগোচরাপরোক্ষচিকীর্ষাকৃতিমত্ত্বস্যৈব কর্তৃত্বরূপতয়া তস্যেচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াত্মক-শক্তিত্রয়ঘটিতত্বাৎ তাদৃশশক্তিসহিতস্যৈবকার্যক্ষমো ভবতি।—বা নি, পৃঃ ১৩৬

৩ মোচকত্বশক্তিমন্তরেণ শিবস্য তদযোগেন মোচনকর্তৃতায়া অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং শক্তাবেব স্বীকর্তুং যুক্তত্বাৎ।—স স, পৃঃ ৯০

৪ শক্তো যয়া স শম্ভুর্ভুক্তৌ মুক্তৌ চ পশুগণস্যাস্য।
তামেকাং চিদ্রূপামাদ্যাং সর্বাত্মনাস্মি নতঃ।—তত্ত্বপ্রকাশ ১।৩

৫ কৌ র, পৃঃ ১১১   ৬ দ্রঃ ঐ, পৃঃ ১২৩-২৪

থাকিতে পারে না। শক্তিরহিত শিব যথাকথঞ্চিৎরূপে জ্ঞাত হইলেও তাঁহার দ্বারা শর্ম (সুখ অর্থাৎ মুক্তি) এবং কর্ম (কর্মফল প্রাপ্তি) সম্ভব হয় না। শক্তিরহিত শিব-বিষয়ে ধ্যানাষ্টক অর্থাৎ সমাধিসময়ে তাঁহাতে রতি অর্থাৎ মনের আনন্দ এবং মনঃস্থিতি অর্থাৎ মনের স্থিরতা হইতে পারে না।"[১]

আরাধনায় নির্গুণ শিবের অনুপযোগিতা ও শক্তির উপযোগিতা—নির্গুণের উপাসনা হয় না এ বিষয়ে পূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে। বামকেশ্বরতন্ত্রের আলোচ্য শ্লোকটির সেতুবন্ধানুযায়ী ব্যাখ্যায় নানাতন্ত্রনিষ্ণাত পণ্ডিত সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় বিষয়টি বিশদভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাঁর মতে[২]—একটি শব্দ উচ্চারণ করলে সেই শব্দে যে-বস্তুকে বুঝায় তার নাম বাচ্য এবং বাচ্য বস্তুর বোধক শব্দের নাম বাচক। বাচক শব্দই 'নাম' বলে আখ্যাত হয়। বস্তুর কোনো একটি গুণের উল্লেখ করেই বাচকশব্দরূপ নামের প্রবৃত্তি হয়ে থাকে। গুণই ধর্ম বা শক্তি। যেমন ঐশ্বর্যরূপ গুণ আছে বলে সগুণ ব্রহ্মে ঈশ্বরশব্দের প্রবৃত্তি হয়। আবার বাচক শব্দে বাচকত্বধর্ম এবং বাচ্য বস্তুতে বাচ্যত্বধর্ম আছে, এই ধর্মও শক্তি। শক্তিহীন শিবে কোনো গুণ বা ধর্ম নাই। কাজেই তাঁতে বাচক শব্দ বা নামের প্রবৃত্তি হতে পারে না। উপাসনায় নামকীর্তন, স্তুতিপাঠ, মন্ত্রপাঠ, প্রার্থনা প্রভৃতি করতে হয়। এই-সবই উপাসনা, এই-সব ছেড়ে উপাসনা হতে পারে না। শক্তিহীন শিবে গুণ বা ধর্ম নাই বলে তাঁতে এই-সবের প্রয়োগ অসম্ভব, কাজেই তাঁর উপাসনাও অসম্ভব। কোনো গুণ বা ধর্মকে নিমিত্ত করেই প্রবৃত্তি হয়, শক্তিহীন শিবে প্রবৃত্তিনিমিত্ত গুণ বা ধর্ম নাই বলে তিনি দুর্জ্ঞেয়, এই জন্য তাঁকে সূক্ষ্ম বলা হয়েছে। ধর্ম ও ধর্মী এই উভয়াত্মিকা শক্তি স্বীকার করলে তাতে নাম কীর্তনাদি প্রযুক্ত হতে পারে বলে তাঁর উপাসনা অসম্ভব নয়, পরন্তু সুকর।

লক্ষ্য করা গেছে শক্তিকারণতাবাদীদের মতে শক্তিহীন পরশিবের ধ্যানও সম্ভব নয়। আর সম্ভব হলেও তাতে নির্বিকল্প সমাধি হয় না। তাঁদের যুক্তি এই—পরশিব শুভাশুভ ধর্মহীন বলে অসুন্দর, সৌন্দর্য একটি ধর্ম, তার অভাব বলেও তিনি অসুন্দর। অসুন্দর পরশিবে মনের রতি হতে পারে না বলে তাঁর ধ্যান সম্ভব নয়। এই অবস্থায় জোর করে মনকে ধ্যানে প্রবর্তিত করলেও সে-ধ্যানে মন কিছুক্ষণ স্থায়ী হতে পারে, দীর্ঘকাল

১ শক্ত্যা বিনা শিবে সূক্ষ্মে নাম ধাম ন বিদ্যতে।
জ্ঞাতেনাপি মহাদেবি শর্ম কর্ম ন কিঞ্চন।
ধ্যানাষ্টককালে তু ন রতির্ন মনঃস্থিতিঃ।—বা সি. (৩।৭) পৃঃ ১৩৭

২ সৌ ল, পৃঃ ১৩৩

পারে না, ধ্যানাবচ্ছিন্নরূপ স্থৈর্য্য অর্থাৎ নির্বিকল্প সমাধিও এ রকম ধ্যানের ফলে সম্ভবপর নয়।[১]

কিন্তু শক্তি ধর্ম এবং ধর্মী এই উভয়াত্মক বলে তাঁতে নাম, ধাম, শর্ম, কর্ম, রতি, স্থিতি সবই সম্ভব।[২]

মোটকথা এঁরা বলতে চান 'শক্তিই উপাস্যা, পরশিব উপাস্য নহেন।'[৩] অবশ্য পরশিবকে এঁরা অস্বীকার করেন না।

নির্গুণা শক্তি—বামকেশ্বরতন্ত্রে আছে সূক্ষ্মাকারস্বরূপিণী শক্তি বীজাকার অর্থাৎ সূক্ষ্ম এবং অঙ্কুরাকার অর্থাৎ স্থূল ষট্‌ত্রিংশত্তত্বাত্মক জগৎ নিঃশেষে কবলীকৃত করে পরমার্গে অর্থাৎ পরশিবের ব্যাপ্তিস্থানের মধ্যে প্রবেশ করে অবস্থান করেন।[৪]

বামকেশ্বরতন্ত্রের এই শ্লোকের সেতুবন্ধানুযায়ী ব্যাখ্যায় সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় বলেছেন[৫] পরশিবের মার্গ অর্থাৎ ব্যাপ্তিস্থানই পরমার্গ। পরশিব ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী তাঁর ব্যাপ্তির বাইরে ব্রহ্মাণ্ডের একটি ধূলিকণাও থাকতে পারে না। শক্তি এমনি পরমার্গের অন্তঃ অর্থাৎ মধ্যে প্রবেশ করে অবস্থিতি করেন। যেখানে যেখানে পরশিব শক্তিও সেখানে। শক্তি ও শিবের অবিনাভাবসম্বন্ধ। কাজেই শিব যেখানে শক্তিও সেখানে অবশ্যই থাকবেন। শক্তিহীন শিব নিষ্ক্রিয় শূন্যাকার, তাঁর থাকা না থাকা সমান। শক্তি এমনি শূন্যাকার শিবের মধ্যে প্রবেশ করে তাঁর শূন্যাবস্থা দূর করে তাঁর উচ্ছূনতা সম্পাদন করেন এবং তাঁকে বিদ্ধ করেই যেন অবস্থিতি করেন। বীজে বৃক্ষ সূক্ষ্মাকারে থাকে, বৃক্ষের এমনি বীজনিহিত সূক্ষ্মাবস্থার নাম বীজাবস্থা, পরে স্থূলাকারে পরিণতির নাম অঙ্কুরাবস্থা। শিবতত্ত্ব থেকে পৃথ্বীতত্ত্ব পর্যন্ত ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বাত্মক বিশ্বেরও এই দুটি অবস্থা। প্রলয়কালে স্থূল জগৎ সূক্ষ্ম জগতে এবং সূক্ষ্ম জগৎ শক্তিতে লীন হয়। স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ তখন নিঃশেষরূপেই শক্তির কুক্ষিগত হয়। শক্তি এমনি করে বিশ্বকে কবলীকৃত করে পরশিবে লীন হন। এই সময়ে শক্তির আকার ও স্বরূপ সূক্ষ্ম অবস্থায় থাকে। অবয়ব-সংস্থানের নাম আকার আর বস্তুর ধর্ম অর্থাৎ যা না থাকলে তাকে সেই বস্তু বলে চিনতে পারা যায় না, তাই সেই বস্তুর স্বরূপ।

---

১ শুভাশুভধর্মহীনত্বাচ্ছূন্যত্বেন তত্র মনসো হ্রস্তেরযোগায় ধ্যানং সম্ভবতি। বলাৎকারাদিনা তত্র মনসঃ প্রবর্তনেঽপি কতিপয়ক্ষণস্থায়িত্বমেব তায় চিরকালস্থিতিত্বেন ন ধ্যানত্বাবচ্ছিন্নরূপং স্থৈর্যং নির্বিকল্প-সমাধ্যপরপর্যায়ং স্যাৎ।—বা নি, সে ব, পৃঃ ১৬৮

২ শক্তেস্তু ধর্মধর্ম্যুভয়াত্মকত্বেন নাম ধাম শর্ম কর্ম রতিঃ স্থিতিশ্চেতি সর্বমপ্যুপপন্নতে ইত্যর্থাদুক্তং ভবতি।—ঐ

৩ কৌ র, পৃঃ ২০০

৪ প্রবিশ্য পরমার্গান্তঃ সূক্ষ্মাকারস্বরূপিণী। কবলীকৃতনিঃশেষবীজাঙ্কুরতয়া স্থিতা।—বা নি ৪।৮

৫ কৌ র, পৃঃ ২০১

যেমন—বৃক্ষের কাণ্ড, শাখা, পত্র, পুষ্প, ফল প্রভৃতির অবস্থানের দ্বারা বৃক্ষের যে-অবস্থা তাহা বৃক্ষের আকার এবং বৃক্ষত্ব বৃক্ষের স্বরূপ।

প্রলয়কালে শক্তি নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ব্রহ্মকোটিতে অবস্থান করেন। এই অবস্থাতেই তিনি নির্গুণা ব্রহ্মস্বরূপিণী।

শক্তির স্ফুরণ—সৃষ্টির উন্মুখসময়ে শক্তির স্ফুরণ হয় এবং এই স্ফুরিত শক্তি থেকে যথাক্রমে সূক্ষ্ম ও স্থূল জগতের বিকাশ হয়। এমনি করে জগতের বিকাশের সঙ্গে শক্তিরও নানা বিভূতি-মূর্তির আবির্ভাব হয়।[১]

কিভাবে শক্তির প্রথম স্ফুরণ হয় সে সম্বন্ধে আচার্য ভাস্কররায় লিখেছেন শক্তিতে লীন জীবের কর্ম যখন পরিপক্ক হয় তখন সেই কর্মফল প্রদানের জন্য পরশিবের সিসৃক্ষাত্মিকা মায়াবৃত্তি উৎপন্ন হয়। পরশিবের ইচ্ছারূপা মায়াবৃত্তি বা মায়াশক্তিই শক্তির প্রথম স্ফুরণ। মায়ার এই অবস্থা ঈক্ষণ, কাম, তপঃ বিচিকীর্ষাদি শব্দের দ্বারা বর্ণিত হয়।[২]

শ্রৌত সমর্থন—এই মত যে শ্রুতিসম্মত ভাস্কররায় উপনিষৎ থেকে মন্ত্র[৩] উদ্ধার করে তা প্রতিপন্ন করেছেন। ঐতরেয়-উপনিষদে আছে[৪]—সৃষ্টির পূর্বে নামরূপ ও কর্মভেদে বিভিন্ন এই জগৎ অদ্বিতীয় আত্মস্বরূপই ছিল। নিমেষাদি ক্রিয়াশীল কিছুই ছিল না। সেই আত্মা ঈক্ষণ করলেন, আমি লোকসমূহ সৃজন করব।[৫]

তৈত্তিরীয়-উপনিষদেও বলা হয়েছে সেই পরমাত্মা কামনা করলেন আমি বহু হব, আমি উৎপন্ন হব।[৬]

বিমর্শশক্তি—'স ঈক্ষত', 'বহু স্যাং প্রজায়েয়' ইত্যাদি শ্রুতিতে সৃষ্টির প্রাক্কালে পরব্রহ্মের যে প্রথম স্ফুরণ উক্ত হয়েছে তাই বিমর্শ। বলা হয়েছে প্রকাশাত্মক পরব্রহ্মের স্বাভাবিকী স্ফুরত্তা তাঁর বিমর্শশক্তি। ইনিই চরাচর অখিল জগতের সৃষ্টি ও সংহার করেন।[৭]

ত্রিক-দর্শনের প্রসঙ্গে আমরা বিমর্শশক্তির আলোচনা করেছি। এ বিষয়ে শৈব এবং শাক্ত মত একই রকম। শিব প্রকাশ, শক্তি বিমর্শ। বিমর্শ প্রকাশেরই ধর্ম। শিবশক্তি

১ ঐ ২ ল স, পৃঃ ১০৪

৩ দ্রঃ ঐ উপ ১।১।১ ; তৈ উপ ২।৬, মু উপ ১।১।৮ ; ছা উপ ৬।২।৩

৪ আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ। স ঈক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি।—ঐ উপ ১।১।১

৫ উদ্বোধন কার্যালয়-প্রকাশিত উপনিষৎ-গ্রন্থাবলীর ব্যাখ্যা অনুসৃত হয়েছে।

৬ সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি।—তৈ উপ ২।৬

৭ প্রকাশাকাত্মকস্য পরব্রহ্মণঃ স্বাভাবিকঃ স্ফুরণং বিমর্শ ইত্যুচ্যতে। তদুক্তং সৌভাগ্যহৃদয়ে—

স্বাভাবিকী স্ফুরত্তা বিমর্শরূপাস্য বিদ্যতে শক্তিঃ।

সৈব চরাচরমখিলং জনয়তি জগদেতদপি চ সংহরতে।—কৌ ব্র, পৃঃ ১৮-১৯, পাদটীকা

স্বরূপতঃ অভিন্ন; উভয়ের ভেদ কল্পনামাত্র। কাজেই প্রকাশ ও বিমর্শের মধ্যে স্বরূপতঃ ভেদ নেই; ভেদটা কল্পিত। ধর্মধর্মিসম্বন্ধও কল্পিত। বস্তুতঃ যিনি ধর্ম তিনিই ধর্মী। অর্থাৎ স্বরূপতঃ প্রকাশ ও বিমর্শ অভিন্ন।

প্রকাশ ও বিমর্শকে যেখানে পৃথক্ ভাবা হয় সেখানেও উভয়ের অবিনাভাবসম্বন্ধ স্বীকার করা হয়। প্রকাশ ছাড়া বিমর্শ যেমন অসম্ভব তেমনি বিমর্শ ছাড়া প্রকাশের স্থিতিই সম্ভব নয়।[১]

লক্ষ্য করা গেছে বিমর্শশক্তিই স্বতন্ত্রা চিৎশক্তি, পরাশক্তি।

পরমপদ—মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় লিখেছেন[২]—"এই বিশ্বের মূলে যে পূর্ণ সত্তা পারমার্থিকরূপে বর্তমান তাই শক্তির পরম রূপ। বিশুদ্ধ চৈতন্য বললে এর ঠিক পরিচয় দেওয়া হয় না, সচ্চিদানন্দ শব্দের দ্বারাও এর যথাযথ নির্দেশ করা যায় না। অবাঙ্‌মনসোগোচর, অনির্দেশ্য, অবর্ণনীয় এই পরমার্থসত্তাকেই শাস্ত্রে 'পরমপদ' বলা হয়েছে। এই পরমার্থসত্তা সৎ কি অসৎ তা লৌকিক বিচারের বিষয় নয়, তবু বিচারদৃষ্টি নিয়ে আলোচনা করলে স্বীকার করতে হয় উক্ত সত্তায় প্রকাশ আর বিমর্শ উভয় অংশই অবিনাভূতরূপে বর্তমান। শিবশক্তিস্বরূপ প্রকাশ এবং বিমর্শের নিত্য সম্বন্ধই চৈতন্যরূপে মহাপুরুষদের অনুভবগম্য এবং শাস্ত্রে প্রচারিত হয়। কিন্তু চৈতন্য হলেও প্রকাশ এবং বিমর্শের সাম্যাবস্থা হওয়ার জন্য অব্যক্তই থেকে যায়। এই অবস্থারই অন্য নাম 'পরমপদ', এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। এই সাম্যাবস্থায় মহাশক্তিস্বরূপা অনাদি শক্তি পরমশিবের সঙ্গে সামরস্যভাবাপন্ন হয়ে অদ্বয়রূপে বিরাজ করেন। স্বরূপদৃষ্টিতে এই অবস্থাকে একপ্রকারে পরব্রহ্মভাবেরই নামান্তর বলা যায়। তবে এতে এর স্বরূপভূত স্বাতন্ত্র্য নিত্য বর্তমান থাকার জন্য এটি ব্রহ্মতত্ত্ব থেকে বিলক্ষণ। মহাশক্তিস্বরূপ এই পরমপদ আর নিষ্কল অথবা পূর্ণকল পরমেশ্বর কিন্তু এক নয়। কারণ নিষ্কল, নিষ্কল-সকল, আর সকল এই তিন বিশ্বেরই অবস্থা। কিন্তু মহাশক্তি সর্বাতীতা, তিনি বিশ্বাত্মিকা হয়েও বস্তুতঃ বিশ্বোত্তীর্ণা।

এই বিশ্বাতীত পরমপদে নিত্যসাম্য ভগ্ন হয় না কিন্তু তবু এরই স্বাতন্ত্র্যস্বরূপ আত্ম-বিলাসের দ্বারা একপ্রকার ভগ্নবৎ অবস্থা তথা বৈষম্যের উদ্ভব হয় এবং এই বৈষম্যের ফলস্বরূপ গুণপ্রধানভাবে ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বসমন্বিত বিশ্বের আবির্ভাব হয়। বলা-বাহুল্য অখণ্ড পরমার্থস্বরূপ শিবশক্তি থেকে অভিন্নরূপ হলেও স্বাতন্ত্র্যজনিত বিক্ষোভের জন্য ওঁরই দ্বারা বা ওঁরই মধ্যে বিশ্বপ্রপঞ্চের উদয় হয়। কাজেই কারণ, সূক্ষ্ম এবং স্থূল এই ত্রিবিধ ভাগবিশিষ্ট বিশ্ব মূলতঃ শক্তিরই বিকাশ এ সুনিশ্চিত।"

১ শক্তিসাধনা, ক শ অ, পৃঃ ৫৭ ২ শক্তিসাধনা, ক শ অ, পৃঃ ৫৩-৫৭

সৃষ্টি—মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ মহাশয় আরও লিখেছেন[১]—"পরাশক্তি আত্মগর্ভস্থ এবং নিজের সঙ্গে একীভূত বিশ্বকে অর্থাৎ প্রকাশকে দেখার জন্য উন্মুখ হন। তখন মাত্রাবচ্ছিন্ন শিব এবং শক্তি সাম্যভাবাপন্ন হয়ে বিন্দুরূপে পরিণত হন। এক মাত্রা শক্তি-অংশ এবং এক মাত্রা শিব-অংশ সমভাবে নিয়ে এই বিন্দু সংঘটিত হয়। আচার্যেরা শক্তি-অংশকে বলেন শান্তাশক্তি আর শিব-অংশকে বলেন অম্বিকাশক্তি।[২] এই অবস্থায় পরাশক্তি আত্মপ্রকাশ করেন পরাবাগ্‌রূপে। এইটি শব্দের প্রথম ভূমি বা স্তর। এইটিই প্রণবের পরম রূপ অথবা বেদের স্বরূপ।

এই ভূমিতে পরাশক্তি আত্মগর্ভস্থ বিশ্বকে নিত্যবর্তমানরূপে দেখেন। এখানে অতীত আর অনাগতরূপ খণ্ডকালের সত্তা নাই; দূর নিকটের ব্যবধান নাই; কার্য এবং কারণের কঠোর নিয়ম এখানে অপরিজ্ঞাত; এখানে কোনো বিক্ষোভ নাই, চাঞ্চল্য নাই। এ শান্তিময় অবস্থা। এই আদিম ভূমিতে পরাশক্তির দ্বারা আত্মস্ফুরণের দর্শন আর বিশ্বের আবির্ভাব একই কথা, দৃষ্টি আর সৃষ্টি সমানার্থক।

এর পরে শক্তির ক্রমবিকাশ হতে হতে শান্তাশক্তি পরিণত হয়ে যান ইচ্ছা-রূপে আর অম্বিকাশক্তি বামা-রূপে। এই উভয় শক্তির সামরস্যময় যে-অবস্থা তাই শব্দের দ্বিতীয় স্তর; এই স্তরে পরাবাক্ পশ্যন্তীবাগ্‌রূপে পরিণত হন। ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে এখান থেকেই দেশকালাবচ্ছিন্ন সৃষ্টির আরম্ভ।

এর পরের অবস্থায় শক্তি-অংশ দেখা দেন জ্ঞানশক্তিরূপে আর শিব-অংশ জ্যেষ্ঠা-শক্তিরূপে। উভয়ের সামরস্যময় অবস্থা শব্দের তৃতীয় স্তর। এই অবস্থায় পশ্যন্তীবাক্ মধ্যমা-বাগ্‌রূপে পরিণত হন।"

এর পরের স্তরে জ্ঞানশক্তি ক্রিয়াশক্তিরূপে এবং জ্যেষ্ঠা-শক্তি রৌদ্রীশক্তিরূপে পরিণত হন। উভয়ের সামরস্যময় অবস্থা শব্দের চতুর্থ স্তর। মধ্যমাবাক্ এই স্তরে বৈখরীবাগ্‌রূপে পরিণত হন।"[৩]

"কাজেই, দেখা যায় শক্তির দুই অবস্থা—অব্যক্ত বা প্রলীন অবস্থা এবং অভিব্যক্ত অবস্থা।

১ ঐ, পৃঃ ৫৭-৫৮

২ আচার্য ভাস্কররায় বরিবস্যারহস্যের (২।৬৪-৬৫) টীকায় লিখেছেন—প্রকাশাংশভূতা বামাজ্যেষ্ঠারৌদ্র্যঃ শক্তয়স্তিস্রো ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাঃ পুংরূপাঃ। তৎসমষ্টিঃ শান্তা-আম্বিকা শক্তিস্তুরীয়া। বিমর্শাংশভূতা ইচ্ছাজ্ঞানাক্রিয়াঃ শক্তয়স্তিস্রস্তদ্ভার্যাত্বেন প্রসিদ্ধা ভারতীপৃথিবীরুদ্রাণ্যঃ স্ত্রীরূপাঃ। তৎসমষ্টিরম্বিকা-আম্বিকা শক্তিস্তুরীয়া।—প্রকাশের অংশভূতা বামা জ্যেষ্ঠা রৌদ্রী এই তিন শক্তি পুংরূপা। এঁরা ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র। এই তিন শক্তির সমষ্টি শান্তাম্বিকা শক্তি তুরীয়া। বিমর্শের অংশভূতা ইচ্ছা জ্ঞান ক্রিয়া এই তিন শক্তি স্ত্রীরূপা। এঁরা ভারতী পৃথিবী ও রুদ্রাণী নামে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্রের ভার্যা বলে প্রসিদ্ধ। এই তিন শক্তির সমষ্টি অম্বিকাম্বিকা শক্তি তুরীয়া।

৩ শক্তিসাধনা ক খ অ, পৃঃ ৫৮

প্রথমোক্ত অবস্থায় শক্তি শিবের সঙ্গে একাকার হয়ে শিবরূপেই বিরাজ করেন এবং শেষোক্ত অবস্থায় তত্ত্বময় বিশ্বরূপে একই সঙ্গে ক্রমশঃ আবির্ভূত হন"।[১]

সৃষ্টিকার্যে শক্তির প্রাধান্য—শিবশক্তি এক হলেও সংহারকার্যে শিবের এবং সৃষ্টিকার্যে শক্তির প্রাধান্য স্বীকার করা হয়। পরাশক্তি স্বতন্ত্র বলে পরাবাক্ প্রভৃতি ক্রম অবলম্বন করে সৃষ্টিকার্য সম্পাদন করেন এবং তদনন্তর সৃষ্ট বিশ্বের কেন্দ্রস্থানে অবস্থিত হয়ে তাকে নিয়মন করেন। আমরা লক্ষ্য করেছি এই স্বতন্ত্রা শক্তিই ক্রমশঃ ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া-আকার প্রাপ্ত হয়ে বৈচিত্র্যের আবির্ভাব ঘটান এবং বিশ্বরূপ ধারণ করেন। শিব তটস্থ এবং উদাসীন থেকে নিরপেক্ষ সাক্ষিরূপে আপন শক্তির এই লীলা দেখেন।[২]

মূলা প্রকৃতি—পরাশক্তির বিভিন্ন নাম ও রূপ। তিনি মূলা প্রকৃতি। যাঁর প্রকৃতি নাই তাকেই মূলা প্রকৃতি বলা হয়।[৩] মহাভাগবতে বলা হয়েছে প্রকৃতি স্বয়ং স্বেচ্ছায় আপনাকে মায়া, বিদ্যা এবং পরমা এই ত্রিবিধরূপে বিভক্ত করেন। মায়া বিমোহিনী সংসার-প্রবর্তিকা শক্তি। "যিনি পরিস্পন্দাদি ব্যাপার-বিধায়িনী চৈতন্যময়ী সঞ্জীবনী শক্তি তিনি পরমা।" তত্ত্বজ্ঞানাত্মিকা সংসারনিবর্তিকা শক্তি বিদ্যা।[৪]

মায়া ও বিদ্যা—মাতৃকাচক্রবিবেকের টীকায় শিবানন্দ মুনি লিখেছেন বিমর্শই ইদন্তা বা ইদংভাবের প্রাধান্যের সহিত যখন অবভাসিত হন তখন তাঁকে বলা হয় মায়া আর যখন অহংতা বা অহংভাবের প্রাধান্যের সঙ্গে অবভাসিত হন তখন তাঁকে বলা হয় বিদ্যা।[৫]

পরাশক্তি বিদ্যা-অবিদ্যা-স্বরূপিণী। অবিদ্যারূপে তিনি জীবকে সংসার-বাঁধনে বাঁধেন আর বিদ্যারূপে তার মুক্তিবিধান করেন।[৬]

বিদ্যা অর্থ ব্রহ্মজ্ঞান।[৭] ব্রহ্মজ্ঞানেই মুক্তি।[৮] সেইজন্য বিদ্যা মুক্তি বিধান করেন। এই প্রসঙ্গে বলা যায় ব্রহ্মজ্ঞান পরোক্ষ হতে পারে আবার অপরোক্ষও হতে পারে। "আপ্তবাক্য,

---

১ শক্তিসাধনা, ক শ অ, পৃঃ ৫৮ ২ ঐ

৩ যস্যা ন প্রকৃতিঃ সেয়ং মূলপ্রকৃতিসংজ্ঞিতা।—পঞ্চরাত্রাগমবচন, দ্রঃ ল স, সৌ ভা, পৃঃ ১০৪

৪ ত্রিধা চকার চাত্মানং স্বেচ্ছয়া প্রকৃতি স্বয়ং। মায়া বিদ্যা চ পরমেত্যেবং সা ত্রিবিধাঽভবৎ।
মায়া বিমোহিনী পুংসাং যা সংসার-প্রবর্তিকা। পরিস্পন্দাদিশক্তি র্যা পুংসাং সা পরমা মতা।
তত্ত্বজ্ঞানাত্মিকা চৈব যা সংসার-নিবর্তিকা।—মহাভাগবত ২।৫৫-৫৭ দ্রঃ ত ত, পৃঃ ২৪০

৫ বিমর্শ এব ইদন্তোন্মেষণ্যেন ভাসমানো মায়া ইত্যুচ্যতে।
স এব অহন্তোন্মেষণ্যেন বিদ্যোতমানো বিদ্যেতি গীয়তে।—দ্রঃ শাক্তাদ্বৈতবাদ, ক শ অ, পৃঃ ৩৪৫

৬ (ক) ত্বমেব সাপি হ্যনাপা বিদ্যাবিদ্যাস্বরূপিণী।—দেবীভাগবতবচন, দ্রঃ ল স, সৌ ভা, পৃঃ ১০৩
(খ) বিদ্যাবিদ্যেতি দেব্যা দ্বে রূপে জানীহি পার্থিব। একয়া মুচ্যতে জন্তুরন্যয়া বধ্যতে পুনঃ।—ঐ

৭ বিদ্যা ব্রহ্মজ্ঞানলক্ষণা।—দু স ১।৪৪ শ্লোকের চতুর্ধরী-টীকা।

৮ জ্ঞানং মোক্ষৈককারণম্।—কৌ উপ, ৩ (পৃঃ ২)

শাস্ত্রপাঠ ও অনুমান প্রভৃতির দ্বারা যে-জ্ঞান হয়, তাহার নাম পরোক্ষজ্ঞান, আর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে-জ্ঞান জন্মে, তাহার নাম অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান।"[১] অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানই মোক্ষের কারণ।[২] তবে শাস্ত্রালোচনা প্রভৃতির সাহায্যে প্রথমে পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করলে পরেই অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হতে পারে।

শাক্ততন্ত্রের অভিমত— সনাতন ব্রহ্মকে জানার বহু উপায় আছে বটে, তবু শক্তির সহায়তায় অর্থাৎ শাক্তমতের সাধনায় শীঘ্র প্রত্যক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।[৩]

অবিদ্যা—বিদ্যা অবিদ্যার কথা হচ্ছিল। যা বিদ্যা নয়, তাই অবিদ্যা।[৪] অবিদ্যা অজ্ঞান। কেন না, অজ্ঞানই বন্ধন। চিতির পরিচ্ছিন্নস্বজ্ঞানই অজ্ঞান।[৫]

অবিদ্যা জীবকে পঞ্চ বন্ধনে বদ্ধ করেন। এই পঞ্চ বন্ধন[৬]—(১) অনাত্মায় আত্মবুদ্ধি। যেমন দেহ মন এ-সব আত্মা নয়, অথচ এদের আত্মা মনে করা। (২) আত্মায় অনাত্মবুদ্ধি। পরব্রহ্মই আত্মা অথচ তাঁকে আত্মা বলে না জানা। (৩) জীবদের পরস্পর ভেদজ্ঞান। সব জীবই স্বরূপতঃ ব্রহ্ম। কিন্তু জীব তা জানে না বলে পরস্পরকে ভিন্ন মনে করে। (৪) ঈশ্বর থেকে আত্মার ভেদ। ঈশ্বর ও আত্মা স্বরূপতঃ অভিন্ন, কিন্তু তবু জীব ঈশ্বর থেকে নিজেকে ভিন্ন মনে করে। (৫) চৈতন্য থেকে আত্মার ভেদ। আত্মা ও চৈতন্য অভিন্ন হলেও জীব আত্মাকে চৈতন্য থেকে ভিন্ন মনে করে।[৭]

একই শক্তির বিভিন্ন নাম—কাজেই দেখা গেল মায়া, বিদ্যা, অবিদ্যা ক্রিয়াভেদে ভিন্ন মনে হলেও তত্ত্বদৃষ্টিতে একই শক্তি।

দেবীভাগবতে বলা হয়েছে—এই শক্তিকে কেউ বলেন তপঃ, কেউ তমঃ, অন্যেরা বলেন জড়, জ্ঞান, মায়া, প্রধান, প্রকৃতি, অজা শক্তি। শৈবশাস্ত্রবিশারদেরা তাঁকে বলেন বিমর্শ আর বেদতত্ত্বার্থচিন্তকেরা অবিদ্যা।[৮]

১ কৌ র, পৃঃ ৬৪ ২ ঐ

৩ উপায়া বহব সন্তি জ্ঞাতুং ব্রহ্ম সনাতনম্।
তথাপি প্রকৃতেযোগাৎ ক্ষিপ্রং প্রত্যক্ষতাং ব্রজেৎ।—কুলার্ণবতন্ত্রবচন, দ্রঃ কৌ র, পৃঃ ৬৩

৪ অবিদ্যা বিদ্যেতরা।—দু স ১।৪৪ শ্লোকের শাম্ভবী-টীকা।

৫ চিতেঃ পরিচ্ছিন্নস্বজ্ঞানমেবাজ্ঞানম্। এতচ্চাজ্ঞানং বন্ধ ইতি শিবসূত্রে বৃত্তিকৃতা শাস্ত্রং নিরূপিতম্।
—ত্রি র, জ্ঞা খ, পৃঃ ৫৫

৬ অনাত্মন্যাত্মতাবুদ্ধিরাত্মন্যনাত্মতাবুদ্ধিঃ… …জীবানাং পরস্পরং ভেদ ঈশ্বরাদ্ ভেদশ্চৈতন্যাদ্ ভেদ ইতি জ্ঞানত্রয়েণ সহ পঞ্চ।—কৌলোপনিষদের চতুর্দশ মন্ত্রের ভাস্কররায়কৃত ভাষ্য।

৭ কৌ র, পৃঃ ৬৮

৮ কেচিত্তাং তপ ইত্যাহুস্তমঃ কেচিজ্জড়ং পরে। জ্ঞানং মায়াং প্রধানঞ্চ প্রকৃতিং শক্তিমপ্যজাম্।
বিমর্শ ইতি তাং প্রাহুঃ শৈবশাস্ত্রবিশারদাঃ। অবিদ্যামিতরে প্রাহুর্বেদতত্ত্বার্থচিন্তকাঃ।—দে ভা ৭।৩২।৯-১০

মায়া ও মায়েশ্বরী—আরেকটি কথা, শাক্তমতে সচ্চিদানন্দরূপিণী ভগবতী মহামায়া মায়েশ্বরী।[১] পরমার্থতঃ মহামায়া আর মায়াতে কোনো ভেদ নাই। ভেদটা কল্পিত। দেবীভাগবতে দেখা যায় মহাদেবী বলছেন সেই মায়া পরা শক্তি আর আমি শক্তিমতী ঈশ্বরী।[২] শক্তি আর শক্তিমতীতে কোনো ভেদ নেই।

১ মায়েশ্বরীং ভগবতীং সচ্চিদানন্দরূপিণীম্। ধ্যায়েত্তথা ধারয়েচ্চ প্রণমেচ্চ জপেদপি।—দে ভা ৩।৩১।৪৯

২ সা চ মায়া পরা শক্তিঃ শক্তিমত্যহমীশ্বরী।—ঐ ১২।৮।৬৬

দশম অধ্যায়

সাধনা ও শাক্ত দর্শন

শাক্ত দর্শনের প্রাচীনত্ব—সনাতন ধর্মীয় অন্যান্য প্রধান প্রধান উপাসক সম্প্রদায়ের মতো শাক্ত সম্প্রদায়েরও নিজস্ব দর্শন আছে। কিন্তু এই দর্শন কবে থেকে প্রচলিত হয়েছে নির্ধারণ করা কঠিন।

সর্বদর্শনসংগ্রহাদিতে শাক্ত দর্শন নাই—'সর্বদর্শনসংগ্রহ' প্রভৃতি কোনো দর্শনসংকলন-গ্রন্থে শাক্ত দর্শন সংকলিত হয় নি। সর্বদর্শনসংগ্রহ রচিত হয় চতুর্দশ খৃষ্ট শতকে।[১] ঐ শতাব্দীতেই রচিত হয় রাজশেখর সূরির ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়।[২] দ্বাদশ শতকে রচিত হয় হরিভদ্র সূরির ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়।[৩] সর্বদর্শনসিদ্ধান্তসংগ্রহ আচার্য শঙ্করের রচনা মনে করা হয়। অবশ্য গ্রন্থখানাকে শারীরকভাষ্যকার শঙ্করাচার্যের রচনা বলে অনেকেই স্বীকার করেন না।[৪] এই-সব কোনো গ্রন্থেই শাক্তদর্শনের আলোচনা নাই বা তার নামোল্লেখও করা হয় নি।[৫]

না থাকার কারণ—এর কারণ কি? এ সম্বন্ধে একাধিক অনুমান সম্ভবপর। প্রথমেই মনে হতে পারে এই-সব গ্রন্থ সংকলনের সময়ে শাক্ত দর্শন ছিল না। এইজন্যই এই-সব সংকলনগ্রন্থে শাক্ত দর্শন স্থান পায় নি। আবার এমনও হতে পারে সংকলনগ্রন্থগুলি রচনার সময়ে শাক্ত দর্শন ছিল কিন্তু সম্প্রদায়ের বাইরে তার বিশেষ প্রচার ছিল না। এইজন্যই সংকলয়িতারা তাঁদের গ্রন্থে শাক্তদর্শনের আলোচনা করেন নি।

লক্ষ্য করা গেছে শক্তি সম্বন্ধীয় তত্ত্ব শ্রুতিতেই অভিব্যক্ত হয়েছে। চতুর্দশ খৃষ্ট শতকের পূর্বে রচিত আগম ও তন্ত্র-গ্রন্থও পাওয়া গেছে। এই-সব আগমতন্ত্রাদিতে শক্তি সম্বন্ধীয় তত্ত্ব প্রচারিত হয়েছে। কিন্তু মনে হয় শাক্তরা এই-সব তত্ত্বকে বিচারবিতর্কমূলক দার্শনিক আকারে প্রকাশ করার চেষ্টা করেন নি।[৬] প্রশ্ন হবে কেন করেন নি? উত্তরে বলা হয় করেন নি তার কারণ শাক্ত তন্ত্রাদিতে যে-সব গূঢ় তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হয়েছে সেগুলি সাধনলব্ধ; দার্শনিক বিচারের দ্বারাও সেই-সব তত্ত্ব অনধিকারী মানুষের বোধগম্য হয় না। সেইজন্য শাক্ত সাধকেরা সে-সব তত্ত্বকে দার্শনিক বিচারের বিষয়ীভূত করা নিরর্থক মনে করেছেন।[৭]

১ H. S. L: Keath, p. 500

২ Dey and Das Gupta: H. S. L., Vol. 1, p. 396.

৩ H. Sam. L., p. 228　　৪ H. S. L: Keath, p. 500

৫ Śākta Philosophy, H. Ph. E. W., p. 425, n. 2

৬ Ibid, p. 401　　৭ Ibid.

শাক্ত সাধকদের চরম লক্ষ্য ছিল সাধনলব্ধ অদ্বৈতসিদ্ধি। দার্শনিক কূট বিচারের দিকে তাঁদের কোনো লক্ষ্য ছিল মনে হয় না। কেন না তাঁরা ভাল করেই জানতেন "দর্শনশাস্ত্রের কূট বিচারশক্তি আর সাধনলব্ধ অদ্বৈতসিদ্ধি দুই এক পদার্থ নহে।"[১]

তন্ত্রে দর্শনের অনাদর—সেইজন্য তন্ত্রে দর্শনের প্রতি অনাদরই লক্ষ্য করা যায়। কুলার্ণবতন্ত্রে বলা হয়েছে—মোক্ষের কারণ অপরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞান। পশুরা ষড়্দর্শনমহাকূপে নিপতিত। পশুপাশনিয়ন্ত্রিত এই-সব ব্যক্তি পরমার্থ জানে না।[২]

কামাখ্যাতন্ত্রে কথাটা আরেকটু বিস্তৃত করে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে—হাতা যেমন রন্ধন-করা বস্তুর রস কেমন তা জানে না তেমনি ষড়্দর্শনমহাকূপে পতিত পশুরা পরমার্থ কেমন তা জানে না। কদলীবৃক্ষে এবং এরণ্ডবৃক্ষে যেমন সার নাই তেমনি দর্শনে মুক্তি নাই। মৃগরা যেমন মরীচিকার কাছে গিয়ে ফিরে আসে তেমনি মুমুক্ষুরা দর্শনের কাছে গিয়ে ফিরে আসে। সুধী ব্যক্তি প্রথমে শ্রীগুরুর প্রসাদে মুক্তিলাভ করবে, তার পর কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্য সর্বশাস্ত্রের আলোচনা করবে।[৩]

কাজেই দেখা যাচ্ছে তন্ত্রমতে দর্শনাদি শাস্ত্রের কৌতূহল চরিতার্থ করা ছাড়া অন্য উপযোগিতা অন্ততঃ মোক্ষসাধনের ব্যাপারে স্বীকৃত নয়।

তন্ত্রে বিচারের উপযোগিতা স্বীকৃত—তবে দর্শনের প্রতি অনাদর দেখান হলেও তন্ত্রে বিচারের উপযোগিতা স্বীকার করা হয়েছে। তত্ত্বজ্ঞানরূপ পরম-শ্রেয়োলাভের প্রথম সোপান বিচার। ত্রিপুরারহস্যে বলা হয়েছে—বিচার সমস্ত শ্রেয়ের মূল। বিচারকে পরমশ্রেয়োরূপ মহাসৌধের প্রথম সোপান বলে জানবে। উত্তম বিচার ছাড়া কার কি ভাবে ক্ষেমপ্রাপ্তি হবে?[৪]

উক্ত গ্রন্থের মতে পরমা দেবী আরাধনায় সন্তুষ্ট হলে সাধকের চিদাকাশে সূর্যের মতো উজ্জ্বল বিচাররূপতা প্রাপ্ত হন।[৫]

১ ভ ত, পৃঃ ৬৯

২ মোক্ষস্য কারণং সাক্ষাত্তত্ত্বজ্ঞানং কুলেশ্বরি। ষড়্দর্শনমহাকূপে পতিতাঃ পশবঃ প্রিয়ে।
পরমার্থং ন জানন্তি পশুপাশনিয়ন্ত্রিতাঃ।—কু ত, ১ম উল্লাস।

৩ ষড়্দর্শনমহাকূপে পতিতা পশবঃ প্রিয়ে। পরমার্থং ন জানন্তি দর্বী পাকরসং যথা।
ন সারঃ কদলীবৃক্ষে নৈরণ্ডে তু শুভাননে। দর্শনে তু তথা মুক্তির্নাস্তি দেবি মহোদিতম্।
যথা মরীচিকায়াস্তু নিবর্ত্তন্তে পুনর্মৃগাঃ। দর্শনেভ্যঃ নিবর্ত্তন্তে তথা মুমুক্ষবঃ পুনঃ।
শ্রীগুরোশ্চ প্রসাদেন মুক্তিমাদৌ সদা লভেৎ। বিচরেৎ সর্বশাস্ত্রেষু কৌতুকায় ততঃ সুধী।
—কামা ত, ৮ম পটল।

৪ বিচারঃ সর্বমূলং হি সোপানং প্রথমং ভবেৎ। পরশ্রেয়োমহাসৌধপ্রাপ্তৌ জানীহি সর্বথা।
সুবিচারমৃতে ক্ষেমপ্রাপ্তিঃ কস্য কথম্ভবেৎ।—ত্রি র, জ্ঞা খ, ১।৫১-৫২

৫ আরাধিতা পরমা দেবী সম্যক্ তুষ্টা সতী তদা। বিচাররূপতাং যাতি চিদাকাশে রবির্যথা।—ঐ ২।৭০

দর্শনশাস্ত্রের ভিত্তিই বিচার। অতএব বিচারের উপযোগিতা স্বীকার করায় তন্ত্রে পরোক্ষভাবে হলেও দর্শনের উপযোগিতা কিছুটা অবশ্যই স্বীকার করা হয়েছে।

স্বতন্ত্র শাক্ত দর্শন—তবে মনে হয় শাক্ত সম্প্রদায় গড়ে উঠার পরও অনেক কাল পর্যন্ত স্বতন্ত্র শাক্ত দর্শন প্রচারিত হয় নি। দর্শন সম্বন্ধে শাক্ত সাধকদের আগ্রহের অভাব এবং প্রতিকূল মনোভাব ছাড়াও এই কার্যের আরেকটি কারণ নির্দেশ করা হয়। পরমেশ্বরী- বা পরমেশ্বর-প্রোক্ত তত্ত্বগুলি সম্পর্কে শৈব দর্শনে যে-আলোচনা আছে সাধারণ মানুষের পক্ষে তাই যথেষ্ট। এই গুলিকে আবার নূতন করে দার্শনিক প্রণালীবদ্ধ করার প্রয়োজন বোধ হয় নি।[১] এইজন্যই প্রথমে পৃথক্ শাক্ত দর্শন প্রচারিত হয় নি।

শাক্ত দার্শনিক মতের প্রাচীন নিদর্শন—তবে দর্শনসংগ্রহ-গ্রন্থগুলি রচিত হওয়ার বহু পূর্ব থেকেই শাক্ত দার্শনিক মত প্রচলিত ছিল তার প্রমাণ আছে। আচার্য সোমানন্দ তাঁর শিবদৃষ্টি নামক গ্রন্থের তৃতীয় আহ্নিকে শাক্ত মত (শক্ত্যদ্বয়বাদ) খণ্ডন করেছেন।[২] আচার্য সোমানন্দ নবম খৃষ্ট শতকের শেষার্ধে জন্মগ্রহণ করেন।[৩]

বীরশৈবমতের খ্যাতনামা আচার্য শ্রীপতি পণ্ডিত চতুর্দশ খৃষ্ট শতকে জীবিত ছিলেন।[৪] তিনি শ্রীকরভাষ্যে[৫] অন্যান্য মতের সঙ্গে শাক্ত মতেরও আলোচনা করেছেন।

কাজেই শাক্ত দার্শনিক মত যে অন্ততঃ নবম খৃষ্ট শতক থেকে প্রচলিত হয়েছিল এবং চতুর্দশ শতকে অন্যান্য দার্শনিক মতের মতো কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

শক্তি সম্বন্ধীয় তত্ত্ব কিন্তু প্রাচীন কালেই শ্রুতি এবং শৈবাগমে অভিব্যক্ত হয়েছে। এই-সব তত্ত্ব সাধনলব্ধ; দার্শনিক বিচারবিতর্কের উপর নির্ভরশীল নয়। এ কথা আমরা পূর্বেও বলেছি। এই-সব তত্ত্বকে ভিত্তি করেই পরবর্তী কালে শাক্ত দর্শন গড়ে উঠে।

আগে ধর্ম পরে দর্শন—আগে ধর্ম, পরে দর্শন। সব ধর্মমতেরই মোটের উপর এই একই ইতিহাস বলা যায়। ধর্মমতের সঙ্গে যুক্ত না হয়েও অবশ্য দর্শন থাকে। কিন্তু ধর্মমতকে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে হলে তার দর্শন থাকা চাই। আমাদের দেশের প্রধান প্রধান ধর্মমতগুলি দীর্ঘকাল ধরে দর্শনের সঙ্গে যুক্ত। এমনকি ঋগ্‌বেদেও দার্শনিক চিন্তার নিদর্শন আছে। বৈদিক ঋষিরা শুধু যে দেবতাদের উদ্দেশ্যে মন্ত্র রচনা করে তাঁদের স্তবস্তুতি করেছেন তা নয়, তাঁদের স্বরূপ সম্বন্ধেও চিন্তা করেছেন এবং সকল দেবতা যে একই পরম দেবতার রূপভেদমাত্র তাও বলেছেন।[৬]

১ Śakta Philosophy, H. Ph. E. W., p. 401 ২ শি দৃ, Intro., p. ii
৩ ঐ P. iii. ৪ Bhāskari, Vol. III, Intro. P. XLIII ৫ শ্রীকরভাষ্য, পৃঃ ২৫২
৬ Dr. Bhagawandas : Intro., C. H. I., Vol. IV., P. 8.

ভারতের প্রধান ধর্মমতগুলি দার্শনিক যুক্তিবিচারের দ্বারা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ। প্রত্যেক প্রধান ধর্ম মতেরই নিজস্ব দর্শন আছে। যদি কোনো ধর্মমতের দর্শন না থাকে তা হলে সাধারণতঃ জ্ঞানী-গুণীদের কাছে সে-ধর্মমত আদৃত হয় না, যার দর্শন আছে এরূপ ধর্মমতের তুলনায় বিদ্বান্ ব্যক্তিদের কাছে নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন হয়।

শাক্ত ধর্মের দার্শনিক সমর্থন—এইজন্য শাক্ত ধর্মেরও দার্শনিক সমর্থন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। শক্তিসূত্র, পরশুরামকল্পসূত্র, বামকেশ্বরতন্ত্র, তন্ত্ররাজতন্ত্র, ভাবনোপনিষদ্, কৌলোপনিষদ্, ত্রিপুরামহোপনিষদ্ প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রন্থে এবং আচার্য ভাস্কররায় প্রমুখ তন্ত্রবিশারদ পণ্ডিতদের রচিত গ্রন্থাদিতে শাক্তমতের দার্শনিক দিকের পরিচয় আছে।[১] ভাস্কররায়রচিত সেতুবন্ধ (বামকেশ্বরতন্ত্রার্গত নিত্যাষোড়শিকার্ণবের টীকা), বরিবস্যারহস্য, সৌভাগ্যভাস্কর (ললিতাসহস্রনামের টীকা), এবং গুপ্তবতী (দুর্গাসপ্তশতীর টীকা) প্রভৃতি গ্রন্থ এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনে শাক্ত দার্শনিক তত্ত্ব—প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনে শক্তি সম্বন্ধীয় দার্শনিক তত্ত্বও আলোচিত হয়েছে। শাক্ত দর্শনের ক্ষেত্রে ত্রিকমত-ব্যাখ্যাতা আচার্যদের দান প্রভূত। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় আচার্য অভিনবগুপ্তকে শাক্ত সংস্কৃতির আত্মা বলে অভিহিত করেছেন (verily the soul of Śākta culture)।[২] আচার্য ছিলেন প্রখ্যাত কৌল। তাঁর বিবিধ রচনায়[৩] শৈবশাক্ত দর্শনের যে-ব্যাখ্যা আছে তা অতুলনীয়। বিশেষ করে তাঁর তন্ত্রালোককে ত শৈবশাক্ত দর্শনের বিশ্বকোষ বলা যায়।[৪]

শাক্ত দর্শনের ক্ষেত্রে গোরক্ষ প্রভৃতি আচার্যদের দান—আচার্য অভিনবগুপ্তের পরবর্তী আচার্যদের মধ্যে শাক্ত দর্শনের ক্ষেত্রে গোরক্ষ, পুণ্যানন্দ, নটনানন্দ, অমৃতানন্দ, স্বতন্ত্রানন্দ এবং ভাস্কররায়ের দানের কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। গোরক্ষ ওরফে মহেশ্বরানন্দের বিখ্যাত গ্রন্থ মহার্থমঞ্জরী। পুণ্যানন্দের কামকলাবিলাস একখানা প্রামাণ্য গ্রন্থ। নটনানন্দ এই গ্রন্থের চিদ্বল্লী নামে টীকা রচনা করেছেন। বামকেশ্বরতন্ত্রের অন্তর্গত নিত্যাষোড়শিকার্ণবের একটি অংশের নাম যোগিনীহৃদয়। পুণ্যানন্দের শিষ্য অমৃতানন্দ যোগিনীহৃদয়দীপিকা নামে যোগিনীহৃদয়ের একখানি মূল্যবান্ টীকা রচনা করেছেন। সৌভাগ্যসুভগোদয় নামক গ্রন্থখানাও অমৃতানন্দেরই রচনা মনে করা হয়। শাক্ততন্ত্রের গূঢ়তত্ত্ব সম্বন্ধে

১ Prefatory Note to The Tripurā Rahasya, Part 1, P. 2.

২ Śākta Philosophy, H, Ph. E. W, P. 404.

৩ আচার্য অভিনবগুপ্তরচিত ৪৮ খানা গ্রন্থের একটি তালিকা দিয়ে অধ্যাপক কান্তিচন্দ্র পাণ্ডে লিখেছেন আচার্যের যে আরও অনেক রচনা ছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।—Abhi, 2nd Ed., pp. 27-28

৪ Śākta Philosophy, H. Ph. E. W., p 404

একখানা অপূর্ব গ্রন্থ স্বতন্ত্রানন্দের মাতৃকাচক্রবিবেক। শিবানন্দ মুনি এর চমৎকার টীকা রচনা করেছেন। আচার্য ক্ষেমরাজ প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয় নামক বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেছেন। আচার্য ভাস্কররায় প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়কে বলেছেন শক্তিসূত্র। পরবর্তী যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ তন্ত্রবিশারদ পণ্ডিত মনে হয় ভাস্কররায় (অষ্টাদশ শতক)। তিনি শাক্ত-আগম-বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। পূর্বেই তাঁর সেতুবন্ধাদি গ্রন্থের উল্লেখ করা হয়েছে। ভাস্কররায়-রচিত কৌল, ত্রিপুরা এবং ভাবনা উপনিষদের ভাষ্যও প্রসিদ্ধ।[১]

শ্রীকুল এবং কালীকুল—শাক্ত মতের বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে। তার মধ্যে শ্রীকুল এবং কালীকুল[২] সমধিক প্রসিদ্ধ।

শ্রীকুলের গ্রন্থ—শ্রীকুলের গ্রন্থাদি বিস্তর। বলা হয় অগস্ত্য, দুর্বাসা, দত্তাত্রেয় প্রমুখ ঋষিরা শ্রীবিদ্যার উপাসক ছিলেন এবং বিভিন্ন মনোজ্ঞ গ্রন্থও রচনা করেন। শক্তিসূত্র এবং শক্তিমহিম্নস্তোত্র অগস্ত্যের রচনা মনে করা হয়। পরশম্ভুস্তোত্র এবং ললিতাস্তবরত্ন দুর্বাসার রচনা বলে পরিচিত।[৩] পরম্পরা অনুসারে দত্তাত্রেয় দত্তসংহিতা নামে গ্রন্থ রচনা করেন। আঠার হাজার শ্লোকে সমাপ্ত এই গ্রন্থের সারসংকলন করেন পরশুরাম ছ হাজার সূত্রে। পরশুরামের শিষ্য সুমেধা দত্তাত্রেয় এবং পরশুরামের মধ্যে কথোপকথনের আকারে উভয়ের রচিত গ্রন্থের সারসংকলন করেন। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় মনে করেন ত্রিপুরারহস্য এই সুমেধারচিত গ্রন্থ।[৪] এই গ্রন্থের জ্ঞানখণ্ডকে শাক্ত দর্শনের একটি চমৎকার ভূমিকা মনে করা যায়।[৫]

এ ছাড়া সুভগোদয়স্তুতি, প্রপঞ্চসারতন্ত্র, সৌন্দর্যলহরী, প্রয়োগক্রমদীপিকা, শারদাতিলক প্রভৃতি শ্রীকুলের প্রখ্যাত গ্রন্থ।[৬]

কালীকুলের গ্রন্থ—কালীকুলের গ্রন্থাদি সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত অল্প। কালজ্ঞান,

১ Sākta Philosophy, H. Ph. E. W., p. 404

২ নিরুত্তরতন্ত্রে কালীকুল এবং শ্রীকুল সম্বন্ধে বলা হয়েছে—কালী, তারা, রক্তকালী, ভুবনেশ্বরী, মহিষমর্দিনী, ত্রিপুটা, ত্বরিতা, দুর্গা এবং বিদ্যা প্রত্যঙ্গিরা—এঁদের বলা হয় কালীকুল। আর সুন্দরী (ত্রিপুরসুন্দরী), ভৈরবী, বালা, বগলা, কমলা, ধূমাবতী, মাতঙ্গী, বিদ্যা স্বপ্নাবতী এবং মহাবিদ্যা মধুমতী—এঁদের বলা হয় শ্রীকুল। যথা—

কালী তারা রক্তকালী ভুবনা মহিষমর্দিনী। ত্রিপুটা ত্বরিতা দুর্গা বিদ্যা প্রত্যঙ্গিরা তথা।
কালীকুলং সমাখ্যাতং শ্রীকুলঞ্চ ততঃপরম্। সুন্দরী ভৈরবী বালা বগলা কমলাদি চ।
ধূমাবতী চ মাতঙ্গী বিদ্যা স্বপ্নাবতী প্রিয়ে। মধুমতী মহাবিদ্যা শ্রীকুলং পরিকীর্তিতম্।—নিরু ত, পঃ ১

কালীকুলের দেবীদের উপাসকেরাও কালীকুল এবং শ্রীকুলের দেবীদের উপাসকেরা শ্রীকুল।

৩ Sākta Philosophy, H. Ph. E. W., Vol. I, p. 403

৪ Ibid, also p. 426 n 18   ৫ Ibid, p. 403   ৬ Ibid.

কালোত্তর, মহাকালসংহিতা, ব্যোমকেশসংহিতা, জয়দ্রথযামল, উত্তরতন্ত্র, শক্তিসঙ্গমতন্ত্র (কালীখণ্ড) প্রভৃতি এই কুলের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।[১]

শাক্ত দর্শনের আলোচনায় উল্লিখিত গ্রন্থগুলি বিশেষ সহায়ক। কেন না, এই-সব গ্রন্থে দার্শনিক তত্ত্ব প্রসঙ্গক্রমে বিবৃত হয়েছে।

সৃষ্টি শক্তির পরিণাম—শাক্তদর্শন শক্তিকেন্দ্রিক। অতএব শক্তিকে নিয়েই সুরু করা যাক। লক্ষ্য করা গেছে শাক্ত শাস্ত্রানুসারে শক্তি সৃষ্টির বা জগতের কারণ, নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ উভয়ই। শক্তি জগতের উপাদান-কারণ অর্থ জগৎ শক্তির পরিণাম। বরিবস্যারহস্যে স্পষ্টই বলা হয়েছে—অর্থময়ী শব্দময়ী চক্রময়ী দেহময়ী সৃষ্টি শক্তির পরিণাম।[২]

শাক্তদর্শন পরিণামবাদী—এইজন্য শাক্তদর্শনকে বলা হয় পরিণামবাদী। পরিণামবাদ মূলতঃ সাংখ্য মত। এই "মতে কারণ বিকৃত বা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত অর্থাৎ কার্যাকারে পরিণত হয়। সুতরাং কার্যরূপ বস্তু আছে। কার্যজ্ঞান নির্বস্তুক নয়।"[৩]

সদৃশ ও বিসদৃশ পরিণাম— পরিণাম দুরকমের—সদৃশ পরিণাম আর বিসদৃশ পরিণাম। বস্তুর যখন অবস্থান্তর হয় তখন তাকে বলে বিসদৃশ পরিণাম। আর যখন অবস্থান্তর হয় না, বস্তু স্বরূপেই থাকে তখন হয় তার সদৃশ পরিণাম।[৪]

কারণরূপে শক্তির হয় সদৃশ পরিণাম আর কার্যরূপে বিসদৃশ পরিণাম। অর্থাৎ কারণ-রূপে শক্তি স্বরূপতঃ যা তাই থাকেন আর কার্যরূপে অবস্থান্তরিতরূপে অবভাসিত হন।[৫]

বিবর্তবাদ—কাজেই এই পরিণাম বা আভাসকে এক রকমের বিবর্তও বলা যায়।[৬] তবে শঙ্করাচার্যের বিবর্তবাদ থেকে এটি ভিন্ন। শঙ্করাচার্য শুধু কারণকে সৎ বলেন। তাঁর মতে কার্য পরমার্থতঃ সৎ নয়; কারণে কার্যের প্রতীতি হয় মাত্র; যেমন রজ্জুতে সর্পের প্রতীতি হয়।

সৎকার্যবাদ—কিন্তু শৈব শাক্ত প্রভৃতি মতে কার্য পরমার্থতঃও সৎ। "সগুণ ব্রহ্মের পরিণামই জগৎ। জগৎ প্রলয়কালে সূক্ষ্মাকারে ব্রহ্মে লীন থাকে, সৃষ্টিসময়ে স্থূলরূপে তাহার বিকাশ হয়। জগতের অত্যন্তাভাব কখনও হয় না, কেবল অবস্থান্তরমাত্র হয়। ইহা শাক্ত দর্শনের সিদ্ধান্ত এবং ইহাই সৎকার্যবাদ।"[৭]

১ Śākta Philosophy, H. Ph. E. W., p. 404

২ সাংখ্যক্রং বিজ্ঞেয়া বংপরিণামাত্মভূতেব্যা। অর্থময়ী শব্দময়ী চক্রময়ী দেহময্যপি চ সৃষ্টিঃ।—ব র ১।৫

৩ শ্রীগো ব কে জৈ, সপ্ত লেখচয়, প্রথম বর্ষ, পৃঃ ১৮৩ ৪ কৌ র, পৃঃ ১২৩, পাদটীকা

৫ Mahāmāyā, p. 60, f. n. 3 ৬ Ś. Ś., 4th Ed, p. 280

৭ কৌ র, পৃঃ ৩৭, পাদটীকা

শাক্তদর্শন অদ্বৈতবাদী—"সগুণব্রহ্মপ্রতিপাদক শাক্ত দর্শন পরিণামবাদী এবং অদ্বৈতবাদী।"[১] কিন্তু সাধনার ক্ষেত্রে শাক্তমতেও দ্বৈত স্বীকৃত, সাধ্য ও সাধকের ভেদ স্বীকৃত। তবে সাধনা করতে করতে সাধক এমন এক অবস্থায় পৌছে যান যখন সাধ্যসাধকের ভেদ লোপ পেয়ে যায়। এইজন্য কুলার্ণবতন্ত্রে দেবী বলছেন—আমার তত্ত্বকে কেউ কেউ অদ্বৈত বলতে চায় কেউ কেউ দ্বৈত বলতে চায়। কিন্তু আমার তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা জানে তা দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিত।[২]

দর্শনের আলোচ্য—সৃষ্টি শক্তির পরিণাম এই কথা দিয়ে আমরা আলোচনা সুরু করেছিলাম। দর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয়ও সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয়। "কিরূপে জগৎ রহিয়াছে, কিরূপে তাহার ধ্বংস হইবে, ইহা লইয়াই দর্শন শাস্ত্রের যত কিছু বিচার, মীমাংসা, বাদবিতণ্ডা, মতামত।"[৩]

ত্রিপুরারহস্যে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে—এই মহৎ জগদাড়ম্বরের উদ্ভব হল কোত্থেকে, এর অবস্থান কোথায় এবং কোথায়ই বা আবার এটি চলে যায়।[৪]

শব্দার্থরূপ সৃষ্টি—শাক্ত মতে সৃষ্টি দুরকমের, শব্দময়ী আর অর্থময়ী। পূর্বে যে চক্রময়ী ও দেহময়ী বলে আরও দুরকমের সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে তা অর্থসৃষ্টির অন্তর্গত।[৫]

শিব থেকে ক্ষিতি পর্যন্ত ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বকে নিয়ে অর্থময়ী সৃষ্টি আর পরা থেকে বৈখরী পর্যন্ত শব্দকে নিয়ে শব্দময়ী সৃষ্টি।[৬]

ষড়ধ্বা—শব্দার্থরূপ চরাচর জগৎ।[৭] শব্দার্থময় জগৎকে ষড়ধ্বাত্মক জগৎও বলা হয়।[৮] এই ষড়ধ্বাত্মক জগৎ চিদ্‌রূপিণী মহাশক্তির মধ্যে প্রকাশিত। সৌভাগ্যহৃদয়ে বলা হয়েছে—দেবেশি, চিদ্‌রূপিণী তোমার মধ্যে বর্ণ, পদ, মন্ত্র, কলা, তত্ত্ব এবং ভুবন—এই ছটি অধ্বা অবভাসিত হচ্ছে।[৯]

১ কৌ র, পৃঃ ৬৭, পাদটীকা

২ অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছন্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তি চাপরে। মম তত্ত্বং বিজানন্তো দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিতম্।
—কু ত, ১ম উল্লাস

৩ ত ত, পৃঃ ১৫৯

৪ কস্মাদিদং সমুদিতং জগদাড়ম্বরং মহৎ। কুত্র বা গচ্ছতি পুনঃ কুত্র সংস্থানমৃচ্ছতি।—ত্রি র, জ্ঞা খ, ১।৩১-৩২

৫ সা চ সৃষ্টিঃ দ্বেধা অর্থময়ী শব্দময়ী চেতি। চক্রময়ী দেহময়ী চেতি সৃষ্টিদ্বয়ং তু বালক্রীড়নকার্থে স্থূলগৃহসমানাকারত্বেন সূক্ষ্মগৃহনির্মাণতুল্যমর্থসৃষ্টাবেবান্তর্গতম্।—ব র, পৃঃ ৪৭

৬ অর্থময়ী শিবাদিক্ষিত্যন্তষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বরূপা। শব্দময়ী পরাদিবৈখর্যন্তা।—ঐ পৃঃ ৭

৭ চরাচরাত্মকমিদং শব্দার্থরূপং জগৎ।—শা তি ১।১

৮ তন্ত্রমতে জগৎ যেমন ষড়ধ্বাত্মক তেমনি জীবদেহও ষড়ধ্বময়। 'যতঃ ষড়ধ্বময়মেব শরীরম্'—
দ্রঃ শা তি ৫।১৫, ১৬-এর রাঘবভট্টকৃত টীকা।

৯ বর্ণঃ কলা পদং তত্ত্বং মন্ত্রো ভুবনমেব চ। ইত্যধ্বষট্‌কং দেবেশি ভাতি ত্বয়ি চিদাত্মনি।
—দ্রঃ কা বি, ষষ্ঠ শ্লোকের চিদ্‌বল্লী।

অধ্বা অর্থ পথ বা উপায়। ষড়ধ্বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের ছটি উপায়।

ষড়ধ্বার মধ্যে বর্ণ, পদ এবং মন্ত্রকে বলা হয় শব্দ বা বাক্ আর কলা, তত্ত্ব এবং ভুবনকে বলা হয় অর্থ।[১] ষড়ধ্বার অন্যভাবেও ভাগ করা হয়। বলা হয়েছে ষড়ধ্বা বাচকবাচ্যভেদে দ্বিবিধ। বর্ণ, পদ ও মন্ত্র বাচক আর কলা, তত্ত্ব ও ভুবন বাচ্য।[২]

ষড়ধ্বা শাক্ত দর্শনের আলোচ্য বিষয়। তা ছাড়া শাক্ত সাধকের পক্ষে ষড়ধ্বার জ্ঞান অত্যাবশ্যক। কেন না, তন্ত্রের নির্দেশ—ষড়ধ্বা, ষোড়শাধার, লিঙ্গত্রয় এবং ব্যোমপঞ্চক যিনি তত্ত্বতঃ অবগত হন তিনি পরমা গতি প্রাপ্ত হন।[৩]

ষোড়শাধার লিঙ্গত্রয় ব্যোমপঞ্চক—ষোড়শাধার বলতে বুঝায় মূলাধারচক্র, স্বাধিষ্ঠানচক্র মণিপূরচক্র অনাহতচক্র, বিশুদ্ধাখ্যচক্র, আজ্ঞাচক্র, বিন্দু, কলা, নিবোধিকা, অর্ধেন্দু, নাদ, নাদান্ত, উন্মনী, বিষ্ণুচক্র, ধ্রুবমণ্ডল ও শিব।[৪] দেহস্থ স্বয়ম্ভূলিঙ্গ, বাণলিঙ্গ ও ইতরলিঙ্গ এই তিনকে বলা হয় লিঙ্গত্রয়। আর ব্যোমপঞ্চক বলতে বুঝায় ব্যোম, মরুৎ, তেজ, অপ এবং ক্ষিতি এই পঞ্চমহাভূত।

শাক্ত দর্শনের প্রধান আলোচ্য—সাধারণতঃ ষড়ধ্বার মধ্যে ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বকে শাক্ত দর্শনের আলোচ্য বিষয় মনে করা হয়। নিত্যোৎসবে বলা হয়েছে ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বই শাক্তদর্শন বা ত্রৈপুরদর্শনের প্রমেয় পদার্থ।[৫] শুধু শাক্ত দর্শনের নয়, অদ্বৈত শৈব দর্শনেরও আলোচ্য ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্ব।[৬]

শব্দ ও অর্থ—ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্ব অর্থময়ী সৃষ্টি। আগে শব্দ পরে অর্থ। রাঘবভট্ট লিখেছেন শব্দব্রহ্মরূপিণী পরাশক্তি শব্দরূপকে ব্যাপ্ত করে অর্থরূপকে ব্যাপ্ত করেন।[৭] সমস্ত অর্থই শব্দের বাচ্য, প্রকাশ্য।[৮] শব্দ বাচক, প্রকাশক ; অর্থ বাচ্য, প্রকাশ্য।

অবশ্য শব্দ ও অর্থের মধ্যে কোনটি আগে কোনটি পরে নিশ্চয় করে বলা যায় না। কেন

১ বাক্ বর্ণপদমন্ত্ররূপা, অর্থঃ কলাতত্ত্বভুবনাত্মা।—কা বি, দ্বাদশ শ্লোকের চিদ্‌বল্লী।

২ অধ্বানো দ্বিবিধাঃ। বাচ্যবাচকভেদেন। বাচকো বর্ণপদমন্ত্রভেদেন ত্রিবিধঃ। বাচ্যং চ তত্ত্বভুবন-কলাভেদাৎ।—প্র সা ত ৪।৮-এর টীকা।

৩ ষড়ধ্বষোড়শাধারং ত্রিলিঙ্গং ব্যোমপঞ্চকম্। তত্ত্বতো যো বিজানাতি স যাতি পরমাং গতিম্।
—দ্রঃ কৌ র, ভূমিকা, পৃঃ ॥৵.

৪ মূলাধারং স্বাধিষ্ঠানং মণিপূরমনাহতম্। বিশুদ্ধমাজ্ঞাচক্রঞ্চ বিন্দুর্ভূয়ঃ কলাপদম্।
নিবোধিকা তথার্ধেন্দুর্নাদো নাদান্ত এব চ। উন্মনী বিষ্ণুচক্রঞ্চ ধ্রুবমণ্ডলিকঃ শিবঃ।
ইত্যেতৎ ষোড়শাধারং কথিতং যোগিদুর্লভম্।—দ্রঃ ষ নি, শ্লোক ৩৩-এর কালীচরণকৃত টীকা।

৫ ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বান্যেব এতদ্দর্শনপ্রমেয়জাতম্।—নিত্যোৎসব, পৃঃ ৮

৬ Mahāmāyā, P. 232 ৭ শা তি ১।১-এর টীকা।

৮ সর্বস্যাপ্যর্থস্য শব্দপ্রকাশ্যত্বনিয়মাৎ জ্ঞেয়া।—ঐ।

না, তন্ত্রমতে শব্দ এবং অর্থের মধ্যে কোনো ভেদ নেই।[১] শব্দ এবং অর্থ অভিন্নভাবে অবস্থিত একই আত্মার দুই রূপ।[২]

তবে ব্যবহারতঃ উভয়ের ভেদ স্বীকার করা হয় কিন্তু বলা হয় শব্দ এবং অর্থ শিবশক্তিময়, নিত্যযুক্ত।[৩] প্রকাশরূপ শিবাংশ থেকে হয়েছে অর্থসৃষ্টি আর বিমর্শরূপ শক্ত্যংশ থেকে শব্দ-সৃষ্টি।[৪] বায়বীয়সংহিতাতে বলা হয়েছে শঙ্করবল্লভা অশেষ শব্দরূপ এবং মৃগেন্দুশেখর অখিল অর্থরূপ ধারণ করেছেন।[৫]

তবে শারদাতিলকাদি[৬] তন্ত্রে দেখা যায় শব্দসৃষ্টির মুখ্যত্ব স্বীকার করে প্রথমে শব্দসৃষ্টির বিবরণ দিয়ে পরে অর্থসৃষ্টির বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

অর্থ দ্বিবিধ—অর্থ দ্বিবিধ স্থূল এবং সূক্ষ্ম। মনোগ্রাহ্য বাহ্য বস্তু বা বিষয় স্থূল অর্থ। সেই স্থূল অর্থের সংস্পর্শে এলে মন তদাকারে আকারিত হয়। মনের এই বৃত্তি বা বাহ্য অর্থের মানস আকার সূক্ষ্ম অর্থ। স্থূল অর্থকে সূক্ষ্ম অর্থেরই বাহ্য প্রক্ষেপণ বলা হয়।[৭]

মন যেমন একদিকে বিষয়াকারে আকারিত হয় তেমনি অন্যদিকে বিষয় গ্রহণও করে। মনের এই দুই রূপ। একরূপে সে গ্রাহক, অন্যরূপে গ্রাহ্য। মনের গ্রাহকরূপ শব্দ আর গ্রাহ্যরূপ অর্থ। কাজেই বলা যায় শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ গ্রাহক-গ্রাহ্য এবং ভোক্তা-ভোগ্যের সম্বন্ধ।[৮]

পূর্বেই লক্ষ্য করা গেছে তন্ত্রমতে এই চরাচর জগৎ শব্দার্থময়। শব্দসৃষ্টি আর অর্থসৃষ্টি হয় যুগপৎ পরস্পর সম্পৃক্তভাবে, যেমন সম্পৃক্ত থাকে অঙ্কুর আর তার ছায়া তেমনি করে।[৯]

তবে সূক্ষ্মভাবে দেখলে এর মধ্যেও পৌর্বাপর্য লক্ষ্য করা যায়। শব্দের পর অর্থ। বিশেষ করে আলোচনার ক্ষেত্রে এমনি ক্রম স্বীকার করতেই হয়।

শব্দসৃষ্টি :—

শিব ও শক্তি—অতএব শব্দসৃষ্টি নিয়েই আলোচনা সুরু করা যাক। শব্দসৃষ্টির মূলেও শিব ও শক্তি। শারদাতিলকে আছে সনাতন শিবের দুইরূপ—নির্গুণ আর সগুণ।

১ শব্দার্থয়োরভেদঃ।—শা তি ১।১-এর টীকা

২ একস্যৈবাত্মনো ভেদঃ শব্দার্থাবপৃথক্ স্থিতৌ —দ্রঃ ঐ।

৩ বাগর্থৌ নিত্যযুক্তৌ পরস্পরং শিবশক্তিময়াবেতৌ।—কা বি, ১২

৪ প্রকাশাংশস্তেবার্থসৃষ্টৌ বিমর্শাংশস্তৈব শব্দসৃষ্টৌ জনকত্বম্।—ব র, ৭০ সংখ্যক শ্লোকের টীকা।

৫ শব্দজাতমশেষন্তু ধত্তে শঙ্করবল্লভা। অর্থস্বরূপমখিলং ধত্তে মুগ্ধেন্দুশেখরঃ।—দ্রঃ শা তি ১।১

৬ দ্রঃ ঐ শ্লোকের রাঘবভট্টকৃত টীকা। ৭ S. S. pp. 501-505 ৮ Ibid, 506

৯ অর্থসৃষ্টিশব্দসৃষ্ট্যো যুগপদেবাঙ্কুরতচ্ছায়য়োরিব পরস্পরসংপৃক্তয়োরুৎপত্তিঃ। —শা তি ৩।১০-১১-এর সেতুবন্ধ

নির্গুণ শিব প্রকৃতি বা শক্তির সঙ্গে সম্বন্ধশূন্য আর সগুণ শিব সকল।[১] কলা অর্থ প্রকৃতি বা শক্তি। কাজেই সকল অর্থ সশক্তি।

নির্গুণ শিবও কিন্তু বস্তুতঃ শক্তিবিরহিত নন। কেন না শিবশক্তি অভিন্ন।[২] নির্গুণ শিবের সঙ্গে শক্তি এক হয়ে আছেন। এইজন্য তাঁকে শক্তিরহিত মনে হয়। আমরা পূর্বেও এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। নির্গুণ শিবের সঙ্গে একীভূত এই শক্তি বিশ্বোত্তীর্ণা অখণ্ডপরচিচ্ছক্তি।[৩]

শক্তি-নাদ-বিন্দু—তন্ত্রমতে শিবশক্তি (শিবশক্তিরূপ সগুণ ব্রহ্ম) শব্দার্থরূপ সৃষ্টির মূল কারণ। শারদাতিলকে বলা হয়েছে সচ্চিদানন্দবিভব সকল পরমেশ্বর থেকে শক্তি উদ্ভূত হলেন ; শক্তির থেকে নাদ এবং নাদের থেকে বিন্দুর উদ্ভব হল।[৪]

সকল শিব অর্থই ত সশক্তি শিব। তাঁর থেকে আবার শক্তির উদ্ভব হল এ কথার অর্থ কি ? রাঘবভট্ট লিখেছেন—মহাপ্রলয়ের সময় বিশ্ব শক্তিতে লীন হয়ে যায়। শক্তি তখন সূক্ষ্মাকারে চৈতন্যাধ্যাসিত হয়ে অবস্থান করেন। এই শক্তির গুণবৈষম্য অনুসারে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক স্রষ্টব্যপ্রপঞ্চকার্যসাধনে যে-উচ্ছূনাবস্থা তাকেই শক্তি, নাদ ও বিন্দুর উৎপত্তি বলা হয়। শক্তির উৎপত্তি ব্যাপারটা উপচার অর্থে গ্রহণ করতে হবে। অনাদি শক্তির উৎপত্তি কল্পিত বা আরোপিত। রাঘবভট্ট বলেছেন শারদাতিলকের গ্রন্থকার এ ক্ষেত্রে সৎকার্যবাদী সাংখ্যমতের অনুসরণ করেছেন।[৫]

শক্তির চৈতন্যাধ্যাস—এই যে শক্তির চৈতন্যাধ্যাসের কথা হল তা কিন্তু সবাই স্বীকার করেন না। কারণ শাক্তমতে শক্তি স্বরূপতঃ চিৎ, তিনি চিন্ময়ী। তিনি স্বতন্ত্রা। এই স্বাতন্ত্র্যের জন্য সৃষ্টিব্যাপারে স্বীয় স্বরূপ তিনি আচ্ছাদন করেন। কাজেই জীবের স্বরূপও আচ্ছাদন করেন। এমনি আচ্ছাদিতস্বরূপ অজ্ঞ মানুষ তাঁকে অচিৎ মনে করে।[৬] আর শক্তিকে অচিৎ মনে করলে পরেই তাঁর চৈতন্যাধ্যাসের কথা বলা চলে। নৈলে যিনি চিৎস্বরূপিণী তার আবার চৈতন্যাধ্যাস কি ?

গুণভেদে শক্তি-নাদ-বিন্দু—গুণের দিক্ দিয়ে বিচার করে শক্তিকে সাত্ত্বিক, নাদকে

১ নির্গুণঃ সগুণশ্চেতি শিবো জ্ঞেয়ঃ সনাতনঃ। নির্গুণঃ প্রকৃতেরন্যঃ সগুণঃ সকলঃ স্মৃতঃ।—শা তি ১।৬

২ নির্ধর্মকেঽপি ব্রহ্মণি স্বাভিন্নশক্ত্যঙ্গীকারাৎ।—বা বি ৩।১০–১১-এর সে ব। ৩ G. L., p. 110

৪ সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ। আসীচ্ছক্তিস্ততো নাদো নাদাদ্ বিন্দুসমুদ্ভবঃ।—শা তি ১।৭

৫ যা অনাদিরূপা চৈতন্যাধ্যাসেন মহাপ্রলয়ে সূক্ষ্মা স্থিতা তস্যা গুণবৈষম্যাদুন্মুখতয়া সাত্ত্বিক-রাজস-তামস স্রষ্টব্যপ্রপঞ্চকার্যসাধনে উচ্ছূনাবস্থাকেব উপচারাদুৎপত্তিঃ। ইয়ঞ্চ সদুৎপত্তিবাদিসাংখ্যমতমাশ্রিত্য গ্রন্থকারস্যোক্তিরিতি জ্ঞেয়ম্।—ঐ, টীকা ৬ G. L., p. 101

রাজসিক এবং বিন্দুকে তামসিক বলা হয়। সৃষ্টি প্রধানতঃ তমোগুণোদ্ভব। আর বিন্দু সৃষ্টির পূর্বোপযোগী অবস্থা।[১]

প্রকৃতি স্থূলশক্তি। প্রকৃতিই ত্রিগুণাত্মিকা। তবে ঊর্ধ্বতর সূক্ষ্ম শক্তিতেও গুণত্রয় সূক্ষ্মাকারে বিদ্যমান আছে।[২]

নাদ-বিন্দু—পূর্বেই বলা হয়েছে শক্তির থেকে নাদ এবং নাদের থেকে বিন্দুর উদ্ভব হয়। নাদই ঘনীভূত হয়ে বিন্দুতা প্রাপ্ত হয়।[৩] নাদ এবং বিন্দু শক্তিরই সৃষ্ট্যুপযোগী অবস্থামাত্র।[৪]

বীজ অঙ্কুরিত হবার ঠিক আগটাতে ফুলে উঠে। বীজের এই ফুলে-ওঠা অবস্থাকে বলা যায় তার উচ্ছ্বনাবস্থা। তেমনি নাদবিন্দু শক্তির সৃষ্ট্যুপযোগী উচ্ছ্বনাবস্থা।

নাদ—নাদ কথাটার সাধারণ অর্থ শব্দ। কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রে কথাটা পারিভাষিক অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। পরশিব বা পরাশক্তি নিষ্পন্দ, নিঃশব্দ। এই পরাশক্তি যখন সৃষ্ট্যুন্মুখী হন তখন সৃষ্টিমুখে তাঁর যে প্রথম স্পন্দ তাই নাদ। বস্তুতঃ অখণ্ড ব্যাপিকা চিৎশক্তিই নাদ[৫]। শব্দরূপে তিনিই প্রকাশিত হন। নাদরূপে যা কিছু শ্রুত হয় তা শক্তি।[৬]

নাদের থেকে যে বিন্দুর উদ্ভব হয় এই ব্যাপারটিকে তান্ত্রিক গুহ্য সাধনার সাঙ্কেতিক ভাষাতেও প্রকাশ করা হয়েছে। নাদকে বলা হয় শিবশক্তির মৈথুন এবং এই মৈথুন মহাকাল এবং মহাকালীর বিপরীত মৈথুন। প্রকৃত প্রস্তাবে মৈথুনের আনন্দস্পন্দনই (thrill) নাদ। নিষ্ক্রিয় শিব এবং সক্রিয় শক্তির সংযোগের পারিভাষিক নাম মৈথুন। এই মৈথুনের থেকে বিন্দু উৎপন্ন হয়।[৭]

বিন্দু—সব তন্ত্রে কিন্তু বিন্দুর পূর্ববর্তী নাদ স্বীকৃত নয়। প্রপঞ্চসারতন্ত্রে আছে- চিৎ-এর সান্নিধ্যহেতু তত্ত্বসংজ্ঞা চিন্মাত্রা শক্তির সৃষ্টির ইচ্ছা হলে তিনি ঘনীভূতা হয়ে বিন্দুরূপ প্রাপ্ত হন।[৮]

১ G. L., p p. 130—131 ২ Ibid, p. 130

৩ নাদ এব ঘনীভূতঃ কচিদভ্যেতি বিন্দুতাম্।—ত্রঃ ষ নি, শ্লোক ৩৯-এর কালীচরণকৃত টীকা।

নাদ ঘনীভূত হয়ে বিন্দুতা প্রাপ্ত হয় এই ব্যাপারটির অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়। শক্তির থেকেই নাদ বা শব্দের উদ্ভব হয়। লয়যোগসাধক যখন শব্দধারণা অভ্যাস করেন তখন শব্দের মধ্যে ক্রমে মন স্থির হয়ে গেলে তিনি বিন্দুতে উপনীত হন। "শব্দ বস্তুতঃ ক্রিয়ার ধারা। সুতরাং শব্দে চিত্ত স্থির হইলে দৈশিক বিস্তারজ্ঞান লোপ হয়। তাহাই বিন্দু। শব্দের বিস্তারহীন মানসিক ভাবনাই বিন্দু"।—ক পা যো, পৃঃ ১৯৪

৪ তস্যা এব নাদবিন্দু সৃষ্ট্যুপযোগাবস্থারূপৌ।— শা তি ১।৭ শ্লোকের টীকা ৫ The Yantram, p. 12

৬ যৎকিঞ্চিন্নাদরূপেণ শ্রূয়তে শক্তিরেব সা।—হ প্র ৪।১০২ ৭ G. L., p. 110

৮ সা তত্ত্বসংজ্ঞা চিন্মাত্রা জ্যোতিষঃ সন্নিধেস্তদা।
বিচিকীর্ষু ঘনীভূতা ক্বচিদভ্যেতি বিন্দুতাম্।—প্র সা ত ১।৪১

এইজন্য বিন্দুকে বলা হয় পূর্ণা সংসাধিকা চিৎশক্তি।[১] বিন্দু থেকেই বিশ্বের বিকাশ, বিন্দুই চিৎশক্তির প্রথম সুস্পষ্ট ক্রিয়ারূপ। সেইজন্য বিন্দুর লক্ষণ ক্রিয়াপ্রাধান্য।[২] আবার বিন্দুকে পূর্ণা সংরোধিকা চিৎশক্তিও বলা হয়।[৩] কেন না প্রলয়ে সমস্ত জগৎ বিন্দুতে লয়প্রাপ্ত হয়। বিন্দুকে পরব্রহ্মও বলা হয়েছে।[৪] তোড়লতন্ত্রে আছে—নিরাকার পরজ্যোতিকে বলা হয় অব্যয় বিন্দু। বিন্দু শব্দ শূন্যবাচক এবং গুণবাচক।[৫]

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় শব্দসৃষ্টির সকল শিব, শক্তি, নাদ এবং বিন্দু যথাক্রমে অর্থসৃষ্টির শিবতত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব, সদাশিবতত্ত্ব এবং ঈশ্বরতত্ত্ব।[৬]

বিন্দু-নাদ-বীজ—পূর্বোক্ত বিন্দু ত্রিধা ভিন্ন হয়ে যায়। শারদাতিলকে আছে[৭] সাক্ষাৎ পরশক্তিময় বিন্দু ত্রিধা ভিন্ন হয়ে বিন্দু, নাদ এবং বীজ নামে অভিহিত হয়। বিন্দু শিবাত্মক, বীজ শক্ত্যাত্মক এবং তাদের পরস্পরের ক্ষোভ্যক্ষোভকসম্বন্ধ নাদ। সহজকথায় শিবশক্তির সংযোগ নাদ। নাদ শিবশক্ত্যাত্মক।

এই নাদ এবং বিন্দু প্রথমোক্ত নাদ এবং বিন্দু থেকে পৃথক্। এই নাদবিন্দু প্রথমোক্ত নাদবিন্দুর কার্যরূপ।[৮] অর্থাৎ প্রথমোক্ত নাদবিন্দু কারণ এবং পরবর্তী নাদবিন্দু কার্য। প্রথমোক্ত নাদকে পরনাদ এবং বিন্দুকে পরবিন্দু বা মহাবিন্দু বলা হয়। পরবর্তী নাদকে বলা হয় অপরনাদ এবং বিন্দুকে অপরবিন্দু।

কারণবিন্দু থেকে কার্যবিন্দু-আদির উৎপত্তি সম্বন্ধে আচার্য ভাস্কররায় লিখেছেন—এই কারণবিন্দু থেকে ক্রমে কার্যবিন্দু, নাদ এবং বীজ এই তিন উৎপন্ন হয়।[৯]

১ The Yantram, p. 12

২ অভিব্যক্তা পরা শক্তিঃ...এবাত্তি বিন্দুতাবক ক্রিয়াপ্রাধান্যলক্ষণম্।—শা তি ১।৭-এর টীকা

৩ The Yantram, p. 12

৪ পরব্রহ্মৈব বিন্দুঃ।—বা নি ৩।১০-১১-এর সে ব

৫ নিরাকারং পরং জ্যোতির্বিন্দুকাব্যয়সংজ্ঞকম্।
বিন্দুশব্দেন শূন্যং স্যাৎ তথা চ গুণসূচকম্।—ব্রঃ ব নি ৪১ সংখ্যক শ্লোকের টীকা

৬ S. P. p. 41

৭ পরশক্তিময়ঃ সাক্ষাৎ ত্রিধাঽসৌ ভিদ্যতে পুনঃ।
বিন্দুর্নাদো বীজমিতি তস্য ভেদাঃ সমীরিতাঃ।
বিন্দুঃ শিবাত্মকো বীজং শক্তির্নাদস্তয়োর্মিথঃ।
সমবায়ঃ সমাখ্যাতঃ সর্বাগমবিশারদৈঃ।—শা তি ১।৮-৯

৮ ঐ ১।৮-এর টীকা

৯ অস্মাচ্চ কারণবিন্দোঃ সকাশাৎ ক্রমেণ কার্যবিন্দুস্ততো নাদস্ততো বীজমিতি ত্রয়মুৎপন্নম্।—ল স, পৃঃ ৯৯

তিনি দেখিয়েছেন[১] কারণবিন্দু, কার্যবিন্দু নাদ এবং বীজ এই চতুষ্টয়ের অধিদৈবত, অধিভূত এবং অধ্যাত্ম ভেদে পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞা আছে। যথা—

	অধিদৈবত	অধিভূত	অধ্যাত্ম
কারণবিন্দু—	অব্যক্ত, শান্তা, অম্বিকা।	কামরূপপীঠ	শক্তিপিণ্ড, কুণ্ডলিনী, পরা বাক্, পরাশব্দ
কার্যবিন্দু—	ঈশ্বর, বামা, ইচ্ছা	পূর্ণগিরিপীঠ	পশ্যন্তী
নাদ—	হিরণ্যগর্ভ, জ্যেষ্ঠা, জ্ঞান	জালন্ধরপীঠ	মধ্যমা
বীজ—	বিরাট, রৌদ্রী, ক্রিয়া	ওড্যাণপীঠ	বৈখরী

অধিদৈবত-সংজ্ঞা সম্বন্ধে কিন্তু মতভেদ আছে। শারদাতিলকে বলা হয়েছে[২]— বিন্দু থেকে রৌদ্রী জাত হলেন, নাদ থেকে জ্যেষ্ঠা এবং বীজ থেকে বামা। এই শক্তিত্রয় থেকে যথাক্রমে রুদ্র, ব্রহ্মা এবং রমাধিপ উৎপন্ন হলেন।

এই মতের সমর্থনে রাঘবভট্ট প্রয়োগসারের বচন উদ্ধার করেছেন। তাতেও এই কথাই বলা হয়েছে।[৩]

এ সম্বন্ধে আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় আছে। আচার্য ভাস্কররায় এই আলোচনায় অধিদৈবত-শক্তির ক্রমনির্দেশ করেছেন শান্তা—বামা—জ্যেষ্ঠা—রৌদ্রী এবং অম্বিকা—ইচ্ছা—জ্ঞান—ক্রিয়া এইভাবে। কিন্তু তিনি অন্যত্র[৪] লিখেছেন ইচ্ছাদি শক্তি অর্থাৎ ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া এই তিন শক্তি শান্তা থেকে উদ্ভূত এবং বামাদি শক্তি অর্থাৎ বামা, জ্যেষ্ঠা এবং রৌদ্রী এই তিন শক্তি অম্বিকা থেকে উদ্ভূত। কাজেই শক্তির নামের ক্রম দাঁড়ায় শান্তা—ইচ্ছা—জ্ঞান—ক্রিয়া এবং অম্বিকা—বামা—জ্যেষ্ঠা—রৌদ্রী। এ ছাড়া আরেক জায়গায়[৫] পরমা শক্তির শৃঙ্গাটবপু অর্থাৎ ত্রিকোণাকার বপুর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি ত্রিকোণের তিন রেখা ও তিন বিন্দুর যথাক্রম নির্দেশ করেছেন এইভাবে—ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াশান্তা, বামাজ্যেষ্ঠারৌদ্রীঅম্বিকা এবং পরাপশ্যন্তীমধ্যমাবৈখরী। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ও লিখেছেন[৬]

১ এতে চ কারণবিন্দ্বাদয়শ্চত্বারোঽধিদৈবতমব্যক্তেশ্বরহিরণ্যগর্ভবিরাট্স্বরূপাঃ, শান্তাবামাজ্যেষ্ঠারৌদ্রীরূপাঃ, অম্বিকেচ্ছাজ্ঞানক্রিয়ারূপাশ্চ। অধিভূতং তু কামরূপপূর্ণগিরিজালন্ধরোড্যাণপীঠরূপা ইতি তু নিত্যাহৃদয়ে স্পষ্টম্। অধ্যাত্মং তু কারণবিন্দুঃ শক্তিপিণ্ডকুণ্ডল্যাদিশব্দবাচ্যঃ।—স স, সৌ ভা, পৃঃ ৯৯

২ রৌদ্রী বিন্দোস্ততো নাদাজ্জ্যেষ্ঠা বীজাদজায়ত।
বামা তাভ্যঃ সমুৎপন্না রুদ্রব্রহ্মরমাধিপাঃ।—শা তি ১।১০

৩ রৌদ্রী বিন্দোঃ সমুদ্ভূতা জ্যেষ্ঠা নাদাদজায়ত।
বামা বীজাদভূচ্ছক্তিস্তাভ্যো দেবাস্ত্রয়োঽভবন্।—প্রয়োগসারবচন, দ্রঃ শা তি ১।১০-এর টীকা

৪ বা নি, ৩।৩৬-এর সেতু ৫ ঐ পৃঃ ২১১ ৬ শক্তিসাধনা, ক প অ, পৃঃ ৫৭-৫৮

শান্তাশক্তি ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়ারূপে আবির্ভূতা হন আর অম্বিকাশক্তি বামা-জ্যেষ্ঠা-রৌদ্রীরূপে। বামকেশ্বরতন্ত্রেও শক্তির আবির্ভাবের অম্বিকা-বামা-জ্যেষ্ঠা-রৌদ্রী এই নাম-ক্রম নির্দিষ্ট হয়েছে।[১]

কাজেই বলতে হয় আলোচ্য টীকায় হয় লিপিকরপ্রমাদ ঘটেছে, নয় ভাস্কররায় এমন বিশেষ কোনো পরম্পরার অনুসরণ করেছেন যা বামকেশ্বরতন্ত্রের টীকায় অনুসৃত পরম্পরা থেকে পৃথক্। এই বিষয়ে চূড়ান্ত মীমাংসার ভার যোগ্যতর ব্যক্তির উদ্দেশ্যে ন্যস্ত করে প্রস্তুত বিষয়ের অনুসরণ করা যাক।

শব্দব্রহ্ম— কারণবিন্দুর কথা হচ্ছিল। ভাস্কররায় লিখেছেন—অবিভক্ত কারণবিন্দু কার্যবিন্দ্বাদিজননোন্মুখ হয়ে ভিন্ন হয়ে যায় এবং সেই অবস্থায় রব বা শব্দ উৎপন্ন হয়। এই রব বা শব্দকে বলা হয় অব্যক্তাত্মক শব্দব্রহ্ম।[২]

প্রপঞ্চসারতন্ত্রে এই কথার সমর্থন আছে—সেই ভিদ্যমান বিন্দু থেকে অব্যক্তাত্মক রব উৎপন্ন হয়। শ্রুতিবিশারদ পণ্ডিতেরা তাকে বলেন শব্দব্রহ্ম।[৩]

পরাবাক্— ভাস্কররায় লিখেছেন কারণবিন্দ্বাত্মক এই রব সর্বগত হলেও ব্যঞ্জকযত্নসংস্কৃত বায়ুর জন্য জীবদেহে মূলাধারেই অভিব্যক্ত হয়।[৪] মূলাধারে অভিব্যক্ত এই রব বা শব্দব্রহ্ম নিস্পন্দ। একে বলা হয় পরাবাক্;[৫] এটি হল শব্দের প্রথম স্তর।

পশ্যন্তীবাক্— এই রব নাভিপর্যন্ত আগত পূর্বোক্ত বায়ুর দ্বারা অভিব্যক্ত এবং বিমর্শরূপী মনের সঙ্গে যুক্ত হয়। তখন সে কার্যবিন্দুময় হয়ে যায় এবং সামান্যস্পন্দরূপে ব্যক্ত হয়। এই অবস্থায় আলোচ্য রব বা শব্দব্রহ্মের নাম হয় পশ্যন্তীবাক্।[৬] এটি শব্দের দ্বিতীয় স্তর।

পশ্যন্তীবাক্ কার্যবিন্দুময় কি না এ বিষয়ে মতভেদ আছে। পদ্মপাদাচার্য পশ্যন্তীকে নাদতত্ত্বাত্মিকা এবং মধ্যমাকে বিন্দুতত্ত্বাত্মিকা বলেছেন।[৭]

১ দ্রঃ বা বি ৬।৩৬-৪০

২ সোঽয়মবিভাগাবস্থঃ কারণবিন্দুঃ। অয়মেব চ যদা কার্যবিন্দ্বাদিত্রয়জননোন্মুখো ভিদ্যতে তদশায়ামব্যক্তঃ শব্দব্রহ্মাভিধেয়ো রবস্তত্রোৎপদ্যতে।—ল স, সৌ ভা, পৃঃ ৯৯

৩ বিন্দোস্তস্মাদ্ভিদ্যমানাদ্রবোঽব্যক্তাত্মকো ভবেৎ।
স রবঃ শ্রুতিসম্পন্নৈঃ শব্দব্রহ্মেতি কথ্যতে।—প্র সা ত ১।৪৩

৪ সোঽয়ং রবঃ কারণবিন্দুতাদাত্ম্যাপন্নত্বাৎসর্বগতোঽপি ব্যঞ্জকযত্নসংস্কৃতপবনবশাৎ প্রাণিনাং মূলাধার এবাভিব্যজ্যতে।— ল স, সৌ ভা, পৃঃ ৯৯

৫ তদিদং কারণবিন্দ্বাত্মকমভিব্যক্তং শব্দব্রহ্ম স্বপ্রতিষ্ঠিতয়া নিস্পন্দং তদেব চ পরাবাগিত্যুচ্যতে।—ঐ

৬ অথ তদেব নাভিপর্যন্তমাগচ্ছতা তেন পবনেনাভিব্যক্তং বিমর্শরূপেণ মনসা যুক্তং সামান্যস্পন্দপ্রকাশরূপকার্যবিন্দুময়ং সৎ পশ্যন্তীবাগুচ্যতে।—ঐ

৭ প্র সা ত ২।৪৩-এর টীকা

পশ্যন্তীবাকের অভিব্যক্তি-স্থান সম্বন্ধে ভাস্কররায় নিত্যাতন্ত্রের যে-বচন উদ্ধৃত করেছেন তাতে দেখা যায় মূলাধারে সমুৎপন্ন হয় পর নামক নাদ অর্থাৎ রব। সেই নাদ ঊর্ধ্বে নীত হয়ে স্বাধিষ্ঠানে অভিব্যক্ত হয় এবং পশ্যন্তী আখ্যা লাভ করে।[১]

মধ্যমাবাক্—ভাস্কররায় বলেন পশ্যন্তীরূপে অভিব্যক্ত হওয়ার পর শব্দব্রহ্ম উল্লিখিত বায়ুর দ্বারাই হৃদয়ে অভিব্যক্ত হয়ে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত হয়। তখন সে নাদময় হয়ে যায় এবং বিশেষস্পন্দরূপে প্রকাশিত হয়। এই অবস্থায় তার নাম হয় মধ্যমা।[২] এটি শব্দের তৃতীয় স্তর।

বৈখরীবাক্— এর পর সেই রব বা শব্দব্রহ্ম সেই বায়ুর দ্বারাই মুখ পর্যন্ত নীত হয় এবং কণ্ঠাদিস্থানে অকারাদি বর্ণরূপে সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত হয়ে সাধারণ কর্ণগোচর হয়। এই অবস্থায় তার নাম হয় বৈখরী। বৈখরী বীজাত্মিকা।[৩] এটি শব্দের চতুর্থ স্তর।

পরাশক্তি পরাদি বাগ্‌রূপে প্রকাশিতা—একই পরাশক্তি পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা এবং বৈখরী বাগ্‌রূপে প্রকাশিত হয়েছেন। বামকেশ্বরতন্ত্রে বলা হয়েছে[৪]— পরাশক্তি যখন নিজের[৫] অথবা পরম শিবের স্ফুরণ অবলোকন করেন তখন অম্বিকারূপ প্রাপ্ত হন এবং পরাবাক্ নামে অভিহিত হন।
তারপর যখন স্বগতান্তর্গত-বীজভাবে অবস্থিত বিশ্বকে ব্যক্তকরণে উদ্যত হন এবং বাইরে তাকে নিঃসারিত করেন তখন বিশ্বকে বমনের জন্য তাঁকে অঙ্কুশাকারপ্রাপ্তা বামা বলা হয়।[৬]

বামারূপিনী পরাশক্তিই যখন ইচ্ছাশক্তি হন তখন তাঁকে পশ্যন্তীবাক্ বলা হয়। তিনিই জ্যেষ্ঠা এবং জ্ঞানশক্তিরূপিণী মধ্যমাবাক্। তিনি ঋজুরেখাময়ী এবং বিশ্বস্থিতির জন্য জ্ঞানাদিশব্দবাচ্যা।[৭] রৌদ্রী এবং ক্রিয়াশক্তিরূপে তিনিই বিশ্ববিগ্রহা বৈখরীবাক্।[৮]

---

১ মূলাধারে সমুৎপন্নঃ পরাখ্যো নাদসম্ভবঃ। স এবোর্ধ্বতয়া নীতঃ স্বাধিষ্ঠানে বিজৃম্ভিতঃ।
পশ্যন্ত্যাখ্যামবাপ্নোতি ···।—নিত্যাতন্ত্রবচন, দ্রঃ ল স, সৌ ভা, পৃঃ ৯৯

২ অথ তদেব শব্দব্রহ্ম তেনৈব বায়ুনা হৃদয়পর্যন্তমভিব্যজ্যমানং নিশ্চয়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা যুক্তং বিশেষস্পন্দপ্রকাশরূপনাদময়ং সন্মধ্যমাবাগিত্যুচ্যতে।—ল স, সৌ ভা, পৃঃ ৯৯

৩ অথ তদেব বদনপর্যন্তং তেনৈব বায়ুনা কণ্ঠাদিস্থানেষভিব্যজ্যমানমকারাদিবর্ণরূপপরশ্রোত্রগ্রহণযোগ্যস্পষ্টতরপ্রকাশরূপবীজাত্মকং সদ্ বৈখরীবাগুচ্যতে।—ঐ

৪ আত্মনঃ স্ফুরণং পশ্যেদ্ যদা সা পরমা কলা। অম্বিকারূপমাপন্না পরা বাক্ সমুদীরিতা।—বা দি ৩।৩৩

৫ সর্বাতিশায়ী পরিপূর্ণরূপবাক্স্ফুরণাবলোকনচতুরা।—কা বি, ২৩-এর টিপ্পনী

৬ বীজভাবস্থিতং বিশ্বং স্ফুটীকর্তুং যদোন্মুখী। বামা বিশ্বস্য বমনাদঙ্কুশাকারতাং গতা।—বা দি ৩।৩৭

৭ ইচ্ছাশক্তিস্তদা সেয়ং পশ্যন্তী বপুষা স্থিতা। জ্ঞানশক্তিস্তথা জ্যেষ্ঠা মধ্যমা বাগুদীরিতা।
ঋজুরেখাময়ী বিশ্বস্থিতৌ প্রথিতবিগ্রহা।—বা দি ৩।৩৮-৩৯

৮ ক্রিয়াশক্তিস্তু রৌদ্রীয়ং বৈখরী বিশ্ববিগ্রহা।—ঐ ৩।৪০

পরা—আগমে আছে পরাবাক্ জ্যোতিঃস্বরূপা, অব্যক্তা, এবং অবিনাশিনী। তাঁর স্বরূপের জ্ঞান হলে সমস্ত কর্তব্যের অবসান হয়।[১]

পশ্যন্তী—সৌভাগ্যসুধোদয়ে বলা হয়েছে সমস্তই নিজের মধ্যে অবলোকন করেন বলে শক্তিকে বলা হয় পশ্যন্তী। আবার সমস্ত করণকে অতিক্রম করে বিরাজ করছেন বলে মাতা পশ্যন্তীকে উত্তীর্ণাও বলা হয়।[২] পশ্যন্তীর অন্যরকম ব্যাখ্যাও লক্ষ্য করা যায়। পদ্মপাদাচার্য লিখেছেন সামান্যস্পন্দপ্রকাশরূপিণী শক্তিকে সামান্যজ্ঞানাত্মকতার জন্য পশ্যন্তী বলা হয়।[৩]

মধ্যমা—পশ্যন্তী এবং বৈখরীর মধ্যে অবস্থিতা বাক্ মধ্যমা।[৪] পদ্মপাদাচার্যের ব্যাখ্যা—যিনি মধ্যে আছেন এবং বুদ্ধির সঙ্গে যিনি যুক্ত তিনি মধ্যমা।[৫] আবার মধ্যমাকে পরা ও পশ্যন্তীর সমরসাবস্থাও বলা হয়।[৬]

মধ্যমার দুই রূপ—স্থূল আর সূক্ষ্ম। সূক্ষ্মরূপে মধ্যমা নবনাদময়ী; স্থূলরূপে নববর্গাত্মিকা এবং ভূতলিপি নামে খ্যাত।[৭]

নবনাদ—নবনাদের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে মূলাধার থেকে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত ব্যাপিনী কুলকুণ্ডলিনীর স্বরূপ নাদাত্মক। কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হলে দশবিধ নাদ জাত হয়। যথা—চিনি, চিনি চিনি, ঘণ্টানাদ, শঙ্খনাদ, তন্ত্রীনাদ, করতালনাদ, বেণুনাদ, ভেরীনাদ, মৃদঙ্গনাদ এবং মেঘনাদ।[৮] সাধনার বেলা নবম নাদকে বাদ দেওয়া হয়।[৯] তা হলে নাদসংখ্যা দাঁড়ায় নয়। অতএব মধ্যমা নবনাদময়ী।

লক্ষ্মীধর কিন্তু অ ক চ ট ত প য শ ক্ষ এই নব বর্ণকেই নবনাদ বলেছেন।[১০]

---

১ স্বরূপজ্যোতিরেবান্তঃ পরাবাগনপায়িনী।
যস্যাং দৃষ্টস্বরূপায়ামধিকারো নিবর্ততে।—দ্রঃ কা বি ২০-এর চিদ্বল্লী

২ পশ্যতি সর্বং স্বাত্মনি করণানাং সরণিমপি যদুত্তীর্ণা।
তেনেয়ং পশ্যন্তীত্যুত্তীর্ণেত্যপ্যুদীর্যতে মাতা।—সৌভাগ্যসুধোদয়বচন, দ্রঃ ল স, সৌ ভা, পৃঃ ১০০

৩ প্র সা ত, ২।৪৩-এর টীকা

৪ মধ্যে স্থিতা মধ্যমা।—ল স, সৌ ভা, পৃঃ ১০০

৫ মধ্যে যা বুদ্ধিযুক্তা সা মধ্যমা।—প্র সা ত ২।৪৩-এর টীকা

৬ মধ্যমা পরাপশ্যন্ত্যোঃ সমরসাবস্থা।—কা বি, ২৩-এর চিদ্বল্লী

৭ দ্বিবিধা হি মধ্যমা সা সূক্ষ্মা স্থূলাকৃতিস্থিতা সূক্ষ্মা।
নবনাদময়ী স্থূলা নববর্গাত্মা চ ভূতলিপ্যাখ্যা।—কা বি, ২৭

৮ দ্রঃ ঐ, চিদ্বল্লী ৯ নবমং পরিত্যজ্য দশমমেবাভ্যসেৎ।—ঐ

১০ নবনাদময়ীতি—নবনাদাঃ অ-ক-চ-ট-ত-প-য-শ-ক্ষাঃ।—সৌ ল, ৩৪ সংখ্যক শ্লোকের টীকা

নববর্গ—বর্ণমালাকে নয়টি বর্গে ভাগ করা হয়। চিদ্বল্লী[১] অনুসারে এই বর্গ—অ ক চ ট ত প য শ এবং ল। আবার স্বরবর্ণকে দুটি বর্গে ভাগ করে এবং বাকী বর্ণগুলিকে ক চ ট ত প য এবং শ এই সাতটি বর্গে ভাগ করেও নয়টি বর্গ করা হয়।

ভূতলিপি—যে-লিপি বা অক্ষর চেষ্টাবিশেষের দ্বারা উচ্চারিত হবার ধর্মবিশিষ্ট তাকে বলা হয় ভূতলিপি।[২]

কাজেই দেখা যাচ্ছে সূক্ষ্মমধ্যমা অন্তর্মুখ যোগীদেরই অনুভবগম্যা। স্থূলমধ্যমা বর্ণাবলীরূপে অবস্থিত বলে পণ্ডিতমূর্খনির্বিশেষে সবারই উচ্চারণযোগ্যা।[৩] লক্ষণীয় মধ্যমারূপে বর্ণগুলি কল্পনামাত্র বা মানসব্যাপারমাত্র; উচ্চারিত হলে তখন বৈখরী হয়ে যায়।

সূক্ষ্মমধ্যমা আর স্থূলমধ্যমার মধ্যে বস্তুতঃ কোনো ভেদ নাই। কেন না উভয়ের সম্বন্ধ হেতুহেতুমানের সম্বন্ধ। সূক্ষ্মমধ্যমা কারণ এবং স্থূলমধ্যমা কার্য।[৪]

বৈখরী— বৈখরীশব্দের বিভিন্ন ব্যাখ্যা আছে। পদ্মপাদাচার্য লিখেছেন বিশেষরূপে খরত্বের (কঠিনত্বের) জন্য বাক্‌কে বৈখরী বলা হয়।[৫] যোগশাস্ত্রের অভিমত বিখর নামক প্রাণ অর্থাৎ বায়ুদ্বারা প্রেরিতা বলে বাক্‌কে বলা হয় বৈখরী।[৬] সৌভাগ্যসুধোদয়ে বলা হয়েছে বৈ অর্থাৎ নিশ্চিতরূপে খ অর্থাৎ কর্ণবিবরে রাতি অর্থাৎ গমন করে বলে বাক্‌কে বৈখরী বলে।[৭]

জগৎপ্রপঞ্চ অ থেকে ক্ষ পর্যন্ত অক্ষররাশিময়। অক্ষররাশিরূপিণী বৈখরী এই জগৎ প্রপঞ্চের নির্মাত্রী, সর্বশব্দাত্মিকা।[৮]

সাধারণ মানুষ এই বৈখরীবাক্‌কেই জানে, এইটিই তার ভাষা। বর্ণ-পদ- ও বাক্য-রূপে এই ভাষার প্রকাশ। তবে তন্ত্রশাস্ত্রে বর্ণ পদ বাক্য এই কথাগুলি শুধু বৈখরী সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হয় না। রাঘবভট্ট পশ্যন্তীকে বলেছেন বর্ণরূপা, মধ্যমাকে পদরূপা এবং বৈখরীকে বাক্যরূপা।[৯]

১ কা বি, ২৭-এর চিদ্বল্লী।

২ ভূতাশ্চ তে লিপয়শ্চ ভূতলিপয়ঃ। অত্র লিপীনাং ভূতত্বং নাম চেষ্টাবিশেষাকারবিভাসাভিব্যঞ্জ্যত্বম্। ঐ

৩ ঐ

৪ আভা কারণমস্যা কার্যং স্থনয়োর্যতস্ততো হেতোঃ।
সৈবেয়ং নহি ভেদস্তাদাত্ম্যাং হেতুহেতুমত্তাদৃষ্টম্।—কা বি, ২৮

৫ বিশেষেণ খরত্বাবৈখরী।—প্র সা ত ২।৪৩-এর টীকা

৬ প্রাণেন বিখরাখ্যেন প্রেরিতা বৈখরী পুনরিতি।—দ্রঃ ল স, সৌ ভা, ১০০

৭ বৈ নিশ্চয়েন খং কর্ণবিবরং রাতি গচ্ছতি ইতি।—দ্রঃ ঐ

৮ আদিক্ষান্তাক্ষররাশিময়াখিলপ্রপঞ্চনির্মাত্রী সর্বশব্দাত্মিকা বৈখরী।—কা বি, ৩২-এর চিদ্বল্লী

৯ শা তি ১।১-এর টীকা।

বৈখরী থেকে পরা পর্যন্ত শব্দের ক্রমসূক্ষ্ম স্তর বা অবস্থা সূচিত হয়েছে। বৈখরী স্থূল, মধ্যমা সূক্ষ্ম, পশ্যন্তী সূক্ষ্মতর এবং পরা সূক্ষ্মতম।[১]

বৈখর্য্যাদির জাগ্রদাদি অবস্থা—তন্ত্রে বৈখর্য্যাদি বাকের জাগ্রদাদি অবস্থার কথাও বলা হয়েছে। বীজরূপা বৈখরী, বাকের জাগ্রদবস্থা; বিন্দুরূপা মধ্যমা, বাকের স্বপ্নাবস্থা; নাদরূপা পশ্যন্তী, বাকের সুষুপ্ত্যবস্থা এবং শক্তিরূপা পরা, বাকের তুরীয়াবস্থা।[২]

স্থূলাদি শরীর—আবার বৈখর্য্যাদি-বাকের স্থূলাদি শরীরও কল্পিত হয়। বৈখরীর স্থূল-শরীর (বিরাট্), মধ্যমার সূক্ষ্ম-শরীর বা লিঙ্গশরীর (হিরণ্যগর্ভ), পশ্যন্তীর কারণ-শরীর[৩] (ঈশ্বর) এবং পরার মহাকারণ-শরীর। জীবের তুরীয়-অবস্থার শরীরকে মহাকারণ-শরীর বলা হয়।[৪] কাজেই তুরীয়-অবস্থায় বাকেরও মহাকারণ-শরীর সিদ্ধান্ত হয়।

শব্দব্রহ্মের উদ্ভব সম্বন্ধে আচার্য ভাস্কররায় প্রধানতঃ প্রপঞ্চসারতন্ত্রের মত অনুসরণ করেছেন। এ বিষয়ে শারদাতিলকেরও একই মত। তাতেও দেখা যায়— ভিদ্যমান পরবিন্দু থেকে অব্যক্তাত্মা রব উত্থিত হল। সর্বাগমবিশারদ পণ্ডিতগণ তাকে শব্দব্রহ্ম বলেন।[৫]

নাদব্রহ্ম—এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রাঘবভট্ট লিখেছেন শক্ত্যবস্থারূপ যে প্রথম বিন্দু তার থেকেই অব্যক্তাত্মা বর্ণাদিবিশেষরহিত অখণ্ড নাদমাত্র উৎপন্ন হল। এই নাদই শব্দব্রহ্ম। একে নাদব্রহ্মও বলা হয়।[৬] এখানে নাদ অর্থ শব্দ। নাদ বা নাদব্রহ্ম সমস্ত শব্দের (কার্যরূপ শব্দের) উৎপত্তির কারণ।[৭] পূর্বোক্ত পরাদি বাক্ নাদেরই চতুর্বিধ রূপ।[৮]

কাজেই নাদ আদিশব্দ (Primordial Sound); এ শব্দ দিব্যকর্ণগোচর,[৯] স্থূল-কর্ণগোচর নয়।

১ বৈখরীতোঽপি সূক্ষ্মসূক্ষ্মতরসূক্ষ্মতমানাং মধ্যমাপশ্যন্তীপরারূপাণাং ত্রিবিধবর্ণানাং সত্ত্বাৎ।
—বা নি ৩।১০-১১-এর সে ব

২ (i) প্র সা ত ১৯।৪৭-এর পদ্মপাদাচার্যকৃত টীকা (ii) G. L., p. 209 ৩ G. L. p. 209.

৪ ততঃ মহাকারণশরীরাভিমানী জীবঃ তুর্যঃ।—ল স, সৌ ভা, পৃঃ ১৮

৫ ভিদ্যমানাৎ পরাদ্ বিন্দোরব্যক্তাত্মা রবোঽভবৎ।
শব্দব্রহ্মেতি তং প্রাহুঃ সর্বাগমবিশারদাঃ।—শা তি ১।১১-১২

৬ স্ফুটিতাদরূপাদ্বিন্দোর্নাদব্রহ্মাত্মকো রবো ব্যক্তঃ।—কা বি, ৯

৭ নাদঃ সর্বশব্দোৎপত্তির্হেতুর্বর্ণঃ, স এব শব্দব্রহ্ম।—কা বি, ৯-এর টিপ্পনী

৮ নাদঃ পরাপশ্যন্তীমধ্যমাবৈখরীরূপেণ চতুর্বিধঃ।—সৌ ল, ৪১ সংখ্যক শ্লোকের লক্ষ্মীধরকৃত টীকা

৯ Mahāmāyā, p. 61.

অনাহত নাদ—শাস্ত্রে আছে এক অখণ্ড নাদাত্মক শব্দ সমস্ত শব্দরূপে বিভক্ত হয়। এই নাদ অনন্তমিতস্বভাব বলে অর্থাৎ কখনো লোপ পায় না বলে একে অনাহত নাদ বলা হয়।[১] অবশ্য সাধারণতঃ একে অনাহত নাদ বলা হয় এইজন্য যে এই নাদ এক বস্তুর সঙ্গে অন্য বস্তুর আঘাতে উৎপন্ন নয়।

এই অনাহত নাদ বা শব্দব্রহ্মই শাস্ত্রনির্দিষ্ট ওঁ। কেন না শব্দব্রহ্ম প্রণবরূপী।[২] প্রশ্নোপনিষদে আছে— ব্রহ্মের দুই রূপ, পর ব্রহ্ম আর অপর ব্রহ্ম। উভয়ই ওঙ্কারস্বরূপ।[৩] অপর ব্রহ্ম শব্দব্রহ্ম।[৪]

লক্ষণীয় মুখে ওঁ উচ্চারণ করলে যে-শব্দ উত্থিত হয় আলোচ্য অনাহত নাদ তা নয়। এ নাদ অতি সূক্ষ্ম, স্থূলকর্ণগোচর নয়, শুধু যোগীদের অনুভবগম্য।[৫]

মহানাদ— এই নাদ বা শব্দব্রহ্মকে মহানাদও বলা হয়। এটি কার্যবিন্দু ও বীজের সংযোগজাত নাদ থেকে ভিন্ন।[৬]

কাজেই দেখা যাচ্ছে শারদাতিলকাদিতে তিনটি নাদের কথা বলা হয়েছে। এক— পরবিন্দুর পূর্ববর্তী পরনাদ ; দুই—মহানাদ বা শব্দব্রহ্ম, পরবিন্দু বিদীর্ণ হওয়ায় এটির উদ্ভব হয় ; তিন—বিন্দু এবং বীজের সংযোগজাত নাদ।[৭]

নাদ সম্বন্ধে অন্য বিবরণ— নাদ সম্বন্ধে আবার অন্যরকম বিবরণও পাওয়া যায়। নাদের তিন অবস্থা—মহানাদ বা নাদান্ত, নাদ এবং নিরোধিনী।[৮] শব্দব্রহ্ম কারণবিন্দাত্মক।[৯] শব্দব্রহ্মের প্রথম স্পন্দন মহানাদ বা নাদান্ত। এই স্পন্দন যখন সমগ্র বিশ্বে ব্যাপ্ত হয়ে যায় অর্থাৎ নাদান্তের দ্বারা সমগ্র বিশ্ব পূর্ণ হয় তখন নাদান্তের সেই অবস্থার নাম হয় নাদ। বিশ্বব্যাপক নাদ অর্থাৎ নাদশক্তি যখন একটি বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল হয় তখন তাকে বলে নিরোধিনী। এই অবস্থায় নাদ বিন্দুতে পরিণত হয়।[১০]

পরনাদকে উন্মনী বলা হয়।[১১] উন্মনী পরাশক্তির অন্যতম রূপ। একে কারণরূপ বলা

১ একো নাদাত্মকো বর্ণঃ সর্বনাদবিভাগবান্।
সোঽনস্তমিতরূপত্বাদনাহত ইতীরিতঃ।— দ্রঃ কা বি, ৯-এর টিপ্পনী

২ শব্দব্রহ্ম প্রণবরূপম্।—প্রা তো, ১ম কাণ্ড, ১ম পরিঃ, ব সং, পৃঃ ৯

৩ এতদ্বৈ সত্যকাম পরং চাপরং চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ।—প্র উপ ৫।২

৪ দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে শব্দব্রহ্ম পরঞ্চ যৎ।—দে পু ১০।৩।৭ ৫ G. L., p. 941

৬ Śākta Philosophy, H. Ph. E. W., p. 414

৭ Ibid, p. 415 ৮ G. L., p. 114

৯ কারণবিন্দাত্মকমভিব্যক্তং শব্দব্রহ্ম—ল স, সৌ ভা, পৃঃ ৯৯ ১০ G. L., p. 114

১১ Śākta Philosophy, H. Ph. E. W., p. 415

হয়। এ ছাড়া আরও দুটি কারণরূপ আছে। যোগসাধনায় এই-সব রূপ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। কেন না সাধককে এই-সব রূপের ধ্যান করতে হয়।

শক্তির সপ্তভূমি—ষট্‌চক্রনিরূপণের টীকাকার কালীচরণ উন্মনী প্রভৃতির অবস্থান নির্দেশ করেছেন এইভাবে[১]—আজ্ঞাচক্রের ঊর্ধ্বে দ্বিতীয় বিন্দু, এটি শিবস্বরূপ। তদূর্ধ্বে অর্ধমাত্রাকারা বোধিনীশক্তি। এই বোধিনীশক্তি বীজ।[২] বোধিনীর ঊর্ধ্বে শিবশক্তি-সমবায়রূপা অর্ধচন্দ্রাকৃতি নাদ। বিন্দু, বোধিনী এবং নাদ এই তিনটি বিন্দুময়পরশক্তির রূপবিশেষ।[৩] নাদের ঊর্ধ্বে লাঙ্গলাকৃতি মহানাদ, তদূর্ধ্বে আজ্ঞীরূপা ব্যাপিকা শক্তি, তদূর্ধ্বে সমনী, তদূর্ধ্বে উন্মনী। শক্তির সপ্তকারণরূপ এই ক্রমানুসারে অবস্থিত।

আবার শক্তির এই সপ্তভূমির বিবরণ অন্যভাবেও পাওয়া যায়। যেমন বিন্দুর ঊর্ধ্বে অর্ধচন্দ্র, তদূর্ধ্বে রোধিনী, তদূর্ধ্বে নাদ, তদূর্ধ্বে ব্যাপিকা, তদূর্ধ্বে সমনী এবং তদূর্ধ্বে উন্মনী।[৪]

যোগসাধকেরা জানেন নাদভূমি থেকেই চিৎশক্তি ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠেন।[৫]

ব্যাপিকা—মহানাদের বিষয় পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। ব্যাপিকাশক্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছে ইনি বিন্দুর বিলাসস্বরূপ বামাদি শক্তিত্রয়ের দ্বারা সংঘটিত ত্রিকোণস্বরূপা।[৬]

সমনী—শিবাধিষ্ঠিতা সমনী বা সমনাশক্তি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ভরণ করেন। সমনাশক্তিযুক্ত শিবই পরমকারণ এবং পঞ্চকৃত্যকারী। সমনাশক্তি চিদানন্দরূপা পরাশক্তি।[৭] কিন্তু কালীচরণ সমনাশক্তিকেও পরাশক্তির অবান্তর রূপ বলেছেন।[৮] সমনাভূমিতেই মনোরাজ্যের অন্ত।[৯]

উন্মনী—সমনার ঊর্ধ্বে উন্মনী বা উন্মনা। শাস্ত্রে আছে[১০]—যেখানে গেলে মনের মনত্ব থাকে না সর্বতন্ত্রে তাকে উন্মনী বলা হয়েছে। সে অতিশুদ্ধ শক্তি।

---

১ তদূর্ধ্বমাজ্ঞাচক্রোর্ধ্বে দ্বিতীয় বিন্দুঃ শিবস্বরূপঃ। তদূর্ধ্বে অর্ধমাত্রাকারা বোধিনীশক্তিস্তদূর্ধ্বে শিবশক্তি-সমবায়রূপার্ধচন্দ্রাকৃতির্নাদস্তদূর্ধ্বে লাঙ্গলাকৃতির্মহানাদ স্তদূর্ধ্বে আজ্ঞীরূপা ব্যাপিকাশক্তিঃ তদূর্ধ্বে সমনী তদূর্ধ্বে উন্মনীতি ক্রমেণ সপ্তকারণরূপাণি বর্ততে।—ষ নি, ৪০-এর টীকা

২ বীজঃ শক্তির্বোধিনীরূপমিত্যর্থঃ।—ঐ

৩ বিন্দুবোধিনীনাদেতি ত্রয়ং বিন্দুময়পরশক্তেঃ রূপবিশেষঃ।—ঐ

৪ শক্তিসাধনা, ক শ অ, পৃঃ ৬১-৬২ ৫ ঐ পৃঃ ৬১ ৬ ঐ ৭ ঐ পৃঃ ৬২

৮ ইদমপি পরশক্তেরবান্তররূপম্।—ষ নি, ৪০-এর টীকা

৯ শক্তিসাধনা, ক শ অ, পৃঃ ৬২

১০ যত্র গত্বা তু মনসো মনস্ত্বং নৈব বিদ্যতে।
উন্মনী সা সমাখ্যাতা সর্বতন্ত্রেষু গোপিতা।—দ্রঃ ষ নি, ৪০-এর টীকা

উন্মনী বা উন্মনাভূমিতে শুধু মন নয়, মন কাল দেশ তত্ত্ব দেবতা তথা কার্যকারণভাব সমস্ত চিরতরে তিরোহিত হয়ে যায়।[১]

উন্মনী দ্বিবিধা— কালীচরণ লিখেছেন উন্মনীশক্তি দ্বিবিধা— নির্বাণকলারূপা এবং বর্ণাবলীরূপা। উভয়েরই স্থান সহস্রারে।[২] উন্মনীকে সপ্তদশী কলাও বলা হয়। কঙ্কাল-মালিনীতন্ত্রে বলা হয়েছে[৩]—সহস্রার বা সহস্রদলপদ্মের কর্ণিকার মধ্যে আছে চন্দ্রমণ্ডল। সেই চন্দ্রমণ্ডলে আছেন সর্বসঙ্কল্পরহিতা সপ্তদশী কলা। তাঁরই নাম উন্মনী। উন্মনী ভবপাশছিন্ন-কারিণী, মোক্ষদায়িনী।[৪]

নাদ ও বিন্দুর রহস্য—নাদ ও বিন্দুর কথা হচ্ছিল। নাদ ও বিন্দুর রহস্য অতি গভীর। একমাত্র সদ্‌গুরুই এ রহস্য উদ্‌ঘাটিত করতে পারেন। শাস্ত্র পড়ে এ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায় মাত্র।

বিন্দুর ত্রিবিধ রূপ—প্রকাশ, প্রকাশ-বিমর্শ এবং বিমর্শ। অথবা সিত, মিশ্র এবং শোণ। এ পূর্বোক্ত বিন্দুত্রয় অর্থাৎ বিন্দু, নাদ এবং বীজেরই নামান্তর।

যদিও শক্তি প্রকাশবিমর্শময়ী তবু সাধারণতঃ শিবকে প্রকাশ এবং শক্তিকে বিমর্শ বলা হয়।[৫] কাজেই সিত বা প্রকাশবিন্দু শিববিন্দু, শোণ বা বিমর্শবিন্দু শক্তিবিন্দু এবং মিশ্র বা প্রকাশবিমর্শবিন্দু উভয়ের সমরসীভূত বিন্দু। এই মিশ্রবিন্দুকে কোথাও কোথাও সর্বতেজো-ময় পরমাত্মা বলা হয়েছে।[৬]

চিদ্‌বল্লীতে[৭] বিন্দুত্রয়ের রহস্য এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে—নিখিলবেদাদিশব্দোৎপাদক অনুত্তর অক্ষর অর্থাৎ 'অ' এই অক্ষরবাচ্য পরমেশ্বর আত্মভূতা নিখিলপ্রপঞ্চনিলয়া বিমর্শশক্তির মধ্যে অনুপ্রবেশ করে বিন্দুরূপ প্রাপ্ত হন। তার পর সেই বিমর্শশক্তিও আপনার অন্তর্গত প্রকাশময় বিন্দুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হন। তখন প্রকাশবিন্দুতে অনুপ্রবিষ্ট এই বিন্দু উচ্ছূন হন আর তাঁর থেকে তেজোময়ী, নীবারাগ্রের মতো সূক্ষ্ম, সমস্ততত্ত্বগর্ভিণী নাদাত্মিকা শক্তি নির্গত হন অর্থাৎ শক্তির নাদরূপ উদ্ভূত হয়। এই নাদ নির্গত হয়েই শৃঙ্গাটরূপ অর্থাৎ ত্রিকোণাকার ধারণ করে। এই ত্রিকোণ বিন্দুনাদাত্মক প্রকাশবিমর্শের 'অহং' নামক শরীর।

১ শক্তিসাধনা, ক শ অ, পৃঃ ৬২ ২ ষ নি, ৪০-এর টীকা

৩ সহস্রারকর্ণিকায়াং চন্দ্রমণ্ডলমধ্যগা। সর্বসঙ্কল্পরহিতা কলা সপ্তদশী ভবেৎ।
উন্মনী নাম তস্যা হি ভবপাশনিকৃন্তনী।—দ্রঃ ষ নি, ৪০-এর টীকা

৪ উন্মনীং চ মালাবর্ণং স্মরণাৎ মোক্ষদায়িনী।—দ্রঃ ঐ

৫ শিবঃ প্রকাশঃ শক্তির্বিমর্শশ্চ।—কা বি, ৫-এর চিদ্‌বল্লী

৬ দ্রঃ কা বি, ৬-৭-এর চিদ্‌বল্লী ৭ কা বি, ৬-এর চিদ্‌বল্লী

সিতবিন্দু এবং শোণবিন্দুর সমরসীকৃত যে মিশ্রবিন্দু তাকে বলা হয় রবিবিন্দু।[১] একে কামও বলা হয় আবার অগ্নীষোমাত্মক বিন্দুও বলা হয়।[২] নটনানন্দনাথ এই কাম শব্দের অর্থ করেছেন পরমার্থবিদ্ মহাযোগীদের দ্বারা যা আত্মা-রূপে অভিলষিত হয় তাই কাম।[৩] অর্থাৎ কাম আত্মা বা ব্রহ্ম। বরিবস্যারহস্যেও কামকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে।[৪] এই কামই কামেশ্বর।[৫] ভাস্কররায় অন্যত্র লিখেছেন উপাধিরহিত শুদ্ধচৈতন্যই কামেশ্বর।[৬]

কামকলা।—অগ্নি আর সোমকে বলা হয় এই কামের অর্থাৎ রবিবিন্দুর কলা। কলা বিমর্শশক্তি।[৭] কামবিশিষ্টা কলা কামকলা।[৮] কাজেই কামকলা প্রকাশবিন্দু এবং বিমর্শবিন্দুর সমষ্টিরূপ। কেন না বিমর্শশক্তি অগ্নিষোমরূপিণী।[৯] কামকলাই মহাত্রিপুরসুন্দরী।

মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় লিখেছেন প্রকাশের সঙ্গে বিমর্শের সাম্যই রবি বা কাম। এই সাম্য ভঙ্গ হলে পরে রবিবিন্দু প্রস্পন্দিত হয়ে শুক্ল আর রক্তবিন্দুরূপে আবির্ভূত হয়।[১০] কাজেই দেখা যাচ্ছে রবিবিন্দুই শুক্লবিন্দু এবং রক্তবিন্দুর সমষ্টিবিন্দু।

আচার্য ভাস্কররায়ও লিখেছেন সমষ্টিরূপে বিন্দু এক,— রবি বিন্দু। আর ব্যষ্টিরূপে বিন্দু দুই,—শুক্লবিন্দু আর রক্তবিন্দু। শুক্ল বিন্দু ইন্দু আর রক্তবিন্দু অগ্নি।[১১] এই দুই বিন্দুরূপে বিন্দু হয়ে যায় বিসর্গ।[১২] অর্থাৎ এক বিন্দুরূপে যা বিন্দু, দুই বিন্দুরূপে তাই বিসর্গ।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় তন্ত্রে বিন্দু ও বিসর্গকে পুরুষ এবং প্রকৃতিও বলা হয়।[১৩]

চিৎকলা।—প্রকাশবিমর্শের সাম্যভঙ্গজনিত যে-প্রস্পন্দনের কথা বলা হল সেই প্রস্পন্দনকার্য থেকে যা অভিব্যক্ত হয় তাকে শাস্ত্রে সংবিৎ বা চৈতন্য বলা হয়েছে। এরই অপর নাম চিৎকলা। অগ্নির সম্পর্কে এলে ঘৃত যেমন ধারারূপে প্রবাহিত হয় তেমনি প্রকাশাত্মক শিবের সংস্পর্শে বিমর্শরূপা পরাশক্তি দ্রবীভূতা হন এবং তাঁর থেকে এক পরমানন্দময়

১ এবংভূতো রবিঃ সিতশোণবিন্দুসমরসীকৃতঃ মিশ্রবিন্দুরিত্যর্থঃ।—কা বি, ৭-এর চিদ্বল্লী

২ কামো রবিরগ্নীষোমাত্মকঃ ইত্যাদিশব্দৈর্ব্যবহ্রিয়তে।—ব র, ২।৬৭-৬৮-এর টীকা

৩ কাম্যতে অভিলষ্যতে আত্মত্বেন পরমার্থবিদ্ভিঃ মহদ্ভিঃ যোগিভিরিতি কামঃ।—কা বি, ৭-এর চিদ্বল্লী

৪ কামো ব্রহ্মৈব।—ব র ২।৬০ ৫ ঐ ২।৬০-এর টীকা

৬ উপাধিরহিতং শুদ্ধং চৈতন্যমেব বিন্দুরূপঃ কামেশ্বরঃ।—ভাবনোপনিষদ্, ২৭-এর ভাষ্য

৭ কা বি, ৭-এর চিদ্বল্লী ৮ যা নি ৬।১০-১১-এর সে ব

৯ অগ্নিষোমরূপিণী বিমর্শশক্তিঃ।—কা বি, ৭-এর চিদ্বল্লী

১০ শক্তিসাধনা, ক শ আ, পৃঃ ৫৯

১১ ব র ২।৬৭-৬৮-এর টীকা। ১২ ঐ

১৩ বিন্দুঃ পুরুষঃ ইত্যুক্তো বিসর্গঃ প্রকৃতির্মতা।—প্র সা ত ৪।১৯

অমৃতধারা প্রবাহিত হয়। এই ধারাই এক প্রকার বিচারে চিৎকলা এবং অন্যপ্রকার বিচারে ব্রহ্মানন্দের স্বরূপ।[১]

আচার্যেরা বলেন এই রহস্যময় ব্যাপারটি লৌকিক ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়। আচার্য ভাস্কররায় লিখেছেন[২]—স্ত্রীপুরুষের সামরস্যদশায় যখন ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত শুক্লবিন্দু কামমন্দিরে প্রবিষ্ট হয়ে শোণবিন্দুর সঙ্গে একীভূত হয় তখনই বাহ্যান্তরভাণবিহীন কেবলমাত্র আনন্দরূপ ব্রহ্ম অবভাসিত হন এটি অনুভবসিদ্ধ ব্যাপার।

এ-সব গুহ্য সাধনার অন্তর্গত বিষয়। সদ্‌গুরুর কাছেই এ-সবের মর্ম অবগত হওয়া যায়।

কামকলারহস্য—কামকলার কথা হচ্ছিল। দেখা গেছে কামকলা রবি, অগ্নি এবং সোম এই বিন্দুত্রয়ের সমষ্টিভূতা। ইনি মাতৃকা, মহাত্রিপুরসুন্দরী, পূর্ণাহন্তারূপিণী প্রকাশানন্দরূপিণী। ইনি দিব্যাক্ষরস্বরূপিণী অর্থাৎ জ্যোতির্ময়ব্রহ্মস্বরূপিণী। এই কামকলাই অনন্ত অক্ষররাশি এবং মহামন্ত্রসমূহের বীজ এঁরই অন্তর্গত।[৩]

এইজন্য কামকলারূপিণী পরাশক্তি মহাত্রিপুরসুন্দরীকে বলা হয়েছে বাগ্‌ভব-কামরাজ-শক্তি বীজাত্মিকা।[৪] দেবীর বাগ্‌ভববীজাত্মক রূপ বাগীশ্বরী। ইনি জ্ঞানশক্তি, মোক্ষরূপিণী অর্থাৎ মোক্ষদায়িনী। তাঁর কামরাজবীজাত্মক রূপ কামকলা। ইনি ক্রিয়াশক্তি, কামরূপা অর্থাৎ কামপ্রদা। আর দেবীর শক্তিবীজাত্মক রূপ পরাশক্তি। ইনি ইচ্ছাশক্তি, শিবরূপিণী অর্থাৎ ধর্মপ্রদা।[৫]

অহমাত্মিকা— কামকলা বা মহাত্রিপুরসুন্দরী চিৎ-আনন্দ-ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়ারূপা। ইনি অণু থেকে অণুতরা, মহৎ থেকেও মহীয়সী। এঁকে বলা হয়েছে 'অনুত্তরবিমর্শ-লিপিলক্ষ্যবিগ্রহা'। অনুত্তরলিপি বলতে বুঝায় প্রকাশবাচক বর্ণ অ আর বিমর্শলিপি বলতে বুঝায় হ-বর্ণ। কাজেই অকারাদিহকারান্ত বর্ণসমূহ দেবীর বিগ্রহ। অ-হ মিলে অহম্।

১ শক্তিসাধনা, ক শ অ. পৃঃ ৫৯

২ যথা লোকে স্ত্রীপুংসয়োঃ সামরস্যদশায়াং যদা ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিতঃ শুক্লবিন্দুঃ কামমন্দিরং প্রবিষ্টঃ শোণবিন্দুনৈকী-ভবতি তদৈব বাহ্যান্তরভাণবিহীনমানন্দমাত্রাবশেষব্রহ্মৈব ভাসত ইত্যনুভবসিদ্ধম্।

—বা বি ৬।১০-১১-এর সেতু।

৩ স্বান্তর্গতানন্তাক্ষররাশিমহামন্ত্রবীর্যপূর্ণাহন্তারূপিণী প্রকাশানন্দসারা বিন্দুত্রয়সমষ্টিভূতদিব্যাক্ষররূপিণী কামকলা নাম মহাত্রিপুরসুন্দরী মাতৃকা পরমযোগিভির্মহামাহেশ্বরৈরভিজ্ঞায়তে ইতি।—বা বি, ৭-এর টিপ্পনী

৪ বাগ্‌ভবকামরাজশক্তিবীজাত্মনেত্যর্থঃ।—বা বি, ১২-এর টিপ্পনী

৫ বাগীশ্বরী জ্ঞানশক্তির্বাগ্‌ভবে মোক্ষরূপিণী। কামরাজে কামকলা কামরূপা ক্রিয়াত্মিকা।
শক্তিবীজে পরাশক্তিরিচ্ছৈব শিবরূপিণী। এবং দেবী ত্র্যক্ষরী তু মহাত্রিপুরসুন্দরী।—বা বি ৪।১৭-১৮

এইজন্য দেবীকে বলা হয়েছে অহমাত্মিকা, পঞ্চাশদক্ষররূপিণী, ষড়ধ্বাত্মক সমস্ত প্রপঞ্চের জনয়িত্রী, পরাভট্টারিকা এবং সমস্ত ভূতের অন্তরাত্মা।[১]

পূর্বেই বলা হয়েছে কামকলা অহমাত্মিকা। আচার্য ভাস্কররায়ও বলেছেন ব্যক্তাব্যক্ত-বিলক্ষণা কামকলা অহং-শব্দের বাচ্যা।[২] অহং-শব্দ কামকলার বাচক। 'অহং' প্রকাশবিমর্শাত্মক, কাজেই শিবশক্তি। বরিবস্যারহস্যে বলা হয়েছে—আকারহীন 'অ-হকার' বা 'অহং' শিবশক্তি। উভয়ে পরস্পর-আশ্লিষ্ট হয়ে স্ফুরিত ও প্রকাশিত। 'অহং' উপনিষদুক্ত পরব্রহ্ম।[৩]

'অহং'-এর অ শিব আর হ শক্তি এ কথার অন্য প্রমাণও আছে। সঙ্কেতপদ্ধতির একটি শ্লোকে পাওয়া যায়—সর্ব বর্ণের অগ্র যে অ-কার তা প্রকাশাখ্য পরম শিব আর অন্ত্য বর্ণ হ-কার বিমর্শাখ্য শক্তি।[৪]

তবে এই অ-কার এবং হ-কার কিন্তু বৈখরীস্তরের স্থূল অ-কার এবং হ-কার নয়, পরাস্তরের সূক্ষ্মতম অ-কার এবং হ-কার।[৫]

হ-কারকে বিসর্গও বলা হয়। এর আকার দুটি বিন্দু (ঃ)। অর্থাৎ দুটি বিন্দুদ্বারা হ-কার সঙ্কেতিত হয়। আর অ-কারের আকার একটি বিন্দু (০)। অর্থাৎ একটি বিন্দুদ্বারা অ-কার সঙ্কেতিত হয়।[৬]

ত্রিবিন্দু—বিন্দুত্রয়ের সমষ্টিরূপা কামকলা। আবার বিন্দুত্রয়ের সমষ্টিরূপকে মহাবিন্দুও বলা হয়। মহাবিন্দুকে পূর্ণাহন্তারূপ পরমেশ্বরও বলা হয়েছে। পরমেশ্বরপরমেশ্বরী অভিন্ন। এইজন্য কামকলাকেও পূর্ণাহন্তারূপিণী বলা হয়েছে।[৭] কাজেই মহাবিন্দু আর কামকলা বা মহাত্রিপুরসুন্দরী একই।

ত্রিকোণ—লক্ষ্য করা গেছে মহাবিন্দু বা পরবিন্দু বা কারণবিন্দু বিন্দু নাদ বীজ নামক বিন্দুত্রয়রূপে ভিন্ন হয়ে যায়। এই বিন্দুত্রয় নিয়ে ত্রিকোণ গঠিত হয়। এই ত্রিকোণকে কামকলা বলা হয়।

১ কা বি, ৬-৭-এর চিদ্বল্লী

২ কামকলা ব্যক্তাব্যক্তবিলক্ষণাঽহং পদবাচ্যা।—ব র ২।৩৭-৩৮-এর টীকা

৩ অহকারৌ শিবশক্তী শূন্যাকারৌ পরস্পরাশ্লিষ্টৌ।
স্ফুরণপ্রকাশরূপাবুপনিষদুক্তং পরং ব্রহ্ম।—ব র ২।৩৯

৪ অকারঃ সর্ববর্ণাগ্র্যঃ প্রকাশঃ পরমঃ শিবঃ।
হকারোঽন্ত্যঃ কলারূপো বিমর্শাখ্যঃ প্রকীর্তিতঃ।—যো হৃ দী ৩।১০-১১-এর টীকা

৫ যো হৃ দী ৩।১০-১১-এর টীকা

৬ অকারস্যৈকবিন্দ্বাকারতা বিসর্গরূপহকারস্য বিন্দুদ্বয়াকারতা চ ধ্বনিতা।—ঐ

৭ মহাবিন্দুঃ পূর্ণাহন্তাবিশেষস্বরূপঃ পরমেশ্বরোঽহন্তাসঙ্ঘ ইত্যর্থঃ।—কা বি, ৬-এর চিদ্বল্লী

ত্রিকোণের উদ্ভব সম্বন্ধে বলা হয়েছে ত্রিবিন্দু থেকে তিনটি রেখা প্রসৃত হয়ে ত্রিকোণ গঠন করে। এই তিনটি রেখা বামা জ্যেষ্ঠা ও রৌদ্রী এই তিন শক্তির প্রতীক। এই রেখা তিনটিকে অ-ক-থ রেখাও বলা হয়।[১] অ থেকে বিসর্গ পর্যন্ত ষোড়শ স্বরবর্ণের দ্বারা গঠিত রেখা অ-রেখা। এটি বামা। একে ব্রহ্মরেখাও বলে। ক থেকে ত পর্যন্ত ষোড়শ বর্ণের দ্বারা গঠিত রেখা ক-রেখা। এটি জ্যেষ্ঠা। একে বিষ্ণু রেখাও বলা হয়। আর থ থেকে স পর্যন্ত ষোড়শ বর্ণের দ্বারা গঠিত রেখা থ-রেখা। এটি রৌদ্রী। একে শিব-রেখাও বলা হয়।[২]

এই রেখা তিনটিকে রজঃ-সত্ত্ব-তমঃ-রেখাও বলা হয়েছে।[৩] ত্রিকোণের তিন কোণে আছে হ ল ক্ষ।[৪] এইভাবে দেখা যায় কামকলা বর্ণাবয়বরূপিণী।

পূর্বোক্ত পরাদি বাক্‌ও বিন্দুগর্ভিত ত্রিকোণরূপে প্রকটিত। ত্রিকোণের তিন রেখা পশ্যন্তী, মধ্যমা এবং বৈখরী আর মধ্যবিন্দু পরাবাক্।[৫] পূর্বেই লক্ষ্য করা গেছে পরাবাক্ শব্দব্রহ্ম। পরাবাক্‌ই পশ্যন্ত্যাদিরূপে প্রকটিত।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় বাকের এই যে পরাদি চতুর্বিধ রূপের কথা তন্ত্রশাস্ত্রে আলোচিত হয়েছে ভারতীয় চিন্তার ক্ষেত্রে অতি-প্রাচীন কাল থেকেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে আছে[৬]—বাক্‌পরিমিত পদ চারটি, মনীষী ব্রাহ্মণেরা তা জানেন। এর মধ্যে তিনটি গুহায় নিহিত এবং বাইরে প্রকাশিত হয় না। চতুর্থটি মানুষ ভাষারূপে ব্যবহার করে। এখানে পরাদি নাম না থাকলেও বর্ণনা থেকে বোঝা যায় পরা, পশ্যন্তী এবং মধ্যমাই বেদোক্ত গুহানিহিত তিন পদ আর বৈখরীই মনুষ্যভাষিত চতুর্থ পদ।

কামকলার কথায় ফিরে আসা যাক। সাধনার ক্ষেত্রে কামকলার বিষয় গুরুগম্য। শাস্ত্রের সুস্পষ্ট নির্দেশ কামকলা পারম্পর্য অনুসারে বিজ্ঞাত হলেই ভববন্ধন মোচন করেন।[৭] পুস্তকাদি পাঠে এ সম্বন্ধে একটা সাধারণ জ্ঞান হতে পারে। তবে এরূপ জ্ঞান ফলপ্রদ হয় না।[৮]

১ পাদুকাপঞ্চকম্, ২-এর টীকা

২ অকারাদিবিসর্গান্তা ব্রহ্মরেখা প্রজাপতিঃ। ককারাদিতকারান্তা বিষ্ণুরেখা পরাৎপরা।
থকারাদিসকারান্তা শিবরেখা ত্রিবিন্দুতঃ।—কালীকুলার্ণববচন, দ্রঃ পাদুকাপঞ্চকম্, ২-এর টীকা

৩ রজঃসত্ত্বতমোরেখা যোনিমণ্ডলমণ্ডিতা।—তন্ত্রজীবনবচন, দ্রঃ ঐ

৪ পাদুকাপঞ্চকম্, ২   ৫ শক্তিসাধনা, ক শ অ, পৃঃ ৫৮

৬ চত্বারি বাক্‌পরিমিতা পদানি তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ।
গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি।—ঋ বে ১।১৬৪।৪৫

৭ পারম্পর্যেণ বিজ্ঞাতা ভববন্ধবিমোচনী।—বা নি ৪।১৯

৮ পুস্তকাবলোকনাদিরূপোপায়ান্তরেণ লব্ধং তু ন ফলতি।—ঐ টীকা

কামকলার অবস্থান—তন্ত্রে কামকলার অবস্থান বর্ণনা করা হয়েছে এই ভাবে—ব্রহ্মরন্ধ্রের ঊর্ধ্বভাগে আছে বিসর্গ।[১] বিসর্গের নীচে সহস্রারপদ্ম।[২] সেই পদ্ম শুক্লবর্ণ অধোমুখ।[৩] তার কর্ণিকার মধ্যে আছে চন্দ্রমণ্ডল। সেই চন্দ্রমণ্ডলে আছে অকথাদি-রেখাত্মক বিন্দুগর্ভিত ত্রিকোণ কামকলা।[৪] এটি শক্তির সূক্ষ্মতম রূপ।

আবার মূলাধারপদ্মের কর্ণিকার মধ্যেও বামা-জ্যেষ্ঠা-রৌদ্রী-রেখাত্মিকা বা ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া-রেখাত্মিকা একটি ত্রিকোণ আছে। একে বলা হয় ত্রৈপুর।[৫] এটি কামকলারই প্রতিরূপ।

ত্রিবিধরূপ—গন্ধর্বতন্ত্রে কামকলার ত্রিবিধ রূপের কথা আছে। এক—স্থূল ও বাহ্য; দুই—সূক্ষ্ম ও আন্তর; তিন—মন্ত্রতনু ও ত্রয়ীময়ী।[৬]

স্থূল—স্থূল ও বাহ্য কামকলা সম্বন্ধে বলা হয়েছে—রবিবিন্দু তাঁর মুখ, ইন্দুবিন্দু এবং বহ্নিবিন্দু তাঁর স্তনদ্বয় এবং হার্ধকলা তাঁর যোনি। সাধককে দেবীর এই মূর্তির সঙ্গে নিজের অভেদ ভাবনা করতে হয়।[৭]

হার্ধকলা—হার্ধকলা সম্পর্কে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় লিখেছেন "শিবশক্তির মিলনোদ্ভূত (পূর্বোক্ত সিতবিন্দু ও শোণবিন্দুর পরস্পর অনুপ্রবেশের বিবরণ দ্রষ্টব্য) অমৃতধারা প্রবাহিত হলে পর তার থেকে যে লীলারূপ তরঙ্গের উৎপত্তি হয় তাকেই তান্ত্রিক পরিভাষায় হার্ধকলা বলে।"[৮] হার্ধকলা তন্ত্রের একটি অতিরহস্যময় গুহ্যতত্ত্ব। একমাত্র গুরুমুখেই এই তত্ত্বের মর্ম অবগত হওয়া যায়।

হার্ধকলাকে যোনি কল্পনা করার কারণ সম্বন্ধে আচার্য ভাস্কররায় লিখেছেন[৯] শিবশক্তির

১ বিসর্গস্তু ব্রহ্মরন্ধ্রোর্ধ্বভাগে।—ষ নি, ৪০-এর কালীচরণকৃত টীকা

২ বিসর্গস্যাধঃ শঙ্খিন্যগ্রে সহস্রদলং পদ্মং বিকসতি।—ঐ

৩ সহস্রারং মহাপদ্মং শুক্লবর্ণমধোমুখম্। অকারাদিক্ষকারান্তৈঃ স্ফুরদ্বর্ণৈর্বিরাজিতম্।

—কঙ্কালমালিনীতন্ত্রবচন, দ্রঃ, ঐ

৪ তস্যান্তশ্চন্দ্রমণ্ডলস্য মধ্যে ত্রিকোণং তত্র অকথাদিত্রিরেখাত্মকং তথত্রিকোণে হলক্ষবর্ণত্রয়ম্।

—ষ চ নি, (T. T., Vol. II), পৃঃ ১২৯

৫ ষ নি, ৮-এর টীকা এবং ষ চ নি, (T. T. Vol II), পৃঃ ১১৭

৬ গ ত ৩০।৪৯-৬১; Preface to kāmakalāvilāsa, pp. VI, VII

৭ বা নি ১।২০১-২০২ ও টীকা, Preface to kāmakalāvilāsa, p. VI.

৮ শিবশক্তিকে মিলনসে উৎপন্ন অমৃতকী ধারা প্রবাহিত হোনেপর উসসে জিস লীলারূপ তরঙ্গকী উৎপত্তি হোতী হৈ বহী তান্ত্রিক পরিভাষামেঁ হার্ধকলাকে নামসে বিখ্যাত হৈ।—শক্তিসাধনা, ক শ অ, পৃঃ ৫২

৯ অত এব কামকলালেখনক্রমে কালচক্রাদৌ যত্র বিবিক্তয়াদৌ বিন্দুত্রয়মধস্তির্যক্‌বিন্দুদ্বয়ং তদধো হংসপদমিতি লিখন্তি সাম্প্রদায়িকাঃ। আনন্দস্য লেখনাসম্ভবাত্তৎকলাভিব্যক্তিস্থানত্বাৎ কামানন্দদ্যোতক হংসপদাকারলেখঃ।

—বা নি ৩।১০-১১-এর সে ব

মিলনে যে-পরমানন্দের উদ্ভয় হয় তার কোনো আকার নাই ; কাজেই তাকে লেখা অর্থাৎ আঁকা যায় না। এইজন্য যন্ত্রাদিতে যেখানে হার্ধকলা আঁকার বিধি আছে সেখানে সেই পরমানন্দের অংশমাত্রের অভিব্যক্তিস্থল কামালয়ের দ্যোতক হংসপদ আঁকতে হয়। হংসপদ অর্থ যোনি।

সূক্ষ্ম—সূক্ষ্ম ও আন্তররূপে কামকলা কুণ্ডলিনী শক্তি। বিদ্যুল্লতাকার অধোমুখ ঊর্ধ্বপুচ্ছ কুণ্ডলিনী মূলাধার থেকে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত লম্বিত হয়ে আছেন।[১] কুণ্ডলিনী ভুজগাকারা।

পূর্বেই লক্ষ্য করা গেছে কামকলা পরাদিবাগ্‌রূপিণী, তিনি শব্দব্রহ্ম। তন্ত্রশাস্ত্রে কুণ্ডলিনীশক্তিকেও শব্দব্রহ্ম বলা হয়েছে। শারদাতিলকের মতে সর্বভূতের চৈতন্যই শব্দব্রহ্ম। এই শব্দব্রহ্ম বা চৈতন্য প্রাণিদেহে কুণ্ডলীরূপ প্রাপ্ত হয়ে বর্ণরূপে গদ্যপদ্যাদিভেদে আবির্ভূত হন।[২]

অন্যত্র বলা হয়েছে[৩] কুণ্ডলিনী সোম, সূর্য এবং অগ্নি এই ত্রিধামজননী। তিনি শব্দব্রহ্ম-স্বরূপিণী, ভূতলিপিমন্ত্রময়ী[৪] এবং পঞ্চাশৎমাতৃকাবর্ণরূপিণী।

মন্ত্রতনু ও ত্রয়ীময়ী— কাজেই কামকলা আর কুণ্ডলিনীশক্তি এক। মন্ত্রতনু ও ত্রয়ীময়ী কামকলার রূপ কল্পনা করা হয় এইভাবে—সামবেদ তাঁর মুখ, ঋগ্‌বেদ এবং যজুর্বেদ স্তনদ্বয় এবং অথর্ববেদ হার্ধকলা।[৫] সামবেদ এক, ঋক্ এবং যজু মিলে এক এবং অথর্ব এক—এইভাবে শ্রুতির তিনভাগ দেবীদেহ রচনা করেছে বলে দেবী ত্রয়ীময়ী।

দেবতা মন্ত্রতনু। অর্থাৎ মন্ত্র দেবতার দেহ। কামকলাকে বলা হয়েছে পঞ্চাশদক্ষররূপিণী। এই পঞ্চাশৎ অক্ষর বা বর্ণ নিয়েই যাবতীয় মন্ত্র। কাজেই এ দিক্ দিয়ে দেখলে কামকলা মন্ত্রতনু।

তন্ত্রসদ্ভাবে বলা হয়েছে—সব মন্ত্র বর্ণাত্মক, সব বর্ণ শক্ত্যাত্মক। শক্তি মাতৃকা আর

১ Kāmakalāvilās, Preface, p. VII

২ চৈতন্যং সর্বভূতানাং শব্দব্রহ্মেতি মে মতিঃ।
তৎপ্রাপ্য কুণ্ডলীরূপং প্রাণিনাং দেহমধ্যগম্।
বর্ণাত্মনা আবির্ভবতি গদ্যপদ্যাদিভেদতঃ।—শা তি ১।১৩-১৪

৩ ত্রিধামজননী দেবী শব্দব্রহ্মস্বরূপিণী। দ্বিচত্বারিংশদ্বর্ণাত্মা পঞ্চাশদ্বর্ণরূপিণী।—ঐ ১।৫৩

৪ অ ই উ ঋ ৯ এই পাঁচ হ্রস্বস্বর, এ ঐ ও ঔ এই চার সন্ধিবর্ণ, পঁচিশটি স্পর্শ বর্ণ এবং য র ল ব শ ষ স এবং হ এই আটটি ব্যাপক বর্ণ মোট এই বেয়াল্লিশটি বর্ণ ভূতলিপি। এই বর্ণগুলি পঞ্চভূতাত্মক বলে এদের ভূতলিপি বলা হয়। ভূতলিপি দিয়ে গঠিত মন্ত্র ভূতলিপিময়।
—শা তি ৭।২-৩-এর টীকা ; T. T., Vol. XVI, Intro., p. 37

৫ Kāmakalāvilās, Preface, p. VII.

মাতৃকা শিবাত্মিকা। সেই মাতৃকা জগতে পরতেজঃসমন্বিতারূপে আবির্ভূতা হয়ে আব্রহ্ম-ভুবনান্ত সমস্ত বিশ্ব ব্যাপ্ত করে বিরাজ করছেন।[১]

কাজেই তন্ত্রমতে প্রত্যেকটি বর্ণই স্বরূপতঃ তেজোরূপা মাতৃকাশক্তি। উচ্চারিত বর্ণ এবং লিখিত বর্ণ তাঁরই স্থূলরূপ।

মাতৃকা অর্থ উৎপাদিকা। যিনি স্থূলসূক্ষ্ম জগতের উৎপাদিকা সেই শক্তিই মাতৃকা-শক্তি। এই মাতৃকাশক্তি স্বরূপতঃ সৃষ্টির কারণভূতা পরমাশক্তি ত্রিপুরা।[২]

বর্ণ শিবশক্তিময়—মাতৃকা শিবাত্মিকা। বর্ণ মাতৃকা। অতএব বর্ণ শিবাত্মক অর্থাৎ শিবশক্তিময়। অবশ্য বর্ণকে শিবশক্তিময় বলার অন্য যুক্তিও আছে। স্বরবর্ণকে বলা হয় শিবশক্তিময়, স্বরবর্ণ ছাড়া ব্যঞ্জনবর্ণ প্রকটিত হয় না। কাজেই স্বরবর্ণযোগে ব্যঞ্জনবর্ণও শিবশক্তিময়।[৩] অবশ্য কোনো কোনো মতে স্বরবর্ণ শক্তি আর ব্যঞ্জনবর্ণ শিব। তবে উভয় মতেরই তাৎপর্য এক।

বর্ণ নিত্য— পঞ্চাশৎ মাতৃকা সাক্ষাৎব্রহ্মস্বরূপিণী, নিত্যা।[৪] কাজেই বর্ণ নিত্য। অন্যরকমভাবে বিচার করলেও দেখা যায় বর্ণ নিত্য। বর্ণ শব্দেরই রূপবিশেষ। কেন না শব্দ দ্বিবিধ—ধ্বন্যাত্মক এবং বর্ণাত্মক।[৫]

পরশুরামকল্পসূত্রে আছে[৬]—বর্ণাত্মক শব্দ নিত্য। শব্দ বা নাদ শক্তিরই রূপ। এইজন্যই শব্দ নিত্য, বর্ণ নিত্য।

ধ্বনি ও বর্ণ—ধ্বনি ও বর্ণের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ট। ধ্বনি বর্ণহীন স্বর। ষড়্‌জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত এবং নিষাদ এই সপ্ত স্বরে ধ্বনি স্বতন্ত্রভাবে প্রতিভাত হয়।[৭] কিন্তু ধ্বনি ছাড়া বর্ণ প্রকাশিত হয় না। অর্থাববোধের নিমিত্ত ধ্বনি বর্ণরূপে প্রকাশিত

১ সর্বে বর্ণাত্মকা মন্ত্রা স্তে চ শক্ত্যাত্মকা প্রিয়ে।
শক্তিস্তু মাতৃকা জ্ঞেয়া সা চ জ্ঞেয়া শিবাত্মিকা।
যা সা তু মাতৃকা লোকে পরতেজঃসমন্বিতা।
তয়া ব্যাপ্তমিদং সর্বমাব্রহ্মভুবনাত্মকম্।—দ্রঃ কা বি, ১১-এর চিদ্‌বল্লী ২ দ্রঃ বা বি ৪।৪

৩ বিনা স্বরৈস্তু ব্যঞ্জনং জায়তে ব্যক্তিরূপতা।
শিবশক্তিময়ান্ প্রাহুস্তস্মাৎ বর্ণান্ মনীষিণঃ।—শা তি ২।৮

৪ পঞ্চাশন্মাতৃকা নিত্যা সাক্ষাদ্ব্রহ্মস্বরূপিণী।—প্রা তো, ১ম কাণ্ড, ৭ম পরিঃ, ব সং, পৃঃ ৪৯

৫ শব্দো হি দ্বিবিধো ধ্বন্যাত্মকো বর্ণাত্মকশ্চ।—বর্ণোদ্ধারতন্ত্রবচন, দ্রঃ ঐ, ১ম কাণ্ড, ২য় পরিঃ, পৃঃ ১৭

৬ বর্ণাত্মকা নিত্যাঃ শব্দাঃ।—প ক সূ ১।৭

৭ ষড়্‌জর্ষভগান্ধারমধ্যমপঞ্চমধৈবতনিষাদেষু সপ্তসু স্বরেষু বর্ণং বিনা ধ্বনিঃ স্বাতন্ত্র্যেণ প্রতিভাতি।—প্রা তো, ১ম কাণ্ড, ২য় পরিঃ, ব সং, পৃঃ ১১

হয়।[১] অন্যভাবে বলা যায় বর্ণ ধ্বন্যাত্মক। প্রত্যেক বর্ণেই বর্ণাংশ এবং ধ্বন্যংশ পরস্পর-সংসৃষ্ট হয়ে বর্তমান।[২]

সমস্ত শব্দ তথা ধ্বনি এবং বর্ণের মূল এক অব্যক্ত নাদ বা ধ্বনি। তাই শব্দব্রহ্ম। এই শব্দব্রহ্মই প্রাণিদেহে চৈতন্যরূপিণী কুণ্ডলিনী এবং তিনিই বর্ণরূপে আবির্ভূতা হন। এ-সব কথা পূর্বেও বলা হয়েছে।

ওঁকার—লক্ষ্য করা গেছে শব্দব্রহ্মের প্রকাশ হয় ওঁ এই অনাহত নাদ বা ধ্বনিরূপে। ওঁ বা প্রণব শব্দব্রহ্মের বাচক। আবার ওঁই শব্দব্রহ্ম। কেন না বাচ্য আর বাচকে কোনো ভেদ নেই। ওঁই কুণ্ডলিনী। কারণ কুণ্ডলিনী শব্দব্রহ্ম। সেইজন্য যেমন বলা হয় কুণ্ডলিনীর থেকে সমস্ত বর্ণাদির উদ্ভব হয়েছে তেমনি প্রণব থেকে সমস্ত বর্ণাদির উদ্ভব হয়েছে এ কথাও বলা হয়।[৩]

বর্ণরূপা মাতৃকা থেকে ব্রহ্মাদির উদ্ভব—কামধেনুতন্ত্রের অভিমত বর্ণরূপা মাতৃকা থেকেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবতার উদ্ভব হয়েছে।[৪] উক্ত তন্ত্রমতে স্বয়ং পরমকুণ্ডলী অকারাদিক্ষকারান্তা বর্ণরূপা হয়ে চরাচর সমস্ত বিশ্ব, নানা শাস্ত্র, পুরাণ, ইতিহাস, বেদ, স্মৃতিশাস্ত্র এবং অন্য যা-কিছু সবই প্রসব করেন। অক্ষর থেকে জাত সমস্তই ব্রহ্মময়।[৫]

তন্ত্রে চন্দ্র সূর্য এবং অগ্নিকে বিশেষ গৌরবের স্থান দেওয়া হয়েছে। আমরা দেখেছি কামকলার ত্রিবিন্দু—রবিবিন্দু সোমবিন্দু এবং অগ্নিবিন্দু। আবার বর্ণসমূহেরও সোমসূর্যাগ্নি-রূপত্বের কথা বলা হয়েছে[৬] এবং তাদের সৌম্য সৌর এবং আগ্নেয় এই তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। স্বরবর্ণ সৌম্য, স্পর্শবর্ণ সৌর এবং ব্যাপকবর্ণ আগ্নেয়। এই ত্রিবিধবর্ণ কাম, ধন এবং ধর্ম প্রদান করে। সৌম্যবর্ণ কামদায়ী, সৌরবর্ণ ধনদায়ী এবং আগ্নেয়বর্ণ দেয় ধর্ম।[৭]

---

১ ধ্বনিমন্তরেণ বর্ণো ন প্রকাশতে। অর্থাববোধায় ধ্বনির্বর্ণাজ্জনাবির্ভবতি প্রকাশত ইতি তত্র তাৎপর্যম্।
—ঐ পৃঃ ১২

২ সর্বেষপি বর্ণেষু বর্ণাংশধ্বন্যংশৌ পরস্পরসংসৃষ্টৌ বর্তেতে।—ব র ২।৭৩-এর টীকা

৩ প্রণবতঃ সর্বেষামক্ষরাদীনামাবির্ভাবদর্শনাচ্চ।—প্রা তো, ১ম কাণ্ড, ২য় পরিঃ, পৃঃ ১৭

৪ বর্ণাত্তু জায়তে ব্রহ্মা তথা বিষ্ণু প্রজাপতিঃ।
রুদ্রশ্চ জায়তে দেবি জগৎসংহারকারকঃ।—কামধেনুতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো, ১ম কাণ্ড, ২য় পরিঃ,
ব সং, পৃঃ ১৫

৫ অকারাদিক্ষকারান্তা স্বয়ং পরমকুণ্ডলী। সর্বং চরাচরং বিশ্বং বর্ণাত্মা সূয়তে ধ্রুবম্।
নানাশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ ইতিহাসঞ্চ সুন্দরি। বেদঞ্চ স্মৃতিশাস্ত্রঞ্চ অন্যানি যানি কানি চ।
অক্ষরাজ্জায়তে সর্বং পরং ব্রহ্মময়ং প্রিয়ে।—কামধেনুতন্ত্রবচন, দ্রঃ ঐ, পৃঃ ১৮

৬ সর্ববর্ণানাং সোমসূর্যাগ্নিরূপত্বমুক্তম্।—শা তি ২।১-৩-এর টীকা।

৭ এষু স্বরাঃ স্মৃতা সৌম্যাঃ স্পর্শাঃ সৌরাঃ স্তুতোদিতাঃ।
আগ্নেয়া ব্যাপকাঃ সর্বে সোমসূর্যাগ্নিদেবতাঃ।—ঐ ২।২-৩; দ্রঃ উক্ত শ্লোকের এবং ২।৩ সংখ্যক শ্লোকের টীকা।

সৌম্যবর্ণ—সৌম্যবর্ণ বা স্বরবর্ণ স্বতন্ত্র।[১] অ থেকে বিসর্গ পর্যন্ত ষোলটি স্বরবর্ণকে হ্রস্ব- এবং দীর্ঘ-ভেদে দুই ভাগ এবং স্ত্রী-পুরুষ-নপুংসকভেদে তিন ভাগ করা হয়।[২] অ ই উ ঋ ঌ (?) এ ও এবং ং (০) হ্রস্বস্বর। এর মধ্যে অ ই উ এ ও এবং ং পুরুষ আর ঋ ঌ (?) নপুংসক। আ ঈ ঊ ৠ ৡ (?) ঐ ঔ এবং ঃ দীর্ঘস্বর। এর মধ্যে ৠ ৡ বাদে বাকী বর্ণগুলি স্ত্রী এবং ৠ ও ৡ নপুংসক।

শারদাতিলকে[৩] বিন্দুকে রবি এবং বিসর্গকে নিশাকর বা সোম[৪] বলা হয়েছে। স্বরবর্ণের অন্ত্যবর্ণ বিসর্গ। বিসর্গ চন্দ্র, অন্য স্বরগুলি তিথিরূপ পঞ্চদশ কলা।[৫]

সৌরবর্ণ—ক থেকে ম পর্যন্ত পাঁচ ভাগে বিভক্ত পঁচিশটি বর্ণ সৌরবর্ণ। এর মধ্যে মকার পুরুষ। তাকে পরমাত্মা, বিশ্বরূপ, জীব, সূর্য এই-সব নাম দেওয়া হয়েছে। আর বিলোমক্রমে ভ থেকে ক পর্যন্ত চতুর্বিংশতি বর্ণকে প্রকৃত্যাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্বাত্মক বর্ণ বলা হয়েছে।[৬]

আগ্নেয় বর্ণ—য র ল ব শ ষ স হ ল় এবং ক্ষ এই দশটি ব্যাপক বর্ণ আগ্নেয়।[৭] এইগুলি আবার দুই বর্গে বিভক্ত। এক—য র ল ব শ; অপর—ষ স হ ল় ক্ষ।

বর্ণের অন্যরকম ভাগ—বর্ণগুলিকে আবার শক্তি ও বীজ এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। স্বরবর্ণ শক্তি আর ব্যঞ্জনবর্ণ বীজ।[৮]

ভূতাত্মক—তন্ত্রে বর্ণসমূহকে ভূতাত্মক বা ভৌতিক বলা হয়েছে এবং পঞ্চভূতের অনুযায়ী তাদের পাঁচ ভাগ করা হয়েছে। শারদাতিলকের মতে[৯] শিবশক্তিসমবায়রূপ কারণবিন্দু থেকে যেমন বর্ণসমূহের[১০] তেমনি পঞ্চভূতেরও উদ্ভব হয়। এইজন্য বর্ণসমূহ ভূতাত্মক এবং পাঁচ ভাগে বিভক্ত।

১ তেষু স্বরাঃ স্বতন্ত্রা স্যুঃ।—শা তি ২।২-৩-এর টীকা

২ ঐ ২।৫-৭-এর টীকা

৩ বিন্দুঃ পুমান্ রবিঃ প্রোক্তঃ সর্গঃ শক্তির্নিশাকরঃ।—ঐ ২।৬

৪ লক্ষ্য করা গেছে বরিবস্যারহস্যে বিন্দুকে রবি ও বিসর্গকে অগ্নি ও সোম বলা হয়েছে।

৫ শা তি ২।৬-এর টীকা

৬ ঐ ২।৪-এর টীকা, প্র সা ত ৩।৮-৯ এবং টীকা

৭ প্র সা ত, T. T., Vol. III, Intro., p. 19, n. 6. শা তি ২।১-৩-এর টীকা

৮ হলো বীজানি শক্তয়ঃ স্বরাশ্চ পরমেশ্বরি।—দক্ষিণামূর্তিসংহিতাবচন, দ্রঃ শা তি ৩।২-এর টীকা

৯ কারণাৎ পঞ্চভূতানামুদ্ভূতা মাতৃকা যতঃ। ততো ভূতাত্মকা বর্ণাঃ পঞ্চ পঞ্চ বিভাগতঃ।—শা তি ২।৯

১০ বর্ণ নিত্য। যা নিত্য তার উদ্ভব হয় না। কাজেই এখানে উদ্ভব বলতে অভিব্যক্তি বুঝতে হবে।
—দ্রঃ শা তি ৭।৯-এর টীকা

পাঞ্চভৌতিক বিভাগ—বর্ণের পাঞ্চভৌতিক বিভাগ[১] :—

অ আ এ ক চ ট ত প য ষ…………মারুত- বা বায়ব্য-বর্ণ…………মরুৎ।

ই ঈ ঐ খ ছ ঠ থ ফ র ক্ষ………… তৈজস- বা আগ্নেয়-বর্ণ……… তেজ।

উ ঊ ও গ জ ড দ ব ল ল………পার্থিব-বর্ণ………………… ক্ষিতি।

ঋ ৠ ঔ ঘ ঝ ঢ ধ ভ ব স……… … বারুণ্য-বর্ণ………………… অপ্।

ঌ ৡ ং ঙ ঞ ণ ন ম শ হ…………… ব্যোম-বর্ণ………………… ব্যোম।

স্বকুলাদি ভেদ—পার্থিব বারুণ্য আগ্নেয় এবং মারুত বর্ণের আবার স্বকুল, মিত্র, মধ্যস্থ বা উদাসীন এবং অমিত্র বা শত্রু এই চার রকমের ভেদ আছে। সাধকের নামের এবং দীক্ষাকালে গ্রহণীয় মন্ত্রের আদ্যক্ষর দিয়ে কুল ঠিক করা হয়। তন্ত্রের বিধান অনুসারে সাধকের নামের এবং গ্রহণীয় মন্ত্রের আদ্যক্ষর এক হওয়া চাই। যদি কারো গ্রহণীয় মন্ত্রের আদ্যক্ষর পার্থিব হয় তবে বলতে হবে পার্থিব-বর্ণ তার স্বকুল। কোন বর্ণ কোন বর্ণের মিত্র বা অমিত্র বা উদাসীন তাও তন্ত্রে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। যেমন আগ্নেয়-বর্ণের মিত্র মারুত-বর্ণ, অমিত্র বারুন-বর্ণ আর উদাসীন পার্থিব-বর্ণ।[২]

দেখা যাচ্ছে ব্যবহারিক জগতের অভিজ্ঞতা অনুসারেই এই-সব সম্বন্ধ স্থির করা হয়েছে। বাতাস আগুনের বন্ধু ও জল শত্রু আর ভূমি শত্রুও নয় মিত্রও নয় ব্যবহারিক জগতে এ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করা যায়।

পূর্বেই বলা হয়েছে তন্ত্রের মতে প্রত্যেকটি বর্ণ মাতৃকাশক্তি। প্রত্যেক বর্ণে শক্তির একটি বিশেষরূপ অভিব্যক্ত। সেইজন্য প্রত্যেক বর্ণের বিশেষ মূর্তি কল্পিত হয়েছে, তার স্বরূপ কল্পিত হয়েছে এবং ধ্যানও নির্দিষ্ট হয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে অকারের কথা ধরা যাক। কামধেনুতন্ত্রে অকারের স্বরূপ বর্ননা করা হয়েছে এইভাবে—অকার শারদ চন্দ্রের মতো উজ্জ্বল, পঞ্চকোণময়, পঞ্চদেবময়, শক্তিত্রয়সমন্বিত, নির্গুণ, গুণযুক্ত, কৈবল্যমূর্তি, বিন্দুত্রয়ময় বর্ণ। অকার স্বয়ং প্রকৃতিরূপিণী।[৩]

তন্ত্রান্তরে অকারের নিম্নলিখিত ধ্যান পাওয়া যায়—কূর্মবাহন অকার অতিকায়, চতুর্মুখ, অষ্টভুজ। তাঁর হাতে গদা শূল প্রভৃতি আয়ুধ শোভা পাচ্ছে। তাঁর রং সোনার মতো।[৪]

১ শা তি ২।১০-১১-এর টীকা ; প্র সা ত ৩।৭০-৭২ ২ শা তি ২।১০-১১-এর টীকা

৩ শরচ্চন্দ্রপ্রতীকাশং পঞ্চকোণময়ং সদা। পঞ্চদেবময়ং বর্ণং শক্তিত্রয়সমন্বিতম্।
নির্গুণং সগুণোপেতং স্বয়ং কৈবল্যমূর্তিমং। বিন্দুত্রয়ময়ং বর্ণং স্বয়ং প্রকৃতিরূপিণী।
—দ্রঃ প্রা তো, ১ম কাণ্ড, ৭ম পরিঃ, ব সং, পৃঃ ৫০

৪ চামীকরনিভঃ শূলগদাপ্রাজদ্ভুজাষ্টকঃ। চতুরাস্যোঽতিকায়ঃ স্যাদকারঃ কূর্মবাহনঃ।
দ্রঃ শা তি ৬।৩-এর টীকা

বর্ণ ও কলা—পূর্বে যে সৌম্য সৌর এবং আগ্নেয় বর্ণের কথা বলা হয়েছে সেই ত্রিবিধ বর্ণ থেকে অষ্টাত্রিংশৎ কলার উদ্ভব হয়েছে। সৌম্য কলা ষোড়শ, সৌর কলা দ্বাদশ এবং আগ্নেয় দশ।[১] যে-বর্ণ থেকে যে-কলা উদ্ভূত তা সেই বর্ণ থেকে অভিন্ন।[২]

এখানে উল্লেখ করা যায় তন্ত্রশাস্ত্রে কলা শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কলা অর্থ প্রকৃতি,[৩] শক্তি,[৪] মায়া।[৫] আবার সময়ের একটি ভাগকেও কলা বলা হয়।[৬] ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বের অন্যতম তত্ত্ব কলা। সেখানে তার অর্থ ভিন্ন। তবে কলা শব্দের সাধারণ অর্থ অংশ। হঠযোগপ্রদীপিকার (৪।১) টীকায় বলা হয়েছে 'কলা নাদৈকদেশঃ'[৭]—কলা নাদের একদেশ অর্থাৎ অংশ।

সৌম্য-কলা—ষোড়শ সৌম্য বর্ণ থেকে ষোড়শ কলার উদ্ভব হয়েছে। তাদের নাম অমৃতা, মানদা, পূষা, তুষ্টি, পুষ্টি, রতি, ধৃতি, শশিনী, চন্দ্রিকা, কান্তি, জ্যোৎস্না, শ্রী, প্রীতি, অঙ্গদা, পূর্ণা এবং পূর্ণামৃতা। এই-সব কলা কামদায়িনী অর্থাৎ কামনাপূর্ণকারিণী।[৮]

সৌর-কলা— স্পর্শযুগ্ম থেকে দ্বাদশ সৌর-কলার উদ্ভব হয়েছে। স্পর্শযুগ্ম বলতে বুঝায় ম বাদ দিয়ে বাকী চব্বিশটি স্পর্শবর্ণের জোড়া জোড়া ভাগ। বর্ণযুগ্ম বা জোড়া এইভাবে নির্দিষ্ট হয়েছে—কভ, খব, গফ, ঘপ, ঙন, চধ, ছদ, জথ, ঝত, ঞণ, টঢ এবং ঠড। কলার নাম তপনী (তপিনী), তাপনী (তাপিনী), ধূম্রা, মরীচি, জ্বালিনী, রুচি, সুষুম্না, ভোগদা, বিশ্বা, বোধিনী (বোধনী) ধারণী (ধারিণী) এবং ক্ষমা। এঁরা ধনদায়িনী।[৯]

আগ্নেয়-কলা—ব্যাপক বর্ণ থেকে নিম্নোক্ত দশটি আগ্নেয় কলার উদ্ভব হয়েছে—ধূম্রার্চি, উষ্মা, জ্বলিনী, জ্বালিনী, বিস্ফুলিঙ্গিনী, সুশ্রী, সুরূপা, কপিলা, হব্যবহা এবং কব্যবহা। এঁরা ধর্মপ্রদা।[১০]

পঞ্চাশৎ কলা--এ ছাড়া প্রণবের পাঁচটি ভেদ বা অংশের থেকে পঞ্চাশৎ কলার উদ্ভব প্রপঞ্চসার, শারদাতিলক প্রভৃতি তন্ত্রে বর্ণিত হয়েছে। প্রণবের পাঁচটি ভেদ এই—অ, উ, ম, বিন্দু এবং নাদ।[১১] কোনো কোনো তন্ত্রে শক্তি এবং শান্ত নামে আরো দুটি ভেদ বর্ণিত হয়েছে।[১২] কিন্তু এ দুটি পর ভেদ, পূর্বোক্ত অপর ভেদের সঙ্গে তাদের গণনা হয় না।[১৩]

১ তদ্বর্ণত্রিভেদসমুদ্ভূতা অষ্টাত্রিংশৎকলা মতাঃ। স্বরৈঃ সৌম্যাঃ স্পর্শযুগ্মৈঃ সৌরা ব্যাপকে বহ্নিজাঃ।
ষোড়শ দ্বাদশ দশ সংখ্যা স্যুঃ ক্রমশঃ কলাঃ।—প্র সা ত ৩।১১-১২

২ তদ্বর্ণতোঽভিন্না কলা।—শা তি-এর ১।১১১ ৩ কলা প্রকৃতিঃ।—শা তি ১।৬-এর টীকা

৪ প্র সা ত ১।২৩ ৫ কলা মায়া।—শা তি ১।১৫-এর টীকা ৬ প্র সা ত ১।৩০

৭ ঐ. T. T. Vol. III, Intro., p. 2 n. 6 ৮ প্র সা ত ৩।১৫, ১৬

৯ প্র সা ত ৩।১৭ ১০ ঐ ৩।১৮-১৯

১১ তারস্ত প্রণবস্য পঞ্চভেদা ইতি অকারোকারমকারবিন্দুনাদাঃ।—শা তি ২।১৭-এর টীকা

১২ প্র সা ত ২।৩০-৩১ ১৩ শা তি ২।১৭-এর টীকা

সৃষ্টি-কলা—অকার থেকে উদ্ভূত হয়েছে সৃষ্টি-কলা। সৃষ্টি-কলা দশটি। যথা—সৃষ্টি, ঋদ্ধি, স্মৃতি, মেধা, কান্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, স্থিরা, স্থিতি এবং সিদ্ধি। অকার ব্রহ্মার বাচক। এইজন্য আলোচ্য কলাগুলিকে ব্রহ্মজাতাঃ অর্থাৎ ব্রহ্মার থেকে উদ্ভূতা বলা হয়।[১]

স্থিতি-কলা—উকার থেকে স্থিতি-কলার উদ্ভব হয়েছে। উকার স্থিতিকর্তা বিষ্ণুর বাচক। এই কলাগুলিকে বলা হয় 'বিষ্ণুজাতাঃ' অর্থাৎ বিষ্ণু থেকে উদ্ভূতা। স্থিতি-কলাও দশটি। যথা—জরা, পালিনী, শান্তি, ঐশ্বরী, রতি, কামিকা, বরদা, হ্লাদিনী, প্রীতি এবং দীর্ঘা।[২]

সংহার-কলা—মকার থেকে উদ্ভূত হয়েছে সংহার-কলা। এগুলিকে রুদ্রজাতাঃ অর্থাৎ রুদ্র থেকে উদ্ভূতা বলা হয়। কারণ ম রুদ্রের বাচক। সংহার-কলা দশটি। যথা—তীক্ষ্ণা, রৌদ্রী, ভয়া, নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্ষুৎ, ক্রোধিনী, ক্রিয়া, উৎকারী এবং মৃত্যু।[৩]

বিন্দু-উদ্ভূতা—বিন্দু থেকে পীতা, শ্বেতা, অরুণা এবং অসিতা এই চারটি কলার উদ্ভব হয়। বিন্দু ঈশ্বরতত্ত্ব। এইজন্য এই কলাগুলিকে ঈশ্বরোদিতা বলা হয়।[৪]

নাদ-উদ্ভূতা—নাদ থেকে ষোলটি কলার উদ্ভব হয়। যথা—নিবৃত্তি, প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা, শান্তি, ইন্ধিকা, দীপিকা, রেচিকা, মোচিকা, পরা, পরাপরায়ণা, সূক্ষ্মা, অমৃতা, আপ্যায়িনী, ব্যাপিনী, ব্যোমরূপা এবং অনন্তা। এই-সব কলা ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনী।[৫] নাদ সদাশিব-তত্ত্ব। এইজন্য এই ষোড়শকলাকে সদাশিবসঞ্জাতা বলা হয়।[৬]

পদ—বর্ণসমূহকে বলা হয় পদ বা পদাখ্যা।[৭] রাঘবভট্ট বর্ণসঙ্ঘ কথাটার ব্যাখ্যায় বলেছেন বর্ণসঙ্ঘ অর্থ বিন্দুযুক্ত বর্ণসমূহ।[৮] পদ মন্ত্রের অবয়ব। পদের অনেক ভেদ আছে।[৯] সহজ কথায় পদ শব্দ।

মন্ত্র—বিভিন্ন মাতৃকাবর্ণ থেকেই সমস্ত মন্ত্র উদ্ভূত হয়েছে।[১০] লক্ষ্য করা গেছে পরাশক্তি কুণ্ডলিনীই মাতৃকাবর্ণ। শারদাতিলকে স্পষ্টই বলা হয়েছে সর্বদেবময়ী দেবী কুণ্ডলিনীই সর্বমন্ত্রময়ী।[১১] কাজেই সমস্ত মন্ত্রই শক্তি। কুণ্ডলিনী শব্দব্রহ্ম। অতএব সমস্ত

১ প্র সা ত ৩।২০-২১ ২ ঐ ৩।২১-২২ ৩ ঐ ৩।২৩-২৪

৪ প্র সা ত ৩।২৪ ; শা তি ২।২৪

৫ ঐ ৩।২৫-২৭ ; শারদাতিলকে (২।২৬) পরাপরায়ণা ও অমৃতা নাই, আছে সূক্ষ্মামৃতা ও জ্ঞানামৃতা।

৬ শা তি ২।২৭

৭ বর্ণসঙ্ঘঃ পদাখ্যা স্যাৎ।—শা তি ৫।৯১

৮ বর্ণসঙ্ঘঃ সবিন্দুবর্ণাঃ।—ঐ, টীকা ৯ ঐ

১০ মাতৃকাবর্ণভেদেভ্যঃ সর্বে মন্ত্রাঃ প্রজজ্ঞিরে।—শা তি ২।৫৭

১১ সর্বদেবময়ী দেবী সর্বমন্ত্রময়ী শিবা।—ঐ ১।৫৫

মন্ত্রই শব্দব্রহ্ম। গন্ধর্বতন্ত্রে বলা হয়েছে—সর্বপ্রাণীর চৈতন্য শব্দব্রহ্মস্বরূপ। এই শব্দব্রহ্ম মন্ত্রবিদ্যাদিভেদে বর্ণরূপে ব্যক্ত হন।[১]

তন্ত্রের অভিমত সমস্ত বর্ণ পদ বাক্যাদি মন্ত্র।[২] কেন না এ-সব শব্দব্রহ্মেরই রূপভেদ। তবে বাহ্য বর্ণ পদ বাক্যাদি মন্ত্র নয়। বলা যায় মন্ত্ররূপা শক্তি এইগুলিকে অবলম্বন করে আবির্ভূতা হন।[৩] এইজন্য বলা হয়েছে যে-ব্যক্তি মন্ত্রকে লিপিমালার অক্ষরমাত্র মনে করে সে নরকে যাবে।[৪]

মন্ত্রের রূপ—যে-কোনো শব্দের আকারে মন্ত্র প্রকাশিত হতে পারে। কেন না মন্ত্র শক্তি। এইজন্য দেখা যায় শুধু সংস্কৃত ভাষায় নয়, বাংলা প্রভৃতি ভাষাতেও মন্ত্র আছে। আবার এমন সব মন্ত্র আছে নিছক ভাষার বিচারে যেগুলি অর্থহীন। তুকতাকের এ রকম বাংলামন্ত্র অনেক আছে। যাঁরা এই-সব মন্ত্রকে ফলপ্রদ মনে করেন তাঁরা মন্ত্রকে শব্দাভিব্যক্ত শক্তি বলেই জানেন।[৫]

তবে একটা কথা। সব শব্দই স্বরূপতঃ মন্ত্র হলেও সাধনার ব্যাপারে বিশেষ করে পূজাদি আধ্যাত্মিক সাধনার ব্যাপারে যে-সব শব্দ ব্যবহৃত হয় তাদেরই সাধারণতঃ মন্ত্র বলা হয়।[৬]

মন্ত্রের প্রাচীনত্ব—প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে মানুষ মন্ত্রে বিশ্বাস করেছে। যাদুমন্ত্রে বিশ্বাস আদিম মানবের একটি বৈশিষ্ট্য বলা চলে। সভ্য মানুষও সে-বিশ্বাস কোনোদিন সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করতে পারে নি। প্রাক্-আধুনিক যুগের সব সভ্য সমাজেই যাদুমন্ত্রে বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। লোকে যাদুমন্ত্রকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মনে করেছে। অনেক ক্ষেত্রেই এই-সব মন্ত্র অর্থহীন, অবোধ্য। হয়ত সেইজন্যই এইগুলিকে যাদুশক্তিসম্পন্ন মনে করা হত।

তন্ত্রশাস্ত্রকে বলা হয়েছে মন্ত্রশাস্ত্র।[৭] তন্ত্রে নানা রকমের বহুমন্ত্রের বিবরণ আছে। এই-সব মন্ত্রকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—এক; উচ্চ আধ্যাত্মিক সাধনার উপযোগী মন্ত্র; দুই—ইষ্টলাভ ও অনিষ্টপরিহারের অথবা শত্রুর অনিষ্টবিধানের উপযোগী মন্ত্র। যাদুমন্ত্র সবই দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে।

১ চৈতন্যং সর্বভূতানাং শব্দব্রহ্ম স্বরূপকম্। বর্ণরূপেণ তদ্ ব্যক্তং মন্ত্রবিদ্যাদিভেদতঃ।—গ ত ৪০।১০

২ সকলাক্ষরপদবাক্যাদীনাং মন্ত্রস্বরূপত্বমুপদিশতি।—ত রা ত ২০।৩৬-৩৩-এর টীকা

৩ P. T., Vol. II, 2nd Ed., p. 607

৪ গুরৌ মানুষবুদ্ধিং চ মন্ত্রে চাক্ষরভাবনাম্।
প্রতিমায়াং শিলাজ্ঞানং কুর্বাণো নরকং ব্রজেৎ।—প্রঃ ঐ, পৃঃ ৬১৫

৫ P. T., Vol. II, 2nd Ed., p. 607 ৬ G. L., p. 208 ৭ Ś. Ś., 4th Ed., p. 484

আমাদের দেশে অধ্যাত্ম-সাধনার উপযোগী মন্ত্রের প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় বেদে। বেদের মূল শ্লোকগুলিকেই মন্ত্র বলা হয়। বেদের দুই ভাগ, মন্ত্র আর ব্রাহ্মণ।[১] ব্রাহ্মণ-অংশকে মন্ত্র-অংশের ব্যাখ্যা বলা যায়।

মন্ত্রশব্দের ব্যাখ্যা—মন্ত্রশব্দের ব্যাখ্যা নানাভাবে করা হয়েছে। এই-সব ব্যাখ্যার মধ্যে প্রাচীনতম ব্যাখ্যা যাস্কের। তিনি বলেছেন যার দ্বারা মনন করা যায় তার নাম মন্ত্র।[২]

মন্ত্রশব্দের দুটি অংশ, মন্ এবং ত্র। মন্ ধাতু থেকে এসেছে মন্ আর ত্রৈ ধাতু থেকে ত্র। মন্ ধাতুর অর্থ মনন করা বা চিন্তা করা আর ত্রৈ ধাতুর অর্থ ত্রাণ করা। এই দুই অর্থ নিয়েই বিভিন্ন তন্ত্রাদিতে মন্ত্রশব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

শ্রীবিদ্যারত্নসূত্রম-এর ১ম শ্লোকের টীকায় উদ্ধৃত একটি শ্লোকে দেখা যায়—মননকে বলে মকার এবং ত্রাণকে ত্রকার। যা মননত্রাণসংযুক্ত তাকেই বলে মন্ত্র।[৩]

পিঙ্গলামততন্ত্রে বলা হয়েছে[৪]—যার থেকে বিশ্বের যথার্থ জ্ঞানের মনন এবং সংসারবন্ধন থেকে ত্রাণ সংসিদ্ধ হয় তাকে বলে মন্ত্র।

তন্ত্রমতে বিশ্বের যথার্থজ্ঞান বা বিশ্ববিজ্ঞান ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মাণ্ডের অভেদজ্ঞান।[৫]

গায়ত্রীতন্ত্রের ব্যাখ্যাটি কিঞ্চিৎ বিস্তৃত। বলা হয়েছে "যাঁহার মনন হেতু জীব পাপ হইতে আত্মত্রাণ সাধন করেন, যাঁহার মনন হেতু জীব স্বর্গভোগ করেন, যাঁহার মনন হেতু জীব মোক্ষলাভ করেন, এইরূপে জীব যাঁহার অবলম্বনে চতুর্বর্গময় হইয়া যান, তাঁহার নাম মন্ত্র।"[৬]

মন্ত্র কুণ্ডলিনী—মন্ত্রের এই-সব ব্যাখ্যা থেকেও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে মন্ত্র চিৎশক্তি কুণ্ডলিনীরই রূপ। কাজেই সব মন্ত্রই চেতন। শব্দ মন্ত্রের শরীর। শব্দকে ব্যবহারতঃ জড় বলে মানলেও তাতে মন্ত্রের চেতনত্ব ব্যাহত হয় না। কেন না জীবদেহ জড় হলেও দেহী জীব যেমন জড় হয় না তেমনি মন্ত্রদেহ শব্দকে জড় বললেও মন্ত্র জড় হয় না।[৭]

১ মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্।—দ্রঃ স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত উপনিষৎ-গ্রন্থাবলী, ১ম ভাগ, ভূমিকা, পৃঃ ৩

২ মন্ত্রা মননাৎ।—নিরুক্ত ৭।১২

৩ মকারং মননং প্রাহুস্ত্রকারস্ত্রাণমুচ্যতে। মননত্রাণসংযুক্তো মন্ত্র ইত্যভিধীয়তে।

৪ মননং বিশ্ববিজ্ঞানং ত্রাণং সংসারবন্ধনাৎ। যতঃ করোতি সংসিদ্ধো মন্ত্র ইত্যুচ্যতে ততঃ।

—দ্রঃ শা তি ৪।১-এর টীকা

৫ P. T., Vol. II, 2nd Ed., p 616.

৬ মননাৎ পাপতস্ত্রাতি মননাৎ স্বর্গমশ্নুতে।

মননান্মোক্ষমাপ্নোতি চতুর্বর্গময়ো ভবেৎ।—গায়ত্রীতন্ত্রবচন, দ্রঃ ত ত, পৃঃ ১২১

৭ শব্দশরীরস্ত জড়ত্বেঽপি শরীরিণামস্মাকমিব চেতনত্বোপপত্তেঃ। —বা বি ৭।৪৩-এর সে ব

সমস্ত মন্ত্র কুণ্ডলিনীর থেকে উদ্ভূত আর কুণ্ডলিনী জীবদেহে চৈতন্যরূপে অবস্থিতা। কাজেই সমস্ত মন্ত্র চৈতন্যরূপে জীবদেহে অবস্থিত। মন্ত্রের অর্থ সংস্কাররূপ চৈতন্যের অন্তর্ভুক্ত। যথাযথ সাধনার দ্বারা সেই অর্থ সাধকের শুদ্ধ চিত্তে প্রতিভাত হয়।[১]

চিত্ত ও মন্ত্র—বামকেশ্বরতন্ত্রের একটি বচনে আছে[২]—অব্যক্তবিগ্রহ শব্দব্রহ্মের থেকে সর্বকারণ ব্যক্তসত্ত্বগুণ বুদ্ধিতত্ত্ব উদ্ভূত হল। এইটিই সাংখ্যের মহত্তত্ত্ব। বুদ্ধিতত্ত্ব মন-বুদ্ধি-অহংকার-চিত্তস্বরূপ।[৩] কাজেই জীবের বুদ্ধিও মূলতঃ মন্ত্র। শিবসূত্রে স্পষ্টই বলা হয়েছে চিত্ত মন্ত্র।[৪] এই চিত্ত নির্মল চিত্ত। ভাস্কররায় লিখেছেন মননত্রাণধর্মত্ব থাকার জন্য নির্মলচিত্তই মন্ত্র।[৫]

এইজন্য মন্ত্রকে শুদ্ধমনন বা শুদ্ধ চিত্তের বৃত্তিও বলা হয়।[৬] যথোচিত সাধনার দ্বারা সাধকের মন মন্ত্রের আকারে আকারিত হয়ে যায়। মন্ত্র দেবতার শরীর।[৭] দেবতা ও মন্ত্র অভিন্ন।[৮] কাজেই সাধকের চিত্ত দেবময় হয়ে যায়। এইভাবে সাধক আর দেবতা এক হয়ে যান। সাধনার ক্ষেত্রে মন্ত্রের এইটিই চরম সার্থকতা।

মন্ত্রের অঙ্গ— তন্ত্রশাস্ত্রে মন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গের কথা বলা হয়েছে। তন্ত্রান্তরমতে[৯] ঋষি, ছন্দ, দেবতা, বীজ, শক্তি এবং কীলক এই ছয়টি মন্ত্রাঙ্গ। যেমন কালীমন্ত্রের ঋষি ভৈরব, ছন্দ উষ্ণিক্, দেবতা কালিকা, বীজ হ্রীঁ, শক্তি হুঁ[১০] এবং কীলক আদ্যবীজ অর্থাৎ ক্রীঁ।[১১]

তবে মন্ত্রাঙ্গ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। ত্রিপুরাসিদ্ধান্তে দেখা যায়— ঋষি, ছন্দ, বীজ, কীলক, শক্তি, অঙ্গন্যাস এবং ধ্যান মন্ত্রের এই সাতটি অঙ্গ।[১২]

১ G. L., p. 212

২ অব্যক্তবিগ্রহাচ্ছব্দব্রহ্মণঃ সর্বকারণম্।
ব্যক্তসত্ত্বগুণং ব্যক্তং বুদ্ধিতত্ত্বমজায়ত।—দ্রঃ, শা তি ১।১৭-এর টীকা ৩ ঐ

৪ চিত্তং মন্ত্রঃ।—দ্রঃ ল স ২০১-এর সৌ ভা

৫ মননত্রাণধর্মত্বান্নির্মলচিত্তমেব বা মন্ত্রঃ।—ল স ২০১-এর সৌ ভা ৬ G. L., p. 145

৭ সর্বেষামেব দেবানাং মন্ত্রমাত্রং শরীরকম্।—স ত ৪০।১২

৮ মন্ত্ররূপো ভবেদ্দেবঃ।—শ স ত, তা খ, ৫৮।৩

৯ দ্রঃ ঋষিং ন্যসেন্মূর্ধ্নিদেশে ইত্যাদি বচন, দ্রঃ শ্যামারহস্য, ১ম পরিচ্ছেদ

১০ ভৈরবোঽস্য ঋষিঃ প্রোক্ত উষ্ণিক্ ছন্দ উদাহৃতম্। দেবতা কালিকা প্রোক্তা লজ্জাবীজন্তু বীজকম্।
শক্তিস্তু কূর্চবীজং স্যাদনিরুদ্ধসরস্বতী।—কালীতন্ত্র ১।৮-৯

১১ কীলকং চাদ্যবীজন্তু চতুর্বর্গার্থসিদ্ধয়ে।—কালীক্রমবচন, দ্রঃ, শ্যামারহস্য, ১ম পরিচ্ছেদ

১২ ঋষিশ্ছন্দশ্চ বীজং চ কীলকং শক্তিরেব চ।
অঙ্গন্যাসস্ততো ধ্যানং মন্ত্রাঙ্গানাং চ সপ্তকম্।—দ্রঃ শ্রীবিদ্যারত্নসূত্রম্ ১-এর দীপিকা

গায়ত্রীতন্ত্রের মতে মন্ত্রের অঙ্গ পাঁচটি। যথা—আবাহন, ধ্যান, স্মরণ, সমর্পণ এবং বিসর্জন।[১]

আবশ্যিক চার বস্তু—আচার্যদের মতে মন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে চারটি বস্তুর জ্ঞানের উপর। বস্তু চারটি—ঋষি ছন্দ দেবতা ও বিনিয়োগ। গৌতমীয়তন্ত্রে বলা হয়েছে—ঋষি ও ছন্দের জ্ঞান ব্যতীত মন্ত্র ফলপ্রদ হয় না। আর মন্ত্রের বিনিয়োগ যাঁরা জানেন না তাঁদের মন্ত্র নির্বীর্য হয়ে যায়।[২]

ঋষি—ঋষি সম্বন্ধে বলা হয়েছে[৩] যে-মন্ত্রের যিনি দ্রষ্টা এবং যে-মন্ত্রের দ্বারা যিনি সিদ্ধিলাভ করেছেন সেই মন্ত্রের তিনি ঋষি। ঋষি তপ এবং যোগবলে সেই মন্ত্র প্রথম অবগত হন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় শাস্ত্রমতে শাস্ত্রীয় সমস্ত মন্ত্র অপৌরুষেয়। কোনো সাধক ঋষির হৃদয়ে মন্ত্রের আবির্ভাব হয়। ঋষি শুধু মন্ত্র অবগত হন বা তার সাক্ষাৎকার করেন।[৪]

গৌতমীয়তন্ত্রে বলা হয়েছে[৫] যে-শুদ্ধাত্মা গুরু তপস্যার দ্বারা মহেশ্বরের মুখ থেকে মন্ত্র অবগত হয়ে প্রথমে তার সাধন করেন তিনিই সেই মন্ত্রের ঋষি বলে গণ্য হন।

দেখা যাচ্ছে মন্ত্রের স্রষ্টা স্বয়ং মহেশ্বর, কোনো পুরুষ নয়।

ছন্দ—ছন্দের বিষয়ে বলা হয়েছে[৬]—পুরাকালে মৃত্যুভীত দেবতারা নিজেদের আচ্ছাদন করার জন্য ছন্দসমূহের স্মরণ করেন। সেই-সব ছন্দের দ্বারা দেবতারা আবৃত হন। আচ্ছাদনের থেকেই ছন্দ কথাটি এসেছে।[৭] সমস্তই ছন্দের দ্বারা আবৃত।

দেবতা—দেবতা সম্বন্ধে বলা হয়েছে, যে-মন্ত্রের উদ্দিষ্ট যে-দেবতা সেই মন্ত্রের দেবত্বের রূপও তাই। দেবত্বকেই দেবতা বলা হয়।[৮]

১ আবাহনং যথা অঙ্গং ধ্যানঞ্চ স্মরণং যথা। তথা অঙ্গং মহাদেব সমর্পণবিসর্জনম্।
পঞ্চাঙ্গং সর্ববিদ্যায়া সর্বশাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা (তম্ ?)।—গায়ত্রীতন্ত্র, ২য় ব্রাহ্মণ পটল

২ ঋষিচ্ছন্দোঽপরিজ্ঞানান্ন মন্ত্রঃ ফলভাগ্ ভবেৎ।
দৌর্বল্যং যাতি মন্ত্রাণাং বিনিয়োগ অজানতাম্।—গৌ ত, ২য় অঃ

৩ যেন যৎ ঋষিণা দৃষ্টং সিদ্ধিঃ প্রাপ্তা চ যেন বৈ।
মন্ত্রেণ তস্য তৎ প্রোক্তমৃষের্ভাবস্তদার্ষকম্।—ত্রঃ শা তি ১।৫-এর টীকা

৪ সাক্ষাৎকৃতধর্মাণ ঋষয়ো বভূবুঃ।—নিরুক্ত ১।২০

৫ মহেশ্বরমুখাজ্জ্ঞাত্বা গুরুর্যস্তপসা মনুম্।
সংসাধয়তি শুদ্ধাত্মা পূর্বং স ঋষিরীরিতঃ।—ত্রঃ, শা তি ১।৫-এর টীকা

৬ মৃত্যুভীতৈঃ পুরা দেবৈরাত্মনশ্ছাদনায় চ। ছন্দাংসি সংস্মৃতানীহ ছাদিতাস্তৈস্ততোঽমরাঃ।
ছাদনাচ্ছন্দ উদ্দিষ্টং সর্বং ছন্দোভিরাবৃতম্।— ঐ

৭ ছন্দাংসি ছাদনাৎ।—নিরুক্ত ৭।১২

৮ যস্য যস্য চ মন্ত্রস্য উদ্দিষ্টা যা তু দেবতা। আকারং তদেবত্বং দৈবতং দেবতোচ্যতে।
ত্রঃ শা তি ১।৫-এর টীকা

বিনিয়োগ— বিনিয়োগ বা প্রয়োগ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-জনক কর্মে শাস্ত্রনির্দিষ্ট উপায়ে মন্ত্রের যোজনাকে বিচক্ষণ ব্যক্তিরা বলেন বিনিয়োগ।[১]

প্রসঙ্গতঃ বলা যায় সাধনমর্মজ্ঞরা বলেন আধ্যাত্মিক সাধনামাত্রেই ঋষি ছন্দ দেবতা ও বিনিয়োগ পরিলক্ষিত হয়। "ঋষি তত্ত্বদর্শী গুরু, ছন্দ সাধনপ্রণালী, দেবতা অপূর্ব সুপ্ত আরাধ্য শক্তি, বিনিয়োগ সেই শক্তিকে সাধনবলে জাগ্রত করে এবং নির্দিষ্টরূপে চালিত করে পূর্ণসিদ্ধি লাভ।[২]

মন্ত্রের ভেদ—তন্ত্রশাস্ত্রে মন্ত্রের কয়েক প্রকারের ভেদ বর্ণিত হয়েছে। বর্ণের মতো মন্ত্রেরও স্ত্রী, পুরুষ এবং নপুংসক এই তিন ভাগ করা হয়েছে। রাঘবভট্ট লিখেছেন বিশেষপ্রয়োগসিদ্ধির জন্য এ রকম ভাগ করা হয়েছে।[৩] নৈলে নিষ্কলচৈতন্য-অখণ্ডানন্দবাচ্য মন্ত্রের আবার স্ত্রীপুরুষাদি ভেদ কি? বস্তুতঃ এ রকম কোনো ভেদ নেই। উপাসকদের প্রয়োজনে এরূপ ভেদ কল্পিত হয়েছে।[৪]

যে-সব মন্ত্রের উদ্দিষ্ট দেবতা পুরুষ তাদের বলা হয় পুরুষমন্ত্র আর যে-সবের উদ্দিষ্ট দেবতা স্ত্রী তাদের বলা হয় স্ত্রীমন্ত্র বা বিদ্যা। বাকী সব মন্ত্র নপুংসক।[৫] মন্ত্র শব্দটি সাধারণ। স্ত্রী পুরুষ নপুংসক সব মন্ত্রই মন্ত্র।[৬]

তন্ত্রশাস্ত্রের বিধান পুংমন্ত্রের শেষে থাকবে হুঁ ফট্, স্ত্রীমন্ত্রের শেষে স্বাহা এবং নপুংসক-মন্ত্রের শেষে নমঃ।[৭] তবে কোনো কোনো তন্ত্রমতে পুংমন্ত্রের শেষে বষট্ ফট্, স্ত্রীমন্ত্রের শেষে বৌষট্ স্বাহা এবং নপুংসক মন্ত্রের শেষে হুঁ নমঃ থাকবে।[৮] এই ত্রিবিধ মন্ত্র বশ্য-ক্রিয়া, শান্তি-ক্রিয়া এবং আভিচারিক-ক্রিয়ায় প্রশস্ত।[৯]

---

১ ধর্মার্থকামমোক্ষেষু শাস্ত্রমার্গেণ যোজনম্।
সিদ্ধমন্ত্রস্য সম্প্রোক্তো বিনিয়োগো বিচক্ষণৈঃ।—দ্রঃ শা তি ১।৫-এর টীকা

২ পূ ত, p. ৮১.

৩ প্রয়োগবিশেষসিদ্ধ্যর্থং মন্ত্রাণাং ত্রৈবিধ্যমাহ পুংস্ত্রীতি।—শা তি ২।৫৮-এর টীকা

৪ নমু নিষ্কলচৈতন্যাখণ্ডানন্দবাচ্যস্য মন্ত্রস্য কথং পুংস্ত্র্যাদিকল্পনমিতি চেৎ সত্যম্। বস্তুতো নাস্ত্যেব। উপাসকানামর্থে কল্পনামাত্রম্।—ঐ

৫ মন্ত্রবিদ্যাবিভাগেন ত্রিবিধা মন্ত্রজাতয়ঃ। পুংস্ত্রীনপুংসকাত্মানো মন্ত্রাঃ সর্বে সমীরিতাঃ।
মন্ত্রাঃ পুংদেবতা জ্ঞেয়া বিদ্যাঃ স্ত্রীদেবতাঃ স্মৃতাঃ।—শা তি ২।৫৭-৫৮

৬ S. Ś, 4th Ed., p. 498

৭ পুংমন্ত্রা হুংফড়ন্তাঃ স্যুর্দ্বিঠান্তাশ্চ স্ত্রিয়ো মতাঃ।
নপুংসকা নমোহন্তাঃ স্যুরিত্যুক্তা মনবস্ত্রিধা।—শা তি ২।৫৯

৮ বষট্ফড়ন্তাঃ পুংলিঙ্গা বৌষট্স্বাহান্তগাঃ স্ত্রিয়ঃ।
নপুংসকা হুঁ নমোহন্তা ইতি মন্ত্রাস্ত্রিধা স্মৃতাঃ।—প্রয়োগসারবচন, দ্রঃ ঐ ২।৫৮-এর টীকা

৯ শস্তাস্তে ত্রিবিধা মন্ত্রা বশ্যশান্ত্যভিচারকে।—শা তি ২।৬০

মন্ত্রের সৌম্য এবং সৌর এই দুই ভাগও করা হয়েছে। সব পুংমন্ত্র সৌর আর সব স্ত্রীমন্ত্র বা বিদ্যা সৌম্য।[১]

আবার আগ্নেয় ও সৌম্য এই দুই শ্রেণীর মন্ত্রেরও বিবরণ পাওয়া যায়। আগ্নেয়মন্ত্র অগ্নিদৈবত। এ রকম মন্ত্রে রং ঔ ক্ষং হং এই বীজগুলির যে-কোনো বীজ প্রায়ই থাকে। সৌম্যমন্ত্র সোমদৈবত। এ রকম মন্ত্রে "ইন্দু (স) ও অমৃতাক্ষর (ব) অধিক পরিমাণে থাকিবে।" আগ্নেয়মন্ত্র ক্রূরকর্মে এবং সৌম্যমন্ত্র সৌম্যকর্মে অর্থাৎ শান্তি প্রভৃতি কর্মে ব্যবহৃত হয়।[২]

স্ত্রীমন্ত্র ও পুংমন্ত্র ভুক্তিমুক্তিপ্রদ—তন্ত্রশাস্ত্রে জীবের ভুক্তিমুক্তির বিধান করা হয়েছে। সেই কাজে স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়বিধ মন্ত্রের উপাসনা বিহিত হয়েছে। মেরুতন্ত্রে আছে—স্ত্রীমন্ত্র ভোগদ আর পুংমন্ত্র মোক্ষদ, উভয়ের উপাসনা ভুক্তিমুক্তি প্রদান করে।[৩]

তবে এ কথাও বলা হয়েছে কলিকালে বিদ্যা বা স্ত্রীমন্ত্র পূর্ণফল প্রদান করে। শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত একটি তন্ত্রবচনে আছে—কালী, নীলা, মহাদুর্গা, ত্বরিতা, ছিন্নমস্তা, বাগ্‌বাদিনী, অন্নপূর্ণা, প্রত্যঙ্গিরা, কামাখ্যাবাসিনী, বালা, মাতঙ্গী, শৈলবাসিনী ইত্যাদি সমস্ত বিদ্যা কলিতে পূর্ণফলপ্রদা।[৪]

সিদ্ধাদি-মন্ত্র—আবার মন্ত্রের অন্যরকম শ্রেণীবিভাগও করা হয়। পুরশ্চর্যার্ণবে উদ্ধৃত বারাহসংহিতার একটি বচনে বলা হয়েছে—পণ্ডিত ব্যক্তি সিদ্ধ সাধ্য সুসিদ্ধ এবং অরি মন্ত্রের এই চার শ্রেণী গণ্য করবেন। সিদ্ধমন্ত্র জপের দ্বারা সাধ্যমন্ত্র হোমাদির দ্বারা এবং সুসিদ্ধ মন্ত্র প্রাপ্তিমাত্র সিদ্ধিদায়ক হয় আর অরিমন্ত্র সাধককে ভক্ষণ করে।[৫]

এই কথাগুলিই একটু অন্যরকমভাবে বলা হয়েছে পিঙ্গলামততন্ত্রে। তাতে আছে—সিদ্ধমন্ত্র কালে সিদ্ধিদায়ক হয়, সাধ্যমন্ত্র জপহোমের দ্বারা সিদ্ধিদায়ক হয়, সুসিদ্ধমন্ত্র গ্রহণমাত্রই সিদ্ধি প্রদান করে এবং অরিমন্ত্র মূল কেটে দেয়।[৬]

---

১ দ্বিধা প্রোক্তাশ্চ তে মন্ত্রাঃ সৌম্যসৌরবিভাগতঃ। সৌরাঃ পুংদেবতা মন্ত্রাস্তে চ মন্ত্রাঃ প্রকীর্তিতাঃ। সৌম্যাঃ স্ত্রীদেবতাস্তাশ্চ বিদ্যাস্তে ইতি বিশ্রুতাঃ।—প্রয়োগসারবচন দ্রঃ শা তি ২।৫৭-এর টীকা

২ অগ্নীষোমাত্মকা মন্ত্রা বিজ্ঞেয়াঃ ক্রূরসৌম্যয়োঃ। [illegible]
আগ্নেয়া মনবঃ সৌম্যা ভূয়িষ্ঠেন্দ্বমৃতাক্ষরাঃ।—শা তি ২।৬০-৬১

৩ স্ত্রীমন্ত্রো ভোগদঃ প্রোক্তঃ পুংমন্ত্রো মোক্ষদঃ পরম্।
উভয়োপাসনং দেবা ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্।—মেরুতন্ত্রবচন, দ্রঃ পু চ, ১ম তরঙ্গ, পৃঃ ১৪

৪ কালী নীলা মহাদুর্গা ত্বরিতা ছিন্নমস্তকা। বাগ্‌বাদিনী চান্নপূর্ণা তথা প্রত্যঙ্গিরা পুনঃ।
কামাখ্যাবাসিনী বালা মাতঙ্গী শৈলবাসিনী। ইত্যাদ্যাঃ সকলবিদ্যাঃ কলৌ পূর্ণফলপ্রদাঃ।
—শা ত, ৩য় উল্লাস

৫ সিদ্ধসাধ্যসুসিদ্ধারিক্রমেণ গণয়েদ্ বুধঃ। সিদ্ধাদীন্ সিদ্ধিদঃ সিদ্ধো জপাৎ সাধ্যো হুতাদিভিঃ।
সুসিদ্ধ প্রাপ্তিমাত্রেণ সাধকং ভক্ষয়েদরিঃ।—পু চ, ১ম তরঙ্গ, পৃঃ ৫০

৬ সিদ্ধঃ সিদ্ধ্যতি কালেন সাধ্যস্তু জপহোমতঃ। সুসিদ্ধো গ্রহণাদেব শত্রুর্মূলানি কৃন্ততি।—ঐ ঐ

ঋণী ধনী—মন্ত্রকে ঋণী ও ধনী এই দুই শ্রেণীতেও ভাগ করা হয়। মন্ত্র ঋণী কি ধনী তার বিচার করা হয় দীক্ষাগ্রহণের সময়। বিচারের বিস্তৃত পদ্ধতি আছে। মোটামুটি বলা যায় সাধ্যমন্ত্রের বর্ণসংখ্যা এবং সাধকের নামের সংখ্যা নিয়ে এই বিচার হয়। বিশেষ পদ্ধতি অনুসারে প্রাপ্ত সাধ্যমন্ত্রের সংখ্যা যদি সেইভাবে প্রাপ্ত সাধকের নামের বর্ণসংখ্যা থেকে অধিক হয় তবে মন্ত্রকে বলা হয় ঋণী আর যদি ন্যূন হয় তা হলে ধনী। ঋণী-মন্ত্র শুভদ বলে গ্রহণীয় এবং ধনী-মন্ত্র অকল্যাণকর বলে বর্জনীয়।[১]

পিণ্ড কর্তরী ইত্যাদি—অক্ষরসংখ্যা অনুসারেও মন্ত্রের বিভিন্ন ভেদ নির্দেশ করা হয়। একাক্ষর মন্ত্রের নাম পিণ্ড, দ্ব্যক্ষর মন্ত্রের নাম কর্তরী, তিন থেকে নয় পর্যন্ত অক্ষরের মন্ত্রের নাম বীজক, দশ থেকে বিশ পর্যন্ত অক্ষরের মন্ত্রকে বলা হয় মন্ত্রক আর তার চেয়ে অধিক অক্ষরের মন্ত্রকে বলা হয় মালা।[২] তবে সাধারণতঃ একাক্ষর মন্ত্রকে বীজ বলা হয়।[৩]

বীজমন্ত্র—প্রকৃত প্রস্তাবে নাদবিন্দুযুক্ত প্রত্যেকটি বর্ণই একটি বীজমন্ত্র। প্রত্যেকটি মাতৃকাবর্ণই যে মন্ত্র তা আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি। প্রপঞ্চযাগের হোম সম্বন্ধে রাঘবভট্ট লিখেছেন প্রত্যেক অক্ষরের ঋষি ছন্দ দেবতা বীজ উচ্চারণ করে সেই অক্ষরের ধ্যান করে সেই অক্ষরের দ্বারাই গন্ধাদি প্রদান করতে হবে এই অর্চনাক্রম।[৪] প্রত্যেক অক্ষরকে মন্ত্ররূপে ব্যবহারের এটি একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন।

সাধারণতঃ বীজমন্ত্র একবর্ণাত্মক। কিন্তু তন্ত্রে এমন একাক্ষর বীজমন্ত্র আছে বিশ্লেষণ করলে যার মধ্যে একাধিক বর্ণ পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ক্রীঁ এই বীজমন্ত্রটির উল্লেখ করা যায়। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এর মধ্যে ক্ র্ ঈ এবং ঁ এই কটি বর্ণ আছে। অথচ ক্রীঁ একাক্ষর বলে গণ্য। এ রকম অক্ষরকে বলা হয় বীজাক্ষর।[৫]

ব্যুৎপত্তি ও ব্যাখ্যা— শব্দকল্পদ্রুমে বীজ শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করা হয়েছে এই ভাবে- বিশেষরূপে অর্থাৎ কার্যরূপে এবং অপত্যরূপে জাত হয় এই অর্থে বি পূর্বক জন্ ধাতুর উত্তর ড প্রত্যয় করে বীজ শব্দ নিষ্পন্ন হয়।[৬]

---

১ বৃ ত সা, পৃঃ ১৭-১৮

২ মন্ত্রা একাক্ষরাঃ পিণ্ডাঃ কর্তর্যো দ্ব্যক্ষরাঃ স্মৃতাঃ।
বর্ণত্রয়ং সমারভ্য নবার্ণাবধি বীজকাঃ। ততো দশার্ণমারভ্য যাবদ্বিংশতি মন্ত্রকাঃ।
তত ঊর্ধ্বং গতা মালাস্তাসু ভেদো ন বিদ্যতে।—ত রা ত ৩৫।২৮-২৯   ৩ S. Ś 4th Ed., p. 498

৪ তত্র প্রত্যক্ষরমৃষিচ্ছন্দোদেবতাশক্তিবীজান্যুচ্চার্য ধ্যানং কৃত্বা তেনৈবাক্ষরেণ গন্ধাদি
দত্তাদিত্যর্চনাক্রমঃ।—শা তি-এর ৩।৮১ টীকা

৫ Tantrābhidhāna, Preface, p. iii.

৬ বিশেষেণ কার্যরূপেণ অপত্যরূপেণ চ জায়তে ইতি বি+জন্+উপসর্গে চ সংজ্ঞায়াম্ ইতি ডঃ।

এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে দেখা যাচ্ছে বীজ কারণ এবং তা-ই কার্যরূপে প্রকটিত হয়। যেমন কারণরূপ বটবীজই কার্যরূপ বটবৃক্ষরূপে প্রকটিত হয়। বীজের মতো যে-মন্ত্র থেকে দেবনামাত্মক মন্ত্রের তথা দেবতার উদ্ভব হয় কিংবা বীজের মতো যে-মন্ত্র দেবনামাত্মক মন্ত্র তথা দেবতারূপে প্রকটিত হয় তাই বীজমন্ত্র।

বীজমন্ত্রের অন্যরকম ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়। যেমন বীজ না বুনলে গাছ এবং তার পাতা ফুল ফল ইত্যাদি পাওয়া যায় না তেমনি প্রথমে আপন ইষ্টদেবতার বীজমন্ত্রে দীক্ষা না নিলে অন্য মন্ত্র গ্রহণের অধিকারী হওয়া যায় না। সেইজন্য দীক্ষার সময় যে-দেবতার মন্ত্র গ্রহণ করা হয় তাকেই বীজমন্ত্র বলে। দেবতার নামঘটিত-মন্ত্র এই মহামন্ত্রের অঙ্কুর।[১]

তন্ত্রমতে শব্দার্থময় চরাচর জগতের উদ্ভব হয়েছে শব্দব্রহ্ম কুণ্ডলিনী থেকে। এর অর্থ কুণ্ডলিনীই বিশ্বের কারণ বা বীজ। আবার কুণ্ডলিনীই বিশ্বরূপে অভিব্যক্ত। এর অর্থ কুণ্ডলিনীই কার্য। এই জন্য তন্ত্রের বিচারে জগৎ মন্ত্রময়।[২]

শব্দই মন্ত্র। বিশ্বের প্রতিটি বস্তুর একটি শব্দরূপ আছে। এই শব্দ তার স্বভাবগত শব্দ। এই স্বভাবগত শব্দই বস্তুটির স্বভাবগত নাম। বস্তু স্বরূপতঃ কুণ্ডলিনী শক্তি। কুণ্ডলিনীর যে যে বিশেষ রূপের দ্বারা অর্থাৎ যে যে শক্তির দ্বারা কোনো বিশেষ বস্তু গঠিত, সেই সেই শক্তির স্পন্দন- বা গতি-জাত শব্দই সেই বস্তুর স্বভাবগত শব্দ, এইটি তার বীজ। ধরা যাক অগ্নির কথা। অগ্নির বীজ রঁ বা রং। কুণ্ডলিনীশক্তির যে-বিশেষ রূপ অগ্নি, তার সূক্ষ্ম শব্দরূপের বৈখরীস্তরে অভিব্যক্তি রং।[৩] সহজ কথায় বলা যায় রং অগ্নিশক্তির ব্যক্ত, সূক্ষ্মরূপ। এই সূক্ষ্মরূপই স্থূল অগ্নিরূপে পরিলক্ষিত হয়। এইজন্য রং অগ্নির বীজ। এইভাবে আকাশের বীজ হং, বায়ুর বীজ যং, জলের বীজ বং এবং পৃথিবীর বীজ লং।

তন্ত্রের অভিমত যদি কোনো ব্যক্তি এমনি কোনো বীজকে প্রবুদ্ধ করে অর্থাৎ যথাবিধি তার চৈতন্য সম্পাদন করে মনে মনে বা মুখে উচ্চারণ করেন তবে যে-বস্তুর বীজ উচ্চারণ করবেন সে বস্তু তাঁর সামনে প্রকট হবে।[৪]

বীজমন্ত্র ও দেবতা—অতএব বীজমন্ত্র বস্তুতঃ দেবতারই সূক্ষ্ম ব্যক্তরূপ। বৃহদ্গান্ধর্বতন্ত্রে আছে—দেবি, শোন, তোমাকে বীজসমূহের দেবরূপতার কথা বলছি। বীজমন্ত্রের উচ্চারণ-মাত্রই দেবরূপের উদ্ভব হয়।[৫] এর অর্থ যথাশাস্ত্র বীজমন্ত্রের উচ্চারণ করলে যে-দেবতার বীজমন্ত্র সেই দেবতার আবির্ভাব হয়।

১ P. T., Vol II, 2nd Ed., pp. 734-785

২ বিশ্বাত্মনা প্রবৃত্তা সা সূতে মন্ত্রময়ং জগৎ।—শা তি ১।৫৭ ৩ G. L. 3rd Ed, p. 211. ৪ ঐ

৫ শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি বীজানাং দেবরূপতাম্।

মন্ত্রোচ্চারণমাত্রেণ দেবরূপং প্রজায়তে।—দ্রঃ G. L., 3rd Ed., p. 245

যামলে বলা হয়েছে—বীজ থেকে নিশ্চয়ই দেবতার শরীরের উদ্ভব হয়। সাধক সেই সেই দেবতার বীজাত্মক মন্ত্র অর্থাৎ যে-দেবতার যে-বীজ সেই বীজাত্মক সেই দেবতার মন্ত্র জপ করে ব্রহ্মময় হবেন।[১]

এই ব্যাপারটাকে অন্যভাবেও বলা যায়। বীজমন্ত্র শক্তির সূক্ষ্ম ব্যক্তরূপ। যথাশাস্ত্র প্রক্রিয়ার দ্বারা বীজমন্ত্রকে জাগাতে পারলে যে-দেবতার বীজমন্ত্র সেই দেবশক্তি ক্রিয়াশীল হয়। স্বামী নিগমানন্দ লিখেছেন—"দেবদেবীর বীজমন্ত্রে তাঁহাদের সূক্ষ্ম শক্তি নিহিত থাকে; শুনিতে সামান্য বর্ণমাত্র কিন্তু ক্রিয়া দ্বারা তাহার শক্তি জাগাইয়া দিলে যে দেবতার বীজ সেই দেবতাশক্তির কার্য করিবে।"[২]

প্রত্যেক দেব বা দেবীর বীজমন্ত্র আছে। যেমন ক্লীং কৃষ্ণের বীজমন্ত্র; ক্রীং কালীর বীজমন্ত্র, ঐং সরস্বতীর বীজমন্ত্র, হৌং শিবের বীজমন্ত্র, শ্রীং লক্ষ্মীর বীজমন্ত্র ইত্যাদি।[৩]

কোনো কোনো বীজাক্ষর একাধিক দেবতার বীজমন্ত্ররূপেও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ক্লীং। এটি কামবীজ, কামেশ্বরীবীজ, গুহ্যকালীবীজ আবার কৃষ্ণ- বা গোপাল-বীজ।[৪]

সাধারণ ভাষার ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায় একই মূল শব্দের অনেক অর্থ থাকে। প্রসঙ্গ অনুসারে অর্থ ঠিক করতে হয়।

বীজমন্ত্রের বেলাও ঠিক এই ব্যাপারটি ঘটেছে। বীজাক্ষর যে-দেবতার মূল মন্ত্রের অঙ্গীভূত বা প্রয়োগের বেলা তার সঙ্গে যুক্ত হয়, সেই দেবতারই বীজমন্ত্র হয়ে থাকে। যেমন ক্লীং কৃষ্ণ এই ত্র্যক্ষর এবং ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ[৫] এই ষড়ক্ষর কৃষ্ণমন্ত্রের অঙ্গীভূত যে ক্লীং তা কৃষ্ণবীজ। তেমনি ক্লীং হূং হ্রীং গুহ্যে কালিকে ক্লীং ক্লীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং স্বাহা[৬] এই ষোড়শাক্ষর গুহ্যকালিকামন্ত্রের অঙ্গীভূত ক্লীং যে গুহ্যকালীবীজ তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। যেখানে মন্ত্র একাক্ষর বীজমন্ত্র সেখানেও অসুবিধা হয় না। কেন না মন্ত্র সাধনরাজ্যের বস্তু। দীক্ষার সময়েই সাধক আপন আরাধ্য দেবতার বীজমন্ত্র গুরুর কাছে পান। কাজেই তিনি যে-বীজমন্ত্র পান তা এক বিশেষ দেবতারই মন্ত্র, অন্য দেবতার মন্ত্র নয়। সেই বীজটি অন্য দেবতার বীজও হতে পারে কিন্তু সেই সাধকের পক্ষে নয়।

উদ্ধৃত গুহ্যকালীর মন্ত্রে দেখা যায় একাধিক বীজ এবং একই বীজ একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে। গুহ্যকালী বীজ ক্লীং হয়েছে তিনবার, কূর্চ-বীজ হূং তিনবার এবং মায়া-বীজ হ্রীং তিনবার।

১ দেবতায়াঃ শরীরন্তু বীজাদুৎপদ্যতে ধ্রুবম্।
তত্তদ্‌বীজাত্মকং মন্ত্রং জপ্ত্বা ব্রহ্মময়ো ভবেৎ।—যামলবচন, দ্রঃ শা ত, ৩য় উল্লাস

২ যোগী গুরু, ৭ম সং পৃঃ ২৮৩   ৩ তন্ত্রাভিধান, পৃঃ ৬৫-৬৭

৪ ঐ পৃঃ ৬২   ৫ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ১৮৭   ৬ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৩২৪

এমনি আরও অনেক মন্ত্রে হয়েছে। যেমন শ্রীং হ্রীং ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় স্বাহা,[১] শ্রীং হ্রীং ক্লীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ক্লীং হ্রীং শ্রীং।[২] দুটিই কৃষ্ণমন্ত্র।

বীজ ছাড়া মন্ত্র—বীজ ছাড়াও মন্ত্র থাকতে পারে। যেমন দশাক্ষর বাগীশ্বরীমন্ত্র—বদ বদ বাগ্‌বাদিনী স্বাহা।[৩] এ রকম মন্ত্র বীজের দ্বারা পুটিত হলে অন্য মন্ত্র হয়ে যায়। যেমন পূর্বোক্ত বাগীশ্বরীমন্ত্র হ্রীং বীজের দ্বারা পুটিত হলে অর্থাৎ তার আদিতে ও অন্তে হ্রীং বীজ যোগ করলে এটি মহালারস্বত মন্ত্র হয়ে যায়। তখন মন্ত্রটি হবে হ্রীং বদ বদ বাগ্‌বাদিনী স্বাহা হ্রীং।[৪]

শুধু বীজ—আবার শুধু বীজ দিয়েও মন্ত্র হয়। যেমন মহাকালীর মন্ত্র ক্রীং হুং হ্রীং।[৫]

একই দেবতার একাধিক মন্ত্র—একই দেবতার একাধিক মন্ত্র আছে। সাধারণতঃ মন্ত্রের অক্ষরসংখ্যা অনুসারেই মন্ত্র ভিন্ন হয়। তবে একই দেবতার সমাক্ষর মন্ত্রও ভিন্ন হতে পারে। যেমন একটি অষ্টাক্ষর কৃষ্ণমন্ত্র—ক্লীং হৃষীকেশায় নমঃ; অন্য একটি—শ্রীং হ্রীং ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা।[৬]

এ রকম ভেদের কারণ শাস্ত্রজ্ঞ সাধকেরাই নির্দেশ করতে পারেন। তবে আমাদের অনুমান অধিকারীর ভেদ, সাধনার লক্ষ্যের ভেদ, সম্প্রদায়ের ভেদ ইত্যাদি নানা কারণে মন্ত্রের এ রকম ভেদ হয়েছে।

বীজমন্ত্র কি অর্থহীন?—যাঁরা মন্ত্রশাস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত নন বীজমন্ত্রগুলি তাঁদের কাছে কতকগুলি অর্থহীন এবং অনেক ক্ষেত্রে অদ্ভুত অক্ষরসমষ্টি মাত্র। এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। যাঁরা নিরক্ষর তাঁদের কাছে নিজের ভাষার অক্ষরগুলিও অর্থহীন। যাঁরা লেখাপড়াজানা লোক তাঁদের কাছেও আপন ভাষার সংকেতলিপি ততদিন অর্থহীন যতদিন তাঁরা সে সংকেতলিপির অর্থ না জানেন। এ ছাড়া যে-ভাষা যাঁর জানা নেই সে-ভাষা এবং তার লিপি তাঁর কাছে অর্থহীন। বীজমন্ত্রগুলির বেলাও ঠিক এই ব্যাপার ঘটে।

সাংকেতিক ভাষায় মন্ত্র—মন্ত্রশাস্ত্রের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত বীজমন্ত্রের অর্থ তাঁদের কাছে সুস্পষ্ট। তন্ত্রশাস্ত্রে মন্ত্রগুলি দেওয়া আছে সাংকেতিক ভাষায়। প্রত্যেকটি মাতৃকা-বর্ণের একাধিক বাচক শব্দ আছে। সেই বাচক শব্দ দিয়ে মন্ত্রটি বিবৃত হয়। মনে হয় অনধিকারী ব্যক্তিদের কাছে মন্ত্র গোপন রাখার জন্যই এ রকম করা হত। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। শ্রীকৃষ্ণের একাক্ষর বীজমন্ত্রটি এইভাবে বর্ণিত হয়েছে—কামাক্ষরং ধরাসংস্থং শান্তিবিন্দুবিভূষিতম্।[৭] এই শব্দগুলির প্রচলিত সাধারণ অর্থ গ্রহণ করলে উদ্ধৃত

১ বৃহৎ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ১৮৫ ২ ঐ পৃঃ ১৮৬ ৩ ঐ, পৃঃ ১২৫ ৪ ঐ
৫ ঐ পৃঃ ৩২০ ৬ ঐ পৃঃ ১৮৪ ৭ ঐ পৃঃ ১৮২

শ্লোকার্ধটির কোনো অর্থই হয় না। কিন্তু সংকেত জানা থাকলে এর মধ্যেকার বীজাক্ষরটি পাওয়া যাবে। যথা, কামাক্ষর ক, ধরাসংস্থ—ধরা ল, কাজেই ধরাসংস্থ অর্থ ল-এর উপরে স্থিত, শান্তি ঈ, আর বিন্দু ং। কাজেই দাঁড়াল ধরাসংস্থ কামাক্ষর ক্ল, তার সঙ্গে ঈ যুক্ত হয়ে হল ক্লী আর তার সঙ্গে ং যুক্ত হয়ে হল ক্লীং। এই ভাবে মন্ত্রকে খুঁজে বের করার নাম মন্ত্রোদ্ধার।

মহাবীজ—লক্ষ্য করা গেছে শব্দব্রহ্মের আদিরূপ ওঁ এই অব্যক্ত ধ্বনি বা শব্দ। এই শব্দ সামান্য শব্দ। এর থেকেই অন্যান্য সমস্ত বিশেষ শব্দের উদ্ভব। এইজন্য ওঁ মহাবীজ বলে গণ্য। অন্যান্য বীজমন্ত্রগুলি পৃথক্ পৃথক্ মাতৃকাবর্ণরূপ বিশেষ বিশেষ শব্দ, ওঁরূপ সামান্য শব্দ থেকে উদ্ভূত।[১]

ওঁ ব্রহ্মবীজ। অন্যান্য সব দেবতা ব্রহ্মেরই বিশেষ বিশেষ রূপ।[২] কাজেই এদিক্ থেকেও বলা যায় সব দেবতার বীজ প্রণব থেকে উদ্ভূত।

সব বীজমন্ত্রই প্রণবোদ্ভূত হলেও একমাত্র প্রণবই বৈদিক এবং অন্য সব বীজমন্ত্র তান্ত্রিক বলে গণ্য হয়।[৩] তার কারণ বেদে ওঁ ভিন্ন অন্য বীজমন্ত্র ব্যবহৃত হয় নি।

সমস্ত মন্ত্র বেদপর—তবে কোনো কোনো তন্ত্রমতে সমস্ত মন্ত্রই বেদপর। মেরুতন্ত্রে আছে—প্রণব বাদ দিয়ে বেদ নেই আর মন্ত্র প্রণবযুক্ত। সেইজন্য মন্ত্রকে বেদপর আর আগমকে বেদাঙ্গ বলা হয়।[৪] পূর্বেও আমরা এ বিষয়ের উল্লেখ করেছি।

প্রণবকে বলা হয়েছে মন্ত্রাদ্য।[৫] আচার্য ভাস্কররায় মন্ত্রাদ্য শব্দের অর্থ করেছেন মন্ত্রসমূহের আদিতে উচ্চারণীয়।[৬]

মন্ত্রের শুধু আদিতে নয় অন্তেও প্রণব যোগ করার বিধি আছে। 'ওঁকারেণ সর্বা বাক্ সংতৃন্না' ভাস্কররায় এই শ্রুতির অর্থ করেছেন সব মন্ত্র ওঁকারসম্পুটিত হবে অর্থাৎ সব মন্ত্রের আদিতে ও অন্তে ওঁকার থাকবে।[৭]

মন্ত্র প্রার্থনা নয়—উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল মন্ত্র শক্তি, শব্দশক্তি, এবং মন্ত্র দেবতা। কাজেই মন্ত্র প্রার্থনা নয়। যাঁরা মন্ত্রকে প্রার্থনা মনে করেন তাঁদের মত

১ G. L., 3rd Ed., p. 242.

২ চিন্ময়স্যাপ্রমেয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ। সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।—কু ত, উঃ ৬

৩ P. T., 2nd Ed., Intro., p. 569

৪ ন বেদঃ প্রণবং ত্যক্ত্বা মন্ত্রো বেদসমন্বিতঃ।
তস্মাদ্বেদপরো মন্ত্রো বেদাঙ্গশ্চাগমঃ স্মৃতঃ।—মেরুতন্ত্রবচন, প্রাঃ পু চ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩১

৫ ওঁকার বর্তুলস্তারো মন্ত্রাদ্যঃ প্রণবো ধ্রুবঃ। প্রাঃ দ স, সৌ ভা, পৃঃ ২৪

৬ ঐ ৭ ঐ

অনুসৃত নয়। মন্ত্র প্রার্থনা হলে যে-সব কথা দিয়ে প্রার্থনা করা হয় সে-সবই মন্ত্র হয়ে যেত আর তা হলে যার যেমন খুশি মন্ত্র রচনা করত। কিন্তু দেখা গেল তন্ত্রমতে মন্ত্র তা নয়।

সমস্ত মন্ত্রই শক্তিমন্ত্র—তন্ত্রমতে সমস্ত মন্ত্রই মহাশক্তি মহামাতৃকা কুণ্ডলিনীর থেকে উদ্ভূত। এইজন্য তান্ত্রিকরা সমস্ত মন্ত্রকেই মহাশক্তির মন্ত্র মনে করেন। মহানির্বাণতন্ত্রে শিব পার্বতীকে বলছেন—যে যে তন্ত্রে যে যে মন্ত্র বর্ণিত হয়েছে সে-সব তোমারই মন্ত্র কেন না, তুমিই আদ্যা প্রকৃতি।[১] এই আদ্যা প্রকৃতিই ব্রহ্মময়ী মহাশক্তি, চিৎশক্তি এবং মায়াশক্তি। ইনিই সর্বদেবময়ী কুণ্ডলিনী। কাজেই যে-কোনো দেবতার মন্ত্র হোক না কেন সে-দেবতা স্বরূপতঃ ইনিই এবং সে-মন্ত্র এঁরই মন্ত্র। সেইজন্য ললিতাসহস্রনামে দেবীকে বলা হয়েছে সর্বমন্ত্রস্বরূপিণী।[২]

মন্ত্র দেবতার শরীর—মন্ত্র দেবতার শরীর। গন্ধর্বতন্ত্রে বলা হয়েছে দেবতার শরীর ত্রিবিধ—ভৌতিক, মনোময় এবং জ্ঞানময়। মুদ্রা ভৌতিক শরীর, যন্ত্র মনোময় শরীর এবং জ্ঞানময় শরীর। জ্ঞানময় মন্ত্রশরীর অবিনাশী নিত্য।[৩]

মন্ত্র দেবতা—তন্ত্রশাস্ত্রে মন্ত্রকে শুধু দেবতার শরীর বলা হয় নি, বলা হয়েছে দেবতা আর মন্ত্র অভিন্ন, বাচ্যবাচকভাবে অভিন্ন।[৪] দেবতা মন্ত্ররূপিণী বা মন্ত্রময়ী। মেরুতন্ত্রে আছে—সাধকদের ফলদানের জন্য দেবতারা সেই সেই রূপ অর্থাৎ সাধকদের বিশেষ বিশেষ ফলদানের জন্য তদুপযোগী রূপ ধারণ করেন কিন্তু তাঁদের মুখ্যরূপ মন্ত্র, অন্য কিছু নয়।[৫]

গায়ত্রীতন্ত্রে বলা হয়েছে মন্ত্র স্বয়ং দেবতা। মন্ত্রের ধ্যানচিন্তা করলে দেবতা দর্শন দিয়ে আবার মন্ত্রেই বিলীন হয়ে যান।[৬]

এই মন্ত্রময়ী দেবতা মন্ত্রের বাচকশক্তি। তন্ত্রান্তরে বলা হয়েছে—সব মন্ত্রই বাচ্যবাচকভাবে প্রতিষ্ঠিত। যে-দেবতার যে-মন্ত্র সেই মন্ত্রের সেই দেবতা বাচ্য এবং সেই মন্ত্রই বাচক।[৭] বিষয়টি ব্যাখ্যা করে পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয় লিখেছেন—"সমস্ত

১ যেষু যেষু চ তন্ত্রেষু যে যে মন্ত্রাঃ প্রকীর্তিতাঃ। তে সর্বে তব মন্ত্রাঃ স্যুস্ত্বমাদ্যা প্রকৃতির্যতঃ।—মহা ত ৫।১৯

২ সর্বেশ্বরী সর্বময়ী সর্বমন্ত্রস্বরূপিণী।—ল স ১০৩, পৃঃ ৬৭

৩ শরীরং ত্রিবিধং প্রাহুর্ভৌতিকংচ মনোময়ম্। পরং জ্ঞানময়ং নিত্যং যদনাশি নিরন্তরম্
মুদ্রাং ভৌতিকমিত্যাহুর্যন্ত্রং বিদ্ধি মনোময়ম্। মন্ত্রং জ্ঞানময়ং বিদ্ধি এবং ত্রিধাবপুর্ভবেৎ। গ ত, ৫।৩৯-৪০

৪ বাচ্যবাচকভাবেন অভেদো মন্ত্রদেবয়োঃ।—রুদ্রযামলবচন, দ্রঃ তান্ত্রিক গুরু, ৪র্থ সং, পৃঃ ১৪১

৫ সাধকানাং ফলং দাতুং তত্তদ্রূপং ধৃতৈঃ সুরৈঃ।
মুখ্যস্বরূপং তেষাংতু মন্ত্রা এব ন চেতরৎ।—মেরুতন্ত্রবচন, দ্র, পু চ, ১ম খণ্ড পৃঃ ৪১

৬ মন্ত্রাণাং চিন্তনাদ্দেবি স মনুর্দেবতা স্বয়ম্। ধ্যানেন দর্শনং দত্বা পুনর্মন্ত্রেষু লীয়তে। গা ত, ৪র্থ পটল

৭ বাচ্যবাচকভাবেন সর্বে মন্ত্রাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
যদ্দেবতায়া যো মন্ত্রঃ সা বাচ্যা স চ বাচকঃ।—দ্রঃ পু চ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৩৮

মন্ত্রেই দুই দুইটি করিয়া নিহিত আছেন। প্রথম বাচ্যশক্তি, দ্বিতীয় বাচকশক্তি। যিনি মন্ত্রের প্রতিপাদ্য দেবতা, তিনি বাচ্যশক্তি আর যিনি মন্ত্রময়ী দেবতা তিনিই বাচকশক্তি।... বীজ যেমন ফলের অন্তর্নিহিত, বাচ্যশক্তিও তদ্রূপ বাচকশক্তির অন্তর্নিহিত। বাহিরের ফলাংশ ভেদ না করিলে যেমন অভ্যন্তরের বীজাংশ লক্ষ্য হয় না, তদ্রূপ বাচকশক্তির আরাধনা না করিলেও বাচ্যশক্তির স্বরূপ অনুভূত হইতে পারে না। মন্ত্র বাচ্যশক্তিবলে জীবিত এবং বাচকশক্তিবলে রক্ষিত।"[১]

সব মন্ত্রেরই বাচ্যশক্তি নির্গুণ কিন্তু বাচকশক্তি সগুণ। কারণ বাচকশক্তি উপাস্য এবং বাচ্যশক্তি অধিগম্য। বাচকশক্তিকে অবলম্বন করতে হবে এবং বাচ্যশক্তিতে প্রবেশ করতে হবে।[২]

বাচকশক্তি বা সগুণ দেবতাই মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং বাচ্যশক্তি বা নির্গুণ নিরাকার ঈশ্বর বা ঈশ্বরীই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য দেবতা।[৩] যেমন কোনো মন্ত্রের বাচকশক্তি তথা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দুর্গা হলে তার বাচ্যশক্তি হবেন মহামায়া।[৪]

বলা বাহুল্য বাচ্যশক্তি এবং বাচকশক্তির মধ্যে স্বরূপতঃ কোনো ভেদ নেই ; উভয় একই শক্তি।[৫]

মন্ত্রের অন্তর্নিহিত শক্তি সাধকচিত্তে বাচকশক্তিকে প্রকট করেন এবং তখন সেই চিত্ত কার্যকারণশৃঙ্খলমুক্ত হয়ে বাচকশক্তিরই রূপ গ্রহণ করে। এর পর হয় বাচ্যশক্তির উপলব্ধি। এটি মন্ত্রসাধনার চরম অবস্থা।[৬]

মন্ত্রের মহিমা—দেখা গেছে আদিম অবস্থা থেকেই মানুষ মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস করেছে। দেবতা মন্ত্রের বশ, দেবতার চেয়ে মন্ত্র বড় এ বিশ্বাস বেদপন্থীদেরও ছিল। তার প্রমাণ আছে অথর্ববেদে এবং ব্রাহ্মণগ্রন্থে।[৭]

তন্ত্রশাস্ত্রে মন্ত্রের মহিমা বিশেষভাবে ঘোষিত হয়েছে। মেরুতন্ত্রে বলা হয়েছে—মন্ত্রই সাক্ষাৎ ঈশ্বর, মন্ত্রই মহৌষধ, মন্ত্রের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সর্বসিদ্ধিপ্রদায়ক আর কিছু নাই।[৮]

মন্ত্র সাধককে চতুর্বর্গ দিতে পারে অর্থাৎ সব রকমের জাগতিক ভোগসুখ এবং মোক্ষ দিতে পারে।[৯]

১ ত ত, পৃঃ ১৩০ ২ ঐ, পৃঃ ১৩৩ ৩ G. L., p 261 ৪ ঐ

৫ জন্যজনকয়োর্ভেদাভাবাদ্ বাচ্যস্ত বাচকেনাপি।—ব ম্ব ২।৮১ ; G. L., p. 261.

৬ P T., Vol. II, 2nd Ed., p. 615

৭ এ সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

৮ মন্ত্র এবেশ্বরঃ সাক্ষান্মন্ত্র এব মহৌষধম্।

নহি মন্ত্রাৎ পরং কিঞ্চিৎ সর্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ।—প্রঃ পু চ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪১ ৯ S. S., 4th Ed., p. 489

মন্ত্রশক্তি—মন্ত্রের শক্তি সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন—মন্ত্র আমাদের অন্তরে নূতন নূতন আধ্যাত্মিকভাবের সৃষ্টি করতে পারে, আমাদের মানসসত্তার পরিবর্তন সাধন করতে পারে, অলব্ধপূর্ব জ্ঞান এবং মনোবৃত্তির বিকাশ সাধন করতে পারে, মন্ত্রসাধক ভিন্ন অন্য ব্যক্তির মনেও অনুরূপ ব্যাপার সাধন করতে পারে। শুধু তাই নয়, মানস এবং প্রাণিক স্তরে এ রকম স্পন্দন উৎপন্ন করতে পারে যা পদার্থের আকারে ক্রিয়ার আকারে পরিণত হয়, এমনকি আধিভৌতিক স্তরে বাস্তব আকৃতিতে পরিণত হয়।[১]

দেখা যাচ্ছে মন্ত্রশক্তিবলে মনন বা চিন্তাও যে বাস্তবরূপে প্রত্যক্ষ হতে পারে তন্ত্রশাস্ত্রের এই অভিমতের সমর্থন করেছেন শ্রীঅরবিন্দ।

মন্ত্রশক্তি অচিন্ত্য। পরশুরামকল্পসূত্রে বলা হয়েছে মন্ত্রের শক্তি চিন্তা বা তর্কের অতীত।[২] এ সম্পর্কে আচার্য শঙ্কর শারীরক ভাষ্যে লিখেছেন[৩] লৌকিক ব্যাপারেও দেখা যায় দেশ-কাল-নিমিত্তের বৈচিত্র্যবশতঃ মণি মন্ত্র ওষধি প্রভৃতির শক্তির দ্বারা পরস্পরবিরুদ্ধ অনেক কার্য হয়ে থাকে। সেই শক্তি উপদেশ ভিন্ন কেবল তর্কের দ্বারা অবগত হওয়া যায় না। এ বিষয়ে পৌরাণিকরা বলেন যে-সকল ভাব অচিন্ত্য তাদের নিয়ে তর্ক করবে না। যা প্রকৃতি অর্থাৎ প্রত্যক্ষদৃষ্ট বস্তুস্বভাব থেকে অন্যরূপ, কেবল উপদেশগম্য, তাই অচিন্ত্য।[৪]

মন্ত্রশক্তি সম্বন্ধে একটি বিষয় লক্ষণীয়। মন্ত্রশক্তি ভাল মন্দ, শুভ অশুভ কিছুই নয়। ব্যাবহারিক জগতের বৈদ্যুতিক শক্তি যেমন ভালমন্দ কিছুই নয়, ব্যবহার অনুসারে তা ভাল কি মন্দ স্থির হয়; মন্ত্রশক্তিও তাই। যে-কাজে মন্ত্রশক্তির প্রয়োগ হয় সেই কাজের ফল অনুসারে একে ভাল বা মন্দ, শুভ বা অশুভ বলা যায়।

মন্ত্রের প্রয়োগ—নানা বিচিত্র কাজে মন্ত্রশক্তির তথা মন্ত্রের প্রয়োগ হয়। যেমন—

১ The Mantra can not only create new subjective states in ourselves, alter our psychical being, reveal knowledge and faculties we did not before possess, can not only produce similar results in other minds than that of the user, but can produce vibrations in the mental and vital atmosphere which result in effects, in actions and even in the production of material forms on the physical plane.—Kena Upanisad. pp. 37-38, cited in A. O. D. V., pp. 22-28

২ মন্ত্রাণামচিন্ত্যশক্তিতা।—প ক সূ ১।৮

৩ লৌকিকানামপি মণিমন্ত্রৌষধিপ্রভৃতীনাং দেশকালনিমিত্তবৈচিত্র্যবশাৎ শক্তয়ো বিরুদ্ধানেককার্যবিষয়া দৃশ্যন্তে। তা অপি তাবন্নোপদেশমন্তরেণ কেবলেন তর্কেণ অবগন্তুং শক্যন্তে অস্য বস্তুন এতাবত্য এতৎসহায়া এতদ্বিষয়া এতৎপ্রয়োজনাশ্চ শক্তয় ইতি। ·····তথা চাহুঃ পৌরাণিকাঃ—

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।

প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্।—ব্র সূ ২।১।২৭-এর ভাষ্য

৪ কৌ র, পৃঃ ৩৩

১ মুক্তিসাধন। এ মুক্তি নির্বাণমুক্তি নয়। ২ ঈশ্বরের তথা তাঁর অবতারের পূজা। ৩ দেবতাদের পূজা। ৪ দেবতাসাধন। ৫ অলৌকিক ক্ষমতালাভ। ৬ পিতৃগণ ও দেবগণের তর্পণ। ৭ ভূতপ্রেতাদিসাধন। ৮ স্বস্ত্যয়নকর্ম। ৯ ভূতাদিবিতাড়ন। ১০ রোগচিকিৎসা। ১১ মানুষ-পশু-শস্যাদির অনিষ্টসাধন। ১৩ বিষঝাড়া। ১৪ অন্যের চিন্তা ও কর্ম প্রভাবান্বিত করা। ১৪ বিশেষ সংস্কার অর্থাৎ অনুষ্ঠানের দ্বারা দেহশুদ্ধি।[১] এই তালিকা দৃষ্টান্ত হিসাবে গণ্য। কেন না এ ছাড়া আরও অনেক কর্মে মন্ত্রের প্রয়োগ হয়।

তান্ত্রিকরা বলেন তান্ত্রিক মন্ত্রের কার্যকারিতা যে-কোনো ব্যক্তি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। সদ্‌গুরুর নির্দেশ অনুসারে যথাশাস্ত্র মন্ত্রের প্রয়োগ করতে পারলে মন্ত্রশক্তি তিনি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করতে পারবেন।[২]

আধ্যাত্মিক সাধনায় মন্ত্র—উচ্চ আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রেও মন্ত্রের উপযোগিতা সনাতনধর্মীয় শাস্ত্রে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হয়েছে। আধ্যাত্মিক সাধনার গোড়ার কথা চিত্তশুদ্ধি। বিশেষ করে যে-ক্ষেত্রে সাধনার লক্ষ্য ব্রহ্মোপলব্ধি সে-ক্ষেত্রে চিত্তশুদ্ধিকে অপরিহার্য প্রথম সোপান গণ্য করা হয়। কারণ অনাদিকর্মসংস্কার এবং অবিদ্যাযুক্ত বিষয়-বাসনার দ্বারা জীবের চিত্ত অশুদ্ধ। অশুদ্ধ চিত্তে ব্রহ্মোপলব্ধি হয় না।

এখানেই মন্ত্রের অন্যতম প্রধান উপযোগিতা। মন্ত্র চিত্তকে পবিত্র করে। যাস্ক বলেছেন মন্ত্র চিত্তকে পবিত্র করে বলে মন্ত্রকে পবিত্র বলা হয়।[৩] আর পূর্বেই লক্ষ্য করা গেছে ভাস্কররায় নির্মলচিত্তকেই মন্ত্র বলেছেন।

মন্ত্র সাধকের বহির্মুখী চিত্তবৃত্তিকে অন্তর্মুখী করে তাঁর ইষ্টদেবতায় নিবিষ্ট করে। এইভাবে চিত্ত নিবিষ্ট হলে সাধক দেখতে পান মন্ত্র ও ইষ্টদেবতা এক।[৪] এই নিবিষ্টতা আরও গভীর হলে মন্ত্র, দেবতা এবং সাধক এক হয়ে যান।

তন্ত্রমতে সাধনার চরম লক্ষ্য পরব্রহ্মস্বরূপিণী মহাশক্তি। পরব্রহ্ম অপ্রাকৃত বস্তু, মন প্রাকৃত বস্তু। পরব্রহ্ম প্রাকৃত মনের গোচর নন। অর্থাৎ প্রাকৃত মনে সরাসরি পরব্রহ্মের উপলব্ধি হয় না। মন প্রথমে শব্দব্রহ্মরূপ মন্ত্রে নিবিষ্ট হয়ে মন্ত্রময়ী দেবতায় তন্ময় হয়। তখন মন চিন্ময় হয়ে যায় এবং সে-রকম অবস্থাতেই পরব্রহ্মের উপলব্ধি সম্ভবপর হয়।

এই ভাবেই মন্ত্র ব্রহ্মোপলব্ধির অন্যতম অধ্বারূপে পরিগণিত হয়েছে।

১ P. T. Vol. II, 2nd Ed., p. 606

২ Ibid, p. 608

৩ পবিত্রং পুনাতেঃ। মন্ত্রঃ পবিত্রমুচ্যতে।—নিরুক্ত ৫।৬

৪ P. T. Vol. II, 2nd Ed., p. 614

অর্থসৃষ্টি :

কলা—কলা, তত্ত্ব আর ভুবন এই নিয়ে অর্থসৃষ্টি। লক্ষ্য করা গেছে কলা শব্দের অন্যতম অর্থ শক্তি। শক্তির নির্বিশেষ পূর্ণরূপও কলা এবং তাঁর কোনো বিশেষরূপ ও ক্রিয়াকেও কলা বলা হয়। তবে সাধারণতঃ শেষোক্ত অর্থেই কলা শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।[১]

চতুর্বিধ কলা—তন্ত্রশাস্ত্র অনুসারে শক্তির কলারূপ চতুর্বিধ—পূর্ণকলা, কলা, অংশ এবং অংশাংশ।[২] শিবতত্ত্বে শক্তির উন্মনী অবস্থা। সেখানে কোনো কলা নেই।[৩] শক্তিতত্ত্বে শক্তির সমনী অবস্থা। এখানেই কলার আবির্ভাব হয়।[৪]

তন্ত্রমতে দেবতার শক্তিকে ষোড়শ কলায় ভাগ করা হয়। যে-মূর্তিতে দেবতার শক্তি ষোলকলায় পূর্ণ তাকে বলা হয় পূর্ণকলামূর্তি। পূর্ণশক্তির একষোড়শাংশ অথবা তার যে-কোনো অংশকে বলা হয় কলামূর্তি। এই কলামূর্তির অংশকে বলা হয় অংশমূর্তি এবং অংশমূর্তির অংশকে বলা হয় অংশাংশমূর্তি।[৫]

এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন মায়িক জগতে কলা অর্থে যে অংশ বুঝায় প্রকৃতিতত্ত্বের ঊর্ধ্ববর্তী শক্তির কলা সম্বন্ধে সে-অর্থ প্রযুক্ত হয় না। সেখানে কলা বলতে যা বুঝায় তা শক্তির রূপবিশেষ।[৬]

শক্তির বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন কলা—শক্তির উন্মনী সমনী প্রভৃতি সপ্ত অবস্থা বা ভূমির বিষয় পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। উন্মনী ছাড়া অন্যান্য অবস্থায় শক্তির বিভিন্ন সংখ্যক কলার উল্লেখ শাস্ত্রে আছে।[৭] সমনীশক্তি সপ্তকলা। নেত্রতন্ত্রানুসারে কলার নাম—সর্বজ্ঞা, সর্বগা, দুর্গা, সবর্ণা, স্পৃহণা, ধৃতি এবং সমনা।[৮]

উক্ত তন্ত্র অনুসারে আঞ্জী বা আঞ্জনীশক্তি পঞ্চকলা। কলার নাম—সূক্ষ্মা, সুসূক্ষ্মা, অমৃতা, অমৃতসম্ভবা এবং ব্যাপিনী।[৯]

মহানাদশক্তি এককলা। এই কলার নাম ঊর্ধ্বগামিনী। নাদশক্তির কলাসংখ্যা চার। যথা—ইন্ধিকা, দীপিকা, রোচিকা, মোচিকা।[১০]

১ G. L., 3rd Ed, 250 ২ Mahāmāyā, p. 38, f. n. 3

৩ যাবৎ সা সমনা শক্তিস্তদূর্ধ্বে উন্মনী স্মৃতা। নাত্র কালকলাভানং ন তত্ত্বং ন চ দেবতাঃ।

—স্বচ্ছন্দসংগ্রহবচন, দ্রঃ ব চ বি (T. T., Vol. II) পৃঃ ১৩২

৪ Mahāmāyā, p. 38, f. n. 3 ৫ G. L., 3rd Ed., p. 194

৬ Ibid, pp. 194-195 ৭ দ্রঃ Ibid, p. 196 ৮ দ্রঃ ঐ

৯ দ্রঃ G. L., 3rd Ed., p. 196; স্বচ্ছন্দসংগ্রহে অমৃতা ও অমৃতসম্ভবার স্থলে মৃতা ও অমৃতা নাম পাওয়া যায়।—দ্রঃ ব চ বি (T. T. Vol. II) পৃঃ ১৩১

১০ দ্রঃ G. L., 3rd Ed., p. 196

নিরোধিনীশক্তির পঞ্চ কলা। যথা— রুন্ধিনী, রোধিনী, রৌদ্রী, জ্ঞানবোধা এবং তমোপহা।[১] এই নিরোধিনীরই অন্যনাম বোধিনী বা বোধিকা। স্বচ্ছন্দসংগ্রহে এই শক্তির পঞ্চকলার নাম করা হয়েছে—বন্ধতী, বোধিনী, বোধা, জ্ঞানবোধা এবং তমোপহা।[২]

রুন্ধিনী এবং রোধিনী কলার জন্য এই ভূমির ঊর্ধ্বে আরোহণ করা বড় বড় দেবতার পক্ষেও কঠিন। তবে শক্তি যাঁকে জ্ঞানবোধা এবং তমোপহা কলার দ্বারা অনুগ্রহ করেন তিনি এই কঠিন ভূমির ঊর্ধ্বে যেতে পারেন।[৩]

নিরোধিনীশক্তি যেমন ঊর্ধ্বগমনে বাধা দেন তেমনি ঊর্ধ্বগতদের অধঃপতনেও বাধা দেন।[৪]

অর্ধচন্দ্রশক্তির কলাও পাঁচটি। যথা—জ্যোৎস্না, জ্যোৎস্নাবতী, কান্তি, সুপ্রভা এবং বিমলা। এই-সব কলাকে বলা হয় সর্বজ্ঞপদসংস্থিতা। কেন না অর্ধচন্দ্রভূমিতে অবস্থিত সাধক সর্বজ্ঞ হন।[৫]

স্বচ্ছন্দসংগ্রহমতে বিন্দুর কলা সংখ্যা চার। যথা—নিবৃত্তি, প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা এবং শান্তি।[৬] তবে এ সম্বন্ধে ভিন্ন মতও লক্ষ্য করা যায়। দেখা গেছে প্রপঞ্চসারতন্ত্রমতে এই চারটি কলা নাদ থেকে উদ্ভূতা ষোলকলার অন্তর্গত।[৭] আর উক্ত তন্ত্র অনুসারে বিন্দু থেকে উদ্ভূতা কলা—পীতা, শ্বেতা, অরুণা এবং অসিতা।[৮] আবার শারদাতিলকে নিবৃত্তি, প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা, শান্তি এবং শান্ত্যতীতা এই পাঁচটি কলাকে নাদের থেকে উদ্ভূতা বলা হয়েছে।[৯]

সম্প্রদায়ভেদের জন্য এই মতভেদ হয়েছে মনে হয়। অবশ্য এই-সব সাধনার অন্তর্ভুক্ত বিষয়। কাজেই এই-সব মতভেদাদির যথার্থ ব্যাখ্যা একমাত্র সাধনমর্মজ্ঞ সদ্‌গুরুর মুখেই অবগত হওয়া যেতে পারে।

ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বের বিচারে কলা—ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বের দিক্ দিয়ে বিচার করে পাঁচটি প্রধান কলা স্বীকার করা হয়। যথা—নিবৃত্তি, প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা, শান্তি এবং শান্ত্যতীতা।[১০] এই পাঁচটি কলাকে উক্ত তত্ত্বসমূহের সম্পিণ্ডিত সামান্যরূপ বলা হয়। এর অর্থ কলা পাঁচটি তত্ত্বসমূহের শক্তিরূপ। তত্ত্বগুলি পঞ্চকলারই বিশেষরূপ।

মহাশক্তিই ক্ষিত্যাদিষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বময়ী। তাঁরই এই পঞ্চ কলা। ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্ব এই

১ দ্রঃ G. L., 3rd Ed., p. 196 ২ দ্রঃ স্ব চ বি (T. T., Vol. II) পৃঃ ১২৬

৩ G. L., 3rd, Ed., p. 196 ৪ Ibid ৫ Ibid

৬ নিবৃত্তিশ্চ প্রতিষ্ঠা চ বিদ্যা শান্তিরনুক্রমাৎ।—দ্রঃ স্ব চ বি (T. T., Vol. II) পৃঃ ১২৫

৭ প্র সা ত ৩।২৫ ৮ ঐ ৩।২৪ ৯ শা তি ১।২৬

১০ G. L., 3rd Ed., p. 250; শান্তি এবং শান্ত্যতীতাকে শান্তা ও শান্তাতীতা বা অবকাশদাও বলা হয়েছে।
—দ্রঃ Ibid, p. 199

পঞ্চকলারই ব্যক্তরূপ।[১] ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বকে কলানুসারে এইভাবে ভাগ করা হয়েছে—ক্ষিতিতত্ত্ব—নিবৃত্তিকলা ; অপ্ থেকে প্রকৃতিতত্ত্ব— প্রতিষ্ঠাকলা ; পুরুষতত্ত্ব থেকে মায়াতত্ত্ব—বিদ্যাকলা ; শুদ্ধবিদ্যাতত্ত্ব থেকে সদাশিবতত্ত্ব—শান্তিকলা এবং শক্তিতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব—শান্ত্যতীতকলা।[২]

আবার নিবৃত্ত্যাদি পঞ্চকলাকে ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাভূতের উৎপাদিকাও বলা হয়।[৩] নিবৃত্তি থেকে ক্ষিতি, প্রতিষ্ঠা থেকে অপ্, বিদ্যা থেকে তেজ, শান্তি থেকে মরুৎ এবং শান্ত্যতীতা থেকে ব্যোম উৎপন্ন হয়েছে।

বলা বাহুল্য কলা জড়শক্তি নয়, চিৎশক্তি। প্রত্যেক সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে এবং প্রত্যেক সৃষ্ট পদার্থকে অতিক্রম করে কলা দেবতারূপে বিদ্যমান। এটি সাধকের প্রত্যক্ষ অনুভবলব্ধ ব্যাপার।[৪]

ব্রহ্মাণ্ডাদি—ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বের অন্তর্নিহিত শক্তিরূপে পঞ্চকলা তত্ত্বগুলিকে চারটি অণ্ডে বিভক্ত করেন। যথা—ব্রহ্মাণ্ড, প্রকৃত্যণ্ড বা মূলাণ্ড, মায়াণ্ড এবং শক্ত্যণ্ড। ব্রহ্মাণ্ডের প্রধান তত্ত্ব বা আবরণতত্ত্ব আকাশ, প্রকৃত্যণ্ডের আবরণতত্ত্ব প্রকৃতি, মায়াণ্ডের মায়া এবং শক্ত্যণ্ডের শক্তি।[৫]

অবরোহক্রমে শক্তিতত্ত্ব থেকে শুদ্ধবিদ্যাতত্ত্ব পর্যন্ত শক্ত্যণ্ড। সমনীশক্তি, ব্যাপিনীশক্তি, অঞ্জীশক্তি, নাদশক্তি এবং বিন্দুশক্তি এবং তাদের কলাসমূহ এই শক্ত্যণ্ডের অন্তর্গত। এটি মন্ত্রমহেশ্বর, মন্ত্রেশ্বর, মন্ত্র এবং বিদ্যেশ্বরদের স্থান। এখানে উল্লেখ করা যায় বিজ্ঞানাকলদের স্থান শুদ্ধবিদ্যার নিম্নে কিন্তু মায়ার ঊর্ধ্বে।[৬] শক্ত্যণ্ডের প্রধান কলা শান্তিকলা।

মায়াতত্ত্ব থেকে পুরুষতত্ত্ব পর্যন্ত মায়াণ্ড। মায়াণ্ড বিদ্যাকলার ক্ষেত্র। বিদ্যাকলা প্রলয়াকল এবং সকল নামক জীবদের পরিচ্ছিন্ন দ্বৈতজ্ঞানের উৎপাদিকা। এর পর প্রকৃতিতত্ত্ব থেকে অপ্-তত্ত্ব পর্যন্ত প্রকৃত্যণ্ড। এটি প্রতিষ্ঠাকলার ক্ষেত্র। সর্বশেষে ক্ষিতিতত্ত্ব নিয়ে ব্রহ্মাণ্ড। এটি নিবৃত্তিকলার স্থান। প্রকৃত্যণ্ড এবং ব্রহ্মাণ্ড সকল নামক বদ্ধ জীবদের স্থান।[৭]

পূর্বেই বলা হয়েছে ক্ষিতিতত্ত্বের শক্তি নিবৃত্তিকলা। সৃষ্টিমুখে শক্তি ক্ষিতিতত্ত্বে পৌঁছে তত্ত্বসৃষ্টিকর্মে নিবৃত্ত হন। এইজন্যই এই তত্ত্বে তাঁর যে-কলা তাকে নিবৃত্তিকলা বলা হয়েছে। ক্ষিতিতত্ত্বে মহাশক্তি কুণ্ডলিনীরূপ ধারণ করেন। কাজেই নিবৃত্তিকলা কুণ্ডলিনীরই রূপ বা কলা। নিবৃত্তিকলা ভৌতিক জগতের বহিরাবরণ সৃষ্টি করেন।[৮]

১ G. L., 3rd Ed., p. 199 ২ Ibid, p. 197-198 ; 252-258

৩ ধরাদিপঞ্চভূতানামুৎপাদিকা।—শা তি ১।২৫-এর টীকা ৪ G. L., 3rd Ed., p. 198

৫ Ibid ৬ Ibid, p. 201 ৭ Ibid, pp. 198, 201, 258

৮ Ibid, p. 197

অপ্ থেকে প্রকৃতিতত্ত্ব পর্যন্ত তত্ত্বসমূহের শক্তি প্রতিষ্ঠাকলা। এই কলা বাহ্য ভৌতিক বিশ্বের আভ্যন্তর ভিত্তি এবং কাঠামো রচনা করে।[১]

পুরুষ থেকে মায়া পর্যন্ত তত্ত্বের শক্তি বিদ্যাকলা। মায়ার উর্ধ্বে শান্তিকলা। এটি শুদ্ধবিদ্যা থেকে সদাশিব পর্যন্ত তত্ত্বের শক্তি। দ্বৈতই সব দুঃখের মূল। মায়ার পর আর দ্বৈত নেই; কাজেই দুঃখও নেই, আছে শুধু শান্তি। এইজন্যই শুদ্ধবিদ্যাদি তিন তত্ত্বের শক্তিকে বলা হয় শান্তিকলা।[২]

এর পরে শক্তিতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব। লক্ষ্য করা গেছে কোনো কোনো মতে এই দুই তত্ত্বকে পৃথক্ ধরা হয় না। তবে সাধারণতঃ পৃথক্ ধরা হয়। এই দুই তত্ত্বের কলা শান্ত্যতীতা অর্থাৎ এটি শান্তিকলার পরবর্তী। শিবতত্ত্বে কলা নেই এ বিষয়ের পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এ কথাও বলা হয় যে শিবতত্ত্ব সর্বতত্ত্বব্যাপী এবং সর্বতত্ত্বাতীত। এই তত্ত্বে কলারূপে শক্তি শূন্যাতিশূন্যা, অবকাশদা। এই অবকাশদা শক্তিকেই শান্ত্যতীতা কলা বলা হয়।[৩] মোটকথা যে অর্থে নিবৃত্তি প্রভৃতিকে কলা বলা হয় সেই অর্থে শান্ত্যতীতা কলা নয়। এই জন্যই বলা হয় শিবতত্ত্বে কলা নেই।

এই যে নিবৃত্ত্যাদি পঞ্চকলা শারদাতিলকের মতে এই পঞ্চকলাই কলাধ্বা।[৪]

কলা সম্বন্ধে অন্য বিচার— একই বস্তুকে নানাদিক্ থেকে নানাভাবে বিচার করা যেতে পারে। এইজন্য কলা সম্বন্ধেও বিভিন্ন বিচার দেখা যায়। ষট্‌চক্রনিরূপণের টীকায় উন্মনীশক্তিকে নির্বাণকলা বলা হয়েছে। নির্বাণকলা ভবপাশছিন্নকারিণী, মোক্ষ-দায়িনী। এঁকে সপ্তদশীকলাও বলা হয়েছে। ষোড়শীকলার অভ্যন্তরে আছেন সপ্তদশীকলা।[৫] ষোড়শী কলাকে বলা হয়েছে অমাকলা।[৬]

ষট্‌চক্রবিবৃতিতে বলা হয়েছে অমাকলা নিত্যা, তাঁর ক্ষয়-উদয় অর্থাৎ হ্রাসবৃদ্ধি নেই। এই কলা সৃষ্ট্যুন্মুখী। শিবশক্তির মিলনে যে-অমৃতধারা প্রবাহিত হয় ইনি সেই ধারার ধারিণী।[৭] সৌভাগ্যভাস্করে উদ্ধৃত বাসনাসুভগোদয়ের একটি বচনে ষোড়শীকলাকে বলা হয়েছে সচ্চিদানন্দরূপিণী।[৮]

লক্ষ্মীধর সৌন্দর্যলহরীর টীকায়[৯] অন্যান্য পঞ্চদশ কলার বিবরণ দিয়েছেন। পঞ্চদশ

---

১ G. L., 3rd Ed., p. 197 ২ Ibid, p. 198 ৩ Ibid, p. 199

৪ নিবৃত্ত্যাদ্যাঃ কলাঃ পঞ্চ কলাধ্বেতি প্রকীর্তিতঃ।—শা তি ৫।৭৯

৫ তন্মধ্যে কুটিলা নির্বাণাখ্যা সপ্তদশীকলা।—কঙ্কালমালিনীতন্ত্রবচন, ষঃ ব নি ৪৩-এর টীকা

৬ চন্দ্রস্য ষোড়শকলা অমানাম্নীতি যাবৎ।—ষ চ বি (T. T. Vol. II) পৃঃ ১৩০ ৭ ঐ

৮ ষোড়শী তু কলা জ্ঞেয়া সচ্চিদানন্দরূপিণী।—ল স, সৌ ভা, পৃঃ ৭৬

৯ ৩২ সংখ্যক শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

কলার নাম—দর্শা, দৃষ্টা, দর্শতা, বিশ্বরূপা, সুদর্শনা, আপ্যায়মানা, আপ্যায়মানা, আপ্যায়া, সুনৃতা, ইরা, আপূর্যমাণা, আপূর্যমাণা, পূরয়ন্তী, পূর্ণা এবং পৌর্ণমাসী। এই পঞ্চদশ কলাকে আগ্নেয়, সৌর এবং চান্দ্র এই তিন খণ্ডে ভাগ করা হয়। দর্শা থেকে সুদর্শনা পর্যন্ত আগ্নেয় খণ্ড, আপ্যায়মানা থেকে ইরা পর্যন্ত সৌরখণ্ড আর আপূর্যমাণা থেকে পৌর্ণমাসী পর্যন্ত চান্দ্রখণ্ড।[১]

দর্শা শিবতত্ত্বাত্মিকা, দৃষ্টা শক্তিতত্ত্বাত্মিকা, দর্শতা মায়াতত্ত্বাত্মিকা, বিশ্বরূপা শুদ্ধবিদ্যাতত্ত্বাত্মিকা, সুদর্শনা জলতত্ত্বাত্মিকা, আপ্যায়মানা তেজস্তত্ত্বাত্মিকা, আপ্যায়মানা বায়ুতত্ত্বাত্মিকা, আপ্যায়া মনস্তত্ত্বাত্মিকা, সুনৃতা পৃথিবীতত্ত্বাত্মিকা, ইরা আকাশতত্ত্বাত্মিকা, আপূর্যমাণা বিদ্যাতত্ত্বাত্মিকা, আপূর্যমাণা মহেশ্বরতত্ত্বাত্মিকা, পূরয়ন্তী পরতত্ত্বাত্মিকা, পূর্ণা আত্মতত্ত্বাত্মিকা এবং পৌর্ণমাসী সদাশিবতত্ত্বাত্মিকা।[২]

লক্ষ্মীধর নিত্যা কলা অর্থাৎ ষোড়শীকলাকে বলেছেন সাদাখ্যতত্ত্বাত্মিকা।[৩]

ষোড়শীকলাকে অমৃতকলা এবং সপ্তদশী- বা নির্বাণ-কলাকে অমৃতাকারা বা অমৃতাকাররূপিণীও বলা হয়েছে। নির্বাণকলা এবং অমৃতকলা মহাশক্তিরই দুই রূপ। নির্বাণকলা চিন্মাত্রস্বভাবা আর অমাকলা বা অমৃতকলা সৃষ্ট্যুন্মুখী ও ঊর্ধ্বশক্তিরূপা। বলা হয় ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বের শক্তিতত্ত্বে এই উভয়কলা বিদ্যমান।[৪]

সাধকের পক্ষে এই-সব কলা সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। কেন না সাধকের ষড়ধ্বা-শুদ্ধি করতে হয়।[৫] কলা সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকলে কলাশুদ্ধি সম্ভবপর নয়।

ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্ব—শাক্তমতে মহাশক্তিই ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বরূপিণী। সর্বময়ী দেবী ক্ষিত্যাদি-শিবান্ত-তত্ত্ব থেকে অভিন্ন।[৬]

অদ্বৈতশৈব দর্শনের আলোচনা প্রসঙ্গে ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বের আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে। এ বিষয়ে শাক্ত দর্শনেরও মোটামুটি একই বিচার। কাজেই এখানে এ সম্বন্ধে শাক্তমতের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল।

শিব ও শক্তি অভিন্ন। এইজন্য ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বাত্মক বিশ্বকে যেমন শক্তির রূপ বলা হয় তেমনি বলা হয় পরম শিবের শরীর।[৭] প্রলয়কালে সূক্ষ্মাবস্থাপন্ন জগৎকে গর্ভীকৃত

১ দ্রঃ সৌন্দর্যলহরীর ৩২ সংখ্যক শ্লোকের টীকা ২ ঐ ৩ ঐ

৪ G. L., 3rd Ed., pp. 199-200

৫ দ্রঃ শা তি ৫।৭৭-এর টীকা

৬ সর্বময়ী ক্ষিত্যাদিশিবান্ততত্ত্বাভিন্না।—শ স, সৌ ভা, পৃঃ ৩৭

৭ এতদাত্মকং বিশ্বমেব পরমশিবশরীরম্।—নিত্যোৎসব, পৃঃ ৮

করে শক্তি শিবে বিলীন অবস্থায় থাকেন, তখন শক্তির কোনো ক্রিয়া থাকে না, এরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত নির্গুণ ব্রহ্মের নাম পরমশিব।[১]

শিবতত্ত্ব—কেবলমাত্র স্বস্বরূপে অবস্থিত এই পরমশিবের 'আমি বহু হব, আমি উৎপন্ন হব' এই সিসৃক্ষার উদয় হয়। এই সিসৃক্ষা শুধু ইচ্ছাশক্তি নয়, ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া এই ত্রিশক্তি। রামেশ্বর এই ত্রিশক্তির কারণীভূতা সূক্ষ্মরূপা শান্তা নাম্নী শক্তিকেই পরশিব বলেছেন। সিসৃক্ষা-উপাধিবিশিষ্ট পরমশিবই শিবতত্ত্ব।[২]

শক্তিতত্ত্ব—প্রপঞ্চবাসনারূপা পূর্বোক্তা সিসৃক্ষাই শক্তিতত্ত্ব।[৩] শিবতত্ত্ব আর শক্তিতত্ত্ব বস্তুত: অভিন্ন। রামেশ্বরের মতে 'বহু হব, উৎপন্ন হব'—এই ইচ্ছাশক্তিযুক্ত স্রষ্ট্র্যুন্মুখ পরমশিবই শক্তিপদবাচ্য।[৪]

সদাশিবতত্ত্ব—জগৎকে যিনি অহংরূপে দর্শন করেন তিনি সদাশিবপদবাচ্য।[৫] "সদাশিবের অহন্তা পরাহন্তা বা পূর্ণাহন্তা।"

ঈশ্বরতত্ত্ব—জগৎকে যিনি অহং থেকে ভিন্ন করে ইদংরূপে দেখেন তিনি ঈশ্বর।[৬]

বিদ্যাতত্ত্ব—'জগৎ আমিই' ইত্যাকার সদাশিবসম্বন্ধিনী বৃত্তিই বিদ্যাপদবাচ্য।[৭] ত্রিকদর্শনাদির মতে কিন্তু এই পঞ্চমতত্ত্বের নাম শুদ্ধবিদ্যা বা সদ্‌বিদ্যা।

মায়াতত্ত্ব—'ইদং জগৎ' ইত্যাকার অর্থাৎ ইদং অহং থেকে ভিন্ন এ রকম যে ভেদবিষয়িনী ঈশ্বরনিষ্ঠা বৃত্তি তাকে বলে মায়া।[৮]

অবিদ্যাতত্ত্ব—পূর্বোক্ত বিদ্যার আচ্ছাদিকা এবং তার বিরোধিনী অবিদ্যাপদবাচ্য।[৯] কিন্তু ত্রিকপ্রভৃতি দর্শন এবং ভাস্কররায়প্রমুখ আচার্যেরা একে বিদ্যাতত্ত্ব বলেছেন।

কলাতত্ত্ব—শিবের সর্বকর্তৃত্ব জীবে সংকুচিত হয়ে কিঞ্চিৎকর্তৃত্ব প্রাপ্ত হয়। এই কিঞ্চিৎকর্তৃত্বই কলা নামে খ্যাত।[১০]

রাগতত্ত্ব—শিবের নিত্যতৃপ্তি জীবে সংকুচিত হয়ে কোনো কোনো বিষয়ে অতৃপ্তি-আকারে দেখা দেয়। এই সংকুচিত নিত্যতৃপ্তিকে রাগ বলা হয়।[১১]

কালতত্ত্ব—শিবের নিত্যতা জীবে ষড়্‌ভাববিকারযোগে সংকুচিত হয়ে কালপদবাচ্য হয়।[১২]

১ কৌ র, পৃ: ১২৪, পাদটীকা ২ প ক সূ ১।৮-এর রামেশ্বরকৃত সৌভাগ্যোদয় নামক বৃত্তি ৩ ঐ

৪ নির্গুণ এব শিবঃ যো বহু স্যাং প্রজায়েয় ইতি ইচ্ছাশক্ত্যা যুক্তঃ স্রষ্ট্র্যুন্মুখঃ স এব শক্তিপদবাচ্যঃ।

—ঐ ৩।১-এর বৃত্তি

৫ ঐ ১।৪-এর রামেশ্বরকৃত বৃত্তি। ৬ ঐ ৭ ঐ ৮ ঐ ৯ ঐ

১০ ঐ ১১ ঐ

১২ অস্তি জায়তে বর্ধতে বিপরিণমতে অপক্ষীয়তে বিনশ্যতীতি ষড়্‌ভাবাঃ— আছে, জাত হয়, বর্ধিত হয়, পরিণামপ্রাপ্ত হয়, ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, বিনাশপ্রাপ্ত হয়—এই ষড়্‌ভাববিকার।—ঐ

নিয়তিতত্ত্ব—শিবের সর্বস্বাতন্ত্র্য অবিদ্যাদ্বারা জীবে সংকুচিত হয়ে নিয়তি নামে খ্যাত হয়।[১]

পুরুষতত্ত্ব বা জীবতত্ত্ব— পূর্বোক্ত নিয়তি কাল রাগ কলা এবং অবিদ্যার আশ্রয় জীব।[২]

প্রকৃতিতত্ত্ব—সত্ত্ব রজ এবং তমঃ এই তিন গুণের সাম্যরূপা প্রকৃতি।[৩] শব্দসৃষ্টি আর অর্থসৃষ্টির মূল একই। শব্দব্রহ্মস্বরূপিণী কুণ্ডলিনীই সর্বতত্ত্বময়ী।[৪] ইনিই প্রকৃতি। এইজন্য যে-রবকে শব্দব্রহ্ম বলা হয়েছে তাকে অব্যক্তাত্মক বা প্রকৃত্যাত্মকও বলা হয়েছে। অর্থাৎ কুণ্ডলিনীই প্রকৃতিস্বরূপিণী।[৫] প্রপঞ্চসারতন্ত্রে প্রধানকে শক্তি বলা হয়েছে।[৬] প্রকৃতি, প্রধান এবং অব্যক্ত পর্যায়বাচক শব্দ।[৭]

কাজেই দেখা যাচ্ছে শাক্তমতে চিদ্রূপিণী কুণ্ডলিনীশক্তিই প্রকৃতি। তবে এই প্রকৃতি আর সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি এক নয়। কেন না সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি অচেতন।

বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহত্তত্ত্ব—আমরা লক্ষ্য করে এসেছি বামকেশ্বরতন্ত্রমতে অব্যক্তবিগ্রহ শব্দব্রহ্ম থেকে ব্যক্তসত্ত্বগুণ বুদ্ধিতত্ত্বের উদ্ভব হয়। প্রপঞ্চসারতন্ত্র[৮] এবং শারদাতিলকেও[৯] শব্দব্রহ্ম থেকে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে। মহত্তত্ত্ব আর বুদ্ধিতত্ত্ব একই।

শারদাতিলকে মহত্তত্ত্বকে গুণান্তঃকরণাত্মক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে মহত্তত্ত্ব সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মক এবং মন বুদ্ধি অহংকার চিত্ত এই অন্তঃকরণচতুষ্টয়-স্বরূপ।[১০]

প্রসঙ্গতঃ বলা যায় অন্তঃকরণচতুষ্টয় সর্ববাদিসম্মত নয়। শৈবদর্শনের আলোচনা-প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা গেছে উক্ত দর্শনে বুদ্ধি, অহংকার এবং মন এই তিনটিকে অন্তঃকরণ বলা হয়েছে। উমানন্দনাথ নিত্যোৎসবে অন্তঃকরণত্রিতয়ের কথা বলেছেন। তাঁর মতে রজোগুণাত্মক অহংকার, সত্ত্বগুণাত্মক বুদ্ধি এবং তমোগুণাত্মক মন এই তিনটি অন্তঃকরণ।[১১]

অহংকারতত্ত্ব—মহত্তত্ত্ব থেকে বৈকারিক, তৈজস এবং ভূতাদি এই ত্রিবিধ অহংকার উৎপন্ন হয়। বৈকারিক অহংকার সাত্ত্বিক, তৈজস রাজসিক এবং ভূতাদি তামস।[১২]

অন্যান্য তত্ত্ব—শারদাতিলকের মতে বৈকারিক অহংকার থেকে একাদশ ইন্দ্রিয়ের

১ প ক সূ ১।৪-এর রামেশ্বরকৃত বৃত্তি ২ ঐ ৩ ঐ

৪ সর্বতত্ত্বময়ী সাক্ষাৎ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরা বিভুঃ।—শা তি ১।৫৫ ৫ ঐ ১।৫১-এর টীকা

৬ প্রধানমিতি যামাহুর্যা শক্তিরিতি কথ্যতে।—প্র সা ত ১।২৬

৭ প্রকৃতিঃ প্রধানোপরপর্যায়মব্যক্তশব্দেনোচ্যতে।—শা তি ১।১৭-এর টীকা

৮ প্র সা ত ১।৩৪ ৯ শা তি ১।১৭-এর টীকা ১০ শা তি ১।১৭ এবং টীকা

১১ নিত্যোৎসব, পৃঃ ৮ ১২ শা তি ১।১৮ এবং টীকা

একাদশ অধিষ্ঠাতৃদেবতার উদ্ভব হয়েছে। এঁদের নাম—দিক্, বায়ু, অর্ক, প্রচেতা, অশ্বিনী-কুমারদ্বয়, বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র (বিষ্ণু), সূর্য, ব্রহ্মা এবং চন্দ্র।[১]

তৈজস অহংকার থেকে দশ ইন্দ্রিয় এবং মন উৎপন্ন হয়েছে।[২]

আর ভূতাদি-অহংকার থেকে পঞ্চতন্মাত্র (সূক্ষ্ম ভূত) এবং তার থেকে যথাক্রমে পঞ্চমহা-ভূত উৎপন্ন হয়েছে।[৩]

ত্রিবিধ ভাগ—প্রকৃতি থেকে ক্ষিতি পর্যন্ত তত্ত্বের আবার ত্রিবিধ ভাগ করা হয়েছে। যথা—প্রকৃতি, প্রকৃতি-বিকৃতি এবং বিকৃতি। মূলপ্রকৃতি প্রকৃতি। মহত্তত্ত্ব, অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র প্রকৃতি-বিকৃতি। আর মন, দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত বিকৃতি। শেষোক্ত ষোলটি তত্ত্বকে ষোড়শ বিকারও বলা হয়।[৪] আবার প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহংকার এবং পঞ্চতন্মাত্র এই আটটি তত্ত্বকে অষ্ট প্রকৃতিও বলা হয়েছে।[৫]

এই বিচারে "প্রকৃতি শব্দের অর্থ উপাদান কারণ, বিকৃতি শব্দের অর্থ কার্য।"[৬] যে-তত্ত্ব কারণ তাকে বলা হয় প্রকৃতি। যে-তত্ত্ব একাধারে কারণ ও কার্য সে প্রকৃতি-বিকৃতি। যে-তত্ত্ব শুধু কার্য সে বিকৃতি। আর যে-তত্ত্ব শুধু কারণ সে মূলপ্রকৃতি।

ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বের ভাগ—ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বের বিভাগের বিষয় পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। লক্ষ্য করা গেছে আচার্য অভিনবগুপ্ত ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বের আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব এবং শক্তিতত্ত্ব এই তিন ভাগ করেছেন।

শাক্তদর্শনেও এই ভাগ স্বীকৃত। তবে শাক্ত আচার্যেরা এর সঙ্গে আরেকটি ভাগের কথা বলেন। সেতুবন্ধে উদ্ধৃত এই বিষয়ক একটি অভিযুক্তবচনে (পূর্বাচার্যদের বচন) বলা হয়েছে—ক্ষিতিতত্ত্ব থেকে মায়াতত্ত্ব পর্যন্ত আত্মতত্ত্ব; শুদ্ধবিদ্যাতত্ত্ব থেকে সদাশিবতত্ত্ব পর্যন্ত বিদ্যাতত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব এই দুই তত্ত্ব শিবতত্ত্ব (অভিনবগুপ্তের মতে শক্তিতত্ত্ব) আর এই সমস্ত তত্ত্বের সমষ্টিকে বলা হয় তুরীয়তত্ত্ব।[৭]

জীবের স্থূলাদি দেহের সঙ্গে এই আত্মতত্ত্বাদি অভিন্ন বলা হয়। স্থূলদেহ আত্মতত্ত্ব, সূক্ষ্মদেহ বিদ্যাতত্ত্ব, কারণদেহ শিবতত্ত্ব এবং মহাকারণদেহ তুরীয়তত্ত্ব।[৮]

১ শা তি ১।১৮-১৯ এবং টীকা ২ ঐ ১।১৯ এবং টীকা ৩ ঐ ১।১৯-২০

৪ T. T., Vol. XVIII, Part I, Intro., pp. 7-8 ৫ Ibid, p. 8

৬ শ্রীগো ব কে লে, ৭ম লেকচার, ১ম বর্ষ, পৃঃ ১৭৩

৭ মায়ান্তমাত্মতত্ত্বং বিদ্যাতত্ত্বং সদাশিবান্তং স্যাৎ।
শক্তিশিবৌ শিবতত্ত্বং তুরীয়তত্ত্বং সমষ্টিরেতেষাম্।—বা নি ৭।৩২-৩৩-এর সেতু

৮ বা নি, পৃঃ ২৪২-২৪৩; সৌভাগ্যভাস্করেও তুরীয়দশাপন্ন জীবের মহাকারণ দেহের কথা বলা হয়েছে।
—দ্রঃ ল স, সৌ ভা, পৃঃ ৭৬

"এইজন্যই তান্ত্রিক আচমনে 'আত্মতত্ত্বায় স্বাহা' এই মন্ত্রে স্থূলদেহের, 'বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা' এই মন্ত্রে সূক্ষ্মদেহের এব 'শিবতত্ত্বায় স্বাহা' এই মন্ত্রে কারণদেহের শোধন করা হয়।"[১]

ভাস্কররায় শ্রুতিপ্রমাণ উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন মহাকারণদেহও শোধ্য।[২]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় জীবের যেমন স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণদেহ আছে তেমনি শিবেরও এই ত্রিবিধ দেহ আছে। জীবের স্থূল দেহ প্রত্যক্ষ পাঞ্চভৌতিক দেহ। "পঞ্চ প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও দশ ইন্দ্রিয়, ইহা ভোগসাধন সূক্ষ্ম শরীর। অপঞ্চীকৃত ভূত হইতে ইহা উত্থিত হইয়াছে। এই সূক্ষ্ম শরীর মোক্ষ পর্যন্ত স্থায়ী। পূর্বাচার্যেরা সংসারের মূলীভূত অজ্ঞানকে কারণশরীর বলিয়াছেন।"[৩] সূক্ষ্ম শরীরকে লিঙ্গশরীর বা পুর্যষ্টকও বলা হয়।[৪]

শিবের ধ্যানে যে 'করচরণাদিবিশিষ্ট' রূপ বর্ণিত হয় তাই তাঁর স্থূল শরীর, মন্ত্ররূপ শরীর সূক্ষ্ম শরীর আর বাসনাত্মক শরীর পর- বা কারণ-শরীর।[৫] রামেশ্বর বলেন এই ত্রিবিধ শরীরকঞ্চুকিত পরম শিবই আত্মতত্ত্ব শিব। এই শিবও জীব।[৬]

আত্মতত্ত্বাদির ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে সেতুবন্ধে বলা হয়েছে— ক্ষিতি থেকে মায়া পর্যন্ত তত্ত্বে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের 'সৎ'-অংশ প্রকট, চিদানন্দাংশ আবৃত। এইজন্যই এই তত্ত্বগুলিকে বলা হয় আত্মতত্ত্ব। শুদ্ধবিদ্যা থেকে সদাশিব পর্যন্ত তত্ত্বে সচ্চিদংশ প্রকট, আনন্দাংশ আবৃত। এরূপ হওয়ার জন্য এদের বিদ্যাতত্ত্ব বলা হয়। শক্তি ও শিবতত্ত্বে কিছুই আবৃত নয়, সচ্চিদানন্দ প্রকট। এই কারণে এই দুটি তত্ত্বকে বলা হয় শিবতত্ত্ব।[৭]

আত্মতত্ত্বাদির অন্য ব্যাখ্যাও আছে। পদ্মপাদাচার্য বলেছেন আত্মতত্ত্ব প্রমেয়, বিদ্যাতত্ত্ব প্রমাণ এবং শিবতত্ত্ব প্রমাতা।[৮]

অন্যরকম ভাগ—আবার অন্যরকম বিচারে ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বের শুদ্ধ, শুদ্ধাশুদ্ধ বা মিশ্র এবং অশুদ্ধ এই ত্রিবিধ ভাগও করা হয়। অবরোহক্রমে শিবতত্ত্ব থেকে শুদ্ধবিদ্যাতত্ত্ব পর্যন্ত শুদ্ধ, মায়াতত্ত্ব থেকে মনস্তত্ত্ব পর্যন্ত শুদ্ধাশুদ্ধ আর শ্রোত্র থেকে ক্ষিতিতত্ত্ব পর্যন্ত তত্ত্ব অশুদ্ধ।[৯]

তবে শুদ্ধাশুদ্ধ এবং অশুদ্ধতত্ত্ব সম্বন্ধে মতভেদ আছে। মায়াতত্ত্ব থেকে পুরুষতত্ত্ব পর্যন্ত

১ কৌ র, পৃঃ ১৩০, পাদটীকা ২ বা নি, পৃঃ ২৫২-২৫৩

৩ শ্রীগো ব কে লে, ৭ম লেকচর, ৫ম বর্ষ, পৃঃ ১৯৩

৪ S. P., 2nd Ed., p. 56 ৫ প ক সূ ১।৫-এর টীকা ৬ ঐ

৭ তথা ক্ষিত্যাদিমায়ান্তং সদ্রূপং প্রকটং চিদানন্দাংশৌ বাবৃতৌ তাদৃশত্বাদেবৈষামাত্মতত্ত্বরূপতা। শুদ্ধবিদ্যাদিত্রয়ে সচ্চিদংশাবনাবৃতাবানন্দাংশেবাবৃতঃ। তাদৃশত্বাদেব তেষাং বিদ্যাতত্ত্বরূপতা। শক্তিশিবয়োস্তু ন কোঽপ্যংশ আবৃতোঽতঃ শিবতত্ত্বরূপতা।—বা নি (৭।৪৫-৪৬-এর সে ব) পৃঃ ২৫৬

৮ প্র সা ত ১।৬০-এর টীকা ৯ প্রা তো, ব সং, পৃঃ ১২

শুদ্ধাশুদ্ধ বা মিশ্র এবং প্রকৃতিতত্ত্ব থেকে ক্ষিতিতত্ত্ব পর্যন্ত অশুদ্ধ সাধারণতঃ এ রকম ভাগই লক্ষ্য করা যায়।[১]

জগৎ যেমন ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বাত্মক তেমনি পাঞ্চভৌতিক। ভাস্কররায় সেতুবন্ধে ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বকে পাঁচ ভাগ করে দেখিয়েছেন ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বও পঞ্চভূতময়। ক্ষিতিতত্ত্ব থেকে শ্রোত্রতত্ত্ব পর্যন্ত ক্ষিতিময়, মনস্তত্ত্ব থেকে প্রকৃতিতত্ত্ব পর্যন্ত জলময়, পুরুষতত্ত্ব থেকে মায়াতত্ত্ব পর্যন্ত তেজোময়, শুদ্ধবিদ্যাতত্ত্ব থেকে সদাশিবতত্ত্ব পর্যন্ত বায়ুময় এবং শক্তিতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব আকাশময়।[২]

তত্ত্বের অধীশ্বর— ক্ষিত্যাদি-তত্ত্বের বিভিন্ন অধীশ্বর আছেন। ক্ষিত্যাদিপ্রকৃত্যন্ত-তত্ত্বের অধীশ্বর ব্রহ্মা, পুরুষাদিকলান্ত-তত্ত্বের বিষ্ণু, মায়াতত্ত্বের রুদ্র, শুদ্ধবিদ্যাদিসদাশিবান্ত-তত্ত্বের ঈশ, তদূর্ধ্ব তত্ত্বের অধীশ্বর অনাশ্রিত শিব এবং পরশিব।[৩]

সাধনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ—প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় শাক্তদর্শন সাধনার সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত। দর্শনের সিদ্ধান্তের সার্থকতা সাধনার ক্ষেত্রে প্রয়োগে। ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্ববিচারেরও প্রধান সার্থকতা এইখানে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় শারদাতিলকে পঞ্চভূতের বর্ণনির্দেশ-প্রসঙ্গে বলা হয়েছে আকাশ স্বচ্ছ, মরুৎ কৃষ্ণ, অগ্নি রক্ত, জল বিশদ অর্থাৎ সাদা এবং ভূমি বা ক্ষিতি পীতবর্ণ।[৪] টীকায় রাঘবভট্ট বলেছেন শাস্ত্রানুগ উপাসনার জন্য কতিপয় অরূপী দ্রব্যের বর্ণের কথা বলা হল।

এর থেকে বোঝা যাচ্ছে পঞ্চভূত তর্কশাস্ত্রানুমোদিত কয়েকটি সিদ্ধান্তমাত্রই নয়, এ দিক্‌টা ত আছেই, এ ছাড়াও এদের আরেকটা দিক্ আছে—সাধনার ক্ষেত্রে প্রয়োগের দিক্। অন্যতত্ত্বগুলিরও এমনি সার্থকতা আছে।

দার্শনিক সিদ্ধান্তের সাধনার ক্ষেত্রে প্রয়োগের আরেকটি দৃষ্টান্ত হিসাবে তান্ত্রিক তত্ত্বশোধনের উল্লেখ করা যায়। তান্ত্রিক সাধকের তত্ত্বশোধন অবশ্য-করণীয়। তার যথাশাস্ত্র প্রক্রিয়া আছে। তবে তত্ত্বশোধনের মূলগত ভাব তত্ত্বগুলির কারণৈকত্বচিন্তা।[৫]

দেখা গেল শৈব ও শাক্ত দর্শনে সাংখ্যতত্ত্বের অতিরিক্ত বারটি তত্ত্ব স্বীকার করা হয়েছে। এই অতিরিক্ত তত্ত্বগুলির অস্তিত্বের প্রমাণ কি? এই তত্ত্বগুলিকে কি চতুর্বিংশতি সাংখ্য-তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না? এ রকম প্রশ্ন মনে জাগতে পারে। পরশুরামকল্পসূত্রের বৃত্তিকার রামেশ্বর এই প্রশ্ন দুটি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে অতিরিক্ত তত্ত্বগুলির অস্তিত্বের প্রমাণ শাস্ত্র। তিনি পরশুরামকল্পসূত্রের সূত্রকে প্রমাণ নির্দেশ করেছেন। এ ছাড়া স্কন্দপুরাণ ও পরমানন্দতন্ত্রের বচনও প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করেছেন।[৬]

---

১ শা তি ৫।৮২-৮৪ ২ বা বি (৭।৪৫-৪৬), পৃঃ ২৫৬

৩ G. L., 3rd Ed., p. 257 ৪ শা তি ১।২১-২২

৫ শোধনং নাম তত্ত্বানাং কারণৈকত্বচিন্তনম্।—বড়বামহারত্নবচন, দ্রঃ শা তি ৫।৭৭-এর টীকা

৬ প ক সূ ১।৪-এর বৃত্তি

রামেশ্বর বলেন নি কিন্তু এ বিষয়ে আরেকটি বিষয় বিবেচনা করার আছে। অধিকারী ব্যক্তিরা মনে করেন এই-সব তত্ত্ব শুধু বিচারবিমর্শের ফল নয়। সাধক যোগীদের যোগানুভূতিতে প্রথমে এই-সব তত্ত্ব এবং তাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়। তারপরে তর্কশাস্ত্রানুযায়ী বিচার করেও দেখান হয় যে এই-সব তত্ত্ব তর্কসিদ্ধও বটে।[১] কাজেই তত্ত্বের অন্যতম প্রধান প্রমাণ বলা যায় যোগীদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে রামেশ্বর বলেন চব্বিশটি সাংখ্যতত্ত্ব আর অতিরিক্ত বারটি তত্ত্ব পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্মবিশিষ্ট বলে অতিরিক্ত তত্ত্বগুলি সাংখ্যতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। অগ্রবর্তী তত্ত্বগুলি অতি সূক্ষ্ম, মন্দমতিদের পক্ষে কঠিনবেদ্য অর্থাৎ বোঝা কঠিন। সেইজন্য এই শ্রেণীর নিম্নাধিকারীর জন্য সুগমবেদ্য অর্থাৎ সহজে বোঝা যায় এমনি ক্ষিত্যাদিপ্রকৃত্যন্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে।[২]

ভুবন :

অর্থ—'অস্মাৎ ভরতি ইতি ভুবনম্'[৩] এর থেকে উৎপন্ন হয় এই জন্য এ ভুবন। সহজকথায় বলা যায় ভুবন উৎপত্তিস্থান, লোক। আবার ভূত অর্থাৎ উৎপন্ন অর্থে ভুবন শব্দটির অতি প্রাচীন ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ঋগ্‌বেদে[৪] একাধিক স্থলে শব্দটি এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

ষট্‌ত্রিংশতত্ত্ব নিয়ে ভুবনসমূহ গঠিত। সাধনার বিচারে ভুবনগুলিকে প্রাণ ও বোধের বিভিন্ন ভূমি (planes) বলা যায়।[৫]

সংখ্যা—বিভিন্ন গ্রন্থে ভুবনের বিভিন্ন সংখ্যা নির্দেশ করা হয়েছে। রাঘবভট্ট লিখেছেন ভুবন পাঁচটি। যথা—আকাশ, বায়ু, তৈজস, আপ্য এবং পার্থিব।[৬] বায়বীয়সংহিতা অনুসারে মূলাধার থেকে আরম্ভ করে উন্মনী পর্যন্ত সাধনার বিভিন্ন ভূমিকে বলা হয় ভুবন। যে-অধ্বার আদিতে মূলাধার ও অন্তে উন্মনী তাকেই বলা হয় ভুবনধ্বা।[৭]

এ ছাড়া সাধারণতঃ চতুর্দশ ভুবনের কথা বলা হয়। যথা—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য, অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল এবং পাতাল। ভূঃ থেকে সত্য পর্যন্ত ভুবন ঊর্ধ্বক্রমে অবস্থিত এবং ভূঃ-র নিম্নবর্তী অতল থেকে পাতাল পর্যন্ত ভুবন অধঃক্রমে অবস্থিত। অধোভুবনগুলির অন্যরকম নাম এবং ক্রমও লক্ষ্য করা যায়।[৮]

১ K. Sh., p. 163 ২ প ক সূ ১।৪ সূত্রের বৃত্তি ৩ দ্রঃ G. L., 3rd Ed., p. 251

৪ ঋ বে ১।১৫৪।২, ৪ ; ১।১৫৭।৫ ৫ Śākta Philosophy, H. Ph. E. W., Vol. I, p. 418.

৬ আকাশবায়ুতৈজসাপ্যপার্থিবভুবনানি পঞ্চ।—শা তি ৫।৯০-এর টীকা

৭ আধারাদ্যুন্মন্যন্তক ভুবনাধ্বা প্রকীর্তিতঃ।—দ্রঃ শা তি ৫।৯০-এর টীকা

৮ দ্রঃ প্রা তো, ৬।৩, ব সং, পৃঃ ৪৩৬

মর্মজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন প্রত্যেক তত্ত্বেরই আছে এক ভুবনমালা। ভুবনগুলির মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয়ে ভেদ থাকলেও যে যে তত্ত্বের যে যে ভুবন সেই সেই ভুবনে সেই সেই তত্ত্বের সামান্য ধর্মগুলির প্রাধান্য থাকে। অবশ্য পাতঞ্জল দর্শনের মতো শৈব-শাক্ত দর্শনেও 'সর্বং সর্বাত্মকম্'—সর্ব বস্তু সর্বাত্মক এই মতটি স্বীকার করা হয়।[১] কাজেই তত্ত্বগুলির মূলগত একত্ব আছে বলে সব ভুবনেই সব ভুবন বিদ্যমান বলা হয়।

শুদ্ধাদি ভাগ—ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বের যেমন শুদ্ধ, শুদ্ধাশুদ্ধ এবং অশুদ্ধ এই তিন ভাগ আছে তেমনি তাদের ভুবনগুলিরও এই তিন ভাগ করা হয়েছে। শুদ্ধ তত্ত্বের ভুবনগুলি শুদ্ধ, শুদ্ধাশুদ্ধ তত্ত্বের ভুবনগুলি শুদ্ধাশুদ্ধ এবং অশুদ্ধতত্ত্বের ভুবনগুলি অশুদ্ধ।

ব্রহ্মাণ্ডাদি মণ্ডল— কলা-সম্পর্কে আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা ব্রহ্মাণ্ডাদি চার অণ্ডের আলোচনা করেছি। এক একটি অণ্ড এক একটি মণ্ডল (sphere)। পৃথ্বীতত্ত্বের ভুবনগুলি নিয়ে ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল, অপ্ তত্ত্ব থেকে প্রকৃতিতত্ত্ব পর্যন্ত তত্ত্বের ভুবনগুলি নিয়ে প্রকৃত্যণ্ডমণ্ডল, পুরুষ তত্ত্ব থেকে মায়াতত্ত্ব পর্যন্ত তত্ত্বের ভুবনগুলি নিয়ে মায়াণ্ডমণ্ডল এবং শুদ্ধবিদ্যাতত্ত্ব থেকে শক্তিতত্ত্ব পর্যন্ত তত্ত্বের ভুবনগুলি নিয়ে শক্ত্যণ্ডমণ্ডল গঠিত। এই মণ্ডলটিই ব্যাপকতম। শক্তিতত্ত্বের পরে আর মণ্ডল নেই; কেন না এর পরে কোনো পরিচ্ছিন্নতা (limitation) নেই বলে কোনো মণ্ডলও নেই। তবে শিবতত্ত্বেরও ভুবন স্বীকার করা হয়।[২]

বিভিন্ন তত্ত্বের ভুবন—

শিবতত্ত্বের ভুবন দশটি। যথা—অনাশ্রিত, অনাথ, অনন্ত, ব্যোমরূপিণী, ব্যাপিনী, ঊর্ধ্বগামিনী, মোচিকা, রোচিকা, দীপিকা আর ইন্ধিকা। এর মধ্যে প্রথম পাঁচটিকে বলা হয় শাক্ত-ভুবন এবং শেষ পাঁচটিকে নাদোর্ধ্বভুবন।

শক্তিতত্ত্বের ভুবন পাঁচটি। যথা—শান্ত্যতীতা, শান্তি, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা এবং নিবৃত্তি। এদের বৈন্দবপুর বলা হয়।

সদাশিবতত্ত্বের ভুবনের নামও সদাশিব। এই তত্ত্বের একটিমাত্র ভুবন।

ঈশ্বরতত্ত্বের ভুবনসংখ্যা আট। যথা—শিখণ্ডি, শ্রীকণ্ঠ, ত্রিমূর্তি, একনেত্র, একরুদ্র, শিবোত্তম, সূক্ষ্ম এবং অনন্ত।

শুদ্ধবিদ্যাতত্ত্বের নয়টি ভুবন। যথা—মনোন্মনী, সর্বভূতদমনী, বলপ্রমথনী, বলবিকরণী, কলবিকরণী, কালী, রৌদ্রী, জ্যেষ্ঠা এবং বামা।

মায়ার ভুবনসংখ্যা আট। যথা—অঙ্গুষ্ঠমাত্র, ঈশান, একেক্ষণ, একপিঙ্গল, উদ্ভব, ভব, বামদেব আর মহাদ্যুতি।

১ Śakta Philosophy, H. Ph. E. W., Vol. I., p. 418 ২ Ibid

কালতত্ত্বের ভুবন মাত্র দুটি—শিখেশ আর একবীর।

কলাতত্ত্বেরও ভুবন দুটি—পঞ্চান্তক আর শূর।

বিদ্যাতত্ত্বের ভুবনসংখ্যাও দুই। যথা—পিঙ্গ আর জ্যোতি।

নিয়তিতত্ত্বেরও দুটি ভুবন—সম্বর্ত আর ক্রোধ।

রাগতত্ত্বের ভুবন পাঁচটি। যথা—একশিব, অনন্ত, অজ, উমাপতি আর প্রচণ্ড।

পুরুষতত্ত্বের ভুবনসংখ্যা ছয়। যথা—একবীর, ঈশান, ভব-ঈশ, উগ্র, ভীম এবং বাম।

প্রকৃতিতত্ত্বের ভুবন আটটি। এদের নাম—শ্রীকণ্ঠ, ঔম, কৌমার, বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম, ভৈরব, কৃত আর অকৃত।

বুদ্ধিতত্ত্বেরও ভুবনসংখ্যা আট। যথা—ব্রাহ্ম, প্রজেশ, সৌম্য, ঐন্দ্র, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, আর পিশাচ।

অহংকারতত্ত্বের একটিমাত্র ভুবন—স্থলেশ্বর।

মন এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়েরও ভুবন একটি—স্থূলেশ্বর।

পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়েরও একটি ভুবন—শঙ্কুকর্ণ।

পঞ্চতন্মাত্রের ভুবন পাঁচটি। যথা—কালঞ্জর, মণ্ডলেশ্বর, মাকোট, দ্রাবিণ্ড এবং ছকলাণ্ড।

আকাশতত্ত্বের ভুবন আটটি। যথা—স্থাণু, স্বর্ণাক্ষ, ভদ্রকর্ণ, গোকর্ণ, মহালয়, অবিমুক্ত, রুদ্রকোটি এবং বস্ত্রপাদ।

বায়ুতত্ত্বেরও ভুবন আটটি। যথা—ভীমেশ্বর, মহেন্দ্র, অট্টহাস, বিমলেশ, নল, নাকল, কুরুক্ষেত্র এবং গয়া।

তেজস্তত্ত্বের ভুবন আটটি যথা—ভৈরব, কেদার, মহাকাল, মধ্যমেশ, আম্রাতক, জল্পেশ, শ্রীশৈল এবং হরিশচন্দ্র।

অপ্‌তত্ত্বের ভুবনসংখ্যাও আট। যথা— লকুলীশ, পারভূতি-ভিণ্ডি, মুণ্ডি, বিধি, পুষ্কর, নৈমিষ, প্রভাস এবং অমরেশ।

পৃথ্বীতত্ত্বের ভুবনসংখ্যাই সব চেয়ে বেশী, মোট এক শ আট। উত্তর কামিকাগমে বলা হয়েছে[১] পূর্বদিকে কপালীশাদি, অগ্নিকোণে অগ্নিরুদ্রাদি, দক্ষিণে যমাদি, নৈঋতকোণে নিঋত্যাদি, পশ্চিমে বলাদ্যা, বায়ুকোণে শীঘ্রাদি, উত্তরে নিধীশাদি, ঈশানকোণে বিদ্যাধি-

১ কপালীশাদয় প্রাচ্যামগ্নিরুদ্রাদয়োঽনলে। যমাদ্যা দক্ষিণে ভাগে নিরৃত্যাদ্যাশ্চ নৈঋতে।
বলাদ্যা বারুণে ভাগে শীঘ্রাদ্যা বায়ুগোচরে। উত্তরে তু নিধীশাদ্যা ঈশে বিদ্যাধিপাদয়ঃ।
বৃষাদয়স্তথাভাগে শম্ভুমুখ্যা হ্যধোগতাঃ। ভুবনানাং শতং চাষ্টাধিকমেব তু বিদ্যতে।
—উত্তর-কামিকাগমবচন দ্রঃ El. H. I., Vol. II, Part II, p. 395

পাদি, অধোভাগে বৃষাদি আর নভোভাগে শম্ভুপ্রমুখ ভুবন অবস্থিত। এইভাবে এক শ আট ভুবনের বিন্যাস করবে।[১]

ভুবনগুলি বিভিন্ন প্রকারের জীবের আবাসস্থল। শৈবরা বলেন পরম শিব ভুবনগুলির সৃষ্টি করেছেন তাদের অধিবাসীদের ভোগের জন্য। এই-সব অধিবাসীদের মধ্যে মানুষ থেকে আরম্ভ করে পরমেশ্বর পরমেশ্বরী পর্যন্ত ক্রমোন্নত নানা স্তরের নানা সত্তা বিরাজমান।[২]

শক্তিতত্ত্ব ও শিবতত্ত্বের ভুবনের অধিবাসী শক্তিজগণ এবং শাম্ভবগণ।[৩]

মন্ত্রমহেশ্বরেরা সাদাখ্যতত্ত্বের ভুবনে বাস করেন। ঈশ্বরতত্ত্বের ভুবনের অধিবাসী মন্ত্রেশ্বরগণ। শুদ্ধবিদ্যাতত্ত্বের ভুবনে বাস করেন মন্ত্রগণ ও বিদ্যেশ্বরগণ। শুদ্ধবিদ্যার নীচে আর মায়াতত্ত্বের উপরে বিজ্ঞানাকলদের স্থান। প্রলয়াকলেরা মায়াতত্ত্বের ভুবনে বাস করেন। অর্থাৎ এঁরা মায়াণ্ডের অধিবাসী। সকলদের বাস প্রকৃত্যণ্ডে এবং ব্রহ্মাণ্ডে।[৪]

সত্যাদি ভুবনের অধীশ্বর-অধীশ্বরী—আবার অন্যবিচারে সত্যাদি সপ্ত ভুবনের বা ঊর্ধ্বলোকের অধীশ্বর এবং অধীশ্বরীর কথা বলা হয়েছে। সত্যলোকের অধীশ্বর পরম শিব বা মহাবিষ্ণু, অধীশ্বরী আদ্যাশক্তি মহাকালী; তপোলোকের অধীশ্বর শম্ভু, অধীশ্বরী সিদ্ধকালী; সদাশিব এবং মহাগৌরী জনলোকের অধীশ্বর ও অধীশ্বরী; মহর্লোকের অধীশ্বর ঈশ ও অধীশ্বরী ভুবনেশ্বরী; রুদ্র ও রুদ্রকালী স্বর্লোকের অধীশ্বর ও অধীশ্বরী; ভুবর্লোকের অধীশ্বর বিষ্ণু এবং অধীশ্বরী রাধা আর ভূর্লোকের অধীশ্বর ও অধীশ্বরী ব্রহ্মা ও সাবিত্রী।[৫]

১ ভুবন সম্বন্ধে এই বিবরণ গোপীনাথ রাও মহাশয়ের Elements of Hindu Iconography (Vol. II, Part II, pp. 393-95) নামক গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে। তাতে পৃথ্বীতত্ত্বের ভুবনগুলির নাম করা হয় নি; শুধু বলা হয়েছে পৃথ্বীতত্ত্বের ভুবন অন্ধকালী থেকে কালাগ্নি পর্যন্ত।

২ G. L., 3rd Ed., pp. 253-254

৩ ত আ, ন আ (৯।৫৩) পৃঃ ৫২

৪ G. L., 3rd Ed., pp. 201, 255

৫ P. T., Part II, 2nd Ed., Intro., p. 593

এই সপ্ত ভুবন বা লোক সপ্ত শক্তিলোক (cosmic centres of Power) আবার এই সাতটিই চৈতন্যের সপ্ত ভূমি বা স্তর। ব্রহ্মার চৈতন্যের চেয়ে বিষ্ণুর চৈতন্য উচ্চতর, রুদ্রের চৈতন্য তার চেয়ে উচ্চতর, এমনিভাবে চৈতন্যের ক্রমোচ্চতা নির্দিষ্ট হয়েছে। পরমশিব বা মহাবিষ্ণুর চৈতন্য অন্যের তুলনায় সর্বোচ্চ।[১]

কলা-তত্ত্ব-ভুবন—কলা, তত্ত্ব ও ভুবন এই তিনের পরস্পরের সম্বন্ধ নিম্নলিখিত তালিকা[২] থেকে সহজে বোঝা যাবে। ভুবনের নাম পূর্বেই দেওয়া হয়েছে বলে এখানে আর বিস্তৃতভাবে দেওয়া হল না।

কলা	তত্ত্ব	ভুবন
	(ক) শুদ্ধতত্ত্ব	
শান্ত্যতীতা	১। শিবতত্ত্ব	... অনাশ্রিতাদি
	২। শক্তিতত্ত্ব	... শান্ত্যতীতাদি
শান্তি	৩। সদাশিবতত্ত্ব	... সদাশিব
	৪। ঈশ্বরতত্ত্ব	... শিখণ্ডাদি
	৫। শুদ্ধবিদ্যাতত্ত্ব	... মনোন্মন্যাদি
	(খ) শুদ্ধাশুদ্ধ তত্ত্ব	
বিদ্যা	৬। মায়া	... অঙ্গুষ্ঠমাত্রাদি
	৭। কাল	... শিখেশাদি
	৮। কলা	... পঞ্চান্তকাদি
	৯। বিদ্যা	... পিঙ্গলাদি
	১০। নিয়তি	... সম্বর্তাদি
	১১। রাগ	... একশিবাদি
	১২। পুরুষ	... একবীরাদি

১ P. T., Part II, 2nd Ed., Intro., pp. 598-599

২ দ্রঃ El. H. I., Vol. II. Part II, pp. 392-397, f. n.

(গ) অশুদ্ধ তত্ত্ব

কলা	তত্ত্ব		ভুবনেশ্বর
প্রতিষ্ঠা	১৩।	প্রকৃতি	... শ্রীকণ্ঠাদি
	১৪।	বুদ্ধি	... ব্রাহ্মাদি
	১৫।	অহংকার	... স্থূলেশ্বর
	১৬।	মন	স্থূলেশ্বর
	১৭।	শ্রোত্র	
	১৮।	ত্বক্	
	১৯।	চক্ষু	
	২০।	জিহ্বা	
	২১।	নাসা	
	২২।	বাক্	শঙ্কুকর্ণ
	২৩।	পাণি	
	২৪।	পাদ	
	২৫।	পায়ু	
	২৬।	উপস্থ	
	২৭।	শব্দ	কালঞ্জরাদি
	২৮।	স্পর্শ	
	২৯।	রূপ	
	৩০।	রস	
	৩১।	গন্ধ	
	৩২।	ব্যোম	... স্থাণু-আদি
	৩৩।	মরুৎ	... ভীমেশ্বরাদি
	৩৪।	তেজ	... ভৈরবাদি
	৩৫।	অপ্	... লকুলীশাদি
নিবৃত্তি	৩৬।	ক্ষিতি	... ভদ্রকাল্যাদি

পিণ্ড-ব্রহ্মাণ্ড—এই প্রসঙ্গে পিণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডের বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যেতে পারে। কেন না ব্রহ্মাণ্ড ভুবনসমূহেরই অন্যতম মণ্ডল। যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে তাই আছে পিণ্ডে[১] এটি তন্ত্রশাস্ত্রের একটি মূল সিদ্ধান্ত। কথাটাকে অন্যভাবেও বলা হয়—যা এখানে অর্থাৎ পিণ্ডে আছে তা অন্যত্র অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডেও আছে; যা এখানে নেই তা কোথাও নেই।[২]

পিণ্ডের অর্থাৎ ব্যষ্টিজীবদেহের আর ব্রহ্মাণ্ডের এই সম্বন্ধের ধারণা কিন্তু প্রাচীন। ঋগ্‌বেদের পুরুষসূক্তে তার সূচনা হয়েছে। এই সূক্তে সর্বপ্রাণিসমষ্টিরূপ-ব্রহ্মাণ্ডদেহ যে-বিরাট্ পুরুষের[৩] সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাঁরই ধারণা থেকে ক্রমে ক্রমে পিণ্ডদেহও যে ব্রহ্মাণ্ডদেহের ক্ষুদ্ররূপ এই ধারণার উদ্ভব হয়েছে। অথর্ববেদেই দেখা যায় ব্যষ্টি-মানুষেই ঋগ্‌বেদোক্ত বিরাট্ পুরুষের কল্পনা আরোপিত হয়েছে। একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে—অতএব যে পুরুষকে জানে সে মনে করে এই পুরুষ ব্রহ্ম। কারণ গরু যেমন গোষ্ঠে বাস করে তেমনি সব দেবতা এর মধ্যে রয়েছেন।[৪] মন্ত্রটি একাদশ কাণ্ডের অষ্টম সূক্তের অন্তর্গত। অষ্টম সূক্তে বর্ণিত পুরুষ সাধারণ ব্যষ্টিমানুষ।

এই ধারণাটি ব্রাহ্মণগ্রন্থেও অনুসৃত হয়েছে। তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে—আমার বাক্যে অগ্নি অধিষ্ঠিত, প্রাণে বায়ু, চক্ষুতে সূর্য, মনে চন্দ্রমা, শ্রোত্রে দিক্। পৃথিবী আমার শরীরে অধিষ্ঠিত, ওষধিবনস্পতি আমার লোমে, ইন্দ্র আমার বলে, পর্জন্য আমার মূর্ধাতে, ঈশান আমার মন্যুতে অধিষ্ঠিত। প্রকৃতি আমার শরীরে আশ্রিত, শরীর হৃদয়ে অর্থাৎ বিজ্ঞানাত্মায়, হৃদয় আমাতে অর্থাৎ জ্ঞানাত্মা চেতনায়, আমি অমৃতে অর্থাৎ অক্ষর পরমাত্মায় আর অমৃত ব্রহ্মে আশ্রিত। এই যুক্তিপরম্পরা অনুসরণ করে দেখান হয়েছে বাক্ প্রভৃতি প্রত্যেকটি বস্তুই শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মাশ্রিত। অর্থাৎ দেখান হয়েছে ব্যষ্টিমানুষ ব্রহ্ম বা বিরাট্ পুরুষ থেকে ভিন্ন নয়।[৫]

এই ধারণা উপনিষদাদিতেও অনুসৃত হয়েছে। ছান্দোগ্য-উপনিষদে মানবদেহকে বলা হয়েছে ব্রহ্মপুর। সেই দেহের মধ্যে হৃদয়পদ্মে আছে অন্তরাকাশ। বাইরের ভৌতিক আকাশের যে-পরিমাণ হৃদয়মধ্যবর্তী এই আকাশেরও সেই পরিমাণ। দ্যুলোক এবং পৃথিবী

১ ব্রহ্মাণ্ডবর্তি যৎকিঞ্চিত্তৎপিণ্ডেঽপ্যস্তি সর্বথা।—সিদ্ধসিদ্ধান্তসংগ্রহ ৩।২

২ যদিহাস্তি তদ্ অন্যত্র, যন্নেহাস্তি ন তৎ কচিৎ।—বিশ্বসারতন্ত্রবচন,

দ্রঃ S. S., 4th Ed, p. 275 ; S. P., 2nd Ed., p. 50, n 4

৩ সর্বপ্রাণিসমষ্টিরূপো ব্রহ্মাণ্ডদেহো বিরাডাখ্যো যঃ পুরুষঃ।—ঋ বে ১০।৯০।১-এর সায়ণভাষ্য

৪ তস্মাদ্বৈ বিদ্বান্ পুরুষমিদং ব্রহ্মেতি মন্যতে। সর্বা হ্যস্মিন্ দেবতা গাবো গোষ্ঠ ইবাসতে।

—অ বে ১১।৮।৩২

৫ তৈ ব্রা ৩।১০।৮।১৬-২২ এবং তট্টীকাস্বরমিশ্রের ভাষ্য।

উভয়েই এই অন্তরাকাশে সংস্থাপিত ; অগ্নি এবং বায়ু, সূর্য এবং চন্দ্রমা, বিদ্যুৎ, নক্ষত্রসমূহ এরই মধ্যে সংস্থাপিত।[১]

কাজেই পিণ্ড-ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে তন্ত্রশাস্ত্রের যে-সিদ্ধান্ত তাতে ভারতের একটি অতি প্রাচীন চিন্তাধারাই অনুসৃত হয়েছে সন্দেহ নেই।

দেখা গেল পিণ্ড অর্থাৎ মানবদেহ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে সে-সবই মানবদেহে বর্তমান—গ্রহনক্ষত্র, নদীসমুদ্র, পাহাড়পর্বত সব। নির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে—ব্রহ্মপদ্ম অর্থাৎ মূলাধারচক্রে আছে পৃথিবী। তাতে আছে মনুষ্যাদি জীব। দেবি! তারা সবাই ব্রহ্মাণ্ড। তাদের মধ্যে আছে ভুবনসমূহ ; তাদের মধ্যেই আছে সপ্ত স্বর্গ এবং সপ্ত পাতাল। এইরূপে সব দেহের মূলাধারাদি চক্রে আছে চতুর্দশ ভুবন। পরেশানি! প্রতি-দেহই এক একটি ব্রহ্মাণ্ড।[২]

দেহের কোন অংশে চতুর্দশ ভুবনের কোনটি অবস্থিত শাস্ত্রে তা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। শাক্তানন্দতরঙ্গিণীতে আছে—পায়ের তলায় অতল, তার উর্ধ্বে বিতল, জানুতে সুতল, সন্ধি-রন্ধ্রেতে তল, গুল্‌ফে তলাতল, লিঙ্গমূলে রসাতল এবং কটিসন্ধিতে ও পাদাদিতে পাতাল। নাভিদেশে ভূর্লোক, কণ্ঠদেশে স্বর্লোক, চক্ষুতে মহর্লোক, তার উর্ধ্বে জনলোক, ললাটে তপোলোক এবং মহাযোনিতে অর্থাৎ ভ্রূমধ্যের উর্ধ্বে বিন্দুস্থানে সত্যলোক।[৩] এ বিষয়ে অবশ্য মতভেদ আছে।[৪]

মানবদেহে ষট্‌ত্রিংশতত্ত্বের অবস্থান এইভাবে বর্ণিত হয়েছে—পা থেকে নাভি পর্যন্ত আত্মতত্ত্ব, নাভি থেকে হৃদয় পর্যন্ত বিদ্যাতত্ত্ব এবং হৃদয় থেকে বিন্দু পর্যন্ত শিবতত্ত্ব।[৫]

১ ছা উপ ৮।১, ৩

২ ব্রহ্মপদ্মে পৃথিব্যাস্তু বর্তন্তে মানুষাদয়ঃ। তে সর্বে দেবি ব্রহ্মাণ্ডাস্তন্মধ্যে ভুবনানি চ।
পাতালসপ্তকং তত্র তত্রৈব স্বর্গসপ্তকম্। এবং ক্রমাৎ সর্বদেহে ভুবনানি চতুর্দশ।
প্রতিদেহং পারেশানি ব্রহ্মাণ্ডং নাত্র সংশয়ঃ।—নি ত, ১০ম পটল

৩ পাদাধস্তুতলং বিদ্যাতদূর্ধ্বং বিতলন্তথা। জানুনোঃ সুতলঞ্চৈব তলংচ সন্ধিরন্ধ্রয়োঃ।
তলাতলং গুল্‌ফমধ্যে লিঙ্গমূলে রসাতলম্। পাতালং কটিসন্ধৌ চ পাদাদৌলক্ষয়েদ্ বুধঃ।
ভূর্লোকো নাভিদেশে তু ভুবর্লোকস্তথা হৃদি। স্বর্লোকঃ কণ্ঠদেশে তু মহর্লোকশ্চ চক্ষুষি।
জনলোকস্তদূর্ধ্বঞ্চ তপোলোকো ললাটকে। সত্যলোকো মহাযোনৌ ভুবনানি চতুর্দশ।—শা ত, উঃ ১

৪ দ্রঃ প্রা তো, ষষ্ঠ কাণ্ড, ৩য় পরিঃ, ব সং, পৃঃ ৪০৬

৫ পাদাদিনাভিপর্যন্তং আত্মতত্ত্বং প্রকীর্তিতম্।
নাভ্যাদিহৃদয়ান্তং হি বিদ্যাতত্ত্বং প্রকীর্তিতম্।
হৃদয়াদিবিন্দুপর্যন্তং শিবতত্ত্বং প্রকীর্তিতম্।—শ স ত, স্থ খ, ৪।৬৫-৬৬

রাঘবভট্ট লিখেছেন শরীর ষড়ধ্বময়।[১] কথাটির ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে তিনি যে-বচন উদ্ধার করেছেন তাতে আছে— মূর্ধা শান্ত্যতীতকলা; বক্ত্র এবং শিরোরুহ শান্তিকলা; জানু, জঙ্ঘা এবং অস্থি নিবৃত্তিকলা। শিরোরুহসমূহ ভুবন-অধ্বা, মাংস ও রুধির মন্ত্র-অধ্বা, শিরাসমূহ পদ ও বর্ণ-অধ্বা আর মজ্জা মেদ অস্থি ধাতু ও রেত তত্ত্ব-অধ্বা।[২]

পূর্বেই বলা হয়েছে সাধনার ক্ষেত্রে তান্ত্রিক সাধককে ষড়ধ্বা-শোধন অবশ্যই করতে হয়। কেন না ষড়ধ্বা-শোধনের দ্বারা শরীরশুদ্ধি হয়।[৩]

সাধনার বিচারে শাক্ত দর্শনের প্রধান সার্থকতা সাধনার ক্ষেত্রে প্রয়োগে। শক্তি-সাধনায় শাক্তদর্শনের অন্য কোনো উপযোগিতা নাই। দার্শনিক বিচারের দ্বারা পরম বস্তু লাভ হয় না। এমন কি দর্শনের অন্যতম প্রধান আলোচ্য যে-সৃষ্টি তারও নিগূঢ় রহস্য অবগত হওয়া যায় না।

সৃষ্টির রহস্য নিগূঢ়—শাক্ত দর্শনের আলোচনা উপলক্ষ্যে আমরা এই যে-শব্দার্থময়ী সৃষ্টির আলোচনা করলাম সাধকদের মতে এ রকম আলোচনায় সৃষ্টির প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয় না। যিনি সাধনার উচ্চ স্তরে আরোহন করেছেন এ রহস্য শুধু তাঁরই কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়। তবে সাধনায়ও সৃষ্টিতত্ত্ব জ্ঞান আবশ্যক। সেইজন্য এইরূপ আলোচনারও প্রয়োজন স্বীকৃত হয়। গুরু শিষ্যকে সৃষ্টিরহস্য তার উপযোগী করেই উপদেশ দেন।

দেবীভাগবতের টীকায় নীলকণ্ঠ লিখেছেন—সৃষ্টিপ্রক্রিয়া অনির্বচনীয়, এর নিগূঢ় রহস্য ঠিকমত বোঝান যায় না। উপাসনায় সৃষ্টিতত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক। এইজন্য গুরু শিষ্যের অধিকার বিবেচনা করে যেভাবে সৃষ্টিতত্ত্বের উপদেশ দিলে শিষ্যের বোধগম্য হবে সেইভাবেই তাকে উপদেশ দেন। এইজন্যই শাস্ত্রে সৃষ্টিব্যাপারের বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়। সাধনার উচ্চস্তরে আরোহণ করলে সাধক নিজেই সৃষ্টির যথার্থ রহস্য অবগত হন।[৪]

নানা শাস্ত্রগ্রন্থে সৃষ্টিব্যাপার নানাভাবে বর্ণিত হলেও সৃষ্টিপ্রবাহ যে অনাদি এবং অনন্ত এ বিষয়ে সনাতনধর্মীয় শাস্ত্রে কোনো মতভেদ নেই। কল্প থেকে কল্পান্তরের মধ্য দিয়ে এই প্রবাহ চলেছে। সৃষ্টির পর প্রলয়, প্রলয়ের পর আবার কল্পারম্ভে নূতন সৃষ্টি এই ক্রমে সীমাহীন বিরামহীন প্রবাহ চলেছে। অবশ্য পূর্ববর্তী কল্পের যে-সৃষ্টি

১ শা তি ৫।১৫-এর টীকা

২ শান্ত্যতীতা কলা মূর্ধা শান্তি বক্ত্রশিরোরুহা। নিবৃত্তি জানুজঙ্ঘাস্থি ভুবনাধ্বশিরোরুহা।
মন্ত্রাধ্বমাংসরুধিরা পদবর্ণশিরাবৃতা। তত্ত্বাধ্বমজ্জামেদোঽস্থিধাতুরেতোবৃতা শিবে।

—দ্রঃ শা তি ৫।১৫-১৬-এর টীকা

৩ শা তি ৫।১৫-১৬-এর টীকা ৪ দ্রঃ দেবী ভা, পৃঃ ২৬০০-এর পাদটীকা

পরবর্তী কল্পের সৃষ্টিও যে ঠিক তাই হবে এমন কথা নেই। খুঁটিনাটি ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে। তবে সাধারণভাবে সৃষ্টিকল্পনা উভয়ত্র একই।[১]

সনাতনধর্মীয় সব শাস্ত্রমতে এবং ভারতের সব দার্শনিক মতেই জগৎ সত্য এই অর্থে যে এর ব্যাবহারিক সত্তা রয়েছে, এটি কোনো ব্যক্তিবিশেষের মনের প্রসূতি নয়।[২] এমন কি অদ্বৈতবেদান্তীরাও জগতের ব্যাবহারিক সত্তা স্বীকার করেন। বেদান্তপরিভাষাকার জগৎ সম্বন্ধে বলেন 'ন তু সংসারদশায়াং বাধঃ' জগৎ স্বরূপতঃ মিথ্যা হলেও সংসারদশায় মিথ্যা নয়। যেমন যখন লোকে স্বপ্ন দেখে তখন স্বপ্ন মিথ্যা নয়। তখনই যদি স্বপ্ন মিথ্যা হত তা হলে লোকে স্বপ্নে বাঘ দেখে ভয়ে চীৎকার করে উঠত না। সেইজন্য দার্শনিকেরা বলেন 'দেহাত্মপ্রত্যয়ো যদ্বৎ প্রমাণত্বেন কল্পিতঃ লৌকিকং তদ্বদেবেদং প্রমাণন্ত্বাত্মনিশ্চয়াৎ'।—দেহে আত্মপ্রত্যয় পরমার্থতঃ মিথ্যা হলেও যেমন সংসারদশায় প্রমাণ বলে গণ্য হয় তেমনি দ্বৈত জগৎ স্বরূপতঃ মিথ্যা হলেও ব্রহ্মসাক্ষাৎকার না হওয়া পর্যন্ত জীবের কাছে স্বতন্ত্ররূপেই প্রমাণ বলে গণ্য হয়।[৩] শৈবশাক্তমতে কিন্তু বিশ্বসৃষ্টি পরমার্থতঃ সত্য, এ সৃষ্টি শিবশক্তির লীলা, তাঁদের আনন্দের অভিব্যক্তি।

আরেকটা কথা। তন্ত্রমতে সৃষ্টি একটি মহাব্রহ্মাণ্ড এবং অসংখ্য বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড তার অন্তর্গত। নির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে—মহাব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আছে বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড। তার মধ্যে আছে প্রাণিসমূহ এবং ভুবনসমূহ।[৪] আর সেই মহাব্রহ্মাণ্ড থেকে উদ্ভূত হয় লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মাণ্ড।[৫]

মহাব্রহ্মাণ্ডের ভূঃ প্রভৃতি সপ্ত লোক আছে। এর প্রত্যেকটি লোক থেকে অসংখ্য বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব হয়। প্রত্যেকটি বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডেরও আছে সপ্তলোক। প্রত্যেক গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক প্রাণী এক একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড এবং প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যেই আছে সপ্তলোক অর্থাৎ সপ্ত শক্তিভূমি এবং তাদের অধিষ্ঠাতৃদেবতা।[৬]

এই সৃষ্টিকল্পনা অনুধাবন করলে মহাশক্তির যে-বিরাট্ রূপের আভাস পাওয়া যায় তার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ একদিকে আপনার ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি করে। সে যখন দেখে মহাব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় পৃথিবী একটি ধূলিকণার মতো আর সেই পৃথিবীর এতটুকু একটি জীব সে, তখন সে নিরহংকার হয়, মহাশক্তির শরণার্থী হয়। আবার অন্যদিকে মানুষ তার আত্মস্বরূপের সন্ধান পায়। সে দেখে এই মহাব্রহ্মাণ্ড যে মহাশক্তির রূপ সেও তাঁরই রূপ; সেও একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। তখন সে সব রকমের ক্ষুদ্রতার, হীনতার ঊর্ধ্বে উঠার প্রেরণা পায় আর আত্মস্বরূপ-উপলব্ধির প্রয়াসী হয়। সাধারণভাবে বলা যায় শাস্ত্রানুগ এই প্রয়াসই তার সাধনা।

১ Mahāmāyā, pp. 112-.13. ২ Ibid, Intro., p. 8 ৩ ব্রঃ ত ত, পৃঃ ২১৬

৪ মহাব্রহ্মাণ্ডমধ্যে তু বৃহদ্‌ব্রহ্মাণ্ডমেব চ। তন্মধ্যে জন্তবো দেবি তন্মধ্যে ভুবনানি চ।—নি ত, পৃঃ ১০

৫ ব্রহ্মাণ্ডাত্তত্র জায়ন্তে লক্ষং লক্ষং সুলোচনে।—ঐ ৬ P. T., Part II., 2nd Ed., p. 665

একাদশ অধ্যায়

সাধনা

সাধনার অর্থ—সাধনা শব্দের ব্যাপক অর্থ কোনো বিষয়ে সিদ্ধিলাভের জন্য ঐকান্তিক প্রযত্ন। অন্যভাবে বলা যায় যে-প্রযত্নের দ্বারা সিদ্ধিলাভ হয় তাই সাধনা। সাধনার সঙ্কীর্ণ অর্থ আরাধনা। আরাধনাও অবশ্য প্রযত্নবিশেষ।

সাধারণভাবে বলা যায় যার দ্বারা মানুষের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক পূর্ণ পরিণতি লাভ হয় তারই নাম সাধনা।[1]

সাধনার বিভিন্ন লক্ষ্য—যে যে-বিষয়ে সিদ্ধি চায় সে সেই বিষয়ে সাধনা করে। সাধারণ মানুষ বল, ঐশ্বর্য, মান, যশ প্রভৃতি চায়। কাজেই এ-সব তাদের সাধনার লক্ষ্য হতে পারে। আবার আধ্যাত্মিক প্রকৃতির লোকেরা পারমার্থিক বস্তু চান, ভগবানকে চান, মোক্ষ বা মুক্তি চান। এইজন্য তাঁদের সাধনার লক্ষ্যও তাই হয়। এ ছাড়া এমন-সব মানুষ আছেন যাঁরা জাগতিক এবং পারমার্থিক উভয়বিধ সিদ্ধিই কামনা করেন। এইজন্যই সনাতনধর্মীয় শাস্ত্রে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চতুর্বর্গকে পুরুষার্থ বা পুরুষের সাধনার বস্তু বলা হয়েছে।

সুখ— পরশুরামকল্পসূত্রের বৃত্তিকার রামেশ্বর পুরুষার্থকে বলেছেন সুখ। সুখ দুরকমের নৈসর্গিক এবং কৃত্রিম। নৈসর্গিক সুখ মোক্ষ। কৃত্রিম সুখ তৃতীয় পুরুষার্থ কাম।[2] অর্থাৎ কৃত্রিম সুখ অভিলষিত ঐহিক সুখ। কাম্য কর্মের ফলস্বরূপ যে-স্বর্গবাস তাও কৃত্রিম সুখ।

লোকের রুচি- ও প্রকৃতি-অনুসারে তাদের বাঞ্ছিত বস্তু ভিন্ন হয় কিন্তু এই সুখ বস্তুটি সবাই চায়। কেউ চায় কৃত্রিম সুখ, কেউ চায় নৈসর্গিক সুখ, কেউ বা উভয় সুখই কামনা করে।

সুখের উপায়—মানুষ নানা ভাবে সুখের সাধনা করে। এবিষয়ে শাস্ত্রের অবশ্য একটি সাধারণ নির্দেশ আছে। শাস্ত্র বলেন—যথার্থ সুখের উদ্ভব ধর্ম থেকে। সেইজন্য

১ জিসসে হমারী শারীরিক মানসিক ঔর আধ্যাত্মিক পূর্ণ পরিণতি লাভ হো উসীকা নাম সাধনা হৈ। পূ ত, পৃঃ ৩-৪

২ পুরুষার্থঃ সুখং তচ্চ নৈসর্গিকং কৃত্রিমং চেতি। নৈসর্গিকং মোক্ষরূপম্। কৃত্রিমস্তু তৃতীয়ঃ পুরুষার্থঃ কামঃ ইত্যুচ্যতে।—প ক সূ ১২-এর বৃত্তি।

সকল বর্ণের লোকেরই যত্নসহকারে ধর্মাচরণ করা কর্তব্য।[১] অর্থাৎ শাস্ত্রের অভিমত কৃত্রিম বা নৈসর্গিক যে-কোনো সুখের অভিলাষী ব্যক্তিমাত্রকেই ধর্মপথে চলতে হবে।

ধর্ম সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ আছে। কাজেই এ ক্ষেত্রে লোকের বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা। এইজন্য আচার্যেরা বলেন "ধর্ম কেবলমাত্র শাস্ত্রগম্য অর্থাৎ শাস্ত্রদ্বারাই তাহা নিরূপণীয়, অন্য কোন প্রমাণ দ্বারা তাহার নির্ণয় হইতে পারে না।"[২]

আবার শাস্ত্রেও মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। এইজন্য শাস্ত্রকাররাই বলেছেন যুক্তিযুক্ত বিচার অনুসারে শাস্ত্রের নির্দেশ মানতে হবে। রঘুনন্দনধৃত বৃহস্পতিসংহিতার একটি বচনে স্পষ্টই বলা হয়েছে—যুক্তিহীন বিচারের দ্বারা শাস্ত্র মানিতে গেলে তাতে ধর্মহানি হয়।[৩]

স্থায়ী সুখ—সুখলাভের পথ যাই হোক না কেন একটি বিষয়ে কিন্তু সব মানুষ একমত। সবাই স্থায়ী সুখ চায়। কিন্তু যথার্থ স্থায়ী সুখ কি এবং কেমন করে পেতে হয় তা কম লোকেই জানে। আর যারা জানে তাদের মধ্যেও খুব কম লোকই তার জন্য যথাবিহিত সাধনা করতে পারে।

শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদে আছে—নিষ্ক্রিয় অনেকের যিনি এক এবং স্বতন্ত্র আত্মা, একটি বীজকে যিনি বহুপ্রকার করেন, যে-সব ধীর ব্যক্তি তাঁকে আত্মস্বরূপে দর্শন করেন, তাঁদের শাশ্বত সুখ লাভ হয়, অন্যদের নয়।[৪]

স্থায়ী সুখ সম্বন্ধে ছান্দোগ্য-উপনিষদে বলা হয়েছে—যা ভূমা তাই সুখ, অল্পে সুখ নাই, ভূমাই সুখ।[৫]

ভূমার লক্ষণ এইভাবে নির্দেশ করা হয়েছে—লোকে যাতে অপর কিছু দেখেনা, অপর কিছু শোনে না, অপর কিছু জানে না তাই ভূমা।[৬] অর্থাৎ ভূমায় দ্বৈত নেই, ভূমা ব্রহ্ম, আত্মা।[৭]

কাজেই দেখা গেল স্থায়ী সুখ বলতে বুঝায় ব্রহ্মোপলব্ধি বা আত্মোপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান।[৮] এরই নাম নৈসর্গিক সুখ বা মোক্ষ বা মুক্তি।

১ সুখং বাঞ্ছন্তি সর্বে হি তচ্চ ধর্মসমুদ্ভবম্। তস্মাদ্ধর্মঃ সদা কার্যঃ সর্ববর্ণৈঃ প্রযত্নতঃ।—দক্ষসংহিতা ৩।২৩

২ শ্রীগো ব কে লে, আর্টস লেক্‌চার, ৫ম বর্ষ, পৃঃ ২১৭

৩ কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্মহানিঃ প্রজায়তে।—দ্রঃ ব্যবহারতত্ত্বম্-এর ব্যবহারদর্শনম্

৪ একো বশী নিষ্ক্রিয়াণাং বহূনামেকং বীজং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্।—শ্বে উপ ৬।১২

৫ যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্।—ছা উপ ৭।২৩।১

৬ যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা।—ঐ ৭।২৪।১ ৭ ঐ ৭।২৫।২

৮ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি সম্বন্ধে দ্রঃ মু উপ ৩।২।৮, ৯; শ্বে উপ ১।১০

সাধনার চরম লক্ষ্য—এই পারমার্থিক সুখই চরম এবং পরম সুখ। এ অকৃত্রিম, অপরিণামী, শাশ্বত। বলাই বাহুল্য কঠিন সাধনা ভিন্ন এ সুখ লাভ হয় না। আর উচ্চস্তরের সাধনারও চরম লক্ষ্য এই সুখ বা মোক্ষ বা প্রত্যক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান লাভ করা।

এই মত সনাতনধর্মী সব সম্প্রদায়েই মোটের উপর স্বীকৃত। কেন না সাধারণতঃ সব সম্প্রদায়েরই চরম লক্ষ্য জীবের মোক্ষ বা মুক্তি। অবশ্য এই মোক্ষ বা মুক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে মতপার্থক্য আছে। সার্ষ্টি, সারূপ্য, সালোক্য, সাযুজ্য, নির্বাণ বা কৈবল্য এমনি বিবিধ মুক্তির কথা শাস্ত্রে পাওয়া যায়। আবার প্রেমভক্তিবাদী বৈষ্ণবেরা মুক্তি চান না। কিন্তু পূর্বোক্ত সুখ তাঁরাও চান। তাঁদের সাধনার চরম লক্ষ্য নিত্য ভগবৎপ্রেমরস আস্বাদন, এইটিই তাঁদের শাশ্বত সুখ। 'প্রেমিক গুরু' গ্রন্থে বলা হয়েছে—"শ্রীভগবানের চিন্ময় নিত্যানন্দ ধাম হইতে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর নিত্যরসধারা ঝলকে ঝলকে উৎসারিত হইয়া জগতে আসিতেছে, তাঁহারই অনুভূতিতে জীব সুখান্বেষী হয়।...সে সুখপ্রাপ্তিই জীবের শিক্ষা, দীক্ষা, সাধনা, ভজনা বা উপাসনার চরম উদ্দেশ্য"।[১]

শাক্তশাস্ত্রমতে—শাক্তশাস্ত্রমতে সাধনার চরম লক্ষ্য অদ্বয়ব্রহ্মোপলব্ধি বা অদ্বয়-ব্রহ্মজ্ঞান। একে কৈবল্যমুক্তিও বলা হয়। এটি বড়ই দুরধিগম্য। সাধক যুগযুগান্তরের জন্মজন্মান্তরের সাধনার দ্বারা এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেন।[২]

সাধারণের জন্য সাধনা—এই কঠিন সাধনা সাধারণের অধিগম্য নয়। সেইজন্য শাক্তশাস্ত্রে তাদের জন্য অধিকারিভেদে[৩] নিম্নলক্ষ্যের নানা সাধনার, নানা দেবতার আরাধনার ব্যবস্থা আছে। তবে এই-সব সাধনার দ্বারাও মানুষ ক্রমে উচ্চতর সাধনার অধিকারী হয়ে উঠবে এইটি শাস্ত্রের মর্মগত অভিপ্রায়।

ভুক্তি—উল্লিখিত নৈসর্গিক সুখ বা স্থায়ী পারমার্থিক সুখ সাধারণের সাধ্য নয়, তারা তার অভিলাষীও নয়। সাধারণতঃ তারা চায় কৃত্রিম সুখ বা ভোগমূলক সুখ। তান্ত্রিক পরিভাষায় একে বলে ভুক্তি। আয়ু, আরোগ্য, বল, বীর্য, ধন, জন, মান, জয়, যশ, শত্রুবিনাশ এমন কি পরলোকে স্বর্গবাস প্রভৃতি বহু বস্তু নিয়ে এই সুখ। এটিকে উপেক্ষা করে শুধু পারমার্থিক সুখের সাধনার কথা বললে সে-কথা লোকে মেনে চলতে পারবে না। সেইজন্য শাক্তশাস্ত্রে অর্থাৎ তন্ত্রাদিতে ভোগমূলক সুখ বা ভুক্তিও সাধনার অন্যতম লক্ষ্যরূপে নির্দিষ্ট হয়েছে।

১ প্রেমিক গুরু, ৪র্থ সং, পৃঃ ১০২ ২ P. T., Part II, 2nd Ed., Intro., p. [illegible]

৩ সাধনার ক্ষেত্রে অধিকার অর্থ যোগ্যতা (competency)। দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে গুরু এই অধিকার নির্ধারণ করেন।

ভুক্তিলক্ষ্য সাধনা প্রকৃত সাধনা নয়— তবে এই জাতীয় অনিত্যবস্তুভোগ বা ভুক্তি যে-সাধনার লক্ষ্য অনেকে তাকে প্রকৃত সাধনা বলতেই চান না। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় লিখেছেন—"সাধনার উদ্দেশ্য মৃত্যুর পর স্বর্গে অথবা অন্যান্য ঊর্ধ্বলোকে উত্থিত হইয়া সেখানকার উপভোগ্য ঐশ্বর্য ও আনন্দ সম্ভোগ করা নহে, কারণ ঐ জাতীয় ভোগ পুণ্যকর্মপ্রভাবে জীব বিনা সাধনাতেই প্রাপ্ত হইতে পারে। উহা কৃতকর্মের ফলভোগমাত্র, উহা প্রকৃত সাধনার ফল নহে। যে-সাধনায় জীব মোহনিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া নিজের শিবত্ব অনুভবপূর্বক পূর্ণতত্ত্বের দিকে অগ্রসর হইতে না পারে, তাহা প্রকৃত সাধনা নহে। এইজন্য কুণ্ডলিনীজাগরণ হইতেই প্রকৃত সাধনার সূত্রপাত হয়।"[১]

কুণ্ডলিনী ব্রহ্মময়ী মহাশক্তি। চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁরই। কাজেই জীবমাত্রই তাঁরই রূপবিশেষ।

সাধনার প্রয়োজনীয়তা—কিন্তু সাধনা ভিন্ন জীব তা উপলব্ধি করতে পারে না। সাধনরাজ্যের ভাষায় বলা যায় সাধনা ভিন্ন শক্তি জাগরিত হন না। বহ্নি সর্ববস্তুতে ব্যাপ্ত থাকলেও যেমন দুটি বস্তুর ঘর্ষণ ভিন্ন প্রজ্বলিত হয় না এবং প্রজ্বলিত না হলে যেমন আলোক-দানাদি কোনো কাজে লাগে না তেমনি চিন্ময়ী শক্তি সর্বব্যাপিনী হলেও সাধনা ব্যতীত প্রত্যক্ষ হন না এবং জীবের বাঞ্ছা পূর্ণ করেন না।[২]

সব সাধনাই মূলতঃ শক্তিসাধনা—যিনি যে-বিষয়েই সাধনা করুন না কেন উপযুক্ত শক্তিসঞ্চয় না হলে তিনি সে-বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করতে পারেন না। সমস্ত সিদ্ধিই শক্তি-সাপেক্ষ। কি ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে কি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সর্বত্রই এই সত্যটি পরিলক্ষিত হয়। সেইজন্য শাস্ত্রবিশারদ আচার্যেরা বলেন সব সাধনাই মূলতঃ শক্তিসাধনা। এ সম্পর্কে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় লিখেছেন—যাঁরা বিচারশীল এবং সাধনরাজ্যে প্রবিষ্ট তাঁরাই জানেন সাধনামাত্রই শক্তির আরাধনা। কেন না যে-কোনো মানুষের অন্তর্দৃষ্টির সামনে যে-কোনো আদর্শই লক্ষ্যরূপে থাকুক না কেন তিনি শক্তিসঞ্চয় করতে করতে আপনার দুর্বলতা যদি পরিহার করতে না পারেন তা হলে সম্যগ্‌রূপে উক্ত আদর্শের উপলব্ধি করে তাকে আত্মরূপে পরিণত করতে পারবেন না। সমস্ত সিদ্ধি শক্তিসাপেক্ষ। কাজেই যে-সিদ্ধিই অভীষ্ট হোক না কেন আত্মশক্তির অনুশীলন ব্যতীত সে-সিদ্ধি লাভ তাঁর পক্ষে সম্ভবপর নয়।[৩]

কবিরাজ মহাশয় আরও লিখেছেন—এই ভাবে বিচার করলে বোঝা যায় শিব, বিষ্ণু,

১ শ্রীশ্রীসিদ্ধিমাতাপ্রসঙ্গ, ভূমিকা, পৃঃ ।৵০

২ কর্পূরাদিস্তোত্রম্‌, T. T., Vol. IX, Intro., pp. 18-19 ৩ শক্তিসাধনা, ক শ অ, পৃঃ ৫৫

গণেশ, সূর্য অথবা যে-কোনো দেবতার উপাসনা মূলতঃ শক্তিরই উপাসনা। এইভাবে বৈষ্ণবাদি সব সম্প্রদায়ের সমুদয় সাধনা শক্তিসাধনার অন্তর্গত।[১]

মহামহোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে শুধু সনাতনধর্মীয় সম্প্রদায়গুলি নয়, পৃথিবীতে যত প্রকার ধর্মসম্প্রদায় আছে, জেনে হোক আর না জেনে হোক, সাক্ষাৎভাবে হোক আর পরোক্ষ ভাবেই হোক, সবাই শক্তির আরাধনা করে; শক্তির আরাধনা করা ছাড়া কারুর কোনো কাজ হয় না।[২]

তান্ত্রিক সাধনা—শক্তিসাধনা তান্ত্রিক সাধনা। এ কথার অর্থ কিন্তু এ নয় যে অন্য কোনো সাধনা তান্ত্রিক নয়। যে-সাধনা তন্ত্রসম্মত তাই তান্ত্রিক সাধনা। বৈষ্ণবাদি সম্প্রদায়েরও তন্ত্র আছে। সেই-সব-তন্ত্রসম্মত বৈষ্ণবাদি-সাধনাও তান্ত্রিক সাধনা।

বৈশিষ্ট্য—তান্ত্রিক সাধনার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে এই সাধনার দ্বার সবার জন্য উন্মুক্ত। বেদসম্মত সাধনায় ব্রাহ্মণাদি দ্বিজদেরই অধিকার আছে, শূদ্রদের অধিকার নাই।[৩] কিন্তু তান্ত্রিক সাধনায় জাতিবর্ণনির্বিশেষে সবারই অধিকার আছে। সাধনার চরম লক্ষ্য বেদ ও তন্ত্র উভয়ের ক্ষেত্রেই এক। রুদ্রযামলে বলা হয়েছে—বেদের অনুসরণে যে-স্থানে যাওয়া যায় তন্ত্রের অনুসরণেও সেই স্থানেই যাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সবাই তান্ত্রিক সাধনার অধিকারী।[৪]

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন তান্ত্রিক সাধনায় জাতিবর্ণনির্বিশেষে সবারই সাধারণভাবে অধিকার আছে বটে, তবে বিশেষ সাধনার ক্ষেত্রে সাধকের বিশেষ অধিকারের অত্যাবশ্যকতাও তন্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে। যেমন গন্ধর্বতন্ত্রে উচ্চকোটির তান্ত্রিক সাধনার অধিকারী সম্পর্কে বলা হয়েছে—আস্তিক, শুচি, দান্ত, দ্বৈতহীন, জিতেন্দ্রিয়, ব্রহ্মিষ্ঠ, ব্রহ্মবাদী, ব্রহ্মী, ব্রহ্মপরায়ণ, সর্বহিংসামুক্ত, সর্বপ্রাণীর হিতে রত ব্যক্তিই তন্ত্রশাস্ত্রে তথা এই শাস্ত্রনির্দিষ্ট, উচ্চ সাধনায় অধিকারী; এ ছাড়া অন্য ব্যক্তি ভ্রমসাধক।[৫]

১ ইস প্রকারসে বৈষ্ণবাদি সমস্ত সম্প্রদায়োঁ কী সারী সাধনাএঁ শক্তিসাধনাকে অন্তর্গত হৈঁ।—ক প ম, পৃঃ ৫৫

২ ঐ, পৃঃ ৫৬

৩ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণোক্তধর্মযোগ্যাস্তু নেতরে।—দ্রঃ ব্র সূ ১।৩।৩৮-এর শক্তিভাষ্য।

৪ যদ্বেদৈর্গম্যতে স্থানং তত্তন্ত্রৈরপি গম্যতে।
ব্রহ্মক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রাস্তেন সর্বেঽধিকারিণঃ।—দ্রঃ সৌ ভা, ল ম, পৃঃ ৮৫

৫ আস্তিকোঽথ শুচির্দান্তো দ্বৈতহীনো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ব্রহ্মিষ্ঠো ব্রহ্মবাদী চ ব্রহ্মী ব্রহ্মপরায়ণঃ।
সর্বহিংসাবিনির্মুক্তঃ সর্বপ্রাণিহিতে রতঃ।
সোঽস্মিন্ শাস্ত্রেঽধিকারী স্যাৎ অন্যো ভ্রমসাধকঃ।—গ ত ৪।১৮-১৯

ভুক্তিমুক্তি—তান্ত্রিক সাধনার আরেকটি বৈশিষ্ট্য এ সাধনায় ভুক্তিমুক্তি উভয়ই লাভ হয়। মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে[১]—মুক্তির জন্য এবং ইহলোকে ও পরলোকে সুখপ্রাপ্তির জন্য তন্ত্রোক্ত পথের মতো এমন পথ আর নেই। এই পথে সুখ অর্থাৎ কৃত্রিম সুখ বা ভোগ এবং মোক্ষ দুইই মিলে।

সময়াচারতন্ত্রে আছে অন্য দেবতার সাধকদের কদাচিৎ কারো মুক্তিলাভ, কারো বা ভুক্তিলাভ হয় কিন্তু দেবীর সাধকের ভুক্তিমুক্তি করতলস্থ।[২]

এই কথাটাই যামলে কিঞ্চিৎ বিশদভাবে বলা হয়েছে—যেখানে ভোগ সেখানে মোক্ষ নাই, যেখানে মোক্ষ সেখানে ভোগ নাই। শিবাপদাম্ভোজযুগলের অর্চনাকারীদের ভোগ ও মোক্ষ উভয়ই করতলগত।[৩]

প্রবৃত্তিনিবৃত্তি—তান্ত্রিক সাধনা প্রবৃত্তি নিবৃত্তি উভয় মার্গেই বিহিত। সাধারণ ভোগাসক্ত মানুষ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। তাদের প্রথমেই প্রবৃত্তির নিগ্রহ করে নিবৃত্তি-মার্গের অনুসরণ করতে বললে তা তারা করতে পারে না। সেইজন্য তন্ত্রশাস্ত্রে প্রবৃত্তির পথেই সাধনার ব্যবস্থা হয়েছে। এই সাধনার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষও ক্রমে ক্রমে নিবৃত্তিমার্গের সাধনার অধিকারী হয়ে উঠে।

মূলতঃ নিবৃত্তিমার্গের সাধনা—ব্রহ্মলক্ষ্য সাধনামাত্রই মূলতঃ নিবৃত্তিমার্গের সাধনা। কাজেই তান্ত্রিক সাধনাও মূলতঃ নিবৃত্তিমার্গের সাধনা। কেন না প্রকৃত তান্ত্রিক সাধনার লক্ষ্যও ব্রহ্মময়ী বা ব্রহ্ম। তবে এ নিবৃত্তি নিগ্রহমূলক নয়। মানুষের প্রকৃতিকে নিপীড়িত করলে নিবৃত্তি আসে না এই মনোবৈজ্ঞানিক সত্যটি এ সাধনায় স্বীকৃত। অবশ্য প্রকৃতির নিগ্রহ যে ব্যর্থ তন্ত্র ভিন্ন অন্য শাস্ত্রেও তা স্বীকার করা হয়েছে। যেমন শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় বলা হয়েছে—জ্ঞানী ব্যক্তিও আপন প্রকৃতির অনুরূপ কাজ করেন, প্রাণীরা আপন প্রকৃতির অনুসরণ করে; এক্ষেত্রে নিগ্রহ কি করবে?[৪]

এই-সব বিবেচনা করেই তন্ত্রশাস্ত্রে মানুষের প্রকৃতির অনুকূল সাধনা বিহিত হয়েছে। ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে নয়, দেবীমুখে সব দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়ে এ সাধনা।

১ নাতঃ পন্থা মুক্তিহেতুরিহামুত্র সুখাপ্তয়ে।
যথা তন্ত্রোদিতো মার্গো মোক্ষায় চ সুখায় চ।—মহা ত ২।২০

২ কদাচিৎ কস্য মুক্তিঃ স্যাৎ কস্যচিদ্ ভুক্তিরেব চ।
এতস্যাঃ সাধকস্যাথ ভুক্তিমুক্তিঃ করে স্থিতা।—স: শা ত, উ: ৩

৩ যত্রাস্তি ভোগো ন চ তত্র মোক্ষ যত্রাস্তি মোক্ষো ন চ তত্র ভোগঃ।
শিবাপদাম্ভোজযুগার্চকানাং ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থ এব।—যামলবচন, দ্রঃ ঐ

৪ সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি।—গীতা ৩।৩৩

স্বল্পকালে সিদ্ধি—তান্ত্রিক সাধনার অপর একটি বৈশিষ্ট্য এ সাধনায় স্বল্পকালে সিদ্ধি-লাভ হয়। গন্ধর্বতন্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—ভোগী সাধক দম্ভ, মোহ, নিদ্রা, আলস্য, বাহ্যচিন্তা, কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, মাৎসর্য বর্জন করে বিশেষ যত্ন সহকারে বিদ্যার (অর্থাৎ শক্তিমন্ত্রের) অভ্যাস করবে। এ রকম করলে বহুকোটিজন্মোদ্ভূত দুর্বাসনা ত্যাগ করে এক জন্মেই মুক্তিলাভ করবে।[১]

কুলার্ণবতন্ত্রের মতে সমস্ত ধর্ম অনুসারেই দীর্ঘকালের সাধনার দ্বারা মোক্ষলাভ হয় কিন্তু কৌলমার্গের সাধনায় সদ্যই মোক্ষলাভ হয়।[২]

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য—তান্ত্রিক সাধনা মানবজীবনের সর্বাঙ্গীন সার্থকতা বিধান করে। এই সাধনায় শরীর শক্তসমর্থ, শীতাতপসহিষ্ণু এবং রোগপ্রতিরোধসমর্থ হয়। এতে মানুষকে কষ্টসহিষ্ণু ও ধৈর্যশীল করে তোলে। নিয়মিতভাবে ইচ্ছাসংযমের অভ্যাসের জন্য সাধক দৃঢ়সঙ্কল্প ও নির্ভীক হন। দেহ মনের এই-সব গুণের জন্য তিনি যে শুধু পারমার্থিক সিদ্ধি-লাভের উপযোগী হয়ে উঠেন তা নয়, সমাজেরও বিশেষ কল্যাণকারী হন। এ রকম সাধকের পক্ষে পরোপকার ব্রত। কাজেই তিনি শুধু নিজের স্বার্থ বা পরমার্থ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন না।[৩]

প্রকারভেদ ও স্তরভেদ—সমাজের সর্বনিম্ন স্তরের অজ্ঞ মানুষ থেকে আরম্ভ করে উচ্চতম স্তরের মহাপণ্ডিত পর্যন্ত সকল শ্রেণীর সকল মানুষের উপযোগী সাধনা তন্ত্রশাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে। এইজন্য যক্ষকন্যাসাধনা, রসপারদসাধনা, বৃদ্ধের তরুণ হওয়ার সাধনা প্রভৃতি থেকে আরম্ভ করে অদ্বৈতব্রহ্মসাধনা পর্যন্ত বহু বিচিত্র সাধনার কথা তন্ত্রশাস্ত্রে পাওয়া যায়।[৪] সাধকের অধিকার অনুসারে নানা স্তরভেদও নির্দিষ্ট হয়েছে।

উচ্চাধিকারীর সাধনা— নিম্নাধিকারীর নিম্নলক্ষ্য সাধনা অপেক্ষাকৃত সহজ কিন্তু উচ্চাধিকারীর ব্রহ্মলক্ষ্য সাধনা অত্যন্ত কঠিন। ব্রহ্মময়ীর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে হলে জীবকে শিব হতে হয়। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় বলেন—পাশজালমুক্ত হয়ে জীব যতক্ষণ শিবরূপে প্রকাশিত না হয়েছে ততক্ষণ তার পক্ষে পূর্ণস্বরূপা মহাশক্তির যথার্থ সন্ধান পাওয়া খুবই কঠিন। শিবভাব প্রাপ্ত হলেও শবরূপে পরিণত হয়ে শবাসন পরিগ্রহ না করতে পারলে নিজের মধ্যে মহাশক্তির উন্মেষ প্রাপ্ত হতে পারে না।[৫]

১ দম্ভং মোহং তথা নিদ্রামালস্যং বাহ্যচিন্তনম্। কামং ক্রোধং তথা লোভং হিংসাং মাৎসর্যমেব চ॥
বর্জয়িত্বা প্রযত্নেন বিদ্যামেব সমভ্যসেৎ। দুর্বাসনাং পরিত্যজ্য কোটিজন্মসমুদ্ভবাম্।
একেন জন্মনা মুক্তিং যাতি ভোগী ন সংশয়ঃ।—গ ত ২২।৮৯-৯১

২ ধর্মেষু সর্বেষু চিরাভ্যাসেন মানবাঃ।
মোক্ষং লভন্তে কৌলে তু সদ্য এব ন সংশয়ঃ।—কু ত, ২য় উল্লাস,

৩ P. T., Part II, 2nd Ed.. p. 688 ৪ দ্রঃ রুদ্রযামল, উত্তরতন্ত্র, ১ম পটল

৫ শক্তিসাধনা, ক প অ, পৃঃ ৬০

শিব হতে গেলে শিবকে জানতে হবে। কবিরাজ মহাশয় লিখেছেন "আমাদের দেশে একটি কথা আছে যে 'জানিতে পারিলে তবে হইতে পারা যায়।' 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি' ঠিক ঠিক ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে অর্থাৎ ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে নিজেই ব্রহ্মরূপে প্রকাশমান হইতে পারা যায়। তদ্রূপ কোনো দেবতাকে সত্যভাবে জানিতে পারিলে নিজেই সেই দেবভাবে স্থিতিলাভ করা যায়।"[১]

শক্তিসাধনা জ্ঞানমূলক— এখানে তান্ত্রিক সাধনার আরেকটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। এ সাধনা জ্ঞানমূলক। শক্তিজ্ঞান না হলে শক্তিসাধনা সম্ভবপর হয় না। শক্তিসাধককে প্রথমে শক্তি সম্বন্ধে অপরোক্ষ শাস্ত্রীয় জ্ঞান লাভ করতে হবে। কেন না তন্ত্রের বিধান—জ্ঞানের দ্বারাই পশুভাবের, বীরভাবের ও দিব্যভাবের সাধনা হতে পারে। এইজন্যই তন্ত্রসাধনায় জ্ঞানের এত গৌরব।[২]

সাধনার দ্বারা পরোক্ষ শক্তিজ্ঞান যখন অপরোক্ষ হয়ে উঠে তখনই সাধকের মুক্তিলাভ হয়। কত জন্মজন্মান্তরের পরে জীবের এই শক্তিজ্ঞান হয়। নিরুত্তরতন্ত্রে শিব বলছেন—কত জন্মের পর শক্তিজ্ঞান জন্মে। দেবি! শক্তিজ্ঞান বিনা নির্বাণ লাভ হয় না।[৩]

অদ্বৈতব্রহ্মসাধনা— শক্তিজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান। শক্তি ব্রহ্ম। কাজেই শক্তিসাধনা ব্রহ্মসাধনা। এ সাধনা অদ্বৈতব্রহ্মসাধনা। সাধনার প্রথম অবস্থায় দ্বৈত থাকে, চরম অবস্থায় অদ্বৈত। সেই অবস্থায় সাধক 'অন্যাত্মব্যতিরেকেণ দ্বিতীয়ং ন বিপশ্যতি' আত্মা অর্থাৎ ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় আর কিছু দেখেন না।[৪]

তবে সাধনার প্রথমাবস্থা থেকেই উচ্চাধিকারী শক্তিসাধককে অদ্বৈতভাবনা করতে হয়। কৌল সাধক সম্পর্কে কৌলাবলীনির্ণয়ে বিধান দেওয়া হয়েছে—আমি দেবী, অন্য কেউ নয়, আমি ব্রহ্মই, শোকভাজন নই, আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ, এইভাবে সাধক আত্মভাবনা করবেন।[৫]

শক্তিসাধনার অনুষ্ঠানাদিও অদ্বৈততত্ত্বের ক্রিয়ারূপ বলা যায়। সেইজন্য সাধনমর্মজ্ঞ ব্যক্তিদের মতে অদ্বৈত বেদান্তের তত্ত্ব অধিগত না হলে শক্তিসাধনায় অধিকারই হয় না।[৬]

১ দেহের সাধনা হিমাদ্রি, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১

২ জ্ঞানেন বীরকর্মা চ জ্ঞানেন পশুভাবনম্। জ্ঞানেন দিব্যভাবী চ তস্মাৎ জ্ঞানং বিশিষ্যতে।
—নিগমকল্পদ্রুমবচন, দ্র. প্রা তো. কাণ্ড ৬, পরিঃ ৪, ব সং পৃঃ ৪৪৭

৩ বহুনাং জন্মনামন্তে শক্তিজ্ঞানং প্রজায়তে।
শক্তিজ্ঞানং বিনা দেবি নির্বাণং নৈব জায়তে।—নিরু ত, পঃ ২

৪ যোগীতন্ত্র, ষষ্ঠ সং, পৃঃ ১০৩

৫ অহং দেবী ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহমিত্যাত্মানং বিভাবয়েৎ। —কৌ নি, উঃ ১

৬ Ś. Ś., 4th Ed., p 99

শাস্ত্রেও এই অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। দেবীভাগবতে দেবী বলেছেন—সাধক নিত্য অতন্দ্রিত হয়ে বেদান্ত শ্রবণ করবে। নিত্য তত্ত্বমসি ইত্যাদি বাক্যের অর্থ বিচার করবে। তত্ত্বমসি ইত্যাদি বাক্য জীবব্রহ্মের ঐক্যবোধক। এই ঐক্যবোধ হলে নির্ভয় সাধক মদ্রূপ হয়ে যাবে।[১]

গন্ধর্বতন্ত্রে বিধান দেওয়া হয়েছে— সর্বভূতের চৈতন্যস্বরূপ যে-ব্রহ্ম আমিই সেই ঈশ্বর, সাধক এইরূপ ভাবনা করবে। সোঽহম্—আমিই সেই ব্রহ্ম সর্বদা এইরূপ চিন্তার ফলে সাধক দেবরূপ লাভ করে।[২]

অনুষ্ঠানাদি-সম্পর্কে জ্ঞান—এত গেল সাধারণভাবে জ্ঞানের কথা। শক্তিসাধনায় সাধনার অনুষ্ঠানাদি-সম্পর্কেও জ্ঞান অত্যাবশ্যক। কুলার্ণবতন্ত্রে শিব বলেছেন—শাম্ভবি! যারা দেবতার স্বরূপ, যন্ত্রের তত্ত্ব এবং মন্ত্রের ব্যাপ্তি জানে না তাদের কৃত অর্চনাদি সব ব্যর্থ হয়।[৩]

কর্ম ও ভক্তি—শক্তিসাধনা জ্ঞানমূলক হলেও এতে কর্ম এবং ভক্তির স্থানও সমান গুরুত্বপূর্ণ।[৪] অবশ্য কোনো কোনো তন্ত্রে কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের মধ্যে একটা ক্রমোচ্চতা স্বীকার করা হয়েছে। যেমন যোগিনীতন্ত্রের মতে কর্মের দ্বারা ভক্তি, ভক্তির দ্বারা জ্ঞান এবং জ্ঞানের দ্বারা মুক্তিলাভ হয়।[৫] তবে সাধারণভাবে বলা যায় এই সাধনায় জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয় হয়েছে। এ সাধনা একাধারে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ।[৬]

ব—তান্ত্রিক সাধনায় তথা শক্তিসাধনায় দেহের গৌরব বিশেষভাবে স্বীকৃত। এটি এই সাধনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিশ্বসারতন্ত্রে বলা হয়েছে—সমস্ত দেহের মধ্যে মনুষ্যদেহ দুর্লভ। আর সেইজন্যই মনুষ্যজন্মকে সুদুর্লভ বলা হয়।[৭]

১ বেদান্তশ্রবণং কুর্যান্নিত্যমেবমতন্দ্রিতঃ। তত্ত্বমস্যাদিবাক্যস্য নিত্যমর্থং বিচারয়েৎ।
তত্ত্বমস্যাদি বাক্যস্য জীবব্রহ্মৈক্যবোধকম্।
ঐক্যে জাতে নির্ভয়স্তু মদ্রূপো হি প্রজায়তে।—দে ভা ৭।৩৪।১৮-১৯

২ চৈতন্যং সর্বভূতানাং যদ্ ব্রহ্ম সোঽহমীশ্বরঃ।
সোঽহমিত্যস্য সততং চিন্তনাদ্ দেবরূপতা।—গ ত ১০।৩-৪

৩ দেবক যন্ত্ররূপঞ্চ মন্ত্রব্যাপ্তিমজানতাম্। কৃতার্চনাদিকং সর্বং ব্যর্থং ভবতি শাম্ভবি।—কু ত, উঃ ৩

৪ ভক্ত্যা চ ক্রিয়য়া চণ্ডি পূজয়েদ্ যস্তু কালিকাম্।
জীবঃ শিবত্বং লভতে সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ।—মুণ্ডমালাতন্ত্রবচন, প্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৩, পরিঃ ৪,
ব সং পৃঃ ৪৪০

৫ কর্মণা লভতে ভক্তিং ভক্ত্যা জ্ঞানমুপালভেৎ। জ্ঞানামুক্তির্মহাদেবি সত্যং সত্যং বদাম্যহম্।—যো ত, পঃ ১৩

৬ Mahāmāyā, p. 255

৭ দুর্লভো মানুষো দেহঃ সর্বদেহেষু সর্বদা। তস্মাচ্চ মানুষং জন্ম একমেবং সুদুর্লভম্।
—প্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ১, পরিঃ ৩, ব সং পৃঃ ২৫

মনুষ্যজন্ম ছাড়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না আর তত্ত্বজ্ঞান ছাড়া মোক্ষ মিলে না। পূর্বেই বলা হয়েছে সনাতনধর্মী শাস্ত্র অনুসারে মানবজীবনের লক্ষ্য ধর্ম-অর্থ-কাম- ও মোক্ষ-লাভ বা পুরুষার্থ-লাভ। মোক্ষ চরম পুরুষার্থ।

তন্ত্রশাস্ত্রের অভিমত—শরীরই মানুষের পুরুষার্থ লাভের একমাত্র সাধন।[১] শরীরই যদি না থাকে তা হলে কি দিয়ে পুরুষার্থ লাভ হবে? সেইজন্য কুলার্ণবতন্ত্রে বলা হয়েছে—দেহ ছাড়া কারো পুরুষার্থ থাকতে পারে না। কাজেই দেহধন রক্ষা করে মানুষের পুণ্যকর্ম করা উচিত। গ্রাম, ভূমি, বিত্ত, গৃহ, শুভাশুভ কর্ম এ-সব একবার নষ্ট হলে আবার হয় কিন্তু শরীর গেলে আর সেই শরীর হয় না। সেইজন্য মানুষ সর্বদা শরীররক্ষার জন্য যত্ন করে।[২]

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় শুধু তন্ত্রে নয় উপনিষদাদিতেও দেহের গৌরব ঘোষিত হয়েছে। ছান্দোগ্য-উপনিষদে দেহকে বলা হয়েছে ব্রহ্মপুর।[৩] মৈত্রেয়ী-উপনিষদে বলা হয়েছে[৪]—দেহ দেবালয়, জীব শিব।

ঠিক এই কথাটি কুলার্ণবতন্ত্রেও পাওয়া যায়।[৫] কৌলাবলীনির্ণয়ে দেহকে সর্বদেবময় বলা হয়েছে।[৬] তন্ত্রসারের মতে[৭] দেহে আছেন প্রকৃতি, পুরুষ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব। আছে নদী, সমুদ্র, চতুর্দশ ভুবন। ব্রহ্মাণ্ডে যে-সব গুণ আছে সে-সবই আছে দেহে। অর্থাৎ দেহ একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড।[৮]

মানবদেহ বিরাট্ বিচিত্র শক্তির আধার। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন তান্ত্রিক সাধনার অন্যতম লক্ষ্য এই-সব শক্তিকে পূর্ণবিকশিত করা।[৯]

১ শরীরং তু মনুষ্যাণাং পুরুষার্থৈকসাধনম্। —শ ত ৩৪।১৫

২ বিনা দেহেন কস্যাপি পুরুষার্থো ন বিদ্যতে। তস্মাদ্দেহধনং রক্ষ্যং পুণ্যকর্মাণি সাধয়েৎ।

... ...

পুনর্গ্রামাঃ পুনঃ ক্ষেত্রং পুনর্বিত্তং পুন গৃহম্। পুনঃ শুভাশুভং কর্ম ন শরীরং পুনঃ পুনঃ।

শরীররক্ষণায়াসঃ ক্রিয়তে সর্বদা জনৈঃ।—কু ত, উঃ ১ ৩ ছা উপ ৮।১।১

৪ দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ।

ত্যজেদজ্ঞাননির্মাল্যং সোঽহংভাবেন পূজয়েৎ।—মৈ উপ ২।১

৫ দেহো দেবালয়ো দেবি জীবো দেবঃ সদাশিবঃ।

ত্যজেদজ্ঞাননির্মাল্যং সোঽহংভাবেন পূজয়েৎ।—কু ত, উঃ ৯

৬ সর্বদেবময়ং দেহং সর্বদেবময়ীং তনুম্। আত্মানং দেবতারূপং অশ্রেষং পরিচিন্তয়েৎ।—কৌ নি ১০।১০৬-১০৭

৭ প্রকৃতিঃ পুরুষো দেহে ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ শিবস্তথা। সপ্তৈব সমুদ্রাশ্চ ভুবনানি চতুর্দশ।

ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে।—ত্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ১, পরিঃ ৫, ব সং পৃঃ ৩৯

৮ এ সম্বন্ধে ভুবন-প্রসঙ্গে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

৯ S. P., 2nd Ed., pp. 50-51

দেহকে ক্লিষ্টকরা নিষিদ্ধ—সাধারণভাবে বলা যায় তান্ত্রিক সাধনায় দেহকে ক্লিষ্ট করা নিষিদ্ধ। কুলার্ণবতন্ত্রে শিব বলছেন—দেবি! তোমার মায়ামুগ্ধ মূঢ়েরা একাহার, উপবাসাদি নিয়মের দ্বারা কায়শোষণ করে পরোক্ষ অর্থাৎ ব্রহ্ম লাভ করতে চায়। যারা বিবেকহীন, কেবলমাত্র দেহকে পীড়ন করলে, তাদের সিদ্ধিলাভ হবে কি করে? বল্মীকে আঘাত করলে কি মহাসর্প মরে?[১]

সাধনায় অত্যাবশ্যক তিনটি—সাধক, সাধ্য আর সাধনোপায়। প্রকৃতপ্রস্তাবে এই তিনে মিলেই সাধনা। অতএব পর পর এই তিনের আলোচনা করা যাচ্ছে।

সাধক—

সংজ্ঞা—যিনি কোনো বিষয়ে সাধনা করেন তিনিই সাধক। তবে শাস্ত্রে সাধারণতঃ সাধক কথাটি আধ্যাত্মিক সাধনায় রত ব্যক্তি সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হয়। অবশ্য তন্ত্রে ভূত-পিশাচাদি সাধনার কথাও আছে এবং এ রকম সাধনা যারা করে তাদেরও সাধক বলতে হয়। তবে এরা সাধক বিশেষ অর্থে।

দুর্লভ মানবজন্ম—আধ্যাত্মিক সাধনার চরম লক্ষ্য তত্ত্বজ্ঞান বা অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান বা মোক্ষ। এ শুধু মানুষই লাভ করতে পারে।[২] বিশ্বসারতন্ত্রে তাই বলা হয়েছে—মনুষ্যজন্মের মতো জন্ম আর নাই। দেবতা, পিতৃগণ সবাই মানুষজন্ম কামনা করেন।[৩] শাস্ত্রের অভিমত হাজার হাজার জীবের হাজার হাজার জন্মের পর কোনো জীব পুণ্যবশে কদাচিৎ মনুষ্যজন্ম লাভ করে। মোক্ষের সোপানস্বরূপ এই মানবজন্ম একান্ত দুর্লভ। কুলার্ণবতন্ত্র প্রশ্ন করেছেন এমন মানবজীবন লাভ করেও যে আপনাকে ত্রাণ করে না অর্থাৎ আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে না তার মত পাপী কে আছে?[৪]

মুমুক্ষু বিরল—কুলার্ণবতন্ত্র পাপীই বলুন আর যাই বলুন সাধারণ মানুষ আত্মত্রাণের জন্য ব্যস্ত হয় না, আত্মজ্ঞানের জন্য তাদের কোনো মাথাব্যথা নাই, থাকতেও পারে না। শাস্ত্র ও এ সম্বন্ধে অবহিত। তাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ বলছেন—হাজার হাজার

১ একভক্তোপবাসাদ্যৈর্নিয়মৈঃ কায়শোষণৈঃ। মূঢ়াঃ পরোক্ষমিচ্ছন্তি তব মায়াবিমোহিতাঃ।
দেহদণ্ডনমাত্রেণ কা সিদ্ধিরবিবেকিনাম্। বল্মীকতাড়নাদেবি মৃতঃ কোঽত্র মহোরগঃ।—কু. ত., উঃ ১

২ ন মানুষং বিনান্যত্র তত্ত্বজ্ঞানন্তু লভ্যতে।—ঐ

৩ মনুষ্যসদৃশং জন্ম কুত্রাপি নৈব বিদ্যতে। দেবতাঃ পিতরঃ সর্বে বাঞ্ছন্তি জন্ম মানুষম্।
বৃঃ প্রা তো. কাণ্ড ১, পরিঃ ৩, ব সং, পৃঃ ২৫

৪ অত্র জন্মসহস্রেষু সহস্রৈরপি পার্বতি। কদাচিল্লভতে জন্তুর্মানুষ্যং পুণ্যসঞ্চয়াৎ।
সোপানভূতং মোক্ষস্য মানুষ্যং প্রাপ্য দুর্লভম্। যস্তারয়তি নাত্মানং তস্মাৎ পাপতরোঽত্র কঃ।
—কু. ত., উঃ ১

মানুষের মধ্যে কদাচিৎ কেউ সিদ্ধির জন্য অর্থাৎ আত্মজ্ঞানলাভের জন্য চেষ্টা করে। যারা এ রকম চেষ্টা করে তাদের মধ্যেও কদাচিৎ কেউ আমাকে তত্ত্বতঃ জানতে পারে।[১]

সাধকের প্রকারভেদ—সাধারণ মানুষ ভোগসুখ চায়, দুঃখ বিপদ এড়াতে চায়। আর সেইজন্য তাদের কেউ কেউ কোনো না কোনো দেবতার আরাধনাও করে। তন্ত্রশাস্ত্রে এদের জন্যও সাধনার ব্যবস্থা আছে। কাজেই এরাও সাধক, প্রবৃত্তিমার্গের সাধক। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় এদেরই আর্ত এবং অর্থার্থী বলা হয়েছে।[২]

সাত্ত্বিকাদি ভেদ— দেহান্তঃকরণবিশিষ্ট জীবমাত্রই প্রকৃত্যাত্মক আর প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা। কাজেই সব জীবই ত্রিগুণাত্মক।[৩] এই কারণে গুণের প্রাধান্য অনুসারে সব মানুষকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়—সাত্ত্বিক, রাজসিক আর তামসিক। সাত্ত্বিক অর্থ যাঁদের মধ্যে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য, রজঃ ও তমোগুণ অভিভূত। রাজসিক অর্থ যাঁদের মধ্যে রজোগুণের প্রাধান্য, সত্ত্ব এবং তমোগুণ অভিভূত। আর তামসিক অর্থ যাঁদের মধ্যে তমোগুণের প্রাধান্য, রজঃ এবং সত্ত্বগুণ অভিভূত।[৪]

কাজেই সাধকদেরও সাধারণভাবে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। পূর্বোক্ত সাধারণ মানুষ মোটের উপর তামসিক ও রাজসিক শ্রেণীভুক্ত। রাজসিক সাধকেরাও প্রবৃত্তিমার্গের সাধক।[৫] একমাত্র সাত্ত্বিক সাধকেরাই নিবৃত্তিমার্গের সাধক।

অধমাদি ভেদ—আবার অধম, মধ্যম এবং উত্তম ভেদেও সাধকের শ্রেণী-বিভাগ করা হয়। এঁদেরই অশুদ্ধ, মিশ্র ও শুদ্ধ এবং সকল, প্রলয়াকল ও বিজ্ঞানাকল বলা হয়।[৬]

গৃহস্থাদি ভেদ—আবার অন্য বিচারে সাধকদের গৃহস্থ, গৃহাবধূত এবং কুলাবধূত এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।[৭]

গৃহস্থ—সাধারণ মানুষ গৃহস্থ সাধক। অবশ্য গৃহস্থ সাধকদের মধ্যেও সাধনার দিক্ দিয়ে উচ্চনিম্ন-স্তরভেদ আছে। নিম্নস্তরের গৃহস্থ সাধক রাগ দ্বেষ বাসনা কামনার বশীভূত। এঁর দেবারাধনা, যোগচর্চা প্রভৃতি সব কিছুরই লক্ষ্য ভুক্তি ; পরম অদ্বয়তত্ত্বের ধারণা এঁর নেই। এঁর কাছে আরাধ্য আরাধক, জগৎ জগদীশ্বরী সব ভিন্ন। কাজেই এঁকে দ্বৈতবাদী বলতে হয়।[৮]

১ মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে। যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।—গীতা ৭।৩

২ ঐ ৭।১৬ ৩ S. S., 4th Ed., p. 529

৪ সাধকাস্ত্রিবিধাঃ প্রোক্তাঃ সাত্ত্বিকা রাজসাস্তথা।
তামসাশ্চ তথা দেবি ভেদাং বক্ষ্যামি লক্ষণম্।
—মৎস্যসূক্তবচন, তঃ প্রা তো, কাণ্ড ৪, পরিঃ ৬, ব সং, পৃঃ ২৮৪

৫ বামা ক্ষেপা, পৃঃ ১৬২ ৬ ম হ ২।৭৭ এবং টীকা

৭ P. T., Part II, 2nd Ed., pp. 688-689 ৮ Ibid., p 688

তান্ত্রিক সাধনা প্রধানতঃ গৃহস্থের সাধনা। শুধু গৃহস্থ নয় সভার্য গৃহস্থের সাধনা। মৎস্যসূক্তে বলা হয়েছে অদার ব্যক্তির গতি নাই, তার সমস্ত ক্রিয়া নিষ্ফল। ভার্যাহীন ব্যক্তি দেবতার্চনা-মহাযজ্ঞ করবে না। একচক্র রথ বা একপক্ষ পাখীর মতো ভার্যাহীন মানুষ সমস্ত কর্মের অযোগ্য।[১]

আদর্শ গৃহস্থ—তন্ত্রশাস্ত্রে গৃহস্থের একটি উন্নত আদর্শ নির্দিষ্ট হয়েছে। এমনি আদর্শ গৃহস্থ যে-কোনো দেশে শ্রেষ্ঠ নাগরিক এবং দেশের গৌরবস্থল বলে গণ্য হতে পারেন। মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে—গৃহস্থ ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণ হবেন। তিনি যে যে কাজ করবেন সবই ব্রহ্মে সমর্পণ করবেন। মিথ্যা কথা বলবেন না, শঠতা করবেন না। দেবপূজা ও অথিতিসেবা করবেন। মাতাপিতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা মনে করে গৃহস্থ সর্বপ্রযত্নে তাঁদের সেবা করবেন। বিদ্যা ও ধনের অহংকারে মত্ত হয়ে যে মাতাপিতাকে অবহেলা করে সর্বধর্মবহিষ্কৃত সেই ব্যক্তি ঘোর নরকে যায়। মাতা, পিতা, পুত্র, স্ত্রী, অতিথি ভাই এদের বাদ দিয়ে গৃহস্থ প্রাণ কণ্ঠাগত হলেও ভোজন করবেন না। গৃহস্থ শতকষ্ট সহ্য করেও এদের এবং আত্মীয়স্বজনদের যথাশক্তি প্রীতিসাধন করবেন। এইটি সনাতন ধর্ম।[২]

স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে তন্ত্রশাস্ত্রে গৃহস্থকে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গৃহস্থ কখনো ভার্যাকে তাড়না করবেন না, তাকে মায়ের মতো করে পালন করবেন। ঘোর কষ্টে পড়লেও পতিব্রতা সাধ্বী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করবেন না। নিজের স্ত্রী থাকতে বিকারগ্রস্ত মন নিয়ে অন্য স্ত্রীলোককে স্পর্শ করবেন না, করলে নরকে যাবেন।[৩]

তন্ত্রের বিধান এ-সব ক্ষেত্রে বাস্তবানুগ এবং মনস্তত্ত্বসম্মত। পরস্ত্রী সম্বন্ধে এমনি বিবিধ সতর্কতামূলক উপদেশ মহানির্বাণাদি তন্ত্রে বিবৃত হয়েছে।

---

১ অদারস্য গতির্নাস্তি সর্বাস্তস্যাফলাঃ ক্রিয়াঃ। সুরার্চনং মহাযজ্ঞং হীনভার্যো বিবর্জয়েৎ।
একচক্ররথো যদ্বদেকপক্ষো যথা খগঃ। অভার্যোঽপি নরস্তদ্বদযোগ্যঃ সর্বকর্মসু।
—ভঃ প্রা তো, কাণ্ড ২, পরিঃ ১, সং, পৃঃ ৮৪

২ ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণঃ যদ্ যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।
ন মিথ্যাভাষণং কুর্যাৎ ন চ শাঠ্যং সমাচরেৎ। দেবতাতিথিপূজাসু গৃহস্থো নিরতো ভবেৎ।
মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাম্। মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্বপ্রযত্নতঃ।
বিদ্যাধনমদোন্মত্তো যঃ কুর্যাৎ পিতৃহেলনম্। স যাতি নরকং ঘোরং সর্বধর্মবহিষ্কৃতঃ।
মাতরং পিতরং পুত্রং দারানতিথিসোদরান্। হিত্বা গৃহী ন ভুঞ্জীয়াৎ প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপিঃ।
এষামর্থে মহেশানি কৃত্বা কষ্টশতান্যপি। প্রীণয়েৎ সততং শক্ত্যা ধর্মো হ্যেষ সনাতনঃ।
—মহা ত ৮।২৩-২৫, ৩২-৩৩, ৩৭

৩ ন ভার্যাং তাড়য়েৎ ক্বাপি মাতৃবৎ পালয়েৎ সদা। ন ত্যজেৎ ঘোরকষ্টেঽপি যদি সাধ্বী পতিব্রতা।
স্থিতেষু স্বীয়দারেষু স্ত্রিয়মন্যাং ন সংস্পৃশেৎ। দুষ্টেন চেতসা বিদ্বানন্যথা নারকী ভবেৎ।—মহা ত ৮।৩৯-৪০

তন্ত্রশাস্ত্রে সাধকের ভার্যাকে বিশেষ গৌরবের স্থান দেওয়া হয়েছে। নির্বাণতন্ত্রে আছে—নিজের কান্তা সর্বদা পূজ্যা, নিজকান্তাই দেবতা।[১]

সাধারণতঃ লোকে কন্যার চেয়ে পুত্রকে বেশী যত্ন করে লালনপালন করে। কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রের বিধান গৃহস্থ যেমন যত্ন করে পুত্রের লালনপালন ও শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করবেন কন্যারও তেমনি করবেন।[২]

গৃহস্থ শুধু যে নিজের পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা, ভগ্নী, ভাগিনেয়, ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতির পালনতোষণ করবেন তা নয়, জ্ঞাতি, বন্ধু এবং ভৃত্যদেরও করবেন। তা ছাড়া স্বধর্মনিরতদের, নিজের গ্রামবাসীদের, অভ্যাগতদের এবং উদাসীনদেরও গৃহস্থ প্রতিপালন করবেন। বিত্তশালী গৃহস্থ এ রকম না করলে সর্বলোকের ঘৃণ্য, পাপী, পশু বলে গণ্য হবেন।[৩]

গৃহস্থ সাধক নিদ্রা, আলস্য, দেহের প্রতি যত্ন, কেশবিন্যাস এবং বস্ত্র ও ভোজনাদিতে অতিরিক্ত আসক্ত হবেন না। তিনি মিতাহারী, মিতনিদ্র, মিতবাক্, মিতমৈথুন, কপটাদি-শূন্য, নম্র, বাহ্যাভ্যন্তরশৌচসম্পন্ন, নিরলস এবং সর্বকর্মে উদ্যোগবান্ হবেন। শত্রুর কাছে বীর আর বন্ধুবান্ধব ও গুরুজনের কাছে বিনীত হবেন। ঘৃণ্য ব্যক্তিদের সম্মান করবেন না আর মানী ব্যক্তিদের অপমান করবেন না। লোকের সঙ্গে বাস করে তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে তাদের সৌহার্দ, ব্যবহার, প্রবৃত্তি এবং প্রকৃতি জেনে তবে তাদের বিশ্বাস করবেন। সময়ে ক্ষুদ্র শত্রুকেও ভয় করবেন এবং উপযুক্ত অবসরে আপনার প্রভাব প্রকাশ করবেন কিন্তু কখনো ধর্ম লঙ্ঘন করবেন না। ধর্মজ্ঞ গৃহস্থ নিজের যশ, পৌরুষ প্রকাশ করবেন না, যা তাঁকে গোপনে রাখার জন্য বলা হয়েছে তা এবং তিনি পরোপকারের জন্য যা করেছেন তা প্রকাশ করবেন না। যশস্বী গৃহস্থ কোনো হীন উদ্দেশ্যে বিবাদে প্রবৃত্ত হবেন না বা যেখানে পরাজয় সুনিশ্চিত সেখানেও বিবাদ করবেন না আর যারা তার নিজের চেয়ে বড় বা ছোট তাদের সঙ্গে বিবাদ করবেন না।[৪]

১ নিজকান্তা সদা পূজ্যা নিজকান্তা হি দেবতা।—দ্রঃ প্রা তো. কাণ্ড ৭, পরিঃ ১, ব সং পৃঃ ৪৮৯

২ কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।—মহা ত ৮।৪৭

৩ এবং ক্রমেণ ভ্রাতৄংশ্চ স্বসৄর্ভ্রাতৃসুতানপি। জ্ঞাতীন্ মিত্রাণি ভৃত্যাংশ্চ পালয়েত্তোষয়েদ্ গৃহী।
ততঃ স্বধর্মনিরতানেকগ্রামনিবাসিনঃ। অভ্যাগতানুদাসীনান্ গৃহস্থঃ পরিপালয়েৎ।
যদ্যেবং নাচরেদ্দেবি গৃহস্থো বিভবে সতি। পশুরেব স বিজ্ঞেয়ঃ স পাপী লোকগর্হিতঃ।—ঐ ৮।৪৮-৫০

৪ নিদ্রালস্যং দেহযত্নং কেশবিন্যাসমেব চ। আসক্তিমশনে বস্ত্রে নাতিরিক্তং সমাচরেৎ।
যুক্তাহারো যুক্তনিদ্রো মিতবাঙ্ মিতমৈথুনঃ। স্বচ্ছো নম্রঃ শুচির্দক্ষো যুক্তঃ স্যাৎ সর্বকর্মসু।
শূরঃ শত্রৌ বিনীতঃ স্যাৎ বান্ধবে গুরুসন্নিধৌ। জুগুপ্সিতান্ ন মন্যেত নাবমন্যেত মানিনঃ।

গৃহস্থ যত্নসহকারে বিদ্যা, ধন, যশ এবং ধর্ম অর্জন করবেন; ব্যসন, অসৎসঙ্গ ও মিথ্যা-দ্রোহ পরিত্যাগ করবেন। তাঁর চেষ্টা হবে অবস্থানুগত এবং ক্রিয়া সময়ানুগত। তিনি সেইজন্য অবস্থা ও সময় বিবেচনা করে কাজ করবেন। গৃহস্থ যোগক্ষেমরত অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তিতে এবং প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণে যত্নবান্ হবেন। তিনি দক্ষ, ধার্মিক এবং বন্ধুদের প্রিয় হবেন। তাঁর কথা, তাঁর হাসি পরিমিত হবে, বিশেষ করে গুরুজনদের সামনে ত হবেই।[১]

গৃহস্থ জিতেন্দ্রিয়, প্রসন্নাত্মা, সুচিন্তক, দৃঢ়ব্রত, অপ্রমত্ত ও দীর্ঘদর্শী হবেন আর ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারে বিচারশীল হবেন। সত্য, মৃদু, প্রিয় এবং হিতকর কথা ধীর গৃহস্থ বলবেন এবং নিজের উৎকর্ষ প্রচার আর পরের নিন্দা বর্জন করবেন।[২]

গৃহস্থকে জনকল্যাণকর কর্ম করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যে-গৃহস্থ পথের ধারে জলাশয়, বৃক্ষ, বিশ্রামাগার এবং পথে সেতুপ্রতিষ্ঠা করেন তিনি ত্রিলোক জয় করেন।[৩]

যে-গৃহস্থ যথাশাস্ত্র ধর্মাচরণ করেন শাস্ত্রে উচ্চকণ্ঠে তাঁর গৌরব ঘোষণা করা হয়েছে। মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে[৪] —যে-গৃহস্থের প্রতি পিতামাতা প্রসন্ন, বন্ধুরা অনুরক্ত, লোকে

সৌহার্দং ব্যবহারঞ্চ প্রবৃত্তিং প্রকৃতিং নৃণাম্। সহবাসেন তর্কৈশ্চ বিদিত্বা বিশ্বসেত্ততঃ।
ত্রসেদ্বেষ্ট্রপি ক্ষুদ্রাৎ সময়ং বীক্ষ্য বুদ্ধিমান্। প্রদর্শয়েদাত্মভাবান্নৈব ধর্মং বিলঙ্ঘয়েৎ।
বীর্যং যশঃ পৌরুষঞ্চ গুপ্তয়ে কথিতঞ্চ যৎ। কৃতং যদুপকারায় ধর্মজ্ঞো ন প্রকাশয়েৎ।
জুগুপ্সিতপ্রবৃত্তৌ চ নিশ্চিতেঽপি পরাজয়ে। গুরুণা লঘুনা চাপি যশস্বী ন বিবাদয়েৎ।—মহা ত ৮।৫১-৫৭

১ বিদ্যাধনযশোধর্মান্ যত্নেন উপার্জয়েৎ। ব্যসনঞ্চাসতাং সঙ্গং মিথ্যাদ্রোহং পরিত্যজেৎ।
অবস্থানুগতাঃ চেষ্টাঃ সময়ানুগতাঃ ক্রিয়াঃ। তস্মাদবস্থাং সময়ং বীক্ষ্য কর্ম সমাচরেৎ।
যোগক্ষেমরতো দক্ষো ধার্মিকঃ প্রিয়বান্ধবঃ। মিতবাঙ্ মিতহাসশ্চ মান্যান্যাগ্রে তু বিশেষতঃ।—ঐ ৮।২৮-৩০

২ জিতেন্দ্রিয়ঃ প্রসন্নাত্মা সুচিন্ত্যঃ স্যাদ্দৃঢ়ব্রতঃ। অপ্রমত্তো দীর্ঘদর্শী মাত্রাস্পর্শান্ বিচারয়েৎ।
সত্যং মৃদু প্রিয়ং ধীরো বাক্যং হিতকরং বদেৎ। আত্মোৎকর্ষং তথা নিন্দাং পরেষাং পরিবর্জয়েৎ।
—ঐ ৮।৩১-৩২

৩ জলাশয়াশ্চ বৃক্ষাশ্চ বিশ্রামগৃহমধ্বনি। সেতুঃ প্রতিষ্ঠিতো যেন তেন লোকত্রয়ং জিতম্।—ঐ ৮।৩৩

৪ সন্তুষ্টৌ পিতরৌ যস্মিন্ননুরক্তাঃ সুহৃদ্গণাঃ। গায়ন্তি যদ্যশো লোকাস্তেন লোকত্রয়ং জিতম্।
সত্যমেব ব্রতং যস্য দয়া দীনেষু সর্বদা। কামক্রোধৌ বশে যস্য তেন লোকত্রয়ং জিতম্।
বিরক্তঃ পরদারেষু নিস্পৃহঃ পরবস্তুষু। দম্ভমাৎসর্যহীনো যস্তেন লোকত্রয়ং জিতম্।
ন বিভেতি রণাদ্ যো বৈ সংগ্রামেঽপ্যপরাঙ্মুখঃ। ধর্মযুদ্ধে মৃতো বাঽপি তেন লোকত্রয়ং জিতম্।
অসংশয়াত্মা শ্রদ্ধালুঃ শাম্ভবাচারতৎপরঃ। মন্ত্রাসনে স্থিতো যশ্চ তেন লোকত্রয়ং জিতম্।
জ্ঞানিনা লোকযাত্রায়ৈ সর্বত্র সমদৃষ্টিনা। ক্রিয়ন্তে যেন কর্মাণি তেন লোকত্রয়ং জিতম্।
—মহা ত ৮।৩৪-৩৯

যার যশোগান করে তিনি ত্রিলোক জয় করেছেন। যিনি সত্যব্রত, দীনের প্রতি দয়াশীল, কামক্রোধ যাঁর বশে, তিনি ত্রিলোক জয় করেছেন। যিনি পরদারে অনুরক্ত নন, পরবস্তুতে যার আকাঙ্ক্ষা নাই, যিনি দম্ভমাৎসর্যশূন্য, তিনি ত্রিলোক জয় করেছেন। যে-গৃহস্থ রণে ভয় পান না, সংগ্রামে যিনি অপরাঙ্মুখ অথবা ধর্মযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন, তিনি লোকত্রয় জয় করেছেন। যিনি অসংশয়াত্মা, শ্রদ্ধাবান্, শাস্ত্রবাচারপরায়ণ, যিনি শিবশাসনে অবস্থিত, তিনি ত্রিলোক জয় করেছেন। যে-তত্ত্বজ্ঞানী গৃহস্থ সকলের প্রতি সমদৃষ্টি আর শুধু লোকযাত্রার জন্য কর্ম করেন, তিনি লোকত্রয় জয় করেছেন।

এমনি গৃহস্থ সাধক সম্বন্ধেই নির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে যিনি গৃহস্থাশ্রমে থেকে তত্ত্বজ্ঞানরত, তিনি সর্বপাপমুক্ত, তিনি সাক্ষাৎ মহেশ্বর।[১]

গৃহাবধূত— ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থকেই গৃহাবধূত বলা হয়। অবধূত অর্থ সন্ন্যাসী।[২] যিনি গৃহস্থ হয়েও সন্ন্যাসী তিনি গৃহাবধূত। সন্ন্যাস বলতে বুঝায় কাম্য-কর্মত্যাগ আর ত্যাগের-মর্মার্থ সব রকমের কর্মফলত্যাগ।[৩] কাজেই যিনি সন্ন্যাসী তিনি কাম্য কর্ম ত্যাগ করেন এবং অন্য সব কর্মের ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন করেন।

শাস্ত্রে অবধূতের লক্ষণ নির্দেশ করা হয়েছে—যিনি বর্ণাশ্রমের ঊর্ধ্বে চলে গেছেন এবং আত্মাতেই স্থিতচিত্ত সেই অতিবর্ণাশ্রমী যোগীকে বলা হয় অবধূত।[৪]

কুলার্ণবতন্ত্রে অবধূত-সম্পর্কে বলা হয়েছে—যিনি নিত্যবরেণ্য, সংস্কারবন্ধনমুক্ত, যাঁর আত্মজ্ঞান লাভ হয়েছে, তাঁকে অবধূত বলা হয়।[৫]

এই ধরণের শাস্ত্রীয় বচন অনেক আছে। যেমন মণ্ডলব্রাহ্মণোপনিষদে পাওয়া যায়—চিরসমাধিজনিত ব্রহ্মামৃত যিনি পান করেন সেই সন্ন্যাসী পরমহংস অবধূত হন।[৬]

---

১ গৃহস্থাশ্রমমাসাদ্য তত্ত্বজ্ঞানেষু যো রতঃ।
স মুক্তঃ সর্বপাপেভ্যঃ স তু সাক্ষান্মহেশ্বরঃ।—দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৭, পরিঃ ১, ব সং, পৃঃ ৬৯২

২ অবধূতাশ্রমো দেবি কলৌ সন্ন্যাস উচ্যতে।—মহা ত ৮।২২১

৩ কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ।—গীতা ১৮।২

৪ যো বিলঙ্ঘ্যাশ্রমান্ বর্ণান্ আত্মন্যেব স্থিতঃ পুমান্।
অতিবর্ণাশ্রমী যোগী অবধূতঃ স উচ্যতে।—দ্রঃ The Great Liberation, p. 215, n. 1

৫ অক্ষরত্বাদ্বরেণ্যত্বাদ্ ধূতসংসারবন্ধনাৎ।
তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যত্বাদবধূতোঽভিধীয়তে। —কু ত, উঃ ১৭

৬ এবং চিরসমাধিজনিতব্রহ্মামৃতপানপরায়ণোঽসৌ সন্ন্যাসী পরমহংসোঽবধূতো ভবতি।
মণ্ডলব্রাহ্মণোপনিষদ্, ৫ম ব্রাহ্মণ

গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে বলা হয়েছে—যাঁর এক হাতে ত্যাগ, অপর হাতে ভোগ, কিন্তু যিনি ভোগে ও ত্যাগে নির্লিপ্ত তিনি অবধূত।[১]

প্রকারভেদ—বামকেশ্বরতন্ত্রের মতে অবধূত দুই প্রকার গৃহাবধূত আর দিগম্বর। সবস্ত্র, সপত্নিক, ভাবক, সাধক, শুচি, গুরুভক্ত, জ্ঞানী, বাহ্যাভ্যন্তর-ধর্ম-আচরণকারী, অষ্টাঙ্গ যোগের অভ্যাসকারী, প্রাণায়ামপরায়ণ, নিষ্কাম, জ্ঞানের দ্বারা বিশুদ্ধাত্মা, শিবার্চনপরায়ণ অবধূত গৃহাবধূত। আর দিগম্বর সাক্ষাৎ সদাশিব।[২]

মুণ্ডমালাতন্ত্রেও দেখা যায় অবধূতকে সাক্ষাৎ শিব ও সদাশিব বলা হয়েছে।[৩]

কুলাবধূত— সর্বোচ্চ স্তরের সাধক কুলাবধূত। ইনি গৃহত্যাগী। মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে—ইনি সুখদুঃখাদিদ্বন্দ্ববর্জিত, নিষ্কাম, স্থিরমানস। শিষ্ট গুরুর শিষ্য সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় এই অবধূত জগতে ইচ্ছামত বিচরণ করেন। ইনি ব্রহ্মা থেকে তৃণগুচ্ছ পর্যন্ত সমস্তই ব্রহ্মরূপ মনে করেন এবং নিজ আত্মায় পরমাত্মার ধ্যান করে নামরূপ সব বিস্মৃত হয়ে যান।[৪]

এই সন্ন্যাসী গৃহহীন, ক্ষমাশীল, নিঃশঙ্ক, অনাসক্ত, মমতাহীন ও নিরহঙ্কার। ইনি সমস্ত বিধিনিষেধমুক্ত, যোগক্ষেমরহিত ও আত্মবিৎ। এঁর কাছে সুখদুঃখ সমান। ইনি ধীর, জিতাত্মা, বিগতস্পৃহ, দুঃখে স্থিরচিত্ত আর সুখে নিস্পৃহ। স্থিরাত্মা, সদানন্দ বাহ্যাভ্যন্তর-শৌচসম্পন্ন এই অবধূত শান্ত, পরাপেক্ষারহিত ও আকুলতাশূন্য।[৫]

১ একহস্তে ধৃতস্ত্যাগো ভোগশ্চৈককরে স্বয়ম্।
অলিপ্তস্ত্যাগভোগাভ্যাং সোঽবধূতঃ প্রিয়ে অস্তু নঃ।—গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহ, পৃঃ ১

২ অবধূতশ্চ দ্বিবিধো গৃহস্থশ্চ দিগম্বরঃ। সচেলশ্চ সদারশ্চ ভাবক সাধকঃ শুচিঃ।
গুরুভক্তিরতো জ্ঞানী বাহ্যাভ্যন্তরধর্মকৃৎ। অষ্টাঙ্গাভ্যাসনিরতঃ প্রাণায়ামপরায়ণঃ।
নিষ্কামী জ্ঞানশুদ্ধাত্মা শিবার্চনপরায়ণঃ। গৃহাবধূতো দেবেশি দ্বিতীয়শ্চ সদাশিবঃ।
—দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৭ পরিঃ ৪, ব সং, পৃঃ ৪০২

৩ অবধূতঃ শিবঃ সাক্ষাদবধূতঃ সদাশিবঃ।
অবধূতো শিবো দেবি অবধূতাশ্রমঃ শৃণু।—দ্রঃ ঐ পরিঃ ১, পৃঃ ৪৭৮

৪ ততো নির্দ্বন্দ্বরূপোঽসৌ নিষ্কামস্থিরমানসঃ।
বিহরেৎ স্বেচ্ছয়া শিষ্যঃ সাক্ষাদ্ ব্রহ্মময়ো ভুবি।
আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্তং সদ্রূপেণ বিভাবয়ন্।
বিস্মৃত্য নামরূপাণি ধ্যায়ন্নাত্মানমাত্মনি।—মহা তু ৮।২৬৯-২৭০

৫ অনিকেতঃ ক্ষমাবৃত্তো নিঃশঙ্কঃ সঙ্গবর্জিতঃ। নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সন্ন্যাসী বিহরেৎ ক্ষিতৌ।
মুক্তো বিধিনিষেধেভ্যো নির্যোগক্ষেম আত্মবিৎ। সুখদুঃখসমো ধীরো জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
স্থিরাত্মা প্রাপ্তদুঃখোঽপি সুখে প্রাপ্তেঽপি নিস্পৃহঃ। সদানন্দঃ শুচিঃ শান্তো নিরপেক্ষো নিরাকুলঃ।
—মহা তু ৮।২৭১-২৭৩

ইনি কোনো জীবের উদ্বেগের কারণ নন, সব প্রাণীর কল্যাণসাধনে সর্বদা রত। এঁর ক্রোধ ও ভয় নাই; ইনি নিঃসঙ্কল্প এবং নিরুদ্যম অর্থাৎ দেহধারণের চেষ্টাও করেন না। ইনি শোকহীন, দ্বেষহীন, শত্রু এবং মিত্রের প্রতি এঁর একই ভাব। ইনি শীতবাতাতপসহিষ্ণু। মানাপমান এঁর কাছে সমান, শুভাশুভ সমান। বিনা চেষ্টায় যে-বস্তু ইনি পান তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন। ইনি নিষ্কাম, নির্বিকল্প, নির্লোভ এবং অসঞ্চয়ী।[১]

এই পরিব্রাজক অবধূতের কীটে দেবতায় মানুষে সর্বত্র সমদৃষ্টি। ইনি সর্বকর্মে সমস্তই ব্রহ্ম বলে জানেন।[২]

কুলাবধূত স্বেচ্ছাচারপরায়ণ অর্থাৎ তাঁকে বিশেষ কোনো আচার মেনে চলতে হয় না। তবে শাস্ত্রে তাঁকেও অধ্যাত্মশাস্ত্র অধ্যয়ন ও তত্ত্ববিচারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[৩] অবশ্য এ কথাও বলা হয়েছে, যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন তাঁর আর জপ তপ যজ্ঞ নিয়ম ব্রতাদির কোনো প্রয়োজন নাই।[৪] শাস্ত্রের অভিপ্রায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না হওয়া পর্যন্ত এ-সব করতে হবে।

কুলাবধূতসংস্কারের দ্বারা কুলাবধূত হলেই গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হতে হবে এমন কোনো কথা নাই। বরং শাস্ত্রের সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না হওয়া পর্যন্ত কুলাবধূতকে গৃহে থেকে গৃহধর্ম পালনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মশোধন করতে হবে। তাঁকে স্বজাতিচিহ্ন ধারণ করতে হবে, কৌলের মতো সমস্ত কর্ম করতে হবে এবং সর্বদা ব্রহ্মপর হয়ে উত্তম জ্ঞানের অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনা করতে হবে।[৫]

প্রত্যক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করলে কুলাবধূত হংস বা পরমহংস হয়ে যান। এই অবস্থায়ই ইনি নিরাসক্ত, নির্দ্বন্দ্ব এবং মুক্ত হন।[৬] শাস্ত্রে কুলাবধূতের যে-সব গুণের কথা বলা হয়েছে সে-সব পূর্ণভাবে এঁরই অধিগত।

---

১ নোদ্বেজকঃ স্যাজ্জীবানাং সদা প্রাণিহিতে রতঃ। বিগতামর্ষভীর্দান্তো নিঃসঙ্কল্পো নিরুদ্যমঃ।
শোকদ্বেষবিমুক্তঃ স্যাৎ শত্রৌ মিত্রে সমো ভবেৎ। শীতবাতাতপসহঃ সমো মানাপমানয়োঃ।
সমঃ শুভাশুভে তুষ্টো যদৃচ্ছাপ্রাপ্তবস্তুনা। নিস্ত্রৈগুণ্যো নির্বিকল্পো নির্লোভঃ স্যাদসঞ্চয়ী।
—মহা ত ৮।২৭৪-২৭৬

২ সর্বত্র সমদৃষ্টিঃ স্যাৎ কীটে দেবে তথা নরে। সর্বং ব্রহ্মেতি জানীয়াৎ পরিব্রাট্‌ সর্বকর্মসু।—ঐ ৮।২৮০

৩ অধ্যাত্মশাস্ত্রাধ্যয়নৈঃ সদা তত্ত্ববিচারণৈঃ। অবধূতো নয়েৎ কালং স্বেচ্ছাচারপরায়ণঃ।—ঐ ৮।২৮২

৪ ব্রহ্মজ্ঞানং পরং জ্ঞানং যস্য চিত্তে বিরাজতে। কিং তস্য জপযজ্ঞাদ্যৈস্তপোভির্নিয়মব্রতৈঃ।—ঐ ১৪।১২৪

৫ কুলাবধূতসংস্কারো যদি স্যাৎ জ্ঞানদুর্বলঃ। তদা লোকালয়ে তিষ্ঠন্নাত্মানং স তু শোধয়েৎ।
রক্ষন্ স্বজাতিচিহ্নঞ্চ কুর্বন্ কর্মাণি কৌলবৎ। সদা ব্রহ্মপরো ভূত্বা সাধয়েৎ জ্ঞানমুত্তমম্।—ঐ ১৪।১৫০-১৫১

৬ মুক্তো বিরক্তো নির্দ্বন্দ্বো হংসাচারপরো যতিঃ।—মহা ত ১৪।১৭১

এমনি কুলাবধূতকেই মহানির্বাণতন্ত্রে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলা হয়েছে। বলা হয়েছে—তত্ত্বজ্ঞ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ কুলাবধূত জীবন্মুক্ত। তিনি নরাকৃতি সাক্ষাৎ নারায়ণ। গৃহস্থ তাঁর পূজা করবে।[১]

মুণ্ডমালাতন্ত্রাদিতে যে-অবধূতকে সাক্ষাৎ শিব, সদাশিব বলা হয়েছে ইনিই সেই অবধূত।

বিভিন্ন ভাবের সাধক—পূর্বে আমরা সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভাবের সাধকের কথা বলেছি। সাধারণভাবে বলা যায় শাক্ততন্ত্রে এঁদেরই দিব্য, বীর এবং পশুভাবের সাধক বলা হয়েছে।

ভাব—ভাব কথাটার ব্যাখ্যা করা কঠিন। ভাবচূড়ামণিতে বলা হয়েছে ভাব মনের ধর্ম, শব্দের দ্বারা কিভাবে প্রকাশিত হবে? কাজেই ভাবের কথা বলা যায় না, শুধু তার ইঙ্গিতমাত্র করা যায়। ইক্ষুগুড়ের মাধুর্য যেমন খেলেই বোঝা যায় তেমনি ভাববিভাব মনের দ্বারাই চিন্তনীয়।[২]

বামকেশ্বরতন্ত্রেও ভাবকে মানস ধর্ম বলা হয়েছে। বলা হয়েছে মনের দ্বারাই সর্বদা তার অভ্যাস করতে হবে।[৩]

কোনো কোনো অধিকারী ব্যক্তি অবশ্য মনে করেন "ভাব শব্দে জ্ঞানেরই অবস্থা বিশেষ বুঝিতে হইবে।"[৪]

তন্ত্রশাস্ত্রে ভাবের গৌরব বিশেষভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। কৌলাবলীতন্ত্রে বলা হয়েছে—ভাব যদি না থাকে তা হলে অনেক জপতপ, বিস্তর কায়ক্লেশাদি ও যন্ত্রমন্ত্র কিছুই ফলপ্রদ হয় না। ভাব থাকলে সবই হয়। ভাবে মুক্তিলাভ হয়, ভাবে কুলবৃদ্ধি, গোত্রবৃদ্ধি হয়, ভাবে কায়শোধন হয়। ভাব না থাকলে ন্যাসেই বা কি হবে, ভূতশুদ্ধিতেই বা কি হবে আর পূজাতেই বা কি হবে? ভাব না থাকলে এ সমস্তই ব্যর্থ।[৫]

১ কুলাবধূতস্তত্ত্বজ্ঞো জীবন্মুক্তো নরাকৃতিঃ।
সাক্ষান্নারায়ণং মত্বা গৃহস্থস্তং প্রপূজয়েৎ।—ঐ ৮।২৮৮

২ ভাবস্তু মানসো ধর্মঃ শাব্দঃ স হি কথং ভবেৎ।
তস্মাদ্ভাবো ন বক্তব্যো দিঙ্মাত্রং সমুদাহৃতম্।
যথেক্ষুগুড়মাধুর্যদর্শনৈ জায়তে প্রভো।
তথা ভাববিভাবস্তু মনসা পরিভাব্যতে।—দ্রঃ, পু চ, নবম তরঙ্গ, পৃঃ ৮৩৫

৩ ভাবো হি মানসো ধর্মো মনসৈব সদাভ্যসেৎ।—দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৭, পরিঃ ১, ব সং, পৃঃ ৫৮৯

৪ তান্ত্রিক গুরু, ৪র্থ সং, পৃঃ ৫২

৫ বহুজাপাত্তথা হোমাৎ কায়ক্লেশাদিবিস্তরৈঃ। ন ভাবেন বিনা দৈব যন্ত্রমন্ত্রাঃ ফলপ্রদাঃ।
ভাবেন লভতে মুক্তিং ভাবেন কুলবর্ধনম্। ভাবেন গোত্রবৃদ্ধিঃ স্যাৎ ভাবেন কায়শোধনম্।
কিং ন্যাসবিস্তরেণৈব কিং ভূতশুদ্ধিবিস্তরৈঃ। কিং তথা পূজনেনৈব যদি ভাব ন জায়তে।
—কৌ নি ১১।৪-৫, ৬-৭।

ভাবসম্বন্ধে অনুরূপ উক্তি অন্য তন্ত্রেও আছে। যেমন রুদ্রযামলে বলা হয়েছে—যদি ভাব না থাকে তবে হোম প্রভৃতি নানাপ্রকার ক্রিয়ার দ্বারা কি হবে? ভাবের দ্বারাই জ্ঞান উৎপন্ন হয় আর জ্ঞানের থেকেই মোক্ষলাভ হয়।[১]

উক্ত তন্ত্রে আরও বলা হয়েছে—ভাবের দ্বারা সব লাভ হয়, ভাবের দ্বারা দেবদর্শন হয়, পরম জ্ঞানলাভ হয়। কাজেই ভাব অবলম্বন করবে। ভাব সর্বশাস্ত্রের গূঢ় বস্তু, সর্বেন্দ্রিয়ে অবস্থিত। সাধক যখন সমস্তের মূলভূত দেবীভাব লাভ করেন তখন তাঁর সর্বসিদ্ধি লাভ হয় এবং ধ্যান দৃঢ় হয়।[২]

ত্রিবিধ ভাব—তান্ত্রিক সাধনায় ত্রিবিধ ভাব নির্দিষ্ট হয়েছে—দিব্য, বীর এবং পশু। পূর্বেও এ বিষয়ের উল্লেখ করা গেছে। কৌলাবলীতন্ত্রে বলা হয়েছে এই ত্রিবিধ ভাব অনুসারে গুরু, মন্ত্র আর দেবতাও ত্রিবিধ।[৩]

ত্রিবিধ ভাবের মধ্যে দিব্যভাব শ্রেষ্ঠ, সর্বসিদ্ধিপ্রদায়ক; বীরভাব মধ্যম আর কৌলাবলীতন্ত্রের মতে পশুভাব বিশ্বনিন্দিত।[৪] তন্ত্রান্তরেও দিব্যভাবকে উত্তম, বীরভাবকে মধ্যম আর পশুভাবকে অবর বা অধম বলা হয়েছে।[৫] পিচ্ছিলাতন্ত্রে দিব্য ও বীরভাবকে মহাভাব আর পশুভাবকে অধম বলা হয়েছে।[৬]

পশুভাব নিন্দনীয় নয়—তন্ত্রে পশুভাবকে অধম বলা হয়েছে 'নহি নিন্দা ন্যায়' অনুসারে অর্থাৎ দিব্য ও বীরভাবের গৌরব প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, পশুভাবের নিন্দার জন্য নয়। বস্তুতঃ পশুভাব নিন্দনীয় নয়। রুদ্রযামলের মতে সাধনার ক্রম অনুসারে আদিতে পশুভাব, মধ্যে বীরভাব এবং অন্তে দিব্যভাব।[৭] উক্ত গ্রন্থে আরও স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে—প্রথমে পশুভাব অবলম্বন করে তার পরে সর্বভাবোত্তম মহাভাব বীরভাব অবলম্বন আবশ্যক এবং তার পরে অতিসুন্দর দিব্যভাব অবলম্বন মহাফলপ্রদ।[৮]

১ নানাহোমক্রিয়াভিঃ কিং যদি ভাবো ন লভ্যতে। ভাবেন জ্ঞানমুৎপন্নং জ্ঞানান্মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ।
—রু যা, উ ত, ১।২২২-৩

২ ভাবেন লভ্যতে সর্বং ভাবেন দেবদর্শনম্। ভাবেন পরমং জ্ঞানং তস্মাদ্ ভাবাবলম্বনম্।
ভাবশ্চ সর্বশাস্ত্রাণাং গূঢ়ং সর্বেন্দ্রিয়স্থিতম্। সর্বেষাং মূলভূতঞ্চ দেবীভাবং যদা লভেৎ।
তদৈব সর্বসিদ্ধিশ্চ তদা ধ্যানো দৃঢ়ো ভবেৎ।—ঐ ১।১১৬-১৭

৩ ভাবস্তু ত্রিবিধঃ প্রোক্তো দিব্যবীরপশুক্রমাৎ। গুরুশ্চ ত্রিবিধশ্চৈব তথৈব মন্ত্রদেবতা।—কৌ নি ১১।১-২

৪ আদ্যভাবো মহান্ শ্রেয়ান্ সর্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ। দ্বিতীয়ো মধ্যমশ্চৈব তৃতীয়ো বিশ্বনিন্দিতঃ।—ঐ ১১।২-৩

৫ উত্তমো দিব্যভাবঃ স্যাদ্বীরভাবস্তু মধ্যমঃ। পশুভাবোঽধমঃ প্রোক্তো ভাবমেকং সমাশ্রয়েৎ।
—দ্রঃ পু চ, তঃ ৯, পৃঃ ৮৬৫

৬ দিব্যবীরৌ মহাভাবাবধমঃ পশুভাবকঃ।—দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৭, পরিঃ ১, ব সং, পৃঃ ৪৮৮

৭ পশুভাবং প্রথমকে দ্বিতীয়ে বীরভাবকম্।
তৃতীয়ে দিব্যভাবঞ্চ ইতি ভাবত্রয়ং ক্রমাৎ।—রু যা, উ ত, ১১।২৮-২৯

৮ আদৌ ভাবং পশোঃ কৃত্বা পশ্চাৎ কুর্যাদবশ্যকম্। বীরভাবং মহাভাবং সর্বভাবোত্তমোত্তমম্।
তৎপশ্চাৎ অতিসৌন্দর্যং দিব্যভাবং মহাফলম্।—ঐ ৩।৫০-৫১

বিষয়টির ব্যাখ্যা করে নিগমকল্পদ্রুমে বলা হয়েছে—পশুভাবের সমাপ্তিতে বীরভাবের আরম্ভ আর বীরভাবের সমাপ্তিতে দিব্যভাবের আরম্ভ। বাল্য-যৌবন-বার্দ্ধক্য, পুষ্প-ফল-বীজ, দুগ্ধ-নবনীত-ঘৃত, সঙ্কল্প-কার্য-দক্ষিণা এ-সবের মধ্যে যেমন একটা ক্রমপরিণতি আছে তেমনি আছে পশু-বীর-দিব্যভাবের মধ্যে একটা ক্রমপরিণতির সম্বন্ধ।[১]

কাজেই পশুভাব নিন্দনীয় নয়। রুদ্রযামলতন্ত্রে পশুভাবকে অধম বলা হয়েছে অথচ উক্ত তন্ত্রেই আছে সর্বদা বেদাভ্যাস করলে পশুভাবেও সিদ্ধিলাভ হয়। পশুভাবে অবস্থিত সাধক যদি বেদপাঠ করেন, বেদার্থ চিন্তা করেন, সমস্ত নিন্দাবিরহিত হন, হিংসা আলস্য লোভ মোহ কাম ক্রোধ মদ মাৎসর্য বর্জন করেন, তা হলে পশুভাবও সিদ্ধিপ্রদ হয়। যাঁরা পশুভাবকে মহাভাব বলে জানেন তাঁরাও পরিশ্রম ও অভ্যাসের দ্বারা সিদ্ধিলাভ করেন। শ্রমের অসাধ্য কিছু নাই। সমস্ত জগৎ শ্রমাধীন, দেবতারাও শ্রমাধীন।[২]

উক্ত তন্ত্রেই অন্যত্র বলা হয়েছে দেবী কুণ্ডলী পশুভাব ব্যতীত তুষ্ট হন না। পশুভাবে জ্ঞানসিদ্ধি হয়। এমনি জ্ঞানসিদ্ধি হলেই সাধক বীরভাবে মোক্ষভাজন হন এবং দিব্যভাবে সমাধিস্থ হয়ে জীবন্মুক্ত হন।[৩]

সাধনায় ভাবক্রম—আমরা লক্ষ্য করেছি তান্ত্রিক সাধনা বাস্তবসচেতন মনোবিজ্ঞান-সম্মত সাধনা। সাধারণ মানুষ প্রথমেই বীরভাবের বা দিব্যভাবের সাধনার অধিকারী হতে পারে না। সেইজন্যই তাদের জন্য শাস্ত্রে সাধনার পূর্বোক্ত ক্রমনির্দেশ করা হয়েছে।

এ সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় লিখেছেন—একদিকে পশুভাব, অপরদিকে দিব্যভাব, মধ্যে বীরভাব উভয়ভাবের সংযোজকরূপে বিদ্যমান। প্রথমে দিব্যভাবে উত্থিত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। এইজন্য একটি মধ্যবর্তী ভাবকে আশ্রয় করিয়া দিব্যভাবকে

১ পশুভাবসমাপ্তিশ্চ বীরভাবাবরম্ভকঃ। দিব্যারম্ভকো বীরভাবনাশক এব চ।
যথা বাল্যো যৌবনঞ্চ বৃদ্ধভাবঃ ক্রমাৎ প্রিয়। যথা পুষ্পং ফলঞ্চৈব বীজঞ্চৈব যথাক্রমম্।
যথা দুগ্ধং নবনীতং ঘৃতঞ্চেতি মহেশ্বর। যথা সঙ্কল্পঃ কার্যঞ্চ দক্ষিণাঞ্চেতি চৈব।
তথা ভাবত্রয়ং জ্ঞেয়মারম্ভারম্ভজনকম্।—নিঃ প্রা। তা. কাণ্ড ৭, পরিঃ ১, ব সং পৃঃ ৪৮৮

২ পশুভাবেঽপি সিদ্ধিঃ স্যাৎ যদি বেদং সদাভ্যসেৎ। বেদার্থচিন্তকং নিত্যং বেদপাঠরতনিত্যিয়ম্।
সর্বনিন্দাবিরহিতং হিংসালস্যবিবর্জিতম্। লোভমোহকামক্রোধমদমাৎসর্যবর্জিতম্।
যদি ভাবস্থিতো মন্ত্রী পশুভাবেঽপি সিদ্ধিভাক্। পশুভাবং মহাভাবং যে জানন্তি মহীতলে।
কিমসাধ্যং মহাদেব শ্রমাভ্যাসেন চাপি তৎ। শ্রমাধীনং জগৎ সর্বং শ্রমাধীনাশ্চ দেবতাঃ।
—রু যা, উ ত, ১১।১৩-১৭

৩ ন তুষ্টা কুণ্ডলীদেবী পশুভাবং বিনা প্রভো। পশুভাবে জ্ঞানসিদ্ধির্বীরভাবে হি মোক্ষভাক্।
দিব্যভাবে সমাধিস্থো জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে।—ঐ, পৃঃ ৪০

অবলম্বন করিতে হয়। মনুষ্যচরিত্রে পশুপ্রকৃতির সকল চিহ্নই বর্তমান রহিয়াছে। যদিও আকৃতিতে মনুষ্যভাব মনুষ্যদেহে জন্মগ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্ত হওয়া যায় তথাপি মনুষ্যের প্রকৃতি অর্থাৎ গুণলাভ তীব্র সাধনসাপেক্ষ। মানুষের দেহ পাইলেও মানুষমাত্রেই এক হিসাবে প্রথমতঃ পশু। যেমন—ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করিলেও পিতামাতা শুদ্ধ ব্রাহ্মণদেহসম্পন্ন হইলেও সন্তান যেমন প্রকৃত ব্রাহ্মণপদবাচ্য হয় না, তাহার জন্য ব্রাহ্মণদেহের অনুরূপ তপস্যা ও অন্তে ব্রহ্মজ্ঞানের অর্জন আবশ্যক হয়, ইহাও ঠিক সেইরূপ। মনুষ্যদেহ লাভ করিয়াও জন্মপ্রাপ্ত পাশবপ্রকৃতি হইতে মুক্তিলাভের সাধনা করিতে হয়।"[১]

এই সাধনার বিষয়ে কবিরাজ মহাশয় লিখেছেন—"প্রাচীন তান্ত্রিক আচার্যগণ যথাবিধি অনুষ্ঠিত দীক্ষার দ্বারা ও উহার সহায়ক সংযম সদাচারাদির অনুষ্ঠানের দ্বারা জীবকে পশুভাব হইতে মুক্ত করিবার জন্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যতদিন পশুভাব নিবৃত্ত না হয়, ততদিন পশুর আচারেই থাকিতে হয়, ইহাই ছিল তাহাদের নিয়ম। অর্থাৎ নৈতিক নিয়ম বা বিধিনিষেধের আবশ্যকতা ততদিন তাঁহারা স্বীকার করিতেন। ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিন্দু স্থির না হওয়া পর্যন্ত এই আচার পালনীয় ছিল। কিন্তু বিন্দু স্থির হইলেও দিব্যভাবের উদয় হইতে পারে না। সাংখ্যমতে যেমন সত্ত্ব ও পুরুষের বিবেকজ্ঞানের ফলে পুরুষ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেও নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরপদে অধিরূঢ় হইতে পারে না, তদ্রূপ পশুভাব কাটিয়া গেলেও দিব্যভাবের সমাগম হয় না। যে প্রকৃতিকে বর্জন করা হইয়াছে, নিজে শুদ্ধ ও উন্নত হইয়া নিজের স্বভাবের অনুরূপ সেই প্রকৃতির শুদ্ধ রূপকে গ্রহণ করিয়া পুনর্বার সাধনপথে অগ্রসর হইতে হয়। তখন পশুভাবের সাধনা থাকে না, তখনকার সাধনা বীরভাবের সাধনা"।[২]

বীরভাবের এবং দিব্যভাবের সাধনা সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—"বীরভাবের সাধনাই প্রকৃত মনুষ্যত্বের সাধনা। বীরভাবের সাধনার ফলে পুরুষপ্রকৃতির দ্বন্দ্ব মিটিয়া যায়। প্রকৃতিকে তখন আর পৃথক্ করিয়া রাখা হয় না এবং পুরুষ নিজেও তখন প্রকৃতি হইতে পৃথক্ থাকে না। তখন পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ে মিলিত হইয়া যামলভাবের উদয় হয়। অর্থাৎ বৈষ্ণবগণের যুগলউপাসনা এবং বৌদ্ধগণের যুগনদ্ধভাব। এই যামলভাবের ক্রমবিকাশ হইতে সাম্যভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহারই নাম দিব্যভাব।"[৩]

এই আলোচনার থেকে বোঝা যায় পশুভাব দ্বৈত, বীরভাবকে বলা যায় দ্বৈতাদ্বৈত। কেন না "এই অবস্থায় দ্বৈতভাব কিঞ্চিৎ অপসারিত হয়, অদ্বৈতভাব ভাসা ভাসারূপে দেখা দেয়; কিন্তু স্থায়ীভাবে পরিণত হয় না।" দিব্যভাব অদ্বৈত।[৪]

১ দেহের সাধনা, হিমাদ্রি, ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৩৬২ বাং। ২ ঐ
৩ দেহের সাধনা, হিমাদ্রি, সেপ্টেম্বর, ১৩৬২ বাং ৪ দ্রঃ কৌ র, পৃঃ ৯

পশু—পশুভাবাপন্ন সাধককে তন্ত্রের পরিভাষায় বলে পশু। শৈবশাস্ত্রনির্দিষ্ট পশু আর শাক্ত তন্ত্রোক্ত পশু ঠিক এক নয়। শৈবশাস্ত্রানুসারে জীবমাত্রই পশু কিন্তু শাক্ত শাস্ত্রে শুধু সাধনার ক্ষেত্রে পশুভাবাপন্ন জীবকে পশু বলা হয়; যাঁর পশুভাব নিবৃত্ত হয়ে গেছে সেই সাধক আর পশু নন। তবে তত্ত্বদৃষ্টিতে দেখলে দেখা যাবে পশু সম্বন্ধে শৈব ও শাক্ত শাস্ত্র একমত। শৈব মতে ত্রিবিধমলাবৃত বা ষট্‌কঞ্চুকাবৃত শিবই জীব বা পশু।

পাশ—শাক্ত তন্ত্রেও বলা হয়েছে—ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, শঙ্কা, জুগুপ্সা, কুল, শীল আর জাতি এই অষ্ট পাশের দ্বারা বদ্ধ জীব পশু আর পাশমুক্ত জীব সদাশিব।[১] সাধককে ক্রমে ক্রমে এই আটটি-পাশমুক্ত হতে হয়।

পরশুরামকল্পসূত্রেও এই আটটির ক্রমশঃ পরিত্যাগের কথা বলা হয়েছে।[২]

পরশুরামকল্পসূত্রের সংস্থিষ্ট সূত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় লিখেছেন—"কোন কোন নিবন্ধকার পাশমুক্তের লক্ষণ এইরূপ বলিয়াছেন,—ঘৃণাপাশ হইতে মুক্ত হইলে মল, মূত্র, শুক্র, শোনিত প্রভৃতি স্পর্শাদিতে মনে কিছুমাত্র বিকারের উদয় হইবে না, বিষ্ঠায় চন্দনে সমজ্ঞান হইবে। লজ্জাপাশ হইতে মুক্ত হইলে পিতামাতা প্রভৃতির সম্মুখেও মৈথুনাদি ব্যাপারের অনুষ্ঠানে মনে কিঞ্চিন্মাত্রও বিকারের উদয় হইবে না। ভয়পাশ হইতে মুক্ত হইলে ব্যাঘ্র ভল্লুক সর্প প্রভৃতির সম্মুখে উপস্থিত হইলেও মনের কিছুই বিকার হইবে না। শঙ্কাপাশ হইতে মুক্ত হইলে কোন কার্য করিতেই মনে কিছুমাত্র সংশয় উপস্থিত হইবে না। জুগুপ্সা পাশ হইতে মুক্ত হইলে সকল লোক তীব্র নিন্দা করিলেও মনের কিঞ্চিন্মাত্রও বিকার হইবে না। কুল, শীল এবং জাতি সম্বন্ধেও এইরূপ।"[৩]

তন্ত্রে সাধারণতঃ অষ্ট পাশের কথা বলা হলেও কোথাও কোথাও বাহান্ন বা বাষট্টি পাশের কথাও পাওয়া যায়। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পঞ্চ ক্লেশকে পাশ বলা হয়। পঞ্চ ক্লেশকে আবার তম, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্রও বলা হয়। তমের আটপ্রকার ভেদ, মোহেরও আটপ্রকার ভেদ, মহামোহের ভেদ দশ, তামিস্রের ভেদ আট এবং মহাতামিস্রের আঠার প্রকার ভেদ, সব মিলিয়ে মোট পাশসংখ্যা হয় বাহান্ন। কোনো কোনো মতে তামিস্রের ভেদও আঠার। তা হলে পাশসংখ্যা দাঁড়ায় বাষট্টি।[৪]

পাশ অবিদ্যা। অবিদ্যাবদ্ধ জীব পশু। সৌন্দর্যলহরীর টীকায়[৫] লক্ষ্মীধর দেখিয়েছেন এই

১ ঘৃণা লজ্জা ভয়ং শঙ্কা জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমী। কুলং শীলং তথা জাতিরষ্টৌ পাশাঃ প্রকীর্তিতাঃ।
পাশবদ্ধঃ পশুঃ প্রোক্তঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ।—কুলার্ণবতন্ত্রবচন, দ্রঃ কৌ র, পৃঃ ২৩০, পাদটীকা

২ ঘৃণা-শঙ্কা-ভয়-লজ্জা-জুগুপ্সা-কুল-জাতি-শীলানাং ক্রমেণাবসাদনম্।—প ক সূ ১০।৭০

৩ কৌ র, পৃঃ ২৩৪, পাদটীকা ৪ ল স, ১২৯ সংখ্যক শ্লোকের সৌ ভা, পৃঃ ৯০-৯১

৫ সৌ ল, ৯৯ সংখ্যক শ্লোকের টীকা

মত শ্রুতিসম্মত। প্রমাণস্বরূপ তিনি যে-শ্রুতিবচন উদ্ধার করেছেন তার অর্থ—অদিতি পাশ অর্থাৎ অবিদ্যাকৃত বন্ধন প্রকৃষ্টরূপে মোচন করুন। পশুত্বনিবৃত্তির জন্য পশুপতিকে নমস্কার করি।[১] লক্ষ্মীধরের মতে এই শ্রুতির সহজ অর্থ পশুপতি সদাশিবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অদিতি পাশবিমোচন করুন।

পশুর আচার বা কর্তব্যাকর্তব্য—তন্ত্রশাস্ত্রে পশুর আচার বা কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভাবচূড়ামণিতে আছে—পশুভাবতৎপর সাধক প্রথমে যত্ন করে শুদ্ধি আচরণ করবেন। মাছ খাবেন না, মনে মনে স্ত্রীলোকের (মন্দভাবে) স্মরণ করবেন না। পরদ্রব্যের প্রতি লোভ করবেন না, ভোগে মন দেবেন না। সিন্ধুতীরে, পর্বতে, কাননে, দেবালয়ে, বিল্বমূলে, নির্জনস্থানে, পুণ্যক্ষেত্রে বা সুন্দরস্থানে সাধনা করবেন। শূদ্রের দর্শন করবেন না, কৌটিল্য দূর থেকেই ত্যাগ করবেন। সুসমাহিত হয়ে শুভ্রবর্ণা দেবতার ধ্যান করবেন। ত্রিসন্ধ্যা দেবপূজা এবং জপ করবেন। রাত্রে মন্ত্র জপ করবেন না, জপমালা স্পর্শও করবেন না। ভোজনের পর মন্ত্র জপ (উচারণ) করবেন না, সব কাজে মৌনী হয়ে থাকবেন। সাধক পর্বকালে স্ত্রীগমন করবেন না। পুষ্প, গন্ধদ্রব্য, জল স্বয়ং আহরণ করে পূজা করবেন। মৈথুন, সেই সম্পর্কিত কথা এবং যারা সে-সব কথা বলে তাদের সঙ্গ বর্জন করবেন। ঋতুকাল ব্যতীত পত্নীতে উপরত হবেন না। পুরাণশ্রবণে শ্রদ্ধাশীল হবেন, বেদ ও বেদাঙ্গবিষয়ে তৎপর হবেন। বিদ্বান্ সাধক রাত্রে ভোজন করবেন না এবং তাম্বূল সেবন করবেন না। গুরুর সব আদেশ যত্নসহকারে পালন করবেন। স্বজাতকুসুম ও হেতুদ্রব্য স্পর্শ করবেন না, করলে ত্রিরাত্র পঞ্চগব্যের দ্বারা শুদ্ধ হবেন। দেবীভক্তিপরায়ণ পশুসাধক রক্তবস্ত্র ব্যবহার করবেন না। বিষ্ণুতন্ত্রোক্ত কল্পাদির অনুষ্ঠান করবেন। বীরভাবের কথাবার্তা পশু বলবেন না। ধর্মতৎপর হয়ে নিত্যশ্রাদ্ধ, গোসেবা, সন্ধ্যাবন্দনা, তীর্থস্নান, পীঠস্থানে গমন ইত্যাদি কর্ম করবেন।[২]

১ অদিতিঃ পাশং প্র মুমোক্তু, তং নমঃ পশুভ্যঃ পশুপতয়ে করোমি।—তৈ সং ৩।১।৪।১৪

২ প্রথমঃ পূর্বমেবার্থং যত্নতঃ শুদ্ধিমাচরেৎ। ন মৎস্যভোজনং কুর্যান্ন স্ত্রিয়ং মনসা স্মরেৎ।
পরদ্রব্যে ন লোভঃ স্যান্ন ভোগে মানসং ভবেৎ। সিন্ধুতীরে পর্বতে বা কাননে বা সুরালয়ে।
বিল্বমূলে বিবিক্তে তু পুণ্যক্ষেত্রে সুশোভনে। ন শূদ্রদর্শনং কুর্যাৎ কৌটিল্যং দূরতস্ত্যজেৎ।
দেবতা শুভ্রবর্ণা তু ধ্যাতব্যা সুসমাহিতৈঃ। ত্রিসন্ধ্যং দেবপূজা স্যাৎ ত্রিসন্ধ্যং জপমাচরেৎ।
রাত্রৌ মালাঞ্চ মন্ত্রঞ্চ স্পৃশেন্নৈব কদাচন। ন মন্ত্রং প্রজপেদ্ (উচ্চরেদ্) ভুক্ত্বা মৌনী স্যাৎ সর্বকর্মসু।
পর্বকালে স্ত্রিয়ং নৈব গচ্ছেদ্ বৈ সাধকোত্তমঃ। পুষ্পং গন্ধং জলং চৈব স্বয়মানীয় পূজয়েৎ।
মৈথুনং তৎকথালাপং তদ্‌গোষ্ঠীং পরিবর্জয়েৎ। ঋতুকালং বিনা গচ্ছেন্ন চ স্বস্ত্রিয়মাদরাৎ।
পুরাণশ্রবণে শ্রদ্ধা বেদবেদাঙ্গতৎপরঃ। ন রাত্রৌ ভোজয়েদ্বিদ্বান্ তাম্বূলঞ্চ তথৈব চ।

কামাখ্যাতন্ত্রে প্রথমেই পশুর লক্ষণ নির্দেশ করে তার কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে—যিনি পঞ্চতত্ত্ব গ্রহণ করেন না, তার নিন্দাও করেন না, যা শিবপ্রোক্ত তা সত্য মনে করেন, শিবোক্ত বিষয়ের নিন্দা পাপ মনে করেন, তিনি পশু। পশু সাধক নিত্য হবিষ্য ভক্ষণ করবেন, তাম্বূল স্পর্শ করবেন না। ঋতুস্নাতা না হলে স্ত্রীকে কামভাবে স্পর্শ করবেন না। পরস্ত্রীকে দেখে যদি মনে কামভাব জাগে তা হলে তার সঙ্গ ত্যাগ করবেন। গন্ধদ্রব্য ও মাল্য ব্যবহার করবেন না, ছিন্ন বস্ত্র ব্যবহার করবেন না। সর্বদা দেবালয়ে থাকবেন, আহারের জন্য শুধু গৃহে যাবেন। পুত্রকন্যাদির প্রতি ব্যগ্রভাবেই বাৎসল্য প্রদর্শন করবেন। ঐশ্বর্য প্রার্থনা করবেন না আবার যদি থাকে তবে তাও ত্যাগ না। ধন থাকলে সর্বদা দান করবেন। সমস্ত কার্পদ্রোহ অর্থাৎ কৃপার্হবিরোধী মনোভাব পরিহার করবেন এবং অহংকারাদি ত্যাগ করবেন, বিশেষ করে ক্রোধ বর্জন করবেন।[১]

কলিতে পশুভাব নিষিদ্ধ ?— উপরের বিবরণ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় পশুভাবের সাধনা কত কঠিন সাধনা এবং কত দীর্ঘ সময়-সাপেক্ষ। সম্ভবতঃ এই কারণেই কোনো কোনো তন্ত্রে কলিযুগে পশুভাবের সাধনা নিষেধ করা হয়েছে। যেমন মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে— কলিতে পশুভাব নাই, দিব্যভাবও দুর্লভ ; শুধু বীরসাধনকর্ম প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ।[২] অবশ্য সব তন্ত্রে এ মত স্বীকৃত নয়। কেন না আমরা দেখেছি তান্ত্রিক সাধনার ক্রম অনুসারে আদিতে পশুভাবের সাধনা নির্দিষ্ট হয়েছে।

গুরুণা যদ্যদাদিষ্টং তৎ সর্বং যত্নতশ্চরেৎ। যজ্ঞাতকুসুমং চৈব হেতুদ্রব্যং তথৈব চ।
এতৎ স্পৃষ্ট্বা ত্রিরাত্রঞ্চ পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি। রক্তবস্ত্রং ন গৃহ্নীয়াদ্বৈষ্ণবীভক্তিপরায়ণঃ।
বিষ্ণুতন্ত্রোক্ত-কর্মাদি তদনুষ্ঠানমেবচ। কার্যং বীরকথালাপং ন কুর্যাৎ বীরবন্দিতে।
নিত্যশ্রাদ্ধং গবাং গ্রাসং সন্ধ্যাবন্দনমেবচ। তীর্থস্নানং পীঠদেশে গমনং বর্জয়েৎপশুঃ।—কৌ নি ১১।১৩১-৪২

১ পঞ্চতত্ত্বং ন গৃহ্নাতি তত্র নিন্দাং করোতি ন। শিবেন গদিতং যত্তু তৎ সত্যমিতিভাবয়ন্।
নিন্দায়াং পাতকং বেত্তি পাশবঃ স প্রকীর্তিতঃ। হবিষ্যং ভক্ষয়েন্নিত্যং তাম্বূলং ন স্পৃশেদপি।
ঋতুস্নাতাং বিনা নারীং কামভাবে নহি স্পৃশেৎ। পরস্ত্রিয়ং কামভাবো দৃষ্ট্বা সঙ্গং সমুৎসৃজেৎ।
মৎস্যাদ্যেমৎস্যমাংসানি পাশবো নিত্যমেব চ। গন্ধমাল্যাদি বস্ত্রাণি চৌরাণি প্রত্যজেৎ চ।
দেবালয়ে সদা তিষ্ঠেদাহারার্থং গৃহং ব্রজেৎ। কন্যাপুত্রাদিবাৎসল্যং কুর্যান্নিত্যং সদাকুলঃ।
ঐশ্বর্যং প্রার্থয়েন্নৈব যদ্যস্তি তত্তু ন ত্যজেৎ। সদা দানং সদাকুর্যাৎ যদি সন্তি ধনানি চ।
কার্পদ্রোহান্ ক্ষিপেৎ সর্বানহংকারাদিকাংস্তথা। বিশেষেণ মহাদেবি ক্রোধং সংবর্জয়েদপি।

—কামা ত, পঃ ৪

২ পশুভাবঃ কলৌ নাস্তি দিব্যভাবোঽপি দুর্লভঃ।
বীরসাধনকর্মাণি প্রত্যক্ষাণি কলৌ যুগে।—মহা ত ৪।১৯

তা ছাড়া প্রাণতোষণীতে মহানির্বাণতন্ত্রেরই একটি বচন উদ্ধৃত করা হয়েছে। তাতে আছে—দিব্যভাব এবং বীরভাব কলিতে নেই। এ যুগে শুধু পশুভাবে মানুষের মন্ত্রসিদ্ধি হবে।[১] সম্পূর্ণ মহানির্বাণতন্ত্র ছাপা হয় নি। প্রাণতোষণীতে অপ্রকাশিত অংশ থেকেই বচন উদ্ধৃত হয়েছে মনে হয়। কেন না প্রকাশিত মহানির্বাণতন্ত্রে এই বচনটি নাই। কিন্তু তবু একই তন্ত্রে পরস্পরবিরোধী বচন কি করে থাকে এই প্রশ্ন থেকে যায়। প্রাণতোষণীতে উদ্ধৃত বচনের প্রসঙ্গ না জানায় সঠিক উত্তর দেওয়া সম্ভবপর নয়। তবে মনে হয় দুই দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য দুরকম উক্তি করা হয়েছে। শুদ্ধ বেদাচারাদি কলিযুগে সম্ভব নয় বলে পশুভাবের সাধনা নিষেধ করা হয়েছে। আবার যখন বিবেচনা করা হয়েছে বীর বা দিব্য ভাবের সাধক এ যুগে দুর্লভ তখন এই দিক্ দিয়ে বিচার করে বলা হয়েছে কলিতে দিব্যভাব এবং বীরভাব নেই, পশুভাবেই মন্ত্রসিদ্ধি হবে।

কালীবিলাসতন্ত্রের মতেও কলিকালে দিব্যভাব এবং বীরভাব নাই; পশুভাবই প্রশস্ত; এই পশুভাবেই সাধক সিদ্ধিলাভ করবেন।[২]

উক্ত তন্ত্র অনুসারে সত্যত্রেতা পর্যন্ত দিব্যভাব এবং ত্রেতাদ্বাপর পর্যন্ত বীরভাব বিহিত।[৩]

পশুর প্রকারভেদ— পশুর প্রকারভেদ আছে। সাধারণভাবে দুটি ভেদ করা হয় সভাব পশু আর বিভাব পশু।[৪] যখন পশুর মনে উচ্চ ভাবের ছায়া পড়ে কিন্তু জ্ঞানের আবির্ভাব হয় না তখন পশুকে সভাব পশু বলা হয়। আর যখন ঐ ছায়া ঘনীভূত হয়ে উঠে তখন সেই অবস্থায় পশুকে বিভাব পশু বলা হয়।[৫]

নিরুত্তরতন্ত্রে দীক্ষিত-অদীক্ষিত-ভেদে পশুর দুইভাগ করা হয়েছে। দীক্ষিতকে বলা হয়েছে পশু আর অদীক্ষিতকে মহাপশু।[৬]

১ দিব্যবীরময়ো ভাবঃ কলৌ নাস্তি কদাচন।
কেবলং পশুভাবেন মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেন্নৃণাম্।—দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৭, পরিঃ ২, ব সং, পৃঃ ৫০৭

২ দিব্যবীরমতং নাস্তি কলিকালে সুলোচনে।
কলৌ পশুমতং শস্তং ততঃ সিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ।—কালীবিলাসতন্ত্র ৬।২১

৩ সত্যত্রেতাদ্বিপর্যন্তং দিব্যভাববিনির্ণয়ঃ।
স ভাবঃ পরমেশানি মকারাদ্যেষু সর্বতঃ।
ত্রেতাদ্বাপরপর্যন্তং বীরভাব ইতীরিতঃ।—ঐ ৬।১০-১১

৪ সভাবশ্চ বিভাবশ্চ পশুর্দ্বেধা ব্যবস্থিতঃ।—কৌ নি ১১।১৮৭

৫ অটলবিহারী ঘোষ-রচিত ভাব ও আচার, ক প অ, পৃঃ ৪২৭

৬ স এব দ্বিবিধো দেবি দীক্ষিতোঽদীক্ষিতঃ পশুঃ।
দীক্ষিতো হি ভবেৎ পূর্বোঽদীক্ষিতো হি মহাপশুঃ।—নিরু ত পঃ ১২

আবার পশুর উত্তম, মধ্যম এবং অধম এই তিন প্রকার ভেদও করা হয়েছে। রুদ্রযামলে বলা হয়েছে—যে-পশু সাধক দুর্গাপূজা এবং শিবপূজা অবশ্যই করেন তিনি উত্তম পশু। যিনি শুধু শিবপূজা করেন তিনি মধ্যম আর শিবাসহ শিবপূজা করলে উত্তম বলে গণ্য হন। ধীর বৈষ্ণব সাধক মধ্যম পশু। আর যারা ভূতসমূহের এবং দেবতাসমূহের সর্বদা সেবা করে তারা অধম পশু, তারা নরকস্থ এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।[১]

উত্তম ও অধম পশুর ভেদ অন্যভাবেও নির্ণয় করা হয়। কৌলমার্গরহস্যে বলা হয়েছে— পশু দ্বিবিধ। যে-মানব সংসার মোহে আচ্ছন্ন, যে-কোনো প্রকারে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকেই পরম পুরুষার্থ মনে করে, ধর্মাধর্ম বা পরমার্থতত্ত্বের ধারেও যায় না, সে অধম পশু। যে-মানব শাস্ত্রে বিশ্বাসসম্পন্ন, সৎকর্মপরায়ণ, ভগবদ্ভক্ত এবং পরমার্থতত্ত্বান্বেষী সে উত্তম পশু।[২]

কুব্জিকাতন্ত্রে অধম পশুর লক্ষণ নির্দেশ করা হয়েছে এইভাবে—যার বলিদানে সংশয়, তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধেও সর্বদা সংশয়, যে মন্ত্রকে অক্ষর মনে করে, গুরুর প্রতি যার সর্বদা অবিশ্বাস, প্রতিমাকে যে শিলা মনে করে, দেবতায় দেবতায় যার ভেদবুদ্ধি, নিরামিষ দিয়ে যে দেবতার পূজা করে, অজ্ঞানের জন্য যে সর্বদা অস্নাত, প্রত্যহ যে দেহতাড়না করে এবং যে সকলের নিন্দা করে বেড়ায়, সে পশুর মধ্যে অধম।[৩]

পশু থেকে বীর—রুদ্রযামলে পাওয়া যায় পশুভাবে জ্ঞানী হয়ে তার পর বীরভাবের আচার অবলম্বন করতে হয়। সাধক বীরাচার অবলম্বন করেই রুদ্র হন, অন্যপ্রকারে কিছুতেই নয়।[৪]

বীরশব্দের ব্যাখ্যা—কুলার্ণবতন্ত্রে বীরের ব্যাখ্যা করা হয়েছে এইভাবে[৫]—রাগ মদ

১ দুর্গাপূজাং শিবপূজাং যঃ করোতি পশূত্তমঃ। অবশ্যং হি যঃ করোতি স পশূত্তমঃ স্মৃতঃ।
কেবলং শিবপূজাংচ করোতি যদি সাধকঃ। পশূনাং মধ্যমঃ শ্রীমান্ শিবয়া সহ চোত্তমঃ।
কেবলং বৈষ্ণবো ধীরঃ পশূনাং মধ্যমঃ স্মৃতঃ। ভূতানাং দেবতানাং চ সেবাং কুর্বন্তি সর্বদা।
পশূনাম্ অধমাঃ প্রোক্তাঃ নরকস্থা ন সংশয়ঃ।—রু যা, উ ত, পৃঃ ৬   ২ কৌ র, পৃঃ ৯

৩ সংশয়ো বলিদানে চ তন্ত্রে চ সংশয়ঃ সদা। মন্ত্রে চাক্ষরবুদ্ধিশ্চ অবিশ্বাসো গুরৌ সদা।
প্রতিমাসু শিলাবুদ্ধির্ভেদকো দৈবতে পুনঃ। নিরামিষেণ যেষেশি দেবতায়াঃ প্রপূজনম্।
অজ্ঞানেন সদাঽস্নানং প্রত্যহং দেহতাড়নম্। সর্বেষামেব নিন্দাঞ্চ যঃ কুর্যাচ্চ বরেশ্বরি।
স এব পশুভাবেন অধমঃ পরিকীর্তিতঃ।—কুব্জিকাতন্ত্রম্, রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৭, পটল ১, ব সং, পৃঃ ৪৮৮

৪ জ্ঞানী ভূত্বা পশোর্ভাবে বীরাচারং ততঃ পরম্।
বীরাচারাদ্ ভবেদ্রুদ্রোঽন্যথা নৈব চ নৈব চ।—রু যা, উ ত, ১১।৩৭-৩৮

৫ বীতরাগমদক্লেশকোপমাৎসর্যমোহতঃ।
রজস্তমোবিদূরত্বাদ্বীর ইত্যভিধীয়তে।—কু ত, পৃঃ ১৭

ক্লেশ কোপ মাৎসর্য এবং মোহ্ বীত অর্থাৎ অপগত হওয়ার জন্য এবং রজঃ ও তমঃ বিদূরিত হওয়ার জন্য সাধককে বীর বলা হয়। মূল সংস্কৃত শ্লোকের প্রথমার্ধের আরম্ভে আছে বীত-শব্দ এবং দ্বিতীয়ার্ধের আরম্ভে রজঃ। বীতশব্দের বী আর রজঃ শব্দের র নিয়ে বীরশব্দ গঠন করা হয়েছে।

তান্ত্রিক সাধনার ক্ষেত্রে বীরশব্দটি পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। বীর অর্থ বীরভাবাশ্রিত সাধক। তবে বীরশব্দের প্রচলিত অর্থও বীর সাধক-সম্পর্কে প্রযোজ্য। কৌলমার্গরহস্যে বলা হয়েছে—"যে মানব অদ্বৈতজ্ঞানরূপ অমৃতহ্রদের কণিকামাত্র আস্বাদন পাইয়া, বীরের মত অবিদ্যারজ্জুচ্ছেদনে কৃতপ্রযত্ন হইয়া অমৃতহ্রদের সন্ধানে ধাবিত হইতে চায়, তাহার নাম বীর"।[১]

তা ছাড়া বীরভাবের সাধনার মধ্যে চিতাসাধনা, শবসাধনা প্রভৃতি যে-সব সাধনা আছে অত্যন্ত সাহসী এবং বলশালী ব্যক্তি ব্যতীত অন্যের পক্ষে সে-সব সাধনা সম্ভবপরই নয়। এইজন্যও এই-সব সাধনায় প্রবৃত্ত সাধকদের বীর বলা হয়।

অদ্বৈতভাবের সাধক— বীর সাধক অদ্বৈতভাবের সাধক।[২] পরশুরামকল্পসূত্রের বৃত্তিতে একটি তন্ত্রবচন উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে আছে[৩]—"যিনি প্রতিযোগী 'ইদং' পদার্থকে 'অহং' পদার্থে বিলীন করিতে পারিয়াছেন, যাঁহার চিত্ত স্বাত্মানন্দে নিমগ্ন, তাঁহার নাম বীর।"

এই সূত্রের এবং বৃত্তির তাৎপর্য আলোচনা-প্রসঙ্গে কৌলমার্গরহস্যে বলা হয়েছে—"'অহং' ইহার অর্থ আত্মা বা আমি। 'ইদং' ইহার অর্থ 'অহং' পদার্থের প্রতিযোগী অর্থাৎ 'আমি' পদার্থ ব্যতিরিক্ত সমগ্র জগৎ এবং জাগতিক পদার্থ। যে সাধক সাধনার দ্বারা অদ্বৈতভাব প্রাপ্ত হইয়া সমগ্র জগৎ এবং জাগতিক পদার্থকে 'অহং' অর্থাৎ আমি বলিয়া মনে করিতে পারেন, তাঁহার নিকট 'অহং' হইতে ভিন্ন আর কোন পদার্থের অস্তিত্ব থাকে না, কাজেই 'ইদং' বা জগৎ 'অহং' পদার্থে বিলীন হইয়া যায়। এই প্রকার বীর সাধক 'অহং' পদার্থকে কেবল নিজের দেহমধ্যে সঙ্কীর্ণভাবে আবদ্ধ না রাখিয়া সমস্ত বিশ্বে ছড়াইয়া দেন।"[৪]

লক্ষণ ও আচার—বিভিন্ন তন্ত্রে বীরের লক্ষণ এবং আচার বর্ণিত হয়েছে। নির্বাণ-তন্ত্রের মতে অবধূতই বীরসাধক হবার অধিকারী। উক্ত তন্ত্রে দেখা যায় শিব দেবীকে বলছেন— দেবি! অবধূত কি রকম শোন। বীরের মূর্তি সর্বদা তপঃপরায়ণ। তার

১ কৌ র, পৃঃ ৯ ২ বীরভাবে মন্ত্রসিদ্ধিরদ্বৈতাচারলক্ষণম্।—রু যা, উ ত, ১।১৩৬

৩ অহমি প্রলয়ং কুর্বন্ ইদমঃ প্রতিযোগিনঃ।
স বীর ইতি বিজ্ঞেয়ঃ স্বাত্মানন্দনিমগ্নধীঃ।—দ্রঃ প ক সূ ৬।৩৯-এর বৃত্তি

৪ কৌ র, পৃঃ ২০৫, পাদটীকা

আলম্বিত কেশজাল অসংস্কৃত। অস্থিমালা অথবা রুদ্রাক্ষমালা সে ধারণ করবে। বীরেন্দ্র দিগম্বর বা কৌপীনধারী হবে। সে অঙ্গে ভস্ম এবং রক্তচন্দন মাখবে। সর্বদা ক্ষমাশীল হবে। দান, ধ্যান, তপস্যা করবে; বালভাবে অবস্থান করবে। আমি শিব, ভৈরবানন্দ, সমুণ্ড, কুলনায়ক—এমনি ভাবপর হয়ে সর্বদা হেতুদ্রব্য সেবন করবে, সম্বিদা এবং কারণবারি সেবন করবে। এহেন সাধক সাক্ষাৎ শম্ভুস্বরূপ সন্দেহ নাই। অবধূত ব্রাহ্মণ হলে বীরভাবে নির্বাণমুক্তি, ক্ষত্রিয় হলে সাযুজ্য, বৈশ্য হলে স্বারূপ্য এবং শূদ্র হলে সালোক্যমুক্তি লাভ করবে।[১]

আরও বলছেন—যে নানা শাস্ত্রে বিজ্ঞ, নানা কর্মে বিশারদ, অবলাকে যে সর্বদা ইষ্টদেবীর মতো মনে করে, সেই জিতেন্দ্রিয় মহাজ্ঞানী সাধকই ভারতবর্ষে বীরসাধক বলে খ্যাত। বীর সর্বদা ঊর্ধ্ববাহু, মুক্তকেশ এবং দিগম্বর। সর্বত্র তার সমভাব, সে নরোত্তম। নানা দেশে, পীঠস্থানে, তীর্থক্ষেত্রে সে সর্বদা ভ্রমণ করে বেড়ায়, যত্নসহকারে দেবতা ও শ্রীগুরুর পূজাধ্যান করে। বীরসাধক অন্তর্যাগনিষ্ঠ।[২]

কামাখ্যাতন্ত্রে বলা হয়েছে[৩]—বীর সাধক নির্ভয়, অভয়দানকারী, গুরুভক্তিপরায়ণ, বাচাল, বলবান্, শুদ্ধ, পঞ্চতত্ত্বানুরক্ত, মহাযোগী, মহোৎসাহী, মহাবুদ্ধি, মহাসাহসী, মহাশয়, সর্বদা সাধুদের পালনে রত। বীর তমোময়,[৪] বিনয়ে সর্বদা মহোৎসুক। এমনি বহুগুণযুক্ত বীর স্বয়ংরুদ্রস্বরূপ।

১ শৃণু দেবি! প্রবক্ষ্যামি অবধূত যথা ভবেৎ। বীরস্তু মূর্তিং জানীয়াৎ সদা তপঃপরায়ণঃ।
অসংস্কৃতকেশজালমুক্তালম্বিতমূর্দ্ধজঃ। অস্থিমালাবিভূষশ্চ রুদ্রাক্ষান্ বাপি ধারয়েৎ।
দিগম্বরো বীরেন্দ্রশ্চ অথবা কৌপীনী ভবেৎ। রক্তচন্দনদিগ্ধাঙ্গঃ কুর্যাৎ ভস্মবিভূষণম্।
ক্ষমাদানং তপোধ্যানং বালভাবেন শৈলজে। শিবোঽহং ভৈরবানন্দঃ সমুণ্ডঃ কুলনায়কঃ।
এবং ভাবপরো মন্ত্রী হেতুযুক্তঃ সদা ভবেৎ। সম্বিদাসেবনং কুর্যাৎ সদা কারণসেবনম্।
ভবেৎ সাক্ষাৎ স পুরুষঃ শম্ভুরূপো ন সংশয়ঃ। নির্বাণমুক্তিমাপ্নোতি ব্রাহ্মণো বীরভাবতঃ।
অবধূতঃ ক্ষত্রিয়শ্চ সহযোগী ন সংশয়ঃ। স্বরূপোঽপি ভবেৎ বৈশ্যঃ শূদ্রোঽপি সহলোকবান্।
—নি ত, পঃ ১৪

২ নানাশাস্ত্রেষু যো বিজ্ঞো নানাকর্মবিশারদঃ। সদেষ্টদেবীভাবেন ভাবয়েৎ যো হি চাবলাম্।
স এব ভারতে বীরো মহাজ্ঞানী জিতেন্দ্রিয়ঃ। ঊর্দ্ধবাহুঃ সদা বীরো মুক্তকেশো দিগম্বরঃ।
সর্বত্র সমভাবো যঃ স চ নরোত্তমো ভবেৎ। নানাদেশেষু পীঠেষু ক্ষেত্রেষু তীর্থভূমিষু।
ভ্রমণং কুরুতে নিত্যং কুর্যাৎ যত্নেন পূজনম্। দেবতায়াঃ সদা ধ্যানং শ্রীগুরোঃ পূজনং তথা।
অন্তর্যাগেষু যো নিষ্ঠঃ স বীরঃ পরিকীর্তিতঃ।—ঐ

৩ নির্ভয়োঽভয়দো বীরো গুরুভক্তিপরায়ণঃ। বাচালো বলবান্ শুদ্ধঃ পঞ্চতত্ত্বে সদা রতিঃ।
মহোৎসাহো মহাবুদ্ধির্মহাসাহসিকোঽপি চ। মহাশয়ঃ সদা দেবি সাধূনাং পালনে রতঃ।
তমোময়ঃ সদা বীরো বিনয়েন মহোৎসুকঃ। এবং বহুগুণৈর্যুক্তো বীরো রুদ্রঃ স্বয়ং প্রিয়ে।—কামা ত, পঃ ৪

৪ তমোময় কথাটি নিন্দা অর্থে ব্যবহৃত হয় নি। স্বয়ং শিব তমোভাবস্থিত। "তমোভাবস্থিতঃ শম্ভুর্যোগীশঃ পরমেশ্বরঃ।"—নিত্যাতন্ত্রবচন, প্রাঃ প্রা তো, কাণ্ড, ৭, পরিঃ ১, ব সং, পৃঃ ৬০২

নিরুত্তরতন্ত্রের মতে বীর সাধক নির্দ্বন্দ্ব, নিরহংকার, নির্লোভ, শুচি। তিনি গুরু ও দেবতার প্রতি অনুরক্ত, শান্ত, ঘৃণালজ্জাবিবর্জিত। তাঁর অঙ্গ রক্তচন্দনলিপ্ত, তিনি রক্তকৌপীনধারী। উদারচিত্ত বীর সাধক সর্বত্র বৈষ্ণবাচারতৎপর। কিন্তু তাঁর গুহ্য সাধনা কুলাচারের। কুলমার্গে তিনি পণ্ডিত, কুলসঙ্কেতবেত্তা এবং কুলশাস্ত্রবিশারদ। এই সাধক মহাবলশালী, মহাবুদ্ধি, মহাসাহসিক ও শুচি। তিনি নিত্যকর্মনিষ্ঠ এবং দম্ভ- ও হিংসা-শূন্য। পরনিন্দা তিনি সহ্য করতে পারেন না এবং সর্বদা পরোপকারে রত থাকেন।[১]

বীর সাধক যোগী। রুদ্র যামলে বলা হয়েছে বীরভাবের সাধককে যোগাশ্রয় করতে হবে, তাঁকে যোগী হতে হবে।[২]

প্রকারভেদ : সভাব ও বিভাব—বীরের প্রকারভেদ আছে। পশুর মতো বীরেরও সভাব ও বিভাব এই দুই ভাগ করা হয়। সভাব বীর সত্ত্বপ্রধান, বিভাব বীর রজঃপ্রধান। সাধনবলে যাঁর অন্তরে তন্ত্রের অর্থ প্রকট হয়েছে, যিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছেন এবং যাঁর বিষয়বাসনা ক্ষীণ হয়ে গেলেও ভোগবাসনা সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হয় নি, তিনিই সভাব বীর। আর সাধনার দ্বারা যিনি পশুভাব অতিক্রম করেছেন কিন্তু সভাব বীরের মতো জ্ঞান লাভ করতে পারেন নি, তিনি বিভাব বীর। সর্বোল্লাস, রুদ্রযামল প্রভৃতি গ্রন্থে এই দুই রকমের বীরের কর্তব্যাকর্তব্য বিস্তৃতভাবে বিবৃত হয়েছে।[৩]

শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে পাঁচ প্রকারের বীরের উল্লেখ আছে। যথা—শ্রীচক্র-বীর, ঊর্মিলা-বীর, চূড়াচক্র-বীর, পুষ্পচক্র-বীর, এবং জীবচক্র-বীর। জীবচক্রে ভাবযোগ, পুষ্পচক্রে ক্রিয়াযোগ, শ্রীচক্রে জ্ঞানযোগ, ঊর্মিলায় লয়যোগ এবং চূড়াচক্রেও লয়যোগ বিহিত।[৪] বোঝা যাচ্ছে সাধনার ভেদ অনুসারে এই ভেদ করা হয়েছে।

---

১ নির্দ্বন্দ্বো নিরহংকারো নির্লোভো নির্ভয়ঃ শুচিঃ। গুরুদেবরতঃ শান্তো ঘৃণালজ্জাবিবর্জিতঃ।
রক্তচন্দনলিপ্তাঙ্গো রক্তকৌপীনভূষণঃ। উদারচিত্তঃ সর্বত্র বৈষ্ণবাচারতৎপরঃ।
কুলাচাররতো বীরঃ পণ্ডিতঃ কুলবর্ত্মনি। কুলসংকেতসংবেত্তা কুলশাস্ত্রবিশারদঃ।
মহাবলো মহাবুদ্ধির্মহাসাহসিকঃ শুচিঃ। নিত্যকর্মণি নিষ্ঠা[কা]তোদম্ভহিংসাবিবর্জিতঃ।
পরনিন্দাসহিষ্ণুশ্চ পরোপকাররতঃ সদা।—নিরু ত, পঃ ১১

২ বীরভাবং সমাশ্রিত্য সর্বদা যোগমাশ্রয়েৎ।
…বীরো যোগী ভবেদ্ ধ্রুবম্।—রু যা, উ ত, ৫১।২০-২১

৩ ভাব ও আচার, ক শ অ, পৃঃ ৪২৭

৪ পঞ্চধা বীর ইত্যুক্তস্তদ্ভেদং শৃণু পার্বতি। শ্রীচক্রবীরো দেবেশি ঊর্মিলাখ্যো দ্বিতীয়কঃ।
চূড়াচক্রং তৃতীয়ং স্যাৎ পুষ্পচক্রং চতুর্থকম্। জীবচক্রং পঞ্চমং স্যাৎ পঞ্চভেদাঃ প্রকীর্তিতাঃ।
ভাবযোগো জীবচক্রে পুষ্পচক্রে ক্রিয়াত্মিকঃ। শ্রীচক্রে জ্ঞানযোগস্তু লয়যোগস্তু [ঊর্মিলে]।
চূড়াচক্রে রাজযোগো কিমন্যৎ শ্রোতুমিচ্ছসি।—শ স ত, ম খ, ১।১৯৭-২০০

বামী ও কৌলিক— কুলরত্নাবলীতে দিব্যসাধক এবং বীরসাধক প্রত্যেকের বামী অর্থাৎ বামাচারী এবং কৌলিক অর্থাৎ কুলাচারী এই দুই শ্রেণী নির্দেশ করা হয়েছে।[১]

অন্য প্রকারভেদ— অদ্বৈতবেদান্তী সন্ন্যাসীদের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ[২] অনুসারে তীর্থ, আশ্রম, বন, আনন্দ, গিরি, পর্বত, সাগর, সরস্বতী, ভারতী এবং পুরী উপাধি দিয়ে দশ সম্প্রদায়ে ভাগ করা হয়েছে। এঁদের বলা হয় দশনামী সম্প্রদায়। নির্বাণতন্ত্রে বিশেষ বিশেষ লক্ষণ অনুসারে বীর সাধক বা বীরভাবাশ্রিত অবধূতকেও বন, অরণ্য, ভারতী, গিরি এবং পুরি (পুরী) বলা হয়েছে। যিনি তপস্যার দ্বারা মন্ত্রদান করেন তাঁকে বলা হয় বন। যিনি স্রস্তকেশ, জটাজূটধারী, সর্বদা বাতুলের মতো থাকেন, যিনি অন্তর্যোগী মহাবীর, তিনি অরণ্য। যিনি নানা শাস্ত্রে বিজ্ঞ, নানাকর্মবিশারদ, যিনি অবলাকে আপন ইষ্টদেবী ভাবেন, সেই মহাজ্ঞানী জিতেন্দ্রিয় বীরই ভারতী। যিনি সর্বদা ঊর্ধ্ববাহু মুক্তকেশ দিগম্বর, যে নরোত্তম সর্বত্র সমভাবাপন্ন, যাঁর কাছে ইষ্টদেবী ভিন্ন আর কিছু নাই, তাঁকে বলা হয় গিরি। নানা দেশে পীঠস্থানে তীর্থক্ষেত্রে যিনি নিয়ত ভ্রমণ করেন, নিত্য দেবতা ও গুরুর পূজাধ্যান যত্নসহকারে করেন, যিনি অন্তর্যাগবিশিষ্ট, সেই বীর সাধকই পুরি।[৩]

অদ্বৈতবেদান্তী সন্ন্যাসী এবং অদ্বৈতভাবের বীর সাধক বা অবধূতের মধ্যে বস্তুতঃ যে কোনো ভেদ নেই নির্বাণতন্ত্রের উক্ত বর্ণনা থেকে তা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

বীরের সাধনা শীঘ্রফলদায়ী—তন্ত্রশাস্ত্রে বীর সাধকের বিবিধ সাধনা নির্দিষ্ট হয়েছে। বীরের সাধনামাত্রই শীঘ্র ফলপ্রদ। শক্তি সঙ্গমতন্ত্রে ত এমন কথাও বলা হয়েছে যে বীর-সাধনমার্গে কালী, তারা ও ছিন্নমস্তার সাধনায় রাত্রির এক যামেই সিদ্ধিলাভ করা যায়।[৪]

১ দিব্যবীরৌ স্বরেশানি শক্তিসেবাপরায়ণৌ।
বামিকৌলিকভেদাভ্যাং প্রত্যেকং দ্বিবিধৌ স্মৃতৌ।—দ্রঃ পু চ, তঃ ৯ পৃঃ ৮৬৩

২ দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৭, পরিঃ ১, ব সং পৃঃ ৪৯৫

৩ যো মন্ত্রদানং তপসা স বনঃ পরিকীর্তিতঃ। স্রস্তকেশো জটাজূটঃ সদা বাতুলবত্তথেৎ।
অন্তর্যোগী মহাবীরোঽরণ্যসংজ্ঞক শৈলজে। নানাশাস্ত্রেষু যো বিজ্ঞো নানাকর্মবিশারদঃ।
সদেষ্টদেবীভাবেন ভাবয়েদ্ যো হি চাবলাম্। স এব ভারতী বীরো মহাজ্ঞানী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সদোর্দ্ধবাহুর্বে বীরো মুক্তকেশো দিগম্বরঃ। সর্বত্র সমভাবেন ভাবয়েদ্ যো নরোত্তমঃ।
ইষ্টদেবীং বিনা নাস্তি স গিরিঃ পরিকীর্তিতঃ। নানাদেশেষু পীঠেষু ক্ষেত্রেষু তীর্থভূমিষু।
ভ্রমণং কুরুতে নিত্যং কুর্যাৎ যত্নেন পূজনম্। দেবতায়াঃ সদা ধ্যানং গুরোঃ পূজনং তথা।
অন্তর্যাগেষু যো নিষ্ঠঃ স বীরঃ পুরিরেব চ।—দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৭ পরিঃ ১, ব সং, পৃঃ ৪৯৮

৪ কালী তারা ছিন্নমস্তা বীরসাধনমার্গতঃ।
যামমাত্রেণ সিধ্যন্তি নাত্র কার্যা বিচারণা। —শ স ত, তা খ, ৩৪।৮-৯

যোগিনীহৃদয়ে ঘোষণা করা হয়েছে—বীরসাধনা ছাড়া শীঘ্র সিদ্ধিকর আর কিছুই নাই। কাজেই সর্বপ্রযত্নে বীরসাধনা বিধেয়।[১]

এই ধরণের তন্ত্রবচন অনেক আছে। যেমন কৌলাবলীনির্ণয়ে পাওয়া যায়—বীরসাধনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং শীঘ্র সিদ্ধিদায়ক আর কিছু নাই। কলিযুগে বীরসাধনায় এক দিনরাত্রিতে সর্বসিদ্ধি লাভ হয়। দ্বাপরে সেই সিদ্ধি লাভ হত এক মাসে, ত্রেতায় এক বৎসরে এবং সত্যযুগে দশ বৎসরে।[২]

গুহ্য সাধনা—বীরের সাধনা সম্পর্কে আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। তন্ত্রশাস্ত্রমতে বীরের সাধনা গুহ্য সাধনা। এই সাধনার মন্ত্র যন্ত্র পূজা প্রভৃতি সব ব্যাপারেরই গূঢ় সঙ্কেত আছে। একমাত্র সদ্‌গুরুমুখেই এই-সব সঙ্কেতের অর্থ অবগত হওয়া যায়। সেইজন্য নিরুত্তরতন্ত্রে বলা হয়েছে—ক্রমসঙ্কেত পূজাসঙ্কেত মন্ত্রসঙ্কেত এবং মন্ত্র ও যন্ত্রের লিখন-সঙ্কেত গুরুপরম্পরায় জানতে হবে। যে-বীর সঙ্কেতজ্ঞ নয় তাকে চক্রে নিয়োগ করলে তার পূজা নিষ্ফল হবে এবং তার পদে পদে দুঃখ হবে। যে-বীর সঙ্কেতহীন এবং গুরুক্রম অনুসারে অভিষিক্ত নয়, সে কুলভ্রষ্ট, পাপিষ্ঠ, তাকে বীরচক্রে বর্জন করবে।[৩]

বীরের মহিমা—তন্ত্রে বীরসাধকের মহিমা বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন উৎপত্তিতন্ত্রে পাওয়া যায়—যেখানে বীর সাধক বা দিব্য সাধক বাস করেন সেখানে সমস্ত তীর্থ অবস্থান করে। যিনি বীর তিনি দেবতা, তিনি সাক্ষাৎ শিব সন্দেহ নাই। যেখানে বীরের বাস সেখানে কার ভয় থাকতে পারে? সেখানে অকালমরণ নাই, দুর্ভিক্ষভয় নাই, কখনো রাজপীড়নের ভয় নাই।[৪]

---

১ নান্যসিদ্ধিকরঃ শীঘ্রঃ বীরসাধনবর্জিতম্।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন বিধেয়া বীরসাধনা।—ত্র পু চ, তঃ ৭, পৃঃ ৬১২

২ নাস্মাৎ পরতরং কিঞ্চিৎ সত্বরং সিদ্ধিদায়কম্। সর্বসিদ্ধিভবত্যেব অহোরাত্রে কলৌ যুগে।
দ্বাপরে তচ্চ মাসেন ত্রেতায়াং হায়নেন তু।
কৃতে তু দশভির্বর্ষৈঃ সত্যং সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ।—কৌ নি ১৪।৭৮-৭৯

৩ ক্রমসঙ্কেতকৈব পূজাসঙ্কেতমেব চ। মন্ত্রসঙ্কেতকৈব যন্ত্রসঙ্কেতং তথা।
লিখনং মন্ত্রযন্ত্রাণাং সঙ্কেতং গুরুমার্গতঃ। সঙ্কেতজ্ঞং বিনা বীরং যদি চক্রে নিয়োজয়েৎ।
নিষ্ফলং পূজনং দেবি দুঃখং তস্য পদে পদে। সঙ্কেতহীনো যো বীরো নাভিষেকী গুরুক্রমাৎ।
কুলভ্রষ্টঃ স পাপিষ্ঠস্তং ত্যজেদ্ বীরচক্রকে।—নিরু ত, পঃ ১০

৪ যত্র বীরো বসেদ্দেবি দিব্যো বা পরমেশ্বরি। তত্র সর্বাণি তীর্থানি বসন্তি বীরসাধনে।
যো বীরঃ স শিবঃ সাক্ষাদেব এব ন সংশয়ঃ। যত্র বীরো বসেদ্দেবি তত্র কস্য ভয়ং ভবেৎ।
নাকালমরণং তত্র ন দুর্ভিক্ষভয়ং তথা। রাজপীড়াভয়ং দেবি তত্র নাস্তি কদাচন।
—প্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৭, পরিঃ ২, ব সং, পৃঃ ৫০৫-৫০৬

ভাবচূড়ামণিতন্ত্রে বলা হয়েছে—যে-দেশে বীর সাধক বা তাঁর বংশ বাস করেন সে-দেশে মারীভয় নাই, রাজভয়াদিও নাই। সে-দেশে সর্বদা সুমঙ্গল, লোকের ধনপুত্রাদির বৃদ্ধি হয়। সে-দেশে লক্ষ্মী সুস্থির হয়ে থাকেন।[১]

দিব্যভাব— বীরভাবের পর দিব্যভাব। বীরভাবের সাধনা ছাড়া দিব্যভাব লাভ করা যায় না। এইজন্য তন্ত্রের বিধান বীরভাবের ধর্মসাধনা করে তবে দিব্যভাবের ধর্মসাধনা করতে হবে।[২]

দিব্য সাধক—সাধনার বলে বীর সাধকই দিব্য সাধক হন। কৌলমার্গরহস্যের মতে বীরভাবের সাধক সাধনার দ্বারা দ্বৈতভাব অপসারিত করে দিব্যভাবে উন্নতিলাভ করেন। সাধনার দ্বারা অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করে উপাস্য দেবতার সত্তায় নিজের সত্তা ডুবিয়ে দিয়ে নির্মল আনন্দ অনুভব করেন।[৩]

দিব্য সাধক বিশ্বকে দেবতারূপ মনে করেন। তিনি সমস্ত জগৎকে স্ত্রীময় এবং পুরুষকে শিবরূপী মনে করেন। তিনি শিবশক্তির অভেদ ভাবনা করেন, তিনি দেবতাস্বভাব। দিব্য সাধক নিত্য স্নানাদি করেন, দানদক্ষিণা করেন, ত্রিসন্ধ্যা জপতপ করেন, নির্মল বস্ত্র পরিধান করেন। এই সাধকের বেদশাস্ত্র, গুরু, দেবতা ও মন্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান সুদৃঢ়। তিনি দেবপূজা, পিতৃতর্পণ, শ্রাদ্ধাদি নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়া করেন। তাঁর শত্রুমিত্রে সমভাব। তিনি অন্য কারো অন্ন গ্রহণ করেন না। শুধু গুরুর অন্ন সর্বসিদ্ধিলাভের জন্য ভোজন করেন। যা কদর্য যা নিষ্ঠুর তিনি তা বর্জন করেন। দেবতার নিন্দাকারীর সঙ্গে বাক্যালাপ করেন না; সর্বদা সত্যকথা বলেন, কখনও মিথ্যা কথা বলেন না। সর্বদা দিব্যভাবে পরমেশ্বরীর পূজা করেন। প্রত্যহ গুরুর আরাধনা করেন আর সব কিছুকেই দেবতাস্বরূপ, পরমেষ্ঠিস্বরূপ মনে করেন।[৪]

১ যদ্দেশে বিদ্যতে বীরপুংকুলং সাঽপি ভৈরব। ন চ মারীভয়ং তত্র ন চ রাজভয়াদিকম্।
সুমঙ্গলং সদা তত্র ধনপুত্রবিবর্ধনম্। লক্ষ্মীস্তত্র মহাদেব সুস্থিরা ভবতি ধ্রুবম্।—ভা., চূ ত, ছঃ ৯, পৃঃ ৮০

২ বীরাচারং বিনা নাথ দিব্যাচারং ন লভ্যতে।
ততো বীরাচারধর্মং কৃত্বা দিব্যং সমাচরেৎ।—ক শা, উ ত, ২৩।৫৮

৩ কৌ র, পৃঃ ৯

৪ বিশ্বঞ্চ দেবতারূপং ভাবয়েৎ সুরসুন্দরি। স্ত্রীময়ঞ্চ জগৎ সর্বং পুরুষং শিবরূপিণম্।
অভেদে চিন্তয়েৎ যস্তু স এব দেবতাত্মকঃ। নিত্যস্নানং নিত্যদানং ত্রিসন্ধ্যঞ্চ জপার্চনম্।
নির্মলং বসনং দেবি পরিধানং সমাচরেৎ। বেদশাস্ত্রে দৃঢ়জ্ঞানং গুরৌ দেবে তথৈব চ।
মন্ত্রে চৈব দৃঢ়জ্ঞানং পিতৃদেবার্চনং তথা। বলিবৈশ্বং তথা শ্রাদ্ধং নিত্যকার্যং প্রচিন্তিতে।
শত্রুং মিত্রং সমং দেবি চিন্তয়েচ্চ মহেশ্বরি। অন্যস্যৈব মহেশানি সর্বেষাং পরিবর্জয়েৎ।
গুরোরন্নং মহেশানি ভোক্তব্যং সর্বসিদ্ধয়ে। কদর্যঞ্চ মহেশানি নিষ্ঠুরং পরিবর্জয়েৎ।

নানা তন্ত্রে দিব্য সাধকের লক্ষণাদি বর্ণিত হয়েছে। যেমন কামাখ্যাতন্ত্রে শিব বলছেন—দিব্য সাধক সকলের মনোহরণ করে। সে মিতবাদী, স্থিরাসন। এই সাধক গভীরের মানুষ, স্নিগ্ধবক্তা। সে একসঙ্গে বহুবিষয়ে মনঃসংযোগ করতে পারে এবং সর্বদা সুখী। সে সর্বত্র নির্ভয়, শুধু গুরুর চরণসমীপে ভীরু। সে সর্বদর্শী, সর্ববক্তা এবং সকল দুষ্টের দমনকারী। বেশী কথা বলে কি হবে সর্বগুণান্বিত দিব্য সাধক স্বয়ং আমি।[১]

মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে—দিব্য সাধক দেবতুল্য, সদা শুদ্ধচিত্ত, দ্বন্দ্বাতীত অর্থাৎ সুখদুঃখ-শীতোষ্ণাদির অতীত, আসক্তিশূন্য, সর্বভূতের প্রতি তাঁর রাগদ্বেষশূন্য-সমভাব। তিনি ক্ষমাশীল।[২]

প্রকারভেদ— রুদ্রযামলে অধম, মধ্যম ও উত্তম এই ত্রিবিধ দিব্য সাধকের উল্লেখ আছে। যাঁদের দিব্যভাব বেদোদ্ভব অর্থাৎ বেদাদি অধ্যয়নের দ্বারা যাঁদের চিত্তে দিব্যভাবের উদয় হয়েছে তাঁরা অধম। যাঁদের দিব্যভাব আগমোদ্ভব অর্থাৎ আগমশাস্ত্রের অধ্যয়নাদির দ্বারা লব্ধ তাঁরা মধ্যম। আর যাঁদের দিব্যভাব বিবেকোদ্ভব অর্থাৎ সাধনার দ্বারা যাঁদের বিবেক উৎপন্ন হয়েছে এবং তার থেকে দিব্যভাবের উদয় হয়েছে তাঁরা উত্তম।[৩]

শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে আদিদিব্য ও উপদিব্য এই দুই শ্রেণীর দিব্যের উল্লেখ আছে।[৪] কিন্তু এঁদের আর কোনো বিবরণ দেওয়া হয় নি। কাজেই এঁদের কোনো পরিচয় জানা যায় না।

দিব্য সাধকের সাধনা—দিব্য এবং বীরের সাধনা একই। কৌলাবলীনির্ণয়ে বলা হয়েছে—বীরসাধন বীর সাধকের কর্তব্য, দিব্য সাধকেরও কর্তব্য কিন্তু পশুদের কর্তব্য নয়।[৫]

দেবতানিন্দকং দৃষ্ট্বা নালাপঞ্চ সমাচরেৎ। সত্যঞ্চ কথয়েদ্দেবি ন মিথ্যাঞ্চ কদাচন।
কেবলং দিব্যভাবেন পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্। গুরোরারাধনং দেবি প্রত্যহং চিন্তয়েৎ সুধীঃ।
সর্বঞ্চ দেবতারূপং পরমেষ্ঠিস্বরূপকম্।—কুব্জিকাতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৭, পরিঃ ১ ব সং, পৃঃ ৪৮৭

১ দিব্যঃ সর্বমনোহারী মিতবাদী স্থিরাসনঃ। গভীরঃ স্নিগ্ধবক্তা চ শতাবধানকঃ সুখী।
গুরুপাদাম্বুজে ভীরুঃ সর্বত্র ভয়বর্জিতঃ। সর্বদর্শী সর্ববক্তা সর্বদুষ্টনিবারকঃ।
সর্বগুণান্বিতো দিব্যঃ সোঽহং কিং বহুবাক্যতঃ।—কামা ত, পঃ ৪

২ দিব্যশ্চ দেবতাপ্রায়ঃ শুদ্ধান্তঃকরণঃ সদা। দ্বন্দ্বাতীতো বীতরাগঃ সর্বভূতসমঃ ক্ষমী।—মহা ত ১।৫৫

৩ ত্রিবিধং দিব্যভাবঞ্চ বেদাগমবিবেকজম্। বেদার্থমধমং প্রোক্তং মধ্যমঞ্চাগমোদ্ভবম্।
উত্তমং সকলং প্রোক্তং বিবেকোল্লাসসম্ভবম্।—রু যা, উ ত, পঃ ১১।৬-৭; জীবানন্দ বিদ্যাসাগর প্রকাশিত ও রসিকমোহন-প্রকাশিত রুদ্রযামল দুখানিতে 'বেদার্থমধমং প্রোক্তং' স্থলে 'বেদার্থমধ সংপ্রোক্তং' পাঠ আছে। কিন্তু আমাদের মনে হয় প্রসঙ্গবিচারে প্রাণতোষণীধৃত উদ্ধৃত পাঠই শুদ্ধ পাঠ।

৪ আদিদিব্যতুপদিব্যো দিব্যভেদদ্বয়ং শিবে।—শ স ত, সু খ, পঃ ১।১৯৬

৫ বীরসাধনকার্যঞ্চ কর্তব্যং বীরপুঙ্গবৈঃ। দিব্যৈরপি চ কর্তব্যং পশুভির্ন চ পার্বতি।—কৌ নি ১১।১১৫

দিব্যে বীরে বিশেষ ভেদ নাই—এইজন্য কোনো কোনো তন্ত্রে দিব্য ও বীরের বিশেষ ভেদ স্বীকার করা হয় না। যেমন পিচ্ছিলাতন্ত্রে আছে[১]—দিব্যে এবং বীরে তেমন ভেদ নেই। তবে কিঞ্চিৎ ভেদ আছে বটে, বীর মহোদ্ধত, দিব্য তা নয়, এই ভেদ।

কৌলাবলীনির্ণয়েও বলা হয়েছে—দিব্য ও বীর সাধকের মধ্যে ভেদ নেই, তবে কিছু ভেদ আছে, তা বলা হচ্ছে। দিব্য সাধক শান্ত, বিনীত, মধুর, কলালাবণ্যযুক্ত, দেবতুল্য আর বীর সাধক প্রায়ই উদ্ধতমানস।[২]

কালীবিলাসতন্ত্রের মতে কিন্তু দিব্য আর বীর সাধকের মধ্যে কোনো ভেদ নাই।[৩]

সাধকধর্ম বা সাধকের পালনীয় বিধিনিষেধ—এই-সব বিভিন্ন সাধকের পালনীয় নানা বিধিনিষেধ তন্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে এখানে কয়েকটি বিধিনিষেধের উল্লেখ করা গেল। এই-সবের পর্যালোচনা করলে শাস্ত্রনির্দিষ্ট যথার্থ শাক্ত সাধক সম্বন্ধে আমাদের ধারণা আরও স্পষ্ট হবে।

দেবীমন্ত্রের সাধক-সম্পর্কে গন্ধর্বতন্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—দম্ভ মোহ নিদ্রা আলস্য বাহ্যচিন্তা কাম ক্রোধ লোভ হিংসা ও মাৎসর্য বর্জন করে যত্ন সহকারে সাধকের দেবীমন্ত্রের সাধনা করতে হবে।[৪] এ-সম্পর্কে পূর্বেও আলোচনা করা গেছে।

শাক্ত সাধককে ষট্ 'প' বর্জন করতে হবে। পরনিন্দা পরদ্রোহ পরিবাদ পরস্ত্রী পরবিত্ত আর প্রতিগ্রহ এই ষট্ 'প'।[৫]

অন্যত্র বলা হয়েছে সাধক পরান্ন পরদ্রব্য প্রতিগ্রহ পরস্ত্রী পরনিন্দা এ-সবের চিন্তাও করবেন না। পরান্নের দ্বারা যাঁর জিহ্বা দগ্ধ হয়, তাঁর কি করে সিদ্ধিলাভ হবে।[৬]

পরমতসহিষ্ণুতা— ভারতীয় সনাতনধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এর পরমতসহিষ্ণুতা, অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে এর অসাধারণ উদারতা। তন্ত্রশাস্ত্রেও সেই উদারতার সুরটি স্পষ্টভাবে ধ্বনিত হয়েছে। সাধকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাঁরা যেন কখনো অন্য দেবতার নিন্দা

১ দিব্যে বীরে ন ভেদোঽস্তি ভেদো বীরো মহোদ্ধতঃ।—দ্র: প্রা তো, কাণ্ড ৭, পরি: ১, ব সং, পৃ: ৪৮৮

২ দিব্যে বীরে ন ভেদোঽস্তি যো ভেদঃ স তু কথ্যতে। শান্তো বিনীতো মধুরঃ কলালাবণ্যসংযুতঃ।
দিব্যশ্চ দেববৎ প্রায়ো বীরশ্চোদ্ধতমানসঃ।—কৌ নি ১১।১১৭-১৮

৩ যথা দিব্যস্তথা বীরো নাস্তি ভেদঃ শুচিস্মিতে।—কালীবিলাসতন্ত্র ৩।১২ ৪ দ্র: গ ত ২২।৮৯-৯০

৫ পরনিন্দা পরদ্রোহঃ পরিবাদো মহেশ্বরি। পরস্ত্রীপরবিত্তে চ ষষ্ঠশ্চৈব প্রতিগ্রহঃ।
বর্জয়েৎ সর্বযত্নেন সংখ্যামন্ত্রাঃ শক্তঃ ভবেৎ।—শ স ত, তা খ, ১৪।৬৯-৭০

৬ পরান্নং চ পরদ্রব্যং তথৈব তু প্রতিগ্রহম্। পরস্ত্রীং পরনিন্দাং চ মনসাপি বিবর্জয়েৎ।
জিহ্বা দগ্ধা পরান্নেন করৌ দগ্ধৌ প্রতিগ্রহাৎ। মনো দগ্ধং পরস্ত্রীভিঃ কথং সিদ্ধির্বরাননে।
—ঐ, তা খ, ৩।১০১-১০২

না করেন। এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই উপাধি- ও ভাব-ভেদে ভিন্ন হয়েছেন। যিনি একের পূজা করেন তিনি অন্য সকলেরও পূজা করেন।[১]

ভাস্কররায়ের শিষ্য উমানন্দনাথ তাঁর 'নিত্যোৎসব' নামক গ্রন্থে উপাসকধর্ম বা সাধকের পালনীয় বিধিনিষেধের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন—সাধক অন্য দর্শন বা ধর্মের নিন্দা করবেন না। নিজের উপাস্য ভিন্ন অন্য দেবতার সম্বন্ধে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ববুদ্ধি থাকবে না। শুধু সৎশিষ্যের নিকটেই সাধনরহস্য প্রকাশ করবেন। সর্বদা স্বীয় উপাস্য মন্ত্রের তত্ত্বানুসন্ধান করবেন। সর্বদা শিবোঽহং আমি শিব এই ভাবনা করবেন। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য অবৈধ হিংসা চৌর্য লোকের সঙ্গে বিরোধ স্ত্রীলোকের প্রতি বিদ্বেষ বিদ্বিষ্ট পদার্থ— এই-সব বর্জন করবেন। একমাত্র সর্বজ্ঞ গুরুর উপাসনা করবেন। গুরুবাক্য ও শাস্ত্রবাক্যে সর্বত্র সংশয় বর্জন করবেন। একমাত্র নিজের উপভোগবুদ্ধিতে ধনাদি উপার্জন করবেন না। ফলের অভিসন্ধি না করে কর্ম করবেন। নিজের বর্ণোচিত ও আশ্রমোচিত নিত্যকর্ম লোপ করবেন না। পঞ্চমকারের অভাব হলেও নিত্যপূজা করবেন। বৈধ কর্মের অনুষ্ঠানে সর্বত্র নির্ভয় হবেন।[২]

সম্প্রদায়—শাক্ত সাধকদের বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে। সৌভাগ্যসুধোদয়ে রামেশ্বর সম্প্রদায়শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন গুরুপরম্পরায় আগত আচারের অনুসরণের নাম সম্প্রদায়।[৩]

নিত্যোৎসবে উমানন্দনাথও অনুরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন একমাত্র স্বগুরুপরম্পরা-উপদেশে যে-ধর্ম লাভ করা যায় তাই সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় অনুসারে গুরু শাস্ত্র ও দেবতার প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় হলে সর্বসিদ্ধি লাভ হয়।[৪]

---

১ নান্যনিন্দা প্রকর্তব্যা কদাচিদপি সাধকৈঃ। একং ব্রহ্মৈবাদ্বিতীয়ং সর্বত্র কথিতং ময়া।
উপাধিভাবভেদেন নানাত্বং ভজতে সতি। একং পূজয়তে যস্তু সর্বানর্চয়তি স্ম (চ ?) সঃ।

—বরদাতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো. কাণ্ড ৫, পরিঃ ৬, ব সং, পৃঃ ৩৮৪

২ দর্শনান্তরাণামনিন্দনম্। স্বোপাস্যদেবতাবদন্যা কাপি মহত্ত্বভাবাভাবঃ। সচ্ছিষ্য এব রহস্যপ্রকাশনম্। সদা স্বোপাস্যমন্ত্রানুসন্ধানম্। সততং শিবোঽহমিতি ভাবনম্। কামক্রোধলোভমোহমদমাৎসর্যাণাম্ অবিহিতহিংসায়াশ্চৌর্যস্য জনবিরোধস্য স্ত্রিয়া বিদ্বেষস্য বিদ্বিষ্টস্য চ বর্জনম্। সর্বজ্ঞস্যৈকস্য গুরোঃ উপাস্তিঃ। গুরুবাক্যশাস্ত্রাদৌ সর্বত্রাসংশয়ঃ। স্বৈকোপভোগবুদ্ধ্যা ধনাদ্যনর্জনম্। ফলমনভিসন্ধায় কর্মাচরণম্। অলোপঃ স্ববর্ণাশ্রমোক্তানাং নিত্যানাং কর্মণাম্। মপঞ্চকস্যালাভেঽপি নিত্যসপর্যানিবর্তনম্। বৈধানুষ্ঠানে সর্বতো নির্ভয়তা।—নিত্যোৎসব, পৃঃ ৯

৩ সম্প্রদায়ঃ গুরুপরম্পরা-আচারানুসরণম্।—প ক সূ ১।৯-এর সৌভাগ্যসুধোদয়।

৪ স্বগুরুপরম্পরোপদেশৈকগম্যধর্মরূপেণ সম্প্রদায়েন গুরুশাস্ত্রদেবতাসু বিশ্বাসেন চ সর্বাঃ সিদ্ধয়ঃ।

নিত্যোৎসব, পৃঃ ৮

কিন্তু শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে অন্যরকম ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তাতে আছে সম্যক্ জ্ঞান প্রদান করে বলে সম্প্রদায়কে সম্প্রদায় বলা হয়।[১] অবশ্য এ ব্যাখ্যা পূর্বোক্ত ব্যাখ্যার বিরোধী নয়।

প্রধান সম্প্রদায়—শক্তিসঙ্গমাদি-তন্ত্রে তিনটি প্রধান সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। যথা কেরল, কাশ্মীর এবং গৌড়। বলা হয়েছে এই সম্প্রদায়ত্রয় সর্বসিদ্ধিপ্রবর্তক।[২]

আবার কোনো কোনো তন্ত্রের মতে প্রধান সম্প্রদায় চারটি। যেমন ষট্সম্ভবরহস্যে পূর্বোক্ত তিন সম্প্রদায় এবং বিলাস এই চার সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে। পূবে গৌড়, মধ্যে কেরল এবং পশ্চিমে কাশ্মীর এইভাবে সম্প্রদায়ের অঞ্চল নির্দেশ করা হয়েছে। বিলাস সম্প্রদায়ের কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চল নেই। সব অঞ্চলেই এই সম্প্রদায় পরিলক্ষিত হয়।[৩] সম্মোহনতন্ত্রে বলা হয়েছে বিলাস নামক সম্প্রদায় সর্বগ বলে পরিকীর্তিত।[৪]

শক্তিসঙ্গমতন্ত্রের মতে কেরল, কাশ্মীর এবং গৌড় এই তিন সম্প্রদায় ছাপ্পান্নটি দেশ জুড়ে রয়েছে। নেপাল থেকে আরম্ভ করে কলিঙ্গ পর্যন্ত অঞ্চলের আঠারটি দেশে গৌড়সম্প্রদায়; আর্যাবর্ত থেকে আরম্ভ করে সমুদ্র পর্যন্ত অঞ্চলের উনিশটি দেশে কেরলসম্প্রদায় আর অবশিষ্ট উনিশটি দেশে কাশ্মীরসম্প্রদায় কল্যাণকর।[৫]

কেরলাদির ভাগ—উক্ত তন্ত্র অনুসারে কেরলাদি তিন সম্প্রদায়ের প্রত্যেকটির শিব, শক্তি ও শিবশক্তি এই তিন ভাগ আছে। যেমন শিবকেরল, শক্তিকেরল ও শিবশক্তিকেরল। কাশ্মীর- ও গৌড়-সম্প্রদায়েরও এই একই রকম ভাগ। ইষ্টদেবতা অনুসারে এই ভাগ হয়েছে মনে হয়। আবার এই রকম প্রত্যেক ভাগের শুদ্ধ, উগ্র ও গুপ্ত এই তিন ভাগের কথাও বলা হয়েছে। কাজেই এই তন্ত্রমতে কেরলাদি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নয়টি ভাগ।[৬]

১ সম্যক্ প্রদীয়তে জ্ঞানং সম্প্রদায়ঃ প্রকীর্তিতঃ ।—শ স ত, তা খ, ১৪।৫১

২ কেরলশ্চৈব কাশ্মীরো গৌড়শ্চৈব তৃতীয়কঃ । সম্প্রদায়ত্রয়ং প্রোক্তং সর্বসিদ্ধিপ্রবর্তকম্ ।—ঐ ১৪।৭০

৩ The Spirit and Culture of the Tantras, C. Her. I, Vol. IV, p. 247

৪ বিলাসাখ্যঃ সম্প্রদায়ঃ সর্বগঃ পরিকীর্তিতঃ ।—দ্রঃ S. T., p. 99

৫ কেরলশ্চৈব কাশ্মীরো গৌড়মার্গস্তৃতীয়কঃ । ষট্পঞ্চাশদ্দেশভেদাৎ সর্বত্র ব্যাপ্য তিষ্ঠতি ।
অষ্টাদশসু দেশেষু গৌড়মার্গঃ প্রকীর্তিতঃ । নেপালদেশমারভ্য কলিঙ্গান্তং মহেশ্বরি ।
আর্যাবর্তং সমারভ্য সমুদ্রান্তং মহেশ্বরি । কেরলাখ্যঃ ক্রমঃ প্রোক্তশ্চৈকোনবিংশতিদেশকে ।
তদন্তদেশে দেবেশি কাশ্মীরাখ্যঃ ক্রমঃ শুভঃ ।—শ স ত, কা খ, ৩।৩-৬

৬ কেরলশ্চৈব কাশ্মীরো গৌড়মার্গস্ত্রয়াত্মকঃ । সম্প্রদায়ত্রয়ে প্রোক্তং ত্রিভেদং ত্রিভেদং ভবেৎ ।
শৈবকেরলকং দেবি শক্তিকেরলকং তথা । শিবশক্তিকেরলাখ্যং ত্রিভেদং পরিকীর্তিতম্ ।
শুদ্ধোগ্রগুপ্তভেদেন নবধা কেরলং ভবেৎ । নবধা চৈব কাশ্মীরং গৌড়ং চ নবধা ভবেৎ ।
—ঐ, তা খ, ৩৩।১৩-১৯

গৌড়— সিদ্ধসিদ্ধান্তসংগ্রহে উক্ত তিন সম্প্রদায়ের বিশেষ পরিচয় দেওয়া হয়েছে। গৌড়সম্প্রদায় সম্বন্ধে বলা হয়েছে—এঁদের পূজায় সর্বার্থসিদ্ধি সঙ্কল্প করে পুষ্পার্পণ করার পর নৈবেদ্য নিবেদন করতে হয়। তার পর হোম করতে হয় এবং তাম্বূল নিবেদন করার পর বলিদান করতে হয়। এঁরা বাঁ হাতে পূজা আর ডান হাতে তর্পণ করেন। এঁদের মুখ্য পঞ্চমকার গ্রহণ করতে হয়। এঁরা নিজের হৃদয়ে দেবীর বিসর্জন করেন। এইটি বামাচারীদের সেবিত গৌড় নামক সম্প্রদায়।[১]

শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে এই সম্প্রদায় সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—এঁরা দেবতা, গুরু এবং মন্ত্রের ঐক্য ভাবনা করবেন। স্থাবর জঙ্গম সমগ্র জগৎ তেজোময় ভাববেন। দেবতা-গুরু-মন্ত্রের চৈতন্যকে তেজঃপুঞ্জনিভ ভাববেন। সেই তেজঃপুঞ্জ মেরুপর্বতের মতো এক পর্বতাকার ধারণ করেছে কল্পনা করবেন আর সেই তেজের মধ্যে আয়ুধহস্তা মহাদেবীর ভাবনা করবেন। ধ্যানোক্ত বিধি অনুসারে ধ্যান করে দেবীকে সর্বরূপা ভাববেন। যে-সাধক এমনি ভাবনা করেন দেবী তাঁকে বর দেন।[২]

কাশ্মীর— কাশ্মীরসম্প্রদায়ের বিষয়ে বলা হয়েছে— এঁদের শাস্ত্র-বিনিয়োগ অনুসারে অর্চনায় পীঠার্চনার পর বলিদান করতে হয়। পঞ্চোপচারে পূজার পর হোম করতে হয়। এঁদের পূজা এবং তর্পণ দক্ষিণহস্তেই করণীয়। এই সম্প্রদায়ে পঞ্চমকারের অভাবে অনুকল্পব্যবহার বিহিত। মদ্যের অনুকল্প বা প্রতিনিধি তাম্রপাত্রস্থ ঘৃত বাতীত গব্য। মাংসের অনুকল্প বা প্রতিনিধি লবণ, আদা, পিণ্যাক অর্থাৎ তিলকল্ক বা তিলের লাড়ু, পেয়াজ, মাষকলাই এবং রশুন। মৎস্যের অভাবে তার প্রতিনিধি হবে ক্রমুক, তাম্বূল প্রভৃতি আমিষ দ্রব্য। বর্তুলাকার মুদ্রার অভাবে চাল বা ভাজা-চানা প্রভৃতি অনুকল্প। পঞ্চম-মকারের অনুকল্প এই— বিধানজ্ঞ সাধক আপন বাম উরুর উপরে চন্দন দিয়ে শক্তিত্রিকোণ এঁকে তার মধ্যে শক্তিবীজ লিখবেন। সেই ত্রিকোণে শক্তির পূজা করে শক্তিগায়ত্রী শতবার জপ করবেন। স্বয়ম্ভুকুসুমের অভাবে রক্তচন্দন দিয়ে অর্ঘ্য দিবেন। হয়ারিকুসুম শিব আর অপরাজিতাকুসুম শক্তি। এই উভয়ের মিলোৎপন্ন কুলামৃত গ্রহণ

১ সর্বার্থসিদ্ধিসঙ্কল্পপূজাপুষ্পার্পণাদনু। নৈবেদ্যান্তে চ হবনং তাম্বূলান্তে বলির্মতঃ।
পূজনং বামহস্তেন দক্ষহস্তেন তর্পণম্। সাক্ষাদ্দানং মকারেণ হৃদি দেব্যা বিসর্জনম্।
গৌড়াখ্যসম্প্রদায়োঽয়ং সেবিতো বামিভিঃ সদা।—প্রাঃ পু চ, স্তঃ ৯, পৃঃ ৮৬৬

২ দেবতাগুরুমন্ত্রাণামৈক্যং সম্ভাবয়ন্ ধিয়া। সর্বং তেজোময়ং ভাব্যং জগৎস্থাবরজঙ্গমম্।
ত্রয়াণাং দেবি চৈতন্যং তেজঃপুঞ্জনিভং শিবে। তেজঃকূটমভূদেকং মেরুপর্বতসন্নিভম্।
তত্তেজসি মহাদেবীং সায়ুধাং পরিচিন্তয়েৎ। ধ্যানোক্তবিধিনা ধ্যাত্বা সর্বরূপাং বিভাবয়েৎ।
এবং ভাবয়তস্তস্য দেবতা বরদা ভবেৎ।—শ স ত, সু খ, ৩।১৫-১৮

করবেন। এই-সব পঞ্চতত্ত্বের অনুকল্প। কাশ্মীরসম্প্রদায়ের সাধকেরা দেবতার বিসর্জন করবেন স্বীয় সহস্রারে। এই সম্প্রদায় কৌলিকদের প্রিয় বলে জানবে।[১]

শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে কাশ্মীরসম্প্রদায় সম্বন্ধে বলা হয়েছে— এঁরা মন্ত্র-দেবতা-গুরুর ঐক্য ভাবনা করবেন। অক্ষরের স্বরূপ তেজঃপুঞ্জের মতো কল্পনা করবেন। তেজঃপুঞ্জ সমস্ত অক্ষর একত্র ভাবনা করবেন এবং চৈতন্যত্রিতয় (গুরু, মন্ত্র ও দেবতা) অক্ষরে লীন ভাবনা করবেন। চৈতন্যজাত সব তেজ কোটিসূর্যের প্রভাবিশিষ্ট। তেজঃপুঞ্জ অক্ষরসমূহকে রত্নকূটসমূহের মতো ভাবনা করে ইষ্টসিদ্ধিপ্রদ মন্ত্র জপ করবেন।[২]

কেরল— কেরলসম্প্রদায়ের বিষয়ে সিদ্ধান্তসংগ্রহে বলা হয়েছে এই সম্প্রদায়ের সাধকেরা দেবতার প্রীত্যর্থে সঙ্কল্প করবেন। পঞ্চতত্ত্বের ভাবনামাত্র করবেন অর্থাৎ মুখ্য বা অনুকল্প পঞ্চতত্ত্বের প্রয়োজন এঁদের নেই। পঞ্চোপচার প্রদান করে আত্মা, বিদ্যা, শিব, সর্ব, পূর্ণ এই ক্রম অনুসারে পূজা করবেন। পূজার পরে বলিদান বিহিত। ডান হাতে পূজা আর বাঁ হাতে তর্পণ করবেন। সমস্ত কর্মের শেষে হোম করবেন আর স্বীয় হৃদয়ে দেবতার বিসর্জন করবেন। মুনিদের দ্বারা সমুপাসিত এই কেরল সম্প্রদায়।[৩]

কাদি-হাদি-কহাদি মত—এই-সব সাধকসম্প্রদায়ের মধ্যে আবার বিভিন্ন মত আছে। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে[৪] কাদি হাদি এবং কহাদি এই তিনটি মতের উল্লেখ আছে।

১ বিনিয়োগাদর্চনার্থং বলিঃ পীঠার্চনাদনু। হোমঃ পঞ্চোপচারান্তে দক্ষিণার্চনতর্পণে।
গব্যং তু তাম্রপাত্রস্থং বারুণী স্যাদ্ ঘৃতং বিনা। লবণার্দ্রকপিণ্যাকপলাণ্ডুমাষপঙ্ককম্।
লশুনং চ মহাদেবি মাংসপ্রতিনিধিঃ স্মৃতঃ। মৎস্যাভাবে তু ক্রমুকং তাম্বূলং বস্তামিষম্।
মুদ্রাভাবে তণ্ডুলং বা ভর্জিতং চনকাদিকম্। বিলিখেৎ পঞ্চমাভাবে শক্তিবীজং ত্রিকোণকম্।
বামোরৌ সাধকঃ রক্তং চন্দনেন বিধানবিৎ। শক্তিং সম্পূজ্য তত্রৈব তদ্গায়ত্রীং শতং জপেৎ।
স্বয়ম্ভুকুসুমাভাবে রক্তচন্দনকং ক্ষিপেৎ। হয়ারিকুসুমং শম্ভুঃ শক্তিঃ প্রোক্তাঽপরাজিতা।
তয়োঃ সম্মেলনোৎপন্নং গৃহ্নীয়াচ্চ কুলামৃতম্।...
এতে তত্ত্বানুকল্পাশ্চ সহস্রারে বিসর্জনম্। কাশ্মীরসম্প্রদায়োঽসৌ বিজ্ঞেয়ঃ কৌলিকপ্রিয়ঃ।
—সিদ্ধান্তসংগ্রহবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৯, পৃঃ ৮৬৬

২ মন্ত্রদেবগুরূণাং হি হ্যৈক্যং সংভাবয়ন্ ধিয়া। তেজঃপুঞ্জনিভং সর্বং হ্যক্ষরস্য স্বরূপকম্।
তেজঃপুঞ্জাক্ষরাণি চ সর্বং চৈকত্র ভাবয়েৎ। সর্বং লীনং হ্যক্ষরে বৈ চৈতন্যত্রিতয়ং শিবে।
সর্বং চৈতন্যজং তেজঃ কোটিসূর্যসমপ্রভম্। তেজঃপুঞ্জাক্ষরাণ্যেব রত্নকূটসমূহবৎ।
সংভাব্য প্রজপেন্মন্ত্রমিষ্টসিদ্ধিপ্রদায়কম্।—শ স ত, সু খ, পঃ ৩।১১-১৩

৩ সঙ্কল্পো দেবতাপ্রীত্যৈ তত্ত্বানাং ভাবনৈবহি। আত্মা বিদ্যা শিবঃ সর্বঃ পূর্ণশ্চেতি ক্রমেণ চ।
পূজা পঞ্চোপচারান্তে পূজান্তে চ বলির্ভবেৎ। পূজনং দক্ষহস্তেন বামহস্তেন তর্পণম্।
হোমঃ সমস্তক মান্তে হৃদ্যেবোদ্বাসনং স্মৃতম্। কেরলাখ্যঃ সম্প্রদায়ো মুনিভিঃ সমুপাসিতঃ।
—সিদ্ধান্তসংগ্রহবচন, দ্রঃ, পু চ, তঃ ৯, পৃঃ ৮৬৭

৪ দ্রঃ শ স ত, তা খ, ৫৮।৮১-৮২

সম্মোহনতন্ত্র অনুসারে কাদিমতে মন্ত্রের আরম্ভে আছে ক, হাদিমতে হ আর কাদি ও হাদি উভয়ে মিলে কহাদিমত।[১]

শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে বলা হয়েছে ক ব্রহ্মস্বরূপ। যে মতে ক-কে আদি স্বীকার করা হয় তা কাদিমত। হ শিবস্বরূপ। যে মতে হ-কে আদি স্বীকার করা হয় তা হাদিমত।[২]

উক্ত তন্ত্রমতে কাদিকে কালীমত, হাদিকে শ্রীত্রিপুরসুন্দরীমত এবং কহাদিকে তারিণীমত বলা হয়েছে।[৩]

কাদিমতের অন্যনাম বীরাদম্বুত্তর, হাদিমতের অন্যনাম হংসরাজ। কাদিমতের দেবতা কালী, হাদিমতের ত্রিপুরসুন্দরী এবং কহাদিমতের তারা বা নীলসরস্বতী।[৪]

তন্ত্ররাজতন্ত্রের প্রথম পটলে আছে দেবী শিবকে কাদিমত কিরূপ এই প্রশ্ন করলে উত্তরে শিব বলেন কাদি দেবীরই রূপ, কাদি-শক্তি সর্বসিদ্ধিদায়িনী।[৫] এর অর্থ দেবীর রূপ ত্রিকোণাকার। বাংলা ক এবং প্রাচীন দেবনাগরী ক-এর বাঁদিকে একটি ত্রিকোণ আছে।[৬] ক যে দেবীর রূপ কামধেনুতন্ত্রে তা ব্যাখ্যা করে দেখান হয়েছে। বলা হয়েছে[৭] ক-এর বামরেখা ব্রহ্মা, দক্ষিণরেখা বিষ্ণু, অধোরেখা রুদ্র, মাত্রা সাক্ষাৎ মহেশ্বরী,[৮] ডান দিকের অঙ্কুশ কুণ্ডলিনী আর ত্রিকোণের মধ্যেকার শূন্য সদাশিব। এই শূন্যের মধ্যেই কৈবল্যদায়িনী কালী অধিষ্ঠিতা। ত্রিকোণের ঊর্ধ্বকোণে আছেন ব্রহ্মার শক্তি বামা, বামকোণে বিষ্ণুশক্তি জ্যেষ্ঠা এবং দক্ষিণকোণে রুদ্রশক্তি রৌদ্রী।

সার জন উডরফ লিখেছেন গৌড়সম্প্রদায় কাদিমতকে সর্বোচ্চ মনে করেন আর কাশ্মীর

১ Tantrarāja Tantra, (T. T. Vol. VIII), Intro. p. 2

২ ককারাৎ ব্রহ্মরূপত্বং তৎকাদিমতমীরিতম্। হকারাৎ শিবরূপত্বং তদ্ধাদিমতমীরিতম্।

—শ স ত, তা খ, ৫৮।৮১

৩ কাস্তং হান্তং মহেশানি কান্তং কালীমতং ভবেৎ। হান্তং শ্রীত্রিপুরাখ্যং কহাখ্যং তারিণীমতম্।

—ঐ, কা খ, ৬।১২৫

৪ Ś. Ś, 4th Ed., p. 166

৫ কাদিসংজ্ঞা ভবদ্রূপা সা শক্তিঃ সর্বসিদ্ধয়ে।—ত রা ত ১।৭

৬ Tantrarāja Tantra, (T. T. Vol. VIII), Intro., p. 1

৭ বামরেখা ভবেদ্ ব্রহ্মা বিষ্ণুর্দক্ষিণবীথিকা। অধোরেখা ভবেদ্ রুদ্রঃ মাত্রা সাক্ষান্মহেশ্বরী।
কুণ্ডলী অঙ্কুশাকারা মধ্যে শূন্যঃ সদাশিবঃ।…শূন্যগর্ভে স্থিতা কালী কৈবল্যপদদায়িনী।
…ঊর্ধ্বকোণে স্থিতা বামা ব্রহ্মশক্তিরিতীরিতা। বামকোণে স্থিতা জ্যেষ্ঠা বিষ্ণুশক্তিরিতীরিতা।
দক্ষকোণে স্থিতা বিন্দু রৌদ্রী সংহাররূপিণী।—কামধেনুতন্ত্র, পৃঃ ৩

৮ এখানে মহেশ্বরী অর্থ সরস্বতী। কেন না কয়েকটি শ্লোক পরেই বলা হয়েছে 'শঙ্খকুন্দসমা কীর্তির্মাত্রা সাক্ষাৎ সরস্বতী।'

ও কেরল সম্প্রদায় ত্রিপুরা ও তারার উপাসনা করেন[১] অর্থাৎ হাদিমত ও কহাদিমতের প্রাধান্য স্বীকার করেন।

অন্যান্য সম্প্রদায়—শাক্তদের মধ্যে এ ছাড়া আরও অনেক সম্প্রদায় এবং উপসম্প্রদায় আছে। আচার, সাধ্য ইত্যাদি বিভিন্ন ভেদ অনুসারে এই-সব সম্প্রদায়ভেদ হয়েছে। দক্ষিণাচারী, বামাচারী, চীনাচারী, কৌল, কাপালিক, রসসাধক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের নাম পাওয়া যায়।

শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে ত বৌদ্ধ এবং জৈনদেরও শাক্ত বলা হয়েছে। উক্তত্যন্ত্রের সুন্দরীখণ্ডে আছে[২] চীন, কাপালিক, বৌদ্ধ, জৈন, দিব্য, কৌল, বীর ও পশু সাধকেরা শাক্তের অন্তর্গত। চীনাচারের সাধকেরা তারাক্রম ও ছিন্নমস্তাক্রমের সাধক। এঁদের দুশ প্রকারভেদ আছে। কাপালিকদের ভেদ পাঁচটি। যথা—ইন্দ্রজালী, দেবজালী, রুদ্রজালী, বিদ্যাজালী এবং সিদ্ধিজালী।

কাপালিক—শৈব সম্প্রদায়ের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা শাক্ত কাপালিকদের সম্বন্ধে ও কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছি। কাপালিক সাধারণতঃ বীরভাবের বামাচারী সাধক।[৩] শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে বলা হয়েছে[৪] যিনি কপালপাত্রে ভোজন করেন, যিনি মদ্যমাংসতৎপর, নিত্য ত্রিযোনি[৫] দর্শন করেন, সর্বদা মুণ্ডমালা ধারণ করেন আর শ্মশানাগ্নিতে ভোজন করেন তিনি কাপালিক।

রসসাধক— সাধনার ক্ষেত্রে রসশব্দ দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়; এক পারদ, দুই ভাবরস।

প্রথম অর্থে রসসাধনা দেহসাধনার অন্তর্ভুক্ত। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় লিখেছেন "রসসাধনাও দেহসাধনারই একটি প্রকারভেদমাত্র। রসবাদিগণ

---

১ Ś Ś, 4th Ed., p. 167

২ শাক্তে চান্তর্গতা দেবি চীনাঃ কাপালিকাঃ শিবে। বৌদ্ধা জৈনাস্ততো দেবি দিব্যাঃ কৌলাস্তথা শিবে।
চীনানাং দ্বিশতং ভেদাস্তারচ্ছিন্নাবিধৌ স তু। কাপালিকে পঞ্চভেদাস্তানহো বদ মহে শিবে।
ইন্দ্রজালী দেবজালী রুদ্রজালী তৃতীয়কঃ। বিদ্যাজালী তুর্যসংখ্যঃ পঞ্চমঃ সিদ্ধিজালিকঃ।
—শ স ত, সু খ, ১।১৮, ১৯০, ১৯২-৯৩

৩ ŚK. P., p. 10, n. 1

৪ কপালপাত্রসম্ভোজী মদ্যমাংসেষু তৎপরঃ। ত্রিযোনিদর্শকো নিত্যং মুণ্ডমালাধরঃ সদা।
শ্মশানাগ্নিপ্রভোজী যঃ স চ কাপালিকঃ স্মৃতঃ।—শ স ত, কা খ, ৮।৯-১০

৫ এটি সাংকেতিক শব্দ। এর অর্থ যোনিমণ্ডল বা শক্তিত্রিকোণ। ত্র্যঃ ত্রিকোণমেতৎ কথিতং যোনিমণ্ডলমুত্তমম্।—কামধেনুতন্ত্র, পঃ ৩

সাধারণতঃ আগম-সম্প্রদায়ের সাধক। তাঁহারা আপন আপন উপাসনার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কেহ কেহ শৈবরূপে এবং কেহ কেহ শাক্তরূপে পরিচিত। অন্য প্রকার উপাসনার সহিতও যে রসসাধনার যোগ ছিল না, তাহা যেন কেহ মনে না করেন। এই সকল সাধকের মুখ্য লক্ষ্যই ছিল পিণ্ডস্থৈর্য্য; অর্থাৎ দৈহিক অমরত্ব ও তন্মূলক জীবন্মুক্তি। তাঁহারা রস অথবা পারদের দ্বারা এই মহান্ কার্য সিদ্ধ করিতেন বলিয়া তাঁহাদিগকে রসবাদী নামে বর্ণনা করা হয়।"[১]

ভাবরসের সাধনা যুগলের সাধনা। মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ মহাশয় লিখেছেন "সর্বত্রই রসসাধনাতে যুগলের উপাসনা আবশ্যক। যুগললব্ধ ভাবরস সাধনার প্রাণবস্তু।"[২]

দক্ষিণাচারী প্রভৃতি সাধকের বিষয় আচার-প্রসঙ্গে আলোচিত হবে।

সাধ্য—

সাধ্যের ব্যাখ্যা—যার সাধনা করা যায় তাই সাধ্য। শাক্ত সাধকদের সাধ্য শক্তি। আবার সাধনার দ্বারা যা লাভ করা যায় তাও সাধ্য। এইভাবে বিচার করলে সিদ্ধি বা সাধনার ফলও সাধ্য। বাহ্যতঃ শক্তি ভিন্ন অন্য বস্তু যেখানে সাধ্য সেখানেও শক্তিই বস্তুতঃ সাধ্য। কেন না জগতের সব কিছুই শক্তিরই রূপ; যে-কোনো প্রকারের সিদ্ধিই হোক না কেন তা শক্তি ভিন্ন অন্য কিছু নয়। এই জন্য ললিতাসহস্রনামে দেবীকে বলা হয়েছে মহাসিদ্ধি।[৩]

শাক্তমতে পরম সাধ্য অদ্বয়ব্রহ্ম। শাক্ত শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্ম মাতৃরূপিণী মহাশক্তি। অদ্বয়ব্রহ্মের সাধনার অধিকার কিন্তু কম লোকেরই আছে। সেইজন্য সাধকের অধিকার অনুসারে ব্রহ্মের রূপকল্পনা শাস্ত্রে লক্ষ্য করা যায়। কুলার্ণবতন্ত্রে বলা হয়েছে—সাধকদের হিতের জন্য চিন্ময়, অপ্রমেয়, নির্গুণ, অশরীরী ব্রহ্মের রূপকল্পনা হয়েছে।[৪]

সাধ্যের ভেদ—লক্ষ্য করা গেছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা-কিছু আছে সবই ব্রহ্মময়ী মহাদেবীর রূপ। কিন্তু এ রকম অভেদজ্ঞান সাধারণ মানুষের থাকে না। তাদের কাছে দেব দেবী যক্ষ রক্ষ ভূত প্রেত মানুষ ইতর প্রাণী ইত্যাদির অসংখ্য ভেদ বর্তমান। সেইজন্য সাধারণ মানুষের সাধ্যও বিভিন্ন। তারা আপন আপন প্রকৃতি অনুসারে এবং উদ্দেশ্য অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেবতা এমন কি অপদেবতারও পূজা করে।

তন্ত্রশাস্ত্রমতে সর্বোচ্চ অদ্বয়ব্রহ্ম থেকে অশরীরিলোকের সর্বনিম্নস্তরের সত্তা পর্যন্ত সবই মানুষের সাধ্য। সাধারণভাবে বলা যায় একদিকে ব্যক্ত ব্রহ্ম এবং আরেক দিকে মানুষ, এর মধ্যে অসংখ্য অশরীরী সত্তা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এঁদের মধ্যে ভাল মন্দ ইষ্টকারী

---

১ দেহের সাধনা, হিমাদ্রি, ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৩৬২ ২ ঐ ৩ ল স, শ্লোক ১০৬

৪ চিন্ময়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্যাশরীরিণঃ। সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।—কু ত, উঃ ৬

অনিষ্টকারী সবই আছেন। এঁরা হয় প্রকৃতিজ না হয় মানুষেরই বিদেহী সত্তা। তন্ত্রশাস্ত্রে শুধু যে এঁদের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে তা নয়, এঁদের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে এবং এঁদের বশীভূত করার বা পরিহার করার উপায়ও নির্দিষ্ট হয়েছে। এঁদের মধ্যে যাঁরা উচ্চস্তরের শক্তি তাঁরা সাধককে ধন পুত্র আরোগ্য যশ ক্ষমতা বিদ্যা প্রভৃতি বিবিধ কাম্য বস্তু প্রদান করেন। সাধক আপনার হিত কামনায় যা প্রার্থনা করেন এঁরা তাই দেন। আর যাঁরা নিম্নস্তর বা নিম্নতমস্তরের শক্তি তাঁরা শুধু সাধকের হীন দৈহিক ভোগবাসনা চরিতার্থ করার সহায়তা করেন। এঁরা জীবের মোক্ষবিধান করতে পারেন না।[১]

মোক্ষ দেন ব্রহ্মময়ী পরা শক্তি। শুধু মোক্ষ নয়, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্বর্গই তিনি দেন।

পরা শক্তি সর্বদেবময়ী। কাজেই সব দেবতাই তাঁর রূপভেদমাত্র। অন্যভাবে বলা যায় পরা শক্তির দেবতারূপ বহু। মহানির্বাণতন্ত্রে দেবীকে বলা হয়েছে[২]—নানা বর্ণ ও আকারের অনন্ত রূপ তোমার। নানা সাধনার দ্বারা লভ্য এই-সব রূপের বর্ণনা কে করতে পারে ?

শাস্ত্রে উমা দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী কালী তারা প্রভৃতি বহু দেবীর বিবরণ পাওয়া যায়। নাম- ও রূপ-ভেদে এঁরা ভিন্ন কিন্তু পরমার্থতঃ ভিন্ন নন,[৩] একই মহাশক্তির বিভিন্ন রূপ। শাক্তানন্দতরঙ্গিণীতে আছে পরাশক্তিকে কেউ বলেন উমা, কেউ শক্তি, কেউ লক্ষ্মী, কেউ ভারতী, কেউ গিরিজা, কেউ অম্বিকা। আবার দুর্গা ভদ্রকালী চণ্ডী মাহেশ্বরী এই-সব নাম কেউ কেউ করে থাকেন। অন্যেরা দেবীর কৌমারী বৈষ্ণবী বারাহী ঐন্দ্রী ব্রাহ্মী বিদ্যা অবিদ্যা মায়া ইত্যাদি নাম দিয়েছেন। পরমর্ষিরা তাঁকে বলেন প্রকৃতি, বলেন অপরা।[৪]

তন্ত্রে এই ধরণের বচন বিস্তর পাওয়া যায়। যেমন মহানির্বাণতন্ত্রে সদাশিব দেবীকে বলছেন—তুমি কালী তারিণী দুর্গা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ধূমাবতী বগলা ভৈরবী ছিন্নমস্তা অন্নপূর্ণা বাগ্‌দেবী ও কমলালয়া অর্থাৎ লক্ষ্মী। তুমি সর্বশক্তিস্বরূপা, সর্বদেবময়ী তোমার তনু। তুমি স্থূল এবং সূক্ষ্ম, ব্যক্ত এবং অব্যক্তস্বরূপিণী। তুমি নিরাকারা হয়েও সাকারা।

---

১ P. T. Part II, 2nd Ed., p. 689

২ তব রূপাণ্যনন্তানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ।
নানাপ্রয়াসসাধ্যানি বর্ণিতুং কেন শক্যতে।—মহা ত ৪।২

৩ নামভেদাদ্ ভবেদ্ভিন্না ন ভিন্না পরমার্থতঃ।—দে পু ৩৮।৪

৪ উমেতি কেচিদাহুস্তাং শক্তিং লক্ষ্মীতি চাপরে ভারতীত্যপরে চৈনাং গিরিজেত্যম্বিকেতি চ।
দুর্গেতি ভদ্রকালীতি চণ্ডী মাহেশ্বরী তথা। কৌমারী বৈষ্ণবী চৈব বারাহ্যৈন্দ্রীতি চাপরে।
ব্রাহ্মীতি বিদ্যাবিদ্যেতি মায়েতি চ তথাপরে। প্রকৃতিশ্চাপরা চৈব বদন্তি পরমর্ষয়ঃ।—শা ত, উঃ ৩

তোমাকে কে জানতে পারে? উপাসকদের কাজের জন্য, জগতের কল্যাণের জন্য এবং দানবদের বিনাশের জন্য তুমি নানাবিধ দেহ ধারণ কর। তোমার মূর্তি চতুর্ভুজা দ্বিভুজা ষড়্ভুজা ও অষ্টভুজা। বিশ্বরক্ষার্থ তুমি নানা অস্ত্রশস্ত্র ধারণ কর। নানা তন্ত্রে আমি তোমার সেই সেই রূপের উপযোগী মন্ত্রযন্ত্রাদি সাধনের এবং পশ্বাদি ত্রিভাবের সাধকের কথা বলেছি।[১]

দেবীর চতুর্ভুজ, দ্বিভুজ ইত্যাদি উপলক্ষণ। কেন না দ্বাদশ চতুর্দশ ষোড়শ অষ্টাদশ প্রভৃতি সংখ্যক-ভুজযুক্তা দেবীর মূর্তির বিবরণ পাওয়া যায়। একটি ধ্যানে দেবীকে সহস্রভুজা বলা হয়েছে।[২]

বিভিন্ন আম্নায়ের দেবী—পুরশ্চর্যার্ণবে বলা হয়েছে[৩]—দেবীর অনন্তরূপভেদহেতু সব রূপের কথা বলা অসম্ভব। তবু বাড়বানলীয়তন্ত্রোক্ত কয়েকটি রূপভেদ এখানে দেখান যাচ্ছে।

বাড়বানলীয়তন্ত্রে আম্নায়ভেদে দেবীর রূপভেদ দেখান হয়েছে। উক্ত তন্ত্রে আছে—সচ্চিদানন্দমূর্তি একই আদ্যা শক্তি জগতের প্রসূতি। নানাবিভূতিভেদে তাঁর অনেক রূপ। পূর্ণেশী ভুবনেশানী ললিতা অপরাজিতা লক্ষ্মী সরস্বতী বাণী পারিজাতপদাঙ্কিতা অন্নপূর্ণা এবং জয়া প্রভৃতি দেবী পূর্বাম্নায়সমাশ্রিতা।[৪]

নিশেশী দক্ষিণা-কালী বগলা ছিন্নমস্তা ভদ্রা তারা মাতঙ্গী—এঁরা দক্ষিণ-আম্নায়ের দেবতা।[৫]

১ ত্বং কালী তারিণী দুর্গা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী। ধূমাবতী ত্বং বগলা ভৈরবী ছিন্নমস্তকা।
ত্বমন্নপূর্ণা বাগ্দেবী ত্বং দেবী কমলালয়া। সর্বশক্তিস্বরূপা ত্বং সর্বদেবময়ী তনুঃ।
ত্বমেব সূক্ষ্মা স্থূলা ত্বং ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী। নিরাকারাঽপি সাকারা কস্ত্বাং বেদিতুমর্হতি।
উপাসকানাং কার্যার্থং শ্রেয়সে জগতামপি। দানবানাং বিনাশায় ধৎসে নানাবিধাস্তনূঃ।
চতুর্ভুজা ত্বং দ্বিভুজা ষড়্ভুজাঽষ্টভুজা তথা। ত্বমেব বিশ্বরক্ষার্থং নানাশস্ত্রাস্ত্রধারিণী।
তত্তদ্রূপবিভেদেন মন্ত্রযন্ত্রাদিসাধনম্। কথিতং সর্বতন্ত্রেষু ভাবাশ্চ কথিতাস্ত্রয়ঃ।—মহা ত ৪।১৩-১৮

২ শূলাদ্যস্ত্রসহস্রমণ্ডিতভুজামুদ্যত্‌পীনস্তনীম্। আবদ্ধামৃতরশ্মিরম্যমুকুটাং বন্দে মহেশপ্রিয়াম্।
দ্রঃ স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীচণ্ডী, ৩য় সং, পৃঃ ৯

৩ দেবীভেদানামনন্তত্বেন বক্তুমশক্যত্বেঽপি বাড়বানলীয়তন্ত্রোক্তাঃ কতিচিদ্ ভেদা ইহ প্রদর্শ্যন্তে।
—পু চ, তঃ ১, পৃঃ ১১

৪ একৈবাদ্যা জগৎসূতিঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহা। তত্তদ্বিভূতিভেদেন ভিন্নাঽনেকত্বমাগতা।
পূর্ণেশী ভুবনেশানী ললিতা চাপরাজিতা। লক্ষ্মীঃ সরস্বতী বাণী পারিজাতপদাঽঙ্কিতা।
অন্নপূর্ণা জয়াদ্যাশ্চ পূর্বাম্নায়সমাশ্রিতা।—দ্রঃ, পু চ, তঃ ১, পৃঃ ১১-১২

৫ নিশেশী দক্ষিণাকালী বগলা ছিন্নমস্তকা। ভদ্রা তারা চ মাতঙ্গী দক্ষিণাম্নায়দেবতাঃ।
বাড়বানলীয়তন্ত্রবচন, দ্রঃ, পু চ, তঃ ১, পৃঃ ১২

বহুভেদসংযুক্তা কুব্জিকা কুলালিকা মাতঙ্গী অমৃতলক্ষ্মী প্রভৃতি দেবী পশ্চিম-আম্নায়ের দেবতা।[১]

সিদ্ধিলক্ষ্মী গুহ্যলক্ষ্মী মহাভীমসরস্বতী ধূম্রা কামকলাকালী মহাকালী কপালিনী মহাশ্মশানকালী কালসঙ্কর্ষিণী প্রত্যঙ্গিরা মহারাত্রি যোগেশী সিদ্ধিভৈরবী—এই-সব বিদ্যা সমস্ত বিদ্যার মধ্যে উত্তমোত্তমা। এঁরা উত্তরাম্নায়ের দেবতা এবং চতুর্বর্গফলদাত্রী।[২]

কামেশী ললিতা বালা মহাত্রিপুরসুন্দরী ভৈরবী এঁরা ঊর্ধ্বাম্নায়-সমাশ্রিতা।[৩]

বজ্রযোগিনী পন্নগী নৈঋতেশ্বরী এঁরা জৈনমার্গপ্রপূজিতা অধঃ-আম্নায়ের দেবতা।[৪]

মহাকালসংহিতার মতে কিন্তু অধঃ-আম্নায়ের আদ্যভূতা দেবী ভয়ানকা ভীমা দেবী।[৫] এই গ্রন্থের মতে কুমারী এবং দুর্গা সর্বাম্নায়প্রপূজিতা।[৬]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতে সিদ্ধ সাধকেরা সমাধিমুখে ভাবমুখে বিশ্বরূপিণী বিশ্বজননীর এই-সব বিবিধ রূপ প্রত্যক্ষ করেন এবং ধ্যান ও মন্ত্র প্রাপ্ত হন।[৭]

দশমহাবিদ্যা—দেবীর বিবিধ রূপের মধ্যে দশটি রূপ দশমহাবিদ্যা নামে বিখ্যাত। মহাভাগবতপুরাণে বলা হয়েছে—দেবীর বহু মূর্তির মধ্যে দশমহাবিদ্যাই প্রকৃষ্টা।[৮]

চামুণ্ডাতন্ত্রে আছে—মহাবিদ্যা কালী ও তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, বিদ্যা ধূমাবতী, সিদ্ধবিদ্যা বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা এই দশ মহাবিদ্যাকে সিদ্ধবিদ্যা বলা হয়।[৯]

আবির্ভাবকাহিনী— মহাভাগবতপুরাণের অষ্টম অধ্যায়ে দশমহাবিদ্যার নিম্নোক্ত আবির্ভাবকাহিনী পাওয়া যায়। সতী দক্ষযজ্ঞে যাবার জন্য শিবের অনুমতি চান।

---

১ বহুপ্রভেদসংযুক্তা কুব্জিকা চ কুলালিকা। মাতঙ্গ্যমৃতলক্ষ্ম্যাদ্যাঃ পশ্চিমাম্নায়দেবতাঃ।—দ্রঃ পু চ, তঃ ১, পৃঃ ১২

২ সিদ্ধিলক্ষ্মী গুহ্যকালী মহাভীমসরস্বতী। ধূম্রা কামকলাকালী মহাকালী কপালিনী।
মহাশ্মশানকালী চ কালসংকর্ষিণী তথা। প্রত্যঙ্গিরা মহারাত্রির্যোগেশী সিদ্ধিভৈরবী।
এতা বহুবিধাযুক্তাঃ সর্ববিদ্যোত্তমোত্তমাঃ। উত্তরাম্নায়পীঠস্থাশ্চতুর্বর্গফলপ্রদাঃ।—ঐ পৃঃ ১৩

৩ কামেশী ললিতা বালা মহাত্রিপুরসুন্দরী। ত্রিপুরা ভৈরবী প্রোক্তা ঊর্ধ্বাম্নায়সমাশ্রিতাঃ।—ঐ

৪ যোগিনী বজ্রপূর্বা চ পন্নগী নৈঋতেশ্বরী। অধরাম্নায়পীঠস্থা জৈনমার্গপ্রপূজিতাঃ।—ঐ

৫ যত্রাদ্যভূতা বিখ্যাতা ভীমাদেবী ভয়ানকা।—ঐ

৬ কুলবালা চ দুর্গা চ সর্বাম্নায়প্রপূজিতা।—ঐ

৭ দ্রঃ ভারতে শক্তিপূজা, পৃঃ ১০৫

৮ এতাঃ সর্বাঃ প্রকৃষ্টাস্তু মূর্তয়ো বহুমূর্তিষু।—দ্রঃ ত ত, পৃঃ ১৭৭

৯ কালীতারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী। ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা।
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা। এতা দশ মহাবিদ্যা সিদ্ধবিদ্যা প্রকীর্তিতাঃ।
—দ্রঃ, প্রা তো, কাণ্ড ৪, পরিঃ ৬, ব সং, পৃঃ ৩৭৪

শিব তাঁকে সেখানে যেতে নিষেধ করেন। বলেন 'সতি! তোমার সেখানে যাওয়া উচিত নয়। সেখানে তোমার অপমান ছাড়া সম্মান হবে না।' দক্ষ ইচ্ছে করেই শিবসতীকে নিমন্ত্রণ করেন নি। এইজন্যই বিনা নিমন্ত্রণে যেতে দিতে শিবের আপত্তি। সতী তবু যাবার জন্য জেদ করতে থাকেন। তখন শিব তাঁকে কড়া কথা বলেন—দক্ষকন্যে! আমি জানি তুমি আমার কথার বাধ্য নও। তোমার যা ইচ্ছে তাই কর। আমার আজ্ঞার অপেক্ষা কিসের ?[১]

এ কথায় দেবী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেন। ভাবেন শিব আমাকে পত্নীভাবে পেয়ে আমার স্বরূপ বিস্মৃত হয়েছেন। অতএব এঁকে এবং আমার পিতা অহংকারী দক্ষ-প্রজাপতিকে ত্যাগ করে কিছুকাল নিজলীলায় স্বরূপে অবস্থান করব।[২] এই ভেবে দেবী অতিভয়ংকরী কালীমূর্তি ধারণ করলেন। কৃষ্ণাঞ্জনসমপ্রভা দিগম্বরী আলুলায়িতকুন্তলা লোলজিহ্বা মুণ্ডমালিনী সেই মূর্তি দেখে শিব মূঢ়ের মতো ভয়ে পলায়ন করতে চাইলেন এবং দিক্ লক্ষ্য করে ধাবিত হলেন।

তখন দেবী স্বামীকে এমনি ভয়াভিভূত দেখে দয়াপরবশ হয়ে তাঁকে বারণ করবার জন্য ক্ষণমধ্যে দশমূর্তি ধারণ করে দশ দিকে অবস্থান করেন।[৩] শিব যেদিকে যান সেই দিকেই দেখেন ভয়ংকরী মূর্তি। তখন পালাবার পথ না পেয়ে তিনি ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করেন। আবার চোখ খুলে দেখেন সামনে সেই ভয়ংকরী কালীমূর্তি। জিজ্ঞাসা করেন—কে তুমি শ্যামা ? আমার প্রাণবল্লভা সতী কোথায় ? দেবী বললেন চিনতে পারছ না ? আমিই ত সতী। আমি সৃষ্টিসংহারকারিণী সূক্ষ্মা প্রকৃতি। তোমার বনিতা হওয়ার জন্য তোমার জন্যই গৌরবর্ণা হয়েছিলাম। আর দশদিকে মহাভয়ংকরী যে-দশমূর্তি দেখছ সে-সব আমারই মূর্তি। অতএব মহামতি শম্ভু ভয় করো না।[৪]

অবস্থান—মহাভাগবতপুরাণের মতে দশদিকে দশমহাবিদ্যার অবস্থান এইরূপ—মধ্যে শিব, তাঁর সম্মুখে উত্তরে কালী, ঊর্ধ্বে তারা, পূর্বে ছিন্নমস্তা, পশ্চিমে ভুবনেশ্বরী, দক্ষিণে বগলা,

---

১ জানামি বাগ্‌বহির্ভূতাং মামহং দক্ষকন্যকে। যথারুচি কুরু ত্বং মমাজ্ঞাং কিং প্রতীক্ষসে।
—মহাভাগবতপুরাণবচন, দ্রঃ বিশ্বকোষ, দশমহাবিদ্যাশব্দ

২ ত্যক্ষ্যেঽহমপি দর্পিষ্ঠং পিতরঞ্চ প্রজাপতিম্।
সংস্থাস্যামি কিয়ৎকালং স্বস্থানং নিজলীলয়া।—ঐ।

৩ এবং পতিং বীক্ষ্য ভয়াভিভূতকং দয়ান্বিতা তৎপ্রতিবারণেচ্ছয়া
সর্বাসু দিক্ষু ক্ষণমাত্রমধ্যতঃ স্থিতা চ ভূত্বা দশমূর্তিরম্বিকা।—ঐ

৪ অহং তু প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা সৃষ্টিসংহারকারিণী। অতস্ত্বদ্বনিতাত্বে ত্বদর্থে গৌরদেহিকা।…
দশদিক্ষু মহাভীমা যা এতা দশমূর্তয়ঃ। সর্বা মমৈব তা শম্ভো ভয়ং কুরু মহামতে।—ঐ।

অগ্নিকোণে ধূমাবতী, নৈঋতকোণে ত্রিপুরসুন্দরী, বায়ুকোণে মাতঙ্গী, ঈশানকোণে ষোড়শী আর অধঃদেশে ভৈরবী।[১]

৫। **আবির্ভাবকাল**—তন্ত্রে দশমহাবিদ্যার আবির্ভাবকাল নির্দিষ্ট হয়েছে। তার পারিভাষিক নাম রাত্রি। বিশেষ বিদ্যার আবির্ভাবকাল বা রাত্রির বিশেষ নাম আছে। সেই সেই বিদ্যার আবার সেই সেই নামও দেওয়া হয়েছে। যেমন কালীর আবির্ভাবকাল মহারাত্রি আবার কালীরও নাম মহারাত্রি। তেমনি তারার আবির্ভাবকাল ও নাম ক্রোধরাত্রি; ষোড়শীর দিব্যরাত্রি; ভুবনেশ্বরীর সিদ্ধরাত্রি; ছিন্নমস্তার বীররাত্রি; ভৈরবীর কালরাত্রি; ধূমাবতীর দারুণরাত্রি; বগলামুখীর বীররাত্রি; মাতঙ্গীর মোহরাত্রি এবং কমলার মহারাত্রি।[২]

পূর্বোক্ত পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে এই আবির্ভাবকালের যে কোনো যোগ নেই তা স্পষ্টই বোঝা যায়। পূর্বোক্ত কাহিনীটি লোকরঞ্জক কাহিনীমাত্র। কিন্তু আবির্ভাবকালের মধ্যে গূঢ় সাধনসঙ্কেত আছে মনে হয়। একমাত্র সাধনমর্মজ্ঞরাই এই সংকেতের যথার্থ রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারেন।

তবে জ্যোতিষের বিচারে মহারাত্র্যাদির ব্যাখ্যা করা হয়েছে স্বতন্ত্রতন্ত্রে। বলা হয়েছে—ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের একাদশী তিথি মহারাত্রি। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা দশমী তিথি যদি শুক্রবারে পড়ে বা রাত্রিতে একাদশী পড়ে তা হলে তাকে দিব্যরাত্রি বলে। মঙ্গলবারে অমাবস্যা তিথিতে যদি রবির সংক্রমণ হয় এবং তার সঙ্গে যদি কুলনক্ষত্রের যোগ হয় তা হলে তাকে তাররাত্রি বলে। বহুভাগ্যে কদাচিৎ এরূপ যোগাযোগ ঘটে। চৈত্রসংক্রান্তিতে অষ্টমী তিথি হলে তাকে সিদ্ধরাত্রি বলে। বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়াতে কুলনক্ষত্রের যোগ হলে তাকে দারুণতিথি অর্থাৎ দারুণরাত্রি বলা হয়। দীপান্বিতা চতুর্দশীর সঙ্গে যখন অমাবস্যার যোগ হয় তখন তাকে কালরাত্রি বলে। কালরাত্রি কালী ও তারার প্রিয়করী। কৃষ্ণজন্মাষ্টমীকে বলে মোহরাত্রি। চৈত্রমাসের শুক্লা নবমীতে হয় ক্রোধরাত্রি আর অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা অষ্টমীতে ঘোররাত্রি। মাঘ মাসের মঙ্গলবারে যদি চতুর্দশী হয় আর তার সঙ্গে কুলনক্ষত্রের যোগ হয় তবে তাকে বীররাত্রি বলে।[৩]

---

১ দ্রঃ বিশ্বকোষ, দশমহাবিদ্যা। লক্ষ্য করার বিষয় মহাভাগবতপুরাণে দশমহাবিদ্যার তালিকায় কমলার নাম নাই আবার চামুণ্ডাতন্ত্রাদিতে ত্রিপুরসুন্দরীর নাম নাই।

২ দশমহাবিদ্যা, ক শ অ, পৃঃ ১১২

৩ ফাল্গুনে চ মহারাত্রিঃ কৃষ্ণৈকাদশিকা তিথিঃ। জ্যৈষ্ঠে বা দশমী শুক্লা দেবি বারযুতা ভৃগোঃ।
রাত্রাবেকাদশী চেৎ স্যাৎ দিব্যরাত্রিঃ প্রকীর্তিতা। অমা ভৌমে সংক্রমশ্চ কুল ঋং গ্রহণং যদি।
তাররাত্রিস্তু সংপ্রোক্তা ভাগ্যাদেব তু লভ্যতে। সিদ্ধরাত্রিরষ্টমী স্যাচ্চৈত্রসংক্রমণান্বিতা।

মোটকথা দশ মহাবিদ্যা যে একই মহাদেবীর বিভিন্ন রূপ এবং শিব পর্যন্ত যে মহাদেবীর স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে যান উল্লিখিত কাহিনীতে এই তত্ত্বই সাধারণ লোকের উপযোগী করে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

মহাবিদ্যা—সাধারণতঃ মহাবিদ্যা বললে দেবীর পূর্বোক্ত দশরূপ বুঝালেও কোনো কোনো তন্ত্রে বিশেষ করে কালী ও তারাকে মহাবিদ্যা বলা হয়েছে। তেমনি সাধারণভাবে দশমহাবিদ্যাকেই সিদ্ধবিদ্যা বলা হলেও বিশেষ করে বগলাকে সিদ্ধবিদ্যা বলা হয়।[১]

দশমহাবিদ্যার অন্য নাম—চামুণ্ডাতন্ত্রাদিতে দশমহাবিদ্যার যে-নাম দেওয়া হয়েছে তাই প্রচলিত নাম। কিন্তু অন্যরকম নামও পাওয়া যায়। যেমন শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে আছে[২]—কালী তারা ছিন্না সুন্দরী বগলামুখী মাতঙ্গী শ্যামলা লক্ষ্মী সিদ্ধবিদ্যা-ভৈরবী এবং ধূমাবতী—এই ক্রমে মহাবিদ্যা দশজন।

মালিনীবিজয়ে[৩] দশমহাবিদ্যার এই নাম পাওয়া যায়—কালী নীলা মহাদুর্গা ত্বরিতা ছিন্নমস্তকা বাগ্‌বাদিনী অন্নপূর্ণা প্রত্যঙ্গিরা কামাখ্যাবাসিনী-বালা এবং শৈলবাসিনী-মাতঙ্গী।

দশাধিক মহাবিদ্যা— দশের অধিক সংখ্যক মহাবিদ্যার উল্লেখও তন্ত্রে আছে। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে বলা হয়েছে বিরূপাক্ষ ত্রয়োদশ মহাবিদ্যার বিবরণ দিয়েছেন।[৪] নিরুত্তরতন্ত্রে বলা হয়েছে—কালী তারা ছিন্না মাতঙ্গী ভুবনেশ্বরী অন্নপূর্ণা নিত্যা মহিষমর্দিনী-দুর্গা ত্বরিতা ত্রিপুরা পুটা ভৈরবী বগলা ধূমাবতী কমলা সরস্বতী জয়দুর্গা ও ত্রিপুরাসুন্দরী— তন্ত্রাদিতে এই অষ্টাদশ মহাবিদ্যা কীর্তিতা হয়েছেন।[৫]

তৃতীয়া মাধবে শুক্লা কুর্লক্ষে দারুণা তিথিঃ। দীপোৎসবচতুর্দশ্যামময়া যোগ এব চ।
কালরাত্রির্মহেশানি তারাকালীপ্রিয়ংকরী। কৃষ্ণজন্মাষ্টমী দেবি মোহরাত্রিঃ প্রকীর্তিতা।
চৈত্রশুক্লানবম্যাস্তু ক্রোধরাত্রিঃ প্রকীর্তিতা। ঘোররাত্রির্মার্গশীর্ষে কৃষ্ণাষ্টম্যাং মহেশ্বরি।
চতুর্দশী ভৌমযুক্তা মকারেণ সমন্বিতা। কুলবক্রসমাযুক্তা বীররাত্রিঃ প্রকীর্তিতা।
—ত্রঃ প্রা তো. কাণ্ড ৫, পরিঃ ৬, ব সং পৃঃ ৩৭৫

১ ত্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৫, পরিঃ ৬, ব সং, পৃঃ ৩৭৪

২ কালী তারা তথা ছিন্না সুন্দরী বগলামুখী। মাতঙ্গী শ্যামলা লক্ষ্মীঃ সিদ্ধবিদ্যা চ ভৈরবী।
ধূমাবতী ক্রমেণৈব মহাবিদ্যা দশৈব তু।—শ স ত, তা খ, ৩।১৬-১৭

৩ কালী নীলা মহাদুর্গা ত্বরিতা ছিন্নমস্তকা। বাগ্‌বাদিনী চান্নপূর্ণা তথা প্রত্যঙ্গিরা পুনঃ।
কামাখ্যাবাসিনী বালা মাতঙ্গী শৈলবাসিনী।—ত্রঃ শা ত, উঃ ৩

৪ ত্রয়োদশ মহাবিদ্যা বিরূপাক্ষেণ কীর্তিতাঃ।—শ স ত, তা খ, ১১।৩

৫ কালী তারা তথা ছিন্না মাতঙ্গী ভুবনেশ্বরী। অন্নপূর্ণা তথা নিত্যা দুর্গা মহিষমর্দিনী।
ত্বরিতা ত্রিপুরা পুটা ভৈরবী বগলা তথা। ধূমাবতী তথা জ্যেষ্ঠা কমলা চ সরস্বতী।
জয়দুর্গা তথা তন্ত্রে তথা ত্রিপুরসুন্দরী। অষ্টাদশ মহাবিদ্যা তন্ত্রাদৌ কথিতা প্রিয়ে।—নির ত, পঃ ১৫

নারদপঞ্চরাত্রে ত সোজা বলে দেওয়া হয়েছে— মহাবিদ্যা সপ্তকোটি, উপবিদ্যাও সেইরূপ। তাঁদের মূর্তির সংখ্যা করা যায় না।[১]

তবে সাধারণতঃ চামুণ্ডাতন্ত্রাদিবর্ণিত দশমহাবিদ্যার কথাই অধিকাংশ তন্ত্রে পাওয়া যায়।

আবির্ভাবতত্ত্ব—দশমহাবিদ্যার আবির্ভাবতত্ত্বের ব্যাখ্যায় বলা হয় গণিতে শূন্যের যেমন নিজস্ব কোনো মূল্য নেই, একে অসীমের দ্যোতক একটি নিরাকার পদার্থমাত্র বলা যায়, কিন্তু এই শূন্যই যখন একের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন তার মূল্য দেখা দেয়, উভয়ে মিলে দশ হয়ে যায়, তেমনি নিরাকার ব্রহ্মময়ী যখন একের সঙ্গে অর্থাৎ আপন ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হন তখন তিনি ভক্তদের মনোবাসনা পূর্ণ করবার জন্য দশমহাবিদ্যার রূপ ধারণ করেন। এই দশ রূপ হয়েছে সত্ত্বাদিগুণের তারতম্যানুসারে।[২] মহানির্বাণতন্ত্র-মতে গুণ- ও ক্রিয়া-অনুসারে দেবীর রূপ কল্পিত।[৩]

দশমহাবিদ্যার মধ্যে কালী শুদ্ধসত্ত্বগুণপ্রধানা নির্বিকারা নির্গুণব্রহ্মস্বরূপপ্রকাশিকা।[৪] যোগিনীতন্ত্রে দেখা যায় দেবী ঘোর নামক অসুরকে বলছেন—ইদানীং আমার পরম ব্রহ্মানন্দময় রূপ দেখ। পরম ধাম এই রূপ কালীরূপ। এর চেয়ে পরতর ব্রহ্মরূপ আর নাই।[৫]

এই আদ্যা বিদ্যা কালী সাক্ষাৎ কৈবল্যদায়িনী।[৬]

তারা সত্ত্বগুণাত্মিকা এবং তত্ত্ববিদ্যাদায়িনী। ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী এবং ছিন্নমস্তা রজোগুণপ্রধানা সত্ত্বগুণাত্মিকা। এঁরা গৌণমুক্তি, ঐশ্বর্য ও স্বর্গাদি প্রদান করেন। ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা তমোগুণপ্রধানা। আভিচারিক ষট্কর্মসাধনে এঁদের আরাধনা করা হয়। তবে সাধারণভাবে বলা যায় দশমহাবিদ্যাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভুক্তিমুক্তি প্রদান করেন।[৭]

কুব্জিকাতন্ত্রে দশমহাবিদ্যার মহাত্ম্যবর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে— এঁরা সর্বদা ধর্ম অর্থ

১ সপ্তকোটির্মহাবিদ্যা উপবিদ্যাশ্চ তাদৃশাঃ।
তাসাং মূর্তির্মুনিশ্রেষ্ঠ সংখ্যাতুং নৈব শক্যতে।—না প্রা তো, কাণ্ড ৪, পরি ৩, ব সং, পৃঃ ৩৭৩

২ Karpūrādistotra, T. T., Vol. IX, Intro., pp. 13-14.

৩ গুণক্রিয়ানুসারেণ রূপং দেব্যাঃ প্রকল্পিতম্।—মহা ত ১৩।৪

৪ Karpūrādistotra, T. T., Vol IX, Intro., pp. 13-14.

৫ ইদানীং পশ্য মদ্রূপং ব্রহ্মানন্দং পরং পদম্।...
তদ্রূপং পরমং ধাম কালীরূপমিতি শৃণু। ইতঃ পরতরং রূপং ব্রহ্মণো নাস্তি কুত্রচিৎ।—যো তো, পৃঃ ৮

৬ শূন্যগর্ভে স্থিতা কালী কৈবল্যপদদায়িনী।—কামধেনুতন্ত্র, পৃঃ ৩

৭ Karpūrādistotra, T. T., Vol. IX, Intro., pp. 13-14.

কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ প্রদান করেন। যে-কোনো প্রকারে এঁরা কলিযুগে পূর্ণফল প্রদান করে থাকেন। ত্রিভুবনে এঁদের সমান আর নাই। একবারমাত্র মহাবিদ্যার উচ্চারণে অর্থাৎ মন্ত্রোচ্চারণে জীব সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয় আর মহাবিদ্যার স্মরণের দ্বারা ভববন্ধন-মুক্ত হয়ে যায়।[১]

পূর্বে আমরা ষড়াম্নায়ের অন্তর্গত বিভিন্ন দেবীর উল্লেখ করেছি। মহাকালসংহিতার অনুস্মৃতিপ্রকরণে বলা হয়েছে—ষড়াম্নায়ে অনেক দেবতা আছেন। তাঁদের কেউ কেউ সত্যযুগে, কেউ কেউ ত্রেতাযুগে, কেউ কেউ দ্বাপরযুগে আবার কেউ কেউ কলিযুগে ফল প্রদান করেন। কিন্তু দশমহাবিদ্যা চারযুগে ফল প্রদান করেন। তাঁদের মধ্যে কালী, তারা ও ত্রিপুরসুন্দরী বিশিষ্ট। এই তিনের মধ্যে আবার কলিযুগে কালী বিশিষ্ট।[২]

সাধারণভাবে বলা যায় উচ্চ তান্ত্রিক সাধনার সাধ্যা কালী, তারা এবং ত্রিপুরসুন্দরী।

এঁদের সম্বন্ধে পৃথগ্‌ভাবে আলোচনা করার আগে মহাবিদ্যা-প্রসঙ্গে আরেকটি সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি। শিব ও শক্তির অবিনাভাবসম্বন্ধ। কাজেই যেখানে শক্তি সেখানেই শিব। এইজন্য প্রত্যেক মহাবিদ্যার একজন করে ভৈরব আছেন। মহাবিদ্যার পূজার সঙ্গে ভৈরবেরও পূজা করতে হয়।

ভৈরব—ভৈরব শিব। ভৈরবশব্দের বিবিধ ব্যাখ্যা দেখা যায়।[৩] যিনি বিশ্বকে ভরণ অর্থাৎ ধারণ ও পোষণ করেন, বিশ্ব যাকে ধারণ ও পোষণ করে অর্থাৎ বিশ্বময় বলে যিনি সর্বত্র স্ফুরিত এবং যিনি শব্দনস্বভাব বলে সবিমর্শ অর্থাৎ শব্দরাশিসমুত্থ-কাদি-কলাবিমর্শময় রব তিনি ভৈরব। অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করা হয়। যেমন—ভী অর্থ ভয়। তার অর্থ সংসারত্রাস। সেই ত্রাসজনিত রব অর্থাৎ ক্রন্দন বা চিন্তা থেকে যিনি জাত তিনি ভৈরব। সংসারভয়ে ভীত জীব যখন ভগবান্ ভগবান্ বলে আর্তরব করে বা ভগবদ্‌বিষয়ক চিন্তা করে তখন সেই জীবের হৃদয়ে পরমার্থরূপে যিনি স্ফুরিত হন তিনি ভৈরব।[৪]

১ ধর্মার্থকামমোক্ষদা নিত্যং চতুর্বর্গফলপ্রদাঃ। যেন তেন প্রকারেণ কলৌ পূর্ণফলপ্রদাঃ।
আসামেব সমানা হি নাস্তি ত্রিভুবনে ধ্রুবম্। একোচ্চারণমাত্রেণ সর্বপাপাৎ প্রমুচ্যতে।
স্মরণেনৈব দেবেশি মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ।—প্রঃ. প্রা তো, কাণ্ড ৫, পরিঃ ৬, ব সং, পৃঃ ৩৭৪

২ ষড়াম্নায়েষু দেবেশি ভূয়স্যঃ সন্তি দেবতাঃ। তাসু কাশ্চিৎ কৃতযুগে ত্রেতায়াং কাশ্চিদীরিতাঃ।
দ্বাপরে ফলদাঃ কাশ্চিৎ কলৌ কাশ্চিৎ ফলপ্রদাঃ। চতুর্যুগেষু ফলদা দশবিদ্যা মযেরিতাঃ।
তাসু তিস্রো বিশিষ্যন্তে কালী তারা চ সুন্দরী। তিসৃষপি শিবে তাসু কলৌ কালী বিশিষ্যতে।
—মহ, পু চ, তঃ ১, পৃঃ ১৬

৩ সঃ ত আ, প্র আ, পৃঃ ১৩৯-৪৩

৪ ভয়ং ভীঃ সংসারত্রাসঃ তস্মা জনিতো যোঽসৌ রবঃ ভগবদ্‌বিষয় আক্রন্দঃ পরামর্শো বা ততো জাতঃ ইতি ভৈরবঃ। তেনাক্রন্দবতাং পরামর্শবতাং চ হৃদি পরমার্থভূমৌ স্ফুরিত ইতি যাবৎ।—ঐ পৃঃ ১৪১

শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে দশমহাবিদ্যার ভৈরবের নাম করা হয়েছে। যথা—কালিকার ভৈরব মহাকাল, সুন্দরীর অর্থাৎ ত্রিপুরসুন্দরীর ললিতেশ্বর, তারার অক্ষোভ্য, ছিন্না বা ছিন্নমস্তার বিকরালক, ভুবনা বা ভুবনেশ্বরীর মহাদেব, ধূম্রা বা ধূমাবতীর কালভৈরব, মহালক্ষ্মী বা কমলার নারায়ণ, ভৈরবীর বটুক, মাতঙ্গীর মতঙ্গ বা সদাশিব এবং বগলার ভৈরব মৃত্যুঞ্জয়।[১]

ভৈরবের নাম সম্বন্ধে অবশ্য মতভেদ আছে। যেমন তোড়লতন্ত্রমতে ত্রিপুরসুন্দরীর ভৈরব পঞ্চবক্ত্র শিব, ভুবনেশ্বরীর ত্র্যম্বক, ভৈরবীর দক্ষিণামূর্তি, ছিন্নমস্তার কবন্ধ শিব, ধূমাবতী বিধবা বলে তাঁর ভৈরব নেই, বগলার ভৈরব একবক্ত্র মহারুদ্র, কমলার বিষ্ণুরূপ সদাশিব।[২] কালী, তারা ও মাতঙ্গীর ভৈরব শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে যেমন আছে তেমনি।

এবার একে একে দশমহাবিদ্যার আলোচনা করা যাক।

কালী—আদ্যা মহাবিদ্যা কালী। সাধারণতঃ লোকে শক্তিসাধনা বলতে কালীসাধনাই বোঝে। বিশেষ করে বাংলাদেশে ত বটেই। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে আছে হাদিমতে মহাশক্তিকে কেরলে কালী, কাশ্মীরে ত্রিপুরা এবং গৌড়ে তারা বলা হয়। কিন্তু কাদিমতে কেরলে দেবীকে ত্রিপুরা, কাশ্মীরে তারিণী বালা এবং গৌড়ে কালী বলা হয়।[৩] লক্ষ্য করা গেছে গৌড়সম্প্রদায়ে কাদিমতই সর্বোচ্চ বলে অনুসৃত হয়। কাজেই গৌড়দেশে কালীর আরাধনার প্রাধান্যের শাস্ত্রীয় নির্দর্শনও পাওয়া যায়।

কালীনামের ব্যাখ্যা— মহানির্বাণতন্ত্রে দেখা যায় সদাশিব দেবীকে বলছেন—জগৎসংহারকারী মহাকাল তোমার রূপবিশেষ। মহাসংহারকালে কাল সমস্ত বিশ্ব গ্রাস করবেন। সর্বভূতকে কলন অর্থাৎ গ্রাস করার জন্য তাঁকে মহাকাল বলা হয়। আর

১ কালিকায়া মহাকালঃ সুন্দর্য্যা ললিতেশ্বরঃ। তারায়াশ্চ তথাঽক্ষোভ্যশ্ছিন্নায়া বিকরালকঃ।
ভুবনায়া মহাদেবো ধূম্রায়াঃ কালভৈরবঃ। নারায়ণো মহালক্ষ্ম্যা ভৈরব্যা বটুকঃ স্মৃতঃ।
মাতঙ্গ্যাস্তু মতঙ্গঃ স্যাদথ বা স্যাৎ সদাশিবঃ। মৃত্যুঞ্জয়স্তু বগলাবিদ্যায়াঃ পরিকীর্তিতঃ।

শ স, পু চ, ত: ১, পৃঃ ১৩-১৫

২ মহাত্রিপুরসুন্দর্য্যা দক্ষিণে পূজয়েচ্ছিবম্। পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রঞ্চ প্রতিবক্ত্রে সুরেশ্বরি।
তেন সার্দ্ধং মহাদেবী সদা কামকুতূহলা। ...শ্রীমদ্ভুবনসুন্দর্য্যা দক্ষিণে ত্র্যম্বকং যজেৎ।
...ভৈরব্যা দক্ষিণে ভাগে দক্ষিণামূর্তিসংজ্ঞকম্। ...ছিন্নমস্তাদক্ষিণাংশে কবন্ধং পূজয়েচ্ছিবম্।
...ধূমাবতী মহাবিদ্যা বিধবারূপধারিণী। ...বগলায়া দক্ষভাগে একবক্ত্রং প্রপূজয়েৎ।
মহারুদ্রেতি বিখ্যাতং জগৎসংহারকারকম্।...কমলায়া দক্ষিণাংশে বিষ্ণুরূপং সদাশিবম্।

তোড়লতন্ত্র, পঃ ১

৩ কেরলে কালিকা প্রোক্তা কাশ্মীরে ত্রিপুরা মতা। গৌড়ে তারেতি সংপ্রোক্তা সৈব লোকোত্তরা ভবেৎ।
হাদৌ ত্রিতয়মেতদ্ধি সংক্ষেপেণ প্রকীর্তিতম্। অথ কাদৌ কেরলে তু ত্রিপুরা সা প্রকীর্তিতা।
কাশ্মীরে তারিণী বালা গৌড়ে কালী প্রকীর্তিতা।—শ স ত, কা খ, ৩।২৩-২৬

মহাকালকেও গ্রাস কর বলে তুমি আদ্যা কালিকা। কালকে গ্রাস কর বলে তুমি কালী। তুমি সমগ্র বিশ্বের আদিরূপিণী অর্থাৎ কারণস্বরূপা। সৃষ্টিকালে সমগ্র বিশ্বের তুমি আদিরূপিণী এবং সংহারকালে সমগ্র বিশ্ব তুমি কলন কর, এইজন্য তোমাকে আদ্যা কালী বলা হয়।[১]

কলনশব্দের একাধিক অর্থ। যথা— গতি ক্ষেপ জ্ঞান গণন ভোগীকরণ শব্দ এবং স্বাত্মসাৎকরণ। সেইজন্য শ্রীভূতিরাজ-প্রমুখ আচার্যেরা বলেন মহাশক্তি বিশ্বকে ক্ষেপণ করেন, জীবকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন এবং বিশ্বকে সংহার করেন বলে তিনি কালী।[২]

কাল—আবার কালীকে বলা হয়েছে কালগতা শক্তি।[৩] এই কালের স্বরূপ কি? অথর্ববেদে কালসূক্তে কাল সম্বন্ধে বলা হয়েছে—কাল জগৎ সৃষ্টি করেছেন, কালে সূর্য তাপ দেয়, কালে সমস্ত প্রাণী বিধৃত, কালে চক্ষু দূরদর্শন করতে পারে। কালে মন প্রাণ বিধৃত। কালে নাম সমাহিত, কাল এলে সমস্ত প্রজা আনন্দিত হয়। কালে আছে তপ, আছে জ্যেষ্ঠ অর্থাৎ যা প্রধান এবং কালে ব্রহ্ম সমাহিত। কাল সর্বেশ্বর, কাল প্রজাপতির পিতা। প্রজাপতি তাঁর দ্বারা প্রেরিত, তাঁর দ্বারা জাত, তাঁতে প্রতিষ্ঠিত। কাল ব্রহ্ম হয়ে পরমেষ্ঠী অর্থাৎ ব্রহ্মাকে ভরণ করেন।[৪]

কালসূক্তে দেখা যায় কাল সৃষ্টিকারী ও পালনকারী দেবতা। পরে কাল এবং ধ্বংসকারী দেবতা রুদ্র এক হয়ে গেছেন।[৫] আর পুরাণে ও তন্ত্রে তিনিই শিব মহাকালরূপে দেখা দিয়েছেন। এই পরমশিব মহাকাল কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় বিধান করেন।[৬]

---

১ তব রূপং মহাকালো জগৎসংহারকারকঃ। মহাসংহারসময়ে কালঃ সর্বং গ্রসিষ্যতি।
কলনাৎ সর্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্তিতঃ। মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা।
কালসংগ্রসনাৎ কালী সর্বেষামাদিরূপিণী। কালত্বাদাদিভূতত্বাদাদ্যা কালীতি গীয়তে।—মহা ত ৪।৩০-৩২

২ কলনং—চ গতিঃ ক্ষেপো জ্ঞানং গণনং ভোগীকরণং শব্দনং স্বাত্মলয়ীকরণং চ। যদাহুঃ শ্রীভূতিরাজগুরবঃ ক্ষেপাজ্জ্ঞানাচ্চ কালী কলনবশতয়াপ··· ।—অভিনবগুপ্তের তন্ত্রসার, পৃঃ ৩০

৩ কালী কালগতা শক্তিঃ।—অহির্বুধ্ন্যসংহিতা, ২৮

৪ কালো ভূতিমসৃজত কালে তপতি সূর্যঃ। কালে হ বিশ্বা ভূতানি কালে চক্ষুর্বি পশ্যতি।
কালে মনঃ কালে প্রাণঃ কালে নাম সমাহিতম্। কালেন সর্বা নন্দন্ত্যাগতেন প্রজা ইমাঃ।
কালে তপঃ কালে জ্যেষ্ঠং কালে ব্রহ্ম সমাহিতম্। কালো হ সর্বস্যেশ্বরো যঃ পিতাসীৎ প্রজাপতেঃ।
তেনেষিতং তেন জাতং তদু তস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতম্। কালো হ ব্রহ্ম ভূত্বা বিভর্তি পরমেষ্ঠিনম্।

—অ বে ১৯।৫৩।৬-৯

৫ ব্রহ্মাদিভূতপর্যন্তং জগদেতচ্চরাচরম্। যতঃ কলয়তে রুদ্রঃ কালরূপী ততঃ স্মৃতঃ।
ব্রঃ পা সূ ২।৩-এর কৌণ্ডিন্যভাষ্য

৬ Karpūrādistotra, T. T., Vol. IX, Intro. p. 2

এই মহাকালের শক্তি মহাকালী। শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ নেই। সেইজন্যই মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে মহাকাল মহাকালীরই রূপ।

আবির্ভাবকাহিনী— পুরাণাদিতে জনসাধারণের উপযোগী করে মহাদেবীর কালীরূপে আবির্ভাবের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। নারদপঞ্চরাত্রে বলা হয়েছে— দক্ষগৃহে সমুদ্ভূতা লোকবিশ্রুতা সতী রাজর্ষি দক্ষের প্রতি কুপিতা হয়ে দেহত্যাগ করেন এবং মেনকার প্রতি অনুগ্রহ করে তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম হয় কালী। কালী সর্বশাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা।[১]

মার্কণ্ডেয়পুরাণে আছে— শুম্ভনিশুম্ভের দ্বারা উৎপীড়িত দেবতারা হিমালয়ে গিয়ে মহাদেবীর স্তব করছিলেন। তখন পার্বতী তাঁদের সম্মুখে এসে জিজ্ঞাসা করলেন আপনারা কাঁর স্তব করছেন এবং সেই মুহূর্তে তাঁর (পার্বতীর) শরীরকোষ থেকে শিবা অম্বিকা আবির্ভূতা হয়ে বললেন দেবতারা আমার স্তব করছেন। পার্বতীর শরীরকোষ থেকে উৎপন্না বলে অম্বিকাকে বলা হয় কৌশিকী।[২] কৌশিকী দেবী নির্গতা হয়ে গেলে পার্বতী কৃষ্ণা হয়ে গেলেন এবং হিমালয়ে অধিষ্ঠিতা হয়ে কালিকা নামে খ্যাত হলেন।[৩]

এখানে দেখা যাচ্ছে দেবী কৃষ্ণবর্ণা বা কাল বলে তাঁকে কালী বলা হয়েছে।

দুর্গাসপ্তশতীতে আবার চামুণ্ডাকেও কালী বলা হয়েছে। আর এই চামুণ্ডা-কালীর আবির্ভাবের নিম্নলিখিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে—শুম্ভের আদেশে চণ্ডমুণ্ড-প্রমুখ দৈত্যেরা হিমাচলশৃঙ্গে সিংহের উপর আসীনা দেবী অম্বিকাকে ধরতে গেলে ক্রোধে দেবীর মুখমণ্ডল মসীবর্ণ হল।[৪]

তখন তাঁর ভ্রুকুটিকুটিল ললাটফলক থেকে অসিপাশধারিণী করালবদনা কালী দ্রুত বিনির্গতা হলেন। কালিকাদেবীর হাতে বিচিত্র খট্বাঙ্গ অর্থাৎ কঙ্কালপঞ্জর, গলায় নরমুণ্ডের মালা, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম, তাঁর শরীরের মাংস শুষ্ক। তিনি অতিভীষণা, অতীব ভয়ঙ্করী, অতিবিশাল-বদনা। লেলিহান জিহ্বার জন্য তাঁকে ভীষণা দেখাচ্ছে। তাঁর আরক্ত চক্ষু কোটরগত। সিংহনাদে তিনি দিঙ্‌মণ্ডল পূর্ণ করছেন।[৫]

১ দক্ষগেহে সমুদ্ভূতা যা সতী লোকবিশ্রুতা। কুপিতা দক্ষরাজর্ষিং সতী ত্যক্ত্বা কলেবরম্।
অনুগৃহ্য চ মেনায়াং জাতা তস্যাস্তু সা তদা। কালী নাম্নেতি বিখ্যাতা সর্বশাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা।
—নারদপঞ্চরাত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৫, পরিঃ ৬, ব সং, পৃঃ ৭৭৫   ২ দু স, অঃ ৫

৩ তস্যাং বিনির্গতায়াং কৃষ্ণাভূৎ সাপি পার্বতী।
কালিকেতি সমাখ্যাতা হিমাচলকৃতাশ্রয়া।—ঐ ৫।৮১   ৪ ঐ, অঃ ৭

৫ ভ্রুকুটীকুটিলাত্তস্যা ললাটফলকাদ্দ্রুতম্। কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী।
বিচিত্রখট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা। দ্বীপিচর্মপরীধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা।
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা। নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্‌মুখা।—ঐ ৭।৫-৭

কালীর স্বরূপ—কালীর স্বরূপ ব্যাখ্যাত হয়েছে তন্ত্রাদিতে। কালী ব্রহ্ম।[১] এ সম্বন্ধে নানা তন্ত্রে অনেক বচন পাওয়া যায়। যেমন শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে বলা হয়েছে—তিনিই অর্থাৎ কালীই আদিনাথোক্ত পরব্রহ্ম বলে বর্ণিতা অথবা তিনিই আদিনাথ ও পরব্রহ্ম বলে বর্ণিতা। তিনি সচ্চিদাত্মস্বরূপা ব্রহ্মরূপা ও নির্গুণা।[২] উক্ত তন্ত্রের অন্যত্রও বলা হয়েছে—আদ্যা কালী নির্গুণা বাক্যাতীতা ও পরাৎপরা।[৩] আরেক জায়গায় আছে—ব্রহ্মবিদ্যা কালিকা নির্গুণা চিৎস্বরূপিণী। যে-কোনো প্রকারে এই জননী পরাশক্তি সাধনীয়া।[৪]

মহাকালসংহিতায় কালীকে বলা হয়েছে—অচিন্তনীয়া, অমিতাকারশক্তিস্বরূপা, প্রত্যেক ব্যক্তির একমাত্র অধিষ্ঠানসত্তাস্বরূপা, গুণাতীতা, নির্দ্বন্দ্ববোধগম্যা একমাত্র তুমিই পরব্রহ্মরূপে প্রসিদ্ধা।[৫]

ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবতা কালিকার থেকেই উদ্ভূত আবার কালিকার মধ্যেই লয়প্রাপ্ত হন। নির্বাণতন্ত্রের অভিমত—বৃক্ষ যেমন মাটিতে জন্মে মাটিতে মিশে যায়, বুদ্‌বুদ যেমন জলে জন্মে জলে মিশে যায়, তড়িৎ যেমন মেঘে উৎপন্ন হয়ে মেঘে বিলীন হয়, তেমনি ব্রহ্মাদি দেবতারা সৃষ্টিকালে কালিকার থেকে উদ্ভূত হয়ে আবার প্রলয়কালে তাঁর মধ্যেই লয়প্রাপ্ত হন।[৬]

কালীকে নির্গুণা বলা হয়েছে কিন্তু তিনি নির্গুণা এবং সগুণা উভয়ই।[৭] তেমনি তিনি নিরাকারা এবং সাকারা। মহানির্বাণতন্ত্রে দেখা যায় সদাশিব বলছেন—পুনঃ অর্থাৎ প্রলয়ের পর তুমি আবার তমোরূপ নিরাকার স্বরূপ প্রাপ্ত হও এবং বাক্যের অতীত ও মনের

---

১ (i) ওঁ অথ হ এনাং ব্রহ্মরন্ধ্রে ব্রহ্মরূপিণীমাপ্নোতি।—কালিকোপনিষৎ মন্ত্র ১

(ii) সচ্চিদানন্দরূপাহং ব্রহ্মৈবাহং স্ফুরৎপ্রভম্।—যো ত, পূ খ, পঃ ১০

২ সা এব আদিনাথোক্তং (খলু) পরব্রহ্মেতি গীয়তে।

সচ্চিদাত্মস্বরূপেয়ং ব্রহ্মরূপা২প নির্গুণা।—শ স ত, তা খ, ৫।৭৪

৩ আদ্যা শ্রীনির্গুণা কালী বাচ্যাতীতা পরাৎপরা।—ঐ, কা খ, ২।১০৫

৪ কালিকা ব্রহ্মবিদ্যেয়ং নির্গুণা চিৎস্বরূপিণী।

যেন কেন প্রকারেণ সাধনীয়া পরাম্বিকা।—ঐ, তা খ, ৩।২৪-২৫

৫ অচিন্ত্যামিতাকারশক্তিস্বরূপা প্রতিব্যক্ত্যধিষ্ঠানসত্ত্বৈকমূর্তিঃ।

গুণাতীতনির্দ্বন্দ্ববোধৈকগম্যা ত্বমেকা পরব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা।

—মহাকালসংহিতাবচন, দ্রঃ কর্পূরাদিস্তোত্রের

৭ম শ্লোকের বিমলানন্দ স্বামীকৃত টীকা।

৬ জায়তে চ ক্ষিতৌ বৃক্ষো যথা পৃথ্ব্যাং বিলীয়তে। তোয়াত্তু বুদ্‌বুদং জাতং যথা তোয়ে বিলীয়তে।

জলদে তড়িদুৎপন্না লীয়তে চ যথা ঘনে। তথা ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ কালিকায়াং প্রজায়তে।

তথা প্রলয়কালে তু পুনঃ তস্যাং প্রলীয়তে।—নি ত, পটল ১০

৭ বিপরীতরতা কালী নির্গুণা সগুণাপি চ।—নিরু ত, পঃ ২

অগম্য তোমার এই রূপ। তখন তুমিই এক হয়ে বিরাজ কর। সাকারা হয়েও তুমি নিরাকারা। আপন মায়াশক্তিকে অবলম্বন করে তুমি বহুরূপ ধারণ কর। তুমি সকলের আদি কিন্তু স্বয়ং অনাদি। তুমি সকলের সৃষ্টিকর্ত্রী পালনকর্ত্রী ও হরণকর্ত্রী।[১]

পরব্রহ্মরূপিণী কালী যে সকলের আদি অর্থাৎ একমাত্র কারণ মহাকালসংহিতায় তা স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে। উক্ততন্ত্রে মহাকালীস্তোত্রে বলা হয়েছে—যখন ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র পঞ্চভূত কিছুই ছিল না তখন পরব্রহ্মরূপিণী একমাত্র তুমিই সকলের কারণরূপে বিরাজমানা ছিলে।[২]

পূর্বেই বলা হয়েছে কালী ব্রহ্মাদি দেবতাসহ সব কিছুর সৃষ্টি-পালন- ও সংহার-কারিণী। সৃষ্টিকর্ত্রী তিনি আবার সৃষ্টিও তিনি। এই ভাবটিকে বিশদ করে কর্পূরাদিস্তোত্রে বলা হয়েছে—জননী! তুমি জগতের প্রসূতি, পালয়িত্রী এবং প্রলয়কালে ক্ষিত্যাদি সমস্তের সংহারকারিণী। অতএব তুমি ব্রহ্মা ত্রিভুবনপতি-বিষ্ণু এবং মহেশও তুমি। সমস্তই তুমি অর্থাৎ জগতের নিমিত্তকারণ তুমি, উপাদানকারণও তুমি। তোমার কি আর স্তব করব?[৩]

কালিকাশব্দের ব্যাখ্যা— কালিকা যে অনাদ্যন্তব্রহ্মস্বরূপিণী কালিকাশব্দের বর্ণসমূহের ব্যাখ্যার দ্বারাও তা প্রতিপন্ন করা যায়।[৪] কালিকাশব্দের বর্ণবিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় ক্+আ+ল্+ই+ক্+আ। ক ব্রহ্ম,[৫] আ অনন্ত,[৬] ল বিশ্বাত্মা,[৭] ই সূক্ষ্মা।[৮] কাজেই দাঁড়াল কালিকা ব্রহ্ম, অনন্ত, বিশ্বাত্মা, সূক্ষ্মা।

১ পুনঃ স্বরূপমাসাদ্য তমোরূপং নিরাকৃতিঃ। বাচাতীতা মনোঽগম্যা ত্বমেকৈবাবশিষ্যসে।
সাকারাঽপি নিরাকারা মায়য়া বহুরূপিণী। ত্বং সর্বাদিরনাদিস্ত্বং কর্ত্রী হর্ত্রী চ পালিকা।

মহা ত ৪।৩১-৩৪

২ যদা নৈব ধাতা ন বিষ্ণু ন রুদ্রো ন কালো ন বা পঞ্চভূতানি চাসন্।
তদা কারণীভূতসত্ত্বৈকমূর্তিঃ ত্বমেকা পরব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা।—কর্পূরাদিস্তোত্রের ৩য় শ্লোকের বিমলানন্দ স্বামীকৃত স্বরূপব্যাখ্যায় উদ্ধৃত।

৩ প্রসূতে সংসারং জননি ভবতী পালয়তি চ।
সমস্তং ক্ষিত্যাদি প্রলয়সময়ে সংহরতি চ।
অতস্ত্বং ধাতাসি ত্রিভুবনপতিঃ শ্রীপতিরপি।
মহেশোঽপি প্রায়ঃ সকলমপি কিং স্তৌমি ভবতী।—কর্পূরাদিস্তোত্র, ১২

৪ দ্রঃ ঐ, ৩য় শ্লোকের বিমলানন্দ স্বামীকৃত স্বরূপব্যাখ্যা।

৫ ক=ব্রহ্ম সৃষ্টিঃ খাদিমশ্চ ক্রোধীশশ্চ মহাসু(হ)কঃ। দক্ষিণো মূলমন্ত্রী কামাখ্যো গণনায়কঃ।

—তন্ত্রাভিধান (T. T. Vol. I) পৃঃ ৫২

৬ আ=মুখবৃত্তং ভরঃ শেষো দীর্ঘোঽনন্তো মরুৎ তথা।—ঐ, পৃঃ ৫৩

৭ ল—বিশ্বাত্ম-মন্দৌ (মন্ত্রৌ?) বলবান্ মেরুর্গিরিঃ কলারসঃ।—ঐ, পৃঃ ২০

৮ ই—ইঃ সূক্ষ্মা শাল্মলী বিন্দা চন্দ্রঃ পুষা সুগুহ্যকঃ।—ঐ, পৃঃ ৩

বীজমন্ত্রের ব্যাখ্যা— কালীর বীজমন্ত্র ক্রীঁ। ক্রীঁ—ক্‌+র্‌+ঈ+ঁ। বরদাতন্ত্রোক্ত মন্ত্রার্থাভিধানে বীজটির অর্থ ব্যাখ্যা করা হয়েছে—ক কালী, র ব্রহ্ম, ঈ মহামায়া, নাদ বিশ্বমাতা আর বিন্দু দুঃখহর। এই বীজমন্ত্রের দ্বারাই দুঃখশান্তির জন্য কালিকাদেবীর পূজা করবে।[১]

সংকেততন্ত্রে বীজমন্ত্রটির অন্যরকম ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। তাতে আছে— ককার থেকে বিশ্ব উৎপন্ন, সেই কারণে দেবী সৃষ্টিস্বরূপিণী; র কালাগ্নিরুদ্রাত্মক, সেই কারণে দেবী সংহাররূপিণী, ঈ লোকত্রয়পালিনী মহালক্ষ্মী, সেই কারণে দেবী পালিনী শক্তি আর বিন্দু (ঁ) শিবশক্তির সামরস্যের দ্যোতক।[২]

আবার তন্ত্রকল্পদ্রুমে অন্যভাবে বীজমন্ত্রটির ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বলা হয়েছে— উজ্জ্বলরূপত্বের জন্য ককার জ্ঞানচিৎকলা, রকারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই চিৎকলা সর্বতেজোময়ী শুভা; ঈকার যুক্ত হয়ে সাধকের অভীষ্টদায়িনী আর বিন্দুর নিষ্কলত্বহেতু কৈবল্যদায়িনী।[৩]

তোড়লতন্ত্রে বীজটির ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। যথা—ককার ধর্মদায়ক, ঈকার অর্থদায়ক, রকার কামদায়ক এবং মকার (অর্থাৎ ং। ঁ না দিয়ে অনুস্বার দেওয়া হয়েছে) মোক্ষদায়ক। একত্র উচ্চারিত হলে অর্থাৎ ক্রীং এই বীজমন্ত্র যথাশাস্ত্র উচ্চারিত হলে নির্বাণমোক্ষ প্রদান করে।[৪]

কালীমাহাত্ম্য—

কলিযুগে কালী— কালীকুলের শাস্ত্রমতে কলিযুগে একমাত্র কালীই ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনী। কুমারীতন্ত্রে বলা হয়েছে—মহাশক্তির কালীরূপ বিশেষ করে কলিযুগে মানুষের ভুক্তিমুক্তিপ্রদ। কালীর উপাসক ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব চন্দ্র সূর্য বরুণ কুবের অগ্নি এবং অন্যান্য দেবতা; এ ছাড়া দুর্বাসা বশিষ্ঠ দত্তাত্রেয় বৃহস্পতি এই-সব ঋষি। বেশী কথা

---

১ ক কালী ব্রহ্ম র প্রোক্তং মহামায়ার্থকশ্চ ঈ। বিশ্বমাত্রর্থকো নাদো বিন্দুর্দুঃখহরার্থকঃ।
তেনৈব কালিকাদেবীং পূজয়েদ্ দুঃখশান্তয়ে।—তন্ত্রাভিধান (T. T. Vol. I) পৃঃ ৬২

২ ককারাদ্বিশ্বমুৎপন্নং তেন সৃষ্টিস্বরূপিণী। রেফঃ কালাগ্নিরুদ্রাত্মা তেন সংহাররূপিণী।
ঈকারশ্চ মহালক্ষ্মীর্লোকত্রয়বিভাবিনী। তেনেয়ং পালিনী শক্তিঃ সামরস্যং চ বিন্দুনা।
—দ্রঃ, পু চ, ৯ম তরঙ্গ, পৃঃ ৭২৪

৩ ককারোজ্জ্বলরূপত্বাৎ কেবলং জ্ঞানচিৎকলা। জ্বলনার্ণসমাযোগাৎ সর্বতেজোময়ী শুভা।
দীর্ঘেকারেণ দেবেশি সাধকাভীষ্টদায়িনী। বিন্দুনাং নিষ্কলত্বাচ্চ কৈবল্যফলদায়িনী।—তন্ত্রকল্পদ্রুম,
দ্রঃ, কর্পূরাদিস্তোত্রের ১ম শ্লোকের বিমলানন্দ স্বামীকৃত স্বরূপব্যাখ্যা।

৪ ককারং ধর্মদং দেবি ঈকারং চার্থদায়কং। রকারং কামদং কান্তে মকারং মোক্ষদায়কং।
একত্রোচ্চারণাদ্দেবি নির্বাণমোক্ষদায়িনী।—তোড়লতন্ত্র, উঃ ৬

বলে কি হবে সব দেবতাই কালীর উপাসক। কালিকার প্রসাদেই ভুক্তিমুক্তি করতলগত হয়।[১]

তন্ত্রান্তরেও বলা হয়েছে— কালিকা জগতের মাতা, শোকদুঃখবিনাশিনী। বিশেষতঃ কলিযুগে তিনি মহাপাতকহারিণী।[২]

কলিযুগে কালীর আরাধনা যে প্রশস্ত একথা শাস্ত্রে অন্যভাবেও বলা হয়েছে। তারারহস্তে আছে—কলিতে জেগে আছেন কালী, জেগে আছেন পন্নগী। কালী ও কৃষ্ণ কলিতে জাগ্রত দেবতা।[৩] কাজেই এ যুগে এঁদের আরাধনাই প্রশস্ত।

কালী সম্বন্ধে কথাটাকে আরও বিশদ করে তন্ত্রান্তরে বলা হয়েছে—কলিযুগে কালীই একমাত্র আরাধ্যা। এ যুগে শিবকর্তৃক আরাধিতা হয়ে কালী প্রত্যক্ষ হন। কলিকালে কালীকে পরিত্যাগ করে কেউ যদি মোক্ষকামী হন তা হলে তিনি ভোজন ছাড়াই ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে চাইবেন।[৪]

শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে বলা হয়েছে— কলিযুগে যিনি কালীকে পরিত্যাগ করে সিদ্ধিকামী হন তিনি চক্ষু ছাড়াই দর্পণে রূপ দেখতে চান।[৫]

এই ধরণের তন্ত্রবচন অনেক পাওয়া যায়।

কালীমন্ত্রের প্রশংসা— তন্ত্রে কালীমন্ত্রেরও প্রভূত প্রশংসা করা হয়েছে। কুব্জিকা-তন্ত্রে বলা হয়েছে— এই পরমা বিদ্যা অদেয়া, কলিযুগে পূর্ণফলপ্রদা, মোক্ষদা এবং শীঘ্রফলপ্রদা।[৬]

১ বিশেষতঃ কলিযুগে নরাণাং ভুক্তিমুক্তিদম্। তস্যাস্তূপাসকাশ্চৈব ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাদয়ঃ।
চন্দ্রঃ সূর্যশ্চ বরুণঃ কুবেরোঽগ্নিস্তথাপরঃ। দুর্বাসাশ্চ বশিষ্ঠশ্চ দত্তাত্রেয়ো বৃহস্পতিঃ।
বহুনা কিমিহোক্তেন সর্বে দেবা উপাসকাঃ। কালিকায়াঃ প্রসাদেন ভুক্তিমুক্তিঃ করে স্থিতা।

—প্রা:, শ্যামারহস্য পরি: ১

২ কালিকা জগতাং মাতা শোকদুঃখবিনাশিনী। বিশেষতঃ কলিযুগে মহাপাতকহারিণী।

—প্রা:, ঐ, পরি: ৩(৪৭)

৩ কলৌ জাগর্তি কালী চ কলৌ জাগর্তি পন্নগী। কলৌ কালী কলৌ কৃষ্ণ কলৌ গোপালকালিকা।

—তারারহস্য, পৃ: ২

৪ কলৌ কালী কলৌ কালী কলৌ কালী তু কেবলা। সাধিতা কামনাথেন প্রত্যক্ষা কালিকা কলৌ।
কলৌ কালীং বিহায়াথ যঃ কশ্চিন্মোক্ষকামুকঃ। স ভোজনং বিনা নূনং ক্ষুন্নিবৃত্তিমভীপ্সতি।

—তন্ত্রান্তরবচন, প্রা:, পু চ, ভা: ৯ পৃ: ৭২৩

৫ কলৌ কালীং বিহায়াথ যঃ কশ্চিৎ সিদ্ধিকামুকঃ। স চক্ষুসা বিনা রূপং দর্পণে দ্রষ্টুমিচ্ছতি।

—শ স ত, তা খ, ১।৮৮

৬ অদেয়া পরমা বিদ্যা কলৌ পূর্ণফলপ্রদা। কালিকা মোক্ষদা দেবি কলৌ শীঘ্রফলপ্রদা।

প্রা তো, কাণ্ড ৩, পরি: ৬, ব সং, পৃ: ৩৮৩

ভৈরবতন্ত্রে কালিকামন্ত্র সম্বন্ধে বলা হয়েছে— এই-সব বিদ্যার জ্ঞানমাত্র মানুষ জীবন্মুক্ত হয়।[১]

বিভিন্ন কালী—তন্ত্রশাস্ত্রে বিভিন্ন কালীর বিবরণ আছে। কালী স্বরূপতঃ এক। সাধকের অধিকার এবং অভীষ্ট অনুসারেই তাঁর বিভিন্ন নামরূপ শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে। মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে কালমাতা মহাপ্রভাময়ী অরূপা কালিকার রূপকল্পনা হয় গুণক্রিয়ানুসারে।[২] একথা আমরা পূর্বেও বলেছি।

তোড়লতন্ত্রের মতে কালী অষ্টধা। যথা—দক্ষিণাকালিকা সিদ্ধকালিকা গুহ্যকালিকা শ্রীকালিকা ভদ্রকালী চামুণ্ডাকালিকা শ্মশানকালিকা আর মহাকালী।[৩]

মহাকালসংহিতার অনুস্মৃতিপ্রকরণে বলা হয়েছে— কালী নববিধা সর্বতন্ত্রে এ কথা স্বীকৃত। আদ্যা দক্ষিণাকালী, দ্বিতীয়া ভদ্রকালী, তৃতীয়া শ্মশানকালী, চতুর্থী কালকালী, গুহ্যকালী পঞ্চমী, ষষ্ঠী কামকলাকালী, সপ্তমী ধনকালিকা, অষ্টমী সিদ্ধিকালী আর নবমী চণ্ডিকালিকা।[৪]

লক্ষণীয় উভয় তালিকাতেই প্রথম নামটি দক্ষিণাকালীর। এ ছাড়া সিদ্ধকালী গুহ্যকালী ভদ্রকালী এবং শ্মশানকালী উভয় তালিকাতেই আছেন।

এ ছাড়া অন্যান্য কালীর নামও পাওয়া যায়। যেমন জয়দ্রথযামলে পাওয়া যায় এই-সব নাম —কালিকা ডম্বরকালী রক্ষাকালী ইন্দীবরকালিকা ধনদকালিকা রমণীকালিকা ঈশানকালিকা জীবকালী বীর্যকালী প্রজ্ঞাকালী ও সপ্তার্ণকালী।[৫]

শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে হংসকালী[৬] ও বশীকরন-কালিকার[৭] নাম করা হয়েছে।

এই-সব নাম পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সাধকের অভীষ্ট অনুসারেই কালিকাদেবীর

---

১ অথ বক্ষ্যে মহাবিদ্যাঃ কালিকায়াঃ সুদুর্লভাঃ। যাসাং বিজ্ঞানমাত্রেণ জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ।
—দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৩০৭

২ অরূপায়াঃ কালিকায়াঃ কালমাতুর্মহাদ্যুতেঃ। গুণক্রিয়ানুসারেণ ক্রিয়তে রূপকল্পনা।—মহা ত ৫।১৪০

৩ দক্ষিণাকালিকা সিদ্ধকালিকা গুহ্যকালিকা। শ্রীকালিকা ভদ্রকালী চামুণ্ডাকালিকা পরা।
শ্মশানকালিকা দেবি মহাকালীতি চাষ্টধা।—তোড়লতন্ত্র, পঃ ৩

৪ কালী নববিধা প্রোক্তা সর্বতন্ত্রেষু গোপিতা। আদ্যা দক্ষিণাকালী চ ভদ্রকালী তথা পরা।
অন্যা শ্মশানকালী চ কালকালী চতুর্থিকা। পঞ্চমী গুহ্যকালী চ পূর্বং যা কথিতা ময়া।
ষষ্ঠী কামকলাকালী সপ্তমী ধনকালিকা। অষ্টমী সিদ্ধিকালী চ নবমী চণ্ডিকালিকা।
—দ্রঃ পু চ, খঃ ১, পৃঃ ১৩

৫ Bagchi : Evolution of Tantras, C. Her. I., Vol. IV, p. 2'9

৬ শ স ত, কা খ, ৬।১৩০ ৭ ঐ ১।৬৩

বিভিন্ন রূপ নির্দিষ্ট হয়েছে। যে-বিভিন্ন নামের কালিকার উল্লেখ এইমাত্র করা হল তাঁদের সবার ধ্যান ও মন্ত্রাদি প্রচলিত মুদ্রিত তন্ত্রাদিতে পাওয়া যায় না। কাজেই প্রত্যেকের পৃথক্ সাধনা আছে কি না বলা কঠিন। কেন না মুদ্রিত তন্ত্রে নেই বলেই যে কোনো তন্ত্রে নেই এমন কথা বলা যায় না। কারণ তন্ত্রগ্রন্থ সামান্যই মুদ্রিত হয়েছে আবার অনেক গ্রন্থ লোপ পেয়েও গেছে।

সেইজন্য এখানে শুধু কালীর কয়েকটি বহুপ্রচলিত রূপের বিবরণ দেওয়া গেল।

দক্ষিণাকালী—লক্ষ্য করা গেছে মহাকালসংহিতা অনুসারে আদ্যা[১] কালী দক্ষিণা-কালী। নির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে—দক্ষিণ দিকে রবিসুত অর্থাৎ যমের অবস্থান। কালী নামে ভীত হয়ে সে ইতস্ততঃ ছুটে পালায়। এইজন্যই ত্রিজগতে কালিকাদেবীকে দক্ষিণাকালী বলা হয়।[২]

উক্ত তন্ত্রে আরও বলা হয়েছে—পুরুষকে অর্থাৎ শিবকে বলা হয় দক্ষিণ আর শক্তিকে বামা। বামা দক্ষিণকে জয় করে মহামোক্ষপ্রদায়িনী হন। এইজন্য ত্রিজগতে তিনি দক্ষিণা নামে পরিচিতা।[৩]

এ সম্পর্কে তন্ত্রতত্ত্বের আলোচনাটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। "পুরুষের নাম দক্ষিণ (দক্ষিণাঙ্গ স্বরূপ বলিয়া) শক্তির নাম বাম (বামাঙ্গস্বরূপ বলিয়া)। যতদিন এই বাম ও দক্ষিণ, স্ত্রী ও পুরুষ সমবলে অবস্থিত, ততদিন সংসারবন্ধন (তন্ত্রমতে মহাশক্তির পুরুষ-অংশ সংসার-প্রবৃত্তিময় বন্ধনের কারণ এবং শক্তি-অংশই সংসার-নিবৃত্তিময় মুক্তির কারণ)। সাধনার প্রখর প্রভাবে বামাশক্তি জাগরিতা হইলে তিনি যখন দক্ষিণশক্তি পুরুষকে জয় করিয়া তদুপরি স্বয়ং দক্ষিণানন্দে নিমগ্না হয়েন অর্থাৎ কি বাম, কি দক্ষিণ উভয় অংশই যখন

১ মহানির্বাণতন্ত্রে আদ্যা কালীর যে-ধ্যান বর্ণিত হয়েছে তা অন্যান্য তন্ত্রে বর্ণিত দক্ষিণাকালীর ধ্যানের থেকে ভিন্ন। কাজেই উক্ত তন্ত্রানুসারে আদ্যাকালী ব্যবহারতঃ দক্ষিণাকালী থেকে পৃথক্ মনে হয়। আদ্যাকালীর ধ্যান, যথা—

মেঘাঙ্গীং শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং রক্তাম্বরাং বিভ্রতীং
পাণিভ্যামভয়ং বরঞ্চ বিলসদ্রক্তারবিন্দস্থিতাম্।
নৃত্যন্তং পুরতো নিপীয় মধুরং মাধ্বীকমদ্যং মহা—
কালং বীক্ষ্য বিকাসিতাননবরামাদ্যাং ভজে কালিকাম্।—মহা ত ৫।১৪১

২ দক্ষিণস্যাং দিশি স্থানে সংস্থিতশ্চ রবেঃ সুতঃ। কালীনাম্না পলায়েত ভীতিযুক্তঃ সমন্ততঃ।
ততঃ সা দক্ষিণা নাম্না ত্রিষু লোকেষু গীয়তে।—নি ত, পঃ ১০

৩ পুরুষো দক্ষিণঃ প্রোক্তো বামা শক্তির্নিগদ্যতে। বামা সা দক্ষিণং জিত্বা মহামোক্ষপ্রদায়িনী।
অত সা দক্ষিণা নাম্না ত্রিষু লোকেষু গীয়তে।—ঐ

তাঁহার প্রভাবে পূর্ণ হইয়া যায়, তখনই সেই কেবলানন্দরূপিণী জীবের মহামোক্ষ প্রদান করেন। তাই ত্রৈলোক্যমোক্ষদা মায়ের নাম দক্ষিণাকালী।"[১]

দক্ষিণাকালীর অন্যরকম ব্যাখ্যাও আছে। কামাখ্যাতন্ত্রে শিব বলছেন—যজ্ঞাদি কর্মের শেষে দক্ষিণা যেমন যজ্ঞাদিকে সফল করে তেমনি হে দেবি! কালিকা সকলকে বাঞ্ছিত ফল এবং মুক্তি দেন বলে সেই বরবর্ণিনীকে দক্ষিণাকালী বলা হয়।[২]

আবার কেউ কেউ বলেন দাক্ষিণামূর্তি নামক ভৈরবের আরাধিতা বলে দেবীকে দক্ষিণা-কালী বলা হয়।[৩]

স্বরূপব্যাখ্যা— দক্ষিণাকালীর স্বরূপ সম্বন্ধে নিরুত্তরতন্ত্রে বলা হয়েছে শিবশক্তি দ্বিবিধা—নির্গুণা এবং সগুণা। নির্গুণা পরব্রহ্মসনাতনী জ্যোতির্ময়ী।[৪] উক্ত তন্ত্রমতে জ্যোতির্ময়ী দক্ষিণাকালী প্রপঞ্চ থেকে দূরস্থা।[৫] অর্থাৎ দেবীর নির্গুণস্বরূপ মায়িক বিশ্বপ্রপঞ্চের অতীত।

পূর্বেই বলা হয়েছে দক্ষিণাকালীই আদ্যা শক্তি। দ্বাবিংশাক্ষরী বিদ্যারূপে তিনিই অনিরুদ্ধসরস্বতী। নিরুত্তরতন্ত্রের মতে সেই অনিরুদ্ধসরস্বতী নির্গুণস্বরূপে অপরিমেয়া।[৬] শক্তিসঙ্গমতন্ত্র অনুসারে তারাদি সব বিদ্যাই কালিকা থেকে জাতা, সব বিদ্যাই কালিকাবিদ্যায় অবস্থিতা।[৭]

সগুণ অবস্থায় দক্ষিণাকালী স্বরগর্ভা মহাকালনিরূপিণী। তিনিই নারীরূপ ধারণ করে বিশ্ব প্রসব করেন। তিনিই মহালক্ষ্মী বিষ্ণুমায়া, অখিল জগৎকে মোহগ্রস্ত করেন।[৮]

---

১ ত ত, পৃঃ ৩২৬-২৭

২ যথা কর্মসমাপ্তৌ চ দক্ষিণা ফলসিদ্ধিদা।
তথা মুক্তিপ্রদা দেবি সর্বেষাং ফলদায়িনী।
অতো হি দক্ষিণাকালী কথ্যতে বরবর্ণিনী।—কা ত, পৃঃ ৯

৩ দক্ষিণে দক্ষিণামূর্তি ভৈরবারাধিতে ইত্যর্থঃ
—কর্পূরাদিস্তোত্রের ৩য় শ্লোকের বিমলানন্দ স্বামীকৃত স্বরূপব্যাখ্যা।

৪ শিবশক্তির্দ্বিধা দেবি নির্গুণা সগুণাপি চ।
নির্গুণা জ্যোতিষাং বৃন্দং পরংব্রহ্ম সনাতনী।—নিরু ত, পৃঃ ২

৫ জ্যোতিশ্চ দক্ষিণাকালী দূরস্থা স্যাৎ প্রপঞ্চতঃ।—ঐ

৬ অমাত্ত্বান্নির্গুণে সাপি অনিরুদ্ধসরস্বতী।—ঐ

৭ তারাদ্যাঃ সকলা বিদ্যাঃ কালিকায়াঃ প্রজজ্ঞিরে।
সর্বা বিদ্যাঃ কালিকায়াং সংস্থিতা এব পার্বতি।—শঃ সং চ, ৪৯, পৃঃ ১২৬

৮ সগুণা স্বরগর্ভা চ মহাকালনিরূপিণী। নারীরূপং সমাশ্রিত্য সৈব বিশ্বং প্রসূয়তে।
বিষ্ণুমায়া মহালক্ষ্মীর্মোহয়ত্যখিলং জগৎ।—নিরু ত, পৃঃ ২

পূর্বেই বলা হয়েছে তন্ত্রমতে ব্রহ্মাদি দেবতা কালী থেকে উৎপন্ন হয়েছেন। নির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে— দেবী কালিকার একাংশে ব্রহ্মা, একাংশে বিষ্ণু এবং একাংশে শম্ভু উৎপন্ন হয়েছেন। নদী প্রভৃতির কাছে সমুদ্র যেমন অপার তেমনি ব্রহ্মাদি দেবতার কাছে মহাকালী অপার। কালীরূপ মহাসমুদ্রের তুলনায় ব্রহ্মাদি দেবতা গোষ্পদের জল। গোষ্পদ যেমন সমুদ্রের জলের সম্বন্ধে কোনো ধারণা করতে পারে না তেমনি ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং শঙ্করও সম্পূর্ণ কালীতত্ত্ব অবধারণ করতে পারেন না। সৃষ্টিকর্তা-প্রমুখ দেবতাদি যেমন কালীর দ্বারা উৎপন্ন হন তেমনি প্রলয়কালে আবার তাঁর মধ্যে বিলীন হন। কালীর এই ব্রহ্মাদি-পুরুষরূপ স্বর্গপ্রদানকারী আর কালী স্বরূপে নির্বাণদাত্রী।[১]

দক্ষিণাকালীই শ্যামা—দক্ষিণাকালী কৃষ্ণা। তন্ত্রান্তরে বলা হয়েছে কালিকা দ্বিবিধা—কৃষ্ণা আর রক্তা। কৃষ্ণাকে বলা হয় দক্ষিণা আর রক্তাকে সুন্দরী।[২]

এই দক্ষিণাকালীই শ্যামা বা শ্যামাকালী। তন্ত্রসারে 'অথ শ্যামামন্ত্রাঃ' শিরোনাম দিয়ে প্রথমেই কালীতন্ত্র থেকে দক্ষিণাকালীর বিদ্যারাজ্ঞী নামক এই মন্ত্রটি উদ্ধৃত করা হয়েছে—

ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং স্বাহা।[৩]

দক্ষিণাকালীর মন্ত্র অনেক। কিন্তু উদ্ধৃত মন্ত্রটিকে শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়।[৪]

ধ্যান—কালীতন্ত্রে দক্ষিণাকালীর এই ধ্যানটি পাওয়া যায়—দক্ষিণাকালী করালবদনা, ঘোরা, মুক্তকেশী, চতুর্ভুজা। দেবী মুণ্ডমালাবিভূষিতা। তাঁর বামদিকের অধঃহস্তে সদ্যশ্ছিন্ন মুণ্ড, ঊর্ধ্বহস্তে খড়্গ আর দক্ষিনদিগের ঊর্ধ্বহস্তে অভয়মুদ্রা এবং অধঃহস্তে বরমুদ্রা। দেবী মহামেঘপ্রভা, শ্যামা, দিগম্বরী। দেবীর কণ্ঠস্থিত মুণ্ডমালা থেকে বিগলিত রুধিরের দ্বারা তাঁর দেহ চর্চিত। দুটি শবশিশু দেবীর কর্ণভূষণ হওয়াতে তাঁকে ভয়ংকরী দেখাচ্ছে। তিনি ঘোরদংষ্ট্রা করালাস্যা, পীনোন্নতপয়োধরা। তাঁর কাঞ্চী শবহস্তনির্মিত। তিনি হাস্যমুখী। দেবীর দুই ওষ্ঠপ্রান্ত থেকে রক্তধারা বিগলিত হওয়ায় তিনি দীপ্তবদনা। মহারৌদ্রী শ্মশানবাসিনী দেবী ঘোররবকারিণী। তিনি ত্রিনয়না।

---

১ একাংশেন ভবেদ্ ব্রহ্মা একাংশেন জনার্দ্দনঃ। একাংশেন ভবেচ্ছম্ভুঃ কালিকায়াঃ সুলোচনে।
অপারা সা মহাকালী নদ্যাদীনাং সমুদ্রবৎ। গোষ্পদে চ যথা তোয়ং ব্রহ্মাদ্যা দেবতাস্তথা।
গোষ্পদং কিং বিজানীয়াৎ সমুদ্রস্য জলং শিবে। তেন ব্রহ্মা ন জানাতি বিষ্ণুঃ কিং বেত্তি শঙ্করঃ।
সৃষ্টিকর্তা যথা কাল্যা জন্যন্তে চ সুরাদয়ঃ। তথা প্রলয়কালে তু পুনস্তস্যাং প্রলীয়তে।
অতো নির্বাণদা কালী পুরুষঃ স্বর্গদায়কঃ।—নি ত, পৃঃ ১০

২ কালিকা দ্বিবিধা প্রোক্তা কৃষ্ণারক্তাপ্রভেদতঃ। কৃষ্ণা তু দক্ষিণা প্রোক্তা রক্তা তু সুন্দরী মতা।
—তন্ত্রান্তরবচন, কর্পূরাদিস্তোত্রের ৩য় শ্লোকের বিমলানন্দ স্বামীকৃত স্বরূপব্যাখ্যায় উদ্ধৃত।

৩ বৃহ ত সা, ১০ সং, পৃঃ ৩০৭ ৪ দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৩০৭, ৩১৭

তাঁর নয়ন প্রাতঃসূর্যের মতো। তিনি দন্তুরা। তাঁর কেশরাশি ডানদিকে এলায়িত এবং তাতে মুক্তা খচিত। দেবী শবরূপী মহাদেবের হৃদয়োপরি অধিষ্ঠিতা। তাঁর চারধারে ঘোররবকারী শিবাদল। দেবী মহাকালের সঙ্গে বিপরীতরতিনিরতা। তিনি সুখপ্রসন্নবদনা এবং তাঁর মুখপদ্ম ঈষদ্‌হাস্যযুক্ত। সবকামনা-পূর্ণকারিণী এবং সমৃদ্ধিদায়িনী কালীর এইরূপে ধ্যান করবে।[১]

নিরুত্তরতন্ত্রে দেবীর যে-ধ্যান দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে পূর্বোক্ত ধ্যানের ভাবগত বিশেষ ভেদ নেই তবে ভাষাগত কিঞ্চিৎ ভেদ আছে। ধ্যানটি এই[২]—কালীর ধ্যান করবে তিনি করালবদনা, পীনোন্নতপয়োধরা, মহামেঘপ্রভা, শ্যামা, ঘোররাবা, চতুর্ভুজা। তাঁর বাম দিকের উপরের হাতে সদ্যশ্ছিন্ন নরমুণ্ড, নীচের হাতে খড়্গ[৩] আর ডান দিকের উপরের হাতে অভয়মুদ্রা ও নীচের হাতে বরমুদ্রা। দেবীর গলায় পঞ্চাশদ্‌বর্ণের প্রতীক মুণ্ডমালা। তার থেকে রুধিরধারা বিগলিত হয়ে দেবীদেহ চর্চিত করছে। দেবীর ওষ্ঠপ্রান্ত থেকে ক্ষরিত রক্তধারা দ্বারা তাঁর মুখখানি শোভিত। ঘোররবকারী শিবাদল দেবীকে চতুর্দিকে

১ করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্। কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্।
সদ্যশ্ছিন্নশিরঃখড়্গবামাধোর্ধ্বকরাম্বুজাম্। অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণোর্ধ্বাধঃপাণিকাম্।
মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীম্। কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালীগলদ্রুধিরচর্চিতাম্।
কর্ণাবতংসতানীতশবযুগ্মভয়ানকাম্। ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নতপয়োধরাম্।
শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীম্। সৃক্কদ্বয়গলদ্রক্তধারাবিস্ফুরিতাননাম্।
ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীম্। বালার্কমণ্ডলাকারলোচনত্রিতয়ান্বিতাম্।
দন্তুরাং দক্ষিণব্যাপিমুক্তালম্বিকচোচ্চয়াম্। শবরূপমহাদেবহৃদয়োপরি সংস্থিতাম্।
শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দিক্ষু সমন্বিতাম্। মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাম্।
সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরাননসরোরুহাম্। এবং সংচিন্তয়েৎ কালীং সর্বকামসমৃদ্ধিদাম্।
—কালীতন্ত্রোক্ত ধ্যান, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৩১০-৩১১

২ ধ্যায়েৎ কালীং করালাস্যাং পীনোন্নতপয়োধরাম্। মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং ঘোররাবাং চতুর্ভুজাং।
সদ্যশ্ছিন্নশিরঃখড়্গবামোর্দ্ধাধঃকরাম্বুজাং। অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণোর্ধ্বাধঃপাণিকাং।
পঞ্চাশদ্বর্ণমুণ্ডালীগলদ্রুধিরচর্চিতাং। সৃক্কদ্বয়গলদ্রক্তধারাবিস্ফুরিতাননাং।
শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দিক্ষু সমন্বিতাং। শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীং।
দিগম্বরীং মুক্তকেশীং চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরাং। শবরূপমহাদেবহৃদয়োপরি সংস্থিতাং।
মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাং। মদিরাঘূর্ণনয়নাং স্মেরাননসরোরুহাং।
অট্টহাসাং মহারৌদ্রীং সর্বানন্দকারিণীং। এবং সংচিন্তয়েৎ কালীং শ্মশানালয়বাসিনীং।—নিরু ত, পঃ ২

৩ ধ্যানে আছে সদ্যশ্ছিন্নশিরঃখড়্গবামোর্ধ্বাধঃ করাম্বুজাং—এর অর্থ বামদিকের উর্দ্ধহস্তে সদ্যশ্ছিন্ন শির এবং অধঃহস্তে খড়্গ। কিন্তু কালীতন্ত্রাদিতে আছে সদ্যশ্ছিন্নশিরঃখড়্গবামাধোর্ধ্বকরাম্বুজাম্—অর্থাৎ বাম দিকের নীচের হাতে সদ্যশ্ছিন্ন শির এবং উপরের হাতে খড়্গ। দেবীর প্রচলিত মূর্তিতেও তাই দেখা যায়।

ঘিরে রেখেছে। শবহস্তের দ্বারা দেবীর কাঞ্চী রচিত। তিনি হাস্যমুখী দিগম্বরী মুক্তকেশী। তাঁর শিরোভূষণ অর্দ্ধচন্দ্র। শবরূপী মহাদেবের বুকের উপরে তিনি অবস্থিতা। দেবী মহাকালের সঙ্গে বিপরীতরতিনিরতা। মদিরাপানে তাঁর নয়ন বিঘূর্ণিত, মুখপদ্ম হাস্যবিকসিত। কালিকাদেবী অট্টহাস্যকারিণী মহারৌদ্রী এবং সর্বদা আনন্দকারিণী। এইরূপে শ্মশানবাসিনী কালীর চিন্তা করবে।

তবে দেবতার মন্ত্রভেদানুসারে ধ্যানভেদ হয়। মহাকাল-সংহিতায় গুহ্যকালীর মন্ত্রপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে—মন্ত্রসমূহের ভেদ অনুসারে ধ্যানেরও বিবিধ ভেদ হয়।[১] এ কথা সব দেবতার মন্ত্র-সম্পর্কেই প্রযোজ্য।

সেইজন্য দক্ষিণাকালীরও ভিন্ন রকম ধ্যান পাওয়া যায়। যথা— দক্ষিণাকালিকা অঞ্জনাদ্রির মত কৃষ্ণবর্ণা। তিনি করালবদনা মুক্তকেশী শিবশক্তি। তাঁর গলায় মুণ্ডমালা মুখে স্মিতহাসি। তিনি মহাকালের হৃদয়পদ্মে অবস্থিতা পীনপয়োধরা ঘোরদংষ্ট্রা শিবের সঙ্গে বিপরীতরতাসক্তা। নাগ দেবীর যজ্ঞোপবীত, অর্ধচন্দ্র তাঁর শিরোভূষণ। তিনি সর্বালঙ্কারযুক্তা ও মুণ্ডমালাবিভূষিতা। দিগম্বরী দেবীর কটিতে সহস্রশবহস্তনির্মিত কাঞ্চী। কোটি কোটি শিবা ও যোগিনীর দ্বারা পরিবৃতা হয়ে দেবী বিরাজিতা। দেবীর মুখপদ্ম রক্তপূর্ণ। তিনি মদ্যপানে প্রমত্তা, বহ্নি সূর্য ও চন্দ্র দেবীর ত্রিনেত্র। তাঁর আনন রক্তিম। সদ্যোমৃত দুটি কিশোরের শব তাঁর দুই কর্ণভূষণ। দেবীর কণ্ঠস্থিত মুণ্ডমালা থেকে রক্তধারা নিঃসৃত হয়ে তাঁর অঙ্গ শোভিত করছে। দেবী শ্মশানাগ্নিনিবাসিনী। ব্রহ্মাবিষ্ণু তাঁর বন্দনা করেন। তাঁর করপদ্মে সদ্যশ্ছিন্ন নরমুণ্ড খড়্গ বরমুদ্রা এবং অভয়মুদ্রা।[২]

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি দক্ষিণাকালীকে আদ্যা কালী বলা হয়। কিন্তু মহানির্বাণ-তন্ত্রে আদ্যা কালীর যে-ধ্যান বর্ণিত হয়েছে তা আলোচ্য ধ্যানগুলি থেকে পৃথক।

কালীমূর্তির তত্ত্ব— দেবীর ধ্যান-প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক

১ মন্ত্রাণাং ভেদতো ধ্যানভেদাঃ স্যুর্বিবিধাস্তথা।—দ্রঃ পু চ. তঃ ৯, পৃঃ ৭৬১

২ অঞ্জনাদ্রিনিভাং দেবীং করালবদনাং শিবাম্। মুণ্ডমালাবলীকীর্ণাং মুক্তকেশীং স্মিতাননাম্।
মহাকালহৃদম্ভোজস্থিতাং পীনপয়োধরাম্। বিপরীতরতাসক্তাং ঘোরদংষ্ট্রাং শিবৈঃ সহ।
নাগযজ্ঞোপবীতাঢ্যাং চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরাম্। সর্বালঙ্কারসংযুক্তাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্।
শবহস্তসহস্রৈস্তু বদ্ধকাঞ্চীং দিগংশুকাম্। শিবাকোটিসহস্রৈস্তু যোগিনীভির্বিরাজিতাম্।
রক্তপূর্ণমুখাম্ভোজাং মদ্যপানপ্রমত্তিকাম্। বহ্ন্যর্কশশিনেত্রাঞ্চ রক্তবিস্ফুরিতাননাম্।
বিগতাসুকিশোরাভ্যাং কৃতকর্ণাবতংসিনীম্। কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালীগলদ্রুধিরচর্চিতাম্।
শ্মশানবহ্নিমধ্যস্থাং ব্রহ্মকেশববন্দিতাম্। সদ্যঃকৃত্তশিরঃখড়্গবরাভীতিকরাম্বুজাম্।
—দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৩১১

মনে করি। ধ্যানাদিতে কালীর যে-মূর্তি নির্দিষ্ট হয়েছে তার গভীর তত্ত্ব সাধারণ লোকের জানা নেই। এই সাধারণ লোকের মধ্যে অবশ্য তথাকথিত শিক্ষিত লোকেরাও আছেন। শেষোক্তরা প্রায়ই স্বদেশের প্রাচীন ধর্ম ও সাধনা সম্বন্ধে কিছুই জানেন না এবং সেইজন্য সে সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীলও নন। এই কারণে এঁরা কালীমূর্তি সম্বন্ধেও অনেক ক্ষেত্রেই হাস্যকর ধারণা পোষণ করেন্।

সাধকের সাধ্যমূর্তির অর্থ ঐতিহাসিক বিচারের দ্বারা লভ্য নয়। সাধকেরা স্বয়ং মূর্তির যে-তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা স্বীকার করেন তাই চরম বলে মেনে নিতে হয়। কেন না সাধকের কাছে মূর্তি বাস্তবসত্তাও (real) বটে আবার প্রতীকও বটে। যোগী সাধকের শুদ্ধচিত্তে দেবতা যে-মূর্তিতে প্রতিভাত হয়েছেন ধ্যানে আছে তারই বর্ণনা। কাজেই সাধকের কাছে দেবীমূর্তি বাস্তবসত্তা। আবার মূর্তিবর্ণনায় কতকগুলি গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সংকেত থাকে এই দিক্ দিয়ে মূর্তি প্রতীক। প্রতীক যাঁরা ব্যবহার করেন তাঁরা তা যে-অর্থে ব্যবহার করেন তাই তার যথার্থ অর্থ। অন্যেরা তার কি অর্থ করেন তা এ ক্ষেত্রে অগ্রাহ্য।

কৃষ্ণবর্ণা—দক্ষিণাকালী কৃষ্ণা। ধ্যানে তাঁকে মহামেঘপ্রভা শ্যামা এবং অঞ্জনাদ্রিনিভা বলা হয়েছে। কামাখ্যাতন্ত্রে আছে—কালী সদা কৃষ্ণবর্ণা এটি আগমের নির্ণয়।[১] কালীর বর্ণ কৃষ্ণ কেন সে সম্বন্ধে মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে—শ্বেত পীতাদি বর্ণ যেমন কৃষ্ণ বর্ণে বিলীন হয়ে যায় তেমনি সর্বভূত কালীর মধ্যে প্রবেশ করে অর্থাৎ বিলীন হয়। এইজন্য যাঁরা মোক্ষের উপায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন তাঁরা নির্গুণা নিরাকারা কল্যাণময়ী কালশক্তির কৃষ্ণবর্ণ নিরূপণ করেছেন।[২]

"পরাশক্তি অরূপা সুতরাং বর্ণহীন। যেখানে সর্ববর্ণের অভাব তাহাই নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ এ কথা বিজ্ঞানসম্মত। বিজ্ঞান আরও বলে যে-জ্যোতিঃ আমাদের চক্ষু ধারণা করিতে পারে না, তাহাই নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ দেখায়। তাই মহাজ্যোতিঃ কালী কৃষ্ণবর্ণা। কিন্তু জ্ঞাননেত্রে মহাজ্যোতিঃরূপে দৃষ্ট হন।"[৩]

কর্পূরাদিস্তোত্রের প্রথম শ্লোকে কালিকা দেবীকে বলা হয়েছে ধ্বান্তধারাধররুচিরুচিরা অর্থাৎ নীলমেঘের মত মনোজ্ঞা। এর ব্যাখ্যায় বিমলানন্দস্বামী লিখেছেন দেবী

১ কৃষ্ণবর্ণা সদা কালী আগমস্যেতি নির্ণয়ঃ।—কামা ত, পঃ ৯

২ শ্বেতপীতাদিকো বর্ণো যথা কৃষ্ণে বিলীয়তে। প্রবিশন্তি তথা কাল্যাং সর্বভূতানি শৈলজে।
অতস্তস্যাঃ কালশক্তের্নির্গুণায়া নিরাকৃতেঃ। হিতায়াঃ প্রাপ্তযোগানাং বর্ণঃ কৃষ্ণো নিরূপিতঃ।

মহা ত ১৩।৫-৬

৩ তান্ত্রিক গুরু, ৪র্থ সং, পৃঃ ৭১, পাদটীকা

শুদ্ধসত্ত্বগুণাত্মক ঘনীভূতজ্যোমরী এবং চিদাকাশ। এইজন্য তাঁর নীলবর্ণ চিন্তা করতে হয়।[১] এখানে নীলবর্ণ অর্থ কৃষ্ণবর্ণ। কেন না স্বামীজী আপন ব্যাখ্যার সমর্থনে যোগবাশিষ্ট থেকে যে-বচন উদ্ধার করেছেন তাতে আছে[২]—শিব ও শিবার ব্যোমরূপ বলে তাঁদের বপু অসিত অর্থাৎ কৃষ্ণ।

ঋগ্‌বেদে আছে অগ্রে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে ছিল তমঃ। সেই তমসায় সমস্তই আচ্ছন্ন ছিল।[৩] মৈত্রায়ণী-উপনিষদেও বলা হয়েছে সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র তমঃ ছিল।[৪] এই আদি তমঃই কালী। মহানির্বাণ তন্ত্রে সদাশিব দেবীকে বলছেন--সৃষ্টির পূর্বে বাক্য ও মনের অতীত তমোরূপে তুমি একা বিরাজমানা ছিলে। আবার বলছেন—প্রলয়ের পর তুমি আবার তোমার নিরাকার, বাক্যের অতীত ও মনের অগম্য তমোরূপ স্বরূপ প্রাপ্ত হও এবং তখন অদ্বিতীয়া তুমিই অবশিষ্ট থাক।[৫]

দিগম্বরী—কালী দিগম্বরী বা দিগ্‌বস্ত্রা। বস্ত্র আবরণ। সব চেয়ে সূক্ষ্ম আবরণ মায়া। কালী পূর্ণব্রহ্মময়ী বলে মায়াতীতা। তাই তিনি আবরণশূন্যা দিগম্বরী।[৬]

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলার আছে। অনেক অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি কালীমূর্তি দিগম্বরী বলে নাসিকাকুঞ্চিত করেন। তাঁরা অবগত আছেন কিনা জানিনে মেডোনার অনেক নগ্নচিত্র অঙ্কিত হয়েছে।[৭] পোপের আপন গীর্জা সিস্‌টাইন চ্যাপেল-এ (Sistine Chapel) মাইকেলেঞ্জেলো (Michelangelo) অঙ্কিত লাষ্ট জাজ্‌মেণ্ট (Last Judgement) নামক প্রখ্যাত ছবি আছে। তাতে যীশু খৃষ্টের নগ্নমূর্তি অঙ্কিত হয়েছে। এ ছাড়া ক্রুশবিদ্ধ যীশু খৃষ্টের লক্ষ লক্ষ নগ্নমূর্তি সারা খৃষ্টান জগতের শ্রদ্ধাভক্তি লাভ করছে।[৮] মূর্তি নগ্ন হলেই নাসিকাকুঞ্চিত করার কোনো কারণ ঘটেনা।

মুক্তকেশী— সে যাক্। কালী মায়াতীতা কিন্তু অনন্ত জীবকোটিকে মায়াপাশে

---

১ ধ্বান্তধারারূচিরুচিরে শুদ্ধসত্ত্বগুণাত্মকঘনীভূতজ্যোমরূপাৎ তথা চিদাকাশত্বাচ্চ নীলবর্ণচিন্তনীয়ে।—কর্পূরাদিস্তোত্র ১ম শ্লোকের স্বরূপব্যাখ্যা।

২ শিবয়োর্ব্যোমরূপত্বাদসিতং লক্ষ্যতে বপুঃ।—ঐ, পাদটীকা

৩ তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রে।—ঋ বে ১০।১২৯।৩

৪ তমো বা ইদমেকমাস।—মৈত্রায়ণী-উপনিষৎ, চতুর্থ প্রপাঠক

৫ সৃষ্টেরাদৌ ত্বমেকাসীৎ তমোরূপমগোচরম্।
পুনঃ স্বরূপমাসাদ্য তমোরূপং নিরাকৃতিঃ।
বাচাতীতং মনোঽগম্যং ত্বমেকৈবাঽবশিষ্যসে।—মহা ত ৪।২৭, ৩১

৬ দ্রঃ কর্পূরাদিস্তোত্র ৭ম শ্লোকের বিমলানন্দ স্বামীকৃত স্বরূপব্যাখ্যা

৭ S. S. W., p. 302 ৮ Ibid, pp. 271-278

বদ্ধ করেন। তাঁর মুক্তকেশজাল মায়াপাশের প্রতীক। আবার কালী ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং শিবেরও মুক্তিবিধান করেন বলে তিনি মুক্তকেশী। ক্+অ+ঈশ=কেশ। ক ব্রহ্মা, অ বিষ্ণু এবং ঈশ শিব। কাজেই কেশ বলতে বুঝায় ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব। কেশকে মুক্ত করেন বলে দেবী মুক্তকেশী।[১] কালী যে ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং শিবকেও ভুক্তিমুক্তি প্রদান করেন নিরুত্তরতন্ত্রে তা স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে। বলা হয়েছে— অনিরুদ্ধসরস্বতী কালী মহাকল্পতরু। তিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং শিবেরও ভুক্তিমুক্তির কারণ।[২]

আবার মুক্তকেশীর অন্যরকম ব্যাখ্যাও আছে। কেশবিন্যাসাদি বিলাস-বিকার। দেবী নির্বিকারা। এইজন্যই তিনি বিগলিতচিকুরা বা মুক্তকেশী।[৩]

ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র—কোথাও কোথাও বর্ণনা আছে কালীর ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র শোভা পাচ্ছে। এ সম্বন্ধে মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে— নিত্যা কালরূপা অব্যয়া শিবস্বরূপা কালীর ললাটে অমৃতত্বহেতু চন্দ্রকলা অঙ্কিত।[৪] চন্দ্রের থেকে অমৃত ক্ষরিত হয়। দেবীর ললাটে আছে চন্দ্রের সপ্তদশী কলা—অমাকলা।[৫] দেবী অমৃতত্ব অর্থাৎ নির্বাণমোক্ষ প্রদান করেন বলে তাঁর ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র বা চন্দ্রকলা।[৬]

ত্রিনয়না—কালী ত্রিনয়না। মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে—কালী চন্দ্র সূর্য ও অগ্নি এই তিন নিত্য নয়নের দ্বারা কালসম্ভূত অখিল জগৎ দর্শন করেন বলে তাঁর ত্রিনয়ন কল্পিত হয়েছে।[৭] অন্যভাবে বলা যায় ব্রহ্মময়ী দেবী বিরাট্। ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান তাঁর প্রত্যক্ষ। তাই তিনি ত্রিনয়না।[৮]

করালবদনা— কালী করালবদনা। মহাকালরূপে তিনি সমস্ত বিশ্বকে গ্রাস করেন আবার মহাকালকেও গ্রাস করেন। তাই তিনি করালবদনা।[৯]

ঘোরদংষ্ট্রাদি—দেবী ঘোরদংষ্ট্রা দন্তুরা প্রকটিতরদনা। তাঁর জিহ্বা রক্তবর্ণ লেলিহান। মূর্তিতে দেখা যায় লেলিহান জিহ্বা তিনি দংশন করে আছেন। দেবীর শুভ্র দন্ত স্বপ্রকাশ-সত্ত্বগুণসূচক। আর ঘোর বা বিশাল দন্ত সত্ত্বগুণের আধিক্যসূচক। রক্তবর্ণ লোল রসনা

---

১ Karpūrādistotra, T. T., Vol. IX, Intro. p. 24

২ মহাকল্পতরুঃ কালী অনিরুদ্ধসরস্বতী। ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানাং ভুক্তিমুক্ত্যেককারণম্।—নিরু ত, পঃ ২

৩ দ্রঃ কর্পূরাদিস্তোত্রের ৩য় শ্লোকের স্বরূপব্যাখ্যা

৪ নিত্যায়াঃ কালরূপায়া অব্যয়ায়াঃ শিবাত্মনঃ। অমৃতত্বাল্ললাটেঽস্যাঃ শশিচিহ্নং নিরূপিতম্।—মহা ত ১৩।৭

৫ Gr. L., 3rd Ed., p. 879, n. 5

৬ কর্পূরাদিস্তোত্র ২য় শ্লোকের স্বরূপব্যাখ্যা

৭ শশিসূর্যাগ্নিভির্নিত্যৈরখিলং কালিকং জগৎ। সম্পশ্যতি যতস্তস্মাৎ কল্পিতং নয়নত্রয়ম্।—মহা ত ১৩।৮

৮ Karpūrādistotra, T. T., Vol. IX, Intro., p. 24. ৯ দ্রঃ মহা ত ৪।৩০-৩২

রজোগুণসূচক। দেবী প্রথমে রজোগুণের বৃদ্ধি করে তমোগুণ নাশ করেন। দেবীর লেলিহান জিহ্বা এই তত্ত্বের সূচক। তারপর সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি করে তিনি রজঃ ও তমঃ উভয় গুণকেই নাশ করেন। জিহ্বা দংশনের দ্বারা এই তত্ত্বটিই সূচিত হয়েছে।[১]

কালিকা দেবীর দুই ওষ্ঠপ্রান্তে রক্তধারা বিগলিত হচ্ছে। রক্তধারা রজোগুণসূচক। রক্তধারা বহির্গত হচ্ছে এর অর্থ দেবী রজোগুণরহিতা শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা বিরজা।[২]

শবকর্ণভূষণা—দুটি কিশোর বা বালকের শব দেবীর দুই কর্ণভূষণ। মহেশ্বরের মতো নির্বিকার নিষ্কামবালকস্বভাব সাধক ব্রহ্মরূপিণী কালীর অতীব প্রিয় এই তত্ত্বটিই দেবীর এই কর্ণভূষণের দ্বারা সূচিত হয়েছে।[৩]

মুণ্ডমালিনী—কালীর গলায় মুণ্ডমালা। এই মুণ্ডমালা পঞ্চাশৎ (মতান্তরে একপঞ্চাশৎ) মাতৃকাবর্ণের প্রতীক। লক্ষ্য করা গেছে নিরুত্তরতন্ত্রোক্ত ধ্যানে পঞ্চাশদ্বর্ণমুণ্ডালী অর্থাৎ পঞ্চাশদ্বর্ণরূপ মুণ্ডমালার কথা বলা হয়েছে। দেবী শব্দব্রহ্মময়ী পঞ্চাশদ্বর্ণরূপিণী।[৪] মাতৃকা-বর্ণগুলি নামরূপাত্মক অর্থাৎ শব্দার্থময় জগতের প্রতিনিধি। মহাপ্রলয়ের সময় কালী জগৎকে আপনার মধ্যে প্রতিসংহার করেন। পঞ্চাশদ্বর্ণময়ী দেবীর থেকে শব্দার্থময় জগতের উদ্ভব হয়ে আবার তাতেই লয় প্রাপ্ত হয়।[৫] দেবীর কণ্ঠের মুণ্ডমালায় এই তত্ত্বটির সংকেত রয়েছে।

আবার কালী সর্বদেবময়ী সাক্ষাৎ শব্দব্রহ্মস্বরূপিণী।[৬] প্রত্যেকটি মাতৃকাবর্ণই একটি বীজমন্ত্র অর্থাৎ কোনো দেবতার স্বরূপ, মুণ্ডমালা মাতৃকাবর্ণের প্রতীক। কাজেই সব দেবতা কালীর থেকে উদ্ভূত, মুণ্ডমালা এই তত্ত্বটিই প্রকাশ করছে।

মুণ্ডমালার অন্য ব্যাখ্যাও আছে। দানবদলনী দেবী ধর্মসংরক্ষণের জন্য যে-সব দুষ্কৃতকারী দানব সংহার করেন তাদের মুণ্ড মালা করে গলায় পরেন।[৭] দেবী সর্বস্বরূপা; দানবেরাও দেবীর রূপবিশেষ। যারা দেবীর হাতে নিহত হল তারা স্বরূপ প্রাপ্ত হল। দেবীর গলায় তাদের মুণ্ডমালা এই তত্ত্বের সূচক।

পীনোন্নতপয়োধরা—জগজ্জননী কালী পীনোন্নতপয়োধরা। এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব পালনকর্ত্রী দেবী স্তন্যরূপ অন্নাদি দিয়ে ত্রিজগতের পালন করছেন।[৮]

---

১ দ্রঃ কর্পূরাদিস্তোত্রের ৪র্থ শ্লোকের বিমলানন্দ স্বামীকৃত স্বরূপব্যাখ্যা; Karpūrādistotra, T. T., Vol. IX, Intro., p. 25

২ ঐ ৭ম শ্লোকের স্বরূপব্যাখ্যা ৩ ঐ ২য় শ্লোকের স্বরূপব্যাখ্যা

৪ ঐ ষষ্ঠ শ্লোকের স্বরূপব্যাখ্যা ৫ G. L., 3rd Ed., p. 225

৬ সর্বদেবময়ী সাক্ষাচ্ছব্দব্রহ্মস্বরূপিণী।—কালীতত্ত্ববচন, দ্রঃ পু ৫, শ্লঃ ৯, পৃঃ ১২৫

৭ G. L., 3rd Ed., p. 224

৮ কর্পূরাদিস্তোত্রের ষষ্ঠ শ্লোকের স্বরূপব্যাখ্যা

চতুর্ভুজা—দক্ষিণাকালিকা চতুর্ভুজা। দেবীর চতুর্ভুজের ব্যাখ্যা এইভাবে করা হয়। প্রত্যেক বৃত্তে ৩৬০ অংশ (ডিগ্রি) আছে। বৃত্তটিকে ৯০° ডিগ্রি করে চার ভাগ করা হয়। এই চার ভাগ বৃত্তের চার ভুজ। এর অর্থ পূর্ণবৃত্ত চতুর্ভুজ। মহাকালী পূর্ণরূপা। তিনি মহাকাশরূপিণী। কেন না আকাশ ব্রহ্ম আর কালীও ব্রহ্ম। মহাকাশকে পূর্ণবৃত্ত কল্পনা করা হয়। তাই কালী চতুর্ভুজ।[১]

দেবীর বাম দিকের উপরের হাতে খড়্গ আর নীচের হাতে ছিন্ন মুণ্ড। দেবী জ্ঞানখড়্গের দ্বারা নিষ্কাম সাধকদের মোহপাশ ছিন্ন করেন—দেবীর হাতের খড়্গের এই তত্ত্বার্থ।

তত্ত্বজ্ঞানের আধার মস্তক। দেবী নিরাসক্ত মোহমুক্ত সাধককে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন এবং দেবীর চরণে নিবেদিতজীবন এই সাধক দেবীর অত্যন্ত প্রিয় বলে দেবী কখনও তাকে হাতছাড়া করেন না। এরূপ সাধকের ভাগবতী বুদ্ধি এবং চিন্তাভাবনা। দেবীর হস্তস্থিত নৃমুণ্ড এই তত্ত্ব সূচিত করছে।

দেবীর ডান দিকের উপরের হাতে অভয়মুদ্রা এবং নীচের হাতে বরমুদ্রা। এর অর্থ দেবী সকাম সাধককে অভয় এবং অভীষ্ট বর দেন।[২] মহানির্বাণতন্ত্রে অভয় এবং বর সম্বন্ধে বলা হয়েছে সময়ে সময়ে যখন বিপদ্ আসে তখন জীবদের বিপদ্ থেকে রক্ষা করা অভয় আর তাদের স্ব স্ব কর্মে প্রেরণ করা বর।[৩] মানুষ কিন্তু সাধারণতঃ দেবতার কাছে দুটি বস্তুই চায়—বিপদ্ থেকে দেবতার কৃপায় রক্ষা পেতে চায় আর কাম্যবস্তু লাভ করতে চায়। কাজেই তাদের কাছে বর অর্থ কাম্যবস্তু লাভ।

তন্ত্রে দক্ষিণাকালীর মূর্তি আলীঢ়পাদা[৪] এবং প্রত্যালীঢ়পাদা[৫] উভয়রূপেই বর্ণিত হয়েছে। দেবী বাঁ পা বাড়িয়ে দাঁড়ালে তাকে বলা হয় আলীঢ়পাদা আর ডান পা বাড়িয়ে দাঁড়ালে প্রত্যালীঢ়পাদা।[৬] এক পা অতীতে এবং এক পা ভবিষ্যতে রেখে কালের অধিষ্ঠাত্রী কালী দাঁড়িয়ে আছেন; আলীঢ় বা প্রত্যালীঢ়পাদা মূর্তির এই তাৎপর্য।

১ দ্রঃ দশমহাবিদ্যা, ক শ অ, পৃঃ ১০৪

২ কর্পূরাদিস্তোত্রের ৩র্থ শ্লোকের স্বরূপব্যাখ্যা

৩ সময়ে সময়ে জীবরক্ষণং বিপদঃ শিবে। প্রেরণং স্বস্বকার্যেষু বরশ্চাভয়মীরিতম্।—মহা ত ১৩।১০

৪ বামপাদং শবহৃদি দক্ষিণাং লোকলাম্বিতাম্।
—যোগিনীতন্ত্রবচন, দ্রঃ কালী ত, ১।৩১-৩২-এর সিদ্ধান্তভূষণকৃত টীকা

৫ শবস্য হৃদয়ে চৈব দক্ষপাদনিবেশিতাম্।— কুব্জিকাতন্ত্রবচন দ্রঃ ঐ

৬ আলীঢ়ং বামপাদস্ত প্রত্যালীঢ়ন্তু দক্ষিণম্।...
আলীঢ়পাদা সা দেবী প্রত্যালীঢ়া ক্ষণে ক্ষণে।
অনন্তরূপিণীং জ্ঞাতুং কো বক্তুং শক্যতে প্রিয়ে।—শুদ্ধসাধনতন্ত্র, পঃ ৬

শবহস্তকৃত কাঞ্চী—কালীর কটিদেশে শবহস্তনির্মিত কাঞ্চী। হাত মানুষের প্রধান কর্মসাধন অর্থাৎ কাজ করার যন্ত্র। কাজেই হাতকে কর্মের প্রতীক বলা যায়। কল্পাবসানে সমস্ত জীব তাদের স্থূলদেহ ত্যাগ করে স্ব স্ব কর্মসহ লিঙ্গদেহ আশ্রয় করে এবং সগুণব্রহ্মরূপিণী কালীর কারণদেহের অবিদ্যাময় অংশে পুনরায় কল্পারম্ভ পর্যন্ত অবস্থান করে এবং মোক্ষলাভ না হওয়া পর্যন্ত জীবকে বার বার এইভাবে অবস্থান করতে হয়। এইজন্যই মৃত জীবদের প্রধানকর্মসাধনভূত হস্তসমূহের দ্বারা নির্মিত কাঞ্চী বিরাট্‌রূপিণী মহাদেবীর গর্ভধারণযোগ্য নিম্নোদর তথা যোনির ঊর্ধ্বস্থিত কটিদেশে কল্পিত হয়েছে।[১]

মোক্ষলাভ না হওয়া পর্যন্ত জীবের কর্মসংস্কার যায় না। স্থূলদেহ বিনষ্ট হলে কর্মসংস্কার জীবের সূক্ষ্মদেহ বা লিঙ্গদেহকে আশ্রয় করে এবং যথাকালে এই কর্মসংস্কার অনুসারেই জীব আবার স্থূলদেহ ধারণ করে। জ্ঞানভাষ্যে জীবের শরীরকে তার কর্মেরই রূপ বলা হয়েছে।[২] বলা হয়েছে—জীব কর্মের দ্বারা জাত হয়, কর্মের দ্বারাই প্রলীন হয়। দেহ বিনষ্ট হলে সেই কর্ম আবার নূতন দেহে সংযুক্ত হয়।[৩]

শববক্ষস্থিতা—কালী শবরূপী শিবের বক্ষোপরি অবস্থিতা। শব নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতীক। গায়ত্রীতন্ত্রে বলা হয়েছে—শবশব্দের দ্বারা প্রেতরূপ ব্রহ্ম বুঝতে হবে।[৪] পরশিব শুদ্ধ চিৎস্বরূপ, নির্গুণ ব্রহ্ম। তিনি নিষ্ক্রিয়। শবও নিষ্ক্রিয়। তাই শব নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতীক। পরশিব আর পরাশক্তি অভিন্ন। সেইজন্য শবরূপী শিবকে বলা হয়েছে দেবীর নির্গুণব্রহ্মরূপ স্বীয়পদ।[৫] যিনি স্বরূপতঃ নির্গুণ ব্রহ্ম তিনিই সগুণব্রহ্মরূপে গুণময়ী সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণী মহাশক্তি। মহাশক্তি কালী কখনও নির্গুণব্রহ্মস্বরূপবিচ্যুত হন না, দেবীর শিবরূপ নির্গুণস্বরূপই তাঁর ত্রিগুণাত্মক রূপের আধার, 'শবরূপ-মহাদেবহৃদয়োপরিসংস্থিতা' দেবীর রূপকল্পনার এই রহস্য।

দেবীর এই রূপকল্পনায় সাংখ্যের পুরুষপ্রকৃতিতত্ত্ব উপাদান হয়েছে। সাংখ্যমতে পুরুষ, নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতি নিয়ত ক্রিয়াশীল। জগদ্‌ ব্যাপারে প্রকৃতিরই কর্তৃত্ব। তবে এই কর্তৃত্ব পুরুষের সান্নিধ্যহেতু সম্ভবপর হয়। 'তাত্ত্বিক গুরু'তে বিষয়টির ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে—প্রকৃতির সত্ত্বাধিক্যে পুরুষের সান্নিধ্যে মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্বের উদ্ভব হয়। বুদ্ধিতত্ত্ব থেকে অহংকার এবং অহংকারের বিভিন্ন বিকার থেকে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় উৎপন্ন হয়।

১ কর্পূরাদিস্তোত্রের ৭ম শ্লোকের বিমলানন্দ স্বামীকৃত স্বরূপব্যাখ্যা

২ শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি শরীরং কর্মরূপিণম্।—জ্ঞানভাষ্যবচন, দ্রঃ শা ত. উঃ ১

৩ কর্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্মণৈব প্রলীয়তে। দেহে বিনষ্টে তৎকর্ম পুনর্দেহে প্রজায়তে।—ঐ

৪ শব ইত্যক্ষরে ব্রহ্মবাচকঃ প্রেতনির্ণয়ঃ।—গা ত, পরিঃ ১, ব্রাহ্মণ পটল

৫ দ্রঃ কর্পূরাদিস্তোত্রের ৭ম শ্লোকের স্বরূপব্যাখ্যা

পুরুষই চৈতন্যশক্তি, সুখদুঃখাদিরহিত। পুরুষ অকর্তা। ইনি কিছুই করেন না। সমগ্র বিশ্বব্যাপার প্রকৃতির কার্য তবে প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর সাপেক্ষ। পুরুষের সান্নিধ্যের জন্যই প্রকৃতি বিশ্বরচনা করেন। কেন না প্রকৃতি জড়, পুরুষসান্নিধ্য ব্যতীত কিছুই করতে পারেন না। তবে সাংখ্যমতে প্রকৃতিরই সাক্ষাৎ কর্তৃত্ব। এইজন্য পুরুষ প্রকৃতির ক্রিয়াধাররূপে পদতলে এবং সেই অভিনয়েই কালীমূর্তি মহাদেবের বুকের উপর স্থাপিত।[১]

অবশ্য তন্ত্রে সাংখ্যমত অবিকল অনুসৃত হয়নি। তন্ত্রমতে শক্তিই সৃষ্টিকার্য নির্বাহের জন্য পুরুষমূর্তি ধারণ করেন। তন্ত্রতত্ত্বে বলা হয়েছে 'মূলত শক্তিই প্রকৃতি। পুরুষ বা নপুংসক প্রকৃতির বিকৃতিমাত্র। শক্তি লীলাচ্ছলে সৃষ্টিকার্যের জন্য পুরুষমূর্তি ধারণ করেন এবং সংসারলীলাভঙ্গ হলে স্বস্বরূপে অবস্থান করবেন। যাঁরা আত্যন্তিক মহাপ্রলয় স্বীকার করেন অর্থাৎ বিশ্বাস করেন এই মহাপ্রলয়ের পর আর সৃষ্টি হবে না এটি তাঁদের অভিমত। কিন্তু এ মতের সমর্থক যুক্তিপ্রমাণ দুর্বল। এইজন্যই তন্ত্রশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত মহাশক্তির পুরুষ-অংশই সংসারপ্রবৃত্তিময় বন্ধনের কারণ এবং শক্তি-অংশই সংসারনিবৃত্তিময় মুক্তির কারণ। আত্যন্তিক মহাপ্রলয়ের কোনো কারণ নেই। নিত্যানন্দময়ীর সৃষ্টিস্থিতিসংহার নিত্য, বন্ধনও নিত্য, মুক্তিও নিত্য। সেই নিত্যমুক্তিময়ীর নিত্যমূর্তিতে সৃষ্টির বীজরূপ পুরুষও নিত্য কিন্তু সেই মহানির্বাণরূপ মুক্তিস্থান পুরুষশক্তি (সৃষ্টিপ্রক্রিয়া) কেবল লীলানন্দ অনুভবের জন্য অবস্থিত। তাঁর মধ্যে সৃষ্টির কোনো তরঙ্গ নেই। সেইজন্য সে-শক্তিকে লীলার উপলক্ষ্য স্বরূপ নিম্নে রেখে মুক্তিদাত্রী মহাশক্তি তাঁর উপরিভাগে আরূঢ়া। নিশ্চেষ্ট পুরুষ বা সৃষ্টিশক্তিকে পদতলে স্তম্ভিত করে দেবী মুক্তির বিজয় ঘোষণা করছেন।'[২]

দেবীর পদতলে শিব এই ব্যাপারটির অন্য ব্যাখ্যাও আছে। আদ্যাশক্তি ভগবতী কালী আপনভাবে বিভোর হয়ে ক্রীড়াসক্ত বালকের মতো জগতের সৃষ্টি করছেন আবার বিনাশ করছেন। আনন্দময়ীর এ লীলা অবিরাম চলছে। পুরুষরূপ সদাশিব দেবীর চরণতলে থেকে দেবীর এই অপূর্ব লীলা দেখে বিমুগ্ধ হয়ে আছেন।[৩]

শবরূপী শিবের হৃদয়োপরিসংস্থিতা কালীর অন্য ব্যাখ্যাও আছে। মহাশক্তি কালী চিন্ময়ী। জীবজগৎ তাঁর চিৎকণা লাভ করেই সচেতন বা সজীব হয়। চৈতন্য বা শক্তিশূন্য হলে জীবে আর জড়ে কোনো ভেদ থাকে না। প্রলয়কালে চিদেকঘনা মহামায়া যখন বিশ্বের সমস্ত চৈতন্যশক্তিকে আপনার মধ্যে প্রতিসংহার করে অব্যক্ততত্ত্বে বিলীন হয়ে যান তখন জগৎ শিব বা শব হয়ে যায়। কালীমূর্তি এই সংহারতত্ত্বেরই প্রতীক।[৪]

---

১ তান্ত্রিক গুরু, ৪র্থ সং, পৃঃ ৫ ২ ঐ ঐ, পৃঃ ৩২৫-৩২৬

৩ কালীতত্ত্ব, ক শ অ, পৃঃ ৫৩৪ ৪ কালীতত্ত্ব, ক শ অ, পৃঃ ৫৩৪

আবার বলা হয় মহাশক্তিরূপিণী কালীর সামনে কাল অতিতুচ্ছ ও নিষ্ক্রিয়। দেবীর পদতলে শবরূপী মহাকালের কল্পনায় এই তত্ত্বটিই ব্যক্ত হয়েছে।[১] মহাকাল বিশ্বের কলনকারী আর কালী মহাকালেরও কলনকারিণী। কাল দেবীর অধীন। কাল জগতের আধার কিন্তু কালীর আশ্রিত। কালীর পদতলে মহাকাল এই তত্ত্বটির সূচক।

বিপরীতরতাতুরা—ধ্যানে আছে কালী মহাকালের সঙ্গে বিপরীতরতাতুরা। এইমাত্র যে-সাংখ্যতত্ত্বের আলোচনা করা হল এক্ষেত্রেও সেই তত্ত্বটি অন্যভাবে ব্যক্ত হয়েছে। যে-রতিক্রীড়ায় নারী ক্রিয়াশীলা আর পুরুষ নিষ্ক্রিয় মানবীয় ব্যাপারে তাকে বলা হয় বিপরীতরতি। দেবীর ধ্যানে একটি গূঢ় পারমার্থিক তত্ত্ব এই মানবীয় ব্যাপারের ভাষায় সংকেতে প্রকাশ করা হয়েছে।

কালী নির্গুণ ব্রহ্ম এবং সগুণ ব্রহ্ম। নিরুত্তরতন্ত্রে বলা হয়েছে যখন নির্গুণা কালী সগুণা হন তখনই তিনি হন বিপরীতরতা।[২] কালী আর শিব অভিন্ন। ব্যবহারতঃ শিবকে পুরুষ আর শক্তিকে প্রকৃতি বললেও তাঁরা স্বরূপতঃ একই মহাশক্তি। উক্ত নিরুত্তরতন্ত্রেই বলা হয়েছে[৩] সব সিদ্ধবিদ্যাদের মধ্যে দক্ষিণাকালী প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়ই। এই প্রকৃতি বা শক্তি এবং পুরুষ বা শিবের মধ্যে পরস্পর অবিনাভাবসম্বন্ধ।

সৃষ্ট্যাদি কার্য ত্রিগুণাত্মক। মহাশক্তি স্বীয় নির্গুণ স্বরূপকে অভিভূত করে স্বেচ্ছায় সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কার্যে প্রবৃত্ত হয়ে আনন্দ করেন। অর্থাৎ সগুণব্রহ্ম দেবীই স্বেচ্ছায় সানন্দে সৃষ্ট্যাদি কার্য করেন। নির্গুণস্বরূপে শিবরূপে তিনি নির্বিকার, সমস্ত কার্যাদির অতীত। গন্ধর্বতন্ত্রে বলা হয়েছে পুরুষ নির্গুণ, নির্বল আর দেবী সগুণা এবং অধিকবলশালিনী।[৪] কাজেই সৃষ্ট্যাদি ব্যাপারে শিব নিষ্ক্রিয় আর দেবীর সক্রিয় ভূমিকা। বিপরীতরতাতুরা কালীর এই তত্ত্ব। এই তত্ত্বটিকে তন্ত্রশাস্ত্রে কামশাস্ত্রসুলভ ভাষার সংকেতে প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন গন্ধর্বতন্ত্রে আছে—অগ্নিচন্দ্রসূর্যরূপিণী হকারার্ধস্বরূপিণী দেবী পুরুষকে অধোদেশে স্থাপন করে বিপরীতভাবে রমণ করছেন।[৫]

বিশেষ তত্ত্ব বুঝাবার জন্য শিবশক্তি সম্বন্ধে এই ধরণের সাংকেতিক ভাষার প্রয়োগ তন্ত্রাদিতে প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। যেমন কর্পূরাদিস্তোত্রে দেবীকে বলা হয়েছে মহাকাল-

১ ঐ, পৃঃ ৫৩৩

২ বিপরীতরতা কালী নির্গুণা সগুণা যদা।—কর্পূরাদিস্তোত্রের অষ্টম শ্লোকের বিমলানন্দ স্বামীকৃত ব্যাখ্যায় উদ্ধৃত। রসিকমোহনকৃত পাঠ—নির্গুণা সগুণাপি চ।—দ্রঃ নিরু তু, পৃঃ ২

৩ সিদ্ধবিদ্যাসু সর্বাসু দক্ষিণা প্রকৃতিঃ পুমান্। অবিনাভাবসম্বন্ধস্তয়োরেব পরস্পরম্।—নিরু তু, পৃঃ ২

৪ সগুণাধিবলা দেবী নির্গুণো নির্বলঃ পুমান্।—গ তু ৩১।৩

৫ অধঃকৃত্বা তু পুরুষং হকারার্ধস্বরূপিণী। বিপরীতেন রমতে বহ্নীন্দ্বর্কস্বরূপিণী।—গ তু ৩১।৮-৯

সুরতপ্রযুক্তা। এ কথার তত্বার্থ—কল্পাবসানে যখন সৃষ্ট্যাদি কার্য থাকে না এবং দেবী নিষ্ক্রিয় তখন তিনি পরম শিবের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে (অর্থাৎ স্বীয় নির্গুণস্বরূপে অবস্থিত হয়ে) অখণ্ডানন্দ অনুভব করেন।[১]

শ্মশানবাসিনী— কালী শ্মশানবাসিনী। শ্মশানশব্দের বিভিন্ন ব্যাখ্যা আছে। যাস্ক শ্মশানশব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন শ্মশান 'শ্ম-শয়ন'। শ্ম অর্থ শরীর। শরীর যাতে টুকরো টুকরো হয়ে যায় বা বিলীন হয়ে যায় তাই শ্মশান।[২] যাস্কের ব্যাখ্যা অনুসারে যেখানে শবদেহের অগ্নিসংকার হয় বা শবদেহ মৃত্তিকাপ্রোথিত করা হয় তাই শ্মশান। এটি শ্মশান-শব্দের সাধারণ অর্থ। অবশ্য এখন শ্মশান বলতে মৃতদেহের অগ্নিসংকারস্থানকেই বুঝায়। কিন্তু বৈদিক যুগে মৃতদেহের যেমন অগ্নিসংকার[৩] হত তেমনি তা মৃত্তিকাপ্রোথিত[৪] করাও হত। কাজেই সে যুগে শ্মশান বলতে এই উভয়কর্মের স্থানকেই বোঝাত মনে হয়।

কালী এই শ্মশানবাসিনী। কালরূপে তিনি জীবকে সংহার করেন। জীবের স্থূলদেহ শ্মশানেই বিলুপ্ত হয়। কাজেই শ্মশান সংহারসূচক। এইজন্য সংহারকারিণী কালীকে শ্মশানবাসিনী বলা হয়েছে।

শ্মশানে চিতাগ্নিই মৃতদেহকে আত্মসাৎ করে। এই চিতাগ্নি কালী স্বয়ং। গুপ্তসাধনতন্ত্রে বলা হয়েছে দক্ষিণাকালী বহ্নিরূপা। এইজন্যই তিনি শ্মশানালয়বাসিনী।[৫]

এই বহ্নি স্থূল চিতাবহ্নি এবং সূক্ষ্ম জ্ঞানবহ্নি উভয়ই। মানুষের স্থূল দেহ যেমন চিতাগ্নিতে ভস্মীভূত হয়, তেমনি তার সূক্ষ্ম বাসনাময় কামিক দেহ জ্ঞানবহ্নিতে দগ্ধ হয়। এটি হয় সাধকের অন্তরে। কাজেই সাধকের অন্তরেই আছে শ্মশান।[৬] সেই শ্মশানে আছেন কৈবল্যদায়িনী কালী। অর্থাৎ পাশমুক্ত শিবতুল্য জীবের শুদ্ধ অন্তরেই কালীর অধিষ্ঠান উপলব্ধ হয়। শ্মশানবাসিনী কালীর এই রহস্য।

চিতাও শ্মশান। নিরুত্তরতন্ত্রে বলা হয়েছে শ্মশান দ্বিবিধ—চিতা আর যোনি।[৭] যোনি অর্থ বিশ্বের কারণ অর্থাৎ কারণব্রহ্ম। কারণব্রহ্ম জগজ্জননী কালী স্বয়ং। সেইজন্য উক্ত তন্ত্রে কালীকে যোনিরূপা শবশয্যা বলা হয়েছে।[৮] শবশয্যা অর্থ শ্মশান।[৯]

---

১ দ্রঃ কর্পূরাদিস্তোত্রের ৭ম শ্লোকের বিমলানন্দ স্বামীকৃত স্বরূপব্যাখ্যা

২ শ্মশানং শ্মশয়নম্। শ্ম শরীরম্। শরীরং শৃণাতেঃ। শম্নাতে র্বা।—নিরুক্ত ৩।৫

৩ দ্রঃ ঋ বে ১০।১৬।৪ ৪ দ্রঃ ঋ বে ১০।১৮

৫ বহ্নিরূপা মহামায়া সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ।
অতএব মহেশানি শ্মশানালয়বাসিনী।—গুপ্তসাধনতন্ত্র পঃ ৬

৬ S. P., 2nd Revised Ed., p. 207

৭ শ্মশানং দ্বিবিধং দেবি চিতা যোনিঃ প্রকীর্তিতা।—নিরু ত, পঃ ১

৮ যোনিরূপা মহাকালী শবশয্যা প্রকীর্তিতা। -ঐ

৯ শ্মশব্দেন শবঃ প্রোক্তঃ শানং শয়নমুচ্যতে। (শব্দকল্পদ্রুম)—শ্ম অর্থ শব আর শান অর্থ শয়ন অর্থাৎ শয্যা। কাজেই শ্মশান শবশয্যা।

আবার চিতা শব্দের তত্ত্বার্থ স্বপ্রকাশ চিৎশক্তি।[১] কাজেই এদিক্ দিয়ে শ্মশান অর্থ কালী স্বয়ং। অতএব কালী শ্মশানবাসিনী একথার অর্থ তিনি স্বরূপে অধিষ্ঠিতা চিদ্রূপিণী ব্রহ্মময়ী।

এই বিষয়টি অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়। মহাপ্রলয়কালে সবপ্রাণী যাতে শবরূপে লীন হয় তাই শ্মশান। শ্মশান পরব্রহ্ম।[২] প্রলয়কালে সমস্তই মহাশক্তিতে বিলীন হয়ে যায়। কাজেই দেবী শ্মশানস্থা বা শ্মশানবাসিনী অর্থ তিনি স্বরূপে অধিষ্ঠিতা।

পূর্বোক্ত নিরুত্তরতন্ত্রে দক্ষিণা কালীর স্থান শ্মশানকে বলা হয়েছে সদাশিব।[৩] মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় লিখেছেন 'সমস্ত বিশ্বের পর্যবসানে বিরাট্ অস্মিরূপ অর্থাৎ বিন্দুস্বরূপ সদাশিবতত্ত্বের আবির্ভাব হয়। এতে অধিষ্ঠিত হয়ে শিবশক্তিরূপ মূলবস্তু লীলাময় ভাবে আত্মপ্রকাশ করেন।[৪] এই শিবশক্তিময় মূলবস্তু আর ব্রহ্মময়ী কালী একই। সেইজন্যই তাত্ত্বিক মূর্তিকল্পনায় দেবী শ্মশানালয়বাসিনী।

শ্মশানালয়বাসিনী কথাটার অন্য আরেকটি ব্যাখ্যাও আছে। ব্রহ্মানন্দ স্বামী লিখেছেন—শ্মশান রুদ্রস্থান, তা কৈলাসের দক্ষিণশৃঙ্গে নিত্য বিরাজমান। এইটিই কালিকালয়। দেবী এখানে বাস করেন বলে তিনি শ্মশানালয়বাসিনী।[৫]

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যোগসাধনার পরিভাষায় সুষুম্না-নাড়ীকে বলা হয় শ্মশান।[৬] মূলাধারে প্রসুপ্তা সর্পাকারা কুণ্ডলিনী জাগরিতা হয়েই সুষুম্নাতে প্রবেশ করেন।[৭] সুষুম্না-মার্গেই তিনি সহস্রারে যাতায়াত করেন। এই কুণ্ডলিনীই নির্বাণকারিণী আদ্যাশক্তি মহাকালী।[৮] সুষুম্নামার্গস্থা কুণ্ডলিনীকে শ্মশানবাসিনী বলা যায়। কাজেই কুণ্ডলিনী অর্থাৎ কালী শ্মশানবাসিনী।

শিবাপরিবৃতা—ধ্যানে আছে কালীকে চার ধারে শিবাদল ঘিরে রয়েছে। কর্পূরাদি-স্তোত্রে[৯] আছে শ্মশান অস্থিকঙ্কালসমাকীর্ণ ভয়ংকর স্থান। শিবাদল সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেবী এই শ্মশানবাসিনী। এখানে শিবা অর্থ শিবপ্রকৃতি অর্থাৎ মঙ্গলস্বভাব অপঞ্চীকৃত মহাভূত আর অস্থিকঙ্কাল শ্বেতবর্ণ বলে সত্ত্বগুণের সূচক। মহাপ্রলয়ের সময় শ্মশান

১ দ্রঃ কর্পূরাদিস্তোত্রের ৮ম শ্লোকের বিমলানন্দ স্বামীকৃত স্বরূপব্যাখ্যা

২ দ্রঃ ঐ পঞ্চদশ শ্লোকের স্বরূপব্যাখ্যা

৩ শ্মশানং দক্ষিণাস্থানং শ্মশানঞ্চ সদাশিবম্।—নিরু ত, প্যঃ ১ ৪ শক্তিসাধনা, ক খ অ, পৃঃ ৩০

৫ শ্মশানং রুদ্রস্থানং তত্তু নিত্যং কৈলাসস্য দক্ষিণশৃঙ্গে অস্ত্যেব কালিকালয়ঃ তত্র বাসিনীম্।

—দ্রঃ কালীতন্ত্র ১।৩৩-এর ব্যাখ্যা

৬ মহাপথঃ শ্মশানঞ্চ সুষুম্নাপ্যেকমেবহি।—প্রা তো, কাণ্ড ৬, পরিঃ ১, ব সং, পৃঃ ৪১৩

৭ মূলোন্নিদ্রভুজঙ্গরাজমহিষীং যান্তীং সুষুম্নান্তরম্।—শা তি ২৫।৬৩ ৮ জ্ঞানীগুরু, ষষ্ঠ সং, পৃঃ ৩১২

৯ দ্রঃ কর্পূরাদিস্তোত্র, শ্লো ৮

অপঞ্চীকৃত মহাভূত এবং মৃত জীবদের সত্ত্বাদিগুণসমূহের দ্বারা সমাকীর্ণ থাকে।[১] দেবী দক্ষিণাকালী এই শ্মশানবাসিনী।

এখানে বলা প্রয়োজন দক্ষিণাকালী শ্মশানবাসিনী হলেও শ্মশানকালী নন। উপাসনার ক্ষেত্রে শ্মশানকালীর ধ্যান মন্ত্রাদি পৃথক্, মূর্তিও পৃথক্।

মদ্যপানপ্রমত্তা— ধ্যানে দক্ষিণাকালীকে মদ্যপানপ্রমত্তা বলা হয়েছে। যা আনন্দিত করে তাই মদ্য।[২] চরম আনন্দ ব্রহ্মানন্দ, ব্রহ্মজ্ঞানে ব্রহ্মানন্দ। তাই বিজয়তন্ত্রে বলা হয়েছে[৩]—যাঁকে নির্বিকার নিরঞ্জন পরব্রহ্ম বলা হয় তদ্বিষয়ক যে-আনন্দকর জ্ঞান তাই মদ্য বলে খ্যাত। ব্রহ্মময়ী কালী স্বাত্মানন্দে স্বাত্মজ্ঞানে বিভোর হয়ে আছেন, মত্ত হয়ে আছেন। এইজন্যই তাঁকে মদ্যপানপ্রমত্তা বলা হয়েছে।

কালী যে মদ্যপান করেন তার অন্যরকম ব্যাখ্যাও আছে। শুদ্ধসত্ত্বময়ী দেবী সাধকের রজোগুণ বৃদ্ধি করে তার তমোগুণের নিগ্রহ করেন এবং সেই তমোগুণোদ্ভব মোহ নাশ করেন। তার পর তার সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি করে রজোগুণেরও নিগ্রহ করেন ও সাধককে মোক্ষদান করেন। সাধকের তমোগুণোদ্ভব মোহই মদ্য।[৪] দেবীর মদ্যপানের এই তাৎপর্য।

ভয়ংকরী—কালীমূর্তি ভয়ংকরী। মহাশক্তির সংহারকার্য চলছে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে। কখনো কখনো তার ভীষণতা সাধারণ লোকের কাছেও প্রত্যক্ষ হয়। যেমন কোনো রেলদুর্ঘটনা, উড়োজাহাজদুর্ঘটনা বা মোটরদুর্ঘটনায় যখন বহুলোক একসঙ্গে মারা যায় তখন সে-দৃশ্য দেখে মানুষ ভয়ে আঁৎকে উঠে। সংহারকার্য যে ভয়ংকর তা লোকে চোখের উপর দেখতে পায়।

মহাশক্তির সংহারকারী রূপকে মূর্তি দিতে গেলে সে-মূর্তি ত ভয়ংকরী হবেই।

কিন্তু কালীমূর্তি ভয়ংকরী সাধারণ পাশবদ্ধ জীবের কাছে। মূর্তিরহস্যজ্ঞ সাধকের কাছে এ মূর্তি করুণাময়ী আনন্দময়ী জননীর মূর্তি। লক্ষ্য করা গেছে কালিকার ধ্যানেই তাঁর জননীরূপ ব্যক্ত হয়েছে। দেবীর প্রসন্নরূপের পরিচয়ও ধ্যানেই আছে। তাঁকে বলা হয়েছে সর্বানন্দকারিণী, হসন্মুখী, সুখপ্রসন্নবদনা এবং স্মেরানন-সরোরুহা।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় ধ্যানে দেবীর করপাদ-উদরাদিবিশিষ্ট যে-রূপ বর্ণিত হয়েছে

১ কর্পূরাদিস্তোত্রের ৮ম শ্লোকের বিমলানন্দ স্বামী-কৃত স্বরূপব্যাখ্যা

২ মদ্যঃ মাদয়িতা অংশুঃ সোমঃ।—ঋ বে ৪।২২।৮-এর সায়ণভাষ্য

৩ যদুক্তং পরমং ব্রহ্ম নির্বিকারং নিরঞ্জনম্। তস্মিন্ প্রমদনং জ্ঞানং তন্মদ্যং পরিকীর্তিতম্।

—বিজয়তন্ত্রবচন, দ্রঃ শাক্ত-ধর্ম, ক প অ, পৃঃ ৫১৭

৪ Karpūrādistotra, Intro p. 25

তা; তাঁর স্থূল রূপ।[১] বিষ্ণুযামলে আছে বিষ্ণু দেবীকে বলছেন—মা, তোমার পরম রূপ কেমন তা কেউ জানে না। সেইজন্য দেবতারা তোমার কাল্যাদি স্থূলরূপের অর্চনা করেন।[২] অর্থাৎ ধ্যানাদিতে কালীর যে-রূপ বর্ণিত হয়েছে তা তাঁর স্থূল রূপ। কালীর সূক্ষ্মরূপ অবাঙ্মনসোগোচর।

দেবতাদেরই যখন এই অবস্থা তখন মানুষের ত কথাই নাই। মানুষ দেবীর স্থূলরূপের ধ্যানাদির দ্বারাই মোক্ষ লাভ করে। কেন না মহাশক্তির সূক্ষ্মরূপের ধ্যান সম্ভবপর নয়।[৩]

স্তব—এই দেবী দক্ষিণাকালী শাক্ত সাধকের অন্যতমা সাধ্যা। ভক্তদের বিশ্বাস স্বয়ং মহাকাল দেবীর সাধনা করেছেন। দেবীর সবচেয়ে বিখ্যাত স্তোত্র কর্পূরাদিস্তোত্র। স্তোত্রটি স্বয়ং মহাকাল-বিরচিত মনে করা হয়।[৪] এই স্তোত্রের বিশেষত্ব এই যে এতে দক্ষিণাকালীর কয়েকটি প্রধান মন্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে এবং মহাদেবীর ধ্যান, যন্ত্র, সাধনা ও স্বরূপবর্ণনা আছে। এটি কৌলস্তোত্র।[৫]

স্তোত্রটি এই[৬]—

মা ত্রিপুরহরবধূ! 'কর্পূরং' শব্দের মধ্যমবর্ণ অর্থাৎ অ র্ প্ ঊ আর অন্ত্যবর্ণ অ এবং ং পরিহার করে যা থাকে তার সঙ্গে অর্থাৎ ক্ র্ এই বর্ণ-দুটির সঙ্গে বামাক্ষী অর্থাৎ ঈ এবং ইন্দু অর্থাৎ ঁ যোগ করলে তোমার বীজমন্ত্র (ক্রীঁ) পাওয়া যায়। এই বীজ যাঁরা ত্রিগুণ করে অর্থাৎ ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ এমনি করে জপ করেন, নীলনীরদকান্তিমনোজ্ঞা ওগো দেবি! সর্বসিদ্ধিপ্রাপ্ত তাঁদের বদনবিবর থেকে গদ্যপদ্যময়ী বাণী স্বচ্ছন্দে উচ্ছ্বসিত হয়।১

মহেশি! ঈশানের অর্থাৎ হকারের সঙ্গে বামকর্ণ অর্থাৎ ঊ এবং ইন্দু অর্থাৎ ঁ যোগ করলে তোমার অন্য বীজ হূঁ পাওয়া যায়। যদি কোনো মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিও এই বীজ দ্বিগুণ করে অর্থাৎ হূঁ হূঁ এমনি করে একবারমাত্রও কখনো জপ করে, তা হলে শিশুশবকর্ণভূষণা অর্দ্ধচন্দ্রচূড়া ওগো দেবি! সে-ব্যক্তি বাচস্পতি বৃহস্পতিকেও জয় করে অর্থাৎ বৃহস্পতির

---

১ করপাদোদরস্থাপি রূপং যৎ স্থূলবিগ্রহম্।—যামলবচন, দ্রঃ, শা ত, উঃ ৩

২ মাতস্ত্বৎপরমং রূপং তন্ন জানাতি কশ্চন। কাল্যাদ্যাঃ স্থূলমদ্রূপং তদর্চন্তি দিবৌকসঃ।—দ্রঃ ঐ

৩ সূক্ষ্মধ্যানং মহেশানি কদাচিন্ন হি জায়তে। স্থূলধ্যানং মহেশানি কৃত্বা মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ।

—যামলবচন, দ্রঃ, ঐ

৪ ইতি মহাকালবিরচিতং স্বরূপাখ্যং স্তোত্রং সমাপ্তম্।—তারারহস্য, পরিঃ ৪

৫ Karpūrādistotra. Preface, P. 1.

৬ কর্পূরং মধ্যমান্ত্যস্বরপররহিতং সেন্দুবামাক্ষিযুক্তং বীজং তে মাতরেতৎ ত্রিপুরহরবধু ত্রিঃকৃতং যে জপন্তি।
তেষাং গদ্যানি পদ্যানি চ মুখকুহরাদুল্লসন্ত্যেব বাচঃ স্বচ্ছন্দং ধ্বান্তধারাধররুচিরুচিরে সর্বসিদ্ধিং গতানাম্।১।

—দ্রঃ T. T., Vol. IX

চেয়েও বিদ্বান্ হয়, ধনপতি কুবেরকেও জয় করে অর্থাৎ কুবেরের চেয়েও ধনী হয় এবং কমলনয়না সুন্দরীদের চিরমুগ্ধ করে। এমনি করে সে প্রভাবশালী হয়।২

আলুলায়িতকুন্তলা ওগো দক্ষিণাকালি! বৈশ্বানরস্থ অর্থাৎ রকারস্থ ঈশ অর্থাৎ হকার (হ্র), তার সঙ্গে বামনেত্র অর্থাৎ ঈ এবং শশধর অর্থাৎ ঁ যোগ করে তোমার অন্য একটি বীজ হ্রীঁ পাওয়া যায়। ওষ্ঠপ্রান্তগলিতরুধিরধারা ওগো দেবি! যাঁরা তোমার এই বীজ দ্বিগুণ করে অর্থাৎ হ্রীঁ হ্রীঁ এমনি করে জপ করেন তাঁরা সমস্ত শত্রুবিনাশ করেন এবং ত্রিভুবন বশীভূত করেন।৩

ত্রিজগদঘহরা দক্ষিণাকালি! তোমার ঊর্দ্ধ-বামকরে কৃপাণ, নিম্ন বামকরে ছিন্নমুণ্ড; ঊর্দ্ধ-দক্ষিণকরে অভয়মুদ্রা, নিম্ন দক্ষিণকরে বরমুদ্রা। প্রকাশিতদশনা ওগো মা! যাঁরা তোমার 'কালিকে' এই নামাত্মক ত্র্যক্ষর মন্ত্র জপ করেন বা ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ দক্ষিণে এই দশাক্ষরমন্ত্রের বিভব ভাবনা করেন, ত্র্যম্বকের অষ্টসিদ্ধি তাঁদের করতলগত হয়।৪

স্মিতমুখী মা স্মরহরমহিষি! বহ্নিসংস্থ বর্গাদ্য অর্থাৎ রকারস্থ ককার অর্থাৎ ক্র, তার সঙ্গে রতি অর্থাৎ ঈ এবং বিধু অর্থাৎ ঁ যোগ করে ক্রীঁ এই বীজটি পাওয়া যায়। এই বীজ তিনটি, কূর্চযুগ্ম অর্থাৎ হূঁ হূঁ, লজ্জাদ্বন্দ্ব অর্থাৎ হ্রীঁ হ্রীঁ এবং এবং ঠদ্বয় অর্থাৎ স্বাহা একত্র করে ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা তোমার এই নবাক্ষরী বিদ্যাটি পাওয়া যায়। যাঁরা তোমার স্বরূপ ভাবনা করতে করতে এটি জপ করেন তাঁরা কন্দর্পের মতো কমনীয়কান্তি হন এবং তাদের চক্ষু লাস্যনৃত্যরতা-লক্ষ্মীর হাতের লীলাকমলের পাপড়ির মতো সুন্দর হয়।৫

মুণ্ডমালিনী পীবরস্তনী ওগো দেবি! যাঁরা তোমার এই অতিগুহ্য শ্রেষ্ঠ বীজগুলির (ক্রীঁ হূঁ হ্রীঁ) প্রত্যেকটি (ক্রীঁ বা হূঁ বা হ্রীঁ), দুটি (হূঁ হূঁ বা হ্রীঁ হ্রীঁ), তিনটি (ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ) অথবা এই-সব বীজ একসঙ্গে[১] (ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ) তোমার

ঈশানঃ সেন্দুবামশ্রবণপরিগতো বীজমন্যন্মহেশি দ্বন্দ্বং তে মন্দচেতা যদি জপতি জনো বারমেকং কদাচিৎ।
জিত্বা বাচামধীশং ধনদমপি চিরং মোহয়ন্নম্বুজাক্ষীবৃন্দং চন্দ্রার্দ্ধচূড়ে প্রভবতি স মহাঘোরবালাবতংসে ॥২॥
ঈশো বৈশ্বানরস্থঃ শশধরবিলসদ্ বামনেত্রেণ যুক্তো বীজন্তে দ্বন্দ্বমন্যদ্ বিগলিতচিকুরে কালিকে যে জপন্তি।
দ্বেষ্টারং ঘ্নন্তি তে চ ত্রিভুবনমপি তে বশ্যভাবং নয়ন্তি সৃক্কদ্বন্দ্বাস্রধারাদ্বয়ধরবদনে দক্ষিণে ত্র্যক্ষরেতি ॥৩॥
ঊর্দ্ধে বামে কৃপাণং করকমলতলে ছিন্নমুণ্ডং তথাধঃ সব্যে চাভীর্বরঞ্চ ত্রিজগদঘহরে দক্ষিণে কালিকে চ।
জপ্ত্বৈতন্নাম যে বা তব মনুবিভবং ভাবয়ন্ত্যেতদম্ব তেষামষ্টৌ করস্থাঃ প্রকটিতরদনে সিদ্ধয়স্ত্র্যম্বকস্য ॥৪॥
বর্গাদ্যং বহ্নিসংস্থং বিধুরতিললিতং তত্ত্রয়ং কূর্চযুগ্মং লজ্জাদ্বন্দ্বঞ্চ পশ্চাৎ স্মিতমুখি তদধষ্ঠদ্বয়ং যোজয়িত্বা।
মাতর্যে যে জপন্তি স্মরহরমহিলে ভাবয়ন্তঃ স্বরূপং তে লক্ষ্মীলাস্যলীলাকমলদলদৃশঃ কামরূপা ভবন্তি ॥৫॥

—দ্রঃ T. T., Vol. IX

১ কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চাননের মতে এখানে দ্বাবিংশত্যক্ষরাত্মক বিদ্যারাজ্ঞী অর্থাৎ ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ দক্ষিণে কালিকে ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা এই মন্ত্রের কথা বলা হয়েছে।—দ্রঃ কর্পূরাদিস্তোত্রের ষষ্ঠ শ্লোকের টীকা

নামের সঙ্গে যুক্ত করে (অর্থাৎ বীজের সঙ্গে দক্ষিণে কালিকে যোগ করে) জপ করেন এবং তত্তৎমন্ত্রবাচ্য তোমার ধ্যানোক্তরূপের (এখানে নবঘননীলা-দিগম্বরী-পীনস্তনী-মুণ্ডমালিনী-মুক্তকেশীরূপ[১]) ভাবনা করেন তাঁদের নয়নপদ্মে কমলা সর্বদা অবস্থান করেন এবং মুখচন্দ্রে বাগ্‌দেবী বিহার করেন।৬

দিগম্বরী মাগো! তোমার কটিতে শবহস্তনির্মিত কাঞ্চী বা চন্দ্রহার, তাতে তোমার নিতম্বদেশ শোভা পাচ্ছে। তুমি ত্রিভুবনের ভোগমোক্ষ বিধান কর। তুমি ত্রিনয়না। শ্মশানস্থশবরূপ-শিবের বক্ষশয্যায় তুমি শিব মহাকালের সঙ্গে সুরতক্রীড়ায় নিবিষ্টা। তোমাকে এইরূপে ধ্যান করলে জড়বুদ্ধিও কবি হয়ে যায়।৭

হরবধু! চতুর্দিকে অতিদুর্দ্ধর্ষ ভয়ংকর শিবাদল। শবসমূহের মুণ্ড অস্থি প্রভৃতিতে চতুর্দিক আকীর্ণ। তার মধ্যে চিতা জ্বলছে। এই শ্মশানে অতিযুবতী[২] তুমি পরমশিব সহ বিপরীতবিহারে আনন্দিতা। যাঁরা সর্বদা তোমার এই রূপের ধ্যান করেন তাঁদের কোথাও পরাভব হয় না।৮

জননি! তোমার পরম তত্ত্ব ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও অবগত নন, আমাদের মতো অত্যন্ত জড়বুদ্ধি ব্যক্তি কি আর বলবে। তথাপি অসিতে! তোমার প্রতি ভক্তিই আমাদেরও স্তুতিমুখর করে তুলেছে। আমাদের এই অপরাধ ক্ষমা কর। অজ্ঞান পশুর প্রতি রোষ তোমার যোগ্য নয়।৯

মা! তোমার মুক্তকেশ দিগম্বর বীরাচারী ভক্ত যদি রাত্রে পীনস্তনজঘনবতী যুবতীরতাসক্ত[৩] হয়ে স্বীয় হৃদয়ে তোমার মহাকালসুরতরতরূপের ধ্যান করতে করতে তোমার মন্ত্র

প্রত্যেকং বা দ্বয়ং বা ত্রয়মপি চ পরং বীজমত্যন্তগুহ্যং ত্বন্নাম্না যোজয়িত্বা সকলমপি সদা ভাবয়ন্তো জপন্তি।
তেষাং নেত্রারবিন্দে বিহরতি কমলা বক্ত্রশুভ্রাংশুবিম্বে বাগ্‌দেবী দেবি মুণ্ডস্রগতিশয়লসৎকণ্ঠি পীনস্তনাঢ্যে ।৬।
গতাসূনাং বাহুপ্রকরকৃতকাঞ্চীপরিলসন্নিতম্বাং দিগ্‌বস্ত্রাং ত্রিভুবনবিধাত্রীং ত্রিনয়নাং।
শ্মশানস্থে তল্পে শবহৃদি মহাকালসুরতপ্রযুক্তাং ত্বাং ধ্যায়ন্ জননি জড়চেতা অপি কবিঃ ।৭।
শিবাভির্ঘোরাভিঃ শবনিবহমুণ্ডাস্থিনিকরৈঃ পরং সংকীর্ণায়াং প্রকটিত-চিতায়াং হরবধূঃ।
প্রবিষ্টাং সন্তুষ্টামুপরিসুরতেনাতিযুবতীং সদা ত্বাং ধ্যায়ন্তি ক্বচিদপি চ ন তেষাং পরিভবঃ ।৮।
বদামস্তে কিংবা জননি বয়মুচ্চৈর্জড়ধিয়ঃ ন ধাতা নাপীশো হরিরপি ন তে বেত্তি পরমং।
তথাপি ত্বদ্ভক্তির্মুখরয়তি চাস্মাকমসিতে তদেতৎক্ষন্তব্যং ন খলু পশুরোষঃ সমুচিতঃ ।৯।

—দ্রঃ T. T., Vol., IX

১ দ্রঃ কর্পূরাদিস্তোত্রের ষষ্ঠ শ্লোকের টীকা

২ পঞ্চাশৎমাতৃকারূপিণী দেবীর পারিভাষিক নাম যুবতী। দ্রঃ পঞ্চাশন্মাতৃকা বা সা যুবতী পরিগীয়তে।

—কামধেনুতন্ত্র, পৃঃ ১০

৩ এইসব অতিগূঢ় সাধনসংকেত। বিমলানন্দ স্বামী-কৃত স্বরূপব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

জপ করেন তা হলে সমস্ত সিদ্ধি তাঁর অধিগত হয়, তিনি কবি অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানী হয়ে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকেন।১০

ত্রিপুরহরবধূ! যদি কোনো সাধক মহাকালের সঙ্গে বিপরীতভাবে অতিশয় রতানন্দ-নিরতা তোমার রূপ নিশ্চলচিত্ত হয়ে ধ্যান করে এবং মন্ত্রার্থ চিন্তা করে এক বৎসর কাল তোমার মন্ত্র জপ করেন তা হলে তিনি পণ্ডিত হয়ে সংসারে সুখে বাস করেন এবং ইচ্ছা-সিদ্ধ্যাদি শক্তিসমূহ তাঁর বশীভূত হয়।১১

জননি! জগৎপ্রপঞ্চের তুমিই প্রসূতি পালয়িত্রী আর প্রলয়কালে ক্ষিত্যাদি পঞ্চমহাভূতাত্মক জগতের তুমিই সংহারকারিণী। অতএব তুমিই ব্রহ্মা, তুমিই ত্রিভুবনপতি শ্রীপতি এবং মহেশ্বরও তুমি। স্থাবর জঙ্গম সমস্তই তুমি। তোমার আর কি স্তব করব?১২

মা! অনেকে তুমি ছাড়া অন্য দেবতাদের পূজা করে। তারা মূঢ়, পরমতত্ত্ব কিছুই জানে না। মহাকালের সহিত রতিরসমহানন্দনিরতা ব্রহ্মাবিষ্ণুরুদ্রাদি দেবতাদের আরাধ্যা আদ্যাশক্তি তুমি। আমি তোমার অতিশয় শরণাগত।১৩

মাগো কালি! তুমি ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ এবং ব্যোম। কল্যাণী গিরিশরমণী কালি! চরাচর সমস্তই একমাত্র তুমি। মা, তোমার কি স্তুতি করব। আমি সাধনহীন অগতি। তোমার অসাধারণ করুণাবশে আমার প্রতি প্রসন্না হও, সংসারে আমার যেন আর জন্ম না হয়।১৪

মহাকালি! শ্মশানে অবস্থিত স্থিরচিত্ত মুক্তকেশ দিগম্বর যে বীরাচারী সাধক তোমার

সমস্তাদাপীনস্তনজঘনধৃগ্ যৌবনবতীরতাসক্তঃ নক্তং যদি জপতি ভক্তস্তব মনুং।
বিবাসা ত্বাং ধ্যায়ন্ গলিতচিকুর স্তস্য বশগাঃ সমস্তাঃ সিদ্ধৌঘা ভুবি চিরতরং জীবতি কবিঃ।১০।
সমাঃ সুস্থীভূতো জপতি বিপরীতাং যদি সদা বিচিন্ত্য ত্বাং ধ্যায়ন্নতিশয়মহাকালসুরতাং
তদা তস্য ক্ষৌণীতলবিহরমাণস্য বিদুষঃ করাম্ভোজে বশ্যা পুরহরবধূ সিদ্ধিনিবহাঃ।১১।
প্রসূতে সংসারং জননি ভবতী পালয়তি চ সমস্তং ক্ষিত্যাদি প্রলয়সময়ে সংহরতি চ।
অতস্ত্বং ধাতাসি ত্রিভুবনপতিঃ শ্রীপতিরপি মহেশোঽপি প্রায়ঃ সকলমপি কিং স্তৌমি ভবতীং।১২।
অনেকে সেবন্তে ভবদধিকগীর্বাণনিবহান্ বিমূঢ়াস্তে মাতঃ কিমপি নহি জানন্তি পরমং
সমারাধ্যামাদ্যাং হরিহরবিরিঞ্চ্যাদিবিবুধৈঃ প্রপন্নোঽস্মি স্বৈরং রতিরসমহানন্দনিরতাং।১৩।
ধরিত্রী কীলালং শুচিরপি সমীরোঽপি গগনং ত্বমেকা কল্যাণী গিরিশরমণী কালি সকলং।
স্তুতিঃ কা তে মাতর্নিজ করুণয়া মামগতিকং প্রসন্না ত্বং ভূয়া ভবমনু ন ভূয়ান্মম জনুঃ।১৪।

—দ্রঃ T. T., Vol. IX

ধ্যাননিরত হয়ে তোমার মন্ত্র জপ করেন এবং প্রত্যেক মন্ত্র জপ করে সহস্র অর্ককুসুম নিজগলিতবীর্যের সঙ্গে তোমাকে প্রদান করেন তিনি অনায়াসে ধরিত্রীর অধিপতি হন।১৫

মাগো কালি! যে-বীরাচারী সাধক মঙ্গলবারে দিবা দ্বিপ্রহরে বা মধ্যরাত্রে ভক্তিভরে তোমার মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক স্বশক্তিরমণজনিতবীর্যলিপ্ত সমূলোৎপাটিত মদনাগারকেশ[১] শ্মশানে একবারমাত্র তোমাকে সমর্পণ করেন তিনি নিশ্চয়ই সৎ কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং ভূপতি হয়ে গজারোহণে সর্বত্র বিচরণ করবেন।১৬

মা! যদি কোন বীরাচারী সাধক 'স্বপুষ্পাকীর্ণ'[২] কুসুমধনুমন্দির সম্মুখে রেখে পুনঃ পুনঃ তার ধ্যান করতে করতে তোমার মন্ত্র জপ করেন তা হলে তিনি গায়কশ্রেষ্ঠ ও কবিত্বামৃতনদীর সরিৎপতি হন অর্থাৎ কালিদাসের মতো মহাকবি হন এবং দেহাবসানে সচ্চিদানন্দরূপিণী তোমাতে বিলীন হয়ে নির্বাণপদ লাভ করেন।১৭

জননী গো! যে বীরাচারী বা দিব্যাচারী সাধক রাত্রিকালে তোমাতে একাগ্রচিত্ত হয়ে এবং আত্মরতানন্দ হয়ে পঞ্চদশকোণবিশিষ্ট যন্ত্রে শবরূপশিবহৃদয়ে হাসিমুখে পরমশিবের সঙ্গে বিপরীতরতিমাধুর্যাসক্তা তোমার ধ্যান করেন তিনি সাক্ষাৎ শিব হয়ে যান। অর্থাৎ অদ্বৈতভাবের সাধক পরমাত্মারূপিণী তোমাতে বিলীন হয়ে কৈবল্যপদ লাভ করেন।[৩]১৮

ওগো অসিতা! যে-সব সাধু ব্যক্তি তোমার নৈমিত্তিক পূজায় মার্জার উষ্ট্র মেষ নর

শ্মশানস্থঃ সুস্থো গলিতচিকুরো দিক্‌পটধরঃ সহস্রস্বর্কাণাং নিজগলিতবীর্য্যেণ কুসুমং।
জপংস্ত্বৎপ্রত্যেকং মনুমপি তব ধ্যাননিরতো মহাকালি স্বৈরং স ভবতি ধরিত্রীপরিবৃঢ়ঃ।।১৫।।
গৃহে সম্মার্জ্জন্যা পরিগলিতবীর্য্যং হি চিকুরং সমূলং মধ্যাহ্নে বিতরতি চিতায়াং কুজদিনে।
সমুচ্চার্য্য প্রেম্ণা মনুমপি সকৃৎ কালি সততং গজারূঢ়ো যাতি ক্ষিতিপরিবৃঢ়ঃ সৎকবিবরঃ।।১৬।।
স্বপুষ্পৈরাকীর্ণং কুসুমধনুষো মন্দিরমহো পুরো ধ্যায়ন্ ধ্যায়ন্ যদি জপতি ভক্তস্তব মনুং
স গন্ধর্বশ্রেণীপতিরপি কবিত্বামৃতনদী-নদীনঃ পর্য্যন্তে পরমপদলীনঃ প্রভবতি।।১৭।।
ত্রিপঞ্চারে পীঠে শবশিবহৃদি স্মেরবদনাং মহাকালেনোচ্চৈর্মদনরসলাবণ্যনিরতাং
সমাসক্তো নক্তং স্বয়মপি রতানন্দনিরতো জনো যো ধ্যায়েত্ত্বামপি জননি স স্যাৎ স্মরহরঃ।।১৮।।

—দ্রঃ T. T., Vol. IX

১ অন্য অর্থ—চুলের জট ছাড়াতে গেলে যে চুল সমূলে উঠে আসে সেই চুল।

—দ্রঃ Karpūrādistotra, p. 59

২ বিবাহিতায়াঃ কন্যায়াঃ প্রথমে ঋতুসম্ভবে। তদ্যোনিস্তং মহেশানি স্বপুষ্পং সর্বমোহনম্।

—মাতৃকাভেদতন্ত্রবচন, দ্রঃ কর্পূরাদিস্তোত্রের সপ্তদশ শ্লোকের টীকা

৩ দ্রঃ কর্পূরাদিস্তোত্রের অষ্টাদশ শ্লোকের বিমলানন্দ স্বামী-কৃত স্বরূপব্যাখ্যা

মহিষ এবং ছাগের লোম- ও অস্থি-যুক্ত মাংস[১] স্বচ্ছন্দে পূজোপহার প্রদান করেন, তাঁদের প্রতিপদে অপূর্বসিদ্ধি লাভ হয়।১৯

মা! যে-জিতেন্দ্রিয় সাধক দিনে হবিষ্যাশী হয়ে একাগ্রচিত্তে তোমার পাদপদ্ম ধ্যান করতে করতে তোমার মন্ত্র লক্ষবার জপ করেন এবং আবার রাত্রে দিগম্বর হয়ে নিধুবন-বিনোদন সহ লক্ষ জপ করেন তিনি জগতে শিবসদৃশ হন।২০

মাগো! তোমার এই স্তব থেকে তোমার মন্ত্র উদ্ধার করা যায়। এতে তোমার স্বরূপ অর্থাৎ নির্গুণসগুণভেদে স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ-তুরীয়াত্মক ধ্যান বর্ণিত হয়েছে আর তোমার শ্রীপাদপদ্মের পূজাবিধিও বর্ণিত হয়েছে। যিনি মধ্যরাত্রে বা পূজাকালে এই স্তোত্র উচ্চৈস্বরে[২] পাঠ করেন তাঁর প্রলাপও কবিত্বরসামৃত হয়ে নিঃসরিত হয়।২১

অনুরাগচঞ্চলা মৃগনয়না রমণীরা সেই স্তোত্রপাঠকারী সাধকের অনুগমন করে। ধরণীর অধীশ্বরও তাঁর বশীভূত হন। তিনি কুবেরতুল্য ধনবান্ হন। শত্রু তাঁকে কারাগারের মতো ভয়ানক মনে করে। সেই ভক্ত জীবন্মুক্ত হয়ে দীর্ঘকাল নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে বাস করেন আর দেহান্তে ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন।২২

কবচ—তন্ত্রশাস্ত্রমতে দেবতার নামের চেয়ে শতগুণ ফল দেয় স্তোত্র, স্তোত্রের শতগুণ ফল দেয় ধ্যান, ধ্যানের শতগুণ ফল দেয় মন্ত্র এবং মন্ত্রের শতগুণ ফল দেয় কবচ।[৩]

> সলোমাস্থি স্বৈরং পললমপি মার্জ্জারমসিতে পরকৌষ্ট্রং মৈষং নরমহিষয়োশ্ছাগমপি বা।
> বলিস্তে পূজায়ামযি বিতরতাং মর্ত্ত্যবসতাং সতাং সিদ্ধিঃ সর্বা প্রতিপদমপূর্বা প্রভবতি ॥১৯॥
> বশী লক্ষং মন্ত্রং প্রজপতি হবিষ্যাশনরতো দিবা মাতর্যুষ্মচ্চরণযুগলধ্যাননিপুণঃ।
> পরং নক্তং নগ্নো নিধুবনবিনোদেন চ মনুং জপেল্লক্ষং স স্যাৎ স্মরহরসমানঃ ক্ষিতিতলে ॥২০॥
> ইদং স্তোত্রং মাতস্তব মনুসমুদ্ধারণজনুঃ স্বরূপাখ্যং পাদাম্বুজযুগলপূজাবিধিযুতং
> নিশার্দ্ধং বা পূজাসময়মধি বা যস্তু পঠতি প্রলাপস্তস্যাপি প্রসরতি কবিত্বামৃতরসঃ ॥২১॥
> কুরঙ্গাক্ষীবৃন্দং তমনুসরতি প্রেমতরলং বশস্তস্য ক্ষৌণীপতিরপি কুবেরপ্রতিনিধিঃ।
> রিপুঃ কারাগারং কলয়তি চ তং কেলিকলয়া চিরং জীবন্মুক্তঃ প্রভবতি স ভক্তঃ প্রতিজনুঃ ॥২২॥
>
> —দ্রঃ T. T., Vol. IX.

১ মানসপূজায় বা অন্তর্যাগে ছাগাদি ছয়টি পশু ষড়রিপুর প্রতীক। ছাগ কাম, মহিষ ক্রোধ, মার্জার লোভ নর মদ, মেষ মোহ আর উষ্ট্র মাৎসর্য। ছাগাদি পশু বলি দেবার তাৎপর্য কামাদি রিপু বলি দেওয়া।
—দ্রঃ কর্পূরাদিস্তোত্রের ১৯ সংখ্যক শ্লোকের বিমলানন্দ স্বামী-কৃত স্বরূপব্যাখ্যা।

২ মনে মনে স্তোত্র পাঠ আর উচ্চৈস্বরে মন্ত্রজপ উভয়ই ভগ্নভাণ্ডের মত নিষ্ফল হয়। দ্রঃ
—মনসা পঠিতং স্তোত্রং বাচা বাপি মনুং জপেৎ।
উভয়োর্নিষ্ফলং দেবি ভিন্নভাণ্ডোদকং যথা।
—বিশুদ্ধেশ্বর-বচন, দ্রঃ কর্পূরাদিস্তোত্রের ২১ সংখ্যক শ্লোকের টীকা

৩ নাম্নঃ শতগুণং স্তোত্রং ধ্যানং তস্মাৎ শতাধিকম্।
তস্মাৎ শতাধিকো মন্ত্রঃ কবচং তচ্ছতাধিকম্।—শ্যামারহস্য, পরিঃ ৪

ব্যাখ্যা—কবচের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে বিপক্ষের অস্ত্রসমূহকে বঞ্চিত করে যা দেহকে রক্ষা করে তা কবচ।[১] সহজ কথায় কবচ অর্থ বর্ম। এটি কবচশব্দের সাধারণ অর্থ। কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রে শব্দটি পারিভাষিক। দেবতার বিশেষমন্ত্রকে কবচ বলা হয়। লৌহ-বর্মাদির মতো দেবতার মন্ত্র সাধকের অঙ্গাদি রক্ষা করে বলে তার নাম কবচ। কবচ পূজার সময় পাঠ করতে হয় আর ভূর্জপত্রে লিখে কণ্ঠাদিতে ধারণ করতে হয়।[২]

বিভিন্ন কবচ— দক্ষিণাকালীর বিভিন্ন কবচ বিভিন্ন তন্ত্রে দেওয়া হয়েছে। সম্প্রদায় অনুসারে এই ভেদ হয়েছে মনে হয়। তন্ত্রসারধৃত ভৈরবতন্ত্রবর্ণিত কবচটি এখানে উদ্ধৃত করা হল।

জগন্মঙ্গল নামক এই কবচের ঋষি শিব, অনুষ্টুপ ছন্দ, দেবতা দক্ষিণাকালিকা, জগতের সম্মোহন, দুষ্টের নিগ্রহ, স্ত্রীবশীকরণ এবং ভুক্তিমুক্তি লাভ এই-সবে এর বিনিয়োগ।

ওঁ। ক্রীঁ এই একাক্ষর বীজরূপিণী কালিকা আমার মস্তক রক্ষা করুন। ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ এই ত্রিবীজরূপিণী খড়্গধারিণী কালিকা আমার ললাট, হূঁ হূঁ বীজদ্বয়রূপিণী নেত্রযুগল, হ্রীঁ হ্রীঁ বীজদ্বয়রূপিণী কর্ণযুগল, 'দক্ষিণে কালিকে' এই মন্ত্রাংশরূপিণী মহেশ্বরী আমার নাসারন্ধ্রদ্বয় রক্ষা করুন। ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ এই ত্রিবীজরূপিণী আমার রসনা, হূঁ হূঁ বীজদ্বয়-রূপিণী কপোল আর হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা-স্বরূপিণী আমার সমস্ত মুখমণ্ডল রক্ষা করুন। দ্বাবিং-শত্যক্ষরী সুখপ্রদা মহাবিদ্যা আমার স্কন্ধদ্বয় রক্ষা করুন আর খড়্গমুণ্ডধারিণী কালী চতুর্দিক্ থেকে আমার সর্বাঙ্গ রক্ষা করুন। ক্রীঁ হূঁ ক্রীঁ এই ত্র্যক্ষরী বিদ্যারূপিণী চামুণ্ডা আমার হৃদয়, ঐঁ হূঁ ওঁ ঐঁ এই বীজচতুষ্টয়রূপিণী আমার স্তনদ্বয় আর হ্রীঁ ফট্ স্বাহা এই বিদ্যারূপিণী আমার গ্রীবা রক্ষা করুন। অষ্টাক্ষরী কর্ত্রিকাধারিণী মহাবিদ্যা আমার ভুজদ্বয় আর ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ এই ষড়ক্ষরী বিদ্যারূপিণী আমার করদ্বয় রক্ষা করুন। ওঁ হ্রীং ক্রীঁ (ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ পাঠান্তর) মে স্বাহা—এই বিদ্যারূপিণী কালিকা আমার জানুদ্বয় রক্ষা করুন। এই বিদ্যার নাম কালীহৃদয়। চতুর্বর্গফলপ্রদা এই বিদ্যা। ক্রীঁ বীজরূপিণী আমার নাভি রক্ষা করুন, 'দক্ষিণে কালিকে' এই মন্ত্রাংশরূপিণী আমার মধ্যদেশ রক্ষা করুন, 'ক্রীঁ স্বাহা'-রূপিণী পৃষ্ঠ রক্ষা করুন আর হ্রীঁ ক্রীঁ দক্ষিণে কালিকে হূঁ হ্রীঁ এই দশাক্ষরী বিদ্যা কালিকা আমার কটিদ্বয় রক্ষা করুন আর স্বাহাযুক্ত এই দশাক্ষরী বিদ্যা আমার ঊরুযুগল রক্ষা করুন। ক্রীঁ হূঁ হ্রীঁ দক্ষিণে কালিকে ক্রীঁ হূঁ হ্রীঁ স্বাহা এই চতুর্দশাক্ষরী বিদ্যা আমার গুল্ফ রক্ষা করুন। খড়্গমুণ্ডধারিণী বরাভয়দাত্রী কালী সকল বিদ্যার দ্বারা আমার সর্বাঙ্গ সব দিক্ থেকে

---

১ কং দেহং বকতি বিপক্ষাস্ত্রাণি বঞ্চয়িত্বা রক্ষতি ইতি শেষঃ।—শব্দকল্পদ্রুম

২ তচ্চ পূজায়াং পাঠ্যং ভূর্জে বিলিখ্য কণ্ঠাদৌ ধার্যং।—ঐ

রক্ষা করুন। কালী কপালিনী কুল্লা কুরুকুল্লা বিরোধিনী বিপ্রচিত্তা উগ্রোগ্রপ্রভা দীপ্তা ঘনদীপ্তা নীলা ঘনা বলাকা মাত্রা মুদ্রা মিতা এই-সব খড়্গধারিণী ও মুণ্ডমালাবিভূষিতা দেবীরা আমাকে দিগ্‌বিদিকে রক্ষা করুন। ব্রাহ্মী নারায়ণী মাহেশ্বরী চামুণ্ডা কৌমারী অপরাজিতা বারাহী নারসিংহী— এই অমিতভূষণা অষ্ট মাতৃকা আপন আপন আয়ুধের দ্বারা দিগ্‌বিদিকে সর্বত্র আমাকে রক্ষা করুন।[১]

ভৈরব ভৈরবীকে বললেন[২] শ্রীজগন্মঙ্গল নামক দিব্য পরমাদ্ভুত এই যে-কবচ তোমাকে বললাম মহামন্ত্রসমূহ এর বিগ্রহ। আমার মুখনিঃসৃত এই ব্রহ্মকবচ ত্রৈলোক্য আকর্ষণ করতে পারে। প্রথমে যথাবিধি গুরুপূজা করে এই কবচ একবার, তিনবার বা যাবজ্জীবন বার বার পাঠ করতে হবে। এই কবচ পঞ্চাশবার পাঠ করলে পাঠকারী ত্রৈলোক্যবিজয়ী হবে।

---

১ শ্রীজগন্মঙ্গলস্যাস্য কবচস্য ঋষিঃ শিবঃ। ছন্দোঽনুষ্টুব্ দেবতা চ কালিকা দক্ষিণেরিতা।
জগতাং মোহনে দুষ্টনিগ্রহে ভুক্তিমুক্তিষু। যোষিদাকর্ষণে চৈব বিনিয়োগঃ প্রকীর্তিতঃ।
ওঁ শিরো মে কালিকা পাতু ক্রীঁ-কারৈকাক্ষরী পরা। ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ মে ললাটঞ্চ কালিকা খড়্গধারিণী।
হূঁ হূঁ পাতু নেত্রযুগ্মং হ্রীঁ হ্রীঁ পাতু শ্রুতী মম। দক্ষিণে কালিকে পাতু ঘ্রাণযুগ্মং মহেশ্বরী।
ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ রসনাং পাতু হূঁ হূঁ পাতু কপোলকম্। বদনং সকলং পাতু হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহাস্বরূপিণী।
দ্বাবিংশত্যক্ষরী স্কন্ধৌ মহাবিদ্যা সুখপ্রদা। খড়্গমুণ্ডধরা কালী সর্বাঙ্গমভিতোঽবতু।
ক্রীঁ হূঁ হ্রীঁ ত্র্যক্ষরী পাতু চামুণ্ডা হৃদয়ং মম। ঐঁ হূঁ ওঁ ঐঁ স্তনদ্বন্দ্বং হ্রীঁ ফট্ স্বাহা ককুৎস্থলম্।
অষ্টাক্ষরী মহাবিদ্যা ভুজৌ পাতু সকর্ত্রিকা। ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ করৌ পাতু ষড়ক্ষরী মম।
ওঁ হ্রীঁ ক্রীঁ মে স্বাহা পাতু কালিকা জানুনী মম। কালীহৃন্নাম-বিদ্যেয়ং চতুর্বর্গফলপ্রদা।
ক্রীঁ নাভিং মধ্যদেশঞ্চ দক্ষিণে কালিকেঽবতু। ক্রীঁ স্বাহা পাতু পৃষ্ঠঞ্চ কালিকা সা দশাক্ষরী।
হ্রীঁ ক্রীঁ দক্ষিণে কালিকে হূঁ হ্রীঁ পাতু কটিদ্বয়ম্। কালী দশাক্ষরী বিদ্যা স্বাহা মমোরুযুগ্মকম্।
ক্রীঁ হূঁ হ্রীঁ পাতু সা গুল্ফং দক্ষিণে কালিকেঽবতু। ক্রীঁ হূঁ হ্রীঁ স্বাহা পাতু চতুর্দশাক্ষরী মম।
খড়্গমুণ্ডধরা কালী বরদাভয়ধারিণী। বিদ্যাভিঃ সকলাভিঃ সা সর্বাঙ্গমভিতোঽবতু।
কালী কপালিনী কুল্লা কুরুকুল্লা বিরোধিনী। বিপ্রচিত্তা তথোগ্রোগ্রপ্রভা দীপ্তা ঘনত্বিষঃ।
নীলা ঘনা বলাকা চ মাত্রা মুদ্রা মিতা চ মাম্। এতাঃ সর্বাঃ খড়্গধরা মুণ্ডমালাবিভূষিতাঃ।
রক্ষন্তু দিগ্‌বিদিক্ষু মাং ব্রাহ্মী নারায়ণী তথা। মাহেশ্বরী চ চামুণ্ডা কৌমারী চাপরাজিতা।
বারাহী নারসিংহী চ সর্বাশ্চামিতভূষণাঃ। রক্ষন্তু স্বায়ুধৈর্দিক্ষু বিদিক্ষু মাং যথা তথা।
—বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৫৩৬-৫৩৭

২ ইতি তে কথিতং দিব্যং কবচং পরমাদ্ভুতম্। শ্রীজগন্মঙ্গলং নাম মহামন্ত্রৌঘবিগ্রহম্।
গুরুপূজাং বিধায়াথ বিধিবৎ প্রপঠেত্ততঃ। কবচং ত্রিঃ সকৃদ্বাপি যাবজ্জীবঞ্চ বা পুনঃ।
এতচ্ছতার্দ্ধমাবৃত্য ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ।—বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৫৩৭

এই ধরণের আরও ফল বর্ণনার পর বললেন[১] এই কবচ না জেনে যে দক্ষিণাকালিকার মন্ত্র জপ করে কোটিবার জপ করলেও তার প্রতি বিদ্যা প্রসন্ন হন না; সে অস্ত্রাঘাত প্রাপ্ত হয় এবং অচিরে তার মৃত্যু হয়।

এখানে বলা আবশ্যক যাঁরা সাধক এ-সব স্তব কবচাদির যথার্থ মর্ম তাঁরাই জানতে পারেন। শুধু বুদ্ধি দিয়ে এ-সবের মর্ম জানা যায় না। বিশেষ করে যাঁরা এই বিশেষ সাধনরাজ্যের সঙ্গে পরিচিত নন তাঁদের এ-সব অর্থহীন মনে হওয়াও আশ্চর্য নয়।

আমরা পূর্বেই বলেছি বাংলা দেশে দক্ষিণাকালী বা শ্যামাকালীর আরাধনাই অধিক প্রচলিত। সেইজন্য এই দেবী সম্পর্কে কিঞ্চিৎ বিস্তৃত আলোচনা করা গেল।[২]

শ্মশানকালী—লক্ষ্য করা গেছে দক্ষিণাকালী শ্মশানবাসিনী হলেও তাঁকে শ্মশানকালী বলা হয় না। শ্মশানকালী মহাশক্তির অন্যরূপ।

মন্ত্র—শ্মশানকালীর মন্ত্র সম্বন্ধে বলা হয়েছে[৩] বাণী অর্থাৎ ঐঁ, মায়া অর্থাৎ হ্রীঁ, লক্ষ্মী অর্থাৎ শ্রীঁ, কামবীজ অর্থাৎ ক্লীঁ, তার পরে কালিকে, তার পরে বিলোমক্রমে আবার ঐ চারটি বীজ একত্র করে ঐ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ কালিকে ক্লীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ঐঁ এই একাদশাক্ষরী চতুর্বর্গপ্রদায়িনী বিদ্যা পাওয়া যায়।

এ ছাড়া দেবীর ক্লীঁ কালিকায়ৈ নমঃ এই সপ্তাক্ষরী বিদ্যা[৪] এবং ক্লীঁ ক্লীঁ ক্লীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ শ্মশানকালি ক্লীঁ ক্লীঁ ক্লীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা এই একবিংশাক্ষরী বিদ্যার[৫] উল্লেখও শাস্ত্রে আছে।

ধ্যান—শ্মশানালয়বাসিনী দেবী অঞ্জনাদ্রির মতো গভীরকৃষ্ণবর্ণা। তিনি ত্রিনয়নী, মুক্তকেশী। তাঁর পিঙ্গল নেত্র রক্তবর্ণ, দেহের মাংস শুকিয়ে গেছে। সেইজন্য তাঁকে অতি ভয়ংকরী দেখায়। কল্যাণময়ী দেবীর বামহস্তে মদ্যপূর্ণ কপাল, দক্ষিণ হস্তে সদ্যশ্ছিন্ন

১ ইদং কবচমজ্ঞাত্বা যো জপেৎ কালিদক্ষিণাম্। শতলক্ষং প্রজপ্ত্বাপি তস্য বিদ্যা ন সিধ্যতি।
সঃ শস্ত্রাঘাতমাপ্নোতি সোঽচিরান্মৃত্যুমাপ্নুয়াৎ।—বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৩৩৮

২ আমাদের আলোচনায় গ্রন্থবিস্তারভয়ে অন্য দেবীদের শুধু মন্ত্র ও ধ্যান বর্ণিত হবে। তবে তারা ও ষোড়শীর কবচ এবং স্তবও দেওয়া হবে। কারণ কালী তারা ষোড়শী এই তিন মহাবিদ্যার আরাধনাই অধিক প্রচলিত। অন্যান্য মহাবিদ্যার স্তব ও কবচ—দ্রঃ শাক্তপ্রমোদ, পৃঃ ২০৮, ২১০; ২৩৮, ২৪০; ২৬৭ ২৬৮; ২৯২, ২৯৩; ৩১৯, ৩২০; ৩৪১, ৩৪২, ৩৭০, ৩৭২

৩ বাণীং মায়াং ততো লক্ষ্মীং কামবীজমতঃপরম্। কালিকে সংপুটত্বেন চতুষ্কং বীজমালিখেৎ।
একাদশার্ণা দেবেশি চতুর্বর্গপ্রদায়িনী।—কালীতন্ত্রোক্ত মন্ত্র, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৩৭০

৪ কামবীজং সমালিখ্য কালিকায়ৈ সমালিখেৎ। নমোঽন্তেন চ দেবেশি সপ্তার্ণো মনুরুত্তমঃ।—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৩৭৪

৫ দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৩২৫

নরমুণ্ড। স্মিতাননা দেবী সর্বদা আমমাংসচর্বণে তৎপর। তাঁর অঙ্গ নানা অলংকারে ভূষিত। দেবী সদা আসবপানে নৃত্যোন্মত্তা।[১]

অন্য ধ্যান—দেবীর এই ধ্যান ছাড়া অন্য ধ্যানও আছে। যথা[২]—কালী মহামায়া ত্রিনেত্রা বহুরূপিণী। তিনি চতুর্ভুজা লোলজিহ্বা পূর্ণচন্দ্রনিভাননা নীলোৎপলদলনয়না এবং শত্রুদের বিনাশকারিণী। দেবীর হস্তে নরমুণ্ড খড়্গ কমল এবং বরমুদ্রা। তিনি রক্তবদনা ভীষণ-দংষ্ট্রা। দিগম্বরী দেবীর মুখে সর্বদা অট্টহাসি। তিনি শবাসনস্থা কল্যাণকারিণী, সর্বকামনা তিনি পূর্ণ করেন। এই রূপে দেবীর ধ্যান করতে হবে।

সিদ্ধকালী—সিদ্ধকালী ব্রহ্মরূপা ভুবনেশ্বরী। ইনি দক্ষিণা কালীরই রূপভেদ।[৩]

মন্ত্র—কালীতন্ত্রে সাংকেতিক ভাষায় সিদ্ধকালীর মন্ত্র দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রটি উদ্ধার করলে পাওয়া যায় ওঁ হ্রীঁ ক্রীঁ মে স্বাহা।[৪] এই মন্ত্র বা বিদ্যার নাম কালীহৃদয়। এই মহাবিদ্যা মহা-অভ্যুদয়দাত্রী সিদ্ধবিদ্যা। এর ঋষি ভৈরব, ছন্দ বিরাট্, ব্রহ্মরূপা ভুবনেশ্বরী সিদ্ধকালী দেবতা, বীজ ক্রীঁ, শক্তি হ্রীঁ।[৫]

ধ্যান—খড়্গোচ্ছিন্ন ইন্দুমণ্ডলনিঃসৃত অমৃতরসের দ্বারা দেবীর সর্বাঙ্গ প্লাবিত। তিনি ত্রিনয়না, মুক্তকেশী। তিনি তাঁর বামহস্তস্থিত কপাল থেকে বিগলিত অমৃত পান করছেন। দিগম্বরীর কটিদেশে কাঞ্চী, মস্তকে মণিময় মুকুট। তিনি দীপ্তজিহ্বা, নীলোৎপলবর্ণা। চন্দ্রসূর্য দেবীর কুণ্ডলরূপে শোভমান। তিনি আলীঢ়পাদা* অর্থাৎ বামপদ সম্মুখে রেখে অধিষ্ঠিতা। এই দেবী আমাদের রক্ষা করুন।[৬]

১ অঞ্জনাদ্রিনিভাং দেবীং শ্মশানালয়বাসিনীং। ত্রিনেত্রাং মুক্তকেশীঞ্চ শুষ্কমাংসাতিভীষণাম্।
পিঙ্গাক্ষীং বামহস্তেন মদ্যপূর্ণকপালকং। সদ্যঃ কৃত্তশিরো দক্ষহস্তেন দধতীং শিবাং।
স্মিতবক্ত্রাং সদা চামমাংসচর্বণতৎপরাং। নানালঙ্কারভূষাঙ্গীং নৃত্যোন্মত্তাং সদাসবৈঃ।
—ষড়্যোক্ত ধ্যান, দ্রঃ শ্যামারহস্য, পরিঃ ৬

২ ওঁ ধ্যায়েৎ কালীং মহামায়াং ত্রিনেত্রাং বহুরূপিণীং। চতুর্ভুজাং লোলজিহ্বাং পূর্ণচন্দ্রনিভাননাম্।
নীলোৎপলদলপ্রখ্যাং শত্রুসংঘবিদারিণীং। নরমুণ্ডং তথা খড়্গং কমলঞ্চ বরন্তথা।
বিভ্রাণাং রক্তবদনাং দংষ্ট্রালীঘোররূপিণীম্। অট্টাট্টহাসনিরতাং সর্বদা চ দিগম্বরাম্।
শবাসনস্থিতাং দেবীং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্।—দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৫, পরিঃ ৬, ব সং, পৃঃ ৩৮৯

৩ দ্রঃ কালীতন্ত্রের বঙ্গানুবাদ, পৃঃ ১১, পাদটীকা

৪ প্রণবং পূর্বমুদ্ধৃত্য লজ্জাবীজমুদ্ধরেৎ। রতিবীজং সমুদ্ধৃত্য পাবকস্য জায়ান্বিতম্।
ঠদ্বয়েন সমাযুক্তা বিদ্যারাজ্ঞী মনোহিতা।—কালী ত, ১০।২৮-২৯

৫ ভৈরবোঽস্য ঋষিঃ প্রোক্তো বিরাট্ ছন্দ উদীরিতম্। সিদ্ধকালী ব্রহ্মরূপা দেবতা ভুবনেশ্বরী।
রতিবীজং বীজমস্যা লজ্জা শক্তিরুচ্যতে।—ঐ, ১০।৩০-৩১

* সম্প্রদায় অনুসারে এর অর্থ শবরূপমহাদেবের বুকের উপর দেবীর বামপদ ও উরুদ্বয়ের উপর দক্ষিণপদ।
—দ্রঃ সিদ্ধান্তভূষণকৃত টীকা, কালী ত, পৃঃ ৫৩

৬ খড়্গোচ্ছিন্নেন্দুবিম্বস্রবদমৃতরসাপ্লাবিতাঙ্গী ত্রিনেত্রা। সব্যে পাণৌ কপালাদ্গলদমৃতমথো মুক্তকেশী পিবন্তী।
দিগ্বস্ত্রা বদ্ধকাঞ্চী মণিময়মুকুটাদ্যৈর্যুতা দীপ্তজিহ্বা। পায়ান্নীলোৎপলাভা রবিশশিবিলসৎ কুণ্ডলালীঢ়পাদা।
—কালী ত, ১০।৩৩

গুহ্যকালী— মহাকালসংহিতার অনুস্মৃতিপ্রকরণে আছে— নববিধা কালীর মধ্যে গুহ্যকালী প্রধান। এঁর মতো বিদ্যা ব্রহ্মাণ্ডে আর নাই।[১]

মন্ত্র—গুহ্যকালীর মন্ত্র একাধিক। মহাকালসংহিতার মতে গুহ্যকালীর মন্ত্র অষ্টাদশ প্রকার। সে-সব সর্বাগমে গোপনীয়, কখনও প্রকাশ্য নয়।[২]

দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি মন্ত্রের উল্লেখ করা যাক। বিশ্বসারতন্ত্রোক্ত প্রথম মন্ত্রটি উদ্ধার করলে পাওয়া যায় ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ গুহ্যে কালিকে ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা। এটি একবিংশাক্ষরী বিদ্যা। এই মন্ত্রের গুহ্যের স্থলে দক্ষিণে যোগ করলেই গুহ্য-কালিকার দ্বাবিংশাক্ষরী বিদ্যা পাওয়া যায়।[৩]

গুহ্যকালীর ষোড়শাক্ষরী বিদ্যা—ক্রীঁ হূঁ হ্রীঁ গুহ্যে কালিকে ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা। এই মন্ত্রের কামবীজদ্বয় অর্থাৎ ক্রীঁ ক্রীঁ বাদ দিলেই ক্রীঁ হূঁ হ্রীঁ গুহ্যে কালিকে হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা। এই চতুর্দশাক্ষরী বিদ্যা পাওয়া যায়। এই মন্ত্রের 'গুহ্যে'-র স্থলে 'দক্ষিণে'-পদ যোগ করলেই গুহ্যকালীর পঞ্চদশাক্ষরী বিদ্যা পাওয়া যায়।[৪]

গুহ্যকালীর দ্বাবিংশাক্ষরী ও পঞ্চদশাক্ষরী বিদ্যা প্রমাণ করে গুহ্যকালী ও দক্ষিণাকালী অভিন্ন। মহাকালসংহিতার মতে দশবক্ত্রা জগদম্বিকা গুহ্যকালী প্রকৃতি আর অন্য কালীরা কার্যকারণভেদে তাঁর বিকৃতি।[৫]

গুহ্যকালী শুধু দশবক্ত্রাই নন। মহাকালসংহিতাতেই আছে তিনি শতবক্ত্রা, অশীতি-বক্ত্রা, ষষ্টীবক্ত্রা, ষটত্রিংশদাননা, ত্রিংশদাননা, বিংশতিবক্ত্রা, দশবক্ত্রা, পঞ্চবক্ত্রা, ত্রিবক্ত্রা, দ্বিবক্ত্রা ও একবক্ত্রা। এঁদের মধ্যে ভরতোপাসিতা গুহ্যকালী দশবক্ত্রা চতুষ্পঞ্চাশৎবাহুযুক্তা। দেবীর ষোড়শাক্ষর মন্ত্র।[৬]

ধ্যান—ভরতোপাসিতা দশবক্ত্রা গুহ্যকালীর মস্ত বড় ধ্যান পুরশ্চর্যার্ণবে[৭] উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু এই ধ্যান তত প্রচলিত নয়। তন্ত্রসারধৃত নিম্নোক্ত ধ্যানটিই বহুপ্রচলিত—

১ নববিধাসু কালীষু গুহ্যকালী প্রশস্যতে। অনয়া সদৃশী বিদ্যা নাস্তি ব্রহ্মাণ্ডগোলকে।—পুঃ চ, পৃঃ ১৬

২ গুহ্যকাল্যাস্তু মন্ত্রাণামষ্টাদশবিধাঃ প্রিয়ে। সর্বাগমেষু গোপ্যাস্তে ন প্রকাশ্যাঃ কদাচন।—ঐ, পৃঃ ৭৩১

৩ বৃহৎ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৩২৪ ৪ ঐ

৫ দশবক্ত্রা তু যা প্রোক্তা গুহ্যকালী ময়া শিব। প্রকৃতিঃ সা পরিজ্ঞেয়া কালীনাং জগদম্বিকা।
অন্যা বিকৃতয়ঃ প্রোক্তাঃ কার্যকারণভেদতঃ।—পুঃ চ, পৃঃ ৭৭১

৬ শতবক্ত্রাশীতিবক্ত্রা ষষ্টিবক্ত্রা তথৈব চ। ষটত্রিংশদাননা ত্রিংশদাননা পরিকীর্তিতা।
তথা বিংশতিবক্ত্রা চ দশবক্ত্রা চ কালিকা। পঞ্চবক্ত্রা ত্রিবক্ত্রা চ দ্বিবক্ত্রা চৈকবক্ত্রিকা।
যা গুহ্যকালী তন্মধ্যে ভরতোপাসিতা প্রিয়ে। দশবক্ত্রা ষোড়শার্ণা চতুষ্পঞ্চাশদ্দোর্যুতা।—ঐ, পৃঃ ৭৭২

৭ পুঃ চ, তরঙ্গ ৯, পৃঃ ৭৩৪

মহামেঘপ্রভা দেবীর পরিধানে কৃষ্ণবস্ত্র। তিনি লোলজিহ্বা ঘোরদংষ্ট্রা। তাঁর চক্ষু কোটরগ্রস্ত, তিনি হাস্যমুখী। তাঁর কণ্ঠে নাগহার, ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র। দেবীর একটি জটা আকাশ স্পর্শ করেছে। তিনি স্বয়ং শব লেহন করছেন। তাঁর অঙ্গে নাগযজ্ঞোপবীত, তিনি নাগশয্যায় অধিষ্ঠিতা। দেবী গুহ্যকালীর গলায় পঞ্চাশৎমুণ্ডসংযুক্ত মালা, তিনি মহোদরী। তাঁর মাথার উপরে সহস্রফণা অনন্তনাগ। তিনি চতুর্দিকে ফণাধারী নাগদের দ্বারা বেষ্টিত। সর্পরাজ তক্ষক দেবীর বাম হস্তের কঙ্কণ আর নাগরাজ অনন্ত দক্ষিণ হস্তের কঙ্কণ। তাঁর কটিতে নাগরচিত কাঞ্চী, পায়ে রত্নূপুর। দেবীর বামে বালকরূপ শিব। দেবী দ্বিভুজা, নাগযজ্ঞোপবীতধারিণী। তাঁর কর্ণদ্বয়ে নরদেহ কুণ্ডলরূপে শোভা পাচ্ছে। দেবী প্রসন্নবদনা সৌম্যা নবরত্নবিভূষিতা। শিবমোহিনী নারদাদি মুনিদের আরাধ্যা। তিনি অট্টহাস্যকারিণী মহাভীমা সাধকের অভীষ্টদায়িনী। এই রূপের ধ্যান করতে হবে।[১]

ভদ্রকালী—নীলকণ্ঠ মহাভারতের টীকায় ভদ্রকালীর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে-কালী ভক্তদের কল্যাণ বিধান করেন তিনি ভদ্রকালী।[২]

মহাভারতে আছে দক্ষযজ্ঞবিনাশের জন্য রুদ্রের ক্রোধ থেকে বীরভদ্রের উদ্ভব হয় আর দেবীর ক্রোধ থেকে উদ্ভব হয় ভদ্রকালীর।[৩]

দেবীভাগবতেও বলা হয়েছে পুরাকালে দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী ভদ্রকালী কোটি যোগিনীর সঙ্গে আবির্ভূতা হয়েছিলেন।[৪]

মন্ত্র—দেবী ভদ্রকালীরও একাধিক মন্ত্র আছে। যথা বিংশাক্ষর মন্ত্র—ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ ভদ্রকাল্যৈ ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা। দেবীর এই বিংশদ্বর্ণাত্মিকা বিদ্যা শুভাবহা চতুর্বর্গপ্রদানকারিণী।[৫]

১ মহামেঘপ্রভাং দেবীং কৃষ্ণবস্ত্রপিধায়িনীম্। লোলজিহ্বাং ঘোরদংষ্ট্রাং কোটরাক্ষীং হসন্মুখীম্।
নাগহারলতোপেতাং চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরাম্। তাং দিবস্পৃশীং জটামেকাং লেলিহানাং শবং স্বয়ম্।
নাগযজ্ঞোপবীতাঢ্যাং নাগশয্যানিষেদুষীম্। পঞ্চাশন্মুণ্ডসংযুক্তবনমালাং মহোদরীম্।
সহস্রফণসংযুক্তমনন্তং শিরসোপরি। চতুর্দ্দিক্ষু নাগফণাবেষ্টিতাং গুহ্যকালিকাম্।
তক্ষকসর্পরাজেন বামকঙ্কণভূষিতাম্। অনন্তনাগরাজেন কৃতদক্ষিণকঙ্কণাম্।
নাগেন রশনাহারকল্পিতাং রত্ননূপুরাম্। বামে শিবস্বরূপন্তং কল্পিতং বৎসরূপকম্ (বালরূপকম্)।
দ্বিভুজাং চিন্তয়েদ্দেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীং। নরদেহসমাবদ্ধকুণ্ডলশ্রুতিমণ্ডিতাম্।
প্রসন্নবদনাং সৌম্যাং নবরত্নবিভূষিতাম্। নারদাদ্যৈর্মুনিগণৈঃ সেবিতাং শিবমোহিনীম্।
অট্টহাসাং মহাভীমাং সাধকাভীষ্টদায়িনীম্।—বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৩২৩

২ ভদ্রং কল্যাণং কালয়তি ভক্তান্ প্রত্যানয়তি সা ভদ্রকালী।—মহা ভা ৩।২৩।৫-এর নীলকণ্ঠ-কৃত টীকা

৩ ভদ্রকালীতি বিখ্যাতা দেব্যাঃ কোপাদ্বিনিঃসৃতা।—মহা ভা. ১২।২৮৩।৫৪

৪ পুরাষ্টম্যাং ভদ্রকালী দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী। প্রাদুর্ভূতা মহাঘোরা যোগিনীকোটিভিঃ সহ।—দে ভা ৩।২৭।৯

৫ ভদ্রকাল্যাঃ পরো বিদ্যাঃ কথ্যন্তে শৃণু পার্বতি। কামবীজত্রিকং বীজং সর্বং পূর্বাপরে বদেৎ।
ভদ্রকালীং তথা ডেংন্তাং বীজমধ্যে নিয়োজয়েৎ। স্বাহান্তা কথিতা বিদ্যা বিংশদ্বর্ণাত্মিকা পরা।
চতুর্বর্গপ্রদা বিদ্যা ভদ্রকালী শুভাবহা।—বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৩২৫

অন্য একটি মন্ত্র—হৌঁ কালি মহাকালি কিলি কিলি ফট্ স্বাহা। এটি ভদ্রকালীর চতুর্দশাক্ষর মহামন্ত্র।[১]

ধ্যান—ভদ্রকালীর একটি ধ্যান এই—ভদ্রকালী ক্ষুধায় ক্ষীণা, তাঁর চক্ষু কোটরগ্রস্ত, মুখ মসির মতো মলিন, কেশ আলুলায়িত। তিনি অনবরত রোদন করছেন আর বলছেন আমি তৃপ্ত হইনি, অখিল জগৎ একগ্রাসে উদরসাৎ করব। দেবীর উভয় হস্তে জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মতো পাশযুগল; তাঁর দন্ত জম্বুফলের মতো কৃষ্ণবর্ণ। দেবী ভদ্রকালী ভয় দূর করুন, আমাকে রক্ষা করুন।[২]

ভদ্রকালী ভয়াপহা। ভয় দূরীকরণের জন্য তাঁর ধ্যানাদি শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে।[৩]

অন্য ধ্যান—পূর্বোক্ত ধ্যান ছাড়া দেবীর অন্য একটি ধ্যান পুরশ্চর্যার্ণবে উদ্ধৃত হয়েছে। যথা—ভদ্রকালী অতিরৌদ্রা মহাদংষ্ট্রা অতিদীর্ঘাঙ্গী কৃশোদরী সুবৃত্তনয়না বীর্যবতী দীর্ঘনাসা ও মদাতুরা। দেবীর কণ্ঠস্বর স্নিগ্ধ-গম্ভীর, নীলমেঘের মতো তাঁর বর্ণ। দেবী 'ভূগুত্তঘট-সন্দীপ্তা' (?), বৃহৎদশনশ্রেণীর জন্য তিনি ভীষণদর্শনা, ক্রোধে তাঁর দংষ্ট্রা, ওষ্ঠ ও চক্ষু তাম্রবর্ণ। তাঁর মাথায় দীর্ঘ রক্তকেশ। ত্রিশূলধারিণী দেবী দোর্দণ্ডপ্রতাপশালিনী। তিনি মানুষ থেকে কীট পর্যন্ত জীবের মাংস ভক্ষণ করেন। দেবীর পরিধানে অতিশয় রক্তবর্ণ বস্ত্র। রক্ত মাংস ও আসব তাঁর প্রিয় বস্তু। মুণ্ডমালা দেবীর অঙ্গশোভা বর্দ্ধন করছে। তিনি শোণিত এবং আসব পান করছেন। পিশাচগণসেবিতা দেবী নৃত্য করছেন, হাসছেন, পিশাচের স্কন্ধে আরোহণ করে সারা জগতে ভ্রমণ করছেন। শঙ্করের মুখোৎপন্না যোগবল্লভা যোগিনী ভদ্রকালীর এই রূপ এবং তিনি মাতৃকাগণের দ্বারা পরিবৃতা হয়ে থাকেন।[৪]

১ প্রাসাদবীজমুদ্ধৃত্য কালীতিপদমুদ্ধরেৎ। মহাকালিপদং চোক্ত্বা কিলিযুগ্মমতঃ পরম্।
অস্ত্রমগ্নিপ্রিয়ান্তোঽয়ং ভদ্রকালীমহামনুঃ।—বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৩৩৭

২ ক্ষুৎক্ষামা কোটরাক্ষী মসিমলিনমুখী মুক্তকেশী রুদন্তী
নাহং তৃপ্তা বদন্তী জগদখিলমিদং গ্রাসমেকং করোমি।
হস্তাভ্যাং ধারয়ন্তী জ্বলদনলশিখাসন্নিভং পাশযুগ্মং
দন্তৈর্জম্বুফলাভৈঃ পরিহরতু ভয়ং পাতু মাং ভদ্রকালী।—ঐ।

৩ ধ্যাতব্যোক্ত মহাদেবী ভদ্রকালী ভয়াপহা।—ঐ

৪ অতিরৌদ্রা মহাদংষ্ট্রা ভৃশং দীর্ঘা কৃশোদরী। সুবৃত্তনয়না শূরা দীর্ঘঘোণা মদাতুরা।
স্নিগ্ধগম্ভীরনির্ঘোষা নীলজীমূতসন্নিভা। ভূগুত্তঘটসন্দীপ্তা মহারদনভীষণা।
দংষ্ট্রৌষ্ঠকোপতাম্রাক্ষী রক্তদীর্ঘশিরোরুহা। ত্রিশূলব্যগ্রদোর্দণ্ডা নরকীটপলাশিনী।
অতিরক্তাম্বরা দেবী রক্তমাংসাসবপ্রিয়া। শিরোমালাভূষিতাঙ্গী পিবন্তী শোণিতাসবম্।
নৃত্যন্তী চ হসন্তী চ পিশাচগণসেবিতা। পিশাচস্কন্ধমারূঢ় ভ্রমন্তী বসুধাতলম্।
শঙ্করস্য মুখোৎপন্না যোগিনী যোগবল্লভা। ঈদৃগ্ভূতা ভদ্রকালী মাতৃভিঃ পরিবারিতা।
—পু চ, ত ৯, পৃঃ ৭৪৪-৭৪৬

আরেকটি ধ্যান—তা ছাড়া প্রপঞ্চসারতন্ত্রে ভদ্রকালীর অন্য একটি ধ্যান বর্ণিত হয়েছে। যথা—ভদ্রকালীর শুভ্র দংষ্ট্রা অতি ভীষণ। তিনি ত্রিনয়না, উর্ধ্বকেশী, ভয়ংকরী। তাঁর হস্তে কপাল পরশু ডমরু ও ত্রিশূল। দেবীর বর্ণ বর্ষণোন্মুখ মেঘের মতো। তাঁর কটিদেশে শোভন কিঙ্কিণীমালা রিণি রিণি শব্দ করছে। দেবী ভদ্রকালী চিরকাল বিভবসিদ্ধি প্রদান করুন।[১]

মহিষমর্দ্দিনী— তন্ত্রমতে ভদ্রকালী মহিষমর্দ্দিনী। যোগিনীতন্ত্রে কালী শিবকে বলছেন—দেবেশ! তোমার বীর্য থেকে মহিষীর গর্ভে তুমি মহিষাসুর নামে জন্মগ্রহণ করবে এবং অসুরভাব প্রাপ্ত হয়ে আমার সঙ্গে মহাযুদ্ধ করবে। তখন আমি ভদ্রকালীরূপে তোমাকে বিনাশ করে আমার পাদপদ্মের বামাঙ্গুষ্ঠ তোমার বুকের উপর স্থাপন করব।[২]

কিন্তু সাধারণতঃ দেবী দুর্গাকেই মহিষমর্দ্দিনী মনে করা হয়। বাংলা দেশে যে-দশভুজা দুর্গার পূজা প্রচলিত তিনি মহিষমর্দ্দিনী। বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণোক্ত যে-ধ্যান[৩] দুর্গাপূজায় ব্যবহৃত হয় এবং যে-ধ্যান অনুসারে শাস্ত্রসিদ্ধ প্রতিমানির্মাণ হয় তাতে দেবী দুর্গাকে মহিষাসুরমর্দ্দিনী বলা হয়েছে।

ভদ্রকালীই দুর্গা। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় লিখেছেন "মহাভারতোক্ত দুর্গাস্তবে, মার্কণ্ডেয়পুরাণে ও বিষ্ণুপুরাণে দুর্গা যশোদাগর্ভসম্ভূতা। তিনি ভদ্রকালী অর্থাৎ কালীরূপা।"[৪]

বিদ্যানিধি মহাশয় ভদ্রকালী সম্বন্ধে জ্যোতিষগণনামূলক আলোচনা করে অনুমান করেছেন ভদ্রকালীই পরবর্তী কালে দুর্গা হয়েছেন। তিনি লিখেছেন "আরও মনে হয় দুর্গাপূজাপ্রচলনের পূর্বে ভদ্রকালীর পূজা হইত। পরে দুর্গাপূজা আসিয়াছে, কিন্তু শরৎঋতুতে।"[৫]

১ সুরৌদ্রসিতদংষ্ট্রিকা ত্রিনয়নোর্দ্ধ্বকেশোল্বণা কপালপরশূল্লসড্ডমরুকত্রিশূলাকুলা।
ঘনাঘননিভা রণক্রুচিরকিঙ্কিণীমালিকা ভবদ্বিভবসিদ্ধয়ে ভবতু ভদ্রকালী চিরম্।—প্র সা ত ৩২।৯

২ মহিষীগর্ভসম্ভূতস্তব রেতঃসমুদ্ভবঃ। ভবিষ্যসি ত্বং দেবেশ মহিষাসুর নামধৃক্।
আসুরং ভাবমাসাদ্য মহাযুদ্ধং করিষ্যসি। তদা ত্বাং নাশয়িত্বাহং ভদ্রকালীস্বরূপতঃ।
বামাঙ্গুষ্ঠং পদাব্জস্য স্থাপয়িষ্যামি তে হৃদি।—যো ত, পূর্বখণ্ড পঃ ৯

৩ ওঁ জটাজুটসমাযুক্তামর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরাম্। লোচনত্রয়সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাম্।
অতসীপুষ্পবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাম্। নবযৌবনসম্পন্নাং সর্বাভরণভূষিতাম্।
সুচারুদশনাং তদ্বৎ পীনোন্নতপয়োধরাম্। ত্রিভঙ্গস্থানসংস্থানাং মহিষাসুরমর্দ্দিনীম্। ইত্যাদি
—বৃঃ পু ব, সং ৩১, পৃঃ ৭৫৯

৪ পূজাপার্বণ, পৃঃ ১১৩ ৫ ঐ, পৃঃ ১১৭

কালী যে দুর্গা হয়েছেন বাংলাদেশে প্রচলিত দুর্গাপূজাবিধিতেও তার নিদর্শন আছে। দেবী দুর্গার মহাস্নানের সময় ওঁ হ্রীঁ ভদ্রকাল্যৈ নমঃ এই মন্ত্রে পঞ্চকষায়-জলে ; ওঁ হ্রীঁ চামুণ্ডায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে স্বর্ণোদকে, বৃষ্টিজলে, বিষ্ণুতৈলে, বৃষশৃঙ্গমৃত্তিকায় ; ওঁ হ্রীঁ কালিকায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে পুষ্করিণীজলে ; হ্রীঁ কাল্যৈ নমঃ এই মন্ত্রে চন্দনজলে দেবীকে স্নান করান বিধি।[১]

সন্ধিপূজায় চামুণ্ডাকালীরূপে দুর্গার ধ্যানপূজা বিহিত।[২] কালিকাপুরাণোক্ত দুর্গাপূজায় যে-দুর্গাস্তব বিহিত তাতে দেখা যায় দেবীকে এই বলে স্তব করা হয়েছে—কালী মহাকালী পাপহারিণী কালিকা ধর্মার্থমোক্ষদা ওগো নারায়ণী তোমাকে নমস্কার।[৩]

কালিকাপুরাণে ষোড়শভুজা দেবীর যে-ধ্যান নির্দিষ্ট হয়েছে তার আরম্ভেই আছে—ষোড়শভুজা জগদ্ধাত্রী জগন্ময়ী যোগনিদ্রা মহামায়া ভদ্রকালী নামে প্রসিদ্ধা।[৪] কাজেই এই ধ্যানটি ভদ্রকালীরই ধ্যান। ধ্যানের শেষদিকে আছে দীপ্তিশালিনী দেবী সিংহবাহিনী ; তাঁর ত্রিনয়ন রক্তবর্ণ। জগন্ময়ী পরমেশ্বরী শূলের দ্বারা মহিষাসুরকে বিদ্ধ করে তাকে বামপদে আক্রমণ করে অবস্থান করছেন।[৫] দুর্গার ধ্যানেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।[৬]

কাজেই দেখা যাচ্ছে ভদ্রকালীই মহিষমর্দিনী, তিনিই দুর্গা। সারকথা কালী দুর্গা চামুণ্ডা প্রভৃতি ব্রহ্মময়ী পরাশক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ। স্বরূপতঃ এঁরা অভিন্ন। তবে উপাসনার ক্ষেত্রে এঁদের ভেদ স্বীকৃত। এইজন্য প্রত্যেকের মন্ত্রধ্যানাদি স্বতন্ত্র। মহিষাসুর-মর্দিনীরও মন্ত্রধ্যান স্বতন্ত্র।

মন্ত্র—সারদাতিলকে সাংকেতিক ভাষায় মহিষমর্দিনীর যে-মন্ত্র দেওয়া হয়েছে তা উদ্ধার করলে পাওয়া যায় 'মহিষমর্দিনি স্বাহা' এটি অষ্টাক্ষরী বিদ্যা।[৭] বিশ্বসারতন্ত্রে বিধান দেওয়া হয়েছে ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ঐঁ শ্রীঁ ওঁ হুঁ এই বীজগুলির যে-কোনো একটি বীজ উক্ত মন্ত্রের আদিতে যোগ করে জপ করতে হবে। এরূপ বীজযুক্ত হলেই মন্ত্রটি নবাক্ষর হয়ে

---

১ দ্রঃ পু দ, সং ৩১, পৃঃ ৭৬২-৭৬৬ ২ ঐ, পৃঃ ৭৮৭, ৮১৪

৩ ওঁ কালি কালি মহাকালি কালিকে পাপহারিণি।
ধর্মার্থমোক্ষদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে।—ঐ, পৃঃ ৮১৪

৪ যোগনিদ্রা মহামায়া জগদ্ধাত্রী জগন্ময়ী। ভুজৈঃ ষোড়শভির্যুক্তা ভদ্রকালীতি বিশ্রুতা।
—দ্রঃ পু চ, পৃঃ ৯০৩

৫ সিংহস্থা নয়নৈরক্তবর্ণৈস্ত্রিভিরতিভিস্বলা। শূলেন মহিষং ভিত্বা তিষ্ঠন্তী পরমেশ্বরী।
বামপাদেন চাক্রম্য তত্র দেবী জগন্ময়ী।—ঐ, পৃঃ ৯০৫ ৬ দ্রঃ পু দ, সং ৩১, পৃঃ ৭৫৯

৭ তারং বিন্দুসমন্বিতং বেতো মর্দিনি ঠদ্বয়ম্। অষ্টাক্ষরীয়মাখ্যাতা বিদ্যা মহিষমর্দিনী।—শা তি ১১।২১

যাবে, আবার এই মন্ত্রের আদিতে ওঁ এবং অন্তে হ্রী কিংবা আদিতে ক্লীঁ এবং অন্তে ওঁ যোগ করলে অথবা আদিতে ওঁ হ্রীঁ কিংবা ক্লীঁ ওঁ যোগ করলে দশাক্ষর মন্ত্র পাওয়া যাবে।[১]

ধ্যান—কুলচূড়ামণিতন্ত্রে মহিষমর্দিনীর এই ধ্যানটি পাওয়া যায়—দেবী মহাদৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধাবস্থিতির রসাস্বাদনে উন্মুখী। তাঁর দক্ষিণ হস্তচতুষ্টয়ে চক্র খড়্গ বাণ এবং শূল আর বাম হস্তচতুষ্টয়ে শঙ্খ চর্ম ধনু ও তর্জনীমুদ্রা। কালের দ্বারা অত্যন্ত প্রবল মহিষের অঙ্গে তিনি অধিষ্ঠিতা। দেবীর পরিধানে পীতাম্বর। তিনি পীনোন্নতস্তনী। তাঁর মাথায় জটাজুট এবং মুকুট শোভা পাচ্ছে। দেবী শ্মশানে সুখে বাস করেন। এইরূপে কালীর ধ্যান করবে।[২]

অন্য ধ্যান—শারদাতিলকে আবার অন্যরকম ধ্যান বর্ণিত হয়েছে। যথা—দেবীর বর্ণ মরকতমণির বর্ণের মতো। তাঁর মস্তকে মণিমুকুট, কর্ণে মণিকুণ্ডল। তিনি ত্রিনয়না এবং মহিষের মস্তকে অধিষ্ঠিতা। শশিশেখরা দেবীর হস্তে চক্র শঙ্খ কৃপাণ খেটক বাণ কার্মুক শূল এবং তর্জনীমুদ্রা।[৩]

মহাকালী—নীলকণ্ঠ মহাকালীর ব্যাখ্যায় বলেছেন ইনি মহতী এবং কালী। অর্থাৎ সংহারকারিণী কালরূপা মহাদেবী মহাকালী।[৪]

মন্ত্র—তন্ত্রসারে মহাকালীর এই মন্ত্রটি দেওয়া হয়েছে—ক্লীঁ ক্লীঁ ক্লীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ মহাকালি ক্লীঁ ক্লীঁ ক্লীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা।[৫]

ধ্যান—তন্ত্রান্তরে মহাকালীর নিম্নলিখিত ধ্যানটি বর্ণিত হয়েছে—দেবী মহাকালী দশাননা, দশপাদা, দশহস্তা। তাঁর প্রত্যেক মুখমণ্ডলে ত্রিনয়ন। তাঁর হস্তে খড়্গ চক্র গদা বাণ ধনু পরিঘ শূল ভুশুণ্ডী নৃমুণ্ড ও শঙ্খ। দেবীর সর্বাঙ্গে অলঙ্কার এবং তাঁর বর্ণ নীল পাথরের মতো। বিষ্ণু যখন যোগনিদ্রায় নিদ্রিত তখন ব্রহ্মা মধুকৈটভবিনাশের জন্য এই দেবীর স্তব করেছিলেন। আমি মহাকালীর সেবা করি।[৬]

১ দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ১২০

২ ধ্যায়েৎ কালীং মহাদৈত্যযুদ্ধবাসরসোন্মুখীং। দক্ষিণে চক্রখড়্গৌ চ বাণশূলং তথৈব চ।
বামে শঙ্খং তথা চর্ম ধনুস্তর্জনমেব চ। বিভ্রতীং কালতীব্রোগ্রমহিষাঙ্গনিবেদুষীং।
পীতাম্বরধরাং পীনোন্নতকুচদ্বয়াং। জটামুকুটশোভাঢ্যাং পিতৃভূমিসুখাবহাং।—দ্রঃ শ্যামারহস্য, পরিঃ ১৩

৩ গারুত্মোপলসন্নিভাং মণিমৌলিকুণ্ডলমণ্ডিতাম্। নৌমি ভালবিলোচনাং মহিষোত্তমাঙ্গনিবেদুষীম্।
চক্রশঙ্খকৃপাণখেটকবাণকার্মুকশূলকান্। তর্জনীমপি বিভ্রতীং নিজবাহুভিঃ শশিশেখরাম্।—শা তি ১১।২৫

৪ মহতী চাসৌ কালী চ কালরাত্রী সংহর্ত্রী কালরূপা মহাকালী।—মহা ভা ৬।২৩।৫-এর টীকা

৫ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৩২৫

৬ খড়্গং চক্রগদেষুচাপপরিঘান্ শূলং ভুশুণ্ডীং শিরঃ। শঙ্খং সন্দধতীং করৈস্ত্রিনয়নাং সর্বাঙ্গভূষাবৃতাম্।
নীলাশ্মদ্যুতিমাস্যপাদদশকাং সেবে মহাকালিকাং। যামস্তৌৎস্বপিতে হরৌ কমলজো হন্তুং মধুং কৈটভম্।
দ্রঃ পু চ, তঃ ১১, পৃঃ ৩৫৬

অন্য ধ্যান— মেরুতন্ত্রে আরেকটি ধ্যান বর্ণিত হয়েছে। যথা—মহারৌদ্রী দেবী পঞ্চবক্ত্রা। তাঁর প্রতিবক্ত্রে ত্রিনয়ন। ভোগিভূষণা দেবীর দক্ষিণ ও বাম হস্তে শক্তি শূল ধনু বাণ খেটক খড়্গ বরমুদ্রা এবং অভয়মুদ্রা।[১]

তন্ত্রান্তরোক্ত ধ্যানের থেকেই জানা যায় মহাকালীই যোগনিদ্রা। বৈকৃতিকরহস্যেও বলা হয়েছে ব্রহ্মা মধুকৈটভবিনাশের জন্য যাঁর স্তব করেছিলেন বিষ্ণুর সেই যোগনিদ্রাকে তমোগুণা মহাকালী বলা হয়।[২]

রক্ষাকালী—উত্তর-কামাখ্যাতন্ত্রে বলা হয়েছে— মারীভয় উপস্থিত হলে, দুর্ভিক্ষভয়ে পীড়িত হলে, পরমভক্তিভরে কালবিনাশিনী কালীর পূজা করতে হবে। সমস্ত প্রাণীকে এই-সব ভয় থেকে রক্ষা করেন বলে দেবীকে রক্ষাকালী বলা হয়।[৩]

মন্ত্র—আর্যাচারপদ্ধতিতে রক্ষাকালীর এই মন্ত্রটি উদ্ধৃত হয়েছে—ওঁ সংঘট্ট সংঘট্ট মৃতান্ সঞ্জীবয় স্বাহা। ভগবতী রক্ষাকালী মৃতসঞ্জীবনীদেব্যৈ নমঃ।[৪]

ধ্যান—রুদ্রযামলে রক্ষাকালীর নিম্নোক্ত ধ্যানটি বর্ণিত হয়েছে—রক্ষাকালী শারদচন্দ্রের মতো শুভ্রবর্ণা, ত্রিমুখী, নবলোচনা, জটামুকুটমণ্ডিতা। দেবী সুচারুদশনা, তিনি রক্ষারূপিণী ও রক্ষাকারিণী। তাঁর পরিধানে রক্তবস্ত্র। ইন্দ্রাদি দেবতা তাঁর আরাধনা করেন। ষড়্ভুজা দেবীর দক্ষিণহস্তত্রয়ে অসি পীযূষভাণ্ড এবং ছুরিকা আর বামহস্তত্রয়ে অঙ্কুশ ডমরু এবং চক্র। তাঁর গলায় নৃমুণ্ডমালা শোভা পাচ্ছে। শোভনপীবরস্তনী দেবী শবোপরি অধিষ্ঠিতা ও কৃতান্তমর্দনোদ্যতা। মৃত্যুনাশিনী মাতা কালিকার এইরূপে ধ্যান করতে হবে।[৫]

অন্য ধ্যান—শক্তিযামল ও ষট্‌কর্মদীপিকায় ষড়্ভুজা রক্ষাকালীর অন্যরকম ধ্যান পাওয়া যায়। যথা—গোদুগ্ধবর্ণের এবং চন্দ্রবর্ণের মিশ্রণে যে-বর্ণ উৎপন্ন হয় রক্ষাকালী দেবীর অঙ্গের সেই বর্ণ। অর্দ্ধচন্দ্র তাঁর শিরোভূষণ। তিনি ষড়্ভুজা, ত্রিমুখী; প্রতিমুখমণ্ডলে তাঁর

১ পঞ্চবক্ত্রাং মহারৌদ্রীং প্রতিবক্ত্রং ত্রিলোচনাম্। শক্তিশূলধনুর্বাণখেটখড়্গবরাভয়ান্।
দক্ষাদক্ষভুজৈর্দেবীং বিভ্রাণাং ভোগিভূষণাম্।—দ্রঃ ঐ, তঃ ৯, পৃঃ ৭৫৪

২ যোগনিদ্রা হরেরুক্তা মহাকালী তমোগুণা। মধুকৈটভনাশার্থং যাং তুষ্টাবাম্বুজাসনঃ।—দু স, পৃঃ ২৮২

৩ মারীভয়ে সমায়াতে দুর্ভিক্ষভয়পীড়িতে। পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা কালীং কালবিনাশিনীম্।
রক্ষণাৎ সর্বভূতানাং রক্ষাকালীতি সা স্মৃতা।—বিশ্বকোষে শ্যামাপদের আলোচনায় উদ্ধৃত।

৪ দ্রঃ আর্যাচারপদ্ধতি, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১১১

৫ ওঁ শরদিন্দুনিভাং শুভ্রাং বদনত্রিতয়ান্বিতাম্। নবলোচনসংযুক্তাং জটামুকুটমণ্ডিতাম্।
সুচারুদশনাং দেবীং রক্ষাং রক্ষণকারিণীম্। রক্তবস্ত্রপরিধানাং বাসবাদিসুরার্চিতাম্।
ষড়্ভুজামসিপীযূষকর্ত্রিকাঃ সব্যতঃ ক্রমাৎ। বামতোঽঙ্কুশডমরুচক্রাণি ক্রমশো ন্যসেৎ।
মুণ্ডালিস্রগ্‌বিরাজন্তীং পীনচারুকুচাবহাম্। এবং সঞ্চিন্তয়েৎ কালীং মাতরং মৃত্যুনাশিনীম্।—দ্রঃ ঐ

ত্রিনয়ন। যমপৃষ্ঠগা দেবী নিয়ত নৃত্য করছেন। রক্ষাকালী ঘোরনিনাদকারিণী, বিপরীত-রতাতুরা, জটাজুটমণ্ডিতা, রক্তবস্ত্রপরিহিতা। তাঁর দক্ষিণ হস্তত্রয়ে খড়্গ, ত্রিশূল ও কর্ত্রী আর বাম হস্তত্রয়ে খেটক ডমরু ও চক্র। দেবী শবাসীনা, প্রত্যালীঢ়পাদা। তাঁর কণ্ঠে মুণ্ডমালা বিলম্বিত। কাঞ্চী মঞ্জীর হার প্রভৃতি ভূষণে তিনি পরিভূষিতা।[১]

অন্য একটি ধ্যান—উদ্ধৃত ধ্যান দুটিতে দেখা যায় রক্ষাকালী ষড়্‌ভুজা। তবে চতুর্ভুজা রক্ষাকালীর ধ্যানও শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে। রুদ্রযামলে নিম্নোক্ত ধ্যানটি আছে[২]—মহামায়া কালী ত্রিনেত্রা, বহুরূপিণী, চতুর্ভুজা, শ্বেতবর্ণা, পূর্ণচন্দ্রনিভাননা। দেবীর হস্তে নরমুণ্ড খড়্গ কমল এবং বরমুদ্রা। তিনি রক্তবদনা ঘোরদংষ্ট্রা. সর্বদা দিগম্বরী এবং অট্টহাস্যনিরতা। দেবী শবাসনস্থিতা মুণ্ডমালাবিভূষিতা। কাঞ্চী মঞ্জীর ও হার তাঁর অঙ্গে শোভা পাচ্ছে। তিনি কালপৃষ্ঠে নৃত্য করছেন। এইরূপে দেবীর ধ্যান করতে হবে।

চামুণ্ডা-কালী—দুর্গাসপ্তশতীতে আছে কালী চণ্ডিকাকে চণ্ড ও মুণ্ডের মুণ্ডদ্বয় এনে উপহার দিলেন। তাই দেখে কল্যাণী চণ্ডিকা কালিকাকে ললিতবাক্যে বললেন—দেবি! চণ্ড ও মুণ্ডের মুণ্ডদ্বয় নিয়ে এসেছ বলে জগতে তুমি চামুণ্ডা নামে খ্যাত হবে।[৩] আমরা পূর্বেও এ বিষয়ের উল্লেখ করেছি।

মন্ত্র—চামুণ্ডা-কালীর একাধিক মন্ত্র আছে। যেমন ভৈরবতন্ত্রে বলা হয়েছে ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ এই ত্র্যক্ষরী মহাবিদ্যা চামুণ্ডা-কালিকা।[৪] তন্ত্রান্তর বর্ণিত মন্ত্রটি উদ্ধার করলে পাওয়া যায়—হ্রীঁ চামুণ্ডায়ৈ নমঃ। এই সপ্তার্ণ মন্ত্রটি সর্বার্থসাধক।[৫]

১ ওঁ গোক্ষীরশশিমিশ্রাভাং অর্ধেন্দুকৃতশেখরাম্। ত্রিমুখীং ষড়্‌ভুজাং ত্র্যক্ষীং নৃত্যন্তীং যমপৃষ্ঠগাম্।
রক্ষাকালীং ঘোররাবাং বিপরীতরতাতুরাম্। জটাজুটসমাযুক্তাং রক্তবস্ত্রপরিচ্ছদাম্।
খড়্গং ত্রিশূলং কর্ত্রীঞ্চ দক্ষিণে বিভ্রতীং বামকে। খেটকং ডমরুং চক্রং ধারয়ন্তীং শবাসনাম্।
প্রত্যালীঢ়পদাম্ভোজাং মুণ্ডমালাবিলম্বিনীম্। কাঞ্চীমঞ্জীরহারাদ্যৈ ভূষণৈঃ পরিভূষিতাম্।—দ্রঃ ঐ

২ ধ্যাত্বা (ধ্যায়েৎ ?) কালীং মহামায়াং ত্রিনেত্রাং বহুরূপিণীম্। চতুর্ভুজাং শ্বেতবর্ণাং পূর্ণচন্দ্রনিভাননাম্।
নরমুণ্ডং তথা খড়্গং কমলং বরদস্তথা। বিভ্রাণাং রক্তবদনাং দংষ্ট্রাঘোরস্বরূপিণীম্।
অট্টাট্টহাসনিরতাং সর্বদা চ দিগম্বরীম্। শবাসনস্থিতাং দেবীং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্।
কাঞ্চীং মঞ্জীরহারঞ্চ নৃত্যন্তীং যমপৃষ্ঠকে।

রক্ষাকালীর ধ্যান ও মন্ত্র বিশ্বভারতীর সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক তান্ত্রিক-গুরুবংশীয় পণ্ডিত সুখময় ভট্টাচার্য শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ মহাশয়ের কাছে পেয়েছি।

৩ তাবানীতৌ ততো দৃষ্ট্বা চণ্ডমুণ্ডৌ মহাসুরৌ। উবাচ কালীং কল্যাণী ললিতং চণ্ডিকা বচঃ।
যস্মাচ্চণ্ডং চ মুণ্ডং চ গৃহীত্বা ত্বমুপাগতা। চামুণ্ডেতি ততো লোকে খ্যাতা দেবী ভবিষ্যসি।—দু স ৭।২৪-২৫

৪ কামবীজদ্বয়ং দেবি দীর্ঘহুঙ্কারমেবচ। ত্র্যক্ষরী সা মহাবিদ্যা চামুণ্ডা কালিকা স্মৃতা।
—দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৩১৯

৫ মায়াবীজং সমুচ্চার্য চামুণ্ডা ঙেযুতা পুনঃ। নমোঽন্তো নগবর্ণোঽয়ং মন্ত্রঃ সর্বার্থসাধকঃ।
—দ্রঃ পু চ, স্তঃ ১২, পৃঃ ১১৩৬

এ ছাড়া দেবীর আরও দুটি প্রচলিত মন্ত্র ওঁ ক্রীঁ হ্রীঁ চামুণ্ডারূপায়ৈ নমঃ[১] এবং ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ চামুণ্ডায়ৈ নমঃ।[২]

ধ্যান—বিনিষ্ক্রান্তা (অম্বিকা দেবীর ললাট থেকে) করালবদনা কালী অসিধারিণী ও পাশহস্তা। তিনি বিচিত্রখট্বাঙ্গধারিণী নৃমুণ্ডমালাবিভূষণা ব্যাঘ্রচর্মপরিহিতা। তাঁর দেহ অস্থিচর্মসার, বদন অতিবিস্তৃত, জিহ্বা লক্‌লক্‌ করছে, তাতে তাঁকে অতিভয়ংকরী মনে হচ্ছে। দেবীর আরক্তনয়ন কোটরগ্রস্ত। সিংহনাদে তিনি দিঙ্‌মণ্ডল পূর্ণ করছেন।[৩]

মহাবিদ্যা কালীর প্রসঙ্গ শেষ করার আগে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। সাধনার দৃষ্টিতে বিচার করে অনেকে দশমহাবিদ্যাতত্ত্বকে সাধনার বিভিন্ন স্তর মনে করেন। কালীতত্ত্ব সাধনার চরম স্তর। সর্বপ্রকারবিকাররহিত বা উপাধিমুক্ত হলে পরে সাধক এই অবস্থায় পৌঁছাতে পারেন। এই মতে সাধনার সর্বনিম্ন স্তর কমলাতত্ত্ব। তার পর আরোহ-ক্রমে মাতঙ্গী বগলা ধূমাবতী ছিন্নমস্তা ভৈরবী ভুবনেশ্বরী ষোড়শী ও তারা; সর্বোচ্চ স্তর কালীতত্ত্ব। সাধক গুরুপদিষ্ট পথে আপন সাধনার বলে ভোগবাসনার সীমা অতিক্রম করে করে এবং একটি একটি করে বিকারগ্রন্থি ছিন্ন করে করে অন্তে কালীতত্ত্বে পৌঁছে পরম নিবৃত্তি লাভ করেন। সাধনার যে-ভূমি বা স্তরে উপনীত হলে ক্ষুধাতৃষ্ণা জরামরণ প্রভৃতি সব বিলুপ্ত হয়ে যায়, সর্ব কর্মবন্ধন শিথিল হয়ে যায়, তাই কালীতত্ত্ব বা পরমপদ। প্রবৃত্তি-সমূহের আত্যন্তিক উচ্ছেদ হলে পরে যখন জীবকোটি ঈশ্বরকোটিতে প্রবিষ্ট হয় তখনই কালীতত্ত্বের উদ্ভব হয়। চিত্তবৃত্তিলয় তথা বাসনাক্ষয় না হলে দিক্‌কালাতীত উক্ত চিন্ময়ভূমিতে গমন সম্ভবপর হয় না।[৪]

তারা—কালী ও তারা স্বরূপতঃ অভিন্ন। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে বলা হয়েছে কালী তারা ত্রিপুরসুন্দরী এবং ছিন্নমস্তা এই চারজনের মধ্যে কোনো ভেদ নাই।[৫] উক্ত তন্ত্রমতে[৬] কালী ও তারার সম্বন্ধ শিবশক্তির সম্বন্ধ। তারা শিব কালী শক্তি, কালী শিব তারা শক্তি। কালী-

১ দ্রঃ পু দ, সং, ৩১, পৃঃ ৭৭৭ ২ ঐ, পৃঃ ৮১৪

৩ কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী। বিচিত্রখট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা।
দ্বীপিচর্মপরিধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা। অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা।
নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা।—দু স ৭।৫-৭

৪ কালীতত্ত্ব, ক শ অ, পৃঃ ৫৩৬-৩৭

৫ যথা ছিন্না তথা কালী যথৈব সুন্দরীপরা। তথৈব তারা কথিতা চতুর্ণাং ন ভিন্নতা।—শ স ত, সু খ, ৪।৫১

৬ কলৌ তারা কলৌ কালী কলৌ তারা চ কালিকা। শিবশক্তিপ্রভেদেন দেহে শক্তিরূপাহিতা।
তারা শিবস্তথা কালী শক্তিরূপা প্রকীর্তিতা। কালী শিবস্তথা তারা শক্তিরূপা প্রকীর্তিতা।
অহো জ্ঞানবতাং জ্ঞানী কালীতারাপরায়ণঃ।—ঐ ৭।১২-১৪

তারাপরায়ণ সাধক জ্ঞানীদের মধ্যেও জ্ঞানী। কলিযুগে কালীর মতো তারাও সর্বসিদ্ধি-দায়িনী ভোগমোক্ষদাত্রী দেবী। তারাতন্ত্রের মতে তারামন্ত্র এবং কালীমন্ত্র ছাড়া সাধক ভোগমোক্ষ যশ এবং শ্রী লাভ করতে পারেন না।[১]

তারারহস্যে বলা হয়েছে সর্বদা তারকত্বহেতু অর্থাৎ ত্রাণ করেন বলে দেবীকে তারা বলা হয়। যিনি কালী নিশ্চিতরূপে তিনিই তারা।[২] কুব্জিকাতন্ত্রের মতেও সর্বদা তারকত্বহেতু দেবীকে তারা ও তারিণী বলা হয়।[৩]

মন্ত্র—তারার মন্ত্র বহু।[৪] এই সব মন্ত্রের দেবতা তিন জন—প্রথমা একজটা, দ্বিতীয়া উগ্রতারা এবং তৃতীয়া নীলসরস্বতী। এঁরা ভোগমোক্ষপ্রদা।[৫] এই তিনজনই তারার রূপভেদ।

একজটা—একজটা সম্বন্ধে তারারহস্যে বলা হয়েছে[৬] আদ্যাকল্পে দেবী মুক্তকেশী, সেক্ষেত্রে স্বয়ং রুদ্র তাঁর জটা। এই কারণে দেবীকে একজটা বলা হয়।

উগ্রতারা—উগ্রতারা সম্বন্ধে বলা হয়েছে দেবী উগ্র আপদ্ থেকে ত্রাণ করেন বলে তাঁকে উগ্রতারা বলা হয়।[৭] স্বতন্ত্রের মতে কালরাত্রির দিন মধ্যরাত্রে শক্তি স্বয়ং ভক্তদের উগ্র আপদ্ থেকে ত্রাণ করার জন্য উগ্রতারারূপে আবির্ভূতা হন।[৮]

নীলসরস্বতী— দেবীর নীলবর্ণ হওয়ার কাহিনীটি এই— মেরুর পশ্চিম কূলে চোলন নামে একটি মহান্ হ্রদ আছে। সেখানে মাতা নীলসরস্বতী স্বয়ং উদ্ভূতা হন। সেখানে তিনি তিন যুগ ধরে জপসাধন করেন। দেবীর ঊর্ধ্ব বক্ত্র থেকে তেজোরাশি বিনিঃসৃত হয়ে চোল-হ্রদে পড়ে এবং তাতে দেবী নীলবর্ণা হয়ে যান।[৯]

১ তারামন্ত্রং বিনা দেবি কালিকামন্ত্রমেব চ। নাপ্নুয়াৎ পরমেশানি ভোগমোক্ষৌ যশঃশ্রিয়ৌ।
—তারাতন্ত্র ৬।৩-৪

২ তারকত্বাৎ সদা তারা যা কালী সৈব নিশ্চিতা।—তারারহস্য, পঃ ১

৩ তারকত্বাৎ সদা তারা তারিণী চ প্রকীর্তিতা।—প্রা তো, কাণ্ড ৫, পরিঃ ৬, ব সং, পৃঃ ৩৭৪

৪ বহবোঽস্যাশ্চ মন্ত্রাঃ স্যুঃ সর্বতন্ত্রাগমাদিষু।—তারারহস্য, পঃ ১

৫ …এতাসাং সর্বমন্ত্রাণাং দেবতাস্তিস্রঃ স্মৃতাঃ। আদ্যা চৈকজটা প্রোক্তা দ্বিতীয়া চোগ্রতারকা।
তৃতীয়া নীলবাণী স্যাদ্ ভোগমোক্ষপ্রদা মতা।—ঐ

৬ আদ্যাকল্পে মুক্তকেশী রুদ্রস্তত্র জটা স্বয়ম্। অস্মাচ্চৈকজটা প্রোক্তা মন্ত্রশাস্ত্রে নিরূপ্যতে।—ঐ

৭ উগ্রাপত্তারিণী যস্মাদুগ্রতারা প্রকীর্তিতা।—ঐ

৮ কালরাত্রিদিনে প্রাপ্তে নিশায়াং মধ্যভাগকে। উগ্রাপত্তরণার্থঞ্চ উগ্রতারা স্বয়ং কলা।
—বিশ্বকোষে দশমহাবিদ্যার আলোচনায় উদ্ধৃত।

৯ মেরোঃ পশ্চিমকূলে তু চোলনাখ্যো হ্রদো মহান্। তত্র জজ্ঞে স্বয়ং দেবী মাতা নীলসরস্বতী।
তত্র জপান্ত প্রজপংস্ত্রিযুগং সমবর্তত। মহোর্দ্ধবক্ত্রান্নিঃসৃতা তেজোরাশির্বিনির্গতঃ।
হ্রদে চোলে নিপত্যৈব নীলবর্ণাভবত্তদা।—স্বতন্ত্রবচন, বিশ্বকোষে দশমহাবিদ্যার আলোচনায় উদ্ধৃত

পুরাণসুলভ এই জাতীয় কাহিনী থেকে কোনো তথ্য বা তত্ত্ব উদ্ধার করার কোনো নির্ভরযোগ্য উপায় আছে বলে মনে হয় না।

পঞ্চাক্ষর মন্ত্র— উগ্রতারার সবিশেষ প্রসিদ্ধ মন্ত্র ওঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ ফট্। এই মন্ত্রের আদিতে শ্রীবীজ অর্থাৎ শ্রীঁ যুক্ত হলে এর দ্বারা সর্বতোমুখী শ্রীলাভ হয়। আদিতে মায়াবীজ অর্থাৎ হ্রীঁ থাকলে এই মহামন্ত্র সর্বাভীষ্ট প্রদান করে আর আদিতে বাগ্‌বীজ অর্থাৎ ঐঁ যুক্ত হলে এই মন্ত্র বাগীশত্ব প্রদান করে।[১]

উগ্রতারার মন্ত্রটিকে প্রণবহীন করলে হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ ফট্ এই একজটামন্ত্রটি পাওয়া যায়। আর মন্ত্রটি থেকে ওঁ এবং ফট্ বাদ দিলে হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ এই ত্র্যক্ষর মহানীলসরস্বতীমন্ত্রটি পাওয়া যায়। একে কুল্লুকাও বলা হয়। এটি সর্বতন্ত্রে গোপনীয়।[২]

মন্ত্রমাহাত্ম্য— মৎস্যসূক্তে আছে তারামন্ত্রসমূহ সর্বসিদ্ধিপ্রদ। এই-সব মন্ত্রের বিজ্ঞানমাত্র সাধক জীবন্মুক্ত হন, বিশুদ্ধ অনর্গল কবিত্ব ও সর্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করেন, কুবেরের মতো ধনশালী হন; রাজদ্বারে সভায় বিবাদে ব্যবসায়াদিতে সর্বত্র জয় লাভ করেন এবং দ্বিতীয় বৃহস্পতির মতো হন।[৩]

ধ্যান—বিভিন্ন তন্ত্রে তারার বিভিন্ন ধ্যান বর্ণিত হয়েছে। এখানে দুটি মাত্র ধ্যান দেওয়া গেল। নীলতন্ত্রে এই ধ্যানটি পাওয়া যায়[৪]—মুণ্ডমালাবিভূষিতা ভয়ংকরী দেবী প্রত্যালীঢ়পদা। তিনি খর্বাকৃতি লম্বোদরী, ভীমা। তাঁর কটিদেশ ব্যাঘ্রচর্মাবৃত। নবযৌবনসম্পন্না দেবী পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতা।[৫] চতুর্ভুজা লোলজিহ্বা মহাভীমা দেবী বরদায়িনী। দেবীর দক্ষিণহস্তে খড়্গ আর কর্ত্রিকা আর বামহস্তে কপাল এবং পদ্ম।

১ দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৩২৮ ২ ঐ

৩ অথ মন্ত্রান্ প্রবক্ষ্যামি তারিণ্যাঃ সর্বসিদ্ধিদান্। যেষাং বিজ্ঞানমাত্রেণ জীবন্মুক্তশ্চ সাধকঃ।
কবিত্বং লভতে শুদ্ধমনর্গলবিজৃম্ভিতম্। পাণ্ডিত্যং সর্বশাস্ত্রেষু ধনৈর্ধনপতির্ভবেৎ।
রাজদ্বারে সভায়াঞ্চ বিবাদে ব্যবহারকে। সর্বত্র জয়মাপ্নোতি বৃহস্পতিরিবাপরঃ।
—দ্রঃ ঐ পৃঃ ৩২৭

৪ প্রত্যালীঢ়পদাং ঘোরাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্। খর্বাং লম্বোদরীং ভীমাং ব্যাঘ্রচর্মাবৃতাং কটৌ।
নবযৌবনসম্পন্নাং পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতাম্। চতুর্ভুজাং লোলজিহ্বাং মহাভীমাং বরপ্রদাম্।
খড়্গকর্ত্রীসমাযুক্তসব্যেতরভুজদ্বয়াম্। কপালোৎপলসংযুক্তসব্যপাণিযুগান্বিতাম্।
পিঙ্গোগ্রৈকজটাং ধ্যায়েন্মৌলাবক্ষোভ্যভূষিতাম্। বালার্কমণ্ডলাকারলোচনত্রয়ভূষিতাম্।
জ্বলচ্চিতামধ্যগতাং ঘোরদংষ্ট্রাং করালিনীম্। সাবেশস্মেরবদনাং স্ত্র্যলঙ্কারবিভূষিতাম্।
বিশ্বব্যাপকতোয়ান্তঃশ্বেতপদ্মোপরিস্থিতাম্।—নীলতন্ত্র, পৃঃ ৩

৫ 'ললাটে শ্বেতাস্থি পট্টিকাচতুষ্টয়ান্বিত-কপালপঞ্চকভূষিতা'।—দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৩৩৪

তিনি একজটাধারিণী ; সে-জটা পিঙ্গলবর্ণ। তাঁর মাথার উপরে নাগরূপধারী অক্ষোভ্য[১] বিরাজমান। তাঁর ত্রিনয়ন তরুণ সূর্যমণ্ডলের মতো বর্তুলাকার। ঘোরদংষ্ট্রা করালিনী দেবী প্রশস্ত চিতার মধ্যে অবস্থিতা, স্বীয় ভাবাবেশে হাস্যবদনা স্ত্রীজনোচিত অলঙ্কারভূষিতা। তিনি বিশ্বব্যাপকজলমধ্যস্থশ্বেতপদ্মের উপরে অধিষ্ঠিতা।

অপর ধ্যান—তারিণীতন্ত্রোক্ত আরেকটি ধ্যান এই—দেবী তারিণী কৃষ্ণবর্ণা লম্বোদরী ভীমা। নাগকুণ্ডল তাঁর শোভাবর্ধন করছে। তিনি রক্তমুখী লোলজিহ্বা কটিদেশে রক্তবস্ত্রধারিণী। পীনোন্নতস্তনী উগ্রা দেবী মহানাগের দ্বারা বেষ্টিতা, শবের উপরে অধিষ্ঠিতা, নাসাগ্রধ্যাননিরতা মহাঘোরা এবং বরদায়িনী। তিনি দীর্ঘকেশী চতুর্ভুজা। তাঁর দক্ষিণোর্ধ্ব হস্তে পদ্ম, বামোর্ধ্ব হস্তে পানপাত্র, দক্ষিণাধঃহস্তে বরমুদ্রা এবং বামাধঃহস্তে অভয়মুদ্রা। তিনি পানপাত্রে রুধিরধারা পান করছেন। নিত্যা সর্বসিদ্ধিপ্রদা দেবী গিরিনিবাসিনী। ত্রিলোচনা দেবী নাগযজ্ঞোপবীতধারিণী। তিনি দীর্ঘনাসা দীর্ঘজঙ্ঘা দীর্ঘাঙ্গী এবং দীর্ঘজিহ্বা। চন্দ্র সূর্য ও অগ্নি দেবীর ত্রিলোচন। শত্রুনাশকারিণী দেবী অতিভয়ংকরী ও বরপ্রদা। তাঁর মাথায় বাঁধা বাঘছাল। ত্রিজগৎ তাঁর ভাবনা করে। সর্বলোকভয়ঙ্করী দেবী সাধকদের সুখ বিধান করেন। এমনি মহাদেবী তারিণীকে প্রণাম করি।[২]

১ সনাতনধর্মী তন্ত্রমতে অক্ষোভ্য শিব। তোড়লতন্ত্রের প্রথম পটলে আছে—

সমুদ্রমথনে দেবি ! কালকূটং সমুত্থিতম্। সর্বে দেবাশ্চ দেব্যশ্চ মহাক্ষোভমবাপ্নুয়ুঃ।
ক্ষোভাদিরহিতং যস্মাৎ পীতং হালাহলং বিষম্। অতএব মহেশানি অক্ষোভ্যঃ পরিকীর্তিতঃ।
তেন সার্দ্ধং মহামায়া তারিণী রমতে সদা।—দ্রঃ তারাতন্ত্রম্, পৃঃ ১০, পাদটীকা

—দেবি। সমুদ্রমথনে কালকূট বিষ উত্থিত হল। তাতে সব দেবদেবীরা ক্ষোভ প্রাপ্ত হলেন। ক্ষোভাদি-রহিত শিব সেই হলাহল পান করেন বলে অক্ষোভ্য নামে খ্যাত হন। মহামায়া তারিণী সর্বদা তাঁর সঙ্গে আনন্দে বিরাজ করেন।

২ কৃষ্ণাং লম্বোদরীং ভীমাং নাগকুণ্ডলশোভিতাম্। রক্তমুখীং ললজ্জিহ্বাং রক্তাম্বরধরাং কটৌ।
পীনোন্নতস্তনীমুগ্রাং মহানাগেন বেষ্টিতাম্। শবস্যোপরি দেবেশি তস্যোপরি কপালকে।
নাসাগ্রধ্যাননিরতাং মহাঘোরাং বরপ্রদাম্। চতুর্ভুজাং দীর্ঘকেশীং দক্ষিণস্যোর্ধ্ববাহুনা।
বিভ্রতীং নলিনীমেকাং বামোর্দ্ধে পানপাত্রকম্। বরাভয়ধরাং দেবীমধস্তাদ্দক্ষবাময়োঃ।
পিবন্তীং রৌধিরীং ধারাং পানপাত্রে সদাশিবে। সর্বসিদ্ধিপ্রদাং দেবীং নিত্যাং গিরিনিবাসিনীম্।
লোচনত্রয়সংযুক্তাং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্। দীর্ঘনাসাং দীর্ঘজঙ্ঘাং দীর্ঘাঙ্গীং দীর্ঘজিহ্বিকাম্।
চন্দ্রসূর্যাগ্নিভেদেন ত্রিলোচনসমন্বিতাম্। শত্রুনাশকরীং দেবীং মহাভীমাং বরপ্রদাম্।
ব্যাঘ্রচর্মশিরোবদ্ধাং জগত্ত্রয়বিভাবিতাম্। সাধকানাং সুখং কর্ত্রী সর্বলোকভয়ংকরীম্।
এবম্ভূতাং মহাদেবীং তারিণীং প্রণমাম্যহম্।—তারিণীতন্ত্রোক্ত ধ্যান, দ্রঃ পু চ, ভঃ ৯, পৃঃ ৭১৪-১৫

কালীও তারার ধ্যানে মিল—লক্ষ্য করার বিষয় কালী ও তারার ধ্যানে অনেক মিল আছে। স্বরূপতঃ উভয় দেবী যে অভিন্ন এর দ্বারা সেই তত্ত্বটিই সমর্থিত হয়।

বিভিন্ন তারা—এর আগে তারার একজটাদি তিনটি রূপের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তন্ত্রে তারার বিভিন্ন রূপের উল্লেখ আছে। মায়াতন্ত্রের মতে তারা উগ্রা মহোগ্রা বজ্রা কালী সরস্বতী কামেশ্বরী ও ভদ্রকালী এই অষ্ট তারিণী বা তারা প্রসিদ্ধ।[১]

স্তোত্র—তারার ধ্যান যেমন একাধিক তেমনি স্তোত্রও একাধিক। নীলতন্ত্রোক্ত নিম্নোক্ত স্তোত্রটি বিশেষ প্রসিদ্ধ[২]—মা নীলসরস্বতী, তুমি প্রণতজনদের সৌভাগ্যসম্পদ্ প্রদান কর। শবের বুকের উপর তুমি প্রত্যালীঢ়পদে অধিষ্ঠিতা, তোমার মুখপদ্মে স্মিত হাসি। প্রফুল্ল পদ্মের মতো তোমার ত্রিনয়ন। তোমার হাতে কর্ত্রী কপাল পদ্ম এবং খড়্গ। তুমি সকলের আশ্রয়। ঈশ্বরী তোমাকে আশ্রয় করি।১

ওগো বাগীশ্বরী, ভক্তদের পক্ষে তুমি কল্পলতা, তুমি সর্বার্থসিদ্ধি প্রদান কর; গদ্য পদ্য প্রাকৃতভাষায় রচনা এই-সব বিষয়ে সর্বজ্ঞতা প্রদান কর। নীলপদ্মের মতো তোমার নয়নত্রয়; তুমি করুণাসাগর, আমাদের মতো ব্যক্তিকে দয়া করে সৌভাগ্যামৃত বর্ষণের দ্বারা সিক্ত কর।২

তুমি খর্বাকারা কিন্তু তোমার দেহ গর্বসমূহে পূরিত। সর্পাদিবেশের দ্বারা তুমি উজ্জ্বল। তোমার কটিতে ব্যাঘ্রচর্ম ও ঘণ্টা। নৃমুণ্ডমালা পরিধানের জন্য তুমি ললিতা। সদ্যশ্ছিন্ন মুণ্ড থেকে রক্ত ঝরছে, একটি মুণ্ডের চুলের সঙ্গে আরেকটি মুণ্ডের চুল বাঁধা, এইভাবেই মালা গাঁথা হয়েছে। ভয়ংকরী তোমার মূর্তি। আমাদের ভয় দূর কর।৩

মাগো, তুমি হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ ফট্ এই মন্ত্রময়ী। মন্ত্রাত্মিকা তুমি আমাদের মতো লোকের আশ্রয়। মা, তোমার মূর্তি ত্রিতেজ-ঘটিত এবং স্থূল-অতিসূক্ষ্ম-পর-ভেদে ত্রিবিধ। তোমার মূর্তি বেদসমূহেরও গোচর নয়। কোনোপ্রকারে তাকে পেয়েছি, এবার তাকে আশ্রয় করলাম।৪

১ তারা চোগ্রা মহোগ্রা চ বজ্রা কালী সরস্বতী। কামেশ্বরী ভদ্রকালী ইত্যষ্টৌ তারিণী স্মৃতা।
—দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ ম সং, পৃঃ ৩৪৭

২ মাতর্নীলসরস্বতী প্রণমতাং সৌভাগ্যসম্পৎপ্রদে প্রত্যালীঢ়পদস্থিতে শবহৃদি স্মেরাননাম্ভোরুহে।
ফুল্লেন্দীবরলোচনত্রয়যুতে কর্ত্রীং কপালোৎপলে। খড়্গঞ্চাদধতী ত্বমেব শরণং ত্বামীশ্বরীমাশ্রয়ে ॥১॥
বাচামীশ্বরি ভক্তকল্পলতিকে সর্বার্থসিদ্ধীশ্বরি গদ্যপ্রাকৃতপদ্যজাতরচনাসার্বজ্ঞসিদ্ধিপ্রদে।
নীলেন্দীবরলোচনত্রয়যুতে কারুণ্যবারাং নিধে সৌভাগ্যামৃতবর্ষণেন কৃপয়া সিঞ্চ ত্বমস্মাদৃশম্ ॥২॥
খর্বে গর্বসমূহপূরিততনো সর্পাদিবেশোজ্জ্বলে ব্যাঘ্রত্বক্পরিবীতসুন্দরকটিব্যাধূতঘণ্টাঙ্কিতে।
সদ্যঃ কৃত্তগলদ্রজঃপরিমিলন্মুণ্ডদ্বয়ী-মূর্ধজগ্রন্থিশ্রেণি-নৃমুণ্ডদামললিতে ভীমে ভয়ং নাশয় ॥৩॥
মায়ানঙ্গবিকাররূপললনা-বিন্দ্বর্ধচন্দ্রাম্বিকে হুংফট্কারময়ী ত্বমেব শরণং মন্ত্রাত্মিকে মাদৃশঃ।
মূর্তিস্তে জননি ত্রিধামঘটিতা স্থূলাতিসূক্ষ্মা পরা বেদানাং ন হি গোচরা কথমপি প্রাপ্তাং নু তামাশ্রয়ে ॥৪॥

তোমার পাদপদ্মের সেবা করে সুকৃতি ব্যক্তিরা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের সাযুজ্য প্রাপ্ত হন'। সুরেন্দ্রপ্রমুখ যে-সব দেবতা সংসারসমুদ্রে মজ্জনপটু এবং তোমার পদসেবায় বিমুখ, মন্দধী ব্যক্তিরা কিজন্য তাঁদের সেবা করে ?৫

মা, তোমার পাদপদ্মযুগলের ধূলি যাঁরা মুকুটে মাখেন তাঁরা যুদ্ধে বিজয়ী হন এবং নির্ভয়ে তোমার অঙ্কে স্থান পান। আর যাঁরা 'আমি দেবতা, ত্রিভুবনে আমার সমান কেহ নাই' এই বলে নিজেদের তোমার তুল্য ভেবে স্পর্দা করেন তাঁরা অগ্নি যেমন আপনা আপনি নিভে যায়, সূর্য যেমন স্বয়ং অস্ত যায়, তেমনি স্বয়ং বিনাশ প্রাপ্ত হন।৬

মাগো, তোমার নাম স্মরণ করলে ভূত প্রেত পিশাচ রাক্ষস যক্ষ নাগরাজ দৈত্য দানবপুঙ্গব খেচর ব্যাঘ্রাদি-জন্তু ডাকিনী এবং ক্রুদ্ধ যমও পলায়ন করে। তারা তোমার নাম স্মরণকারী ব্যক্তির দিকে মুহূর্তের জন্য তাকাতেও পারে না।৭

মা, তোমার পদসেবার দ্বারা লক্ষ্মীসিদ্ধ হওয়া যায়, পাদুকপ্রমুখ সিদ্ধগণকে বশীভূত করা যায়, রণক্ষেত্রে শত্রুদের এবং হস্তীদের স্তম্ভন ও মোহন সম্ভবপর হয়, কমনীয় কামদেবের রূপেরও ভ্রান্তিকারী রূপ এবং নানা গুণলাভ হয়; ক্ষুদ্র ব্যক্তিও বাচস্পতি হয়।৮

যে-ভক্তিমান্ ব্যক্তি শুচি-সংযত হয়ে প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে এই পুণ্য তারাষ্টক পাঠ করেন তিনি দিব্যকবিত্বশক্তি লাভ করেন, সর্বশাস্ত্রার্থবিদ্ হন এবং অনশ্বর লক্ষ্মী লাভ করে ইচ্ছামত নানা ভোগ্য ভোগ করেন। তিনি কীর্তি কান্তি নীরোগতা লাভ করেন এবং সকলের প্রিয় হন। লোকের কাছে সুখ্যাতি লাভ করে অন্তে মোক্ষ প্রাপ্ত হন।

ত্বৎপাদাম্বুজসেবয়া সুকৃতিনো গচ্ছন্তি সাযুজ্যতাং তস্য শ্রীপরমেশ্বর-ত্রিনয়নব্রহ্মাদি-সাম্যাত্মনঃ।
সংসারাম্বুধিমজ্জনে পটুতনূন্ দেবেন্দ্রমুখ্যান্ সুরান্ মাতস্ত্বৎপদসেবনে হি বিমুখান্ কিং মন্দধীঃ সেবতে।৫।
মাতস্ত্বৎপদপঙ্কজদ্বয়রজোমুদ্রাঙ্ককোটীরিণস্তে দেবা জয়সঙ্গরে বিজয়িনো নিঃশঙ্কমঙ্কে গতাঃ।
দেবোঽহং ভুবনে ন মে সম ইতি স্পর্দ্ধাং বহন্তঃ পরে তত্তুল্যাং নিয়তং যথা শুচিরবী নাশং ব্রজন্তি স্বয়ম্।৬।
ত্বন্নামস্মরণাৎ পলায়নপরা দ্রষ্টুঞ্চ শক্তা ন তে ভূতপ্রেতপিশাচরাক্ষসগণা যক্ষাশ্চ নাগাধিপাঃ।
দৈত্যা দানবপুঙ্গবাশ্চ খচরা ব্যাঘ্রাদিকা জন্তবো ডাকিন্যঃ কুপিতান্তকাশ্চ মনুজং মাতঃ ক্ষণং ভূতলে।৭।
লক্ষ্মীঃ সিদ্ধগণাশ্চ পাদুকমুখাঃ সিদ্ধাস্তথা বৈরিণাং স্তম্ভশ্চাপি রণাঙ্গণে গজঘটাস্তম্ভস্তথা মোহনম্।
মাতস্ত্বৎপদসেবয়া খলু নৃণাং সিধ্যন্তি তে তে গুণাঃ ক্লান্তিঃ কান্তমনোভবস্য ভবতি ক্ষুদ্রোঽপি বাচস্পতিঃ।৮।
তারাষ্টকমিদং পুণ্যং ভক্তিমান্ যঃ পঠেন্নরঃ। প্রাতর্মধ্যাহ্নকালে চ সায়াহ্নে নিয়তঃ শুচিঃ।
লভতে কবিতাং দিব্যাং সর্বশাস্ত্রার্থবিদ্ভবেৎ। লক্ষ্মীমনশ্বরাং প্রাপ্য ভুক্ত্বা ভোগান্ যথেপ্সিতান্।
কীর্তিং কান্তিঞ্চ নৈরুজ্যং সর্বেষাং প্রিয়তাং ব্রজেৎ বিখ্যাতিঞ্চাপি লোকেষু প্রাপ্যান্তে মোক্ষমাপ্নুয়াৎ।
—নীলতন্ত্র-বর্ণিত স্তোত্র, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং ৫৩৯-৫৪০

কবচ—স্তব পাঠের মতো কবচ পাঠও আরাধনার অঙ্গ। রুদ্রযামলে তারার নিম্নলিখিত কবচটি বর্ণিত হয়েছে[১]—তারাকবচের ঋষি অক্ষোভ্য, ছন্দ ত্রিষ্টুপ্, দেবতা ভগবতী তারা, সর্বমন্ত্রসিদ্ধির জন্য এর বিনিয়োগ।

ব্রহ্মরূপা মহেশ্বরী ওঁ আমার মস্তক রক্ষা করুন। হ্রীং এই বীজরূপা মহেশ্বরী ললাট রক্ষা করুন, স্ত্রীং এই বীজময়ী লজ্জারূপা মহেশ্বরী আমার বদন রক্ষা করুন, তারিণীশক্তিরূপ হূং আমার হৃদয় রক্ষা করুন। ফট্কাররূপিণী সর্বসিদ্ধিফলপ্রদা আমার সর্বাঙ্গ রক্ষা করুন। ভয়নাশিনী দেবেশী খর্বা আমার গণ্ডযুগল রক্ষা করুন। মহেশ্বরী লম্বোদরী সর্বদা আমার স্কন্ধযুগল রক্ষা করুন। ব্যাঘ্রচর্মাবৃতকটী শিবপ্রিয়া দেবী আমাকে রক্ষা করুন। পীনোন্নত-স্তনী মহেশ্বরী আমার পার্শ্বযুগল রক্ষা করুন। বর্তুলাকাররক্তচক্ষুবিশিষ্টা দেবী সর্বদা আমার কটিদেশ রক্ষা করুন। লোলজিহ্বা ভুবনেশ্বরী আমাকে নাভিতে রক্ষা করুন। করালবদনা হরপ্রিয়া দেবী সর্বদা আমাকে লিঙ্গে রক্ষা করুন। বিঘ্ননাশিনী পিঙ্গোগ্রৈকজটা আমাকে জঙ্ঘাদেশে রক্ষা করুন। প্রেতখর্পরধরা মহেশ্বরী আমাকে জানুচক্রে রক্ষা করুন। নীলবর্ণা দেবী সর্বদা আমার জানুদ্বয় রক্ষা করুন। নাগকুণ্ডলধারিণী দেবী আমাকে পদদ্বয়ে রক্ষা করুন। নাগহারধারিণী দেবী সর্বদা আমার সর্বাঙ্গ রক্ষা করুন। নাগের অঙ্গদধারিণী দেবী আমাকে প্রান্তরদেশে রক্ষা করুন। শত্রুনাশিনী চতুর্ভুজা দেবী আমাকে গমনকালে সর্বদা রক্ষা করুন। খড়্গহস্তা বিজয়প্রদা মহাদেবী আমাকে রক্ষা করুন। বিঘ্ননাশিনী নীলাম্বরপরিহিতা দেবী আমাকে রক্ষা করুন। কর্ত্রীহস্তা দেবী সর্বদা আমাকে বিবাদের সময় শত্রুমধ্যে রক্ষা করুন। ব্রহ্মরূপধারিণী দেবী আমাকে সর্বদা সংগ্রামে রক্ষা করুন। নাগকঙ্কণধারিণী দেবী ভোজনে সর্বদা আমাকে রক্ষা করুন। শবকর্ণা মহাদেবী সর্বদা আমাকে শয়নে রক্ষা করুন। বীরাসনধরা দেবী সর্বদা আমাকে নিদ্রায় রক্ষা করুন। ধনুর্বাণধারিণী দেবী সর্বদা আমাকে বিঘ্নসংকুল-অবস্থায় রক্ষা করুন। নাগবেষ্টিতকটী দেবী সর্বকর্মে আমাকে রক্ষা করুন। ছিন্নমুণ্ডধারিণী দেবী সর্বদা আমাকে কাননে রক্ষা

১ তারাকবচস্যাক্ষোভ্যঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো ভগবতী তারা দেবতা সর্বমন্ত্রসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ।
প্রণবো মে শিরঃ পাতু ব্রহ্মরূপা মহেশ্বরী। হ্রীংকারঃ পাতু ললাটে বীজরূপা মহেশ্বরী।
স্ত্রীংকারঃ পাতু বদনে লজ্জারূপা মহেশ্বরী। হূংকারঃ পাতু হৃদয়ে তারিণীশক্তিরূপধৃক্।
ফট্কারঃ পাতু সর্বাঙ্গে সর্বসিদ্ধিফলপ্রদা। খর্বা মাং পাতু দেবেশী গণ্ডযুগ্মে ভয়াপহা।
লম্বোদরী সদা স্কন্ধযুগ্মে পাতু মহেশ্বরী। ব্যাঘ্রচর্মাবৃতকটী পাতু দেবী শিবপ্রিয়া।
পীনোন্নতস্তনী পাতু পার্শ্বযুগ্মে মহেশ্বরী। রক্তবর্তুলনেত্রা চ কটিদেশে সদাবতু।
ললজ্জিহ্বা সদা পাতু নাভৌ মাং ভুবনেশ্বরী। করালাস্যা সদা পাতু লিঙ্গে দেবী হরপ্রিয়া।
পিঙ্গোগ্রৈকজটা পাতু জঙ্ঘায়াং বিঘ্ননাশিনী। প্রেতখর্পরধরা দেবী জানুচক্রে মহেশ্বরী।

করুন। চিত্রামধ্যস্থিতা দেবী মারণ-অভিচারে আমাকে রক্ষা করুন। দ্বীপিচর্মধারিণী দেবী স্ত্রীপুত্রধন-সম্পর্কে আমাকে রক্ষা করুন। অলঙ্কারবিশিষ্টা হরবল্লভা আমাকে রক্ষা করুন। হুঁ-হুঁ-ফট্-রূপিণী ওগো দেবী, নদীকুঞ্জে আমাকে রক্ষা কর রক্ষা কর। বীজরূপা মহাদেবী সর্বদা আমাকে পর্বতে রক্ষা করুন। 'মণিধারিণি বজ্রধারিণি মহাপ্রতিসরে রক্ষ রক্ষ হুং হুং ওঁ হ্রীং স্বাহা' এই মন্ত্রময়ী মহেশ্বরী আমাকে রক্ষা করুন। "'পুষ্পকেতুরাজার্হতে কাননে' এই মন্ত্রময়ী দেবী কাননস্থলে সর্বদা আমাকে রক্ষা করুন।" 'ওঁ হ্রীং বজ্রপুষ্পে হুং ফট্' এই মন্ত্রময়ী সর্বকামদা দেবী আমাকে

নীলবর্ণা সদা পাতু জানুনী সর্বদা মম। নাগকুণ্ডলধরা দেবী পাতু পাদযুগে ততঃ।
নাগহারধরা দেবী সর্বাঙ্গং পাতু সর্বদা।
নাগাঙ্গদধরা দেবী পাতু প্রান্তরদেশতঃ। চতুর্ভুজা সদা পাতু গমনে শত্রুনাশিনী।
খড়্গহস্তা মহাদেবী পাতু মাং বিজয়প্রদা। নীলাম্বরধরা দেবী পাতু মাং বিঘ্ননাশিনী।
কর্ত্রীহস্তা সদা পাতু বিবাদে শত্রুমধ্যতঃ। ব্রহ্মরূপধরা দেবী সংগ্রামে পাতু সর্বদা।
নাগকঙ্কণধরা দেবী ভোজনে পাতু সর্বদা। শবকর্ণা মহাদেবী শয়নে পাতু সর্বদা।
বীরাসনধরা দেবী নিদ্রায়াং পাতু সর্বদা। ধনুর্বাণধরা দেবী পাতু মাং বিঘ্নসংকুলে।
নাগাঞ্চিতকটী পাতু দেবী মাং সর্বকর্মসু। ছিন্নমুণ্ডধরা দেবী কাননে পাতু সর্বদা।
চিত্রামধ্যস্থিতা দেবী মারণে পাতু সর্বদা। দ্বীপিচর্মধরা দেবী পুত্রদারধনাদিষু।
অলঙ্কারান্বিতা দেবী পাতু মাং হরবল্লভা। রক্ষ রক্ষ নদীকুঞ্জে হুং-হুং-ফট্-সমন্বিতা।
বীজরূপা মহাদেবী পর্বতে পাতু সর্বদা। মণিধরিবজ্রিণি দেবী মহাপ্রতিসরে তথা।
রক্ষ রক্ষ সদা হুং হুং ওঁ হ্রীং স্বাহা মহেশ্বরী। পুষ্পকেতুরাজার্হতে কাননে পাতু মাং সদা।
ওঁ হ্রীং বজ্রপুষ্পে হুং ফট্ প্রান্তরে সর্বকামদা। ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে পাতু পুত্রান্ মহেশ্বরী।
হুং স্বাহা শক্তিসংযুক্তা দারান্ রক্ষতু সর্বদা। ওঁ আঃ হুং ফট্ স্বাহা মহেশানী পাতু দ্যূতে হরপ্রিয়া।
ওঁ হ্রীং সর্ববিঘ্নোৎসারিণী দেবী বিঘ্নান্মাং সর্বতোঽবতু। ওঁ পবিত্রবজ্রভূমে হুং ফট্ স্বাহা-সমন্বিতা।
পৃথিব্যাং পাতু মাং দেবী সর্ববিঘ্নবিনাশিনী। ওঁ আঃ সুরেখে বজ্ররেখে হুং ফট্ স্বাহা-সমন্বিতা।
পাতালে পাতু মাং দেবী নাগিনী নাগসংজ্ঞিকা। হ্রীংকারী পাতু মাং পূর্বে শক্তিরূপা মহেশ্বরী।
স্ত্রীংকারী দক্ষিণে পাতু বধূরূপা মহেশ্বরী। হুং-স্বরূপা মহাদেবী পাতু মাং ক্রোধরূপিণী।
ফ-স্বরূপা মহামায়া পশ্চিমে পাতু সর্বদা। উত্তরে পাতু মাং দেবী ট-স্বরূপা হরপ্রিয়া।
মধ্যে মাং পাতু দেবেশী হুং-স্বরূপা নগাত্মজা। ত্বরিতা পাতু মাং দেবী সর্ববিঘ্নবিনাশিনী।
নীলবর্ণা সদা পাতু সর্বত্র বাগ্‌ভবী সদা। ভবানী পাতু ভবনে সর্বৈশ্বর্যপ্রদায়িনী।
বিদ্যাদানরতা দেবী পাতু বক্ত্রে সরস্বতী। শাস্ত্রে বাদে সংগ্রামে চ জলে চ বিষমে গিরৌ।
ভীমরূপা সদা পাতু শ্মশানে ভয়নাশিনী। ভূতপ্রেতালয়ে ঘোরে দুর্গা মাং শ্রীঘনাবতু।
পাতু নিত্যং মহেশানী সর্বত্র শিবদূতিকা। কবচস্য চ মাহাত্ম্যং নাহং বর্ষশতৈরপি।
শক্নোমি কথিতুং দেবি ভবেত্তস্য ফলঞ্চ যৎ।

প্রান্তরে রক্ষা করুন। 'ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে' এই মন্ত্রময়ী মহেশ্বরী আমার পুত্রদের রক্ষা করুন। 'হুং স্বাহা' এই মন্ত্রময়ী শক্তিসংযুক্তা দেবী আমার পত্নীকে সর্বদা রক্ষা করুন। 'ওঁ আঃ হুং ফট্ স্বাহা' এই মন্ত্রময়ী মহেশানী হরপ্রিয়া আমাকে দ্যূতক্রীড়ায় রক্ষা করুন। 'ওঁ হ্রীং' এই মন্ত্রময়ী সর্ববিঘ্নবিনাশিনী দেবী বিঘ্ন থেকে আমাকে সর্বপ্রকারে রক্ষা করুন। 'ওঁ পবিত্রবজ্রভূমে হুং ফট্ স্বাহা' এই মন্ত্রময়ী আমাকে রক্ষা করুন। 'ওঁ আঃ সুরেখে বজ্ররেখে হুং ফট্ স্বাহা' এই মন্ত্রময়ী সর্ববিঘ্নবিনাশিনী দেবী জগতে আমাকে রক্ষা করুন। নাগনাম্নী নাগিনী দেবী পাতালে আমাকে রক্ষা করুন। হ্রীং-মন্ত্রময়ী শক্তিরূপা মহেশ্বরী পূর্বদিকে আমাকে রক্ষা করুন। স্ত্রীং-মন্ত্রময়ী বধূরূপা মহেশ্বরী আমাকে দক্ষিণদিকে রক্ষা করুন। হুং-স্বরূপা ক্রোধরূপিণী মহাদেবী আমাকে রক্ষা করুন। ফ-স্বরূপা মহামায়া আমাকে পশ্চিমদিকে সর্বদা রক্ষা করুন। ট-স্বরূপা হরপ্রিয়া আমাকে উত্তরে রক্ষা করুন। হুং-স্বরূপা নাগনন্দিনী দেবেশী আমাকে মধ্যদেশে রক্ষা করুন। সর্ববিঘ্নবিনাশিনী ত্বরিতা আমাকে রক্ষা করুন। নীলবর্ণা বাগ্‌ভবা সর্বত্র সর্বদা আমাকে রক্ষা করুন। সর্বৈশ্বর্যপ্রদায়িনী আমাকে গৃহে রক্ষা করুন। বিদ্যাদানরতা দেবী সরস্বতী আমাকে মুখে শাস্ত্রে বিচারে সংগ্রামে জলে এবং বিষম গিরিদেশে রক্ষা করুন। ভয়নাশিনী ভীমরূপা দেবী আমাকে সর্বদা শ্মশানে রক্ষা করুন। ভীষণা দুর্গা ভয়ংকর ভূতপ্রেতালয়ে আমাকে রক্ষা করুন। মহেশানী শিবদূতী আমাকে রক্ষা করুন। এই কবচের মাহাত্ম্য এবং তার যা ফল তা, ওগো দেবী, আমি শতবর্ষেও বর্ণনা করতে পারব না।

যে এই কবচ পাঠ করে, স্ত্রী পুত্র বন্ধু এদের বিষয়ে সে সর্বদেশে সর্বদা নির্ভয় থাকে এবং সে নৃপতিপূজ্য হয়।

শুচি বা অশুচি যে-কোনো অবস্থায় এই সর্বকামদ কবচ পাঠ করলে বা স্মরণ করলে মানুষ দুঃখশোকহীন হয়। সে সর্বশাস্ত্রে জ্ঞানী হয়, সর্ববাগীশ্বর হয় লোককে বশ করতে পারে এবং ধনেশ্বর হয়। রণে দ্যূতক্রীড়ায় বিবাদে সর্বদা তার জয় হয়। সে পুত্রপৌত্র লাভ করে এবং সব যোষিৎদের বিলাসী হয়। শত্রুরা তার দাসত্ব স্বীকার করে এবং সে সকলের প্রিয় হয়। তার দর্শনে গর্বীর গর্ব খর্ব হয় এবং বিচারকারী পরাঙ্মুখ হয়। মৃত্যু তার বশীভূত হয় এবং ক্ষিতিপতিরা তার দাস হয়।

পুত্রদারার্থবন্ধূনাং সর্বদেশে চ সর্বদা। ন বিদ্যতে ভয়ং তস্য নৃপপূজ্যো ভবেচ্চ সঃ।
শুচির্ভূত্বাঽশুচির্বাপি কবচং সর্বকামদম্। প্রপঠন্ বা স্মরন্মর্ত্যো দুঃখশোকবিবর্জিতঃ।
সর্বশাস্ত্রে মহেশানি কবিরাট্ ভবতি ধ্রুবম্। সর্ববাগীশ্বরো মর্ত্যো লোকবশ্যো ধনেশ্বরঃ।
রণে দ্যূতে বিবাদে চ জয়স্তস্য ভবেৎ সদা। পুত্রপৌত্রান্বিতো মর্ত্যো বিলাসী সর্বযোষিতাম্,
শত্রবো দাসতাং যান্তি সর্বেষাং বল্লভঃ সদা। গর্বী খর্বো ভবত্যেব বাদী স্খলতি দর্শনাৎ।
মৃত্যুশ্চ বশতাং যাতি দাসাস্তস্যাবনীভুজঃ।—দ্রঃ বৃহ ত সা ১০ম সং, পৃঃ ৫৪০--৫৪২

ষোড়শী— মহাবিদ্যা ষোড়শীকে শ্রীবিদ্যা ত্রিপুরা বা মহাত্রিপুরসুন্দরীও[১] বলা হয়। কুব্জিকাতন্ত্রে বলা হয়েছে[২] সর্বদা শ্রী প্রদান করেন বলে এই বিদ্যাকে শ্রীবিদ্যা বলা হয়। আর মহাদেবী নির্গুণা বলে তাঁকে ষোড়শী বলা হয়।

দেবীকে ত্রিপুরা কেন বলা হয় সে-সম্বন্ধে কালিকাপুরাণ বলেন[৩] —দেবীর মণ্ডল ত্রিকোণ, ভূপুর ত্রিরেখ, মন্ত্র ত্র্যক্ষর, আবার তাঁর রূপও ত্রিবিধ। কুণ্ডলীশক্তি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই ত্রিদেবের সৃষ্টিতে ত্রিবিধা হন। সবই তিন তিন, কাজেই দেবীকে বলা হয় ত্রিপুরা।

কামকলাবিলাসের ব্যাখ্যায় দেখা যায় মাতা মান মেয় এই তিন রূপ; রক্ত শুক্ল মিশ্র এই ত্রিবিন্দু; সোম সূর্য অগ্নি এই ত্রিধাম; কামরূপ, পূর্ণগিরি জালন্ধর এই ত্রিপীঠ; ইচ্ছা জ্ঞান ক্রিয়া এই ত্রিশক্তি; বাণ ইতর পর এই ত্রিলিঙ্গ; অ-ক-থ এই ত্রিধাভিন্ন মাতৃকাত্রিতয় এমনি ত্রিবিধাত্মক সর্বপ্রপঞ্চের আবির্ভাব ও তিরোভাবভূমি বলে পরাশক্তি ত্রিপুরা।[৪]

কালীই ষোড়শী—কালীই ষোড়শী। এ সম্বন্ধে নারদ পঞ্চরাত্রে[৫] একটি চমৎকার কাহিনী দেওয়া হয়েছে। কাহিনীটিকে একটি গভীর তত্ত্বের জনপ্রিয় ব্যাখ্যা বলা যায়। কাহিনীটি এই—একবার স্বর্গের অপ্সরারা কৈলাসে মহাদেবকে দর্শন করতে যান। শিব তাঁদের সামনেই দেবীকে কয়েকবার কালী কালী বলে ডাকেন। এতে দেবী লজ্জা পেয়ে যান এবং মনে মনে স্থির করেন কালীরূপ ত্যাগ করে বিশুদ্ধ গৌরীরূপ ধারণ করবেন। এমনি সঙ্কল্প করে দেবী কৈলাস থেকে অন্তর্হিতা হয়ে যান। শিব তখন একা। এমনি সময়ে একদিন নারদ এসে উপস্থিত। শিবকে একা দেখে দেবর্ষি তাঁকে দেবীর কথা জিজ্ঞাসা করলেন। শিব বললেন দেবী আমাকে ত্যাগ করে অন্তর্হিতা হয়েছেন। নারদ তখন ধ্যানস্থ হয়ে দেখলেন দেবী সুমেরুর উত্তর পার্শ্বে অবস্থান করছেন। তিনি তখনি সেখানে

---

১ মহাত্রিপুরসুন্দর্যেব শ্রীবিদ্যারূপেত্যর্থঃ।—বা নি ৪।১৮-এর সে ব, পৃঃ ১৪১

২ শ্রীদাত্রী চ সদা বিদ্যা শ্রীবিদ্যা পরিকীর্তিতা। নির্গুণা চ মহাদেবী ষোড়শী পরিকীর্তিতা।

—কুব্জিকাতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৫, পরিঃ ৬, সং, পৃঃ ৩৭৪

৩ ত্রিকোণং মণ্ডলং চাস্যা ভূপুরং চ ত্রিরেখকম্। মন্ত্রোঽপি ত্র্যক্ষরঃ প্রোক্তস্তথা রূপত্রয়ং পুনঃ।
ত্রিবিধা কুণ্ডলীশক্তিস্ত্রিদেবানাং চ সৃষ্টয়ে। সর্বং ত্রয়ং ত্রয়ং যস্মাত্তস্মাত্তু ত্রিপুরা মতা।

—কালিকাপুরাণবচন, দ্রঃ ল স, উপোদ্ঘাত, ১ম শ্লোক-এর সৌ ভা

৪ মাতা মানং মেয়ং বিন্দুত্রয়ভিন্নবীজরূপাণি। ধামত্রয়পীঠত্রয়শক্তিত্রয়ভেদভাবিতান্যপি চ
তেষু ক্রমেণ লিঙ্গত্রিতয়ং তদ্বচ্চ মাতৃকাত্রিতয়ম্। ইত্থং ত্রিতয়পুরী যা তুরীয়পীঠাদিভেদিনী বিদ্যা।

—কা বি ১৩, ১৪

৫ দ্রঃ প্রা তো, ৫ম কাণ্ড, ষষ্ঠ পরিঃ, বসুমতী সং, পৃঃ ৩৭৭-৩৭৮

চলে গেলেন এবং অনেক স্তবস্তুতি করে দেবীকে প্রসন্ন করলেন। দেবী নারদকে শিবের সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন। নারদ বললেন 'মা, মহেশ্বর আবার বিবাহের উদ্যোগ করছেন। তুমি শীঘ্র গিয়ে তা বন্ধ কর।' দেবী তখন এমন অপূর্ব সুন্দর রূপ ধারণ করলেন কোথাও যার তুলনা মিলে না এবং মুহূর্তমধ্যে শিবসন্নিধানে উপস্থিত হয়ে শিবের হৃদয়ে নিজের ছায়া দেখতে পেলেন। ভাবলেন ইনি বোধহয় অন্য কোনো দেবী। সেইজন্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে শিবকে অকৃতজ্ঞ প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী ইত্যাদি বলে তিরস্কার করতে লাগলেন। শিব বললেন—দেবী, ধ্যানস্থ হয়ে জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখ, দেখবে আমার হৃদয়ে তোমারই ছায়া! দেবী তাই করলেন এবং ছায়াটি যে তাঁর নিজেরই ছায়া তা দেখে শান্ত হলেন। এবার দেবী শিবকে সেই ছায়ার তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করলেন। শিব উত্তরদান প্রসঙ্গে বললেন—ত্রিভুবনে সর্বশ্রেষ্ঠরূপ ধারণ করেছ বলে তুমি স্বর্গে মর্ত্যে পাতালে এবং অন্যত্র সুন্দরী পঞ্চমী শ্রী এবং ত্রিপুর-সুন্দরী নামে প্রসিদ্ধ হবে আর সর্বদা ষোড়শবর্ষীয়া বলে ষোড়শী বলে খ্যাত হবে।[১]

শুদ্ধসত্ত্বঘনীভূতমূর্তি—ষোড়শী বা শ্রীবিদ্যার অপর নাম ললিতা। দেবীর উপাসকেরা বলেন ইনি ঘনীভূত ঘৃতের মতো রজস্তমঃসম্পর্কশূন্যশুদ্ধসত্ত্বঘনীভূতমূর্তি। অন্যান্য শিব-শক্তিদের কারো কারো সাত্ত্বিক শরীর আছে বটে কিন্তু তাঁদের মধ্যে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য থাকলেও অন্যগুণও অল্পপরিমাণে যুক্ত আছে। এঁদের কারুরই শুদ্ধসত্ত্বমূর্তি নয়। এইজন্য দেবী ললিতা বা ষোড়শীই সর্বোত্তমা পরব্রহ্মমূর্তি।[২]

বলা বাহুল্য এটি সাম্প্রদায়িক অভিমত।

মন্ত্র—ষোড়শীর বিদ্যা বা মন্ত্র অনেক। তার মধ্যে দশাক্ষরী বিদ্যা সমধিক প্রসিদ্ধ। শাক্তরা বলেন এটি বৈদিক মন্ত্র। ভাস্কর রায় সেতুবন্ধে[৩] বলেছেন মন্ত্রটি অথর্ববেদের শৌনক শাখার অন্তর্গত। আবার নটনানন্দনাথ চিদবল্লীতে[৪] বলেছেন মন্ত্রটি ঋগ্‌বেদের সাঙ্খ্যায়ন শাখার অন্তর্গত। ভাস্কররায়ও বরিবস্যারহস্যের ব্যাখ্যায় মন্ত্রটিকে শাঙ্খায়নশ্রুতির অন্তর্গত বলেছেন।[৫] আলোচ্য শ্রৌত মন্ত্রটি এই—

১ যস্মাৎ ত্রিভুবনে রূপং শ্রেষ্ঠং কৃতবতী শিবে। তস্মাৎ স্বর্গে চ মর্ত্যে চ পাতালেঽন্যত্র পার্বতি।
সুন্দরী পঞ্চমী শ্রী চ খ্যাতা ত্রিপুরসুন্দরী। সদা ষোড়শবর্ষীয়া বিখ্যাতা ষোড়শী ততঃ।

—নারদপঞ্চরাত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৫, পরিঃ ৩, ব সং, পৃঃ ৩৭৭-৭৮

২ তস্যাশ্চ শরীরং ঘনীভূতঘৃতবদ্রজস্তমঃসম্পর্কশূন্যশুদ্ধসত্ত্বঘনীভাবরূপম্। অন্যাসাং শিবশক্তীনাং কতিপয়ানাং সাত্ত্বিকশরীরাণ্যপি সত্ত্বাধিক্যেঽপ্যন্যগুণলবযুক্তানি ন পুনঃ শুদ্ধসত্ত্বানি। অতঃ সর্বোত্তমৈবৈষা পরব্রহ্মমূর্তিঃ।

—ল স, পৃঃ ৪

৩ ইত্যাথর্বণে শৌনকশাখীয়া শ্রুতিঃ।—বা নি ১।১।১৮-১।১৯-এর সে ব, পৃঃ ৩৪

৪ দ্রঃ কা বি, ১৭-এর চিদবল্লী ৫ দ্রঃ ব র ১।৮-এর ব্যাখ্যা

কামো যোনিঃ কমলা বজ্রপাণির্গুহা হসা মাতরিশ্বাঽভ্রমিন্দ্রঃ।
পুন গুহা সকলা মায়য়া চ পুরুচ্যেষা বিশ্বমাতা আদিবিদ্যা।[১]

তন্ত্রের নিয়ম অনুসারে সাংকেতিক ভাষায় মন্ত্রটি ব্যক্ত হয়েছে। যথা—কাম ক, যোনি এ, কমলা ঈ, বজ্রপাণি ল, গুহা হ্রীঁ, হ স, মাতরিশ্বা ক, অভ্র হ, ইন্দ্র ল, গুহা হ্রীঁ, স ক ল, মায়া হ্রীঁ। এই বিশ্বমাতা পুরাতনী আদি বিদ্যা।

বাগ্‌ভব-কামরাজ-শক্তি—তা হলে বিদ্যাটি দাঁড়াল—ক এ ঈ ল হ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ। এই বিদ্যার নাম কামরাজ। এতে তিনটি অংশ লক্ষ্য করা যায়। প্রথম অংশ ক এ ঈ ল হ্রীঁ। একে বলা হয় বাগ্‌ভব-বীজ। দ্বিতীয় অংশ হ স ক হ ল হ্রীঁ। একে বলা হয় কামরাজ-বীজ। আর তৃতীয় অংশ স ক ল হ্রীঁ। একে বলা হয় শক্তি-বীজ।[২]

কাদি-হাদি-সাদি—উক্ত প্রত্যেক বীজের আদি বর্ণের নামানুসারে আবার বিদ্যার পৃথক্ পৃথক্ নাম হয়। বাগ্‌ভব-বীজের আদি বর্ণের নামানুসারে বিদ্যাকে বলা হয় কাদি-বিদ্যা, কামরাজ-বীজের আদি বর্ণের নামানুসারে হাদিবিদ্যা আর শক্তি-বীজের আদি বর্ণের নামানুসারে সাদিবিদ্যা। পঞ্চদশাক্ষরী বিদ্যা এইভাবে কাদি প্রভৃতি বিদ্যা নামে বর্ণিতা হন।[৩]

কূট—বাগ্‌ভব-বীজ, কামরাজ-বীজ এবং শক্তি-বীজকে বাগ্‌ভবকূট কামরাজকূট ও শক্তি-কূট বলা হয়। কূট অর্থ সমূহ। বিদ্যার যে-বর্ণসমূহ একসঙ্গে একবারে উচ্চারিত হওয়া বিধি তাকে বলা হয় কূট। পূর্বোক্ত বাগ্‌ভব-বীজের বর্ণসমূহ একসঙ্গে একবারে উচ্চারণ করতে হয়, এইজন্য এই বর্ণসমূহ একটি কূট। কামরাজ-বীজ এবং শক্তি-বীজ সম্বন্ধেও এই কথা।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিখ্যাত পঞ্চদশাক্ষরী শ্রীবিদ্যার উল্লেখ করা যায়। এঁর নাম লোপামুদ্রা। লোপামুদ্রা দ্বিবিধা—প্রথমা লোপামুদ্রা ও দ্বিতীয়া লোপামুদ্রা। প্রথমা লোপামুদ্রা এই—হ স ক ল হ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ। ইনি অগস্ত্যপূজিতা। দ্বিতীয়া লোপামুদ্রা এই—ক এ ঈ ল হ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ স হ স ক ল হ্রীঁ। ইনিও অগস্ত্যপূজিতা।[৪]

এই দ্বিতীয়া লোপামুদ্রাই চতুষ্কূটা শ্রীবিদ্যার উপাদান। চতুষ্কূটা সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

১ দ্রঃ বা বি ১।১১৮-১১৯-এর সে ব, পৃঃ ৬৪

২ বাগ্‌ভবং প্রথমং বীজং কামরাজং দ্বিতীয়কম্। শক্তিবীজং তৃতীয়ন্তু চতুর্বর্গফলপ্রদম্।
—সিদ্ধেশ্বরীমতবচন, দ্রঃ শা তি ১।১-এর টীকা

৩ দ্রঃ বহ্বৃচোপনিষদের অপ্পয়দীক্ষিতকৃত ভাষ্য

৪ দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ২৪২, ২৪৩

দ্বিতীয়া লোপামুদ্রা দুবার লিখতে হবে। প্রথমবার যেমনটি আছে তেমনি; দ্বিতীয়বারের বেলা প্রথম ও দ্বিতীয় কূটের হ্রীঁ বাদ দিতে হবে, তৃতীয় কূট যেমন তেমনি থাকবে। তা হলে বিদ্যাটি দাঁড়াল— ক এ ঈ ল হ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ স হ স ক ল হ্রীঁ ক এ ঈ ল হ স ক হ ল স হ স ক ল হ্রীঁ। বলা হয়েছে "প্রথম কূটত্রয় পৃথক্ পৃথক্ উচ্চারণপূর্বক শেষকূটত্রয়কে একসঙ্গে উচ্চারণ করিলেই চতুষ্কূটা বিদ্যা হইল।"[১]

এখানেও দেখা যাচ্ছে বর্ণসমূহ অর্থেই কূটশব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

আবার বিদ্যার অন্তর্গত ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা অনুসারেও কূট সংখ্যা নির্ণীত হতে পারে। যেমন শারদাতিলকে ত্রিপুরভৈরবীর বিদ্যাকে পঞ্চকূটাত্মিকা বলা হয়েছে।[২] এই বিদ্যায় হ স ক ল র এই পাঁচটি ব্যঞ্জনবর্ণ আছে। টীকায় রাঘবভট্ট লিখেছেন এই ব্যঞ্জনবর্ণ পাঁচটির সংযোগহেতু বিদ্যার পঞ্চকূটাত্মকত্ব।[৩]

একাক্ষর বীজকেও কূট গণ্য করা হয়। হ্রীঁ শ্রীঁ যোগ করলে ত্রিকূটমন্ত্রগুলি পঞ্চকূট, বৈষ্ণবীমন্ত্রসকল অষ্টকূট এবং চতুষ্কূট শঙ্করমন্ত্র ষট্‌কূট হয়।[৪]

পূর্বেই বলা হয়েছে শ্রীবিদ্যা অনেক। ষোড়শাক্ষরী শ্রীবিদ্যাকে[৫] বলা হয় ষোড়শী। তন্ত্রশাস্ত্র এঁর মাহাত্ম্য উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। জ্ঞানার্ণবতন্ত্রে আছে সহস্রকোটি মুখে এবং শতকোটি জিহ্বার দ্বারাও ষোড়শাক্ষরী শ্রীবিদ্যার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা যায় না। ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপা এই বিদ্যা ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদা।[৬]

ধ্যান—যোগিনীহৃদয়ে নিম্নলিখিত ধ্যানটি বর্ণিত হয়েছে— পদ্মাভা দেবী ষোড়শী প্রভাতসূর্যকিরণের মতো উজ্জ্বল। দেবীর বর্ণ জবাকুসুমের মতো, দাড়িম্বকুসুমের মতো, পদ্মরাগমণির মতো, কুঙ্কুমের মতো অরুণ। তাঁর মস্তকে উজ্জ্বল মুকুট, মাণিক্যকিঙ্কিণীসমূহ তাঁর অঙ্গশোভা বর্দ্ধন করছে। দেবীর কুটিলকেশরাশি কৃষ্ণভ্রমরশ্রেণীর মতো, বদনমণ্ডল নবোদিত সূর্যের মতো, ললাটফলকে অর্ধেন্দু ঈষদ্‌বঙ্কিমভাবে শোভা পাচ্ছে। পরমেশ্বরীর ভ্রূলতার আকার হরধনুর মতো, নয়ন আনন্দে উন্মীলন-নিমীলনলীলায় আন্দোলিত হচ্ছে। তাঁর হেমকুণ্ডল উজ্জ্বল কিরণের মতো শোভা পাচ্ছে, শোভন প্রশস্ত কপোল চন্দ্রের অমৃতমণ্ডলকে পরাজিত করছে। দেবীর সুস্পষ্ট নাসিকা মনে হয় বিশ্বকর্মা নির্মাণ

১ বৃহ ত সা, ১০ম স, পৃঃ ২৪৪ ২ পঞ্চকূটাত্মিকা বিদ্যা বেদ্যা ত্রিপুরভৈরবী।—শা তি ১২।৫

৩ হসকলরেতি পঞ্চব্যঞ্জনসংযোগাৎ পঞ্চকূটাত্মকত্বম্।—ঐ, টীকা

৪ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ২৪৪

৫ ষোড়শাক্ষরী শ্রীবিদ্যা—হ্রীঁ ক এ ঈ ল হ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ।—দ্রঃ শাক্তপ্রমোদ, পৃঃ ১৫৮

৬ বক্ত্রকোটিসহস্রৈস্তু জিহ্বাকোটিশতৈরপি। বর্ণিতুং নৈব শক্যোহং শ্রীবিদ্যা ষোড়শাক্ষরী।
ব্রহ্মবিদ্যা স্বরূপা সা ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদা।—জ্ঞানার্ণবতন্ত্রবচন, দ্রঃ পু চ, খণ্ড ৯, পৃঃ ৭৯৭

করেছেন। অমৃতোপমা দেবীর ওষ্ঠ তাম্রের মতো, প্রবালের মতো, বিম্বের মতো রক্তবর্ণ। দেবীর স্মিতহাসির মাধুর্য মাধুর্যরসসাগরকে পরাভূত করেছে ; তাঁর চিবুক অতুলনীয়। দেবী কম্বুগ্রীবা। মৃণালললিতভুজা। তাঁর সুকুমার করকমল রক্তপদ্মের পাঁপড়ির মতো, রক্তনখপদ্মের জ্যোতি সমগ্র নভোমণ্ডলে বিস্তীর্ণ হয়েছে, সমুন্নতপয়োধর মুক্তাহারলতান্বিত, সুশোভিত মধ্যদেশ ত্রিবলীবলয়যুক্ত। দেবী লাবণ্যসরিতের আবর্তাকার নাভিমণ্ডলের দ্বারা বিভূষিতা। তাঁর নিতম্বদেশ অমূল্যরত্ননির্মিতকাঞ্চীশোভিত, নিতম্বমণ্ডলরূপদ্বিরদের শোভন-অঙ্কুশ রোমরাজি। ঈশ্বরীর সুকুমার উরু ললিতকদলীস্তম্ভের মতো, মনোজ্ঞ জানুমণ্ডল লাবণ্যকুসুমাকৃতি, জঙ্ঘাযুগল লাবণ্যকদলীতুল্য। দেবীর গুল্‌ফযুগল গূঢ় অর্থাৎ অতিপ্রকট নয় ; পদদ্বয়ের অগ্রভাগ কচ্ছপকেও পরাজিত করেছে, তাঁর কৃশ দীর্ঘ অঙ্গুলিগুলিতে স্বচ্ছ নখরাজি শোভা পাচ্ছে। ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর শিরোরত্ন দেবীর চরণকমলে লুণ্ঠিত হচ্ছে। শত চন্দ্রের কান্তিসমূহে উদ্ভাসিতা দেবী। তাঁর লোহিত বর্ণ সিন্দুর, জবাকুসুম ও দাড়িম্বকুসুমকেও পরাজিত করেছে। দেবীর পরিধানে রক্তবস্ত্র, হস্তে পাশ ও অঙ্কুশ। তিনি রক্তপদ্মের উপর অধিষ্ঠিতা, রক্তাভরণভূষিতা। দেবী চতুর্ভুজা ত্রিনেত্রা ; তাঁর হাতে পঞ্চবাণ ও ধনু। তাঁর মুখ কর্পূরকণামিশ্রিত তাম্বূলে পূর্ণ ; তাঁর দেহ কস্তুরী-কুঙ্কুমে অরুণ, সর্বপ্রকারশৃঙ্গারবেশসমৃদ্ধ ও সর্বপ্রকার আভরণে ভূষিত। জগদাহ্লাদজননী জগদ্রঞ্জনকারিণী জগদাকর্ষণকারিণী জগৎকারণরূপিণী সর্বমন্ত্রময়ী দেবী সর্বসৌভাগ্যদায়িনী সর্বলক্ষ্মীময়ী নিত্যা সর্বশক্তিময়ী ও মঙ্গলময়ী। দেবীর এই রূপে আত্মধ্যান করে মানস পূজা করবে।[১]

১ ততঃ পদ্মনিভাং দেবীং বালার্ককিরণোজ্জ্বলাম্। জবাকুসুমসঙ্কাশাং দাড়িমীকুসুমোপমাম্।
পদ্মরাগপ্রতীকাশাং কুঙ্কুমারুণসন্নিভাম্। স্ফুরন্মুকুটমাণিক্যকিঙ্কিণীজালমণ্ডিতাম্।
কালালিকুলসঙ্কাশকুটিলালকপল্লবাম্। প্রত্যগ্রারুণসঙ্কাশবদনাম্ভোজমণ্ডলাম্।
কিঞ্চিদর্ধেন্দুকুটিলললাটমৃদুপট্টিকাম্। পিনাকিধনুরাকারভ্রূলতাম্ পরমেশ্বরীম্।
আনন্দমুদিতোল্লাসলীলান্দোলিতলোচনাম্। স্ফুরন্ময়ূখসঙ্কাশবিলসদ্ধেমকুণ্ডলাম্।
সুগণ্ডমণ্ডলাভোগ-জিতেন্দ্বমৃতমণ্ডলাম্। বিশ্বকর্মবিনির্মাণসূত্রসুস্পষ্টনাসিকাম্।
তাম্রবিদ্রুমবিম্বাভরক্তোষ্ঠীমমৃতোপমাম্। স্মিতমাধুর্যবিজিতমাধুর্যরসসাগরাম্।
অনৌপম্যগুণোপেতচিবুকোদ্দেশশোভিতাম্। কম্বুগ্রীবাং মহাদেবীং মৃণালসদৃশৈর্ভুজৈঃ।
রক্তোৎপলদলাকারসুকুমারকরাম্বুজাম্। রক্তাম্বুজনখজ্যোতির্বিতানিতনভস্তলাম্।
মুক্তাহারলতোপেতসমুন্নতপয়োধরাম্। ত্রিবলীবলয়াযুক্তমধ্যদেশসুশোভিতাম্।
লাবণ্যসরিদাবর্তাকারনাভিবিভূষিতাম্। অনর্ঘরত্নঘটিতকাঞ্চীযুতনিতম্বিনীম্।
নিতম্ববিম্বদ্বিরদরোমরাজিবরাঙ্কুশাম্। কদলীললিতস্তম্ভসুকুমারোরুমীশ্বরীম্।
লাবণ্যকুসুমাকারজানুমণ্ডলবন্ধুরাম্। লাবণ্যকদলীতুল্যজঙ্ঘাযুগলমণ্ডিতাম্।

মহাকালসংহিতায় এবং সিদ্ধান্তসংগ্রহেও এই ধ্যানটি বর্ণিত হয়েছে।[১] তবে তাতে দেবীর ধ্যানের সঙ্গে তাঁর আবাসস্থল এবং সিংহাসনাদির বর্ণনা যুক্ত হয়েছে। যে-বেদীতে দেবীর সিংহাসন স্থাপিত তার বর্ণনা করে বলা হয়েছে বেদীতে দেবীর শুভ রত্নসিংহাসন ধ্যান করবে। ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র এবং ঈশ এই সিংহাসনের পাদচতুষ্টয়। সিংহাসনটি সদাশিবময়। তার মধ্যে পরশিবাত্মক পুষ্পপর্যঙ্ক। তার মধ্যে উদ্যানপীঠক। তার উপরে স্বাস্তিকাসনে দেবী অধিষ্ঠিতা।[২]

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় এই যে ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র ঈশ এবং সদাশিব দেবীর সিংহাসন হয়েছেন এঁদের বলা হয় পঞ্চপ্রেত। এইজন্যই দেবীকে বলা হয় পঞ্চপ্রেতাসনা।

স্তোত্র—ষোড়শী বা শ্রীবিদ্যার একাধিক স্তোত্র আছে। এখানে তন্ত্রসারধৃত স্তোত্রটি বিবৃত হল। যথা[৩]—মা, তোমার পাদপদ্মের সেবা কল্যাণবর্ষী বৃষ্টির মতো, অমৃতে পূর্ণ, লক্ষ্মীর স্বয়ংবর উৎসবের মঙ্গল দীপের মতো, যে-সব ব্যক্তি আন্তরিক ভক্তির সঙ্গে তোমার এ রকম সেবা করে তারা কি না লাভ করতে পারে।১

ওগো জননী, জলে প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো তোমার নয়ন। তোমার বিগ্রহ উদীয়মান সূর্যের বর্ণবিশিষ্ট কমলের মতো সুন্দর, উত্তম সুধার দ্বারা আপ্লুত। তোমার বন্দনায় তোমার এই বিগ্রহ আমার বড়ই স্পৃহণীয়।২

গূঢ়গুল্‌ফপদদ্বন্দ্বপ্রপদাজিতকচ্ছপাম্। তনুদীর্ঘাঙ্গুলিস্বচ্ছনখরাজিবিরাজিতাম্।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিরোরত্ননিঘৃষ্টচরণাম্বুজাম্। শীতাংশুশতসঙ্কাশকান্তিসন্তানহাসিনীম্।
লৌহিত্যজিতসিন্দূরজবাদাড়িমরূপিণীম্। রক্তবস্ত্রপরীধানাং পাশাঙ্কুশকরোদ্যতাম্।
রক্তপদ্মনিবিষ্টাঞ্চ রত্নাভরণভূষিতাম্। চতুর্ভুজাং ত্রিনেত্রাঞ্চ পঞ্চবাণধনুর্ধরাম্।
কর্পূরশকলোন্মিশ্রতাম্বূলপূরিতাননাম্। মহামৃগমদোদ্দামকুঙ্কুমারুণবিগ্রহাম্।
সর্বশৃঙ্গারবেশাঢ্যাং সর্বাভরণভূষিতাম্। জগদাহ্লাদজননীং জগদ্রঞ্জনকারিণীম্।
জগদাকর্ষণকরীং জগৎকারণরূপিণীম্। সর্বমন্ত্রময়ীং দেবীং সর্বসৌভাগ্যসুন্দরীম্।
সর্বলক্ষ্মীময়ীং নিত্যাং সর্বশক্তিময়ীং শিবাম্। এবং রূপমাত্মানং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজয়েৎ।

—দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ২৮২-৮৩

১ দ্রঃ পু চ, ভঃ ৯, পৃঃ ৭৯৯

২ রত্নসিংহাসনং তস্যা বেদ্যা মধ্যে স্মরেচ্ছুভম্। বিরিঞ্চিবিষ্ণুরুদ্রেশরূপপাদচতুষ্টয়ম্।
সদাশিবময়ং সাক্ষাৎ তস্মিন্ পরশিবাত্মকম্। পুষ্পপর্যঙ্কতন্মধ্যে শ্রীমদুদ্যানপীঠকে।
পর্যঙ্কবদ্ধবিলসৎস্বস্তিকাসনশালিনীম্।—ঐ, পৃঃ ৮০১

৩ কল্যাণবৃষ্টিভিরিবামৃতপূরিতাভি র্লক্ষ্মীস্বয়ংবরণমঙ্গলদীপিকাভিঃ
সেবাভিরম্ব তব পাদসরোজমূলে নাকারি কিং মনসি ভক্তিমতাং জনানাম্।১।
এতাবদেব জননী স্পৃহণীয়মাস্তে ত্বদ্বন্দনেষু সলিলস্থগিতোজনেত্রে।
সান্নিধ্যমুদ্যদরুণায়ুতসোদরস্য ত্বদ্বিগ্রহস্য সুধয়া পরয়াপ্লুতস্য।২।

ব্রহ্মাদি ঈষৎপ্রভাবকলুষিত কত জীব প্রতিদিন প্রলয়াভিভূত হচ্ছেন। কিন্তু যে-ব্যক্তি তোমার পদযুগলে একবার মাত্র প্রণাম করে শুধু সে-ই স্থিরসিদ্ধি লাভ করে।৩

ওগো ত্রিপুরসুন্দরী, তোমার যে-সব ভক্ত একবারমাত্র তোমার করুণাসুন্দর কটাক্ষ লাভ করেন তাঁরা কন্দর্পভাবসৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়ে ত্রিভুবনের তরুণীদের মুগ্ধ করতে পারেন। ৪

মা, তুমি ত্রিকোণবাসিনী ত্রিপুরা এবং ত্রিনেত্রা। দেবতারা তোমার হ্রীঁ এই মন্ত্র উচ্চারণ করে যমকিঙ্করের ভয়মুক্ত হয়ে লোকপালদের সঙ্গে নন্দনবনে ক্রীড়া করেন।৫

মাগো, তোমার চিরামৃতপূত শীতল দেহের অর্দ্ধেক যদি ত্রিপুরান্তকারীর দেহার্দ্ধ না হত তা হলে যে-গরল তাঁর গলা পর্যন্ত গিয়েছিল তার বেগ অতি ক্রূর হতে পারত।৬

ওগো দেবী, তোমার পাদপদ্মে প্রণাম সর্বজ্ঞতা সভায় বাক্‌পটুতা উজ্জ্বলৎমুকুট ছত্র দুটি-চামর এবং বিশাল বসুধারাজ্য প্রদান করে।৭

মা, তোমার কটাক্ষকল্পতরু বাঞ্ছিতবস্তু-প্রদানে করুণাবারিধি। ওগো ত্রিপুরসুন্দরী, আমি অনাথ, তোমার প্রতিই আমার ভক্তি, তোমার দিকেই চেয়ে আছি। আমার উপর সেই করুণাকটাক্ষ কর।৮

হায় অন্যেরা অপর সাধারণ দেবতাদের প্রতি মন নিবিষ্ট করে তাঁদের ভক্তি করে। জননী গো, আমি তোমাকেই মন দিয়ে স্মরণ করি, তোমাকেই নমস্কার করি, তুমি আমার শরণস্থল।৯

তোমার কৃপাকটাক্ষের লক্ষ লক্ষ লোক থাকা সত্ত্বেও ওগো ত্রিপুরসুন্দরী, আমার প্রতিও

ঈষৎপ্রভাবকলুষাঃ কতি নাম সন্তি ব্রহ্মাদয়ঃ প্রতিদিনং প্রলয়াভিভূতাঃ।
একঃ স এব জননি স্থিরসিদ্ধিরাস্তে যঃ পাদয়োস্তব সকৃৎ প্রণতিং করোতি।৩।
লব্ধ্বা সকৃৎত্রিপুরসুন্দরি তাবকীনং কারুণ্যকন্দলিতকান্তিভরং কটাক্ষম্।
কন্দর্পভাবসুভগাস্ত্বয়ি ভক্তিভাজঃ সংমোহয়ন্তি তরুণীর্ভুবনত্রয়েঽপি।৪।
হ্রীঁকারমেব তব নাম গৃণন্তি দেবা মাতস্ত্রিকোণনিলয়ে ত্রিপুরে ত্রিনেত্রে।
ত্বৎসংস্মৃতৌ যমভটাভিভবং বিহায় দীব্যন্তি নন্দনবনে সহ লোকপালৈঃ।৫।
হন্তুঃ পুরামধিগলং পরিপূর্যমানঃ ক্রূরঃ কথং ন ভবিতা গরলস্য বেগঃ।
নাশ্বাসনায় যদি মাতরিদং তবার্দ্ধং দেহস্য শশ্বদমৃতাপ্লুতশীতলস্য।৬।
সর্বজ্ঞতাং সদসি বাক্‌পটুতাং প্রসূতে দেবি ত্বদঙ্ঘ্রিসরসীরুহয়োঃ প্রণামঃ।
কিঞ্চ স্ফুরন্মুকুটমুজ্জ্বলমাতপত্রং দ্বে চামরে চ মহতীং বসুধাং দদাতি।৭।
কল্পদ্রুমৈরভিমতপ্রতিপাদনেষু কারুণ্যবারিধিভিরম্ব ভবৎকটাক্ষৈঃ।
আলোকয় ত্রিপুরসুন্দরি মামনাথং ত্বয্যেব ভক্তিভরিতং ত্বয়ি বদ্ধতৃষ্ণম্।৮।
হন্তেতরেষ্বপি নিধায় মনাংসি চান্যে ভক্তিং বহন্তি কিল পামরদৈবতেষু।
ত্বামেব দেবি মনসা সমনুস্মরামি ত্বামেব নৌমি শরণং জননি ত্বমেব।৯।

কিঞ্চিৎ কটাক্ষপাত কর। আমার মতো করুণার পাত্র কোনো ব্যক্তি জন্মায় নি, জন্মাবেও না, জন্মাচ্ছেও না।১০

ওগো ত্রিপুরাধিবাসিনী, যাঁরা তোমার হ্রীং হ্রীং এই বীজমন্ত্র প্রতিদিন জপ করেন তাঁদের পক্ষে দুর্লভ এ জগতে কি থাকতে পারে? সেই-সব মাননীয় ব্যক্তিরা মালা কিরীট মদমত্ত হস্তী প্রভৃতি লাভ করেন; মধুমতী লক্ষ্মী স্বয়ং তাঁদের সেবা করেন।১১

কমললোচনা মাগো, তোমার বন্দনা সম্পদ্ প্রদান করে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে আনন্দিত করে, সাম্রাজ্য প্রদান করে, পাপ দূর করে। শুধু আমিই যেন অবিরত তোমার বন্দনা করি, অন্যে নয়।১২

প্রলয়কালে খণ্ডপরশু পরভৈরব যে-তাণ্ডবনৃত্য করেছিলেন পাশ-অঙ্কুশ-ইক্ষুধনু-পুষ্পবাণ-ধারিণী মূর্তিতে একমাত্র তুমিই তা প্রত্যক্ষ করেছিলে। তোমার সেই প্রত্যক্ষকারিণী মূর্তির জয় হোক।১৩

মা, তোমার ত্রিকোণচিহ্নিত রূপ পরম-অমৃতসিক্ত, উজ্জ্বল কিরীট ও চন্দ্রকলারূপ-ভূষণযুক্ত, প্রচুর কুঙ্কুমলেপনে রক্তবর্ণ, তেজোময় তোমার এই রূপ সর্বদা আমার হৃদয়ে লগ্ন থাকুক।১৪

মা, হ্রীং-ত্রয়পুটিত মহৎ মন্ত্রের দ্বারা সন্দীপিত তোমার এই স্তব যে-মন্ত্রবিৎ সাধক তোমার সামনে পাঠ করেন রাজারা তাঁর বশীভূত হয়, লক্ষ্মী তাঁর কাছে চিরস্থায়িনী হন, তাঁর বাণী নির্মল কবিত্বপূর্ণ হয় এবং তাঁর যশ দীর্ঘস্থায়ী হয়।১৫

লক্ষ্যেষু সৎস্বপি তবাক্ষিবিলোকনানামালোকয় ত্রিপুরসুন্দরি মাং কথঞ্চিৎ।
নূনং ময়া চ সদৃশঃ করুণৈকপাত্রং জাতো জনিষ্যতি জনো ন চ জায়তে বা।১০।
হ্রীং হ্রীমিতি প্রতিদিনং জপতাং তবাখ্যাং কিং নাম দুর্লভমিহ ত্রিপুরাধিবাসে।
মালাকিরীটমদবারণমাননীয়াংস্তান্ সেবতে মধুমতী স্বয়মেব লক্ষ্মীঃ।১১।
সম্পৎকরাণি সকলেন্দ্রিয়নন্দনানি সাম্রাজ্যদানকুশলানি সরোরুহাক্ষি।
ত্বদ্বন্দনানি দুরিতাহরণোদ্যতানি মামেব মাতরনিশং কলয়ন্তু নান্যম্।১২।
কল্পোপসংহরণকল্পিততাণ্ডবস্য দেবস্য খণ্ডপরশোঃ পরভৈরবস্য।
পাশাঙ্কুশৈক্ষবশরাসনপুষ্পবাণা সা সাক্ষিণী বিজয়তে তব মূর্তিরেকা।১৩।
লগ্নং সদা ভবতু মাতরিদং ত্বদীয়ং তেজঃ পরং বহুলকুঙ্কুমপঙ্কশোণম্।
ভাস্বৎকিরীটমমৃতাংশুককলাবতংসং রূপং ত্রিকোণমুদিতং পরমামৃতাক্তম্।১৪।
হ্রীংকারত্রয়সংপুটেন মহতা মন্ত্রেণ সন্দীপিতং স্তোত্রং যঃ প্রতিবাসরং তব পুরো মাতর্জপেন্মন্ত্রবিৎ।
তস্য ক্ষোণিভুজো ভবন্তি বশগা লক্ষ্মীশ্চিরস্থায়িনী বাণী নির্মলসূক্তিভারভরিতা জাগর্তি দীর্ঘং যশঃ।১৫।

—প্রঃ বৃহ স্ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৫২৩-৫২৪

কবচ—সিদ্ধযামলে শ্রীবিদ্যা বা ষোড়শীর নিম্নলিখিত কবচটি বর্ণিত হয়েছে[১]—এই কবচের ঋষি দক্ষিণামূর্তি, ছন্দ পঙ্‌ক্তি, দেবতা ত্রিপুরসুন্দরী, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-সাধনে এর বিনিয়োগ।

ওগো সুরেশ্বরী, তোমার মন্ত্রে বাগ্‌ভব (ক এ ঈ ল হ্রীঁ), কামরাজ (হ স ক হ ল হ্রীঁ) এবং শক্তি (স ক ল হ্রীঁ) এই তিনটি কূট বা বীজ আছে। বাগ্‌ভব আমাকে শীর্ষে রক্ষা করুক, কামরাজ করুক হৃদয়ে, শক্তিবীজ সর্বদা আমাকে নাভি, গুহ্যদেশ ও পদদ্বয়ে রক্ষা করুক। ঐঁ-ক্লীঁ-সৌঃ-বীজরূপিণী কলা আমাকে সর্বসিদ্ধি লাভের জন্য রক্ষা করুন। হসৈং-হসকলহ্রীঃ-হসৌঃ-রূপিণী ভৈরবী আমাকে কণ্ঠদেশে রক্ষা করুন। সুন্দরী আমাকে নাভিদেশে এবং কামকলা সর্বদা শীর্ষে রক্ষা করুন। মহাত্রিপুরসুন্দরী আমাকে ভ্রূ ও নাসিকার মধ্যস্থলে রক্ষা করুন, সুভগা ললাটে এবং ভগা আমাকে কণ্ঠদেশে রক্ষা করুন। ভগোদয়া আমাকে হৃদয়ে, ভগসর্পিণী উদরে, ভগমালা নাভিদেশে এবং লিঙ্গে মনোভবা রক্ষা করুন। মহাদেবী রাজরাজেশ্বরী শিবা আমাকে গুহ্যদেশে, চৈতন্যরূপিণী জগদম্বিকা পদদ্বয়ে রক্ষা করুন। সর্বকার্যশুভঙ্করী নারায়ণী সর্বদেহে আমাকে রক্ষা করুন, ব্রহ্মাণী পূর্বে এবং বৈষ্ণবী দক্ষিণে রক্ষা করুন। বারাহী আমাকে পশ্চিমে রক্ষা করুন, মহেশ্বরী উত্তরে, কৌমারী অগ্নিকোণে এবং মহালক্ষ্মী নৈর্ঋতকোণে রক্ষা করুন। বায়ুকোণে আমাকে চামুণ্ডা রক্ষা করুন, ইন্দ্রাণী ঈশানকোণে, মাহামায়া জলে এবং সর্বমঙ্গলা পৃথিবীতে অর্থাৎ স্থলে রক্ষা করুন, বরদা আকাশে আর ভুবনেশ্বরী আমাকে সর্বত্র রক্ষা করুন।

দেবীর এই কবচ দেবতাদের কাছেও দুর্লভ। প্রাতে শয্যাত্যাগ করে শুচিপবিত্র ও সংযতমনা হয়ে এই কবচ পাঠ করতে হবে। এই কবচ যে পাঠ করবে তার আধি-ব্যাধি এবং কোনো ভয়—মারীভয় পাতকভয় প্রভৃতি কিছুই থাকবে না। সে দারিদ্র্যগ্রস্ত হবে না এবং মৃত্যুর বশীভূত হবে না। ওগো দেবী, সে শিবপুরে যাবে এ কথা তোমাকে সত্য বলছি। এই কবচ না জেনে যে শ্রীবিদ্যা জপ করে সে ফল পায় না, পায় অস্ত্রাঘাত।

---

১ কবচস্য ঋষির্দেবি দক্ষিণামূর্তিরব্যয়ঃ। ছন্দঃ পঙ্‌ক্তিঃ সমুদ্দিষ্টং দেবী ত্রিপুরসুন্দরী।
ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং বিনিয়োগশ্চ সাধনে।
বাগ্‌ভবঃ কামরাজশ্চ শক্তিবীজং সুরেশ্বরি! বাগ্‌ভবঃ পাতু শীর্ষে মাং কামরাজস্তথা হৃদি।
শক্তিবীজং সদা পাতু নাভৌ গুহ্যে চ পাদয়োঃ। ঐঁ ক্লীঁ সৌর্বদনে পাতু বালা মাং সর্বসিদ্ধয়ে।
হসৈং হসকলহ্রীং হসৌঃ পাতু ভৈরবী কণ্ঠদেশতঃ। সুন্দরী নাভিদেশেঽব্যাচ্ছীর্ষে কামকলা সদা।
ভ্রূনাসয়োরন্তরালে মহাত্রিপুরসুন্দরী॥ ললাটে সুভগা পাতু ভগা মাং কণ্ঠদেশতঃ।
ভগোদয়া তু হৃদয়ে উদরে ভগসর্পিণী। ভগমালা নাভিদেশে লিঙ্গে পাতু মনোভবা।
গুহ্যে পাতু মহাদেবী রাজরাজেশ্বরী শিবা। চৈতন্যরূপিণী পাতু পাদয়োর্জগদম্বিকা।

ভুবনেশ্বরী—কুব্জিকাতন্ত্রের মতে ভুবনসমূহের পালন করেন বলে সৃষ্টিস্থিতিকারিণী দেবীকে ভুবনেশ্বরী বলা হয়।[১]

মন্ত্র—ভুবনেশ্বরীর একাক্ষর মন্ত্র হ্রীঁ। সিদ্ধিকামী ব্যক্তিরা এই বীজমন্ত্রের সেবা করেন।[২] হ্রীঁ মায়া বীজ। ভুবনেশ্বরীপারিজাতে বলা হয়েছে মায়া বীজের সমান মন্ত্র হয় নি, হবেও না।[৩]

এ ছাড়া আছে দেবীর বিবিধ ত্র্যক্ষর মন্ত্র। যথা ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ। এই মন্ত্রের সাধনায় ত্রিবর্গফললাভ হয়।[৪]

অন্য একটি মন্ত্র—ঐঁ হ্রীঁ ঐঁ।[৫] আরেকটি আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ। এর প্রথম বীজ অর্থাৎ 'আঁ'কে বলা হয় পাশ আর অন্ত্যবীজ অর্থাৎ ক্রোঁকে বলা হয় অঙ্কুশ। এই মন্ত্রের সাধনার দ্বারা সমস্ত বশীভূত করা যায়।[৬]

আবার দেবীর একাক্ষর মন্ত্রের সঙ্গে বাক্‌শ্রীবীজ, শ্রীকামবীজ, কামশ্রীবীজ[৭] ইত্যাদি পুটিত[৮] করেও মন্ত্র হয়।

ধ্যান—মন্ত্র অনুসারে ধ্যান হয়। কাজেই দেবীর বিভিন্ন মন্ত্রের বিভিন্ন ধ্যান। যেমন—

হ্রীঁ-মন্ত্রের ধ্যান—দেবী ভুবনেশ্বরী উদীয়মান সূর্যের মতো প্রভাময়ী ; তাঁর চন্দ্রকিরীট।

নারায়ণী সর্বগাত্রে সর্বকার্যে শুভঙ্করী। ব্রহ্মাণী পাতু মাং পূর্বে দক্ষিণে বৈষ্ণবী তথা॥
পশ্চিমে পাতু বারাহী উত্তরে তু মহেশ্বরী। আগ্নেয্যাং পাতু কৌমারী মহালক্ষ্মীশ্চ নৈর্ঋতে॥
বায়ব্যাং পাতু চামুণ্ডা ইন্দ্রাণী পাতু ঈশকে। জলে পাতু মহামায়া পৃথিব্যাং সর্বমঙ্গলা।
আকাশে পাতু বরদা সর্বত্র ভুবনেশ্বরী।
ইদন্তু কবচং দেব্যা দেবানামপি দুর্লভম্। পঠেৎ প্রাতঃ সমুত্থায় শুচিঃ প্রযতমানসঃ॥
নাধয়ো ব্যাধয়স্তস্য ন ভয়ঞ্চ কচিদ্ভবেৎ। ন চ মারীভয়ং তস্য পাতকানাং ভয়ং তথা॥
ন দারিদ্র্যবশং গচ্ছেত্তিষ্ঠেন্মৃত্যুবশে ন চ। গচ্ছেচ্ছিবপুরং দেবি সত্যং সত্যং বদামি তে।
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা শ্রীবিদ্যাং যো জপেৎ প্রিয়ে। স নাপ্নোতি ফলং তস্য প্রাপ্নুয়াচ্ছস্ত্রঘাতনম্॥

—দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৫২৬-৫২৭

১ ভুবনানাং পালনত্বাদ্ভুবনেশী প্রকীর্তিতা। সৃষ্টিস্থিতিকরী দেবী ভুবনেশী প্রকীর্তিতা।
—দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৫, পরিঃ ৬, ব সং, পৃঃ ৩৭৪

২ দ্রঃ শা তি ৯।২

৩ মায়াবীজসমো মন্ত্রো ন ভূতো ন ভবিষ্যতি।—দ্রঃ ঐ, টীকা

৪ দ্রঃ শা তি ৯।৫৮ ৫ ঐ ৯।৬৭

৬ অনন্তো বিন্দুসংযুক্তো মায়া ব্রহ্মাগ্নিতারবান্। পাশাদিত্র্যক্ষরো মন্ত্রঃ সর্ববশ্যকরঃ প্রভুঃ।—শা তি ৯।৮০

৭ ঐঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ঐঁ শ্রীঁ, শ্রীঁ ক্লীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ, ক্লীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ শ্রীঁ।—শা তি ৯।২-এর টীকা।

৮ কোনো মন্ত্রকে কোনো বীজের দ্বারা পুটিত করা অর্থ সেই মন্ত্রের আদিতে ও অন্তে সেই বীজ যোগ করা।

তিনি উন্নতস্তনী ত্রিনয়না স্মিতহাস্যমুখী। দেবীর বামদিকের নীচের হাতে বরমুদ্রা, উপরের হাতে পাশ এবং ডানদিকের উপরের হাতে অঙ্কুশ ও নীচের হাতে অভয়মুদ্রা।[১]

ঐঁ-হ্রীঁ-শ্রীঁ-মন্ত্রের ধ্যান—দেবীর মূর্তি সিন্দূরের মতো রক্তবর্ণ। তিনি ত্রিনয়না। তাঁর মাথায় মাণিক্যকিরীট ; উজ্জ্বল চন্দ্র তাঁর শিরোভূষণ। তিনি স্মিতহাস্যমুখী, পীনস্তনী। দেবীর হাতে মণিরত্নপূর্ণ চষক আর রক্তপদ্ম। রত্নঘটের উপর দেবীর দক্ষিণপদ। এইরূপে সৌম্যমূর্তি জননী পরাশক্তির ধ্যান করবে।[২]

ঐঁ-হ্রীঁ-ঐঁ-মন্ত্রের ধ্যান—দেবী শ্যামাঙ্গী শশিশেখরা। তাঁর হাতে বরমুদ্রা রক্তপদ্ম রত্নাঢ্য উত্তম চষক ও অভয়মুদ্রা। মুক্তাহারশোভিত তাঁর স্তন। সেই স্তনভারে তিনি ঈষৎ অবনতা। রক্তপদ্মস্থা ত্রিনয়না সুরপূজিতা হরবধূকে আমি বন্দনা করি।[৩]

আঁ-হ্রীঁ-ক্রোঁ-মন্ত্রের ধ্যান—কমলাসনস্থা দেবীর হাতে বরমুদ্রা অঙ্কুশ পাশ এবং অভয়মুদ্রা। কোটিতরুণসূর্যের মতো প্রভাময়ী ত্রিনয়না সেই আদ্যা ভুবনেশ্বরীর আমি ভজনা করি।[৪]

ভৈরবী—কুব্জিকাতন্ত্রের মতে ভৈরবী দুঃখসংহর্ত্রী, যমদুঃখবিনাশিনী। কালভৈরবের ভার্যা বলে তাঁকে ভৈরবী বলা হয়।[৫]

রামেশ্বর পরশুরামকল্পসূত্রের বৃত্তিতে ভৈরবীশব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন—জগতের ভরণ অর্থাৎ পালন, রমণ অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদি কেলি এবং বমন অর্থাৎ প্রলয়কালে যা পরমশিবকুক্ষিস্থিত থাকে সৃষ্টিকালে তার উদ্‌গীরণ করেন বলে দেবীকে ভৈরবী বলা হয়।[৬]

---

১ উদ্যদ্দিনদ্যুতিমিন্দুকিরীটাং তুঙ্গকুচাং নয়নত্রয়যুক্তাম্।
স্মেরমুখীং বরদাঙ্কুশপাশাভীতিকরাং প্রভজে ভুবনেশীম্।—শা তি ৯।১৪

২ সিন্দূরারুণবিগ্রহাং ত্রিনয়নাং মাণিক্যমৌলিস্ফুরত্তারানায়কশেখরাং স্মিতমুখীমাপীনবক্ষোরুহাম্।
পাণিভ্যাং মণিরত্নপূর্ণচষকং রক্তোৎপলং বিভ্রতীং সৌম্যাং রত্নঘটস্থসব্যচরণাং ধ্যায়েৎ পরামম্বিকাম্।
—ঐ ৯।৬০

৩ শ্যামাঙ্গীং শশিশেখরাং নিজকরৈর্দানং চ রক্তোৎপলং
রত্নাঢ্যং চষকং পরং ভয়হরং সংবিভ্রতীং শাশ্বতীম্।
মুক্তাহারলসৎপয়োধরনতাং নেত্রত্রয়োল্লাসিনীং
বন্দেঽহং সুরপূজিতাং হরবধূং রক্তারবিন্দস্থিতাম্।—ঐ ৯।৬৯

৪ বরাঙ্কুশৌ পাশমভীতিমুদ্রাং করৈর্বহন্তীং কমলাসনস্থাম্।
বালার্ককোটিপ্রতিমাং ত্রিনেত্রাং ভজেঽহমাদ্যাং ভুবনেশ্বরীং তাম্।—শা তি ৯।৮১

৫ ভৈরবী দুঃখসংহর্ত্রী যমদুঃখবিনাশিনী। কালভৈরবভার্যা চ ভৈরবী পরিকীর্তিতা।
ত্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৫, পরিঃ ৬, ব সং, পৃঃ ৩৭৪

৬ ভৈরবীশব্দার্থশ্চ জগতো ভরণাদ্রমণাৎ প্রলয়ে পরমশিবকুক্ষিস্থিতস্য সৃষ্টিসময়ে বমনাচ্চ ভৈরবীতি জ্ঞেয়ম্।
—প ক সূ ১।২-এর বৃত্তি

বিবিধ রূপ—ভৈরবীর বিবিধ রূপ। তন্ত্রশাস্ত্রে ত্রিপুরভৈরবী চৈতন্যভৈরবী ভুবনেশ্বরী-ভৈরবী সম্পৎপ্রদা-ভৈরবী ষট্‌কূটা-ভৈরবী রুদ্রভৈরবী অন্নপূর্ণাভৈরবী প্রভৃতি ভৈরবীর মন্ত্র-ধ্যানাদি বিবৃত হয়েছে।[১]

ত্রিপুরভৈরবী— সুন্দরীস্তবে বলা হয়েছে— ব্রাহ্মী রৌদ্রী এবং বৈষ্ণবী এই তিন শক্তি যাঁর পুর অর্থাৎ শরীর তাঁকে ত্রিপুরা বলা হয়।[২]

প্রপঞ্চসারে আছে—দেবী অম্বিকা ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব এই ত্রিমূর্তি সৃষ্টি করেছেন বলে এই ত্রিমূর্তির পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন বলে সৃষ্টির পূর্বে ত্রয়ীময়ী বলে এবং প্রলয়কালে ত্রিলোক পূর্ণ করে অবস্থান করেন বলে তাঁর নাম হয়েছে ত্রিপুরা।[৩]

মন্ত্র— শারদাতিলকে দেবীর এই মন্ত্রটি দেওয়া হয়েছে— হস্রৈঁ-হসকলীঁ-হস্রৌঃ। এই মন্ত্রের প্রথম বীজকে (হস্রৈঁ) বাগ্‌ভবকূট, দ্বিতীয় বীজকে (হসকলীঁ) কামরাজকূট এবং তৃতীয় বীজকে (হস্রৌঃ) শক্তিকূট বলা হয়। হ স ক ল র এই পঞ্চব্যঞ্জনবর্ণ থাকার জন্য এই বিদ্যা পঞ্চকূটাত্মিকা। এঁকে ত্রিপুরভৈরবী বলা হয়।[৪]

ধ্যান—সহস্র উদীয়মান সূর্যের মত দেবীর কান্তি। তাঁর পরিধানে রক্তবর্ণ ক্ষৌম বস্ত্র; গলায় মুণ্ডমালা। দেবীর পয়োধর রক্তচন্দনলিপ্ত। তাঁর করপদ্মে জপবটী শাস্ত্রগ্রন্থ অভয়মুদ্রা ও বরমুদ্রা। ত্রিনয়না দেবীর মুখে পদ্মের শ্রী, রত্নমুকুটে চন্দ্রকলাসংলগ্ন। মৃদুহাসিনী দেবীর বন্দনা করি।[৫]

চৈতন্যভৈরবী

মন্ত্র—জ্ঞানার্ণবতন্ত্রে সাংকেতিকভাষায় যে-মন্ত্রটি দেওয়া হয়েছে তা উদ্ধার করলে পাওয়া যায় সহৈঁ-সকলহ্রীঁ-সহ্রৌঃ। এই বিদ্যাকে বলা হয় ত্রৈলোক্যমাতৃকা।[৬]

১ দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ২২০-২৩৯

২ ব্রাহ্মী রৌদ্রী বৈষ্ণবীতি শক্তয়স্তিস্র এব হি।
পুরং শরীরং যস্যা সা ত্রিপুরেতি প্রকীর্তিতা।—দ্রঃ পু চ, তঃ ১, পৃঃ ২০

৩ ত্রিমূর্তিসর্গাচ্চ পুরাভবত্বাৎ ত্রয়ীময়ত্বাচ্চ পুরৈব দেব্যাঃ।
লয়ে ত্রিলোক্যা অপি পূরণত্বাৎ প্রায়োঽম্বিকায়াস্ত্রিপুরেতি নাম।—প্র সা ত ৭।২

৪ দ্রঃ শা তি ১২।৩-৫

৫ উদ্যদ্ভানুসহস্রকান্তিমরুণক্ষৌমাং শিরোমালিনীং
রক্তালিপ্তপয়োধরাং জপবটীং বিদ্যামভীতিং বরম্।
হস্তাব্জৈর্দধতীং ত্রিনেত্রবিলসদ্বক্ত্রারবিন্দশ্রিয়ং
দেবীং বদ্ধহিমাংশুরত্নমুকুটাং বন্দে সমন্দস্মিতাম্।—শা তি ১২।৩১

৬ দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ২২৮

ধ্যান—মেরুতন্ত্রে দেবী চৈতন্যভৈরবীর এই ধ্যানটি পাওয়া যায়—দেবী সহস্র উদীয়মান সূর্যের মতো প্রভাশালিনী, নানা অলঙ্কারভূষিতা। তাঁর মুকুটোর্ধ্বে চন্দ্ররেখা শোভমানা, পরিধানে রক্তাম্বর। দেবী নিত্যা, তিনি কপালিনী। তাঁর বামহস্তে পাশ ও অঙ্কুশ, দক্ষিণহস্তে বরমুদ্রা ও অভয়মুদ্রা। তিনি পীনোন্নতঘনস্তনী। এই প্রকারে ধ্যান করে পূর্বসিংহাসনে অধিষ্ঠিতা দেবীর পূজা করতে হবে।[1]

ভুবনেশ্বরী-ভৈরবী

মন্ত্র—জ্ঞানার্ণবতন্ত্রে ভুবনেশ্বরী-ভৈরবীর এই মন্ত্রটি দেওয়া হয়েছে—হসৈঁ-হসকলহ্রীঁ-হসৌঃ।[2]

ধ্যান—মেরুতন্ত্রে দেবীর এই ধ্যানটি বর্ণিত হয়েছে—ভুবনেশ্বরী-ভৈরবী জবাকুসুমের মতো দাড়িম্বকুসুমের মতো বর্ণবিশিষ্টা। তাঁর মস্তকে জটাজুট, তাতে চন্দ্রকলা শোভা পাচ্ছে। দেবী ত্রিনেত্রা। তাঁর পরিধানে রক্তবস্ত্র, অঙ্গ নানা-অলঙ্কারে সুন্দর। তিনি পীনোন্নতস্তনী। তাঁর হাতে পাশ অঙ্কুশ বরমুদ্রা ও অভয়মুদ্রা। এমনি মঙ্গলময়ী দেবীর আশ্রয় গ্রহণ করি।[3]

সম্পৎপ্রদা-ভৈরবী—জ্ঞানার্ণবতন্ত্রে বলা হয়েছে—ত্রিপুরা-বালা যেমন তেমনি ত্রিপুর-ভৈরবী। তার নাম সম্পৎপ্রদা।[4]

মন্ত্র—সম্পৎপ্রদা-ভৈরবীর মন্ত্র এবং ত্রিপুরভৈরবীর মন্ত্র একই বলা যায়। ত্রিপুরভৈরবী মন্ত্রের তৃতীয় কূটের বিসর্গ বাদ দিলেই সম্পৎপ্রদা-ভৈরবীমন্ত্র পাওয়া যায়। তা হলে মন্ত্রটি দাঁড়ায়—হস্রৈঁ হসকল্রীঁ-হস্রৌঁ।[5]

ধ্যান—সম্পৎপ্রদা-ভৈরবীর ধ্যানে বলা হয়েছে—দেবী রক্তবর্ণ সহস্রসূর্যের মতো প্রভাশালিনী, তাঁর জটায় উজ্জ্বল চন্দ্রকলা, রত্নমুকুটে নানাবর্ণের অপূর্ব মুক্তাবলী শোভা পাচ্ছে,

১ উদ্যদ্ভানুসহস্রাভাং নানালঙ্কারভূষিতাম্। মুকুটোর্ধ্বলসচ্চন্দ্ররেখাং রক্তাম্বরাঙ্কিতাম্।
পাশাঙ্কুশধরাং নিত্যাং বামহস্তকপালিনীম্। বরদাভয়শোভাঢ্যাং পীনোন্নতঘনস্তনীম্।
এবং ধ্যাত্বা যজেদ্দেবীং পূর্বসিংহাসনে স্থিতাম্।—দ্রঃ পু চ, তরঙ্গ ৯, পৃঃ ৮০৯-১০

২ দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ২৩৪

৩ জপাকুসুমসঙ্কাশাং দাড়িমীকুসুমপ্রভাম্। চন্দ্ররেখাজটাজূটাং ত্রিনেত্রাং রক্তবাসসাম্।
নানালঙ্কারসুভগাং পীনোন্নতঘনস্তনীম্। পাশাঙ্কুশবরাভীতীর্দধানাং চ শিবাং শ্রয়ে।
—দ্রঃ পু চ, তঃ ৯, পৃঃ ৮১০

৪ যথেয়ং ত্রিপুরা বালা তথা ত্রিপুরভৈরবী। সম্পৎপ্রদা নাম তস্যাঃ শৃণু নির্জরমানসে।
দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ২২৭

৫ দ্রঃ ঐ

গলদেশে গলিতরুধিরলিপ্ত মুণ্ডমালা। দেবী নয়নত্রয়শোভিতা পূর্ণেন্দুবদনা। তাঁর পীনোন্নত-দৃঢ়স্তনের উপরে লতার মতো মুক্তাহার শোভা পাচ্ছে। দেবী যৌবনোন্মত্তরূপিণী। তাঁর পরিধানে রক্তাম্বর, বামহস্তদ্বয়ে পুস্তক ও অভয়মুদ্রা এবং দক্ষিণহস্তদ্বয়ে অক্ষমালা ও বরমুদ্রা। বরদানরতা নিত্যা মহাসম্পৎপ্রদা দেবীকে স্মরণ করি।[১]

ষট্‌কূটা-ভৈরবী

মন্ত্র—জ্ঞানার্ণব তন্ত্রে দেবীর যে-মন্ত্রটি দেওয়া হয়েছে তা উদ্ধার করলে পাওয়া যায়—ডরলকসহৈঁ ডরলকসহীঁ ডরলকসহৌঁ।[২]

এই মন্ত্রে বা বিদ্যায় আছে ছটি ব্যঞ্জনবর্ণ। এই জন্যই এই বিদ্যার নাম হয়েছে ষট্‌কূটা-ভৈরবী।

ধ্যান—তন্ত্রান্তরে দেবীর এই ধ্যানটি বর্ণিত হয়েছে—দেবী ষটকূটা-ভৈরবী বালসূর্য ও জবাকুসুমের বর্ণবিশিষ্টা। গলায় মুণ্ডমালার জন্য তিনি রম্যা। তাঁর পরিধানে বালসূর্যবর্ণের বস্ত্র। সুবর্ণকলসের মতো তাঁর পীনোন্নতপয়োধর। দেবী হস্তে পাশ অঙ্কুশ পুস্তক ও জপমালা ধারণ করে আছেন।[৩]

রুদ্রভৈরবী

মন্ত্র— জ্ঞানার্ণবতন্ত্রোক্ত রুদ্রভৈরবীর মন্ত্রটি এই— হসখফ্রেঁ হসকৃ্রীঁ হসৌঃ।[৪]

ধ্যান—উক্ত তন্ত্রে দেবীর নিম্নলিখিত ধ্যানটি বর্ণিত হয়েছে[৫]—চন্দ্রচূড়া ত্রিলোচনা দেবী রুদ্রভৈরবী সহস্র উদীয়মান্ সূর্যের মতো প্রভাময়ী, নানা-অলঙ্কারভূষিতা। তিনি সমস্ত শত্রু বিনাশ করেন। তাঁর কণ্ঠে মুণ্ডমালা, তার থেকে রক্ত ঝরছে। দেবীর পরিধানে রক্তবস্ত্র,

---

১ আতাম্রার্কসহস্রাভাং স্ফুরচ্চন্দ্রকলাজটাম্। কিরীটরত্নবিলসচ্চিত্রচিত্রিতমৌক্তিকাম্।
গলদ্রুধিরপঙ্কাঢ্যমুণ্ডমালাবিরাজিতাম্। নয়নত্রয়শোভাঢ্যাং পূর্ণেন্দুবদনান্বিতাম্।
মুক্তাহারলতারাজৎপীনোন্নতঘনস্তনীম্। রক্তাম্বরপরীধানাং যৌবনোন্মত্তরূপিণীম্।
পুস্তকং চাভয়ং বামে দক্ষিণে চাক্ষমালিকাম্। বরদানরতাং নিত্যাং মহাসম্পৎপ্রদাং স্মরেৎ।

—দ্রঃ পু চ, পৃঃ ৮১১-৮১২

২ দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৮১২

৩ বালসূর্যপ্রভাং দেবীং জবাকুসুমসন্নিভাম্। মুণ্ডমালাবলীরম্যাং বালসূর্যসমাংশুকাম্।
সুবর্ণকলসাকারপীনোন্নতপয়োধরাম্। পাশাঙ্কুশৌ পুস্তকঞ্চ তথা চ জপমালিকাম্।
দধতীমিতি দেবেশ।—দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ২৩১

৪ দ্রঃ পু চ, অঃ ৯, পৃঃ ৮১৩

৫ উদ্যদ্ভানুসহস্রাভাং চন্দ্রচূড়াং ত্রিলোচনাম্। নানালঙ্কারভূষাঢ্যাং সর্ববৈরিনিকৃন্তনীম্।
বমদ্রুধিরমুণ্ডালীকলিতাং রক্তবাসসীম্। ত্রিশূলং ডমরুং খড্গং তথা খেটকমেব চ।
পিনাকং চ শরান্ দেবীং পাশাঙ্কুশযুগং ক্রমাৎ। পুস্তকং চাক্ষমালাং চ শিবসিংহাসনস্থিতাম্।—দ্রঃ ঐ

তাঁর হস্তে ত্রিশূল ডমরু খড়্গ খেটক পিনাক শর পাশ অঙ্কুশ পুস্তক ও অক্ষমালা। ইনি শিবসিংহাসনে অধিষ্ঠিতা। লক্ষণীয় রুদ্রভৈরবী দশভুজা।

অন্নপূর্ণাভৈরবী

মন্ত্র— অন্নপূর্ণাভৈরবীর দুটি মন্ত্র বিশেষ প্রচলিত, একটি বিংশাক্ষর, অপরটি ঊনবিংশাক্ষর। বিংশাক্ষর, যথা—ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা। এই মন্ত্রের থেকে কামবীজ অর্থাৎ ক্লীঁ বাদ দিলেই ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা এই ঊনবিংশাক্ষর মন্ত্র পাওয়া যায়।[১]

ধ্যান— জ্ঞানার্ণবে দেবীর এই ধ্যানটি আছে— অন্নপূর্ণাভৈরবী তপ্তকাঞ্চনবর্ণা। নবোদিত চন্দ্রকলা তাঁর শিরোভূষণ, নবরত্নের প্রভায় উজ্জ্বল তাঁর মুকুট। তিনি কুঙ্কুমের মতো রক্তবর্ণা। বিচিত্র বস্ত্র তাঁর পরিধানে। তিনি সফরাক্ষী, ত্রিলোচনা। সুবর্ণকলসের মতো তাঁর পীনোন্নতপয়োধর। দুগ্ধধবল পঞ্চবক্ত্র ত্রিলোচন প্রসন্নবদন নীলকণ্ঠ কপর্দী উজ্জ্বলসর্পভূষণ কুন্দকুসুমসন্নিভ শম্ভুকে অবিরাম নৃত্যশীল দেখে পরা দেবী আনন্দময়ী হৃষ্টা। তাঁর সানন্দ মুখ ও চঞ্চল চক্ষু, নিতম্বের উপর মেখলা শোভা পাচ্ছে। দেবী নিত্যা অন্নদানরতা, ভূমি ও শ্রীর দ্বারা অলঙ্কৃতা।[২]

ছিন্নমস্তা—নারদপঞ্চরাত্রে[৩] ছিন্নমস্তার এই উদ্ভবকাহিনী বর্ণিত হয়েছে—একদিন দেবী পার্বতী তাঁর ডাকিনী ও বর্ণিনী নামক দুই সখীর সঙ্গে মন্দাকিনীতে স্নান করতে যান। স্নানের পর সখী দুজন ক্ষুধার্ত হয়ে দেবীর কাছে খাদ্য চান। দেবী তাঁদের ক্ষণকাল অপেক্ষা করতে বলেন। ক্ষণকাল পরেই তাঁরা আবার বলেন—আমাদের খেতে দাও। তুমি সর্বজগতের মা। শিশু যা চাইবার মায়ের কাছেই চায়। মা সকলকে অন্নবস্ত্রাদি দেন। এইজন্যই ওগো করুণাময়ী, তোমার কাছে আমরা ভক্ষ্য প্রার্থনা করছি।[৪]

---

১ দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ২৩৮

২ তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং বালেন্দুকৃতশেখরাম্। নবরত্নপ্রভাদীপ্তমুকুটাং কুঙ্কুমারুণাম্।
চিত্রবস্ত্রপরীধানাং সফরাক্ষীং ত্রিলোচনাম্। সুবর্ণকলসাকারপীনোন্নতপয়োধরাম্।
গোক্ষীরধামধবলং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিলোচনম্। প্রসন্নবদনং শম্ভুং নীলকণ্ঠবিরাজিতম্।
কপর্দিনং স্ফুরৎসর্পভূষণং কুন্দসন্নিভম্। নৃত্যান্তমনিশং হৃষ্টং দৃষ্ট্বানন্দময়ীং পরাম্।
সানন্দমুখলোলাক্ষীং মেখলাঢ্যনিতম্বিনীম্। অন্নদানরতাং নিত্যাং ভূমিশ্রীভ্যামলঙ্কৃতাম্।
—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ২৩৯

৩ দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৫, পরিঃ ৬, ৫ সং, পৃঃ ৩৭৮-৩৭৯

৪ মাতা ত্বং সর্বজগতাং মাতরং প্রার্থয়েচ্ছিশুঃ। মাতা দদাতি সর্বেষাং ভোজনাচ্ছাদনাদিকম্।
অতস্ত্বাং প্রার্থয়ে ভক্ষ্যং ভক্ষ্যার্থং করুণাময়ি।—ঐ

দেবী তাঁদের মধুর কথা শুনে বলেন বাড়ী গিয়ে তোমাদের খেতে দেব। কিন্তু তাঁরা ক্ষুধায় অত্যন্ত পীড়িত হয়ে আবার প্রার্থনা করেন—বাঞ্ছিতদাত্রী ওগো জগন্মাতা, যাতে আমাদের তৃপ্তি হয় এমন ভক্ষ্য আমাদের দাও।

তাঁদের এই কথা শুনে কৃপাময়ী দেবী বাম নখাগ্রের দ্বারা স্বীয় মস্তক ছেদন করলেন। ছিন্ন হওয়ামাত্র মুণ্ড দেবীর বাম হস্তে পড়ে আর তাঁর কণ্ঠ থেকে তিনটি রক্তধারা নিঃসৃত হয়। একটি ধারা যায় বাম দিকে, তিনি এটি দেন ডাকিনীর মুখে; অন্যধারা যায় ডান দিকে, তিনি এটি দেন বর্ণিনীর মুখে; আর মধ্যধারা দেন নিজের মুখে। সেখানে এমনি কাজ করে তাঁরা যেমন এসেছিলেন তেমনি চলে গেলেন। দেবীর মুণ্ড ছিন্ন হয়ে যাওয়ার জন্য তিনি ছিন্নমস্তা নামে পরিচিতা হলেন।[১]

স্বতন্ত্রতন্ত্রেও অনুরূপ বিবরণ পাওয়া যায়।[২]

প্রচণ্ডচণ্ডিকা—ছিন্নমস্তাকে প্রচণ্ডচণ্ডিকাও বলা হয়। তন্ত্রে দেবীর মাহাত্ম্য এইভাবে কীর্তন করা হয়েছে— সর্বকামফলপ্রদা প্রচণ্ডচণ্ডিকার প্রসাদমাত্র লাভ করলে মানুষ শিব হয়ে যায়; পুত্রহীন পুত্রলাভ করে, ধনহীন ধনলাভ করে আর দেবীভক্ত কবিত্ব ও উত্তম পাণ্ডিত্য লাভ করে সন্দেহ নাই।[৩]

মন্ত্র—বিশ্বসারতন্ত্র ও যামলে ছিন্নমস্তার এই ষোড়শাক্ষরী বিদ্যা বর্ণিত হয়েছে— শ্রীঁ ক্লীঁ হ্রীঁ বজ্রবৈরোচনীয়ে হ্রীঁ হ্রীঁ ফট্ স্বাহা। বলা হয়েছে শ্রীঁ আদিতে থাকলে এই বিদ্যা সর্বতোমুখী শ্রী প্রদান করেন; ক্লীঁ আদিতে থাকলে এই বিদ্যার প্রভাবে নারীরা বশীভূত হয়; হ্রীঁ আদিতে থাকলে এই বিদ্যা মহাপাতক নাশ করেন আর ঐঁ আদিতে থাকলে মুক্তি প্রদান করেন।[৪]

১ নখাগ্রেণ চ চিচ্ছেদ বামেন স্বশিরস্তদা। ছিন্নমাত্রন্তু তচ্ছীর্ষং বামহস্তে পপাত চ।
কণ্ঠাদ্বিনিঃসৃতং রক্তং ত্রিধারেণ তপোধন। বামদক্ষিণভেদেন যে ধারে চ বিনির্গতে।
সখীমুখে তু সংযোজ্য মধ্যধারাং স্বকাননে। এবং কৃত্বা তু তাস্তত্র গতাঃ সর্বা যথাগতম্।
ছিন্নং তস্যা যতো মুণ্ডং ছিন্নমস্তা ততঃ স্মৃতা।—দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৫, পরিঃ ৬, ব সং, পৃঃ ৩১৮-১৯

২ দ্রঃ ঐ

৩ প্রচণ্ডচণ্ডিকাং বক্ষ্যে সর্বকামফলপ্রদাম্। যস্যাঃ প্রসাদমাত্রেণ শিব এব ভবেন্নরঃ।
অপুত্রো লভতে পুত্রমধনো ধনবান্ ভবেৎ। কবিত্বং চ সুপাণ্ডিত্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ।
দ্রঃ পু চ, তরঙ্গ ৯, পৃঃ ৮১৩-১৪

৪ লক্ষ্মীং লজ্জাং ততো মায়াং মায়াবামশিকামথ। বজ্রবৈরোচনীয়ে চ মায়ে ফট্ স্বাহয়া যুতে।
লক্ষ্মীবীজং যদা আগ্রং তদা তস্যা শ্রীঃ সর্বতোমুখী। লজ্জাবীজেন চাগ্রেণ বশ্যতাং যান্তি যোষিতঃ।
মায়াবীজেন চাগ্রেন মহাপাতকনাশনম্। মায়াবামশিকাবীজমাদ্যং ভবাম্বুক্তিপ্রদায়কম্।
দ্রঃ পু চ, তঃ ৯, পৃঃ ৮১৪

এখানে লজ্জা বলতে কামবীজ বুঝাচ্ছে।—দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ সং, পৃঃ ২৯৭

এই ষোড়শাক্ষরী বিদ্যার আদিতে ওঁ যোগ করলে পাওয়া যায় ওঁ শ্রীঁ ক্লীঁ হ্রীঁ ঐঁ বজ্রবৈরোচনীয়ে হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা এই সপ্তদশাক্ষরীবিদ্যা। এই বিদ্যা ভুক্তিমুক্তিপ্রদা।[১]

মহাকালসংহিতায় ছিন্নমস্তার আরেকটি বিদ্যা বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে এই দেবীর চেয়ে উগ্রতরা আর কেউ নেই। সেইজন্য অসক্ত ব্যক্তির পক্ষে এই বিদ্যা গ্রহণ করা উচিত নয়। এই বিদ্যায় হয় সিদ্ধি, না হয় মৃত্যু, এই দুটোর একটা হবেই। বিদ্যাটি এই— ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ঐঁ বজ্রবৈরোচনীয়ে হুঁ হুঁ ফট্ স্বাহা।[২]

ছিন্নমস্তার অন্যান্য মন্ত্রও আছে।[৩]

ধ্যান— দেবীর একাধিক ধ্যান আছে। তবে নিম্নোক্ত ধ্যানটি সমধিক প্রসিদ্ধ। কেন না একাধিক নিবন্ধগ্রন্থে এটি উদ্ধৃত হয়েছে। যথা— স্বীয় নাভিতে শুভ্র বিকসিত শ্বেতপদ্ম ধ্যান করতে হবে। সেই পদ্মের কোষমধ্যে জবাকুসুমের মতো এবং বন্ধুকপুষ্পের মতো রক্তবর্ণ সূর্যমণ্ডল। সেই মণ্ডল সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই ত্রিরেখ যোনিমণ্ডলের মতো। তার মধ্যে কোটিসূর্যের প্রভাশালিনী মহাদেবী ছিন্নমস্তা বিরাজিতা। তিনি বামহস্তে স্বীয় মস্তক ধারণ করে আছেন। তাঁর মুখ বিস্তৃত, জিহ্বা উগ্র ও লেলিহান। তিনি ভয়ংকরী। দেবী নিজকণ্ঠনিঃসৃত রক্তধারা পান করছেন। দেবীর কেশপাশ আলুলায়িত। তিনি নানা পুষ্পে শোভিতা। তাঁর দক্ষিণহস্তে কর্ত্রিকা। তিনি মুণ্ডমালাবিভূষিতা। দেবী দিগম্বরী, অতি-ভয়ংকরী, প্রত্যালীঢ়পদে অবস্থিতা। তিনি অস্থিমালাধারিণী। তাঁর গলায় নাগের যজ্ঞোপবীত। পীনোন্নতপয়োধরা দেবী সর্বদা ষোড়শবর্ষীয়া। দেবীর অঙ্গে নাগের অঙ্গদ নাগের কাঞ্চী নাগের নূপুর এবং নাগের কুণ্ডল। তিনি অষ্টনাগসমন্বিতা। বিপরীতরতিনিরত রতিকামের উপর অধিষ্ঠিতা। দেবীর বামে ডাকিনী আর দক্ষিণে বর্ণিনী। এইজন্য দক্ষিণে বর্ণিনীর এবং বামে ডাকিনীর ধ্যান করতে হবে। বর্ণিনী লোহিতশ্যামা মুক্তকেশী দিগম্বরী। তাঁর বামহস্তে কপাল এবং দক্ষিণহস্তে কর্ত্রিকা। তিনি দেবী ছিন্নমস্তার গলদেশনির্গত রক্তধারা পান করছেন। বর্ণিনীও অস্থিমালাধারিণী এবং এঁরও গলায় নাগের যজ্ঞোপবীত। দেবীর বামপার্শ্বে প্রলয়াগ্নির মতো ডাকিনী। তাঁর নয়নে বিদ্যুচ্ছটা,

১ তারাদ্যা ষোড়শী চাদ্যা ভবেৎ সপ্তদশাক্ষরী। এষা বিদ্যা মহাবিদ্যা ভুক্তিমুক্তিকরী সদা।
—বিষসারতন্ত্রবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৯, পৃঃ ৮১৪

২ নাতঃ পরতরা কাচিদুগ্রা দেবী ভবিষ্যতি। তস্মাদসক্তৈর্মনুজৈর্ন গ্রাহ্যেয়ং কথঞ্চন।
সিদ্ধির্বা মৃত্যুরপি বা দ্বয়োরেকতরং ভবেৎ। প্রণবং চ রমাবীজং লজ্জাং বাগভবমেব চ।
বজ্রবৈরোচনীয়ে চ ইত্যেবং তত উদ্ধরেৎ। ক্রোধদ্বয়ং তৎপশ্চাদস্ত্রং স্বাহান্তঃ ষোড়শাক্ষরঃ।
—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৮১৪-১৫

৩ দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৮১৭, ৮১৮; বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৩০৩-৩০৬

দন্তপংক্তি অতি শুভ্র। তিনি দংষ্ট্রাকরালবদনা এবং পীনোত্তুঙ্গপয়োধরা। এই মহাদেবীও মহাভয়ংকরী মুক্তকেশী দিগম্বরী কালরাত্রিরূপিণী নাগের যজ্ঞোপবীতধারিণী। দেবীর মহাজিহ্বা লেলিহান। তিনি মুণ্ডমালাবিভূষিতা। তাঁর বামহস্তে কপাল ও দক্ষিণহস্তে কর্ত্রিকা। তিনি দেবী ছিন্নমস্তার গলদেশনির্গত রক্তধারা পান করছেন। করস্থিত ভীষণ কপালের জন্য তিনি অতিভীষণা। বিচক্ষণ সাধক এই দুই সখীর দ্বারা যিনি সেব্যমানা এবং চিত্তেরও যিনি দুরধিগম্যা সেই সর্বকামফলপ্রদা দেবী ছিন্নমস্তার ধ্যান করবেন।[1]

৩। **ধূমাবতী**—স্বতন্ত্রতন্ত্রে ধূমাবতীর উৎপত্তি বর্ণনা করা হয়েছে এইভাবে—সর্বসংহারচঞ্চলা দেবী ক্রুদ্ধ হয়ে দক্ষ প্রজাপতির যজ্ঞাগ্নিতে স্বদেহ নিক্ষেপ করেন এবং তার ফলে বিরাট ধূমরাশি উৎপন্ন হয়। সেই ধূম থেকে সর্বশত্রুবিনাশিনী ধূমাবতীর উদ্ভব হয়।[2]

নারদপঞ্চরাত্রে আবার ধূমাবতীর অন্যরকম উৎপত্তিকাহিনী পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আছে[3]—একদিন কৈলাসে গিরিজা শিবকে বলেন আমি ক্ষুধায় অত্যন্ত পীড়িত। আমাকে খেতে দাও। শিব তাঁকে একটু সময় অপেক্ষা করতে বলেন।

১ স্বনাভৌ নীরজং ধ্যায়েৎ শুদ্ধং বিকসিতং সিতম্। তৎপদ্মকোষমধ্যে তু মণ্ডলং চণ্ডরোচিষঃ।
জপাকুসুমসঙ্কাশং রক্তবন্ধূকসন্নিভম্। রজঃসত্ত্বতমোরেখাযোনিমণ্ডলমণ্ডিতম্।
মধ্যে তস্যা মহাদেবীং সূর্যকোটিসমপ্রভাম্। ছিন্নমস্তাং করে বামে ধারয়ন্তীং স্বমস্তকম্।
প্রসারিতমুখীং ভীমাং লেলিহানোগ্রজিহ্বিকাম্। পিবন্তীং রক্তধারাং চ নিজকণ্ঠসমুদ্ভবাম্।
বিকীর্ণকেশপাশাং তাং নানাপুষ্পসমন্বিতাম্। দক্ষিণে চ করে কর্ত্রীং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্।
দিগম্বরাং মহাঘোরাং প্রত্যালীঢপদস্থিতাম্। অস্থিমালাধরাং দেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্।
সদা ষোড়শবর্ষীয়াং পীনোন্নতপয়োধরাম্। নাগাঙ্গদাং নাগকাঞ্চীং নাগনূপুরসংযুতাম্।
নাগকুণ্ডলসংযুক্তামষ্টনাগসমন্বিতাম্। বিপরীতরতাসক্তরতিকামোপরিস্থিতাম্।
ডাকিনীবর্ণিনীযুক্তাং বামদক্ষিণযোগতঃ দক্ষিণে বর্ণিনীং ধ্যায়েদ্বামপার্শ্বে তু ডাকিনীম্।
বর্ণিনীং লোহিতশ্যামাং মুক্তকেশীং দিগম্বরাম্। কপালকর্ত্রিকাহস্তাং বামদক্ষিণযোগতঃ।
দেবীগলোচ্ছলদ্রক্তধারাপানং প্রকুর্বতীম্। অস্থিমালাধরাং দেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্।
ডাকিনীং বামপার্শ্বে তু কল্পান্তদহনোপমাম্। বিদ্যুজ্জটাক্ষবদনাং দন্তপঙ্ক্তিবলাকিনীম্।
দংষ্ট্রাকরালবদনাং পীনোত্তুঙ্গপয়োধরাম্। মহাঘোরাং মহাদেবীং মুক্তকেশীং দিগম্বরাম্।
লম্বোদরীং কালরাত্রিং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্। লেলিহানমহাজিহ্বাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্।
কপালকর্ত্রিকাহস্তাং বামদক্ষিণযোগতঃ। দেবীগলোচ্ছলদ্রক্তধারাপানং প্রকুর্বতীম্।
করস্থিতকপালেন ভীষণেনাতিভীষণাম্। আভ্যাং নিষেব্যমাণাং তু ধ্যায়েদ্দেবীং বিচক্ষণঃ।
দুর্নিরীক্ষ্যাং চেতসাঽপি সর্বকামফলপ্রদাম্।—পু চ, তঃ ৯, পৃঃ ৮১৬-১৭

২ দক্ষপ্রজাপতের্যজ্ঞে সর্বসংহারচঞ্চলা ক্রুদ্ধা দেহং বিনিক্ষিপ্য ততো ধূমোঽভবন্মহান্।
তস্মাদ্ধূমাবতী জাতা সর্বশত্রুবিনাশিনী।—স্বতন্ত্রতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৫, পরিঃ ৬, ব সং, পৃঃ ৩৮২

৩ দ্রঃ ঐ পৃঃ ৩৮১-৮২

খানিকক্ষণ পরেই দেবী আবার ভক্ষ্য প্রার্থনা করেন। শিব তখনও তাঁকে আরেকটু অপেক্ষা করতে বলেন। কিন্তু দেবী আর ক্ষুধা সহ্য করতে পারলেন না। বললেন—জগৎপতি, আমাকে ভক্ষ্য দাও, আমি আর দেরী করতে পারছি না। এই বলে স্বামীকে ধরে মুখে পুরে দিলেন।[১] তখন মুহূর্তমধ্যে তাঁর দেহ থেকে ধূমরাশি উদ্ভূত হল। এবার শিব নিজ মায়ার দ্বারা আবার দেহ ধারণ করে দেবীকে বললেন—ভদ্রে, জ্ঞানচক্ষে চেয়ে দেখ আমি ছাড়া পুরুষ নাই আর তুমি ছাড়া নারী নাই।[২] তুমি স্বীয় পতিকে ভক্ষণ করেছ। কাজেই তুমি বিধবা হয়েছ। শাঁখা সিঁদুর ত্যাগ কর। ওগো পতিব্রতা, সধবার এই-সব চিহ্ন ত্যাগ কর। তোমার এই পরা মূর্তি বগলামুখী নামে বিখ্যাত হবে আর তোমার শরীর ধূমে ব্যাপ্ত হওয়ার জন্য তোমাকে ধূমাবতী বলা হবে। তোমার এই দুই পরা মূর্তি সিদ্ধবিদ্যা নামে খ্যাত হবে।

লক্ষণীয় নারদপঞ্চরাত্র অনুসারে বগলা এবং ধূমাবতী এক। দুই মূর্তি, ধূমাবতী অথবা বগলামুখীর দুইরূপ।[৩] কুব্জিকাতন্ত্রে ধূমাবতী সম্বন্ধে বলা হয়েছে—মহামায়া ধূমাবতী ধূম্রাসুরবিনাশিনী। এই মহাদেবী ধূম্ররূপা ও চতুর্বর্গপ্রদা।[৪]

মন্ত্র—মহাথর্বনসংহিতায় ধূমাবতীর এই মন্ত্রটি আছে—ধূঁ ধূঁ ধূমাবতী স্বাহা। অষ্টাক্ষরী এই মহাবিদ্যা সাধকদের সর্বসিদ্ধি প্রদান করেন।[৫] ফেৎকারিণীতন্ত্রমতে ধূমাবতীর মন্ত্র বৈরিনিগ্রহকারক।[৬]

ধ্যান—ফেৎকারিণীতন্ত্রে ধূমাবতীর এই ধ্যানটি বর্ণিত হয়েছে—ধূমাবতী বিবর্ণা চঞ্চলা রুষ্টা (কৃষ্ণা) দীর্ঘাঙ্গী। তাঁর পরিধানে মলিন বস্ত্র, কুন্তলরাজি বিবর্ণ, দন্ত বিরল। তিনি রুক্ষা বিধবা কাকধ্বজরথে আরূঢ়া বিলম্বিতপয়োধরা। তাঁর চক্ষু রুক্ষ, কম্পিত হস্তে সূর্প ও বরমুদ্রা। তিনি বিশালবদনা, অত্যন্ত কুটিলা ও কুটিলনয়না। দেবী সর্বদা ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর, ভয়দা ও কলহপ্রিয়া। এইরূপে দেবীর ধ্যান করে পূজা করতে হবে।[৭]

---

১ দেহি ভক্ষ্যং জগন্নাথ ন শক্নোমি বিলম্বিতুম্। ইত্যুক্ত্বা পতিমাদায় মুখে চিক্ষেপ সা তদা।
—প্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৫, পরিঃ ৬, ব সং, পৃঃ ৩৮১-৮২

২ পশ্য ভদ্রে মহাভাগে পুরুষো নাস্তি মাং বিনা। ত্বদন্যা বনিতা নাস্তি পশ্য ত্বং জ্ঞানচক্ষুষা।—ঐ পৃঃ ৩৮২

৩ বিধবাসি কুরু ত্যাগং শঙ্খং সিন্দূরমেবচ। সাধব্যং লক্ষণং দেবি কুরু ত্যাগং পতিব্রতে।
এষা মূর্তিস্তব পরা বিখ্যাতা বগলামুখী। ধূমব্যাপ্তশরীরত্বাৎ তু ততো ধূমাবতী স্মৃতা।
এতে মূর্তী তব পরে সিদ্ধবিদ্যে প্রকীর্তিতে।—ঐ

৪ ধূমাবতী মহামায়া ধূম্রাসুরনিসূদনী। ধূম্ররূপা মহাদেবী চতুর্বর্গপ্রদায়িনী।—ঐ, পৃঃ ৩৭৪

৫ স্বাহান্তো সবামকর্ণেন্দুধূমাবত্যাগ্নিগেহিনী। অষ্টাক্ষরী মহাবিদ্যা ভজতাং সর্বসিদ্ধিদা।—প্রঃ পু চ, তঃ ৯, পৃঃ ৮২১

৬ ধূমাবতীমন্ত্রঃ প্রোক্তঃ শত্রুনিগ্রহকারকঃ।—ফেৎকারিণীতন্ত্র, পঃ ৭

৭ বিবর্ণা চঞ্চলা রুষ্টা (কৃষ্ণা) দীর্ঘা চ মলিনাম্বরা। বিবর্ণকুন্তলা রুক্ষা বিধবা বিরলদ্বিজা।
কাকধ্বজরথারূঢ়া বিলম্বিতপয়োধরা। সূর্পহস্তাতিরুক্ষাক্ষী ধৃতহস্তা বরান্বিতা।

বগলা—স্বতন্ত্রতন্ত্রে বগলার উদ্ভবকাহিনী এইভাবে বর্ণিত হয়েছে— পুরাকালে সত্যযুগে অতি প্রবলবেগে বায়ু প্রবাহিত হতে থাকে। চরাচর বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে মনে করে বিষ্ণু চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং এই বায়ুবেগ স্তম্ভিত করার জন্য তপস্যার দ্বারা জননী মহা-ত্রিপুরাকে সন্তুষ্ট করেন। দেবীর কৃপায় বায়ুবেগ স্তম্ভিত হয়। দেবী হরিদ্রা নামক একটি সরোবর দেখে তাতে জলক্রীড়া করতে আরম্ভ করেন এবং এই মহাপীত হ্রদের সমীপস্থ বগলাম্বিকা বা মা বগলারূপে আবির্ভূতা হন।[১] লক্ষ্য করার বিষয় মেরুতন্ত্রেও বগলাকে স্তম্ভনী বলা হয়েছে।[২]

মন্ত্র—তন্ত্রান্তরে বগলার নিম্নলিখিত ষট্‌ত্রিংশদক্ষর মন্ত্র নির্দিষ্ট হয়েছে—ওঁ হ্লীঁ বগলামুখি সর্বদুষ্টানাং বাচং মুখং স্তম্ভয় জিহ্বাং কীলয় কীলয় বুদ্ধিং নাশয় হ্লীঁ ওঁ স্বাহা। এই ষট্‌ত্রিংশদক্ষরী বিদ্যা সর্বসম্পৎপ্রদা।[৩] পুরুষার্থচতুষ্টয়লাভে এই বিদ্যার বিনিয়োগ বিহিত।[৪]

এ ছাড়া ওঁ হ্লীঁ বগলামুখি সর্বদুষ্টানাং বাচং মুখং স্তম্ভয় জিহ্বাং কীলয় বুদ্ধিং বিনাশয় হ্লীঁ ওঁ স্বাহা এই চতুস্ত্রিংশদক্ষরী বিদ্যা তন্ত্রে বর্ণিত হয়েছে।[৫] সর্বশত্রুমুখস্তম্ভনে এই বিদ্যার বিনিয়োগ নির্দিষ্ট হয়েছে।[৬]

ধ্যান—মেরুতন্ত্রে ষট্‌ত্রিংশদক্ষরী বিদ্যা-সম্পর্কিত এই ধ্যানটি আছে—দেবী গম্ভীরা মদোন্মত্তা; তপ্তকাঞ্চনের মতো তাঁর বর্ণ। তিনি চতুর্ভুজা ত্রিনয়না কমলাসনে উপবিষ্টা। দেবীর দক্ষিণহস্তে মুদ্গর ও পাশ এবং বাম হস্তে জিহ্বা (শত্রুর) ও বজ্র। তাঁর মনোজ্ঞ স্তনযুগল বৃত্তাকার ও স্থূল। দেবীর কর্ণে স্বর্ণকুণ্ডল শোভা পাচ্ছে আর ললাটে পীতবর্ণ অর্দ্ধচন্দ্র। দেবী পীতভূষণে ভূষিতা এবং স্বর্ণসিংহাসনে অধিষ্ঠিতা।[৭]

প্রবৃদ্ধঘোণা তু ভৃশং কুটিলা কুটিলেক্ষণা। ক্ষুৎপিপাসার্দিতা নিত্যং জয়দা কলহপ্রিয়া।
এবংবিধাং সমাধ্যায়েত্ততঃ কর্ম সমাচরেৎ।—কেৎকারিণীতন্ত্র, পটঃ ৭, বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৩৮৩

১ অথ বক্ষ্যামি দেবেশি বগলোৎপত্তিকারণম্। পুরা কৃতযুগে দেবি বাতক্ষোভ উপস্থিতে।
চরাচরবিনাশায় বিষ্ণুশ্চিন্তাপরায়ণঃ। তপস্যয়া চ সন্তুষ্টা মহাশ্রীত্রিপুরাম্বিকা।
হরিদ্রাখ্যং সরো দৃষ্ট্বা জলক্রীড়াপরায়ণা। মহাপীতহ্রদস্যান্তে সৌরাষ্ট্রে বগলাম্বিকা।
—দ্রঃ প্রা তো, ৪র্থ কাণ্ড ৫, পরিঃ ৬, ব সং, পৃঃ ৩৮২

২ অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি স্তম্ভনীং বগলামুখীম্।—দ্রঃ পু চ, পৃঃ ৮২৪

৩ দ্রঃ ধূমাবতীতন্ত্রম্, শাক্তপ্রমোদ, পৃঃ ৩০৮, বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৩৭৪

৪ দ্রঃ পু চ, তঃ ৯, পৃঃ ৮২৫ ৫ ঐ; বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৩৭৫ ৬ দ্রঃ পু চ, তঃ ৯, পৃঃ ৮২৬

৭ গম্ভীরাঞ্চ মদোন্মত্তাং তপ্তকাঞ্চনসন্নিভাম্। চতুর্ভুজাং ত্রিনয়নাং কমলাসনসংস্থিতাম্।
মুদ্গরং দক্ষিণে পাশং বামে জিহ্বাঞ্চ বজ্রকম্। পীতাম্বরধরাং সান্দ্রবৃত্তপীনপয়োধরাম্।
হেমকুণ্ডলভূষাঞ্চ পীতচন্দ্রার্দ্ধশেখরাম্। পীতভূষণভূষাঞ্চ স্বর্ণসিংহাসনস্থিতাম্।—দ্রঃ পু চ, তঃ ৯ পৃঃ ৮২৫

চতুস্ত্রিংশদক্ষরী বিন্যাসম্পর্কিত ধ্যান—সুধাসমুদ্রের মধ্যে মণিমণ্ডপ, তার মধ্যে রত্নবেদী। সেই বেদীর উপরে সিংহাসন। তার উপরে পীতবর্ণা পীতবস্ত্রা স্বর্ণভূষণ ও মাল্যে শোভিতা দেবী উপবিষ্টা। দেবীর হস্তে মুদ্গর ও শত্রুজিহ্বা। এইরূপ দেবীকে ভজনা করি।[১]

মাতঙ্গী—তুজ্জিকাতন্ত্রে বলা হয়েছে—মদশীলত্বহেতু এবং মতঙ্গাসুরকে বিনাশ করার জন্য দেবীকে মাতঙ্গী বলা হয়। তিনি সমস্ত বিপদ থেকে ত্রাণ করেন।[২]

স্বতন্ত্রতন্ত্রে দেবীর উদ্ভবকাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে পুরাকালে একদা নানাবৃক্ষ-সমাকুল কদম্বকাননে সমস্ত প্রাণীকে বশীভূত করার জন্য মতঙ্গমুনি শতসহস্র বৎসর ধরে নিরন্তর তপস্যা করেন। সেই তপস্যার ফলে দেবী সুন্দরীর নেত্র থেকে তেজ সমুৎপন্ন হয়। সেই তেজোরাশি স্বয়ং জননী কালিকারূপ ধারণ করে আবার তাই শ্যামলরূপ ধারণ করে রাজমাতঙ্গিনী হয়।[৩]

বিবিধ মাতঙ্গী—পুরশ্চর্যার্ণবে[৪] মাতঙ্গী বা মাতঙ্গিনী, উচ্ছিষ্টা-মাতঙ্গী, রাজমাতঙ্গী, সুমুখী-মাতঙ্গী, বশ্য-মাতঙ্গী ও কর্ণমাতঙ্গী এই ষড়্‌বিধ মাতঙ্গীর মন্ত্র ও ধ্যানাদি উদ্ধৃত হয়েছে।

মাতঙ্গী-মন্ত্র—বামকেশ্বরতন্ত্রে মাতঙ্গীর ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ হূঁ মাতঙ্গৈ ফট্ স্বাহা এই মন্ত্রটি বর্ণিত হয়েছে। এই মাতঙ্গী-বিদ্যা সর্বসিদ্ধিপ্রদা। এঁর উপাসনার দ্বারা সাধক বাক্‌সিদ্ধি লাভ করেন।[৫]

ধ্যান—যামলে বর্ণিত মাতঙ্গীর ধ্যানটি এই— দেবী শ্যামাঙ্গী শশিশেখরা ত্রিনয়না রত্নসিংহাসনে অধিষ্ঠিতা বিচিত্ররত্নভূষণে ভূষিতা। তিনি ক্ষীণমধ্যা আপীনস্তনমণ্ডলা স্মিতমুখী। দেবীর ভুজচতুষ্টয়ে অঙ্কুশ অসি পাশ এবং খেড়ক (খেটক)। এইরূপে দেবীর ধ্যান করতে হবে।[৬]

---

১ মধ্যে সুধাব্ধি মণিমণ্ডপরত্নবেদীসিংহাসনোপরিগতাং পরিপীতবর্ণাম্।
পীতাম্বরাং কণকভূষণমাল্যশোভাং দেবীং ভজামি ধৃতমুদ্গরবৈরিজিহ্বাম্।
—যামলোক্ত ধ্যান, দ্রঃ পু চ, তঃ ৯, পৃঃ ৮২৬

২ মাতঙ্গী মদশীলত্বাৎ মতঙ্গাসুরনাশিনী। সর্বাপত্তারিণী দেবী মাতঙ্গী পরিকীর্তিতা।
—দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৫, পরিঃ ৬, ব সং পৃঃ ৩৭৪

৩ অথ মাতঙ্গিনীং বক্ষ্যে ক্রূরভূতভয়ংকরীম্। পুরা কদম্ববিপিনে নানাবৃক্ষসমাকুলে।
বশ্যার্থং সর্বভূতানাং মতঙ্গো নামতো মুনিঃ। শতবর্ষসহস্রাণি তপোঽতপ্যত সন্ততম্।
তত্র তেজঃ সমুৎপন্নং সুন্দরীনেত্রতঃ শুভে। তেজোরাশিরভূত্তত্র স্বয়ং শ্রীকালিকাম্বিকা।
শ্যামলং রূপমাস্থায় রাজমাতঙ্গিনী ভবেৎ।—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৩৮২

৪ দ্রঃ পু চ, তঃ ৯, পৃঃ ৮২৭-৩২ ৫ দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৩৬১

৬ শ্যামাঙ্গীং শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং সদ্রত্নসিংহাসনে সংস্থাং রত্নবিচিত্রভূষণযুতাং সংক্ষীণমধ্যস্থলাম্।
আপীনস্তনমণ্ডলাং স্মিতমুখীং ধ্যায়েদ্দধন্তীং ক্রমাদ্ বেদৈর্বাহুভিরঙ্কুশাসিলতিকে পাশং তথা খেড(ট ?)কম্।
—দ্রঃ, পু চ তঃ ৯, পৃঃ ৮২৭

উচ্ছিষ্টা-মাতঙ্গী-মন্ত্র—উচ্ছিষ্টা-মাতঙ্গীকে উচ্ছিষ্টা-চাণ্ডালিনীও বলা হয়। মেরুতন্ত্রে দেবীর এই মন্ত্রটি বর্ণিত হয়েছে—নম উচ্ছিষ্টচাণ্ডালি মাতঙ্গি সর্বশঙ্করি স্বাহা। এই মন্ত্র জগৎকে সম্মোহিত করে।[১]

ধ্যান—উক্ত তন্ত্রে এই ধ্যানটি দেওয়া হয়েছে—দেবীর পরিধানে কৃষ্ণবস্ত্র, চরণযুগল অলক্তকরঞ্জিত। উন্নতস্তনী দেবীর কণ্ঠে মুক্তা ও প্রবালের মালা এবং কাণে শঙ্খের কুণ্ডল।[২]

সুমুখী-মাতঙ্গী-মন্ত্র— সুমুখী-মাতঙ্গীকেও উচ্ছিষ্টা-চাণ্ডালিনী বলা হয়।[৩] গুহ্যতন্ত্রে দেবীর নিম্নলিখিত মন্ত্রটি দেওয়া হয়েছে—উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনী সুমুখী দেবী মহাপিশাচিনী হ্রীঁ ঠঃ ঠঃ ঠঃ। এই মহাবিদ্যা সর্বপাপ নাশ করেন, স্বর্গ মোক্ষ ও সর্বসৌভাগ্য প্রদান করেন।[৪]

ধ্যান—পুরশ্চর্যার্ণবে দেবীর এই ধ্যানটি উদ্ধৃত হয়েছে—দেবী শবাসীনা। তাঁর পরিধানে রক্তবস্ত্র, অঙ্গে রক্তালঙ্কার ও কণ্ঠে গুঞ্জাহার শোভা পাচ্ছে। তিনি পীনোন্নতপয়োধরা ষোড়শবর্ষীয়া যুবতী। দেবীর বামহস্তে কপাল এবং দক্ষিণহস্তে কর্ত্রিকা। উত্তম মন্ত্রবিদ্ ব্যক্তি এইরূপে পরজ্যোতিঃস্বরূপিণী দেবীর ধ্যান করবে।[৫]

রাজমাতঙ্গী-মন্ত্র— মেরুতন্ত্রে রাজমাতঙ্গীর এই মন্ত্রটি পাওয়া যায়[৬]—ওঁ হ্রীঁ নমঃ বরদে স্ত্রীরাজিতে রাজপূজিতে জয়ে বিজয়ে গৌরি উমে গান্ধারি ত্রিভুবনশঙ্করি সর্বস্ত্রীপুরুষ-বশংকরি সুসু দুদু ঘেঘে বাবা স্বাহা।

ধ্যান—গুহ্যতন্ত্রে দেবীর নিম্নোক্ত ধ্যানটি বর্ণিত হয়েছে—কেশর ও বীজকোষবিশিষ্ট অষ্টদল মহাপদ্ম। তার মধ্যে ত্রিকোণ। ত্রিকোণের বাইরে অষ্টদল, তার বাইরে ষোড়শদল,

১ দ্রঃ পু চ, তঃ ৯, পৃঃ ৮২৮

২ কৃষ্ণাম্বরাং যাবকার্দ্রচরণাম্বুন্নতস্তনীম্। মুক্তাপ্রবালমালাঢ্যাং শঙ্খকুণ্ডলধারিণীম্।—দ্রঃ, ঐ

৩ দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৩৮৩

৪ দত্তাদুচ্ছিষ্টশব্দং তু তথা চাণ্ডালিনীতি চ। সুমুখীতি ততো দেবীং কীর্তয়েৎ তদনন্তরম্।
মহাপিশাচিনী তস্মান্মায়াবীজমনন্তরম্। বিন্দুনাদসমাযুক্তং ঠকারত্রিতয়ং ততঃ।
সবিসর্গং মহাদেবি সর্বপাপপ্রণাশিনী। স্বর্গদা মোক্ষদা বিদ্যা সর্বসৌভাগ্যদা তথা।
দ্রঃ পু চ, তঃ ৯, পৃঃ ৮৩০

৫ শবোপরিসমাসীনাং রক্তাম্বরপরিচ্ছদাম্। রক্তালঙ্কারসংযুক্তাং গুঞ্জাহারবিভূষিতাম্।
ষোড়শাব্দাং চ যুবতীং পীনোন্নতপয়োধরাম্। কপালকর্ত্রিকাহস্তাং পরজ্যোতিঃস্বরূপিণীম্।
বামদক্ষিণযোগেন ধ্যায়েন্মন্ত্রবিদুত্তমঃ।—দ্রঃ পু চ, তঃ ৯, পৃঃ ৮৩০

৬ অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি চতুঃপঞ্চাশদক্ষরম্। ওঁ হ্রীঁ নমশ্চ বরদে স্ত্রীরাজিতে রাজপূজিতে।
জয়ে চ বিজয়ে গৌরি উমে গান্ধারিপদং বদেৎ। ত্রিভুবনশঙ্করি সর্বস্ত্রীপুরুষেতি চ।
বশঙ্করি সুসু দুদু ঘেঘে বাবাহম্বিগোহিনী।—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৮২৮-৮২৯

তার বাইরে চতুর্দল, তার বাইরে চতুরস্র ও চতুর্দ্বার। এমনি উত্তম মণ্ডলমধ্যে সুখাসীনা শুচিস্মিতা শ্যামবর্ণা সুরাসুরপূজিতা দেবী মাতঙ্গী। তাঁর কণ্ঠে কদম্বমালা, কেশজাল দীর্ঘ; চন্দ্রকলা তাঁর শিরোভূষণ। ঈষদ্‌হাস্যমুখী দেবীর ললাটে তিলক। কিঞ্চিৎস্বেদবারিযুক্ত হওয়ায় সে-ললাট মধুর ও তার জন্য দেবী উজ্জ্বলা। তাঁর নাভিদেশে ত্রিবলী ও রোমরাজি শোভা পাচ্ছে। তিনি সর্বাভরণযুক্তা, মুক্তাহারবিভূষিতা। তাঁর কটিতে নানামণিসমৃদ্ধ চন্দ্রহার। রত্নখচিত বলয় ও মণিমণ্ডিত কেয়ূর তাঁর ভূষণ। মদঘূর্ণিতলোচনা দ্বিভুজা দেবী ষোড়শবর্ষীয়া। তাঁর স্তনযুগল স্থূল বর্তুলাকার বিস্তৃত সমুন্নত। দেবীর গলায় স্বর্ণহার, কর্ণে কর্ণভূষণ শোভা পাচ্ছে। দেবী মাতঙ্গিনী তরুণী মধুমত্তা তমালনীলা চতুঃষষ্টিকলারূপা। তাঁর পাশে শুকসারিকা। কোটিবালসূর্যের মতো, জবাকুসুমের মতো তাঁর বর্ণ। এই প্রকারে পীতবর্ণা পরা মাতঙ্গিনীর ধ্যান করতে হবে।[১]

বশ্যমাতঙ্গী-মন্ত্র— মেরুতন্ত্রে বশ্যমাতঙ্গীর এই মন্ত্রটি দেওয়া হয়েছে—ওঁ রাজমুখি রাজাধিমুখি বশ্যমুখি হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ দেবদেবি মহাদেবি দেবাধিদেবি সর্বজনস্য মুখং মম বশং কুরু কুরু স্বাহা।[২]

পুরশ্চর্যার্ণবে মন্ত্রটি উদ্ধৃত হয়েছে কিন্তু ধ্যান দেওয়া হয় নি। তবে মন্ত্রের সঙ্গেই মেরুতন্ত্রের বচন আছে—দেবীর জপপূজাদি রাজমাতঙ্গীর যেমন তেমনি হবে।[৩] ধ্যান পূজার অঙ্গ। তার থেকে অনুমান হয় উভয়ের হয়ত একই ধ্যান।

কর্ণমাতঙ্গী—কর্ণমাতঙ্গীর শুধু মন্ত্রটি আমাদের গোচরে এসেছে। ধ্যান পাইনি। মন্ত্রটি

১ অষ্টপত্রং মহাপদ্মং কেশরাঢ্যং সকর্ণিকম্। তন্মধ্যে তু ত্রিকোণং স্যাদষ্টপত্রং ততো বহিঃ।
পুনঃ ষোড়শপত্রং স্যাৎ তদ্বাহ্যে স্যাচ্চতুর্দলম্। বেদাস্রং সচতুর্দ্বারং মণ্ডলং প্রোক্তমুত্তমম্।
তস্য মধ্যে সুখাসীনাং শ্যামবর্ণাং শুচিস্মিতাম্। কদম্বমালাভরণাং পূজিতাং চ সুরাসুরৈঃ।
প্রলম্বালকসংযুক্তাং চন্দ্ররেখাবতংসিকাম্। ললাটে তিলকোপেতামীষৎপ্রহাসিতাননাম্।
কিঞ্চিৎস্বেদাম্বু মধুরললাটফলকোজ্জ্বলাম্ বলীত্রয়মধ্যাভাং রোমরাজীবিরাজিতাম্।
সর্বাভরণসংযুক্তাং মুক্তাহারবিভূষিতাম্। নানামণিগণোদ্ধকটিসূত্রৈরলঙ্কৃতাম্।
বলয়ৈ রত্নখচিতৈঃ কেয়ূরৈর্মণিভূষিতৈঃ। ভূষিতাং দ্বিভুজাং বালাং মদাঘূর্ণিতলোচনাম্।
আপীনমণ্ডলাভোগসমুন্নতপয়োধরাম্। প্রলম্বস্বর্ণাভরণাং কর্ণোত্তংসবিরাজিতাম্।
তমালনীলাং তরুণীং মধুমত্তাং মাতঙ্গিনীম্। চতুঃষষ্টিকলারূপাং পার্শ্বস্থশুকসারিকাম্।
কোটিবালার্কসংকাশাং জপাকুসুমসন্নিভাম্। এবং বা পীতবর্ণাং বা ধ্যায়েন্মাতঙ্গিনীং পরাম্
—দ্রঃ পু চ, তঃ ৯, পৃঃ ৮২৯-৮৩০

২ দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৮৩১-৮৩২

৩ বিজ্ঞেয়ং রাজমাতঙ্গীতুল্যাং পূজাজপাদিকম্।—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৮৩২

এই—ঐঁ নমঃ শ্রীমাতঙ্গি অমোঘে সত্যবাদিনি মম কর্ণে অবতর অবতর সত্যং কথয় কথয় এহি এহি শ্রীমাতঙ্গৈ নমঃ।[১]

কমলা—কমলা বা লক্ষ্মী। কুব্জিকাতন্ত্রের মতে দেবী বৈকুণ্ঠবাসিনী হলে তাঁকে বলা হয় কমলা আর পাতালবাসিনী হলে লক্ষ্মী।[২]

স্বতন্ত্রতন্ত্রে কমলাকে শ্রীভুবনা ও মহালক্ষ্মী বলা হয়েছে। দেবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছে—পুরাকালে ব্রহ্মা জগৎ-সৃষ্টির উদ্দেশ্যে দারুণ তপস্যা করেন। তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে সেই পরমেশ্বরী তারিণী স্বয়ং চৈত্র-শুক্লানবমীতে উদ্ভূতা হন। এই সর্বশক্তিময়ী শিবা ক্রোধরাত্রি নামে খ্যাত। ইনিই পূর্বে ক্ষীরোদসমুদ্রমথনের থেকে উদ্ভূতা হয়েছিলেন; ইনি বিষ্ণুবক্ষস্থিতা পদ্মাসনগতা রমা। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে এঁরই কোলাসুর-বিনাশিনী মহামাতঙ্গী নামক কলা উদ্ভূতা হন। ফাল্গুনে শুক্র বা মঙ্গলবারে একাদশী তিথিতে মহালক্ষ্মীরূপে এই সর্বসৌভাগ্যদায়িনী দেবী আবির্ভূতা হন।[৩]

মন্ত্র—তন্ত্রে কমলা বা লক্ষ্মীর একাধিক মন্ত্র ও ধ্যান বর্ণিত হয়েছে।[৪] শারদাতিলকের মতে শ্রী বা কমলার মন্ত্রসমূহ শ্রী ও সৌভাগ্য প্রদান করে। দেবীর কটাক্ষমাত্রের দ্বারা ত্রৈলোক্যবাসী জীবের উন্নতি হয়।[৫]

দেবীর একাক্ষর বীজমন্ত্র শ্রীঁ। এই মন্ত্র সর্বকামফলপ্রদ।[৬]

ধ্যান— শারদাতিলকে এই মন্ত্রের নিম্নোক্ত ধ্যানটি পাওয়া যায়— দেবীর কান্তি কাঞ্চনের মতো। হিমগিরির মতো চারিটি গজ শুণ্ডের দ্বারা হিরণ্ময় অমৃতঘট তুলে ধরে তাঁকে অমৃতধারায় স্নান করাচ্ছে। দেবীর বামদিকের নীচের হাতে বরমুদ্রা, উপরের হাতে পদ্ম

১ দ্রঃ পু চ, অঃ ৯, পৃঃ ৮৩২

২ বৈকুণ্ঠবাসিনী দেবী কমলা চ প্রকীর্তিতা। পাতালবাসিনী দেবী লক্ষ্মীরূপা চ সুন্দরী।
—দ্রঃ, প্রা তো. কাণ্ড ৫, পরিঃ ৬, ব সং, পৃঃ ৩৭৪

৩ পুরা ব্রহ্মা জগৎস্রষ্টুং তপোঽতপ্যত দারুণম্। তপসা তস্য সন্তুষ্টা শক্তি সা পরমেশ্বরী।
চৈত্রশুক্লনবম্যাম্ব উৎপন্না তারিণী স্বয়ম্। ক্রোধরাত্রিঃ সমাখ্যাতা সর্বশক্তিময়ী শিবা।
ক্ষীরোদার্ণবসম্ভূতা মথনাচ্চ্যবধেঃ পুরা। বিষ্ণোর্বক্ষঃস্থলস্থা চ পদ্মাসনগতা রমা।
কৃষ্ণাষ্টম্যাং ভাদ্রপদে কোলাসুরনিকৃন্তনী। তস্যাং তিথৌ সমুৎপন্না মহামাতঙ্গিনী কলা।
ফাল্গুনৈকাদশীযুক্তা ভৃগৌ ভৌমে চ যা তিথিঃ। জাতা তস্যাং মহালক্ষ্মীঃ সর্বসৌভাগ্যদায়িনী।
—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৩৮২

৪ দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ১৪০-১৪২

৫ যস্যাঃ কটাক্ষমাত্রেণ ত্রৈলোক্যমভিবর্ধতে।—দ্রঃ শ তি ৮।১

৬ দ্রঃ শা তি ৮।২

আর ডানদিকের উপরের হাতেও পদ্ম এবং নীচের হাতে অভয়মুদ্রা। দেবীর পরিধানে ক্ষৌমবস্ত্র, তিনি পদ্মের উপরে উপবিষ্টা। তাঁকে বন্দনা করি।[১]

আমরা লক্ষ্য করেছি এই ধ্যানবর্ণিত মূর্তির অনুরূপমূর্তি প্রাচীন মুদ্রায় উৎকীর্ণ হয়েছে।

অন্য মন্ত্র—কমলার আরেকটি মন্ত্রের উল্লেখ করা যাক। মন্ত্রটি—নমঃ কমলবাসিন্যৈ স্বাহা। এটি দেবীর দশাক্ষর মন্ত্র।[২]

ধ্যান—এই মন্ত্রের ধ্যান— স্মিতমুখী দেবী পদ্মের উপর আসীনা। তাঁর করপদ্মে বরমুদ্রা, দুটি পদ্ম এবং অভয়মুদ্রা। দেবীর দেহ বিদ্যুৎকান্তি। তাঁর স্থূল উন্নত স্তনযুগলের উপর মুক্তামালা শোভা পাচ্ছে। এমনি দেবী কমলা কটাক্ষবিভবের দ্বারা হরিকে আনন্দিত করছেন। তিনি তোমাদের রক্ষা করুন।[৩]

মহালক্ষ্মী—স্বতন্ত্রতন্ত্রোক্ত মহালক্ষ্মীর আবির্ভাবকাহিনীর উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। ইনি দেবীভাগবতাদি[৪]-পুরাণ-বর্ণিত মহালক্ষ্মী থেকে ব্যবহারতঃ ভিন্ন। তন্ত্রোক্ত মহালক্ষ্মীর মন্ত্রধ্যানাদি পৃথক্।

মন্ত্রঃ—শারদাতিলকে বর্ণিত মহালক্ষ্মীর একটি মন্ত্র—ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্সৌঃ জগৎ প্রসূত্যৈ নমঃ। এই দ্বাদশাক্ষর মহালক্ষ্মী-মন্ত্র সর্বসিদ্ধি প্রদান করে।[৫]

ধ্যান—এই মন্ত্রের ধ্যান—দেবীর অঙ্গদ্যুতি বালসূর্যের মতো। তাঁর মুকুটে অর্দ্ধচন্দ্র শোভা পাচ্ছে এবং কণ্ঠে শোভা পাচ্ছে উজ্জ্বল হার। তিনি রত্নভূষণে ভূষিতা, কুচভারে অবনতা। তাঁর শ্লাঘ্য হস্তে মঞ্জরী (ধানের), দুটি পদ্ম এবং কৌস্তভরত্ন শোভা পাচ্ছে। তিনি সুস্মিতা। প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো তাঁর ত্রিনয়ন। এইরূপে পরা দেবীর ধ্যান করবে। দেবীর পাদপদ্মে শিঞ্জনকারী মঞ্জীর। তিনি নররত্নাকীর্ণ কাঞ্চীদামে বিভূষিতা। তাঁর

১ কান্ত্যা কাঞ্চনসন্নিভাং হিমগিরিপ্রখ্যৈশ্চতুর্ভির্গজৈর্হস্তোৎক্ষিপ্তহিরণ্ময়ামৃতঘটৈরাসিচ্যমানাং শ্রিয়ম্।
বিভ্রাণাং বরমব্জযুগ্মমভয়ং হস্তৈঃ কিরীটোজ্জ্বলাং ক্ষৌমাবদ্ধনিতম্ববিম্বললিতাং বন্দেঽরবিন্দস্থিতাম্।
—শা তি ৮।৪

২ দ্রঃ শা তি ৮।৩৪-৩৫

৩ আসীনা সরসীরুহে স্মিতমুখী হস্তাম্বুজৈর্বিভ্রতি
দানং পদ্মযুগাভয়ে চ বপুষা সৌদামিনীসন্নিভা।
মুক্তাদামবিরাজমানপৃথুলোত্তুঙ্গস্তনোদ্ভাসিনী
পায়াদ্ বঃ কমলা কটাক্ষবিভবৈরানন্দয়ন্তী হরিম্।—শা তি ৮।৩৮

৪ পদ্মস্তাং তত্র দেবানাং তেজঃপুঞ্জসমুদ্ভবা। বভূবাতিবরা নারী সুন্দরী বিস্ময়প্রদা।
ত্রিগুণা সা মহালক্ষ্মীঃ সর্বদেবশরীরজা। অষ্টাদশভুজা রম্যা ত্রিবর্ণা বিশ্বমোহিনী।—দে ভা ৫।৮।৪৩-৪৪

৫ দ্রঃ শা তি ৮।৪৫-৪৬

উদরবন্ধনী মুক্তা-মাণিক্য- ও বৈদূর্যমণি-খচিত। দেবীর দেহমধ্য ত্রিবলীশোভিত। তাঁর নাভিদেশে গঙ্গার আবর্তের মতো স্বকাবর্ত শোভা পাচ্ছে। দেবীর স্তনযুগল চন্দন কর্পূর ও কুঙ্কুমের দ্বারা অলঙ্কৃত ; কণ্ঠে মেঘবিনির্মুক্ত মুক্তার দ্বারা রচিত হার। তিনি পট্টবস্ত্রের উত্তরীয় ধারণ করেছেন। তপ্তকাঞ্চনসম্বদ্ধ বৈদূর্যমণির অঙ্গদ তাঁর ভূষণ। দেবীর করপদ্মে পদ্মরাগমণিশোভিত স্বর্ণকঙ্কণ, অঙ্গুলিতে মাণিক্যখচিত অঙ্গুরীয়ক। তপ্তকাঞ্চননির্মিত মালা তাঁর কণ্ঠভূষণ। তাঁর শঙ্খসদৃশ গ্রীবায় বিচিত্র বিবিধভূষণ। উদীয়মান সূর্যাকৃতি মণিনির্মিত তাঁর তাটঙ্ক (কাণফুল)। রত্নখচিত উজ্জ্বল সুবর্ণনির্মিত কর্ণভূষণে তিনি ভূষিতা। দেবীর ললিত অধরপল্লব জবাকুসুম ও প্রবালের লাবণ্যযুক্ত। দাড়িম্ববীজের মতো তাঁর দন্তপংক্তি। কলঙ্ক- ও ক্ষীণতা-মুক্ত শারদ চন্দ্রের মতো তাঁর আনন, পদ্মদলাকৃতি তাঁর নয়নত্রয়, তাঁর ভ্রূলতাবিভ্রম কন্দর্পের কার্মুককেও পরাজিত করে। দেবীর উন্নত নাসিকা প্রস্ফুটিত তিলফুলের সৌন্দর্যকে পরাভূত করেছে। তিনি স্নিগ্ধ সৌরভযুক্ত কস্তুরীর তিলক ধারণ করেছেন। মত্ত ভ্রমরপংক্তির মতো চূর্ণকুন্তলের দ্বারা শোভিত তাঁর মুখপদ্ম। দেবীর কবরীতে পারিজাতফুল ; অমূল্যরত্ননির্মিত মুকুট তাঁর মস্তকে। মনোহারিণী মহালক্ষ্মী সর্বলাবণ্যের আবাস, বিভ্রমসৌন্দর্যের ভবন আর সমস্ত তেজের জন্মভূমি।[১]

---

১ বালার্কদ্যুতিমিন্দুখণ্ডবিলসৎকোটীরহারোজ্জ্বলাম্। রত্নাকল্পবিভূষিতাং কুচনতাং শালেঃ করৈর্মঞ্জরীম্।
পদ্মে কৌস্তুভরত্নমপ্যবিরতং সম্বিভ্রতীং সুস্মিতাম্। ফুল্লাম্ভোজবিলোচনত্রয়যুতাং ধ্যায়েৎ পরাং দেবতাম্।
শিঞ্জন্মঞ্জীরসংশোভিপদাম্ভোজবিরাজিতাম্। নবরত্নগণাকীর্ণকাঞ্চীদামবিভূষিতাম্।
মুক্তামাণিক্যবৈদূর্য্যসম্বদ্ধোদরবন্ধনাম্। বিভ্রাজমানাং মধ্যেন বলিত্রিতয়শোভিনা।
জাহ্নবীসরিদাবর্তশোভিনাভিবিভূষিতাম্। পাটীরপঙ্ককর্পূরকুঙ্কুমালঙ্কৃতস্তনীম্।
বারিবাহবিনির্মুক্তমুক্তাদামগরীয়সীম্। বহন্তীমুত্তরাসঙ্গং দুকূলপরিকল্পিতম্।
তপ্তকাঞ্চনসন্নদ্ধবৈদূর্য্যাঙ্গদভূষণাম্। পদ্মরাগস্ফুরৎস্বর্ণকঙ্কণাঢ্যকরাম্বুজাম্।
মাণিক্যশকলাবদ্ধমুদ্রিকাভিরলঙ্কৃতাম্। তপ্তহাটকসংক্লৃপ্তমালাগ্রৈবেয়শোভিতাম্।
বিচিত্রবিবিধাকল্পকম্বুসঙ্কাশকন্ধরাম্। উদ্যদ্দিনকরাকারমণিতাটঙ্কমণ্ডিতাম্।
রত্নাঙ্কিতজ্বলৎস্বর্ণকর্ণপূরোপশোভিতাম্। জবাবিদ্রুমলাবণ্যললিতাধরপল্লবাম্।
দাড়িমীফলবীজাভদন্তপংক্তিবিরাজিতাম্। কলঙ্ককার্শ্যনির্মুক্তশরচ্চন্দ্রনিভাননাম্।
পুণ্ডরীকদলাকারনয়নত্রয়সুন্দরীম্। ভ্রূলতাজিতকন্দর্পকরকার্মুকবিভ্রমাম্।
বিকসত্তিলপুষ্পশ্রীবিজয়োন্নতনাসিকাম্। ললাটকান্তিবিভববিজিতার্দ্ধসুধাকরাম্।
সান্দ্রসৌরভসম্পন্নকস্তূরীতিলকাঙ্কিতাম্। মত্তালিমালাকিলসদলকাঢ্যমুখাম্বুজাম্।
পারিজাতপ্রসূনশ্রীবাহিধম্মিল্লবন্ধনাম্। অনর্ঘ্যরত্নঘটিতমুকুটাঞ্চিতমস্তকাম্।
সর্বলাবণ্যবসতিং ভবনং বিভ্রমশ্রিয়ঃ। তেজসাং জন্মভূমিং তাং মহালক্ষ্মীং মনোহরাম্।—শা তি ৮।৭৪-৮৮

অন্যমন্ত্র—পূর্বোক্ত মন্ত্র ছাড়া ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কমলালয়ে প্রসীদ প্রসীদ শ্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মহালক্ষ্মি নমঃ এই সপ্তবিংশত্যক্ষর মন্ত্রটিও শারদাতিলকে দেওয়া হয়েছে।[১]

ধ্যান—এই মন্ত্রের বিহিত ধ্যান—দেবীর কান্তি সিন্দূরের মতো রক্তবর্ণ। তিনি কমল-বাসিনী, সৌন্দর্যবারিধি। মুকুট অঙ্গদ হার কুণ্ডল কটীসূত্র প্রভৃতি অলঙ্কারে তিনি ভূষিতা। দেবীর করপদ্মে ধনপাত্র, ছুটি পদ্ম আর দর্পণ। তিনি পরিচারিকাদের দ্বারা নিত্যপরিবৃতা। এইরূপে বিষ্ণুপ্রিয়া পরা দেবীর ধ্যান করবে।[২]

সাম্রাজ্যলক্ষ্মী

মন্ত্র—মেরুতন্ত্রে সাম্রাজ্যলক্ষ্মীর এই মন্ত্রটি পাওয়া যায়—হসকলীঁ হঁ।[৩]

ধ্যান—উক্ত তন্ত্রে দেবীর নিম্নোক্ত ধ্যানটি বর্ণিত হয়েছে—দেবীর বর্ণ অতসীপুষ্পের মতো। তিনি রত্নভূষণভূষিতা। অষ্টভুজা দেবীর হস্তে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শার্ঙ্গধনু বাণ বরমুদ্রা এবং অভয়মুদ্রা। সুধী সাধক এইরূপে অষ্টভুজা দেবীর ধ্যান করে তিন লক্ষ জপ করবেন।[৪]

সাধ্যা দশমহাবিদ্যা—শাক্তদের সাধ্যা ব্রহ্মময়ী পরাশক্তি। তাঁর বহুবিধ রূপের মধ্যে দশমহাবিদ্যার সাধনাই তন্ত্রে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হয়েছে। মহাভাগবতে তার কারণ নির্দেশ করে বলা হয়েছে—মহাবিদ্যা নানাবিধা। তাঁদের মধ্যে দশমহাবিদ্যা মুক্তিদায়িনী।[৫] শক্তিসাধনার সাধ্য প্রসঙ্গে সেইজন্য দশমহাবিদ্যারই আলোচনা করা গেল।

১ দ্রঃ শা তি ৮।১৪৪-১৪৬

২ সিন্দূরারুণকান্তিমব্জবসতিং সৌন্দর্যবারাংনিধিং কোটীরাঙ্গদহারকুণ্ডলকটীসূত্রাদিভির্ভূষিতাম্।
হস্তাব্জৈর্বসুপত্রমব্জযুগলাদর্শৌ বহন্তীং পরামাবীতাং পরিচারিকাভিরনিশং ধ্যায়েৎ প্রিয়াং শার্ঙ্গিণঃ।
—ঐ ৮।১৪৮

৩ দ্রঃ পু চ, তঃ ৯, পৃঃ ৮৪০

৪ অতসীপুষ্পসঙ্কাশাং রত্নভূষণভূষিতাম্। শঙ্খচক্রগদাপদ্মশার্ঙ্গবাণধরাং করৈঃ।
ষড়্‌ভিঃ করাভ্যাং দেবেশীং বরদাভয়শোভিতাম্। এবমষ্টভুজাং ধ্যাত্বা ত্রিলক্ষং প্রজপেৎ সুধীঃ।—দ্রঃ ঐ

৫ সাপি নানাবিধা তত্র মহাবিদ্যা মহামতে। বিমুক্তিদা মহারাজ তাসাং নামানি মে শৃণু।—দ্রঃ ভ ত পৃঃ ১৪৮

দ্বাদশ অধ্যায়

সাধনোপায়

বিবিধ সাধনোপায়—তন্ত্রশাস্ত্রে শক্তিসাধনার বহুবিধ উপায় নির্দিষ্ট হয়েছে। আমরা পূর্বেই বলেছি তন্ত্রে মনোবিজ্ঞানসম্মত সাধনার ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক মানুষের রুচি প্রকৃতি ও যোগ্যতা ভিন্ন। এই ভেদ স্বীকার করে তন্ত্রশাস্ত্র দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে বিভিন্ন সাধনোপায়ের বিধান দিয়েছেন। বিশেষ সাধকের প্রকৃতি রুচি যোগ্যতা ইত্যাদি অর্থাৎ তার অধিকার বিচার করে গুরু তার জন্য বিশেষ সাধনোপায়ের নির্দেশ দেন। সমাজের অতিনিম্নস্তরের জ্ঞানহীন স্থূলবুদ্ধি অশুদ্ধচিত্ত নিম্নাধিকারী মানুষের জন্য উচ্চস্তরের অদ্বৈত ব্রহ্মসাধনার উপায় নির্দিষ্ট হলে তারা তার অনুসরণ করতে পারবে না। এইজন্য তন্ত্রে এদের উপযোগী নানা সাধনোপায় বিহিত হয়েছে। আবার এদের চেয়ে চিত্তশুদ্ধ্যাদির দিক্ দিয়ে যারা উন্নত তাদের জন্য তদুপযোগী সাধনোপায় নির্দিষ্ট হয়েছে। এমনিভাবে সর্বনিম্নাধিকারী থেকে আরম্ভ করে সর্বোচ্চাধিকারী পর্যন্ত সব-রকম সাধকের উপযোগী সাধনোপায়ের নির্দেশ তন্ত্রশাস্ত্রে পাওয়া যায়।

অধিকার ও কর্মবাদ—অধিকারনির্ণয় সনাতন ধর্মীয় শাস্ত্রানুশীলন ও সাধনার অন্যতম মূলভিত্তি। এই অধিকারের সঙ্গে মানুষের কর্মবাদ তথা জন্মান্তরবাদ যুক্ত। তন্ত্রমতে জীব কর্মানুসারে দেবত্ব মনুষ্যত্ব পশুত্ব পক্ষিত্ব কৃমিত্ব বা স্থাবরত্ব লাভ করে।[1] জগতে যে বিভিন্ন আকৃতি-প্রকৃতির বিভিন্ন ধরণের দেহমনের মানুষ দেখা যায় তার কারণ বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন জন্মান্তরীণ কর্ম। সেইজন্য শাস্ত্রে যে বিভিন্ন মানুষের জন্য বিভিন্ন বিধিবিধান নির্দিষ্ট হয়েছে তাদের কর্মই তার অন্যতম কারণ বলা যায়।[2]

শাস্ত্র ও সাধনার বৈচিত্র্য—মোট কথা মানুষ বিভিন্ন। তাই তাদের জন্য বিভিন্ন সাধনোপায় ও শাস্ত্রবিধি। এই কারণেই সনাতন ধর্মীয় শাস্ত্র ও সাধনার এত বৈচিত্র্য। আর অধিকারী-ভেদে সমস্ত শাস্ত্র এবং সাধনোপায়ই প্রামাণ্য। এ সম্পর্কে ভাস্কররায় সেতুবন্ধে আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন—বিবিধ মানুষ বিবিধচিত্তশালী হয়েছে বিবিধ কর্মপরিপাকবশতঃ। পরমকারুণিক ভগবান্ পরমেশ্বর এই-সব মানুষকে অনুগ্রহ করতে ইচ্ছুক হয়ে এমন-সব বিদ্যা অর্থাৎ শাস্ত্রের প্রবর্তন করলেন যে-গুলি পরস্পর বিসদৃশ

১ দেবত্বমথ মানুষ্যং পশুত্বং পক্ষিতাং তথা। কৃমিত্বং স্থাবরত্বঞ্চ জায়তে জন্তুকর্মভিঃ।—শা ত, উঃ ১

২ দেহঃ কর্মাত্মকঃ প্রোক্তস্তত্তেষ্বেবি প্রতিষ্ঠিতঃ। কর্মযোগানুরূপেণ নির্ণয়ঃ বিধিবাদিনেঃ।—ঐ

হলেও সাক্ষাৎভাবে বা পরম্পরা অনুসারে একই পরমপুরুষার্থ সাধন করে। এ বিষয়ে শ্রুতি-প্রমাণ—তিনি সর্ববিদ্যার অধিপতি। অন্যশ্রুতি—যিনি পূর্বে অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মার সৃষ্টি করে তাঁকে বেদসমূহ ও অন্যান্য বিদ্যা প্রদান করেন। মূলে 'বেদাংশ্চ' পাঠ আছে। এই চকার থাকার জন্য বেদ ভিন্ন অন্য বিদ্যা সমূহও সূচিত হয়েছে। কেন না 'সেই অগ্রজন্মাকে অর্থাৎ ব্রহ্মাকে বেদ ও পুরাণগুলি দিয়েছিলেন'—এই উপবৃংহণে উক্ত ব্যাখ্যা সমর্থিত হচ্ছে। এ বিষয়ে স্মৃতিতেও বলা হয়েছে—শ্রুতি বলেন বিভিন্ন মার্গের এই অষ্টাদশ বিদ্যার আদিকর্তা সাক্ষাৎ শূলপাণি শিব। এইজন্য সূতসংহিতাদিতে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে জগতের কল্যাণকারী পরমশিবপ্রণীত বলে সমস্ত বিদ্যা অর্থাৎ শাস্ত্রই অধিকারভেদে প্রামাণ্য। অধিকার কি রকম? যেমন আর্হতাদি দর্শনে নাস্তিকদের অধিকার, বেদমার্গে ত্রৈবর্ণিকদের অর্থাৎ দ্বিজদের অধিকার পুরুষভেদে ব্যবস্থিত হয়, আবার প্রত্যেক পুরুষের ক্ষেত্রে চিত্তশুদ্ধির তারতম্যানুসারে অধিকার ব্যবস্থিত হয়। বর্ণভেদ ও আশ্রমভেদ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মব্যবস্থা দৃষ্ট হয়।[১]

বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন অধিকার—একই ব্যক্তির বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন অধিকার সম্বন্ধে ভাস্কররায় লিখেছেন[২]—দেখা যায় পিতা প্রভৃতি গুরুজন অতিবাল্যাবস্থায় শিশুকে

---

১ তত্তশ্চ বিবিধকর্মপরিপাকায়ত্তবিবিধচিত্তশালিনো জনানমুজিঘৃক্ষুঃ পরমকারুণিকো ভগবান্ পরমেশ্বরঃ পরস্পরবিলক্ষণা অপি সাক্ষাৎপরম্পরয়া বা পরমপুরুষার্থৈকপ্রয়োজনিকা বিদ্যাঃ প্রবর্তয়ামাস। তথাচ শ্রুতিঃ ঈশানঃ সর্ববিদ্যানাম্ (নৃসিংহতাপিন্যুপনিষৎ, পূর্বতাপিনী ১।১২)। যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ (শ্বে উপ ৬।১৮)। অত্র চকারাদিতরবিদ্যাসমুচ্চয়ঃ।

তস্মৈ বেদান্ পুরাণানি দত্তবানগ্রজন্মনে। ইত্যুপবৃংহণদর্শনাৎ। স্মৃতিরপি—

অষ্টাদশানামেতাসাং বিদ্যানাং ভিন্নবর্ত্মনাম্।

আদিকর্তা কবিঃ সাক্ষাচ্ছূলপাণিরিতি শ্রুতিঃ।

ততশ্চ জগদাপ্তপরমশিবপ্রণীতত্বাবিশেষেণ সর্বাসাং বিদ্যানামধিকারিভেদেন প্রামাণ্যমেবেতি স্পষ্টং সূতসংহিতাদৌ। অধিকারশ্চ যথা নাস্তিকানামেবার্হতাদিদর্শনেষু ত্রৈবর্ণিকানামেব বৈদিকমার্গেষ্বিতি পুরুষভেদেনৈব ব্যবস্থিতস্তথৈকস্যাপি পুরুষস্য চিত্তশুদ্ধিতারতম্যাদপি কশ্চিদ্ ব্যবস্থিতঃ। বর্ণভেদেনৈবাশ্রমভেদেনাপি ধর্মব্যবস্থাদর্শনাৎ।—বা নি, পৃঃ ১-২

২ অতিবাল্যদশায়াং বালক্রীড়নকে প্রবর্তয়তামেব পিত্রাদীনাং তস্যৈবাধ্যয়নাধিকারে তাদৃশক্রীড়ায়াং তাড়নকর্তৃত্বদর্শনাৎ। তদয়ং মথিতোঽর্থঃ—জাতমাত্রস্য ত্রৈবর্ণিকস্য পুরুষস্য ক্রীড়াধিকারে নিবৃত্তেঽক্ষরাভ্যাসঃ। ততশ্ছন্দোভাষাজ্ঞানার্থং কাব্যাধ্যয়নে প্রবর্তকাস্তদোষ্গুণবৎকাব্যমিত্যাদীন্যগ্নিপুরাণবচনানি। ব্যুৎপন্নস্তু কাব্যালাপাংশ্চ বর্জয়েদিতি নিষেধঃ। কাব্যাধ্যয়নজন্যপ্রয়োজনস্য জাতত্বেনোত্তরভূমিকায়ামেবাধিকারান্তরং বিহায় পূর্বভূমিকায়ামেবায়ুঃ ক্ষপয়তোঽনিষ্টং ভবতীতি তদর্থঃ। ততো দেহাদ্যতিরিক্তত্বেনাত্মনো জ্ঞানার্থং ন্যায়শাস্ত্রাধ্যয়নে বিধিঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো ইত্যাদিঃ। তত্র হেতুরবয়বসমুদায়াত্মকন্যায় ইতি যাবৎ। দেহাদিভিন্নত্বে-

তার উপযোগী খেলায় প্রবৃত্ত করেন আবার তারই অধ্যয়নের উপযোগী বয়স হলে তাকে সে-রকম খেলা থেকে বিরত করার জন্য তাড়না করেন। এই ব্যাপারের নির্গলিতার্থ—দ্বিজবর্ণের পুরুষমাত্রের ক্রীড়াধিকার নিবৃত্ত হলে অক্ষরাভ্যাস করতে হবে। তারপরে ছন্দ ও ভাষাজ্ঞান লাভের জন্য কাব্যাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হতে হবে। অগ্নিপুরাণে এর সমর্থক 'গুণযুক্ত অর্থাৎ ভাল কাব্য নির্দোষ' এই ধরণের অনেক বচন আছে। ছন্দ ও ভাষায় ব্যুৎপন্ন হলে কাব্যালাপ বর্জন করতে হবে, এই নিষেধ করা হয়েছে। এই নিষেধের তাৎপর্য এই যে যে-প্রয়োজনে কাব্য-অধ্যয়ন তা সিদ্ধ হলে তার পরবর্তী ভূমিকায় অর্থাৎ উচ্চতর বিষয়ে অধিকার জন্মে। সেই অধিকার বর্জন করে কেউ যদি পূর্বভূমিকায় অর্থাৎ কাব্যচর্চা নিয়ে থাকে তা হলে তার আয়ুক্ষয় ও অনিষ্ট হয়। তার পরের বিধি—আত্মা যে দেহাদির অতিরিক্ত এই জ্ঞানলাভের জন্য ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন। এ সম্পর্কে 'শুষ্কের দ্বারা আত্মার অনুসন্ধান করবে' ইত্যাদি নির্দেশ আছে। শুষ্ক বলতে বুঝায় হেতু অর্থাৎ অবয়ব-সমুদায়াত্মক ন্যায়। দেহ থেকে আত্মা ভিন্ন এবং পরলোকে যাতায়াত সমর্থ, আত্মাকে এইরূপে অবগত হলে যে-সব কর্মের দ্বারা এরূপ আত্মজ্ঞান লাভ হয় সেই-সব কর্মে অধিকার জন্মে। এই অবস্থায় 'আন্বীক্ষিকী তর্কবিদ্যায় অনুরক্ত থাকা নিরর্থক' ইত্যাদি নিষেধ-বচনের দ্বারা পূর্বভূমিকা অর্থাৎ ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যয়নাদি নিষেধ করা হয়েছে। 'প্রাজ্ঞ ব্যক্তি একমাত্র ধর্মেরই আচরণ করবেন' এই ধরণের বিধি-বচনের দ্বারা এর পর উত্তর-ভূমিকার প্রবর্তন করা হয়। এই ভূমিকার উপযোগী পূর্বমীমাংসা ও বেদের কর্মকাণ্ডের অধ্যয়ন বিধি। তার দ্বারা

নামুষ্মিকযাতায়াতক্ষমতয়াত্মনি জ্ঞাতে তু তাদৃশফলককর্মস্বধিকারাদান্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যামনুরক্তো নিরর্থিকামিত্যাদয়ো নিষেধাঃ পূর্বভূমিকাঃ নিষেধন্তি। ধর্মমেবাচরেৎপ্রাজ্ঞ ইত্যাদিবিধয় উত্তরভূমিকায়াঃ প্রবর্তয়ন্তি। তদুপযোগিত্বেন পূর্বমীমাংসায়া বেদে কর্মকাণ্ডস্য চাধ্যয়নং তেন ধর্মার্থকামেষু সাধিতেষু চতুর্থপুরুষার্থলিপ্সয়া পূর্বভূমিকাত্যাগায় নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেনেতি কর্মনিন্দা। এতাশ্চ সর্বা অজ্ঞানভূমিকা ইত্যুচ্যন্তে। এতাঃ পরম্পরাদুর্ভাবেন সপ্তৈবেতি বসিষ্ঠঃ।[1] এতদুত্তরাস্তু জ্ঞানভূমিকাঃ। অথ তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেদাত্মা বা[2] বা অরে দ্রষ্টব্য[3] ইত্যাদয়ো ব্রহ্মজ্ঞানবিষয় উত্তরভূমিকাপ্রবর্তকাঃ। উত্তরভূমিকাস্তু বহ্ব্য ইতি কেচিৎ।

বদন্তি বহুভেদেন জ্ঞানিনো যোগভূমিকাঃ। ইতি বচনাৎ। সপ্তৈবেতি তু ভগবান্ বসিষ্ঠঃ। অববোধং বিদুর্জ্ঞানং তদিদং সাপ্তভূমিকমিত্যুক্তেঃ। তন্নামানি বিবিদিষা বিচারণা তনুমানসা সত্ত্বাপত্তিরসংসক্তিঃ পদার্থাভাবিনী তুর্যগেতি। তল্লক্ষণানি তু বাসিষ্ঠে জ্ঞানশাস্ত্রে দ্রষ্টব্যানি। তদুপযোগিতয়া চ বেদ-উপনিষৎকাণ্ডস্যোত্তরমীমাংসায়াশ্চাধ্যয়নম্।—বা নি, পৃঃ ২-৩

1 তত্র সপ্তপ্রকারাঃ স্বমজ্ঞানস্য ভুবঃ শৃণু।—যো বা, উৎপত্তিপ্রকরণ, ১১৭।৫

2 তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।—মু উপ ১।২।১২

3 আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয্যাত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্বং বিদিতম্।—বৃহ উপ ২।৪।৫

ধর্ম অর্থ ও কাম সাধিত হলে চতুর্থপুরুষার্থ অর্থাৎ মোক্ষলাভের ইচ্ছা জন্মে। এই অবস্থায় পূর্বভূমিকাত্যাগের জন্য 'কৃতের দ্বারা অকৃত লাভ হয় না' ইত্যাদি কর্মনিন্দাসূচক বচন পাওয়া যায়। এই সমস্তকে অজ্ঞানভূমিকা বলা হয়। বসিষ্ঠ বলেছেন এই-সব অজ্ঞানভূমিকা পরম্পরান্ত-ভাবে সাত প্রকার। এর পর জ্ঞানভূমিকা। তা জানার জন্য 'তিনি গুরুরই কাছে যাবেন।' 'আত্মাই দ্রষ্টব্য' ইত্যাদি উত্তরভূমিকা-প্রবর্তক বচন আছে। কেউ কেউ বলেন উত্তরভূমিকা অর্থাৎ জ্ঞানভূমিকা বহু। এর প্রমাণ বচন— জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলেন যোগভূমিকা বহু। কিন্তু ভগবান্ বসিষ্ঠের মতে জ্ঞানভূমিকা সাতটি। এ সম্পর্কে বচন—'অববোধ জ্ঞান; জ্ঞানের সপ্তভূমিকা'। তাদের নাম বিবিদিষা বিচারণা তনুমানসা সত্ত্বাপত্তি অসংসক্তি পদার্থাভাবিনী ও তুর্যগা। এই-সবের লক্ষণ বসিষ্ঠের জ্ঞানশাস্ত্রে অর্থাৎ যোগবাসিষ্ঠে দ্রষ্টব্য। জ্ঞানভূমিকার উপযোগী বলে বেদের উপনিষৎকাণ্ড ও উত্তরমীমাংসার অধ্যয়ন বিহিত।

ভাস্কররায় প্রথম জ্ঞানভূমিকার নাম দিয়েছেন বিবিদিষা। কিন্তু মুদ্রিত যোগবাসিষ্ঠে দেখা যায় প্রথম জ্ঞানভূমিকার নাম শুভেচ্ছা।[1]

সপ্তজ্ঞানভূমিকা—যোগবাসিষ্ঠে (উৎপত্তি প্রকরণ, ১১৮।৮-১৬) সপ্ত জ্ঞানভূমিকার লক্ষণের যে-বিবরণ দেওয়া হয়েছে তার মর্ম এই—সৎশাস্ত্রশ্রবণ গুরূপদেশ সজ্জনসঙ্গ প্রভৃতির দ্বারা (ক) নিত্যানিত্যবস্তু বিবেক; (খ) ইহামুত্রফলভোগবিরাগ; (গ) শম দম উপরতি তিতিক্ষা শ্রদ্ধা সমাধান এই সম্পত্তি-ষট্‌ক এবং (ঘ) মুমুক্ষুত্ব—এই সাধনচতুষ্টয় যুক্ত আত্ম-সাক্ষাৎকারেচ্ছাই শুভেচ্ছা।

শাস্ত্রশ্রবণ সজ্জনসম্পর্ক ও বৈরাগ্যাদির অভ্যাসজনিত যে-সদাচারপ্রবৃত্তি তাকে বলে বিচারণা। সদাচার বলতে এখানে গুরুশুশ্রূষা ভিক্ষাশন এবং শৌচাদি যতিধর্মপালনের সঙ্গে শ্রবণ-মনন বুঝতে হবে।

শুভেচ্ছা ও বিচারণার দ্বারা ইন্দ্রিয়ার্থে অর্থাৎ শব্দাদিবিষয়ে মনের যে-অসক্ততা জন্মে তাকে নিদিধ্যাসন বলে। তনুতা অর্থাৎ সবিকল্প-সমাধিরূপসূক্ষ্মতার জন্য এই নিদিধ্যাসনকেই তনুমানসা বলা হয়।

এই তিন ভূমিকা সাধনভূমিকা। এদের অভ্যাসের ফলে বিষয়বিরত শুদ্ধচিত্তের পরমাত্মায় অবস্থিতিরূপে যে-নির্বিকল্পসমাধিরূপ জ্ঞানভূমিকা তার নাম সত্ত্বাপত্তি। ব্রহ্মানন্দ বলেন শুদ্ধসত্ত্ব অন্তঃকরণে 'অহং ব্রহ্ম অস্মি—আমি ব্রহ্ম' এমনি পরোক্ষবৃত্তিরূপা জ্ঞানভূমির

১ জ্ঞানভূমিঃ শুভেচ্ছাখ্যা প্রথমা সমুদাহৃতা। বিচারণা দ্বিতীয়া তু তৃতীয়া তনুমানসা।
সত্ত্বাপত্তিশ্চতুর্থী স্যাত্ততো সংসক্তিনামিকা। পদার্থাভাবনী ষষ্ঠী সপ্তমী তুর্যগা স্মৃতা।
—যো বা, উৎপত্তিপ্রকরণ, ১১৮।৫, ৬

নাম সত্ত্বাপত্তি। এই ভূমিকার সাধককে বলা হয় ব্রহ্মবিদ্। এটি সংপ্রজ্ঞাতযোগভূমিকা। পরবর্তী তিনটি অসংপ্রজ্ঞাত-যোগভূমিকা।

এই ভূমিকাচতুষ্টয়ের অভ্যাসজাত অসংসক্তির ফলে চিত্তে নিরতিশয়-আনন্দ-নিত্য-অপরোক্ষ-ব্রহ্মাত্মভাব-সাক্ষাৎকার-লক্ষণ-চমৎকার যে-ভূমিকা বিদ্যমান হয় তাই অসংসক্তি নামক পঞ্চমী জ্ঞানভূমিকা। এই ভূমিকায় অবিদ্যাকার্যসংসক্তি সর্বপ্রকারে অবিদ্যমান বলে একে অসংসক্তি বলা হয়। এই ভূমিকায় আরূঢ় সাধককে বলা হয় ব্রহ্মবিদ্বর।

পূর্বোক্ত ভূমিকা-পঞ্চকের অভ্যাসের ফলে চিত্ত দৃঢ়ভাবে আত্মারাম হয়; তাতে বাহ্য ও আভ্যন্তর অন্য পদার্থের ভাবনা থাকে না; শুধু পরপদার্থ বা ব্রহ্মের ভাবনা থাকে। এমনি অবস্থা যে-ভূমিকায় হয় তার নাম পদার্থাভাবিনী। ব্রহ্মানন্দ একে বলেন পরার্থভাবিনী। তাঁর মতে যে-ভূমিকায় সাধক পরব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বিষয়ের চিন্তা করেন না তা পরার্থভাবিনী। এই ভূমিকায় আরূঢ় সাধককে বলা হয় ব্রহ্মবিদ্বরীয়ান্।

এই ভূমিকা-ষট্‌কের দীর্ঘকাল অভ্যাসের ফলে সাধকের ভেদজ্ঞান অন্তর্হিত হয়ে গেলে স্বীয় ব্রহ্মস্বরূপে তাঁর যে-একনিষ্ঠতা উদ্ভূত হয় তাকেই তুর্যগা নামক সপ্তমী জ্ঞানভূমি বলা হয়। এই ভূমিতে আরূঢ় সাধক জীবন্মুক্ত। তাকে ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ বলা হয়। এটি সাধকের তুরীয়াবস্থা। এর পর বিদেহমুক্তের তুরীয়াতীত অবস্থা।

বলা হয়েছে[১] এই সপ্তজ্ঞানভূমিকার মধ্যে প্রথম তিন ভূমিকা মুমুক্ষুর, চতুর্থী ভূমিকা মুচ্যমানের আর শেষ তিন ভূমিকা মুক্তের।

উপরের আলোচনা[২] থেকে এ কথা অবশ্যই স্পষ্ট হয়েছে যে মানুষ যথাবিহিত চেষ্টার দ্বারা ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞানলাভের অধিকারী হয়। শাস্ত্রবিহিত ক্রম অনুসরণ করে চরম জ্ঞানভূমিকা লাভ করতে হয়।

ভাস্কররায় বলেন[৩] ব্রহ্মজ্ঞান দ্বিবিধ—শাব্দ ব্রহ্মজ্ঞান আর অপরোক্ষানুভবরূপ ব্রহ্মজ্ঞান।

১ মুমুক্ষুভূমিকাস্তিস্রো মুচ্যমানস্য তুর্যকা। মুক্তস্য পরতস্তিস্রো ভূমিকাঃ সপ্ত বর্ণিতাঃ।
—যো বা. নির্বাণপ্রকরণ, পূর্বার্ধ, সর্গ ১২০, তাৎপর্য-প্রকাশ।

২ সপ্তভূমিকার লক্ষণ সম্পর্কে এই আলোচনায় আমরা যোগবাসিষ্ঠের তাৎপর্য-প্রকাশ নামক ব্যাখ্যার অনুসরণ করেছি। তা ছাড়া হঠযোগপ্রদীপিকার প্রথম উপদেশের তৃতীয় শ্লোকের জ্যোৎস্না নামক টীকায় ব্রহ্মানন্দ সপ্তজ্ঞানভূমির যে-ব্যাখ্যা করেছেন তারও সাহায্য নিয়েছি।

৩ ব্রহ্মজ্ঞানং চ দ্বিবিধং শাব্দমপরোক্ষানুভবরূপং চ।
শাস্ত্রদৃষ্টির্গুরোর্বাক্যং তৃতীয়ঃ স্বাত্মনিশ্চয়ঃ। অন্তর্গতং তমশ্ছেত্তুং শাব্দবোধো নহি ক্ষমঃ। ইত্যাদি জ্ঞাপকাৎ। তেন শাব্দভূমিকালাভোত্তরং তত্ত্বানুভবরূপনিবেধার্থঃ পাণ্ডিত্যান্নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেদিত্যাদিঃ। (তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ।—বৃহ উপ ৩।৫।১) সপ্তভূমিকাস্বর্গতদ্বিতীয়তৃতীয়য়োস্ত মধ্যে ভক্তিরপেক্ষা মহতী ভূমিকা তদুপযোগিত্বেন ভক্তিমীমাংসাধ্যয়নম্। ভক্তিশ্চ পঞ্চমভূমিকান্তমনুবর্ততে। তত্ত্বাভোত্তরমপরোক্ষানুভব-

এ সম্বন্ধে প্রমাণ-বচন—শাস্ত্রদৃষ্টি গুরুবাক্য আর স্বাত্মনিশ্চয় এই তিনটি অন্তর্গত তমোনাশ করতে পারে ; শুধু শাব্দজ্ঞান তা করতে পারে না। সেইজন্য শাব্দজ্ঞানরূপ ভূমিকালাভের পর সেই ভূমিকায় বৃথা আয়ুক্ষয় শাস্ত্রে নিষিদ্ধ এবং 'পাণ্ডিত্য থেকে বিরত হয়ে বাল্যভাবে অবস্থান করবে' ইত্যাদি বচন নির্দিষ্ট হয়েছে।

পূর্বোক্ত সপ্তভূমিকার অন্তর্গত দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভূমিকার মধ্যে ভক্তিরূপা একটি মহতী ভূমিকা আছে। ভক্তির উপযোগী বলে নারদসূত্র শাণ্ডিল্যসূত্র প্রভৃতি ভক্তি-মীমাংসার অধ্যয়ন বিহিত। পঞ্চম জ্ঞানভূমিকার শেষ পর্যন্ত ভক্তি অনুবর্তন করে। ভক্তিলাভের পর অপরোক্ষানুভবরূপ ষষ্ঠভূমিকা লাভ হয়। এইটি জীবন্মুক্তি। এরই অব্যবহিত পরবর্তী অবস্থা বিদেহকৈবল্য। কেবলমাত্র জ্ঞানেই কৈবল্য লাভ হয়। এখানে জ্ঞান বলতে যোগী পুরুষের মানসানুভবৈকগম্য জ্ঞান বুঝতে হবে। ন্যায়াদি শাস্ত্রে অবশ্য সেই সেই শাস্ত্রনির্দিষ্ট ভূমিকালাভেই মুক্তিলাভ হয় এরূপ বর্ণনা আছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে বিবর্তবাদসম্মত উচ্চতর ভূমিকাগুলির অপহ্নবের জন্যই এরূপ বর্ণনা। এই-সব ন্যায়াদি শাস্ত্রের অনুসরণে পুরুষার্থ প্রাপ্তিতে বিলম্ব ঘটবে বলে লোকের এই-সব শাস্ত্রানুশীলনে অপ্রবৃত্তির আশঙ্কা দূর করার জন্য ন্যায়াদিশাস্ত্রে বিবর্তবাদের অপহ্নব দোষণীয় হয় নি।

'কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিঃ'—কেবলমাত্র কর্মের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হয়, 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ'—ইনি যাকে বরণ করেন তার দ্বারাই ইনি লভ্য' ইত্যাদি বচনে যে 'এব' শব্দ আছে তার দ্বারা বোঝান হয়েছে স্ব স্ব ভূমিকাসাধ্য "কর্মাদির দ্বারাই উত্তরোত্তর ভূমিকালাভের অধিকার জন্মে", অন্য পথ নাই। 'এব' শব্দের দ্বারা উত্তর ভূমিকার অভাব সূচিত হয় নি।

কিন্তু 'জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যম্'—কেবলমাত্র জ্ঞানেই কৈবল্য লাভ হয়' এই বচনের 'এব' শব্দে অভাব সূচিত হয়েছে। কেন না কৈবল্যলাভ বা অপরোক্ষানুভবের পরবর্তী আর অন্য কোনো সাধনভূমিকা নাই।

দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন শাস্ত্রে আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধী উক্তি থাকলেও তাদের মধ্যে বস্তুতঃ কোনো বিরোধ নেই।

সনাতনধর্মীয় শাস্ত্রের এটি একটি বিশেষত্ব। এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিশেষত্বের উল্লেখ

রূপষষ্ঠভূমিকালাভঃ। সৈব চ জীবন্মুক্তিঃ। তদব্যবহিতোত্তরমেব চ বিদেহকৈবল্যং জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যমিত্যত্র জ্ঞানপদস্যানুভবপরত্বাৎ। ন্যায়াদিশাস্ত্রেষু স্বস্বভূমিকালাভমাত্রেণ মোক্ষপ্রাপ্তিবর্ণনং তূত্তরোত্তরভূমিকানামপহ্নবেনৈব। পুরুষার্থপ্রাপ্তৌ বিলম্বশঙ্কয়া প্রবৃত্ত্যভাবনিরাসেন তস্যাদোষত্বাৎ। যানি চ কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিঃ, যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য ইত্যাদীনি বচনানি তেষ্বেবকারঃ স্বস্বভূমিকাসাধ্য উত্তরভূমিকাধিকাররূপফলে সাধনান্তরনিরাসার্থো ন পুনরুত্তরভূমিকা-ভাববোধকঃ। জ্ঞানাদেব ইত্যত্র তদনুভবাৎপরতঃ সাধনান্তররূপায়া ভূমিকায়া অভাবাত্তদভাববোধক এব। —বা নি, পৃঃ ৩

আবশ্যক। অনেক সময় বিভিন্ন শাস্ত্রে আত্মপ্রশংসাসূচক ও অপর শাস্ত্রের নিন্দাসূচক বচন লক্ষ্য করা যায়। এই ব্যাপারের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে ভাস্কররায় লিখেছেন—যে যে বিদ্যার প্রশংসাসূচক বচন পাওয়া যায় সেইগুলি সেই সেই বিদ্যায় অধিকারী ব্যক্তিদের প্রবর্তক আর যে যে বিদ্যার নিন্দাসূচক বচন পাওয়া যায় সেগুলি সেই সেই বিদ্যায় অনধিকারীদের নিবর্তক। এই-সব বচন নিন্দার জন্য নয়। 'নহি নিন্দান্যায়' অনুসারে এইগুলি বিধেয় বস্তুর প্রশংসাসূচক।[১]

ভক্তি—সপ্ত জ্ঞানভূমিকার আলোচনা হচ্ছিল। চরম জ্ঞানভূমিকায় ভক্তি নাই বটে এবং কেবল জ্ঞানেই কৈবল্য লাভ হয় বটে, তবে সাধনার ক্ষেত্রে ভক্তির স্থানও গৌণ নয়। আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি পঞ্চম জ্ঞানভূমিকা পর্যন্ত ভক্তি অনুবর্তন করে আর ভাস্কররায়ের মতে এই ভক্তিলাভও কঠিন সাধনা-সাপেক্ষ।

তিনি লিখেছেন সপ্ত জ্ঞানভূমিকার প্রত্যেকটির আবার বহু অবান্তর ভূমিকা আছে, এদের ইয়ত্তা করে পৃথক্‌ভাবে নির্দেশ করা যায় না। এইগুলি কেবলমাত্র বুদ্ধিমান্‌দের অনুভববেদ্য।[২]

ভাস্কররায় আরও লিখেছেন[৩] এমনি অনেক ভূমিকার এক একটি ভূমিকাই বহুজন্মসাধ্য। জীবের অপরিমিত জন্ম ও বিরাট্ প্রযত্নের দ্বারা ক্রমে পরব্রহ্মের শাশ্বতত্ত্বনিশ্চয়াত্মক ভূমিকা পর্যন্ত আরূঢ় সাধকের সংসারে আর অত্যন্ত আসক্তি থাকে না, আবার তার দৃঢ় নির্বেদও উপস্থিত হয় না। তবে এমনি অবস্থায় সাধকের বিলক্ষণ চিত্তশুদ্ধি হয়। আর সেই

---

১ এবং চ যানি তত্তদ্বিদ্যাপ্রশংসকানি বচনানি তানি তত্তদধিকারিণং প্রত্যেব প্রবর্তকানি। যানি চ তন্নিন্দকানি তানি তত্তদনধিকারিণং প্রতি নিবর্তকানি। ন পুনর্নহি নিন্দান্যায়েন বিধেয়স্তাবকানি।

—বা নি, পৃঃ ২

২ এতাসাং চ ভূমিকানামেকৈকস্যা অবান্তরভূমিকা অপি ভূয়স্য এবেযত্তয়াঽপরিচ্ছেদ্যা বুদ্ধিমদ্ভিরনুভবৈকবেদ্যাঃ সন্ত্যেব।—বা নি, পৃঃ ৩

৩ এবমনেকাসু ভূমিকাস্বেকৈকাঽপি বহুভির্জন্মভিরেব সাধ্যতে। তদেবমপরিমিতৈর্জন্মভির্মহতা প্রযত্নেন পরব্রহ্মণঃ শাশ্বতত্ত্বনিশ্চয়ভূমিকাপর্যন্তং ক্রমেণ সম্যগারূঢ়স্য সংসারে নাত্যন্তমাসক্তির্নাপি দৃঢ়ো নির্বেদ ইত্যাকারিকা বিলক্ষণা চিত্তশুদ্ধিঃ সম্পদ্যতে। সোঽয়ং ভক্তিমার্গেঽধিকারী।

ন নির্বিণ্ণো ন চাসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ। ইতি বচনাৎ।

সা চ ভক্তির্দ্বিবিধা—গৌণী পরা চেতি। তত্রাদ্যা সগুণস্য ব্রহ্মণো ধ্যানার্চনজপনামকীর্তনাদিরূপা সংভবৎসমুচ্চায়িকা। পরভক্তিস্তেতজ্জন্যানুরাগবিশেষরূপা। আদ্যায়া অপি বহবোঽবান্তরভূমিকাঃ। তাসু প্রথমা যোষামগ্নিং ধ্যায়ীতেত্যাদিভাবনাসিদ্ধিঃ। দ্বিতীয়া মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীতেত্যাদিবিহিতোপাস্তিঃ। তৃতীয়া ঈশ্বরোপাস্তিঃ।

—ঐ, পৃঃ ৩-৪

শুদ্ধচিত্ত সাধক ভক্তিমার্গের[১] অধিকারী হন। এ বিষয়ে শাস্ত্রবচন— যিনি নির্বেদযুক্ত নন, আসক্তও নন এমনি সাধকের পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ।

এই ভক্তি দ্বিবিধা—গৌণী আর পরা। সগুণ ব্রহ্মের ধ্যান অর্চনা জপ নামকীর্তনাদিরূপে গৌণী ভক্তির প্রকাশ। গৌণী-ভক্তিসঞ্জাত অনুরাগবিশেষ পরা ভক্তি। গৌণী ভক্তির অনেক অবান্তর ভূমিকা আছে। যেমন তাদের মধ্যে প্রথম ভূমিকার নাম ভাবনাসিদ্ধি। 'নারীরূপে অগ্নির ধ্যান করবে' ইত্যাদি বচনে এটি বিহিত হয়েছে। মনই ব্রহ্ম এইভাবে উপাসনা করবে ইত্যাদি বচনবিহিত উপাসনা দ্বিতীয় ভূমিকা। তৃতীয় ভূমিকা ঈশ্বরোপাসনা।

ঈশ্বরের বহুরূপে উপাসনা হয়; ভাস্কররায় লিখেছেন[২]—ঈশ্বরেরও সূর্য গণেশ বিষ্ণু রুদ্র পরশিব শক্তি—এমনি বিভিন্ন রূপ। এই-সব রূপের ভিন্ন ভিন্ন উপাসনাভূমিকা। শক্তির আবার ছায়া (সূর্যশক্তি), বল্লভা (গণেশশক্তি), লক্ষ্মী ইত্যাদি অনন্তপ্রকার রূপ।

এই ক্রম অনুসারে অনন্ত জন্মের মধ্য দিয়ে অর্থাৎ অসংখ্য জন্মের সাধনার দ্বারা এই-সব ভূমিকায় আরূঢ় হলে পর সাধকের অন্তরে ত্রিপুরসুন্দরীর প্রতি গৌণভক্তির উদয় হয়। এই গৌণভক্তিতে সম্যক্ নিরূঢ় সাধকের অন্তরে দেবীর প্রতি পরা ভক্তির উদয় হয়। এই শাস্ত্রব্যবস্থা।

এ বিষয়ে তন্ত্রের প্রমাণ— শৈব বৈষ্ণব দৌর্গ আর্ক গাণপত্য ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা যে-সাধকের চিত্ত বিশুদ্ধ হয়েছে তার অন্তরে কৌলজ্ঞান প্রকাশিত হয়। সকলের চেয়ে উত্তম বেদাচার, বেদাচারের চেয়ে উত্তম বৈষ্ণবাচার (ভক্তি), বৈষ্ণবাচারের চেয়ে উত্তম শৈবাচার, সৈবাচারের চেয়ে উত্তম দক্ষিণাচার, দক্ষিণাচারের চেয়ে উত্তম বামাচার, বামাচারের চেয়ে উত্তম সিদ্ধান্তাচার, সিদ্ধান্তাচারের চেয়ে কৌলাচার, কৌলাচারের চেয়ে উত্তম আর কিছু নাই।

তান্ত্রিক আচার ও জ্ঞানভূমিকা— লক্ষণীয় ভাস্কররায় যোগবাসিষ্ঠোক্ত সপ্ত

১ ভক্তি ছাড়া উপাসনা হয় না। অত্যন্ত নিম্নভূমির সাধকেরও ভক্তি থাকে। তবে এ রকম সাধকের ভক্তি আর উপরে যে-ভক্তির কথা বলা হল তা নামে এক হলেও স্বরূপতঃ এক নয়।—দ্রঃ কৌ র, পৃঃ ১৬ পাদটীকা।

২ ঈশ্বরস্যাপি সূর্যগণেশবিষ্ণুরুদ্রপরশিবশক্তিভেদেন বহুবিধত্বাত্তত্তদুপাস্ত্যোঽপি ভিন্না এব ভূমিকাঃ। শক্তিরপি ছায়াবল্লভালক্ষ্ম্যাদিভেদেনানন্তবিধৈব। অনেন ক্রমেণৈতা ভূমিকা অনন্তৈর্জন্মভিরারূঢ়স্য পশ্চাৎত্রিপুরসুন্দর্যাং গৌণভক্ত্যুদয়স্তত্র সম্যঙ্ নিরূঢ়স্য তস্যাং পরভক্ত্যুদয় ইতি স্থিতিঃ।

শৈববৈষ্ণবদৌর্গার্কগাণপত্যাদিকৈঃ ক্রমাৎ। মন্ত্রৈর্বিশুদ্ধচিত্তস্য কৌলজ্ঞানং প্রকাশতে।

সর্বেভ্যশ্চোত্তমা বেদা বেদেভ্যো বৈষ্ণবং পরম্। বৈষ্ণবাদুত্তমং শৈবং শৈবাদ্দক্ষিণমুত্তমম্।

দক্ষিণাদুত্তমং বামং বামাৎ সিদ্ধান্তমুত্তমম্। সিদ্ধান্তাদুত্তমং কৌলং কৌলাৎ পরতরং নহি।

ইতি বচনাৎ।—বা নি, পৃঃ ৪

জ্ঞানভূমিকার আলোচনা প্রসঙ্গেই বেদাচারাদি সপ্ত তান্ত্রিক আচারের উল্লেখ করেছেন। তন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞরা বলেন সপ্ত তান্ত্রিক আচারের সঙ্গে যোগবাসিষ্ঠোক্ত সপ্ত জ্ঞানভূমিকার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে; উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সামান্যই। প্রধান পার্থক্য এই যে তান্ত্রিক আচারের বেলা সাধক ভক্তির (বৈষ্ণবাচার) পথ দিয়ে জ্ঞানভূমিতে পৌছান আর যোগবাসিষ্ঠোক্ত জ্ঞানভূমিকার বেলা বিদ্বান্ সাধক যখন নিষ্ফল বিচারমার্গের অনুসরণে দুর্লঙ্ঘ্য সব বাধার সম্মুখীন হন এবং বুঝতে পারেন ভক্তি ভিন্ন তাঁর পক্ষে আর অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর নয় তখন ভক্তির আশ্রয় নিয়ে তিনি তনুমানসা নামক ভূমিকায় আরূঢ় হন।[১] লক্ষ্য করা গেছে ভাস্কররায়ও বিচারণা ও তনুমানসা এই দুই জ্ঞানভূমিকার মধ্যে ভক্তিভূমিকার স্থান নির্দেশ করেছেন।

আচার—সাধারণভাবে বলা যায় আচার ও ভাব শক্তিসাধনোপায়ের ভিত্তি। কেন না, যে-কোনো প্রকারের শক্তিসাধনাই হোক না কেন, কোনো না কোনো আচার এবং ভাব অবলম্বন করেই তা করতে হয়। মহানির্বাণতন্ত্রে শিব বলছেন—দেবি! দেশকাল এবং অধিকারীর ভেদ অনুসারে আমি নানা আচার ও ভাবের সাধনার কথা বলেছি। তার মধ্যে কোনো কোনো সাধনা গুপ্ত। তার কথাও কোনো কোনো তন্ত্রে বলেছি। যে যে মানুষ গুপ্ত বা ব্যক্ত যে যে সাধনায় অধিকারী তারা যদি সেই সেই সাধনা অবলম্বন করে তা হলে সাধনোচিত ফল পায় এবং পাপমুক্ত হয়ে সংসারসমুদ্র পার হয়।[২]

আচারের অর্থ—আচার শব্দটি তন্ত্রে পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। "সাধকের আধ্যাত্মিক অবস্থা লইয়াই সাধনার পথ নির্দিষ্ট হয়। সেই অবস্থাকে তন্ত্রশাস্ত্র সাত ভাগে বিভক্ত করিয়া সপ্ত আচার নাম দিয়াছেন।"[৩]

আচার সপ্তবিধ—লক্ষ্য করা গেছে ভাস্কররায় আচারসম্পর্কে কুলার্ণবতন্ত্রের যে-বচন উদ্ধৃত করেছেন তাতে নিম্নলিখিত সাতটি আচারের উল্লেখ আছে—বেদাচার বৈষ্ণবাচার শৈবাচার দক্ষিণাচার বামাচার সিদ্ধান্তাচার এবং কৌলাচার।

নিত্যাতন্ত্র বিশ্বসারতন্ত্র মহাচীনাচারতন্ত্র প্রভৃতি তন্ত্রেও এই সপ্ত আচারের কথাই বলা হয়েছে। তবে কোনো কোনো তন্ত্রে অঘোরাচার এবং যোগাচার নামে আরও দুটি আচারের

১ দ্রঃ The Spirit and Culture of the Tantras, C. Her. I., Ś. R. C. M., Vol. II, p. 195

২ নানাচারেণ ভাবেন দেশকালাধিকারিণাম্। বিভেদাৎ কথিতং দেবি কুত্রচিদ্‌গুপ্তসাধনম্।
যে যত্রাধিকৃতা মর্ত্ত্যাস্তে তত্র ফলভাগিনঃ। ভবিষ্যন্তি তরিষ্যন্তি মানবা গতকিল্বিষাঃ।

—মহা ত ৪।৭৬-৭৭

৩ তান্ত্রিক গুরু, ৪র্থ সং পৃঃ ৩৬-৩৭

উল্লেখ আছে।[১] অবশ্য অধিকাংশ তন্ত্রেই পূর্বোক্ত সপ্ত আচারেরই উল্লেখ পাওয়া যায়।

ভাব ও আচার—সপ্ত আচার পশু বীর এবং দিব্য এই ত্রিবিধ ভাবের অন্তর্গত। বিশ্বসারতন্ত্রাদিতে বলা হয়েছে[২]— বেদাদি আচারচতুষ্টয় অর্থাৎ বেদাচার বৈষ্ণবাচার শৈবাচার ও দক্ষিণাচার পশুভাবের অন্তর্গত এবং বামাদি আচারত্রয় অর্থাৎ বামাচার সিদ্ধান্তাচার ও কৌলাচার বীর ও দিব্য ভাবের অন্তর্গত। তন্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের মতে বামাচার ও সিদ্ধান্তাচার বীরভাবের এবং কৌলাচার দিব্য ভাবের অন্তর্গত।[৩]

দ্বিবিধ আচার—সাতটি আচারকে আবার দক্ষিণ এবং বাম এই দুই ভাগে ভাগ করাও হয়। বিশ্বসারতন্ত্রে আছে বামদক্ষিণভেদে আচার দ্বিবিধ। পঞ্চমুদ্রাদিসংযুক্ত আচার বামাচার আর পঞ্চমুদ্রাদিরহিত আচার দক্ষিণাচার।[৪] পঞ্চমুদ্রা অর্থ পঞ্চমকার। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা যাবে।

বামকেশ্বরতন্ত্রেও এই দ্বিবিধ আচারের উল্লেখ করে বলা হয়েছে মানুষ জন্মের দ্বারা দক্ষিণাচার এবং অভিষেকের দ্বারা বামাচারের অধিকারী হয়।[৫]

কোনো কোনো তন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের মতে বেদাচার থেকে দক্ষিণাচার পর্যন্ত আচার-চতুষ্টয় দক্ষিণাচারের অন্তর্গত আর বামাচার থেকে কৌলাচার পর্যন্ত আচারত্রয় বামাচারের অন্তর্গত।[৬]

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে তন্ত্রাদিতে আচারের স্থলে মার্গশব্দের ব্যবহারও আলোচ্য অর্থে লক্ষ্য করা যায়। বামাচার দক্ষিণাচারের পরিবর্তে বামমার্গ-দক্ষিণমার্গ-শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।[৭] তবে সাধারণতঃ মার্গশব্দ আচারশব্দের চেয়ে ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয়।[৮]

---

১ Tantra As A Way Of Realisation, C. Her. I., Ś. R. C. M., Vol. II, p. 168

২ চত্বারো দেবি বেদাদ্যাঃ পশুভাবে প্রতিষ্ঠিতাঃ। বামাদ্যাস্ত্রয় আচারা দিব্যে বীরে প্রতিষ্ঠিতাঃ।
—বিশ্বসারতন্ত্রবচন, দ্রঃ ভাব ওর আচার, ক শ অ, পৃঃ ৪২৮

৩ দ্রঃ ভাব ওর আচার, ক শ অ, পৃঃ ৪২৮

৪ আচারো দ্বিবিধো দেবি বামদক্ষিণভেদতঃ। পঞ্চমুদ্রাদিসংযুক্তো বামাচারঃ প্রকীর্তিতঃ।
পঞ্চমুদ্রাদিরহিতো দক্ষিণাচারসংজ্ঞকঃ।—বিশ্বসারতন্ত্রবচন, দ্রঃ কৌ র, পৃঃ ১১

৫ আচারো দ্বিবিধো দেবি বামদক্ষিণভেদতঃ। জন্মমাত্রং দক্ষিণং হি অভিষেকেণ বামকম্।
দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৭, পরিঃ ৪, ব সং, পৃঃ ৫৩২

৬ কৌ র, পৃঃ ১১

৭ পুরশ্চর্যার্ণবে 'আম্নায়ভেদেন মার্গভেদনির্ণয়ঃ' শিরোনাম দিয়ে বাড়বানলীয়তন্ত্র ও রুদ্রযামল থেকে বচন উদ্ধার করা হয়েছে। বাড়বানলীয়তন্ত্রবচনে দক্ষমার্গ বামমার্গ এবং কৌলমার্গ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং একই অর্থে রুদ্রযামলবচনে দক্ষিণাচার বামাচার ও কুলাচার শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।—দ্রঃ পু চ, তরঙ্গ ১, পৃঃ ২০-২১

৮ মার্গ অর্থ মত বা পথ। মৃগ্যতে ইতি মার্গঃ—সাধকের অবলম্বিত পথ মার্গ। সৌভাগ্যভাস্করে (পৃঃ ১১৩) ভাস্কররায় কৌলমার্গ শব্দের ব্যাখ্যায় লিখেছেন কৌলৈর্মৃগ্যতে ইত্যর্থে কর্মণি ঘঞ্। সৌন্দর্যলহরীর (শ্লোক ৩১) টীকায় লক্ষ্মীধরও লিখেছেন কৌলৈঃ মৃগ্যতে অবলম্ব্যতে ইতি কৌলমার্গঃ কৌলমতম্।

তন্ত্রবিদ্ পণ্ডিতেরা কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করেছেন পূর্বোক্ত সপ্ত আচারের মধ্যে শৈব দক্ষিণ বাম সিদ্ধান্ত এবং কৌল এই পাঁচটি আচারই প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক আচার। এই পঞ্চাচারই বামদক্ষিণভেদে দ্বিবিধ।[১]

আচারের ক্রমোর্ধ্বতা—কুলার্ণবতন্ত্রে বেদাচার থেকে কৌলাচার পর্যন্ত ক্রমোর্ধ্বতা নির্দিষ্ট হয়েছে। সাধনার প্রথম সোপান বেদাচার আর সর্বোচ্চ সোপান কৌলাচার।

স্বামী নিগমানন্দ পরমহংস বলেন সাধক প্রথমে গৃহস্থাশ্রমে থেকে সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা নিয়ে বেদাচারে বৈদিক কর্ম, বৈষ্ণবাচারে পৌরাণিক কর্ম এবং শৈবাচারে স্মার্ত কর্ম করবে। তার পর শাক্তাভিষিক্ত হয়ে দক্ষিণাচারে সাধনা করবে। এরপর পূর্ণাভিষিক্ত হয়ে গৃহাবধূত হবে এবং বীরভাবে বামাচারে সাধনা করবে। তার পরে সাম্রাজ্যদীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে বীরভাবে সিদ্ধান্তাচারে সাধনা করবে। এরপর মহাসাম্রাজ্যদীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে দিব্যভাবে কুলাচারে সাধনা করবে। তারও পরে পূর্ণদীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে দিব্যভাব অনুসারে সাধনার চরম উন্নতি করবে। এরূপ সাধনার দ্বারা দিব্যভাব পরিপক্ব হলে নিষ্ক্রিয় হয়ে কাল কাটাবে।[২]

আচারের লক্ষণাদি—আমরা বেদাচার থেকে আরম্ভ করে সিদ্ধান্তাচার পর্যন্ত আচারের লক্ষণাদি সংক্ষেপে বিবৃত করব এবং কৌলাচারে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিস্তৃত আলোচনা করব।

বেদাচার—পশুভাবের সাধকের পক্ষে বেদাচার বিহিত। পশুভাবের সাধক সম্বন্ধে পূর্বেই বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

যে-আচারে সাধক বেদ এবং বেদমূলক স্মৃতিপুরাণাদিতে বিবৃত বিধিব্যবস্থা অনুসারে আরাধ্য দেবতার সকাম উপাসনা করেন তাই বেদাচার। একে পশ্বাচারও বলা হয়।[৩]

নিত্যাতন্ত্রে বিধান দেওয়া হয়েছে বেদাচারী সাধক ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যা ত্যাগ করবেন এবং স্বীয় গুরুদেবের নামের সঙ্গে আনন্দনাথশব্দ যোগ করে তাঁকে প্রণাম করবেন ও সহস্রারে তাঁর ধ্যান করে পঞ্চোপচারে পূজা করবেন। তারপর ঐঁ-বীজ জপ করে কুণ্ডলিনী-শক্তির ধ্যান করবেন। এর পর তিনি যথাবিধি শৌচাদি নিত্যকর্ম সমাধা করবেন।[৪]

১ তন্মতে সপ্তস্বাচারেষু শৈব-দক্ষিণ-বাম-সিদ্ধান্ত কৌলাচারাঃ পঞ্চ তান্ত্রিকপ্রসিদ্ধাঃ। তত্র পুনঃ পঞ্চস্বাচারেষু দ্বৈবিধ্যমাচারস্য প্রকটিতম্—আচারো দ্বিবিধো দেবি বাম-দক্ষিণভেদতঃ।—মাতৃ ত, ভূমিকা, পৃঃ ৬

২ তান্ত্রিক গুরু, ৪র্থ সং, পৃঃ ৭৬   ৩ কৌ র, পৃঃ ৯

৪ বেদাচারং প্রবক্ষ্যামি শৃণু সর্বাঙ্গসুন্দরি। ব্রাহ্মে মুহূর্তে উত্থায় গুরুং নত্বা যথাবিধিঃ।
আনন্দনাথশব্দান্তে পূজয়েত্তু সাধকঃ। সহস্রারাম্বুজে ধ্যাত্বা উপচারৈস্তু পঞ্চভিঃ।
প্রজপ্য বাগ্‌ভবং বীজং চিন্তয়েৎ পরমাং কলাম্।—প্রাঃ প্রা তো, কাণ্ড ৩, পরিঃ ১, ব সং, পৃঃ ১৪৯

বেদাচারের অন্যতম লক্ষ্য সাধকের বাহ্যাভ্যন্তর শুচিতা। বেদাচারী সাধক সব বিষয়ে সর্বদা যথাশাস্ত্র শুচিশুদ্ধ হয়ে চলবেন। অভ্যাসের দ্বারা শুচিতা ক্রমে তাঁর স্বভাবগত হয়ে যায়।

বৈষ্ণবাচার—বেদাচারের অভ্যাসের দ্বারা বহিঃশুদ্ধি যখন সাধকের স্বভাবগত হয়ে যায় তখন তিনি বৈষ্ণবাচারের সাধনায় প্রবৃত্ত হন। এই আচারে বেদাচারবিহিত সমস্ত বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয়। বৈষ্ণবাচার সম্বন্ধে নিত্যাতন্ত্রে বলা হয়েছে—বৈষ্ণবাচারপরায়ণ সাধক বেদাচারক্রমে সর্বদা নিয়মতৎপর হবেন। মৈথুন এমন কি সে-সম্বন্ধে ব্যাক্যালাপও তাঁর পক্ষে নিষিদ্ধ। এ ছাড়া হিংসা নিন্দা কৌটিল্য মাংসভোজন এই-সব তিনি বর্জন করবেন। রাত্রে কখনও মালা জপ করবেন না বা যন্ত্র স্পর্শ করবেন না। তিনি বিষ্ণুর পূজা করবেন, সর্বকর্ম বিষ্ণুকে সমর্পণ করবেন এবং সর্বদা সমস্ত জগৎকে বিষ্ণুময় ভাববেন।[১]

বৈষ্ণবাচারের দ্বারা সাধকের চিত্তশুদ্ধি হয়। এই আচারকে ভক্তির অবস্থা বলা হয়। কেউ কেউ বলেন বৈষ্ণবাচারে সাতটি ভূমিকা আছে। আবার কেউ কেউ বলেন এতে ভূমিকা সাত নয়, অনেক অর্থাৎ ভক্তির অবস্থা বিবিধ। বৈষ্ণবাচারী সাধক গুরূপদিষ্ট পথে চলেন। গুরুর কোনো আদেশ সম্বন্ধে বিচার করার তাঁর অধিকার নাই। প্রসন্নচিত্তে গুরুর আদেশ মেনে চলাই তাঁর কর্তব্য।[২]

শৈবাচার—বৈষ্ণবাচারের পরে শৈবাচার। বৈষ্ণবাচারের সাধনা সমাপ্ত করে সাধক শৈবাচার অবলম্বন করবেন। এই আচারেও বেদাচারের নিয়মাদি মেনে চলতে হয়। নিত্যাতন্ত্রের মতে—এই আচারে বেদাচারক্রমেই শিব ও শক্তির উপাসনা বিহিত। অধিকন্তু এতে পশুবলির বিধি আছে।[৩]

শৈবাচার-সম্পর্কে আচারভেদতন্ত্রে বলা হয়েছে—যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগযুক্ত হয়ে যথাশাস্ত্র দেবীর পূজা করতে হবে। এমনিভাবে ধ্যান ও সমাধি পর্যন্ত শৈবাচার।[৪]

---

১ বেদাচারক্রমেণৈব সদা নিয়মতৎপরঃ। মৈথুনং তৎকথালাপঃ কদাচিন্নৈব কারয়েৎ।
হিংসাং নিন্দাঞ্চ কৌটিল্যং বর্জয়েন্মাংসভোজনম্। রাত্রৌ মালাঞ্চ যন্ত্রঞ্চ স্পৃশেন্নৈব কদাচন।
বিষ্ণৌ সমর্চয়েদ্দেবি বিষ্ণৌ কর্ম নিবেদয়েৎ। ভাবয়েৎ সর্বদা দেবি সর্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ।
—দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৭, পরিঃ ১, ব সং, পৃঃ ৪৯৯

২ ভাব ও আচার, ক শ অ, পৃঃ ৪২৮

৩ বেদাচারক্রমেণৈব শৈবে শাক্তে ব্যবস্থিতম্। তদ্বিশেষঃ মহাদেবি কেবলং পশুঘাতনম্।
—দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৭, পরিঃ ১, ব সং, পৃঃ ৪৯৯

৪ অষ্টাঙ্গযোগসংযুক্তো যজেদ্দেবীং বিধানতঃ।
যাবদ্ ধ্যানং সমাধিশ্চ তাবৎ শৈবঃ প্রচক্ষ্যতে।—দ্রঃ বিশ্বকোষ, শৈবশব্দের আলোচনা।

শৈবাচারপরায়ণ সাধক সর্বকর্মে শিবভাবনা করবেন। এঁর গুরূপদিষ্ট বিষয়ে বিচার করবার অধিকার আছে। ইনি আপন কর্তব্য সম্বন্ধে গুরুকে প্রশ্ন করতে পারেন। গুরুও শিষ্যের অধিকার অনুসারে দুর্বোধ্য বিষয়ও শিষ্যকে বুঝিয়ে দেন। এইজন্য এই অবস্থাকে জ্ঞানার্জনের অবস্থা বলা হয়।[১] অর্থাৎ এটি জ্ঞানভূমিকা।

দক্ষিণাচার—শৈবাচারের পরে দক্ষিণাচার। এই আচার-সম্পর্কে নিত্যাতন্ত্রে বলা হয়েছে—দক্ষিণামূর্তি মুনি পুরাকালে এই আচারের আশ্রয় নিয়েছিলেন বলে একে বলা হয় দক্ষিণাচার। এই আচার বীর- ও দিব্য-ভাবের প্রথম প্রাবর্তক। এই আচারেও বেদাচার অনুসারে পরমেশ্বরীর পূজা করতে হয় এবং রাত্রে বিজয়া সেবন করে অনন্যমনা হয়ে মন্ত্র জপ করতে হয়।[২]

দক্ষিণাচারের অন্যরকম ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়। দক্ষিণশব্দের অর্থ অনুকূল। এইজন্য অনুকূল আচারকে দক্ষিণাচার বলা হয়।[৩] অনুকূল আচার অর্থ যে-আচারে পিতৃগণ ও দেবতাদি অনুকূল অর্থাৎ প্রসন্ন হন, দেবী দক্ষিণা অর্থাৎ অনুকূল হন সেই আচার।[৪]

দক্ষিণাচারপরায়ণ সাধক ব্রহ্মময়ী শক্তির ত্রিবিধরূপের আরাধনার অধিকারী। দক্ষিণা-কালিকারূপে আদ্যাশক্তির তিনি আরাধনা করেন। দক্ষিণাকালিকাই ত্রিশক্তি অর্থাৎ ত্রিশক্তির মিলিত রূপ। দক্ষিণাচারী সাধকের ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া-শক্তির সম্যক্ জ্ঞানের সঙ্গে শ্রদ্ধা ভক্তি ও দৃঢ় সঙ্কল্পের সংযোগ হয়।[৫] এই আচারে নিজ বর্ণাশ্রমধর্ম পালন করতঃ আত্মাকে দেবীরূপে চিন্তা করে দেবীর পূজা করতে হয়।[৬]

বহিঃশুদ্ধি ও অন্তঃশুদ্ধি এবং শাস্ত্রানুশীলনের দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞানকে সাধক এই আচারে বদ্ধমূল করার চেষ্টা করেন। বেদাচার থেকে দক্ষিণাচার পর্যন্ত আচারচতুষ্টয়কে পশ্বাচার বলা হয়। কারণ এই আচারগুলি পশুভাবের অন্তর্গত।[৭] এই দক্ষিণাচার পর্যন্তই প্রবৃত্তিমার্গের সাধনা বিহিত।[৮]

১ ভাব ও আচার, ক শ অ, পৃঃ ৪২৯

২ দক্ষিণামূর্তিমুনিনা আশ্রিতোঽসৌ যতঃ পুরা। অতএব মহেশানি দক্ষিণাচার উচ্যতে।
প্রাবর্তকোঽয়মাচারঃ প্রথমো দিব্যবীরয়োঃ। বেদাচারক্রমেণৈব পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্।
স্বীকৃত্য বিজয়াং রাত্রৌ জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ।—প্রাঃ প্রা তো, কাণ্ড ৭, পরিঃ ১ ম সং, পৃঃ ৪৯৯

৩ ভাব ও আচার, ক শ অ, পৃঃ ৪২৯

৪ সর্বত্র পিতৃদেবাদ্যৌ যস্মাদ্ভবতি দক্ষিণঃ। দেবী চ দক্ষিণা যস্মাৎ তস্মাদ্দক্ষিণ উচ্যতে।
—কালিকাপুরাণবচন, শ্রঃ শ ম, শ্লোক ২২০-এর সৌ অ, পৃঃ ১৮৩-৮৪

৫ Ś. Ś., 4th Ed., p. 156 ৬ প্রঃ কৌ ম, পৃঃ ১০

৭ ভাব ও আচার, ক শ অ, পৃঃ ৪২৯ ৮ Ś. Ś., 4th Ed., p. 156

দক্ষিণাচারের সাধনায়ও মুক্তিলাভ হতে পারে। কিন্তু কোনো কোনো তন্ত্রে এ সাধনাকে বিশেষ শ্লাঘ্য মনে করা হয় নি। যেমন কৌলাচারের সঙ্গে দক্ষিণাচারের তুলনা করে গন্ধর্বতন্ত্রে বলা হয়েছে—উভয় আচারেই ভবজলধি পার হওয়া যায় বটে, তবে দক্ষিণাচারে দুঃখে এবং কৌলাচারে সুখে পার হওয়া যায়। দক্ষিণাচারে পার হওয়া যেমন কলসীতে ভর করে সাঁতার দিয়ে পার হওয়া আর কৌলাচারে উত্তম পোতে আরোহণ করে পার হওয়া।[১]

অবশ্য এ মন্তব্য সাম্প্রদায়িক। কাজেই এ সম্বন্ধে তীব্র মতভেদ থাকবে।

বামাচার—দক্ষিণাচারের পরবর্তী আচার বামাচার। বামা অর্থাৎ স্ত্রীলোক নিয়ে এই আচারে সাধনা হয় বলে একে বামাচার বলা হয় শিক্ষিত সাধারণের মধ্যেও এ রকম একটি ধারণা প্রচলিত আছে। কিন্তু এটি ভ্রান্ত ধারণা। বামাচারের মর্ম সাধারণের অজ্ঞাত বলেই এ রকম ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে।

বামাচারী কোনো কোনো সম্প্রদায়ের সাধুরা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী; এঁরা স্ত্রীলোক নিয়ে সাধনা করেন না। এই ধরণের বামাচারীদের মধ্যে আছেন ওঘদ সাধুরা; বটুক ভৈরবের উপাসকেরা; কন্থাধারী সম্প্রদায়; গোরক্ষনাথ, সিতনাথ এবং মৎস্যেন্দ্রনাথের অনুবর্তীরা।[২] কাজেই বামাচার সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা যে ভ্রান্ত সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

তন্ত্রশাস্ত্রবিদ্ সাধনমর্মজ্ঞ ব্যক্তিরা বামাচারের কি ব্যাখ্যা দিয়েছেন দেখা যাক। স্বামী তারানন্দ তীর্থ লিখেছেন[৩]—নিরুক্তে বাম শব্দের অর্থ করা হয়েছে প্রশস্য।[৪] দুর্গাচার্য বলেছেন যাঁরা প্রজ্ঞাবান্ তাঁরাই প্রশস্য (য এব হি প্রজ্ঞাবন্তস্ত এবহি প্রশস্যা ভবন্তি)। কাজেই প্রশস্য অর্থ প্রজ্ঞাবান্। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় প্রশস্য যোগীর নামই বাম এবং এই যোগীর যে-মার্গ তাই বামমার্গ। কাজেই বামাচার অর্থ প্রশস্য যোগীর অবলম্বিত আচার।

বামশব্দের অনুরূপ অর্থ করেছেন কৌণ্ডিণ্য। তিনি পাশুপতসূত্রের (২।১) ভাষ্যে বামশব্দের অর্থ করেছেন শ্রেষ্ঠ।[৫] কাজেই শ্রেষ্ঠ সাধকের আচার বামাচার।

১ উভাভ্যামপি শক্যং স্যাত্তর্তুং ভবপয়োনিধিম্ ।
দক্ষিণেনাপি কৌলেন দুঃখেনাপি সুখেন চ ।
কুম্ভসংতরণৈস্তুং পোতযানেন বাম্বুধিম্ ।—গ ত ৩৭।৩৩-৩৪

২ S. S., 4th Ed., p. 168 ৩ বামমার্গকা যথার্থ স্বরূপ, ক প অ, পৃঃ ১৪৯

৪ অস্রেমা অনেদ্যা অনেদ্যঃ অনবদ্যঃ অনভিশস্ত্যঃ উক্থ্যঃ সুনীথঃ পাকঃ বামঃ
বয়ুনমিতি দশ প্রশস্য নামানি ।—নিঘণ্টু ৩।৮

৫ কৌণ্ডিন্য যে-অর্থ করেছেন তার সমর্থনে এই শ্লোকটি উদ্ধার করেছেন—
"পুরুষধবলনৃত্যেষুহর্ষিতুলপদ্মস্য । বামঃ শ্রেষ্ঠৈষবক্ত্রেষু নববর্ষেষু কীর্তিতঃ ।"

মেরুতন্ত্রে বামাচারে অধিকারী সাধকের সম্বন্ধে বলা হয়েছে—পরদ্রব্যের প্রতি যিনি অন্ধ, পরস্ত্রীর সম্পর্কে নপুংসক; পরনিন্দায় মূক এবং সর্বদা জিতেন্দ্রিয়, সেই ব্রাহ্মণেরই আছে বামাচারে অধিকার।[১]

এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় শ্রেষ্ঠ প্রশস্ত সাধকই বামাচারী হতে পারেন এবং এ রকম সাধকের আচারই বামাচার।

বামাচারের অন্য ব্যাখ্যাও আছে। স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন[২]—"বাম-শব্দ এখানে 'বিপরীত' অর্থবাচক। অর্থাৎ পঞ্চমকারাদি গ্রহণে ইতরসাধারণে যে-অসংযত আচরণ করে থাকে তদ্বিপরীত আচরণযুক্ত হয়ে পূর্ণসংযমে প্রতিষ্ঠিত থাকতে শিক্ষা দেওয়া বামাচারের উদ্দেশ্য। অথবা এই সব পদার্থগ্রহণে ইতরসাধারণের মনে অধর্মভাবের উদ্দীপনা হয়, তদ্বিপরীত, সুপ্তা কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগরিত করে সাধককে অধিকতর ধর্মভাবাপন্ন সংযত করা ঐ আচারের লক্ষ্য।

তন্ত্র বলেন কুণ্ডলিনী জাগরিত হয়ে সহস্রারে উঠবার সময় মূলাধার হতে আরম্ভ করে প্রতিচক্রকে বামাবর্তে পরিবেষ্টন ও তচ্চক্রস্থ বর্ণসকলকে নিজাঙ্গে মিলিত করে নেন, সমাধির পর নামবার সময় প্রতিচক্রকে দক্ষিণাবর্তে পরিবেষ্টন করতে করতে নামেন। কুণ্ডলিনী শক্তিকে এই বামাবর্তে পরিভ্রমণ করিয়ে সহস্রারে উঠিয়ে সমাধির শিক্ষা যে-আচার দেয় তাই বামাচার।"

বামাচারের ব্যাখ্যা অন্যভাবেও করা হয়। "বামাচার শব্দের অর্থ প্রতিকূলাচার। দক্ষিণাচার পর্যন্ত সাধক যে-ভাব অবলম্বন করে চলে এসেছেন তারই প্রতিকূল ভাব অবলম্বিত হয় বামাচারে। দক্ষিণাচারের চরম অবস্থায় সাধকের মনে নির্বেদের বীজ অঙ্কুরিত হয় আর তা হলে আধ্যাত্মিক উন্নতির আবেগ ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। সাধক এ যাবৎ সংসারে থেকেই সব কাজকর্ম করেছেন কিন্তু এখন তিনি সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। আর এই জন্যই তিনি বামাচার বা প্রতিকূলাচার অবলম্বন করেন।"[৩]

তন্ত্রমতে পরশিব থেকে ক্ষিতি তত্ত্ব পর্যন্ত বহির্মুখী সৃষ্টিপ্রবাহ আর ক্ষিতিতত্ত্ব থেকে পরশিব পর্যন্ত তদ্‌বিপরীত লয়প্রবাহ। প্রথমটি প্রবৃত্তি, দ্বিতীয়টি নিবৃত্তি। প্রবৃত্তিমুখে জীবের সংসার, জীব নানা সংস্কারাদির পাশবদ্ধ পশু আর নিবৃত্তিমুখে জীব পাশমুক্ত শিব। পূর্বেই

১ পরদ্রব্যেষু যোঽন্ধশ্চ পরস্ত্রীষু নপুংসকঃ। পরাপবাদে যো মূকঃ সর্বদা বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
তস্যৈব ব্রাহ্মণস্যাত্র বামে স্যাদধিকারিতা।—দ্রঃ বামমার্গকা যথার্থ স্বরূপ, ক ন অ, পৃঃ ১৪৯; উক্ত পাঠান্তর সহ এই বচন পুরশ্চর্যার্ণব প্রথম খণ্ডের ২৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হয়েছে।

২ ভারতে শক্তিপূজা, ৫ম সং, পৃঃ ১০২-১০৩

৩ তাব ঔর আচার, ক ন অ, পৃঃ ৪২৯

লক্ষ্য করা গেছে বাম অর্থ বিপরীত।[১] জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিপরীত নিবৃত্তি। সেই নিবৃত্তিমূলক সাধনা যে-আচারে বিহিত তাই বামাচার। সহজ কথায় বলা যায় প্রবৃত্তির বিপরীত মার্গের সাধনা যে-আচারে বিহিত তাই বামাচার। প্রবৃত্তির পথে নিবৃত্তির সাধনা বামাচারের বিশেষত্ব।

স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ লিখেছেন—বামাচারের ভিত্তি গভীর নিবৃত্তিজ্ঞান। যে-প্রক্রিয়ায় জীবের সংস্কার ও প্রবৃত্তির পাশ সৃষ্ট ও সংরক্ষিত হয় এবং জীব সেই পাশের দ্বারা বদ্ধ পশু হয়ে যায় সেই প্রক্রিয়াকে একেবারে উল্টে দেওয়া এর লক্ষ্য।[২]

স্বামীজী আরও লিখেছেন[৩]—যে-সব পাশ জীবকে বদ্ধ করে রেখেছে তাদের এমনিভাবে রূপান্তরিত করতে হবে, তাদের এমনিভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, যাতে তারা বন্ধনমুক্তির কারণ হয়ে উঠে। এ বিষয়টি তন্ত্রে বড় সুন্দরভাবে প্রকাশ করা হয়েছে—যার দ্বারা পতন হয় তার দ্বারাই উত্থান হয়।[৪] বিজ্ঞ ব্যক্তির প্রয়োগগুণে প্রাণনাশকারী বিষও অমৃত হয়ে উঠে। এর অন্তর্নিহিত তত্ত্বটি অভ্রান্ত। এই তত্ত্বই তথাকথিত বামাচারের সাধনা ও সিদ্ধান্তের ভিত্তি।

বাহ্য অনুষ্ঠানের দিকে লক্ষ্য রেখেও বামাচারের ব্যাখ্যা করা হয়। বাড়বানলীয়তন্ত্রে আছে—যে-আচারে পঞ্চমকার ব্যবহৃত হয় এবং বাম হাতে পূজা জপ ও হোম হয় তাই বামাচার আর তার বিপরীত দক্ষিণাচার।[৫] অবশ্য তন্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা এরূপ ব্যাখ্যার উপর কোনো গুরুত্ব আরোপ করেন না।

বিভিন্ন বামাচার—তন্ত্রে বামাচার কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বিভিন্ন রকমের সাধনা বামাচার এই সাধারণ নামে অভিহিত হয়েছে দেখা যায়। মেরুতন্ত্রে শাবর সিদ্ধান্ত চীন বাম ও কৌলিক এই পাঁচ প্রকার বামাচারের উল্লেখ আছে। উক্ত তন্ত্রের কথায়—কৌলিক বা কৌলাচার অঙ্গুষ্ঠস্থানীয়, বামাচার তর্জনীতুল্য, চীনক্রম বা চীনাচার মধ্যমাস্থানীয়, সিদ্ধান্তাচার অনামিকাতুল্য আর শাবর কনিষ্ঠাতুল্য।[৬] হাতের পাঁচ আঙুল

১ বামং বিরুদ্ধরূপং তু বিপরীতং চ গীয়তে। বামেন সুখদা দেবী বামদেবী ততঃ স্মৃতা।
—দেবীপুরাণবচন, দ্রঃ ল স ১৪৮-এর সৌ ভা, পৃঃ ১১৩

২ Tantra As A Way Of Realisation, C. Her. I., Vol. IV, p. 228

৩ Ibid p. 231

৪ তুলনীয়—যৈরেব পতনং দ্রব্যৈঃ সিদ্ধিস্তৈরেব চোদিতা।—কু ত ৫।৪৮

৫ যোগাৎ পঞ্চমকারাণাং বামহস্তেন পূজনাৎ। জপাদ্ধোমাচ্চ বামঃ স্যাদ্দক্ষিণস্তদ্বিপর্যয়াৎ।
—দ্রঃ পু চ, তঃ ১ পৃঃ ২০

৬ কৌলিকে হ্যঙ্গুষ্ঠতাং প্রাপ্তো বামঃ স্যাত্তর্জনীসমঃ। চীনক্রমো মধ্যমঃ স্যাৎ সিদ্ধান্তীয়োঽপরো ভবেৎ।
কনিষ্ঠঃ শাবরো মার্গ ইতি বামস্য পঞ্চধা।—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ২২

যেমন আঙুল এই সাধারণ নামে পরিচিত তেমনি উক্ত পাঁচটি আচারও বামাচার এই সাধারণ নামে পরিচিত।

সাধারণতঃ বামাচার শাক্তদের মধ্যেই প্রচলিত মনে করা হয়। সন্ধানী ব্যক্তিদের মতে এরূপ ধারণা ভ্রান্ত। কেন না জানা যায় বামাচারের সাধনা শাক্ত ভিন্ন অন্য সম্প্রদায়েও প্রচলিত ছিল। এমন কি বৌদ্ধ ও জৈনদের মধ্যেও বামাচারের উল্লেখ পাওয়া যায়।[1] তন্ত্রবচনেও এই অভিমতের সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে বলা হয়েছে—কোথাও কোথাও গণেশোপাসক, রুদ্রোপাসক, বিষ্ণু-উপাসক, সূর্যোপাসক এবং স্বয়ম্ভু-উপাসকদের মধ্যে বামাচার দেখা যায়। বৈদিকদের মধ্যেও কোথাও কোথাও বামাচার আছে। ভৈরবেরা (শৈবসম্প্রদায়) বামাচারতৎপর। ক্ষেত্রপালের উপাসক, চীনক্রমের সাধক এবং কাপালিক—এঁরা বামাচার-পরায়ণ। পাশুপতেরাও বামমার্গে প্রতিষ্ঠিত। বৌদ্ধ, কেরল, বীর-বৈষ্ণব, শাম্ভব, চান্দ্র এবং অঘোর-সম্প্রদায়ের লোকেরা বামমার্গপরায়ণ।[2] বামাচারীদের মধ্যে কালামুখ, ভাণ্ডিকের, দিগম্বর—এঁরাও আছেন।[3] শক্তিসঙ্গমতন্ত্রের আলোচ্য উক্তির ঐতিহাসিক যাথার্থ্য নির্দ্ধারণ করার মতো কোনো উপাদান আমরা পাই নি। কাজেই এ সম্বন্ধে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। তবে সাধারণভাবে বলা যায় উপরে বামাচারের যে বিভিন্ন ব্যাখ্যা লক্ষ করা গেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে শাক্ত ভিন্ন অন্য সম্প্রদায়েও বামাচারের সাধনা প্রচলিত থাকা খুবই সম্ভবপর।

বামাচারলক্ষণ—বামাচারী সাধক সম্পর্কে নিত্যাতন্ত্রের নির্দেশ—সাধক দিনের বেলা ব্রহ্মচারী হয়ে সমাহিতচিত্তে দেবীর অর্চনা করবেন আর রাত্রে পঞ্চতত্ত্বের দ্বারা অর্চনা করবেন।[4] পঞ্চতত্ত্বের অভাব হলে অনুকল্পের দ্বারা অর্চনা করবেন।[5] এ ছাড়া আরও অনেকগুলি বিধিনিষেধ তাঁকে মেনে চলতে হয়। যেমন তিনি বৈদিক ক্রিয়াকর্ম পরিত্যাগ করবেন, তন্ত্রোক্ত শ্রাদ্ধতর্পণাদি করবেন, বিষ্ণুপূজা ও বিষ্ণুনাম উচ্চারণ করবেন না আর তুলসীপত্র স্পর্শ করবেন না।[6]

১ Ś. Ś., 4th Ed., p. 537

২ কচিদ্‌গণেশরুদ্রেষু বিষ্ণুসৌরস্বয়ম্ভুবে। বামাচারো বৈদিকেঽপি ভৈরবা বামতৎপরাঃ।
ক্ষেত্রপালা বামপরাশ্চীনাঃ কাপালিকাস্তথা। তথা পাশুপতা দেবি বামমার্গে প্রতিষ্ঠিতাঃ।
বৌদ্ধাশ্চ কেরলা যে চ বীরবৈষ্ণবশাম্ভবাঃ। চান্দ্রাশ্চাঘোরা যেঽপি বামাচারপরায়ণাঃ।

—শ স ত, তা খ, ১।৯২-৯৪

৩ Ś. Ś., 4th Ed., p. 168

৪ দিবসেষু মহেশানি ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ। পঞ্চতত্ত্বানুকল্পেন রাত্রৌ দেবীং সমর্চয়েৎ।

—প্রাঃ প্রা তো, কাণ্ড ৭, পরিঃ ১, ব সং, পৃঃ ৪৯৯

৫ অভাবে সর্বদ্রব্যাণামনুকল্পঃ কলৌ যুগে।—পিচ্ছিলাতন্ত্রবচন, প্রাঃ ঐ, পৃঃ ৪১৮ ৬ কৌ ম, পৃঃ ১৭

আচারভেদতন্ত্রে বামাচার সম্বন্ধে একটি গূঢ়তত্ত্বের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—বামাচারী সাধককে বামা হয়ে পরাশক্তির আরাধনা করতে হবে।[১] ভাস্কররায় সেতুবন্ধে বামাশব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন—প্রলয়ের সময় ষট্‌ত্রিংশতত্ত্ব যাঁর দ্বারা নিঃশেষে কবলীকৃত হয়ে যাঁর মধ্যে বীজাকারে সূক্ষ্মশরীরে অবস্থান করে এবং সেই সেই বীজের সেই সেই রূপে অঙ্কুরিত স্থূল শরীরও যার মধ্যে অবস্থিত সেই শিবাকে বামা বলা হয়। বিশ্বকে বমন করেন বলে দেবী বামা এইটি বামাশব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ।[২]

কাজেই দেখা যাচ্ছে সাধক দেবীভাবাপন্ন হলে পরেই বামাচারে সাধনা করতে পারেন, নৈলে পারেন না।

বামাচারে সাধ্যা—বামাচারে দেবীর সব রূপের সাধনা হয় না। কোন কোন রূপে দেবী বামাচারে সাধ্যা এবং কোন কোন রূপে দক্ষিণাচারে সাধ্যা তন্ত্রশাস্ত্রে তারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শক্তিসঙ্গমতন্ত্র অনুসারে কালী তারা সুন্দরী ভৈরবী ছিন্নমস্তা মাতঙ্গী বগলা—এঁরা বামাচারপ্রিয়া[৩] এবং বামাচারে সিদ্ধিদায়িনী। আর কমলা ভুবনেশ্বরী বালা ধূমাবতী—দক্ষিণাচারে এঁদের সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়, তবে বামাচারেও হয়।[৪]

কঠিন সাধনা—সাধারণতঃ বামাচারের সাধনা হয় পঞ্চতত্ত্বযোগে। পঞ্চতত্ত্ব সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাবে। এখানে শুধু এইমাত্র বলা যায় যে পঞ্চতত্ত্বযোগে সাধনা অত্যন্ত কঠিন। বামাচারের সাধনা যে কত কঠিন রুদ্রযামলের নিম্নোদ্ধৃত বচন থেকে তা অনুমান করা যেতে পারে—বামে রতিকুশলা রমণী, দক্ষিণে মদ্যপাত্র, সম্মুখে চণকবটিকারূপ (ছোলার ডালের বড়া) মুদ্রা আর মুখশুদ্ধির জন্য শূয়ণ, কাছে সরস মধুর সুরে তন্ত্রী-বীণা বাজতে থাকে, সদ্‌গুরু থাকেন আর চলে সংকথালাপ— এই বামাচার। এ আচার পরম গহন, যোগীদেরও অগম্য।[৫]

---

১ বামাচারো ভবেৎ তত্র বামা ভূত্বা যজেৎ পরাম্।—দ্রঃ T. T., Vol. IX, p. 7.

২ কবলীকৃতানাং নিঃশেষাণাং ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বানাং যানি বীজানি সূক্ষ্মশরীররূপাণি যানি চ স্থূলশরীরাণি তত্তদঙ্কুরাণি তত্তদ্রূপতয়া স্থিতা সতীয়ং শিবা বামেত্যুচ্যতে। বামা বিশ্বস্য বমনাদিতি ব্যুৎপত্তিঃ।

—বা নি, ৪।৮-এর সে ব

৩ কালী তারা ছিন্নমস্তা সুন্দরী বগলামুখী। ভৈরবী চৈব মাতঙ্গী বামাচারপ্রিয়া সদা।—শ স ত, তা খ, ১।৯০

৪ কমলা ভুবনা বালা তথা ধূমাবতী শিবে। দক্ষিণাচারযোগেন সিদ্ধ্যত্যেব ন সংশয়ঃ।
বামাচারেণাপি তথা সিদ্ধ্যত্যেব মহেশ্বরি।—ঐ ১।৮৪-৮৫

৫ বামে রামা রমণকুশলা দক্ষিণে চালিপাত্রম্ অগ্রে মুদ্রাশ্চণকবটকা শূকরস্যোষ্ণশুদ্ধিঃ।
তন্ত্রীবীণা সরসমধুরা সদ্‌গুরুঃ সৎকথায়াং বামাচারঃ পরমগহনো যোগিনামপ্যগম্যঃ।

—দ্রঃ পু চ, অ ১, পৃঃ ২৬-২৭

অধিকারী—রুদ্রযামলের বচনটির তাৎপর্য এই যে চিত্তবিকারের এ রকম উপকরণপ্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও যে-সব সাধক অবিচলিত মানসে দেবতাধ্যানতৎপর থাকতে পারেন সেই-সব্ বীরবর্য সাধকেরাই বামাচারে অধিকারী, বিষয়লম্পটেরা নয়।[১] আমরা পূর্বেই বলেছি এ রকম সাধককে দেবীভাবাপন্ন হতে হবে। এই প্রকার লক্ষণযুক্ত বীরভাবের যোগী সাধক বামাচারে অধিকারী।

বর্ণভেদ—আবার বর্ণের বিচারে কোন কোন বর্ণ বামাচারে অধিকারী সে সম্বন্ধেও তন্ত্রশাস্ত্রের নির্দেশ আছে। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য তিন বর্ণের বামাচারে অধিকার সাধারণভাবে সবতন্ত্রেই স্বীকৃত বলা যায়। ব্রাহ্মণ সম্বন্ধেও সাধারণ মত এই যে শ্রৌতাচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণেরা বামাচারে অধিকারী। বাড়বানলীয়তন্ত্রাদিতে শ্রৌতাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণের পক্ষে বামাচার নিষেধ করা হয়েছে। যেমন বাড়বানলীয়তন্ত্রে বলা হয়েছে—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা দক্ষমার্গে অর্থাৎ দক্ষিণাচারে অধিকারী। দ্বিজ (এখানে দ্বিজ অর্থ শ্রৌতাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ) ভিন্ন অন্য তিন বর্ণ বাম ও কৌলাচারে অধিকারী। দক্ষমার্গভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ বামমার্গগামী হলে ইহলোকেই সিদ্ধি অর্থাৎ ভুক্তি পাবেন কিন্তু কখনো মুক্তি পাবেন না। বেদমার্গত্যাগী কৈবল্যেচ্ছাবর্জিত সিদ্ধিকামী ব্রাহ্মণ নরকে যাবেন। যে-সব ব্রাহ্মণ বেদমার্গ ত্যাগ করে তন্ত্রমার্গ অবলম্বন করবেন তাঁরা নরকভোগ করার পর ব্রহ্মরাক্ষস হবেন। বেদসম্মত তান্ত্রিক দক্ষিণমার্গের অনুসরণ করলে ব্রাহ্মণ ইহলোকে নানা সিদ্ধিলাভ করবেন এবং দেহান্তে অমৃতত্ব লাভ করবেন।[২]

মহাকালসংহিতায় শুধু ব্রাহ্মণ নয়, দ্বিজের পক্ষেই বামাচার নিষেধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে—শূদ্র বামাদি আচারে আরাধনা করবেন।[৩] পুরশ্চর্যার্ণবে[৪] এই বচনের ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে দ্বিজ বলতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বুঝতে হবে। বামাদি শব্দের দ্বারা কুলাচারও বুঝান হয়েছে। কুলাচারও শূদ্রের পক্ষে প্রশস্ত। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষে কুলাচার প্রশস্তও নয়, নিষিদ্ধও নয়। ব্রাহ্মণের পক্ষে কুলাচার নিষিদ্ধ। সিদ্ধান্তসারেও

১ দ্রঃ পু চ, তঃ ১, পৃঃ ২৭, পাদটীকা।

২ ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা দক্ষমার্গাধিকারিণঃ। দ্বিজবর্জাস্ত্রয়ো বর্ণা বামকৌলাধিকারিণঃ।
দক্ষমার্গপরিভ্রষ্টো ব্রাহ্মণো বামমার্গগঃ। ইহৈব সিদ্ধিমাপ্নোতি নাপবর্গং কদাচন।
বেদমার্গপরিত্যাগী কৈবল্যেচ্ছাবিবর্জিতঃ। সিদ্ধিকামী বামমার্গী ব্রাহ্মণো নারকী ভবেৎ।
বেদমার্গং পরিত্যজ্য তন্ত্রমার্গৈকতৎপরাঃ। ব্রাহ্মণা নিরয়ং ভুক্ত্বা ভবেয়ুর্ব্রহ্মরাক্ষসাঃ।
বৈদিকং তান্ত্রিকং মার্গং দক্ষিণং ব্রাহ্মণশ্চরন্। ইহ সিদ্ধীশ্বরো ভূত্বা দেহান্তেঽমৃতমশ্নুতে।
—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ২২-২৩

৩ বামাদিনা যজেচ্ছূদ্রো দক্ষিণেন দ্বিজাতয়ঃ।—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ২০   ৪ দ্রঃ ঐ

বলা হয়েছে ব্রাহ্মণ কুলাচার অবলম্বন করবেন না, করলে তাঁর ব্রাহ্মণ্যহানি হবে।[১] কুলাচার সম্বন্ধে এই মত কিন্তু সবাই স্বীকার করেন না। তবে কুলাচারের কথা প্রসঙ্গক্রমে এসে গেছে। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাচ্ছে।

মেরুতন্ত্রে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মবিদ্যা, ব্রাহ্মণাচার, ব্রাহ্মণসংস্কার, ব্রাহ্মণপিতা ও ব্রাহ্মণীমাতা এই পাঁচটি লক্ষণ নির্দেশ করা হয়েছে।[২] বলা হয়েছে এই পঞ্চলক্ষণযুক্ত ব্রাহ্মণের পক্ষে বামাচার নিষিদ্ধ। কিন্তু চতুর্লক্ষণযুক্ত[৩] এবং একলক্ষণযুক্ত[৪] ব্রাহ্মণের পক্ষে বামাচার ফলপ্রদ।

তবে সাধারণভাবে মেরুতন্ত্রেরও অভিমত— বামমার্গে শূদ্রাদি-যবনান্ত লোকেদের সিদ্ধিলাভ হয়।[৫]

বামমার্গী ব্রাহ্মণ—বামমার্গস্থিত ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে এই তন্ত্রের নির্দেশ— বামমার্গী ব্রাহ্মণ কখনো তুলসী স্পর্শ করবেন না, বৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করবেন না, বেদমার্গী ব্রাহ্মণকে প্রণাম করবেন না। আমাকে বন্ধুবান্ধবেরা নিন্দা করুক, স্ত্রীপুত্রাদি ত্যাগ করুক, আমাকে দেখে লোকে হাসুক, রাজা আমাকে দণ্ড দিন, রোগদারিদ্র্য এ-সব দুঃখের দ্বারা সর্বদা আমি পীড়িত হই, লক্ষ্মী থাকুন আর যান, তবু আমি এই পথ পরিত্যাগ করব না— বামাচারের সাধনার প্রতি যে-ব্রাহ্মণের নিষ্ঠাভক্তি এমনি দৃঢ় তিনিই এতে সিদ্ধিলাভ করতে পারবেন।[৬]

কথাগুলি বামাচারপরায়ণ ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে বলা হলেও সাধারণভাবে সাধকমাত্র-সম্পর্কেই প্রযোজ্য।

উপরে উদ্ধৃত তন্ত্রবচন পর্যালোচনা করলে স্পষ্টই বোঝা যায় অন্ততঃপক্ষে মেরুতন্ত্র রচনার সময়ে ব্রাহ্মণের পক্ষে বামাচার তাঁর আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের এবং সমাজের কাছে আদৃত ছিল না।

বামাচার ও দক্ষিণাচার—তবে বামাচার ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ কিনা এ বিষয়ে

---

১ ব্রাহ্মণ্যহানিহেতুত্বাৎ কুলাচারং ন চাচরেৎ।—মেঃ পূ চ, তঃ ১, পৃঃ ২৪

২ ব্রহ্মবীজং তথা ক্ষেত্রং সংস্কারা ব্রহ্মসত্তমাঃ। ব্রাহ্মণাচরণাদ্ ব্রহ্মবিদ্যাভি ব্রাহ্মণো ভবেৎ।—মেঃ ঐ, পৃঃ ২৫

৩ চতুর্লক্ষণসংযুক্তো বামতন্ত্র ফলপ্রদঃ।—মেঃ ঐ, পৃঃ ২৬

৪ একলক্ষণসংযুক্তো বামতন্ত্র ফলপ্রদঃ।—মেঃ ঐ

৫ শূদ্রাদিযবনান্তানাং সিদ্ধির্বামপথে স্থিতা।—মেঃ ঐ

৬ বামমার্গস্থিতো বিপ্রস্তুলসীং ন কচিৎ স্পৃশেৎ। ন স্পৃশেদ্বৈষ্ণবং বিপ্রং প্রণমেন্ন চ বৈদিকম্।
নিন্দন্তু বান্ধবাঃ সর্বে ত্যজন্তু স্ত্রীসুতাদয়ঃ। জনা হসন্তু মাং দৃষ্ট্বা রাজানো দণ্ডয়ন্তু বা।
রোগদারিদ্র্যদুঃখাদ্যৈঃ পীড়িতোঽপ্যনিশং হ্যহম্। লক্ষ্মীস্তিষ্ঠতু বা যাতু ন মুঞ্চামি পদং স্থিরম্।
এবং যস্য দৃঢ়া ভক্তিঃ স বামে সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ।—মেঃ ঐ

সর্ববাদিসম্মত কোনো সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না। তা ছাড়া বামাচার ও দক্ষিণাচার এই উভয় আচার সম্বন্ধে ধারণাও সর্বত্র একরকম ছিল মনে হয় না। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ভাস্কররায় বামমার্গ ও দক্ষিণমার্গ সম্বন্ধে যে-আলোচনা করেছেন (দ্রঃ ল স, সে ব, পৃঃ ১৮৩) তার উল্লেখ আমরা পূর্বেই করেছি। সেই আলোচনায় তিনি বামমার্গ ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ এমন কথা বলেন নি আর স্বমতের সমর্থনে কালিকাপুরাণ থেকে যে-সব বচন উদ্ধৃত করেছেন তাতেও এ রকম কোনো কথা নাই। ভাস্কররায় দক্ষিণমার্গ ও বামমার্গের আলোচনায় লিখেছেন[১]—বামমার্গে স্ব স্ব বর্ণাশ্রমবিহিত যাবতীয় কর্ম, অগ্নিহোত্রাদি শ্রৌতকর্ম, অষ্টকাদি স্মার্তকর্ম, মন্ত্রসিদ্ধ্যাদি তান্ত্রিক কর্ম—এই-সব কর্মে যে যে দেবতা প্রধানভূত বা অঙ্গভূত তাঁদের স্থানে সর্বত্র সাধকের স্বীয় উপাস্য দেবতার ভাবনা করতে হবে; সেই সেই দেবতাবাচক পদের পরে স্বীয় উপাস্য দেবতাবাচকপদ বিশেষণরূপে সর্বমন্ত্রে ব্যবহার করতে হবে। এরূপ মার্গে দেবঋণ ঋষিঋণ এবং পিতৃঋণের পরিশোধ হয় না বলে পাতক হয়। দক্ষিণমার্গে শ্রৌতাদিকর্মের অঙ্গদেবতাস্থানে স্বীয় উপাস্য দেবতার ভাবনার নির্দেশ নাই। তা ছাড়া যে যে দেবতাবিষয়ক শাস্ত্রে যে যে কর্মবিহিত হয়েছে সে-সব কর্ম স্বীয় উপাস্য দেবতার আরাধনার অঙ্গ এমন কোনো বিধি নাই। এইজন্য এই মার্গে পূর্বোক্তরূপ ঋণশোধের অভাবজনিত পাপ হয় না বলে এই মার্গে ঝটিতি মোক্ষলাভ হয়। বামমার্গেও মোক্ষলাভ হয় কিন্তু পূর্বোক্ত ঋণশোধের অভাবজনিত কিয়ৎকালের প্রতিবন্ধকের জন্য কিঞ্চিৎ বিলম্বে হয়। বামমার্গের অনুষ্ঠান কঠিন এবং এতে মোক্ষলাভও বিলম্বে হয়। তবু শিষ্ট ব্যক্তির বামমার্গে প্রবৃত্তি হয় কেন? তার কারণ ইহজন্মেই ভাগমন্দ ঐহিক ফলভোগের লিপ্সায় মোক্ষলাভে স্বল্প বিলম্ব সহ্য করা যায়। বামমার্গ ভুক্তিমুক্তি প্রদান করে বলে বৈষয়িক শিষ্ট ব্যক্তিদের এতে প্রবৃত্তি হওয়া সম্ভব। কিন্তু ঐহিক ভোগবিরক্ত শিষ্ট

১ তত্র বামমার্গো নাম স্বস্ববর্ণাশ্রমবিহিতানি যাবন্তি কর্মাণি, শ্রৌতান্যগ্নিহোত্রাদীনি, স্মার্তান্যষ্টকাদীনি, তান্ত্রিকাণি মন্ত্রসিদ্ধ্যাদীনি, তেষু সর্বেষু যা যা দেবতাঃ প্রধানভূতা অঙ্গভূতা বা তত্তৎস্থানে স্বোপাস্যামেব দেবতাং সর্বত্র ভাবয়েৎ। তত্তদ্দেবতাবাচকপদোত্তরং বিশেষণত্বেন স্বদেবতাবাচকপদং সর্বমন্ত্রেষু বিনিক্ষিপেদিত্যাকারকঃ। ঈদৃশে মার্গে দেবর্ষিপিতৃঋণশোধনাভাবজন্যং পাতকম্‌। দক্ষিণমার্গে তু শ্রৌতাদিতত্তৎকর্মাঙ্গদেবতাস্থানে স্বোপাস্যদেবতৈব ভাবনীয়েতি ন নির্বন্ধঃ অপিতু তত্তদ্দেবতাবিষয়কতন্ত্রেষু যানি কর্মাণি বিহিতানি তদঙ্গত্বেনৈবেতি সর্বকর্মণামুপযোগাভাবাদস্মিন্মার্গে তাদৃশং পাতকং নাস্তীতি ঝটিতি মোক্ষঃ। বামমার্গে তু বিলম্বিতঃ। ঋণশোধনাভাবেন কিঞ্চিৎকালং প্রতিবন্ধাৎ। নচৈবং সতি অনুষ্ঠানতোঽপি কঠিনে মোক্ষাংশেঽপি বিলম্বিতে সাধনে কথং শিষ্টানাং বামমার্গে প্রবৃত্তিরিতি বাচ্যম্‌। ঐহিকানামুচ্চাবচফলানামিহৈব জন্মনি ভোগলিপ্সয়া মোক্ষে স্বল্পবিলম্বস্য সোঢ়ব্যত্বাৎ। ভুক্তিমুক্তিপ্রদত্বেন বৈষয়িকশিষ্টানাং প্রবৃত্তিসম্ভবাৎ। ঐহিকভোগবিরক্তশিষ্টানাং তু মোক্ষে বিলম্বস্যাসোঢ়ব্যত্বাৎ দক্ষিণ এব মার্গে প্রবৃত্তিরিতি বিবেকঃ।—দ্রঃ ল স, ২২০-এর সৌ ভা, পৃঃ ১৮৩

ব্যক্তিদের মোক্ষলাভে বিলম্ব সহ্য হয় না বলে তাঁদের দক্ষিণমার্গেই প্রবৃত্তি হবে এইটিই যুক্তিযুক্ত।

সিদ্ধান্তাচার—বামাচারের পর সিদ্ধান্তাচার। এই অবস্থায় উন্নীত সাধক ভোগ এবং ত্যাগের আপেক্ষিক মূল্য নির্ধারণ করে এ-সম্পর্কে একটা সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন। এইজন্য এই আচারের নাম সিদ্ধান্তাচার।[১]

সিদ্ধান্তাচারে বামাচারের সমস্ত ক্রিয়াকর্ম করতে হয়। তবে এতে অন্তর্যাগের প্রাধান্য; অন্তর্যাগের অঙ্গরূপে বহির্যাগ করতে হয়।[২] আত্মা নিত্যশুদ্ধ সিদ্ধান্তাচারী সাধক সর্বদা এই ভাবনা করবেন। নিত্যাতন্ত্রে বলা হয়েছে—অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্ববলি দিলে যেমন অশ্বহত্যা অর্থাৎ জীবহত্যার পাপ হয় না তেমনি যজ্ঞে কৃত কোনো কর্মে দোষ হয় না। শোধনের দ্বারা শুদ্ধাশুদ্ধ সব শুদ্ধ হয়ে যায়। এইটি সিদ্ধান্তাচারের লক্ষণ।[৩]

সময়াচারতন্ত্রে সিদ্ধান্তাচারপরায়ণ সাধক সম্বন্ধে বলা হয়েছে—তিনি নিত্য স্নান করে শুদ্ধ শুক্লবস্ত্র পরে দেবপূজা করবেন। দিনের বেলা বিষ্ণুপরায়ণ হবেন আর রাত্রে যথালব্ধ উত্তম পঞ্চতত্ত্বের দ্বারা ভক্তিসহকারে বিধিমতো দেবীর আরাধনা করবেন। এরূপ সাধক সর্বপ্রকার ফল লাভ করবেন।[৪]

এই আচারে সাধককে ভৈরববেশে থাকতে হয় ও সর্বদা রুদ্রাক্ষমালা অস্থিমালাদি ধারণ করতে হয়। সাধনার এই অবস্থাতেই সাধকের ব্রহ্মানন্দ লাভ হয়। সিদ্ধান্তাচারী সাধকের দক্ষিণ বাম দুই দিকই দেখা হয়ে গেছে। এই সময় তাঁর মন স্থিরভাব ধারণ করে এবং তিনি কুলজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের কাছাকাছি পৌঁছে যান।[৫]

বামাচার ও সিদ্ধান্তাচারের সাধারণ নাম বীরাচার। কারণ উভয় আচারই বীরভাবের অন্তর্গত।[৬]

সময়াচার—সিদ্ধান্তাচারের পর সপ্তম আচার কৌলাচার। কিন্তু কৌলাচারের

১ The Spirit And Culture Of The Tantras, Ś. R. C. M., Vol. II, pp. 194-195

২ কৌ র, পৃঃ ১০

৩ অশ্বমেধকৃতো নৈব বাজিহত্যা যথা ভবেৎ। তথৈব পরমেশানি যজ্ঞে দোষো ন বিদ্যতে।
শুদ্ধাশুদ্ধং ভবেৎ শুদ্ধং শোধনাদেব পার্বতি। এতদেব মহেশানি সিদ্ধান্তাচারলক্ষণম্।
—নিত্যাতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৭, পরিঃ ১, ব সং পৃঃ ৪৯৯

৪ স্নাতঃ শুক্লাম্বরধরঃ শুদ্ধবেশধরস্তথা। দেবপূজারতো নিত্যং তথা বিষ্ণুপরো দিবা।
নক্তং দ্রব্যাদিকং সর্বং যথালাভেন চোত্তমম্। বিধিবৎ ক্রিয়তে ভক্ত্যা স সর্বঞ্চ ফলং লভেৎ।—দ্রঃ ঐ

৫ ভাব ও আচার, ক প অ, পৃঃ ৪২৯

৬ ঐ

আঁলোচনা আরম্ভ করার আগে সময়াচার নামে অন্য একটি আচারের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাচ্ছে।

ভাস্কররায় সৌভাগ্যভাস্করে লিখেছেন শ্রীবিদ্যার উপাসনায় তিনটি মত আছে—সময়মত, কৌলমত আর মিশ্রমত।[১] এখানে উল্লেখ করা যায় সময়াচারীরা শ্রীবিদ্যার উপাসক।

সৌন্দর্যলহরীর (শ্লোক ৩১) টীকায় লক্ষ্মীধর লিখেছেন পরম কারুণিক পরমেশ্বর পশুপতি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এবং নানা সঙ্করজাতির জন্য বিবিধ তন্ত্র প্রণয়ন করেছেন। সেই-সব তন্ত্রের মধ্যে মহামায়া শম্বর প্রভৃতি চৌষট্টি তন্ত্রে শূদ্রাদির অধিকার। এই-সব তন্ত্র বেদবহির্ভূত বলে বেদমার্গী ব্রাহ্মণদের জন্য বিহিত নয়। তিনি আরও লিখেছেন বেদপন্থীদের জন্য পরমেশ্বর পশুপতি শুভাগমতন্ত্রপঞ্চক প্রণয়ন করেছেন। এই শুভাগম-পঞ্চকে বৈদিক মার্গ অনুসারে অনুষ্ঠানসমূহ নিরূপিত হয়েছে। শুভাগমপঞ্চকনির্দিষ্ট মার্গ প্রদর্শন করেছেন বসিষ্ঠ সনক শুক সনন্দন এবং সনৎকুমার এই পাঁচজন মুনি। এই মার্গই সময়াচার।

বসিষ্ঠসংহিতা সনকসংহিতা শুকসংহিতা সনন্দনসংহিতা এবং সনৎকুমারসংহিতা এই পাঁচখানি গ্রন্থকে শুভাগমপঞ্চক বলা হয়।

সৌন্দর্যলহরীর 'তবাধারে মূলে সহ সময়য়া লাস্যপরয়া' ইত্যাদি শ্লোকের (শ্লোক ৪১) লক্ষ্মীধরকৃত টীকার মর্মানুবাদে পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় লিখেছেন[২] "তাঁহাদিগের (সময়াচারীদের) আন্তরপূজা বা মানস উপাসনাই আছে, বাহ্য আধার বা বাহ্য পূজা একেবারে নাই। শ্রীচক্রই মূলাধারাদি সাধকদেহস্থ ষট্‌চক্ররূপে পরিণত, ইহা তাঁহাদিগের মত। তাঁহাদিগের মানস পূজার আধার শিরস্থ সহস্রদলকমলান্তর্গত চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যস্থান। তাহার নাম সুধাসিন্ধু, বেদে তাহার নাম সরঘা।

সময়াচারিগণ সময়া-নাম্নী আনন্দভৈরবী শক্তি ও সময়-নামা আনন্দভৈরব শিবের মানসপূজা সহস্রদলে করিয়া থাকেন। সময়া ও সময় শব্দের ব্যুৎপত্তি 'সমং সাম্যং যাতি'—সম শব্দের অর্থ সাম্য, 'যা'র অর্থ প্রাপ্ত হয়েন। শিবের সাম্যপ্রাপ্ত শক্তি সময়া, শক্তির সাম্যপ্রাপ্ত শিব সময়।"

লক্ষ্মীধর লিখেছেন শম্ভু এবং দেবী উভয়ের সমপ্রাধান্য সাম্য। সমপ্রধান শিবশিবানীর এই সাম্য পঞ্চবিধ—অধিষ্ঠানসাম্য অবস্থানসাম্য অনুষ্ঠানসাম্য রূপসাম্য এবং নামসাম্য।[৩]

১ সময়মতং কৌলমতং মিশ্রমতং চেতি বিদ্যোপাস্তৌ মতত্রয়ম্।—ল স, ১৪৪-এর সৌ ভা

২ শঙ্করাচার্য গ্রন্থমালা, ১ম খণ্ড, পরিবর্দ্ধিত ৮ম সং, পৃঃ ৩৭৫-৩৭৬

৩ অতঃ উভয়োঃ সমপ্রাধান্যেনৈব সাম্যং বিজ্ঞেয়ম্। পঞ্চবিধসাম্যং তু—অধিষ্ঠানসাম্যং অবস্থানসাম্যং অনুষ্ঠানসাম্যং রূপসাম্যং নামসাম্যং চেতি পঞ্চবিধং সমপ্রধানয়োরেব শিবয়োঃ।—সৌ ল, শ্লোক ৪১-এর টীকা।

লক্ষ্মীধরের পূর্বোক্ত ব্যাখ্যায় দেখা যায় সময়াচারীদের পক্ষে ষট্‌চক্রপূজা বিহিত নয়, তাঁহাদের পক্ষে বিহিত সহস্রদলকমলপূজা।[১] এই পূজা আন্তর পূজা।

সময়াচারপরায়ণদের মন্ত্রের পুরশ্চরণ নাই, জপ নাই, বাহ্য হোমও নাই। বাহ্যপূজা-বিধিও নাই। হৃৎকমলেই সব অনুষ্ঠান করতে হয়।[২]

সময়াচারীদের মতে আন্তরপূজারতি সময়াচার আর বাহ্যপূজারতি কৌলাচার।[৩] তাই এঁরা কৌলাচারের চেয়ে সময়াচারকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন। এঁরা মনে করেন ব্রাহ্মণাদির পক্ষে বাহ্যপূজা বিহিত নয়, বাহ্য জাতির পক্ষেই বাহ্যপূজা বিহিত। বাহ্যপূজা মানুষের ভোগাদি প্রদান করে বলে তা ক্ষুদ্রফলপ্রদ। কৌল ক্ষপণক কাপালিক দিগম্বর 'ইতিহাস' (ভৈরবযামলপ্রামাণ্যবাদীদের ইতিহাস বলা হয়)— এই-সব বামমার্গী-তন্ত্রবাদীরা বাহ্যপূজা করেন। ব্রহ্মবাদী বৈদিকেরা অর্থাৎ শুভাগমপঞ্চকের অনুসরণকারীরা অন্তরারাধনাপরায়ণ। তাঁরা জীবন্মুক্ত হয়ে ত্রিলোকে বিচরণ করেন।[৪] বলা বাহুল্য এ মত সাম্প্রদায়িক। কৌলাচারীরা এটি স্বীকার করেন না।[৫]

কুলশাস্ত্রোক্ত সময়াচার—কৌলশাস্ত্রেও সময়াচারের কথা আছে। কিন্তু সেখানে সময়াচারের অর্থ ভিন্ন। পরশুরামকল্পসূত্রের বৃত্তিতে রামেশ্বর সময়শব্দের অর্থ করেছেন কুলশাস্ত্রপ্রতিপাদিত উপাসক ধর্ম[৬] অর্থাৎ কুলশাস্ত্রনির্দিষ্ট বিধিনিষেধ। আবার সময়শব্দের অর্থ গুপ্তও হয়।[৭] কাজেই সময়াচার অর্থ কুলশাস্ত্রনির্দিষ্ট আচার বা গুপ্ত আচার উভয়ই হতে পারে।

১ সৌ ল, শ্লো ৪১-এর টীকা

২ ঐ, শ্লো ৩৩-এর লক্ষ্মীধরকৃত টীকা

৩ সময়াচারো নাম আন্তরপূজারতিঃ। কুলাচারো নাম বাহ্যপূজারতিরিতি রহস্যম্।

—সৌ ল, শ্লো ৮-এর লক্ষ্মীধরকৃত টীকা

৪ বাহ্যপূজা ন কর্তব্যা কর্তব্যা বাহ্যজাতিভিঃ। সা ক্ষুদ্রফলদা নৃণাং ঐহিকার্থৈকসাধনাৎ॥
বাহ্যপূজারতাঃ কৌলাঃ ক্ষপণাশ্চ কপালিকাঃ। দিগম্বরাশ্চেতিহাসা বামকাস্তন্ত্রবাদিনঃ॥
জীবন্মুক্তাশ্চরন্ত্যেতে ত্রিষু লোকেষু সর্বদা।—সনৎকুমারসংহিতাবচন, দ্রঃ সৌ ল, শ্লো ৩২-এর লক্ষ্মীধরকৃত টীকা

৫ লক্ষ্মীধর কুলশাস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন মনে হয় না। "কুলগ্রন্থে কৌল সাধকের পক্ষে অন্তর্যাগই মুখ্যরূপে বিহিত হইয়াছে।" কাজেই বাহ্যপূজারতি কৌলাচার এ উক্তি যথার্থ নয়।—দ্রঃ কৌ র, পৃঃ ৫২, পাদটীকা

৬ সাময়িকাঃ সময়ে কুলশাস্ত্রমর্যাদায়াং বর্তমানাঃ তে কুলশাস্ত্রপ্রতিপাদিতা উপাসকধর্মা ইতি।

—প ক সূ ১০।৮০-এর বৃত্তি

৭ সময়ো গুপ্তঃ সংকেতঃ শাস্ত্রপদ্ধতিঃ।...সময়ো রহসি প্রোক্তঃ কালে কার্যকমেঽপি চ। ইতি ত্র্যক্ষরকোশঃ।

—ঐ, ৭।১-এর বৃত্তি

পরশুরামকল্পসূত্রে বলা হয়েছে আরম্ভ তরুণ যৌবন প্রৌঢ় তদন্ত উন্মন এবং অনবস্থ এই সপ্ত উল্লাসের মধ্যে প্রৌঢ় পর্যন্ত সময়াচার, তার পরে স্বৈরাচার।[১] এখানে সময় অর্থ উপাসকধর্ম বা নিয়ম। সাধককে প্রৌঢ়োল্লাস পর্যন্ত নিয়ম মেনে চলতে হয়।

রামেশ্বর উল্লাস শব্দের অর্থ করেছেন উপাসকের দশাবিশেষ অর্থাৎ অবস্থাবিশেষ। আরম্ভোল্লাসে সাধকের উপাসনাবিষয়ে শুধু ইচ্ছা জন্মে কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রের কোনো অভিজ্ঞতা থাকে না। তরুণোল্লাসে সাধক সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষিত হন এবং তন্ত্রশাস্ত্রপাঠে তাঁর ইচ্ছা জন্মে। যৌবনোল্লাসে সাধকের তন্ত্রশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ হয়। প্রৌঢ়োল্লাসে সাধক তন্ত্রশাস্ত্রের জ্ঞানলাভ করে সেই শাস্ত্রনির্দিষ্ট ধ্যানের চেষ্টা করেন। তার পরের অবস্থা তদন্ত বা প্রৌঢ়ান্ত। এই অবস্থায় ধ্যান কিঞ্চিৎ অভ্যস্ত হয়। ধ্যানের দ্বারা কিয়ৎকাল মনোলয়ের শক্তি যে-অবস্থায় লাভ হয় তার নাম উন্মনোল্লাস। পূর্ণারূঢ় অবস্থার নাম অনবস্থোল্লাস। এই অবস্থায় সাধকের মন ইষ্টদেবতায় 'নিশ্চলভাবে লয়প্রাপ্ত হয়।'[২]

দেখা যাচ্ছে কৌলমতে সাধনার পথে কিছুদূর পর্যন্ত শাস্ত্রনির্দিষ্ট সময়াচার অবলম্বনীয়, সময়াচারী সাধক খুব উঁচুস্তরের সাধক নন। কৌলাচারীরা বলেন[৩] "সময়াচারী সাধক পূর্ণখ্যাতি লাভের[৪] অধিকারী নহেন, পূর্ণখ্যাতি সমাবেশনেচ্ছার অধিকারী। তিনি 'আমি যেন পূর্ণখ্যাতি লাভ করিতে পারি' এইরূপ অভিলাষ সর্বদাই মনে জাগরুক রাখিবেন, তাহা হইলে তদনুকূল ব্যাপারে সর্বদা যত্ন থাকিবে।"

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এই অভিমতও সম্প্রদায়িক।

কৌলাচার—সপ্ত আচারের সর্বশেষ আচার কৌলাচার। কুলশব্দের উত্তর স্বার্থে ষ্ণ প্রত্যয় করে কৌল শব্দ নিষ্পন্ন হয়। কাজেই কুল এবং কৌল একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কৌলাচারকে কুলাচারও বলা হয়।

কুলশব্দের অর্থ—কুলশব্দের বিভিন্ন অর্থ। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে বা সম্প্রদায় অনুসারে অর্থ ভিন্ন হয়েছে। শ্রৌতসাহিত্যে বংশ অর্থে কুল শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।[৫]

১ আরম্ভতরুণযৌবনপ্রৌঢ়তদন্তোন্মনানবস্থোল্লাসেষু প্রৌঢ়ান্তা সময়াচারাঃ।—দ্রঃ প ক সূ ১০।৬৮

২ তত্র আরম্ভো নাম উপাসনাবিষয়কেচ্ছামাত্রবত্ত্বে সতি তন্ত্রশাস্ত্রানভিজ্ঞত্বম্। সম্যগ্‌গুরুং সম্পাদ্য দীক্ষিতত্বানন্তরং তন্ত্রশাস্ত্রপিপঠিষাশালিত্বং তরুণোল্লাসঃ। ততস্তচ্ছাস্ত্রবিষয়কজ্ঞানবত্ত্বং যৌবনোল্লাসঃ। ততঃ তচ্ছাস্ত্রবিষয়কতত্ত্বজ্ঞানং সম্পাদ্য শাস্ত্রপ্রতিপাদিতধ্যানং কর্তুমীহমানত্বং প্রৌঢ়োল্লাসঃ। তদিচ্ছাঽনন্তরং কিঞ্চিদভ্যস্তে ধ্যানবত্ত্বং তদন্তোল্লাসঃ। ততো ধ্যানেন কঞ্চিৎকালং মনোলয়শক্তিমত্ত্বং উন্মনোল্লাসঃ। পূর্ণারূঢ়ত্বং অনবস্থোল্লাসঃ।
—প ক সূ ১০।৬৮-এর বৃত্তি

৩ কৌ র, পৃঃ ২৪০, পাদটীকা

৪ "জগৎ শিবময়, শিবের বাহিরে জগতের কোনো পদার্থের অস্তিত্ব নাই, আমিই সেই পরিপূর্ণ শিব এইরূপ অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের নাম পূর্ণখ্যাতি।"—ঐ, পৃঃ ২০৯, পাদটীকা। ৫ দ্রঃ ছা উপ ৩।১৩।৬; বৃহ উপ ১।৫।২১

সৌভাগ্যভাস্করে কুলশব্দের আলোচনা প্রসঙ্গে ভাস্কররায় লিখেছেন—পরমশিব থেকে স্বগুরু পর্যন্ত বংশ কুল। 'সংখ্যা বংশ্যেন' এই পাণিনিসূত্রের ব্যাখ্যায় মহাভাষ্যে বলা হয়েছে বংশ দুরকমের, এক বিদ্যাগত, অপর জন্মগত।[১] কুলগত আচার কৌলাচার।

কৌলাচারের কুল বিদ্যাগত কুল। পরমশিব থেকে স্বগুরু পর্যন্ত পরম্পরাক্রমে এই কুল বিস্তৃত। কুলার্ণবতন্ত্রেও বলা হয়েছে—গোত্রকে কুল বলা হয়, তা শিবশক্তিসমুদ্ভূত। এই কুলের জ্ঞানেই মোক্ষলাভ হয়। এই জ্ঞান যার হয় সেই ব্যক্তিকে কৌলিক বলা হয়।[২] এই গোত্রও বিদ্যাগত মনে হয়।

বংশগত মার্গ বা আচার যে-কুলমার্গ বা কুলাচার ভাস্কররায় এই অভিমতও প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন—নিজ নিজ বংশপরম্পরাপ্রাপ্ত মার্গ কুলের অর্থাৎ বংশের সম্বন্ধ-হেতু কৌলমার্গ।[৩] এই মত অনুসারে প্রত্যেক বংশের পরম্পরাগত সাধনমার্গই কৌলমার্গ।

কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রে কৌলমার্গ বা কৌলাচার কথাটি এরূপ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয় না।

কৌল—কুলশব্দের আরেকটি অর্থ ত্রিপুটীকৃত সজাতীয় পদার্থসমূহ। ভাস্কররায় লিখেছেন সজাতীয় মাতৃ-মান-মেয়-পদার্থের সমূহ কুল।[৪]

মাতৃ-মান-মেয় স্থলে জ্ঞাতৃ-জ্ঞান-জ্ঞেয়ও ব্যবহৃত হয়। অর্থের দিক্ দিয়ে উভয়ের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। মাতৃ বা জ্ঞাতৃ অর্থাৎ মাতা বা জ্ঞাতা জীব, মান বা জ্ঞান জ্ঞানক্রিয়া, মেয় বা জ্ঞেয় জ্ঞানের বিষয়।

জ্ঞাতৃ-জ্ঞান-জ্ঞেয় এই তিনের মধ্যে যে জ্ঞানের সাজাত্য আছে এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করে কৌলমার্গরহস্যে বলা হয়েছে—"জগতের যাবতীয় পদার্থই আমার জ্ঞানের বিষয়, 'আমি' জ্ঞানের কর্তা এবং 'জানি' ইহা জ্ঞানক্রিয়া। এইরূপে এক জ্ঞান সমবায়সম্বন্ধে জ্ঞাতায়, বিষয়তা-সম্বন্ধে জ্ঞেয়ে এবং তাদাত্ম্যসম্বন্ধে জ্ঞানক্রিয়ায় অবস্থান করে।... এইরূপে জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-জ্ঞানরূপে ত্রিপুটীকৃত জগতের যাবতীয় পদার্থ এক জ্ঞানরূপ ধর্মের দ্বারা সজাতীয়।"[৫]

কুল সম্বন্ধে এমনি জ্ঞান যাঁর আছে তিনি কৌল।

কৌলাচারপরায়ণ সাধককে তন্ত্রে কৌল কৌলিক কুলীন ইত্যাদি শব্দে নির্দেশ করা

১ পরমশিবাদিস্বগুরুপর্যন্তো বংশো বা কুলম্। 'সংখ্যা বংশ্যেনে'তি পাণিনিসূত্রে 'বংশো দ্বিধা বিদ্যয়া জন্মনা চে'তি মহাভাষ্যাৎ।—ল স, ১-এর সৌ ভা

২ কুলং গোত্রং সমাখ্যাতং তচ্চ শক্তিশিবোদ্ভবম্। যেন মোক্ষ ইতি জ্ঞানং কৌলিকঃ সোঽভিধীয়তে।

—কু ত, উঃ ১৭

৩ স্বস্ববংশপরম্পরাপ্রাপ্তো মার্গঃ কুলসম্বন্ধিত্বাৎ কৌলঃ।—ল স, ১৪৪-এর সৌ ভা

৪ সজাতীয়ানাং মাতৃমানমেয়ানাং সমূহঃ কুলম্।—ঐ

৫ কৌ র, পৃঃ ৫

হয়েছে। কৌলিক বা কৌলের বিভিন্ন ব্যাখ্যাও আছে। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করে, এই-সব ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। যেমন নির্বানতন্ত্রে বলা হয়েছে[১]—যে-দেশে মন্ত্রসাধনার যে-দ্বার নির্দিষ্ট যিনি সেই দ্বারবিশিষ্ট তিনি কৌলিক। কুলার্ণবতন্ত্রে আছে[২]—যিনি শ্রীগুরুর করুণাপ্রাপ্ত হয়েছেন, দীক্ষার দ্বারা যার পাপ ধৌত হয়েছে, এমনি কুলপূজারত সাধকই কৌল, অন্য নয়।

জগৎ শক্তিরই রূপ। জগতের পদার্থমাত্রই শক্ত্যাত্মক। কাজেই কুল শক্তি। তন্ত্রে স্পষ্টভাষাতেই কুলকে শক্তি বলা হয়েছে। যথা—শক্তিকে বলা হয় কুল আর শিবকে অকুল। কুল-অকুলের সম্বন্ধকে বলা হয় কৌল।[৩] কুল-অকুলের সম্বন্ধ শিবশক্তির সামরস্য। দেবী কৌলবতী বলে তাকে কৌলিনী বলা হয়।[৪] এমনি কৌলজ্ঞান যাঁর আছে তিনি কৌল।

কুলার্ণবতন্ত্রেও বলা হয়েছে[৫]—শিবকে অকুল আর শক্তিকে কুল বলা হয়। কুল ও অকুলের অনুসন্ধাননিপুণ অর্থাৎ শিবশক্তির সামরস্যানুসন্ধাননিপুণ সাধকদের বলা হয় কৌলিক বা কৌল।

তন্ত্রালোকের 'অকুলস্যাস্য দেবস্য কুলপ্রথনশালিনী' এই শ্লোকের (৩।৬৭) ব্যাখ্যায় আচার্য অভিনবগুপ্ত বলেছেন কুল পূর্ণসম্বিৎলক্ষণ। এই প্রসঙ্গে তিনি এই তন্ত্রবচনটি উদ্ধার করেছেন—যাতে এই বিচিত্র বিশ্ব উদিত ও অস্তমিত হয় তাকে শিবশক্তিবিবর্জিত কুল বলে জানবে।[৬]

তাঁর মতে এই কুল থেকে ভিন্নরূপে যা অবভাসিত হয় তাই শিবলক্ষণ অকুল, অর্থাৎ অকুল শিব।[৭]

অভিনবগুপ্ত কুলকে বলেছেন পূর্ণসম্বিৎলক্ষণ। পূর্ণসম্বিৎলক্ষণ ব্রহ্ম। কাজেই কুল ব্রহ্ম।[৮]

১ যস্মিন্ দেশে তু যদ্দ্বারো নির্দিষ্টো মন্ত্রসাধনে। তদ্দ্বারেণ বিশিষ্টো যঃ কৌলিকঃ স চ কীর্তিতঃ।
—নি ত, পঃ ১১

২ গুরুকারুণ্যযুক্তস্য দীক্ষানির্ধূতপাতকঃ কুলপূজারতো দেবি সোঽহং কৌলো ন চেতরঃ।—কু ত, উঃ ২

৩ কুলং শক্তিরিতি প্রোক্তমকুলং শিব উচ্যতে। কুলেঽকুলস্য সম্বন্ধঃ কৌলমিত্যভিধীয়তে।
—দ্রঃ প স, সৌ ভা, পৃঃ ৫৩

৪ শিবশক্তিসামরস্যং বা কৌলং তদ্বতী কৌলিনী।—ঐ

৫ অকুলং শিবতাযুক্তং কুলং শক্তিঃ প্রকীর্তিতম্। কুলাকুলানুসন্ধাননিপুণাঃ কৌলিকাঃ প্রিয়ে।—কু ত, উঃ ১৭

৬ যত্রোদিতমিদং চিত্রং বিশ্বং যত্রাস্তমেতি চ। তৎকুলং বিদ্ধি সর্বজ্ঞ শিবশক্তিবিবর্জিতম্।
—দ্রঃ ত আ ৩।৬৭-এর টীকা

৭ লক্ষিতাৎ পূর্ণপরসম্বিত্তত্ত্বলক্ষণাৎ যদন্যদবভাসিতং শিবলক্ষণমকুলম্—ঐ

৮ ন কুলং কুলমিত্যাহুঃ কুলং ব্রহ্ম সনাতনম্।—কুলার্ণবতন্ত্রবচন, দ্রঃ Gr. L., 3rd Ed., p. 78, f. n. 4.

আবার 'কুলপ্রথনশালিনী' শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন শাক্তপ্রসরাত্মক জগৎ কুল।[১] তাঁর উক্তির তাৎপর্য জগৎ পূর্ণপরসম্বিৎলক্ষণ কুলের শক্তিরূপ।

তবে শাক্ততন্ত্রে সাধারণতঃ শিবের অকুল এবং শক্তির কুল নামই প্রচলিত।

যাঁরা কুলাকুলতত্ত্বজ্ঞ এবং কুলপূজক তাঁরাই কৌল।

কুল বলতে আবার মূলাধারচক্র এবং সুষুম্না নাড়ীও বুঝায়। সৌন্দর্যলহরীর টীকায় লক্ষ্মীধর লিখেছেন—কু অর্থাৎ পৃথিবীতত্ত্ব যাতে লীন হয় তা কুল অর্থাৎ আধারচক্র। লক্ষণার দ্বারা সুষুম্নামার্গকেও কুল বলা হয়। কাজেই যাঁরা কুলপূজক তাঁরা কৌল। মূলাধারচক্রে দেবীর আরাধনা করাই তাঁদের কৌলত্ব। এ ব্যাপারের এই রহস্য।[২]

কৌলিনী— লক্ষ্মীধর বলেন এই মূলাধারচক্রস্থিতা কুণ্ডলিনী-শক্তিকে বলা হয় কৌলিনী। তিনিই ত্রিকোণপূজকদের অর্থাৎ কৌলদের উপাস্যা।[৩] এই কুণ্ডলিনী-শক্তিকে কুলযোষিৎও বলা হয়।[৪]

কুলামৃত—এই প্রসঙ্গে বলা যায় কুণ্ডলিনী-শক্তি ষট্‌চক্র ভেদ করার পর সহস্রারস্থিত চন্দ্রমণ্ডলও ভেদ করে যখন পরমশিবের সঙ্গে মিলিত হন তখন সেই চন্দ্রমণ্ডল থেকে অমৃতধারা ক্ষরিত হয়ে সাধকদেহকে অভিষিক্ত করে। এই অমৃতকে বলা হয় কুলামৃত।[৫]

কুলাচারের ব্যাখ্যা— কুলাচার বা কৌলাচারের ব্যাখ্যায় মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে—জীব প্রকৃতিতত্ত্ব দিক্ কাল আকাশ বায়ু তেজ অপ্ এবং ক্ষিতিকে বলা হয় কুল। জীবপ্রকৃত্যাদি এই-সবের প্রতি ব্রহ্মবুদ্ধিতে নির্বিকল্প যে-আচরণ তাই কুলাচার। এই কুলাচার ধর্মার্থকামমোক্ষ প্রদান করে।[৬]

রুদ্রযামলের মতে যে-আচারে কুলস্ত্রী কুলগুরু কুলদেবীর নিত্যপূজা হয় অর্থাৎ কুলস্ত্রী কুলগুরু ও কুলদেবীরূপে ব্রহ্মের পূজা হয়, তাই কুলাচার।[৭]

---

১ কুলস্য শাক্তপ্রসরাত্মনো জগতঃ যৎ প্রথনং…। —ত আ ৩৷৬৭-এর টীকা

২ কুঃ পৃথিবীতত্ত্বং লীয়তে যত্র তৎকুলং আধারচক্রম্। লক্ষণয়া সুষুম্নামার্গঃ কুলমিত্যুচ্যতে। অত এব কৌলাঃ কুলপূজকাঃ আধারসেবকা ইতি কৌলত্বং তেষামিতি রহস্যম্।—সৌ ল, শ্লো ১০-এর টীকা

৩ তত্র স্থিতা কুণ্ডলিনী শক্তিঃ কৌলিনী ইত্যুচ্যতে। সৈব উপাস্যা ত্রিকোণপূজকানাং ইতি রহস্যম্।
—ঐ, শ্লো ৪১-এর টীকা।

৪ অত এব কুলযোষিৎ কুণ্ডলিনীশক্তিঃ।…ঐ শ্লো ৮-এর টীকা।

৫ অতঃ সহস্রারাৎ স্রবদমৃতং কুলামৃতম্।…ল স, সৌ ভা, পৃঃ ৪৩

৬ জীব প্রকৃতিতত্ত্বঞ্চ দিক্কালাকাশমেব চ। ক্ষিত্যপ্তেজোবায়বশ্চ কুলমিত্যভিধীয়তে।
ব্রহ্মবুদ্ধ্যা নির্বিকল্পমেতেষ্বাচরণঞ্চ যৎ। কুলাচারঃ স এবাদ্যে ধর্মকামার্থমোক্ষদঃ।—মহা ত ৭৷৯৭-৯৮

৭ কুলস্ত্রিয়ং কুলগুরুং কুলদেবীং মহেশ্বরি। নিত্যং যৎ পূজয়েদ্বিদ্বং স কুলাচার উচ্যতে।
—রুঃ পূ চ, তরঙ্গ ১, পৃঃ ২২

এ-সম্পর্কে কৌলমার্গরহস্যের ব্যাখ্যাটি প্রাঞ্জল। সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় লিখেছেন "কৌলমার্গ শব্দের পর্যাবসিত অর্থ অদ্বৈতজ্ঞানেচ্ছু মুমুক্ষু সাধক যে-পন্থা অবলম্বন করিয়া গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত আচারের অনুষ্ঠান করতঃ সর্বজগৎ শিবশক্তিময় ধারণা করিয়া, শিবশক্তিসামরস্যসম্পাদনে বিমল ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিতে পারেন, সেই পন্থার নাম কৌলমার্গ।"[১]

উদ্ভবকাহিনী—রুদ্রযামলে[২] কৌলাচার-উদ্ভবের এই কাহিনীটি পাওয়া যায়—ব্রহ্মার পুত্র বশিষ্ঠ মহাবিদ্যার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় পিতার নিকট মন্ত্র নিয়ে শত সহস্র বৎসর কঠোর তপশ্চর্যার সঙ্গে যোগাদি সাধন করলেন। কিন্তু তবু দেবীর সাক্ষাৎলাভ করতে পারলেন না। তখন ক্রুদ্ধ হয়ে পিতার নিকট গিয়ে বললেন প্রভু, আমাকে অন্য মন্ত্র দিন, এই বিদ্যা সিদ্ধিদায়িনী নয়। ব্রহ্মা বললেন—বাপু, একান্তমনা হয়ে ভাবের সঙ্গে যোগমার্গে আবার দেবীর আরাধনা কর। তিনি অবশ্যই তোমাকে দর্শন দিয়ে বর দেবেন। পিতার আজ্ঞা অনুসারে বেদান্তবিদ্ বশিষ্ঠ আবার সহস্র বৎসর ধরে মন্ত্র জপ করলেন। কিন্তু তবু দেবীর দর্শন পেলেন না। তখন ক্রুদ্ধ হয়ে মহাবিদ্যাকেই শাপ দিতে উদ্যত হলেন। এবার যোগীদের অভয়দাত্রী দেবী মুনিকে দর্শন দিয়ে বললেন—অকারণে কেন আমাকে শাপ দিতে যাচ্ছিলে? যে আমার সেবা জানে না, আমার কুলাগমচিন্তার সঙ্গে যার পরিচয় নেই, সে কি করে যোগাভ্যাসের দ্বারা আমার পাদপদ্ম দর্শন করবে?[৩] আমার পবিত্র সাধনা বেদেরও অগোচর। অথর্ববেদপরায়ণ বৌদ্ধদেশ মহাচীনে যাও। সেখানে গিয়ে আমার মহাভাব প্রত্যক্ষ করে ও পাদপদ্ম দর্শন করে আমার কুলজ্ঞান লাভ করবে এবং মহাসিদ্ধ হবে।[৪]

এই বলে দেবী অন্তর্ধান করলেন। আর বশিষ্ঠ গেলেন চীনদেশে। সেখানে বুদ্ধরূপী মহাদেবের সাধনাচার দেখে তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। বুদ্ধ ভগবানকে বার বার মাটিতে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করে বললেন—আমি সিদ্ধিমার্গ জানি না, মহাদেবীর সাধনার জন্য এখানে এসেছি। কিন্তু আচার দেখে আমার অন্তরে ভয় জন্মেছে। আমার বেদগামিনী বুদ্ধি। প্রভু, এই দুর্বুদ্ধি শীঘ্র বিনাশ কর। তোমার আলয়ে সর্বদা সর্ব কর্ম বেদবহিষ্কৃত।[৫]

১ কৌ র, পৃঃ ৭ ২ রু যা, উ ত, পৃঃ ১৭

৩ মম সেবাং ন জানাতি মৎকুলাগমচিন্তনং। কথং যোগাভ্যাসবশাৎ মৎপাদাম্ভোজদর্শনম্।

—রু যা, উ ত, পৃঃ ১৭

৪ মমৈব সাধনং পুণ্যং বেদানামপ্যগোচরম্। বৌদ্ধদেশেঽথর্ববেদে মহাচীনে সদা ব্রজ।
তত্র গত্বা মহাভাবং বিলোক্য মৎপদাম্বুজম্ মৎকুলজ্ঞো মহর্ষে ত্বং মহাসিদ্ধো ভবিষ্যসি।

৫ তবাচারং সমালোক্য ভয়ানি সন্তি মে হৃদি। তন্নাশয় মম ক্ষিপ্রং দুর্বুদ্ধিং বেদগামিনীম্।
বেদবহিষ্কৃতং কর্ম সদা তে চালয়ে প্রভো।—ঐ

পঞ্চতত্ত্ব নিয়ে সাধনা দেখে বৈদিকাচারনিষ্ঠ বশিষ্ঠ ভয় পেয়ে যান। এ-সব তাঁর চিরাভ্যস্তসংস্কারবিরুদ্ধ, অথচ এই বৌদ্ধদেশের সাধনাতেই সিদ্ধিলাভ হবে এ কথা স্বয়ং দেবী বলেছেন। বশিষ্ঠ বড়ই বিপদে পড়লেন। কৃতাঞ্জলি হয়ে বুদ্ধদেবকে বললেন, প্রভু, আপনার এই কুলের বিষয় আমাকে বলুন। আমি বুঝতেই পারছি না এই আচারে কি করে মনের প্রবৃত্তি হবে আর কি করেই বা বৈদিককর্ম ছাড়া সিদ্ধিলাভ হবে।[১]

এর পর বুদ্ধদেব বশিষ্ঠকে কৌলাচার সম্বন্ধে উপদেশ দেন। বুদ্ধোপদিষ্ট কৌলাচারকে মহাচীনাচার বা মহাচীনক্রমও বলা হয়।

এই কাহিনীর মধ্যে কোনো ঐতিহাসিক ইঙ্গিত আছে কিনা নিশ্চয় করে বলা কঠিন। তবে এ নিয়ে জল্পনা কল্পনা অবশ্যই চলতে পারে। বৈদিক সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায় বসিষ্ঠপরিবার অন্যান্য ঋষি পরিবারের মতো সোমের প্রতি ততটা আসক্ত ছিল না।

বসিষ্ঠরা আসক্ত সুরার প্রতি— অনুমান করা হয় প্রাচ্য অঞ্চলের সুরাভক্ত লোকেদের প্রভাবে এ রকম হয়েছিল। এই প্রাচ্য অঞ্চলের লোকেরা সুরাপায়ী অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের অধিক ভক্ত ছিল।[২] দেখা যাচ্ছে বৈদিক যুগেই সুরার সঙ্গে বসিষ্ঠদের একটা যোগাযোগ ছিল। এই সূত্র থেকেই হয়ত তন্ত্রের কৌলাচারসম্পর্কিত বসিষ্ঠ-কাহিনীর উদ্ভব হয়েছে।

তন্ত্রের বসিষ্ঠকাহিনী থেকে দুটি জিনিস স্পষ্ট হয়ে উঠেছে— এক, কৌলাচার বা কৌলমার্গ বেদবহির্ভূত; দুই, এই মার্গের অনুসরণকারীদের মতে এটি বেদমার্গের চেয়ে উত্তম।

কৌলাচার কি বেদবাহ্য?— বেদপন্থী সময়াচারীরাও কৌলাচারকে বেদবহিষ্কৃত বলেন।[৩] দেবীভাগবতাদিতে কৌলাচারকে দুরাচার বলা হয়েছে। দেবীভাগবতে বেদভক্তি-হীন অগ্নিহোত্রাদি-সৎকর্মবর্জিত পাষণ্ডমতগামী লোকদের কাপালিক কৌলিক বৌদ্ধ ও জৈন বলা হয়েছে। বলা হয়েছে এঁরা পণ্ডিত হলেও দুরাচারপ্রবর্তক।[৪]

কিন্তু কৌলমার্গ অবৈদিক এ মত সর্বত্র স্বীকৃত নয়। কুলার্ণবতন্ত্রে শিব দেবীকে

---

১ মনঃ প্রবৃত্তিরেতেষাং কথং ভবতি পাবন। কথম্বা জায়তে সিদ্ধির্বেদকার্যং বিনা প্রভো।

—রু যা, উ ত, পঃ ১৭

২ R. Ph. V. U., 1925, p. 92

৩ এবং চতুঃষষ্টিতন্ত্রাণি পরিজ্ঞাতৃণামপি বঞ্চকানি। ঐহিকসিদ্ধিমাত্রপরত্বাৎ বৈদিকমার্গদূরাণি।

—সৌ ল, মহীশূর, ৩য় সং, পৃঃ ৭৭; চতুঃষষ্টিতন্ত্রাণি কুলমার্গ এব।—ঐ, পৃঃ ৭৮

৪ কাপালিকাঃ কৌলিকাশ্চ বৌদ্ধা জৈনাস্তথাপরে। পণ্ডিতাঃ অপি তে সর্বে দুরাচারপ্রবর্তকাঃ।

—দে ভা ১২।৯।৭৬

বলছেন—বেদশাস্ত্রোক্তমার্গে যে কুলপূজা করে, তোমাকে এবং আমাকে তার সমীপস্থ বলে জানবে, অন্যত্র নয়।[১]

এখানে কুলপূজাকে স্পষ্টই বেদগ্রাহ্য বলা হয়েছে। কাজেই কৌলমার্গ বেদবাহ্য নয় এই অভিমতই কুলার্ণবতন্ত্রে ব্যক্ত হয়েছে মনে হয়।

বামাচার ও কৌলাচার—আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি সিদ্ধান্তসারে ব্রাহ্মণের পক্ষে কৌলাচার নিষিদ্ধ বলা হয়েছে। কাজেই উক্ত তন্ত্রমতেও কৌলাচার বেদবাহ্য। কাজেই কৌলাচার বেদবাহ্য কি না এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে, কিন্তু বামাচার যে বেদবাহ্য এ সম্বন্ধে কোনো মতভেদ নাই। কৌলমার্গ রহস্যে বলা হয়েছে[২]—"বামাচার ও কৌলাচার ভিন্ন। উভয় আচারেই পঞ্চমকারসেবন বিহিত হইয়াছে। বামাচার বেদাচারপরায়ণ ব্রাহ্মণের অবলম্বনীয় নহে, কৌলাচার বেদাচারপরায়ন ব্রাহ্মণেরও অবলম্বনীয়; বামাচার শূদ্রাদির পক্ষে বিহিত; বেদাচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণও বামাচারের পথে কৌলাচারের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন।... দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণগন অদ্যাপি বৈদিক মার্গ পরিত্যাগ করেন নাই। বাঙ্গালাদেশ হইতে বিশুদ্ধ বৈদিক মার্গ বহুদিন পূর্ব হইতেই নির্বাসিত হইয়াছে। এইজন্য বেদাচারপরায়ণ দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণগণ বামাচারের আশ্রয় না লইয়া দক্ষিণাচার হইতেই কৌলাচারে প্রবেশ করিতেন, আর বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ বামমার্গের আশ্রয় লইয়া পরে কৌলমার্গ অবলম্বন করিতেন।"

ভাবচূড়ামণিমতে তন্ত্রশাস্ত্র অতি গূঢ়, তার ভাবও অতিশয় গূঢ়। বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ বুদ্ধিমান্ জিতেন্দ্রিয় যে-ব্রাহ্মণ গূঢ় তন্ত্রার্থের ভাব মন্থন করে তার থেকে সার উদ্ধার করতে পারেন তিনি কৌলমার্গে অধিকারী, অন্যে এই মার্গ অবলম্বন করলে দুঃখ পাবে।[৩]

দেখা যাচ্ছে এই তন্ত্রমতেও কুলমার্গ বেদবাহ্য নয়। বেদবাহ্য হলে তা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের পক্ষে বিহিত হত না।

কাজেই কৌলাচার বেদগ্রাহ্য এ মতেরও যথেষ্ট সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে। এই মতাবলম্বীরা বলেন কৌলাচার বৈদিকাচারপরায়ন ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রশস্ত। তবে তিনি যদি ঐহিক ভোগাকাঙ্ক্ষা করেন তবে বামমার্গের আশ্রয় নিতে পারেন। কৌলমার্গরহস্যে বলা হয়েছে—

১ বেদশাস্ত্রোক্তমার্গেণ কুলপূজাং করোতি যঃ। তৎসমীপস্থিতং মাং ত্বাং বিদ্ধি নান্যত্র ভাবিনি।
—কু ত, উঃ ১০

২ কৌ র, পৃঃ ২৫১-৫২

৩ তন্ত্রানামতিগূঢ়ত্বাত্তদ্ভাবোঽপ্যতিগোপিতঃ। ব্রাহ্মণো বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো বুদ্ধিমান্ বশী।
গূঢ়তন্ত্রার্থভাবস্য নির্মথ্যোদ্ধরণক্ষমঃ। কৌলমার্গেঽধিকারী স্যাদিতরো দুঃখভাক্ ভবেৎ।
দ্রঃ প ক সূ ৩।৩১-এর রামেশ্বরকৃত বৃত্তি

"বামমার্গের সাধনা তামসিক সাধনা, কৌলমার্গের সাধনা সাত্ত্বিক সাধনা। বেদাচারপরায়ণ সাধক সত্ত্বগুণপ্রধান, এইজন্য তাঁহার পক্ষে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় তামসিক সাধনার প্রয়োজন হয় না। ঐহিক ভোগ কামনা করিলে তিনিও তামসিক বামমার্গ অবলম্বন করিতে পারেন।"[১]

কৌলাচারের আরাধ্যা—তন্ত্রে কৌলাচার প্রধানতঃ শ্রীবিদ্যা বিষয়েই বর্ণিত হয়েছে।[২] মুখ্য কৌলাচার একমাত্র শ্রীবিদ্যাবিষয়েই বিহিত।[৩] কাজেই মুখ্য কৌলাচারের আরাধ্যা শ্রীবিদ্যা বা ষোড়শী। দেবীর ত্রিপুরসুন্দরী ললিতা কামেশ্বরী প্রভৃতি অন্য নামও প্রচলিত আছে।

তবে কালী[৪] তারা ভুবনেশ্বরী প্রভৃতি পরাশক্তির অন্যান্য মূর্তিও কৌলাচারে আরাধ্যা। কুলচূড়ামণিতন্ত্রের আরম্ভেই ত্রিপুরা কালিকা বাগীশ্বরী বিমলা মাতঙ্গিনী পূর্ণা চণ্ডনায়িকা একজটা দুর্গা প্রভৃতি কুলসুন্দরী অর্থাৎ কুলাচারে আরাধ্যা দেবীর উল্লেখ করা হয়েছে।[৫]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় বাংলা দেশে শ্রীবিদ্যার উপাসক অতি বিরল। কালী তারা প্রভৃতির উপাসকরাই সংখ্যায় বেশী। এইজন্য বঙ্গদেশীয় তন্ত্রনিবন্ধে কালী তারা প্রভৃতি দেবতাবিষয়ক আচারই বিবৃত হয়েছে, মুখ্য কৌলাচার বিবৃত হয় নি। তবে এ ব্যাপারের ব্যতিক্রমও আছে। যেমন বাংলার প্রখ্যাত কৌলসাধক পূর্ণানন্দ গিরি-রচিত শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি শ্রীবিদ্যার উপাসনাপ্রতিপাদক একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।[৬]

কৌলাচারভেদ—কৌলাচারের প্রকারভেদ আছে। সময়াচারতন্ত্রমতে কৌলাচার দ্বিবিধ— আর্দ্র ও শুষ্ক। পঞ্চমকারযুক্ত হলে কৌলাচারকে আর্দ্র আর পঞ্চমকাররহিত হলে শুষ্ক বলা হয়। কলিযুগে বিশেষ করে আর্দ্রাচারই ফলপ্রদ।[৭]

সম্প্রদায়ভেদ—কৌলাচারে সম্প্রদায়ভেদও আছে। সৌন্দর্যলহরীর টীকায় লক্ষ্মীধর

১ কৌ র, পৃঃ ২৫২ ২ ঐ, পৃঃ ৫৬ ৩ ঐ, পৃঃ ২৫০

৪ (i) কুলাচারং বিনা দেবি কালীমন্ত্রং ন সিধ্যতি।—নির্ব্বা ত, পৃঃ ৭

(ii) কুলাচারবিহীনো যঃ পূজয়েৎ কালিকাং নরঃ
সঃ স্বর্গমোক্ষভাগী চ ন স্যাৎ সত্যং ন সংশয়ঃ।—কালী ত, পৃঃ ১১

৫ অসংখ্যা ত্রিপুরা দেবী অসংখ্যাতা চ কালিকা। বাগীশ্বরী তথাসংখ্যা তথা চ স্বকুলাকুলা।
মাতঙ্গিনী তথা পূর্ণা বিমলা চণ্ডনায়িকা। ত্রিপুরৈকজটা দুর্গা বা চান্যা কুলসুন্দরী।—কুলচূড়ামণিতন্ত্র ১।১-২

৬ দ্রঃ কৌ র, পৃঃ ২৫০

৭ আর্দ্রশুষ্কবিভাগেন দ্বিধাচারং পুনঃ শৃণু। আর্দ্রাচারস্তু বিজ্ঞেয়ো মকারৈঃ পঞ্চভির্যুতঃ।
মকারপঞ্চরহিতঃ শুষ্কাচারঃ প্রকীর্তিতঃ। কলৌ বিশেষতঃ দেবি আর্দ্রাচারঃ ফলপ্রদঃ।
দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৭, পরিঃ ৫, ব সং, পৃঃ ৫৩১

পূর্বকৌল এবং উত্তরকৌল এই দুই কৌল সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন।[১] তাঁর মতে কৌলরা আধারচক্রস্থ ত্রিকোণকে বিন্দুস্থান মনে করেন এবং সেখানে বিন্দুর অর্চনা করেন। ত্রিকোণ বা যোনি দ্বিবিধ—শ্রীচক্রান্তর্গত নবযোনিমধ্যবর্তী যোনি আর সুন্দরী তরুণীর প্রত্যক্ষ বরাঙ্গ। ভূর্জপত্রের বা স্বর্ণের বা পট্টবস্ত্রের পীঠাদিতে শ্রীচক্রান্তর্গত নবযোনিমধ্যবর্তী যোনি অঙ্কিত করে পূর্বকৌলরা পূজা করেন আর উত্তর কৌলরা তরুণীর প্রত্যক্ষ বরাঙ্গেই পূজা করেন।[২]

লক্ষ্মীধর আরও লিখেছেন উত্তরকৌলসিদ্ধান্তে শক্তিতত্ত্ব থেকে ভিন্ন শিবতত্ত্ব নাই; শিবতত্ত্ব শক্তিতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত।[৩]

পূর্বকৌলমতে শক্তি ও শিবের মধ্যে শেষশেষিভাব। লক্ষ্মীধর এ সম্বন্ধে যে-আলোচনা করেছেন তার মর্ম এই[৪]— আনন্দভৈরবীরূপিনী মহাশক্তি আনন্দভৈরবরূপ শিবের শরীর আর নবব্যূহাত্মক আনন্দভৈরবও দেবীর শরীর। সামরস্যযুক্ত উভয়ের পরানন্দ পরস্পর সাপেক্ষ ও সাধারণ। উভয়ের শেষশেষিভাবও আপেক্ষিক। শেষ অর্থ অঙ্গ বা প্রধান আর শেষী অর্থ অঙ্গী বা প্রধান। জগতের সৃষ্টিস্থিতিলয়ব্যাপার পরানন্দস্বরূপ আনন্দভৈরব আর পরচিৎস্বরূপা আনন্দভৈরবী উভয়ের প্রযত্নে হয়। তবে জগতের ব্যক্তাবস্থায় অর্থাৎ সৃষ্টি ও স্থিতিতে আনন্দভৈরবীর প্রাধান্যহেতু তিনি শেষী এবং আনন্দভৈরব শেষ আর লয়ের সময় আনন্দভৈরবের প্রাধান্যহেতু তিনি শেষী আর আনন্দভৈরবী শেষ।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় লক্ষ্মীধর নিজে কৌলসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না। কৌলদের সম্বন্ধে তাঁর অভিমতের সমর্থক কোনো প্রমাণও তিনি উদ্ধৃত করেন নি। এই অবস্থায় তাঁর অভিমতের সত্যাসত্য একমাত্র কুলশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতেরাই নির্দ্ধারণ করতে পারেন।

বিভিন্ন কৌলসম্প্রদায়ের কথা হচ্ছিল। কৌলজ্ঞাননির্ণয়তন্ত্রে[৫] রোমকূপাদিকৌল বৃষণোত্থকৌল বহ্নিকৌল পদোত্তিষ্ঠকৌল মহাকৌল সিদ্ধকৌল সিদ্ধামৃতকৌল যোগিনীকৌল চন্দ্রকৌল শক্তিভেদকৌল ঊর্মিকৌল জ্ঞানকৌল সিদ্ধেশ্বরকৌল ইত্যাদি বিভিন্ন কৌল-সম্প্রদায় বা উপসম্প্রদায়ের নাম পাওয়া যায়। শুধু নাম ছাড়া এদের সম্বন্ধে আর কোনো তথ্যই আমাদের হস্তগত হয় নি।

১ কৌলমতং দ্বিবিধং পূর্বকৌলং উত্তরকৌলং চেতি।—সৌ ল, শ্লো ৩৩-এর টীকা

২ অত্র কৌলমতে ত্রিকোণমেব বিন্দুস্থানম্। স এব বিন্দুঃ তত্র আরাধ্যঃ অত এব কৌলাঃ ত্রিকোণে বিন্দুং নিত্যং সমর্চয়ন্তি। তৎ ত্রিকোণং দ্বিবিধং শ্রীচক্রান্তর্গতনবযোনিমধ্যবর্তিনী যোনিঃ সুন্দর্য্যাঃ তরুণ্যাঃ প্রত্যক্ষযোনিশ্চ। শ্রীচক্রস্থিতনবযোনিমধ্যগতযোনিং ভূর্জহেমপট্টবস্ত্রপীঠাদৌ লিখিত্বাং পূর্বকৌলাঃ পূজয়ন্তি। তরুণ্যাঃ প্রত্যক্ষযোনিং উত্তরকৌলাঃ পূজয়ন্তি।—সৌ ল, শ্লো ৪১-এর টীকা

৩ উত্তরকৌল-সিদ্ধান্তে শক্তিতত্ত্বাৎ অন্যৎ শিবতত্ত্বং নাস্তি। অতশ্চ শিবতত্ত্বং শক্তিতত্ত্বে অন্তর্ভূতমিতি তদেব উপাস্যমিতি প্রস্তুতম্।—ঐ, শ্লো ২৩-এর টীকা

৪ দ্রঃ সৌ ল, শ্লো ৩৪-এর টীকা ৫ দ্রঃ কৌ জ্ঞা নি, পঃ ১৪, ১৬, ২১

অকুলবীরতন্ত্রে[1] বামকৌল এবং দক্ষিণকৌল এই দুই সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। কিন্তু উভয়ের পার্থক্য কি সে সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নি। হয়ত সে-যুগে এ পার্থক্য সুপরিচিত ছিল সেইজন্যই বলা হয় নি।

তবে এক সময়ে যে কৌলমার্গের সাধনার ব্যাপক প্রচলন ছিল তা এই-সব সম্প্রদায়ের শুধু নামের তালিকা দেখেও অনুমান করা যায়।

অধিকার—কিন্তু তা বলে যার খুসি সেই যথাশাস্ত্র-কৌলাচার অবলম্বন করতে পারত এরূপ মনে করার কোনো হেতু নেই। তন্ত্রশাস্ত্র অবশ্য কৌলাচারের দ্বার জাতিবর্ণনির্বিশেষে সবার জন্যই উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। এ বিষয়ে শাস্ত্রের উদার ব্যবস্থা।

মহানির্বাণতন্ত্রে ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে[2]—জগতে বিপ্র থেকে আরম্ভ করে অন্ত্যজ পর্যন্ত যত মানুষ আছে তারা সবাই কুলাচারে অধিকারী।

উক্ত তন্ত্রে এমন কথাও বলা হয়েছে যে যদি কোনো কৌল চণ্ডাল যবন এদের নীচ মনে করে এবং স্ত্রীলোককে অবজ্ঞা করে কৌলধর্মে দীক্ষা না দেন তবে সেই অধম কৌল অধোগতি প্রাপ্ত হবেন।[3]

মুণ্ডমালাতন্ত্রেরও বিধান—পণ্ডিত মূর্খ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য চণ্ডাল সবাই কৌলাচার অবলম্বন করতে পারে এবং কৌলাচার অবলম্বন করলে এরা সবাই সমান কৌল হয়ে যায়।[4]

শাস্ত্রের এ রকম উদার নির্দেশের তাৎপর্য এই যে কৌলাচার কোনো মানুষের পক্ষেই নিষিদ্ধ নয়। অধিকারী ব্যক্তিমাত্রই অর্থাৎ যার যথাবিহিত যোগ্যতা আছে তিনিই এই আচার অবলম্বন করতে পারেন।

কিন্তু এরূপ অধিকার খুব কম লোকেরই থাকে। কারণ এ পথ বড় দুর্গম পথ।

কুলার্ণবতন্ত্রে বলা হয়েছে—কৃপাণধারাগমনের চেয়ে ব্যাঘ্রকণ্ঠাবলম্বনের চেয়ে এবং সর্পধারণের চেয়েও কুলমার্গানুসরণ কঠিন।[5]

গন্ধর্বতন্ত্রেও কৌলাচার নিসর্গদুর্গম অর্থাৎ স্বভাবদুর্গম বলা হয়েছে।[6]

---

১ মীমাংসা পঙ্করাত্রক বামদক্ষিণকৌলিকাঃ।—অকুলবীরতন্ত্র (B), শ্লো ১৩০, দ্রঃ কৌ জ্ঞা নি, পৃঃ ১০৫

২ বিপ্রাদ্যন্ত্যজপর্যন্তা দ্বিপদা যেঽত্র ভূতলে। তে সর্বেঽস্মিন্ কুলাচারে ভবেয়ুরধিকারিণঃ।—মহা ত ১৪।১৮৪

৩ চাণ্ডালং যবনং নীচং মত্বা স্ত্রিয়মবজ্ঞয়া। কৌলং ন কুর্যাৎ যঃ কৌল সোঽধমো যাত্যধোগতিম্।

—মহা ত ১৪।১৮৭

৪ মূর্খো বা পণ্ডিতো বাপি ব্রাহ্মণো বা বরাননে। ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যজঃ শূদ্রশ্চণ্ডালো বরবর্ণিনি।
সর্বে তুল্যাঃ কুলীনাশ্চ এতৎসর্বার্থসাধকম্।—দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৭, পরিঃ ৪, ব সং, পৃঃ ৫৩১

৫ কৃপাণধারাগমনাৎ ব্যাঘ্রকণ্ঠাবলম্বনাৎ। ভুজঙ্গধারণান্নূনমশক্যং কুলসেবনম্।—কু ত, উঃ ২

৬ নিসর্গদুর্গমঃ কৌলঃ সুগম ইব ভাত্যসৌ।—গ ত ৪০।৩০

কৌলাচারের সাধনা যে কত কঠিন কৌলাবলীনির্ণয়ে একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা তা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে[১]—কৌল সাধকের বামে রমণকুশলা রমণী; দক্ষিণে মদ্যপানপাত্র; মধ্যে অর্থাৎ সাধকের সম্মুখে মরিচযুক্ত উষ্ণ শূকরমাংস। সাধকের স্কন্ধে ললিত রমণীয় বীণা। সদ্‌গুরুদের নির্দিষ্ট এই প্রপঞ্চ। (এই প্রপঞ্চের মধ্যে থেকেও সাধককে অবিচলিত চিত্তে সাধনা করতে হয়) এইজন্য কৌলধর্ম পরম গহন, যোগীদেরও অগম্য।[২]

কাজেই কৌলাচারে যে যে-কোন ব্যক্তি অধিকারী নয় তা সহজেই বোঝা যায়।

জিতেন্দ্রিয় বিশুদ্ধচিত্ত দেবতা ও গুরুর প্রতি ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিই কৌলমার্গে অধিকারী। ত্রিপুরার্ণবের মতে শিবোক্ত এই সর্বোত্তম কুলধর্ম জিতেন্দ্রিয় সাধকের পক্ষেই সুলভ এবং সুখকররূপে সিদ্ধিপ্রদ। অন্যের অর্থাৎ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির এই ধর্ম অনন্তজন্মেও লাভ হয় না। যার ক্ষণিক স্মরণমাত্র গৃহহীন সর্বত্যাগী ঊর্ধ্বরেতা সন্ন্যাসীরও মোহ উৎপন্ন হয় তাকেই এই কৌলমার্গে সিদ্ধির কারণ বলা হয়েছে। এদিকে মদ্য এদিকে নানারকম ভক্ষ্য, ওদিকে মদঘূর্ণিতলোচনা সুবেশা তরুণীরা। এ রকম পরিবেশে চিত্তসংযম অত্যন্ত দুষ্কর। ভক্তিশ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির এই চিত্তসংযম কি করে থাকবে?[৩]

আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি ভাবচূড়ামণিতন্ত্রের অভিমতও এই যে বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ বুদ্ধিমান্ জিতেন্দ্রিয় গূঢ়তত্ত্বার্থভাবসারজ্ঞ ব্রাহ্মণই কৌলমার্গে অধিকারী।

'নিত্যোৎসব'-এ কৌলাচার-অবলম্বনে অধিকারী ব্যক্তির লক্ষণ এইভাবে বর্ণিত হয়েছে যিনি সুন্দর সুমুখ সুস্থ সুলভ কৌলাচারে শ্রদ্ধাবান্ সুস্থিরাশয় অর্থাৎ দৃঢ়াভিলাষযুক্ত লোভহীন স্থিরগাত্র অর্থাৎ যৌগিক আসনাদির অভ্যাসের ফলে যার দেহস্থৈর্য লাভ হয়েছে, যিনি প্রেক্ষ্যকারী অর্থাৎ সব দিক্ দেখে শুনে কাজ করেন, যিনি জিতেন্দ্রিয় আস্তিক;

১ বামে রামা রমণকুশলা দক্ষিণে পানপাত্রম্। মধ্যে ন্যস্তং মরীচসহিতং শূকরস্যোষ্ণমাংসম্।
স্কন্ধে বীণা ললিত-সুভগা সদ্‌গুরূণাং প্রপঞ্চঃ। কৌলো ধর্মঃ পরমগহনো যোগিনামপ্যগম্যঃ।
—কৌ নি ২১।১৮৯-১৯০

২ লক্ষ্য করা গেছে রুদ্রযামলে এই বচনই ঈষৎপরিবর্তিত আকারে বামাচার সম্পর্কে প্রযুক্ত হয়েছে।

৩ অয়ং সর্বোত্তমো ধর্মঃ শিবোক্তঃ সুখসিদ্ধিদঃ। জিতেন্দ্রিয়স্য সুলভো নান্যস্যানন্তজন্মভিঃ।
যদূর্দ্ধরেতসাং সর্বত্যাগিনামনিকেতিনাম্। ক্ষণেন স্মৃতমাত্রেণ মোহমুৎপাদয়ত্যলম্।
তদেবাত্র হি সংসিদ্ধৌ কারণং সর্বমীরিতম্। ইতো মদ্যমিতো মাংসং ভক্ষ্যমুচ্চাবচং তথা।
তরুণ্যশ্চারুবেশাঢ্যা মদঘূর্ণিতলোচনাঃ। তত্র সংযতচিত্তত্বং সর্বথা হ্যতিদুষ্করম্।
ভক্তিশ্রদ্ধাবিহীনস্য কথং তাদেবমীশ্বরি।—ত্রিপুরার্ণববচন, দ্রঃ কৌ রহ, পৃঃ ১৭২

স্বীয় গুরু মন্ত্র ও দেবতার প্রতি যাঁর দৃঢ়ভক্তি, এমনি ব্যক্তি কৌলাচারে শিষ্য হবার যোগ্য। এ ছাড়া অন্য ব্যক্তি গুরুর পক্ষে দুঃখদায়ক।[১]

যিনি বিনয়ী পাণ্ডিত্যগর্বহীন এ রকম সাধকই কৌলাচারের সাধনায় অধিকারী। কুলার্ণবতন্ত্রে শিব বলছেন—ব্রহ্ম থেকে অতি সূক্ষ্ম কীট পর্যন্ত সমস্ত জীবই আমার গুরু, আমি সকলের শিষ্য, জগতে আমার পূজ্য কে নয়?—এমনি নিশ্চিতবুদ্ধি সাধক আমাদের (অর্থাৎ শিবশক্তির) প্রিয়। কিন্তু আমি গুরু, আমি সকলের বড়, আমি সব জানি, এমনি অহংকার যাদের তারা কৌলিক হতে পারে না অর্থাৎ তাদের কৌলসাধনায় অধিকার নাই।[২]

কৌলাচারে অধিকারী সম্বন্ধে এমনি তন্ত্রবচন অনেক আছে। এই সব বচনের সার কথা—যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়, ষড়্‌রিপুজয়ী[৩] ভক্তিশ্রদ্ধাবান্ শাস্ত্রজ্ঞ কৌলাচারে তাঁরই অধিকার।

আরেকটি কথা। কৌলাচারের সাধকের সুস্থ শরীর থাকা চাই। শক্তিসাধক সম্বন্ধে সাধারণভাবে এ কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। কুলাচারের বর্ণনা প্রসঙ্গে গন্ধর্বতন্ত্রে বলা হয়েছে—শরীরই মানুষের পুরুষার্থলাভের একমাত্র সাধন।[৪] সুস্থ শরীরে সর্বকর্ম সাধন করতে হবে।[৫] ভবসমুদ্র পার হওয়ার তরণী শরীর। সুস্থ শরীর থাকলেই এই দুস্তর সমুদ্র সুখে পার হওয়া যায়। শরীর রুগ্ন হলে জীবন বিফল হয়ে যায়।[৬] কাজেই সুস্থ শরীর না থাকলে কৌলাচারের সাধনা তথা কোনো সাধনাই চলে না।

সুস্থ শরীরের সঙ্গে সুস্থ মন থাকলে তবে জিতেন্দ্রিয় হওয়া সম্ভবপর হয়। ইন্দ্রিয়সংযম অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। কিভাবে এই কঠিন কাজ সম্পন্ন করে, চিত্ত শুদ্ধ করে সাধক কৌলাচারের অধিকারী হতে পারেন তন্ত্রশাস্ত্রে সে সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

১ চতুর্ভিরাস্তিঃ সহিতঃ শ্রদ্ধাবান্ সুস্থিরাশয়ঃ। অনুবদ্ধঃ স্থিরগাত্রশ্চ প্রেক্ষাকারী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
আস্তিকো দৃঢ়ভক্তিশ্চ গুরৌ মন্ত্রে সদৈব তু। এবংবিধো ভবেচ্ছিষ্যঃ ইতরো দুঃখকৃদ্গুরোঃ।
—নিত্যোৎসব, G. O. S. Vol. xxiii, p. 6-7.

২ ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্তং যস্য মে গুরুসন্ততিঃ। তস্য মে সর্বশিষ্যস্য কো ন পূজ্যো মহীতলে।
ইতি নিশ্চিতবুদ্ধিঃ স ভবেদাবয়োঃ প্রিয়ঃ। অহং গুরুরহং জ্যেষ্ঠোহহং বেদ্মীতি গর্বিতঃ।
অহমেব গরিষ্ঠোহং কৌলিকা ন ভবন্তি তে।—কুলার্ণবতন্ত্রবচন, দ্রঃ কৌ র, পৃঃ ২৩

৩ কৌলাচারী সম্পর্কে পরশুরামকল্পসূত্রের নির্দেশ—
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্যাবিহিতহিংসা-স্তেয়-লোকবিদ্বিষ্টবর্জনম্।—প ক সূ ১।১৯

৪ শরীরং তু মনুষ্যাণাং পুরুষার্থৈকসাধনম্।—গ ত ৩৪।১৫

৫ নিরাময়ে শরীরে তু সর্বকর্মাণি সাধয়েৎ।—ঐ ৩৪।১৪

৬ ভবাব্ধেস্তরণোপায়ং তরণী বপু চোচ্যতে। নির্মলেন শরীরেণ সুখং তরন্তি দুস্তরম্।
সরুজা বপুষা দেবি জীবনং বিফলং প্রিয়ে।—ঐ ৩৪।১৭-১৮

কুলজ্ঞান—যেমন কুলসারে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে[১]—অন্য দেবতাদের বার বার সেবা দ্বারা পরিপক্কমনা সাধক কৌলমার্গ সম্বন্ধে প্রামাণ্য জ্ঞানলাভ করে এবং বাহ্য ইন্দ্রিয় সংযত করে এই মার্গে প্রবেশ করবেন, অন্য ব্যক্তির এতে প্রবেশাধিকার নেই।

কৌলমার্গ সম্বন্ধে জ্ঞানের মধ্যে কুলসঙ্কেতজ্ঞান[২] বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেন না তন্ত্রশাস্ত্রের নির্দেশ কেউ যদি কুলসঙ্কেত না জেনে কৌলমার্গে প্রবেশ করে তবে সে ঘোর নরকে যাবে এবং তার পরজন্মে যা হবে তার ত কথাই নাই।[৩]

ক্রমসঙ্কেত পূজাসঙ্কেত মন্ত্রসঙ্কেত যন্ত্রসঙ্কেত এবং মন্ত্রযন্ত্রলিখনসঙ্কেত কুলসঙ্কেতের অন্তর্ভুক্ত। এ-সব গুরুমুখে জানতে হয়।

যথার্থ কুলজ্ঞান-লাভ সহজ ব্যাপার নয়। কুলার্ণবতন্ত্রে বলা হয়েছে—পূর্বে তপস্যা দান যজ্ঞ তীর্থপর্যটন জপ ব্রত এই-সব করে যে-সব লোকের পাপক্ষয় হয়ে গেছে সেই শুদ্ধচিত্ত শান্ত কর্মপরায়ণ (ধর্মপরায়ণ) গুরুসেবী অতিভক্ত গুহ্যসাধকদের কাছে কুলজ্ঞান প্রকাশিত হয়।[৪]

বলা বাহুল্য কৌলাচার অবলম্বন করলেই কুলজ্ঞান লাভ হয় না। কেন না কুলজ্ঞান অদ্বৈতব্রহ্মজ্ঞান, সমস্ত জগৎ শিবশক্তিময় এই জ্ঞান। অপরোক্ষ কুলজ্ঞান লাভের জন্যই কৌলাচারের সাধনা।[৫] খুব কম লোকই এই কুলজ্ঞান লাভ করতে পারেন। তাই কুল-শাস্ত্র বলেন ভাগ্যবশেই লোকের কুলজ্ঞান প্রকাশ পায়। যাঁদের কুলজ্ঞান প্রকাশ পায় তাঁরা ধন্য, তাঁরা পুণ্যকর্মা, তাঁরা সন্ত, তাঁরা যোগী।[৬]

এখানে ভাগ্য অর্থ জন্মান্তরের সাধনা। তন্ত্রের অভিমত যাঁদের এমনি সাধনা আছে কোনো উপদেশ না পেলেও স্বপ্নোত্থিত ব্যক্তির প্রত্যয়ের মতো তাঁদের কুলজ্ঞান প্রকাশ পেতে পারে। সহস্র জন্মের মধ্য দিয়ে বিহিত বুদ্ধিই মানুষ লাভ করে, উপদেশ নিরর্থক।[৭]

১ অভ্যাসাৎ দেবতানাঞ্চ ভূয়ো ভূয়ো নিষেবণাৎ। পরিপক্বমনাঃ কৌলে লব্ধপ্রামাণ্যকো নরঃ।
বাহ্যেন্দ্রিয়াণি সংযম্য প্রবিশেদত্র নেতরঃ।—দ্রঃ প ক সূ ৩।৩১-এর রামেশ্বরকৃত বৃত্তি

২ সঙ্কেত অর্থ শাস্ত্রপদ্ধতি। বৈজয়ন্তীকোষে আছে—সঙ্কেতঃ শাস্ত্রপদ্ধতৌ।—দ্রঃ প ক সূ ৭।১-এর বৃত্তি

৩ অজ্ঞাত্বা কুলসঙ্কেতং কুলমার্গং বিশেদ্ যদি। স যাতি নরকং ঘোরং কা কথা পরজন্মনি।
—নিরু ত, পঃ ১২

৪ পুরাকৃততপোদানযজ্ঞতীর্থজপব্রতৈঃ। ক্ষীণাংহসাং নৃণাং দেবি কুলজ্ঞানং প্রকাশতে।
শুদ্ধচিত্তস্য শান্তস্য কর্মিণো (ধর্মিণো) গুরুসেবিনঃ। অতিভক্তস্য গুহ্যস্য কুলজ্ঞানং প্রকাশতে।
—কু ত, উঃ ২

৫ কুলাচারেণ দেবেশি ব্রহ্মজ্ঞানং প্রজায়তে।—মহা ত ৪।২১

৬ তে ধন্যাঃ পুণ্যকর্মাণস্তে সন্তস্তে চ যোগিনঃ। যেষাং ভাগ্যবশাদ্দেবি কুলজ্ঞানং প্রকাশতে।—কু ত, উঃ ২

৭ পূর্বজন্মকৃতাভ্যাসাৎ কুলজ্ঞানং প্রকাশতে। স্বপ্নোত্থিতপ্রত্যয়বদুপদেশাদিকং বিনা।
জন্মান্তরসহস্রেষু যা বুদ্ধির্বিহিতা নৃণাম্। তামেব লভতে জন্তুরুপদেশো নিরর্থকঃ।—ঐ

জন্মজন্মান্তরের সাধনার ফলে যে শুধু কুলজ্ঞান লাভ হয় তাই নয়, বহুজন্মার্জিত পুণ্যবল থাকলে তবে মানুষের কুলাচারে মতি হয়।[১]

তার অর্থ কৌলাচার সাধনার এত উচ্চস্তরের অবস্থা যে সাধক জন্মজন্মান্তরের সাধনার ফলেই এই অবস্থায় পৌঁছাতে পারেন। উপদেশের দ্বারা কাউকে কৌলসাধনায় প্রবৃত্ত করান যায় না বা তার দ্বারা কারো কৌলজ্ঞানও লাভ হয় না।

কৌলমাহাত্ম্য—কৌলতন্ত্রে কৌল সাধকের মাহাত্ম্য যে-ভাবে প্রচার করা হয়েছে তার থেকেও কৌলজ্ঞানী সাধক হওয়া যে কিরূপ দুঃসাধ্য তা অনুমান করা যেতে পারে। মহানির্বাণতন্ত্রে কুলাচারপূতাত্মা সাধককে সাক্ষাৎ শিবময় বলা হয়েছে।[২] এরূপ সাধক একান্ত দুর্লভ।[৩]

উক্ত তন্ত্রে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে[৪]—সাড়ে তিন কোটি তীর্থ, ব্রহ্মাদি সকল দেবতা কৌলিকের দেহে অবস্থিত। এ হেন কৌলিকের অর্চনার দ্বারা কি না হয়? পূর্ণাভিষিক্ত সৎকৌল যে-দেশে বাস করেন সেই পুণ্যতম দেশ ধন্য মান্য, দেবতাদেরও প্রার্থনীয়।

কুলার্ণবতন্ত্রে পূর্ণাভিষিক্ত কৌলের লক্ষণ এইভাবে বর্ণিত হয়েছে—নিন্দাস্তুতি শীতোষ্ণ সুখদুঃখাদি যাঁর কাছে সমান; যিনি সর্বত্র সমভাবাপন্ন; যিনি হর্ষবিষাদবর্জিত; যিনি আত্মতত্ত্ব বিদ্যাতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব এই তত্ত্বত্রয়, শ্রীগুরুর চরণ ও মূল মন্ত্রের তত্ত্ব অবগত আছেন; যিনি দেবতা ও গুরুর প্রতি ভক্তিমান্; শাম্ভবীমুদ্রাযুক্ত সেই যোগীশ্বরই পূর্ণাভিষিক্ত কৌলিক; শুধু দীক্ষার দ্বারা পূর্ণাভিষিক্ত হওয়া যায় না।[৫]

আর সৎকৌল বলা হয় সেই জীবন্মুক্ত সাধককে যিনি সমস্তকে ব্রহ্মে এবং সর্বত্র ব্রহ্মকেই দেখেন।[৬] অবিদ্যালেশরহিত ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি জীবিতাবস্থাতেই মুক্ত; তাই তিনি জীবন্মুক্ত।

১ বহুজন্মার্জিতৈঃ পুণ্যৈঃ কুলাচারে মতির্লভেৎ।—মহা ত ৪।৩৮

২ (i) কুলাচারেণ পূতাত্মা সাক্ষাৎ শিবময়ো ভবেৎ।—ঐ

(ii) কুলমার্গরতো জীবঃ শিব এব ন সংশয়ঃ।—মুণ্ডমালাতন্ত্রবচন দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৭, পরিঃ ৪, ব সং পৃঃ ৫৩১

৩ দুর্লভোঽয়ং কুলেশানি কুলতত্ত্ববিশারদঃ।—কু ত উঃ ২

৪ সার্দ্ধত্রিকোটিতীর্থানি ব্রহ্মাদ্যা সর্বদেবতাঃ। বসন্তি কৌলিকে দেহে কিমসাধ্যং কৌলিকার্চনাৎ।
পূর্ণাভিষিক্তঃ সৎকৌল যস্মিন্ দেশে বিরাজতে। ধন্যো মান্যঃ পুণ্যতমঃ স দেশঃ প্রার্থ্যতে সুরৈঃ।
—মহা ত ১০।১০৫-১০৬

৫ যো নিন্দাস্তুতিশীতোষ্ণসুখদুঃখাদিসম্ভবে। সমঃ সর্বত্র যোগীশো হর্ষামর্ষবিবর্জিতঃ।
তত্ত্বত্রয়শ্রীচরণমূলমন্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ। দেবতাগুরুভক্তশ্চ শাম্ভবীমুদ্রয়ান্বিতঃ।
স চ পূর্ণাভিষিক্তঃ স্যাৎ কৌলিকো ন তু দীক্ষয়া।—কুলার্ণববচন দ্রঃ প ক সূ ৫।২২-এর বৃত্তি

৬ সর্বং ব্রহ্মণি সর্বত্র ব্রহ্মৈব পরিপশ্যতি। জ্ঞেয়ঃ স এব সৎকৌলো জীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ।—মহা ত ১০।২১২

কৌলমাহাত্ম্য-প্রকাশক এরূপ বচন অনেক পাওয়া যায়।[১]

সিদ্ধিপ্রাপ্ত কৌল—এই-সব বচন পর্যালোচনা করলে স্পষ্টই বোঝা যায় শুধু কুলজ্ঞানী সিদ্ধপুরুষেরই এরূপ মাহাত্ম্য থাকতে পারে। কৌলাচারে সিদ্ধিলাভ করলে সাধকের কুলজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। আর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হলেই সাধক জীবন্মুক্ত হন।[২] এমনি মহাপুরুষকেই শিবস্বরূপ বা ব্রহ্মস্বরূপ বলা হয়। কেন না যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন তিনি ব্রহ্ম হন।[৩]

এ রকম কুলজ্ঞানী সিদ্ধ পুরুষের ভেদজ্ঞান লোপ পেয়ে যায়। তিনি সব কিছুকেই ব্রহ্ম বলে জানেন। কাজেই তাঁর কাছে বিধিনিষেধ পাপপুণ্য স্বর্গনরক এ-সব নাই।[৪] কর্দমে-চন্দনে শত্রুতে পুত্রে শ্মশানে-গৃহে, তৃণে-কাঞ্চনে তিনি কোনো ভেদ করেন না। তিনি যথার্থ কৌল।[৫]

তন্ত্রশাস্ত্রে যে সব কর্ম ও প্রয়োগ বিহিত হয়েছে ব্রহ্মৈকনিষ্ঠ সিদ্ধ কৌলের পক্ষে সে-সব করা না করা সমান।[৬]

পরশুরামকল্পসূত্র বলেন[৭] যিনি যথাশাস্ত্র কুলাচারের সমস্ত অনুষ্ঠান করে সিদ্ধিলাভ করেছেন তাঁর সবপ্রকারে কৃতকৃত্যতা হয়েছে অর্থাৎ তাঁর আর কোনো অনুষ্ঠানাদির প্রয়োজন নাই। এই জীবন্মুক্ত সাধকের কাশীতেই দেহত্যাগ হোক আর চণ্ডালগৃহেই হোক তাতে কোনো ভেদ হবে না। কেন না অবিদ্যার জন্যই মানুষের স্বর্গনরকাদি প্রাপ্তি হয়। কিন্তু যিনি অবিদ্যালেশরহিত তাঁর স্বর্গনরক কিছুই নাই। কাজেই তিনি যেখানেই দেহত্যাগ করুন না কেন তাতে কিছু আসবে যাবে না।

ব্রহ্মজ্ঞানী সিদ্ধ কৌলের নিজের কোনো কামনা নাই, কোনো কৃত্যাকৃত্য নাই।[৮]

১ দ্রঃ কা ত, পঃ ৫; কৌ নি, উঃ ৮; ইত্যাদি

২ কুলাচারেণ দেবেশি ব্রহ্মজ্ঞানং প্রজায়তে। ব্রহ্মজ্ঞানযুক্তো মর্ত্যো জীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ।—মহা ত ৪।২১

৩ স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।—মু উপ ৩।২।৯

৪ ন বিধি র্ন নিষেধঃ স্যান্ন পুণ্যং ন চ পাতকম্। ন স্বর্গো নৈব নরকঃ কৌলিকানাং কুলেশ্বরি।—কু ত, উঃ ৯

৫ কর্দমে চন্দনেঽভিন্নঃ পুত্রে শত্রৌ তথা প্রিয়ে। শ্মশানে ভবনে দেবি তথৈব কাঞ্চনে তৃণে।
ন ভেদো যস্য দেবেশি স কৌলঃ পরিকীর্তিতঃ।
—নিত্যাতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৭, পরিঃ ৪, ব সং, পৃঃ ৫৩১

৬ উক্তাঃ প্রয়োগা বহবঃ কর্মাণি বিবিধানি চ। ব্রহ্মৈকনিষ্ঠকৌলস্য ত্যাগানুষ্ঠানয়োঃ সমম্।
—মহা ত ১০।২০৯

৭ ইত্থং বিদিত্বা বিধিবদনুষ্ঠিতবতঃ কুলনিষ্ঠস্য সর্বতঃ কৃতকৃত্যতা শরীরত্যাগে কাশীচণ্ডালগৃহয়োর্ন ভেদঃ জীবন্মুক্তঃ।—প ক সূ ১০।৮২

৮ ব্রহ্মজ্ঞানে সমুৎপন্নে কৃত্যাকৃত্যং ন বিদ্যতে।—মহা ত ৭।৯৪

শিবস্বরূপ এই মহাপুরুষ নরদেহে বিহার করেন শুধু লোকযাত্রা শিক্ষা দেবার জন্য এবং লোকদের ত্রাণ করবার জন্য।[১] সারকথা তিনি শুধু লোকহিতের জন্য সংসারে বিচরণ করেন। কিন্তু এমনভাবে থাকেন যাতে লোকে তাঁকে চিনতে না পারে। এইজন্য তিনি নানা বেশ ধরে ঘুরে বেড়ান, একবারও নিজের পরিচয় প্রকাশ করেন না, জনসমাজে উন্মত্ত মূক জড়ের মতো থাকেন।[২]

তিনি এমন আচরণ করেন যাতে লোকে হাসে, তাঁকে কুৎসিৎ বলে ঘৃণা করে, তাঁকে দেখে দূরের থেকেই সরে পড়ে। কখনো শিষ্ট, কখনো দুষ্ট, কখনো ভূতপিশাচের মতো নানাবেশ ধরে কুলযোগী পৃথিবীতে বিচরণ করেন।[৩]

উত্তমাদি ভেদ—বলা বাহুল্য কৌলাচার অবলম্বন করা মাত্রই কোনো সাধক সাধনার এই চরমসিদ্ধির অবস্থায় সাধারণতঃ পৌঁছুতে পারেন না। এইজন্য সাধনার অবস্থাভেদে কৌল সাধকদের উত্তম মধ্যম ও অধম এই তিন শ্রেণী নির্দেশ করা হয়েছে। যিনি সর্বভূতের মধ্যে আপনাকে এবং আপনার মধ্যে সর্বভূতকে দেখেন সেই ব্রহ্মজ্ঞানী কৌল উত্তম; যিনি সমাহিত ও ধ্যাননিষ্ঠ হয়ে পঞ্চতত্ত্বের দ্বারা সাধনা করেন তিনি মধ্যম আর যিনি অদ্বৈতজ্ঞান-ভূমিতে তখনও আরোহণ করেন নি তবে আরোহণ করতে ইচ্ছুক তিনি অধম কৌল।[৪]

উত্তম কৌল ব্যতীত অন্য কৌলদের শাস্ত্রবিহিত সদাচার পালন করতে হয়। কুলার্ণব-তন্ত্রের মতে কুলধর্মের মূল সদাচার, অভিষেক নয়, মন্ত্র নয়, শাস্ত্রপাঠাদিও নয়।[৫]

কৌলাবলীনির্ণয়ের মতে কুলধর্ম গ্রহণ করে যে আচার পালন করে না সেই যথেচ্ছাচারী মহাপাতকীর নিষ্কৃতি নাই। সে মহাপশু এবং তাকে দেবতার অভিশাপ লাগে। সে রৌরব নরকে যায়।[৬]

কৌলসাধকের পালনীয় বিধিনিষেধ—শাস্ত্রবিহিত বিধিনিষেধ মেনে চলা এই আচারপালনের অন্তর্ভুক্ত। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি বিধিনিষেধের উল্লেখ করা যাচ্ছে।

১ কেবলং নররূপেণ তারয়ন্নখিলং জগৎ। শিক্ষয়ন্ লোকযাত্রাঞ্চ কৌলো বিহরতি ক্ষিতৌ।—ঐ ১০।১০৮

২ যোগিনো বিবিধৈর্বেশৈর্নরাণাং হিতকারিণঃ। ভ্রমন্তি পৃথিবীমেতামবিজ্ঞাতস্বরূপিণঃ।
নক্তৈবাত্মবিজ্ঞানং কথয়ন্তি কদাচন। উন্মত্তমূকজড়বল্লিবসেল্লোকমধ্যমে।—কু ত উঃ ৯

৩ যথা হসন্তি লোকোঽস্মিন্ জুগুপ্সন্তি চ কুৎসিতঃ। বিলোক্য দূরতো যান্তি যত তৎপরা যোগী প্রবর্ততে।
কচিচ্ছিষ্টঃ কচিদ্ দুষ্টঃ কচিদ্ভূতপিশাচবৎ। নানাবেশধরো যোগী বিচরেজ্জগতীতলে।—ঐ

৪ তার উত্তর আচার ক শ অ, পৃঃ ৪৩০

৫ নাভিষেকো ন মন্ত্রো বা ন শাস্ত্রপঠনাদিকম্। কারণং কুলধর্মস্য সদাচারঃ কুলেশ্বরি।—কু ত উঃ ১১

৬ কুলধর্মং সমাশ্রিত্য আচারং যো ন পালয়েৎ। যথেচ্ছাচারিণস্তস্য মহাপাতকিনঃ সদা।
নিষ্কৃতির্নাস্তি তস্যৈব মহারৌরবসঙ্কুলে। স মহাপশুরিত্যুক্তো দেবতাশাপমাপ্নুয়াৎ।
—কৌ নি, উঃ ১০

কৌলাচারের সাধনা যে কিরূপ উচুস্তরের সাধনা এই-সব বিধিনিষেধের পর্যালোচনা করলেও সে সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা হতে পারে।

কৌলোপনিষৎ বিধান দিয়েছেন—মদাদি ত্যাজ্য।[১] মাদকদ্রব্যসেবনজনিত বিকারবিশেষকে বলা হয় মদ।[২] এখানে কিন্তু মদ অর্থ কামাদি ষড়্‌রিপু। কৌলসাধককে এ-সব ত্যাগ করতে হবে।

কৌলাচারপরায়ণ সাধক নিজের আচারের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখবেন। এমন কি স্বয়ং ব্রহ্মাও যদি কৌলসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধবাদী হন তা হলে তাঁকেও গ্রাহ্য করবেন না।[৩]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় তান্ত্রিক সাধনায় বিশ্বাস এবং সম্প্রদায়ের প্রাধান্য বিশেষভাবে স্বীকৃত। পরশুরামকল্পসূত্রে[৪] আছে সম্প্রদায় ও বিশ্বাসের[৫] দ্বারা সর্বসিদ্ধিলাভ হয়। সূত্রটি বলা হয়েছে মন্ত্রসাধনা সম্পর্কে। মন্ত্র ছাড়া সাধনা হয় না। কাজেই এটি সাধারণভাবে সাধনা সম্পর্কেই প্রযোজ্য।

কৌল সাধক অন্য সম্প্রদায়ের জ্ঞানী ব্যক্তিদের কথার নিন্দা করবেন না বা অন্যদের উপাস্য দেবতাদের নিন্দা করবেন না।[৬] কোনো মতেরই নিন্দা করবেন না।[৭] ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে নানা মত, নানা পথ। যাঁর যে-মতে যে-পথে অধিকার তাঁর কাছে তাই প্রামাণ্য। কৌল ভিন্ন অন্য মতের নিন্দা করলে সেই সেই মতাবলম্বী সাধকের মনে স্বীয় মত ও পথের প্রতি অবিশ্বাস দেখা দেবে অথচ কৌলমতের অধিকারী না হওয়ায় তাঁরা সে-মতও গ্রহণ করতে পারবেন না। এইভাবে তাঁরা উভয়ভ্রষ্ট হয়ে ছিন্নমেঘের মতো বিনাশপ্রাপ্ত হবেন।[৮]

অন্যের যাতে অনিষ্ট হয় কৌল সাধক তেমন কোনো কাজ করতে পারেন না। কারণ তাঁর কাছে পর কেউ নেই। কেন না শাস্ত্রের নির্দেশ কৌল সাধক প্রাণীমাত্রের ও স্থাবরমাত্রের সঙ্গে একাত্ম হবেন[৯] অর্থাৎ তাঁর হবে সর্বাত্মভাব। কাজেই পরমতের

১ মদাদিত্যাজ্যঃ।   ২ দ্রঃ ঐ মন্ত্রের ভাস্কররায়কৃত ভাষ্য

৩ দ্রঃ ন পশ্যেৎ কমপি—এই কৌলোপনিষৎ-মন্ত্রের ভাস্কররায়কৃত ভাষ্য

৪ সম্প্রদায়বিশ্বাসাভ্যাং সর্বসিদ্ধিঃ।—প ক সূ ১।৯

৫ রামেশ্বর আলোচ্য সূত্রের বৃত্তিতে সম্প্রদায় শব্দের অর্থ করেছেন—গুরুপরম্পরাগতাচারানুসরণম্।—গুরুপরম্পরাক্রমে আগত আচারের অনুসরণ। আর বিশ্বাসশব্দের শব্দের অর্থ করেছেন—বিশ্বাসো মন্ত্রেষু ফলসাধনত্ববিষয়কঃ নিশ্চয়ঃ—মন্ত্রের ফলসাধনত্ববিষয়ে সুনিশ্চিত অবধারণ।

৬ ন নিন্দেদ্‌ জ্ঞবাক্যঞ্চ ন নিন্দেদ্দেবতাদিকম্।—কৌ নি, উঃ ১০

৭ সর্বদর্শনানিন্দা।—প ক সূ ১।১৪

৮ দ্রঃ লোকান্ন নিন্দ্যাৎ—এই কৌলোপনিষৎ-মন্ত্রের ভাস্কররায়কৃত ভাষ্য

৯ সর্বসমো ভবেৎ।—কৌ উপ

নিন্দা দ্বারা তাদের অনিষ্ট হলে কৌল সাধকের এই সর্বাত্মভাবের হানি হয়। সেইজন্য যিনি যে-মত ও আচার অবলম্বন করেছেন তাই তাঁর আত্মজ্ঞানের পক্ষে উপকারক কৌলসাধক এইরূপ মনে করবেন।[১]

এইজন্য পরশুরামকল্পসূত্রে বিধান দেওয়া হয়েছে[২]—কৌল সাধক কোনো প্রাণীর বিরোধ করবেন না। সকল প্রাণীই তাঁর আত্মতুল্য বলে তিনি কারো সঙ্গে বিরোধ করতে পারেন না।

গন্ধর্বতন্ত্র আরও স্পষ্ট করে বললেন[৩]—কৌলসাধক কোনো প্রাণীর হিংসা করবেন না এবং এই সঙ্গেই বললেন তিনি আত্মপীড়নও করবেন না।

কৌল সাধক কোনো ব্রতের আচরণ করবেন না অর্থাৎ কোনো কাম্য কর্মের অনুষ্ঠান করবেন না। কৌলসাধনার লক্ষ্য আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান। এইটিই সাধকের একমাত্র কাম্য। কাজেই অন্য কোনো কাম্য কর্ম তাঁর পক্ষে বিহিত নয়।[৪] তাই পরশুরামকল্পসূত্রের বিধান[৫]—ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে কর্ম করবে। এর অর্থ কাম্যকর্ম করবে না। তবে কোনো কোনো তন্ত্রবিদ্ মনে করেন ঈশ্বরবুদ্ধিতে শাস্ত্রবিহিত কাম্যকর্ম কৌল সাধকের পক্ষে নিষিদ্ধ নয় শাস্ত্রবাক্যের এই তাৎপর্য।[৬]

তন্ত্রান্তরের বিধান পূর্ণাভিষিক্ত কৌলের পক্ষে তীর্থাটন সন্ন্যাস ব্রতধারণ উপবাস মস্তকমুণ্ডন এ-সব বর্জনীয়।[৭] প্রায়শ্চিত্তাদিও বর্জনীয়।[৮] তবে তন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞরা বলেন প্রায়শ্চিত্ত অর্থ তন্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিত্ত ভিন্ন অন্য প্রায়শ্চিত্ত।[৯] তীর্থযাত্রা বর্জনীয় বললেও স্মার্ত বিধি অনুসারে তীর্থযাত্রা বর্জনীয় বুঝতে হবে। কেন না তন্ত্রে পীঠযাত্রার বিধি আছে।[১০]

উপবাস কেন বর্জনীয় গন্ধর্বতন্ত্রে তার একটি কারণও নির্দেশ করা হয়েছে। উক্ত

১ দ্রঃ ইত্যধ্যাহম্—এই কৌলোপনিষৎ-মন্ত্রের ভাস্কররায়কৃত ভাষ্য

২ সর্বভূতৈরবিরোধঃ।—প ক সূ ১০।৫৭

৩ প্রাণিহিংসাং ন কুর্বীত ন চাত্মানং প্রপীড়য়েৎ।—গ ত ৩৪।২

৪ দ্রঃ 'ব্রতং ন চরেৎ' (কৌ উপ) এই মন্ত্রের সিদ্ধান্তভূষণকৃত তাৎপর্য, কৌ র, পৃঃ ৮০

৫ ফলং ত্যক্ত্বা কর্মকরণম্ ।—প ক সূ ১।২২

৬ দ্রঃ ঐ, বৃত্তি

৭ তীর্থাটনং চ সন্ন্যাসং ব্রতধারণমেব চ। উপবাসং মুণ্ডনং চ সর্বথা পরিবর্জয়েৎ।
পূর্ণাভিষিক্তে শিরসি ক্ষেম যত্র ন মুণ্ডনম্—তন্ত্রান্তরবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৫, পৃঃ ৪১০

৮ প্রায়শ্চিত্তং ভৃগোঃ পাতং সন্ন্যাসং ব্রতধারণম্। তীর্থযাত্রাভিগমনং কৌলঃ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ।
—কু ত, উঃ ১১

৯ প্রায়শ্চিত্তাদিকং তন্ত্রোক্তভিন্নম্।—দ্রঃ পু চ, তঃ ৯, পৃঃ ৮৬০

১০ দ্রঃ তারাভক্তিসুধার্ণব, তঃ ৪, পৃঃ ১১৬

তন্ত্রমতে সত্যযুগে প্রাণ অস্থিগত, ত্রেতায় মাংসগত, দ্বাপরে ত্বক্‌গত আর কলিতে অন্নগত। এইজন্যই কলিযুগে নিরাহারব্রত বর্জনীয়।[১]

কৌল সাধক ঘোর বিপদের সময়েও সত্য কথা বলবেন।[২] পরদার ও পরধনে আসক্ত হবেন না[৩] এবং শুধু নিজে ভোগ করব এই বুদ্ধিতে ধন উপার্জন করবেন না।[৪]

তিনি আত্মস্তুতি, পরনিন্দা, পরের গোপন দোষ প্রকাশ পেতে পারে এ রকম কথা, বিরুদ্ধ কথা অর্থাৎ তোমার মরণ হোক এই ধরণের শ্রুতিকটু কথা, পরিহাস, পরকে ধিক্কার দেওয়া, আক্রোশ অর্থাৎ রোদনাদি, পরকে ভয় দেখান—এ-সব বর্জন করবেন।[৫]

কৌল সাধক হবেন নির্ভীক।[৬] বৈধ কর্মের অনুষ্ঠানে তাঁর কোনো রকম ভয় থাকবে না।[৭]

কৌলশাস্ত্রে নারী—নারীর প্রতি কৌল সাধকের সসম্ভ্রম সশ্রদ্ধ সদয় ব্যবহার কুলশাস্ত্রে বিহিত। কুলার্ণবতন্ত্রের বিধান—কৌল সাধক জগতের নারীমাত্রকেই মাতৃকুলসম্ভবা অর্থাৎ মাতৃজাতীয়া মনে করবেন। কখনও নারীর অসম্মান বা নিগ্রহ করবেন না বা নারীর প্রতি দ্বেষ করবেন না। নারীর নিগ্রহে কুলযোগিনীরা কুপিত হন। নারী শত অপরাধ করলেও তাকে পুষ্পের দ্বারাও আঘাত করবেন না। তাদের দোষ ধরবেন না, শুধু গুণই প্রকাশ করবেন।[৮]

কৌলাবলীনির্ণয়েও অনুরূপ বিধান দিয়ে বলা হয়েছে কৌল সাধক নারীর পূজা করবেন। বালিকা যুবতী বৃদ্ধা সুন্দরী কুৎসিতা মহাদুষ্টা যে-কোনো নারীকে দেখলেই কৌল সাধক নমস্কার করবেন।[৯]

১ সত্যে চাস্থিগতাঃ প্রাণাস্ত্রেতায়াং মাংসগা মতাঃ। দ্বাপরে ত্বগ্‌গতাঃ প্রাণাঃ কলাবন্নগতা মতাঃ।
নিরাহারব্রতং দেবি কলৌ তেন বিবর্জিতম্।—প ত ৩৪।১৯-২০

২ সর্বথা সত্যবচনম্।—প ক সূ ১০।৭৭

৩ পরদারধনেষ্বনাসক্তিঃ।—ঐ ১০।৭৮

৪ স্বৈকোপভোগবুদ্ধ্যা ধনাদ্যনার্জনম্। —নিত্যোৎসব, আরম্ভোল্লাস, পৃঃ ৯

৫ স্বস্তুতিপরনিন্দামর্মবিরুদ্ধবচনপরিহাসধিক্কারাক্রোশত্রাসনবর্জনম্।—প ক সূ ১০।৭৯

৬ নির্ভয়তা সর্বত্র।—ঐ ১।১৫

৭ বৈধানুষ্ঠানে সর্বতো নির্ভয়তা।—নিত্যোৎসব, আরম্ভোল্লাস, পৃঃ ৯

৮ যা কাচিদঙ্গনা লোকে সা মাতৃকুলসম্ভবা। কুপ্যন্তি কুলযোগিন্যো বনিতানামতিক্রমাৎ।
শতাপরাধৈর্বনিতাং পুষ্পেণাপি ন তাড়য়েৎ। দোষান্ ন গণয়েৎ স্ত্রীণাং গুণানেব প্রকাশয়েৎ।—কু ত, উঃ ১১

৯ স্ত্রীদ্বেষো নৈব কর্তব্যো বিশেষাৎ পূজনং স্ত্রিয়াঃ।......
বালাং বা যৌবনোন্মত্তাং বৃদ্ধাং বা সুন্দরীং তথা। কুৎসিতাং বা মহাদুষ্টাং নমস্কৃত্য বিসর্জয়েৎ।
—কৌ নি, উঃ ১০

গন্ধর্বতন্ত্রে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে—যাতে নারীদের মন দূষিত হতে পারে এমন কোনো আচরণ কৌল সাধক তাদের সঙ্গে করবেন না। নারীদের অপ্রিয় কাজ করলে সিদ্ধ ব্যক্তিও বিনাশপ্রাপ্ত হন।[১]

এই প্রসঙ্গে শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে নারীর যে-স্তবগান করা হয়েছে তার উল্লেখ করা যায়। তন্ত্রশাস্ত্রে নারীর প্রতি কিরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে এই স্তুতিকে তার একটি নিদর্শন মনে করা যেতে পারে। আলোচ্য তন্ত্রের তারাখণ্ডে আছে—নারী ত্রৈলোক্যজননী, ত্রৈলোক্যরূপিণী, ত্রিভুবনাধার, দেহস্বরূপিণী। পুরুষরূপই হোক আর স্ত্রীরূপই হোক যা কিছু উত্তম রূপ সবই নারী। জগতে যা কিছু রূপ আছে সবই নারীর সৃষ্টি। নারীর মতো সৌখ্য নাই; নারীর মতো গতি নাই; নারীসদৃশ ভাগ্য হয় নি, হবেও না; নারীসদৃশ রাজ্য নাই, নারীসদৃশ তপস্যাও নাই। নারীসদৃশ তীর্থ হয় নি, হবেও না; নারীসদৃশ যোগ নাই, নারীসদৃশ জপও নাই।[২]

বিধিনিষেধ—আবার প্রস্তুত বিষয়ের অনুসরণ করা যাক। কৌলোপনিষদে আছে—সমস্তই শক্তিস্বরূপ।[৩] এইজন্য ভাবচূড়ামণিতন্ত্রে বিধান দেওয়া হয়েছে[৪]—সাধক যা কিছু বলবেন, যা কিছু করবেন, যে-নিদ্রা যাবেন, যে-অর্চনা করবেন এই-সব সমস্তই কুলরূপ অর্থাৎ শক্তিস্বরূপ মনে করবেন এবং এইভাবে ধ্যান করে সুখে বিহার করবেন।

এইজন্য কৌল সাধকের দৃষ্টিতে বিহিত নিষিদ্ধ সব পদার্থই শক্তিময়।[৫] শাস্ত্রের নির্দেশ কৌলসাধক নিত্যকর্মের অনুষ্ঠানের সময় ছাড়া অন্য সব সময় 'শিবোঽহমস্মি'—আমি শিব এই ভাবনা করবেন;[৬] সর্বদা আপনাকে ব্রহ্মস্বরূপ চিন্তা করবেন।[৭]

১ ন দুষ্যতি মনো যেন নারীণাং তৎসমাচরেৎ। নারীণাং বিপ্রিয়ং কৃত্বা সিদ্ধোঽপি নশ্যতি ধ্রুবম্।—গ ত ৩৪।৯

২ নারী ত্রৈলোক্যজননী নারী ত্রৈলোক্যরূপিণী। নারী ত্রিভুবনাধারা নারী দেহস্বরূপিণী।
পুংরূপং চ স্ত্রিয়ো রূপং যৎকিঞ্চিদ্রূপমুত্তমম্। নারী চক্রে সর্বরূপং যৎকিঞ্চিজ্জগতীগতম্।
ন চ নারীসমং সৌখ্যং ন চ নারীসমা গতিঃ। ন নারীসদৃশং ভাগ্যং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
ন নারীসদৃশং রাজ্যং ন নারীসদৃশং তপঃ। ন নারীসদৃশং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
ন নারীসদৃশো যোগো ন নারীসদৃশো জপঃ।—শ স ত, তা খ, ১৩।৪৩-৪৭

৩ সর্বং শাম্ভবীরূপম্।—কৌ উপ

৪ যদ্ যদ্ বদতি নিদ্রাতি যৎ করোতি যদর্চতি। তৎসর্বং কুলরূপঞ্চ ধ্যাত্বা চ বিহরেৎ সুখী।
—দ্রঃ পু চ, তঃ ৯, পৃঃ ৮৬১

৫ দ্রঃ সর্বং শাম্ভবীরূপম্—এই কৌলোপনিষৎ-মন্ত্রের সিদ্ধান্তভূষণকৃত তাৎপর্য, কৌ র, পৃঃ ৭১

৬ দ্রঃ প ক সূ ১।১৮-এর বৃত্তি

৭ আত্মানং ব্রহ্মরূপঞ্চ সর্বদা পরিচিন্তয়েৎ।—কৌ নি, উঃ ১০

কৌল সাধককে আপন সাধনা গোপন রাখতে হয়। কৌলোপনিষদে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—কৌলাচার প্রকাশ করবে না।[১] ভাস্কররায় লিখেছেন যারা স্বকীয়মন্ত্রদীক্ষাহীন এবং উপাসনাহীন, অন্য ধর্মে যাদের অত্যন্ত আদর; যারা মন্ত্রদীক্ষা নিয়ে উপাসনা করলেও ভাসা ভাসা রকমে করে অর্থাৎ যথার্থভাবে করে না—এরা সবাই বহির্মুখ। এরা যাতে সাধককে কৌল বলে চিনতে না পারে সেইভাবেই তিনি স্বীয় সাধনা সর্বদা গোপন রাখবেন।[২]

কৌলরা পশুদের সঙ্গে স্বীয় সাধনার বিষয়ে কোনো কথাই বলবেন না।[৩] এখানে পশু অর্থ পূর্বোক্ত বহির্মুখ ব্যক্তি।[৪]

কৌলাবলীনির্ণয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—শূদ্রের সামনে বেদপাঠ যেমন নিষিদ্ধ তেমনি পশুর সামনে কুলধর্মপ্রসঙ্গ নিষিদ্ধ। লোকে যেমন চোরের হাত থেকে ধন ধান্য বস্ত্রাদি রক্ষা করে তেমনি পশুর হাত থেকে কুলধর্ম রক্ষা করবে।[৫]

কৌল সাধক যাতে নিজের সাধনা গোপন রাখতে পারেন সেইজন্য কৌলোপনিষদে বিধান দেওয়া হয়েছে—কৌল সাধক অন্তরে শাক্ত, বাইরে শৈব এবং লোকসমাজে বৈষ্ণব হবেন।[৬]

কৌল সাধকের আত্মগুপ্তি সম্পর্কে এই ধরণের নির্দেশ বিভিন্ন তন্ত্রেও লক্ষ্য করা যায়।[৭]

শিব শক্তি বিষ্ণু এঁরা স্বরূপতঃ অভিন্ন। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে আছে আদ্যা ললিতাই পুরুষরূপে কৃষ্ণমূর্তি ধারণ করেন।[৮] আর শিবশক্তি যে অভিন্ন এটি তন্ত্রশাস্ত্রের একটি বহুবিঘোষিত তত্ত্ব।

১ প্রাকট্যং ন কুর্যাৎ।—কৌ উপ ২ ঐ, ভাস্কররায়কৃত ভাষ্য

৩ ন কুর্যাৎ পশুসম্ভাষণম্।—কৌ উপ ২৮

৪ বহির্মুখাঃ সর্বেঽপি পশবঃ।—ঐ, ভাস্কররায়কৃত ভাষ্য

৫ কুলধর্মপ্রসঙ্গন্তু পশূনাং পুরতস্ত্যজেৎ। কদাচিন্নৈব কুর্বীত শূদ্রাগ্রে বেদপাঠবৎ।
যথা রক্ষতি চৌরেভ্যো ধনধান্যবস্ত্রাদিকঃ। কুলধর্মং তথা চৈব পশুভ্যঃ পরিরক্ষয়েৎ।—কৌ নি উঃ ১০

৬ অন্তঃ শাক্তঃ। বহিঃ শৈবঃ। লোকে বৈষ্ণবঃ।—কৌ উপ

৭ যথা—

(i) অন্তঃ কৌলা বহিঃ শৈবাঃ সভায়াং বৈষ্ণবা মতাঃ। [illegible]
—[illegible] উঃ ১১

(ii) অন্তঃ শাক্তো বহিঃ শৈবঃ সভায়াং বৈষ্ণবো মতঃ। [illegible]
—কৌ নি. উঃ ১০

(iii) অন্তঃ শাক্তা বহিঃ শৈবাঃ সভায়াং বৈষ্ণবা মতাঃ। [illegible] কৌলা [illegible]
—[illegible], [illegible], [illegible] ৭, [illegible], পৃঃ [illegible]

৮ কদা চিদাদ্যা ললিতা পুংরূপা কৃষ্ণবিগ্রহা।—[illegible], পৃঃ ১৭

কাজেই ব্রহ্মনিষ্ঠ কৌলের পক্ষে শৈব ও বৈষ্ণব চিহ্নধারণ করায় কোনো আপত্তি থাকতে পারে না।

কৌলসাধনা গোপন রাখার উদ্দেশ্যে কৌলোপনিষদে আরেকটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—যুক্তিতর্কের দ্বারা কৌলমার্গের প্রতিষ্ঠা করবে না।[১] ভাস্কররায় লিখেছেন যদি কোনো ন্যায়োপন্যাসনিপুণ কৌল সৎ-ন্যায়ের দ্বারা কৌলমার্গ স্থাপনে সক্ষমও হন তবু তিনি তা করবেন না। কেন না তা করতে গেলে গোপনতা নষ্ট হবে। এই কারণে কুলশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থেও গ্রন্থকারগণ উক্ত নিষেধ-বাক্য অনুসারে সম্প্রদায়গম্য কতগুলি গোপন বিষয় গুরুমুখে জ্ঞাতব্য বলে ছেড়ে দিয়েছেন, নিজেরা প্রকাশ করেন নি।[২]

এই প্রসঙ্গে বলা যায় যুক্তিতর্কের দ্বারা কৌলমার্গ প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে আরেকটি যুক্তি আছে। কৌলশাস্ত্রের অভিমত—কৌলমার্গ অতি গভীর, যোগীদেরও অগম্য। বস্তুতঃ কৌলমার্গ চিন্তার অতীত বলে এ বিষয়ে তর্কের উপন্যাস হতে পারে না।[৩] যে-সব ভাব অচিন্ত্য সে-সব তর্কের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা যায় না।[৪]

কৌল সাধকের পালনীয় আরও সব শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিধিনিষেধ আছে। জীবন্মুক্ত কৌল ভিন্ন অন্য সাধককে এই-সব অবশ্যই মেনে চলতে হয়। পরশুরামকল্পসূত্রে বিধান দেওয়া হয়েছে[৫]—কুলশাস্ত্রানুসারে কি বিহিত কি অবিহিত সেই-সব বিবেচনা করে সাধক সর্বদা বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করবেন। সহজ কথায় বলা যায় কৌল সাধনাতে শুধু কৌল সাধনাতে কেন যে-কোনো সাধনাতেই স্বেচ্ছাচারিতার স্থান নাই।

কৌলাচারপ্রশংসা— কৌলগ্রন্থগুলি কৌলাচারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। প্রধানতঃ কৌলাচারী সাধকের স্বীয় মতের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি ও বিশ্বাসের দৃঢ়তাবৃদ্ধির জন্যই এরূপ করা হয়েছে মনে হয়। অন্যদের কাছে অতিশয়োক্তি মনে হলেও সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের কাছে এই-সব শাস্ত্রবচন যথার্থ।

কুলার্ণবতন্ত্রে শিব বলছেন - জ্ঞানরূপ মন্থনদণ্ডের দ্বারা বেদাগমরূপ মহাসমুদ্র মন্থন করে সারজ্ঞ আমি কুলধর্ম উদ্ধার করেছি। এক দিকে যজ্ঞ-তীর্থ-ব্রতাদি সব ধর্ম এবং আরেক দিকে কুলধর্ম, তৌল করলে কুলধর্ম অধিক ভারী হবে। ঋজুবক্রগামিনী সব নদী যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করে তেমনি বিবিধ ধর্ম কুলধর্মে প্রবেশ করে; অন্য সব প্রাণীর পদচিহ্ন যেমন হস্তিপদচিহ্নে লীন হয়ে যায় তেমনি অন্য সব ধর্ম কৌলধর্মে লীন হয়ে যায়।[৬]

১ কৌলপ্রতিষ্ঠাং ন কুর্যাৎ।—কৌ উপ ২ দ্রঃ ঐ, ভাস্কররায়কৃত ভাষ্য ৩ কৌ র, পৃঃ ১৬

৪ অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাস্তান্ন তর্কেণ যোজয়েৎ।—মহা ভা ৩৫।১২

৫ সর্বত্র বচনপূর্বং প্রবৃত্তিঃ।—প ক সূ ১০।৬৪

৬ মথিত্বা জ্ঞানমন্থেন বেদাগমমহার্ণবম্। সারজ্ঞেন ময়া দেবি কুলধর্মঃ সমুদ্ধৃতঃ।
একতঃ সকলা ধর্মা যজ্ঞতীর্থব্রতাদয়ঃ। একতঃ কুলধর্মশ্চ তত্র কৌলোঽধিকঃ প্রিয়ে।

কৌলমার্গের এই শ্রেষ্ঠত্বের হেতুও কৌলশাস্ত্রে আলোচিত হয়েছে। কুলার্ণবতন্ত্রে আছে[১]—অন্য সব ধর্মে অতি দীর্ঘকালের অভ্যাসের অর্থাৎ সাধনার ফলে মোক্ষ লাভ হয় কিন্তু কৌলধর্মে সদ্য সদ্য মোক্ষলাভ হয় এবিষয়ে সন্দেহ নাই।

মহানির্বাণতন্ত্রে ত শিব সোজা ঘোষণা করেছেন[২]—কৌলধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ধর্ম আর আমার জানা নাই, কেন না এই ধর্মের অনুষ্ঠানমাত্রই মানুষ ব্রহ্মজ্ঞানী হয়।

অন্য মতে যোগ আর ভোগ ভিন্ন। যোগের দ্বারা অকৃত্রিম সুখ অর্থাৎ মোক্ষ আর ভোগের দ্বারা কৃত্রিম সুখ লাভ হয়। কাজেই যোগী হতে গেলে ভোগী হওয়া চলে না আর ভোগী হতে গেলে যোগী হওয়া চলে না। কিন্তু কৌলধর্ম ভোগযোগাত্মক অর্থাৎ এই ধর্মে ভুক্তিমুক্তি একসঙ্গে লাভ হয়। এই জন্য কৌলধর্ম শ্রেষ্ঠ।[৩]

শুধু তাই নয়, অন্য ধর্মে যে-সব দ্রব্য পতনের কারণ বলে বর্ণিত হয়েছে মহাভৈরব ব্যবস্থা দিয়েছেন কৌল ধর্মে সেই-সবের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হবে।[৪]
কৌলধর্ম অতি উদার। ব্রাহ্মণ থেকে অন্ত্যজ পর্যন্ত সব মানুষের জন্যই এর দ্বার উন্মুক্ত, এ কথা আমরা আগেই বলেছি। কৌলধর্মের এই উদারতাই এর শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম কারন। মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে—কৌলধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ধর্ম আর নাই, কারণ এই ধর্ম আশ্রয় করে অন্ত্যজও পবিত্র হয়ে কৌলপদ প্রাপ্ত হয়।[৫] আর কৌল হলেই পাশমুক্ত হয়ে পরমপদ লাভ করে[৬] অর্থাৎ জীবন্মুক্ত হয়।

কৌলশাস্ত্রের অভিমত কৌল ধর্মে লোকধর্মের বিরুদ্ধতা আছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও কৌলধর্ম অন্য ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তার কারণ কৌলধর্ম প্রত্যক্ষফলপ্রদ। প্রত্যক্ষের মতো উৎকৃষ্ট প্রমাণ আর নাই, কেন না সমস্ত প্রাণীর কাছেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে গণ্য। এই প্রত্যক্ষফল

প্রবিশন্তি যথা নদ্যঃ সমুদ্রং ঋজুবক্রগাঃ। তথৈব বিবিধা ধর্মাঃ প্রবিষ্টাঃ কুলমেবহি।
যথা হস্তিপদে লীনং সর্বপ্রাণিপদং ভবেৎ। দর্শনানি চ সর্বাণি কুল এব তথা প্রিয়ে।—কু ত, উঃ ২

১ দর্শনেষু চ সর্বেষু চিরাভ্যাসেন মানবাঃ। মোক্ষং লভন্তে কৌলে তু সদ্য এব ন সংশয়ঃ।—ঐ

২ কৌলধর্মাৎ পরো ধর্মো নাস্তি জ্ঞানে তু মামকে। যস্যানুষ্ঠানমাত্রেণ ব্রহ্মজ্ঞানী নরো ভবেৎ।
—মহা ত ৪।৪৩

৩ যোগী চেন্নৈব ভোগী স্যাদ্ ভোগী চেন্নৈব যোগবিৎ।
ভোগযোগাত্মকং কৌলং তস্মাৎ সর্বাধিকং (কং ?) প্রিয়ে।—কু ত, উঃ ২

৪ যৈরেব পতনং দ্রব্যৈঃ সিদ্ধিস্তৈরেব চোদিতা। শ্রীকৌলদর্শনে চাপি ভৈরবেণ মহাত্মনা।—কু ত, উঃ ৫

৫ কৌলধর্মাৎ পরো ধর্মো নাস্ত্যেব কমলাননে। অন্ত্যজোঽপি যমাশ্রিত্য পূতঃ কৌলপদং ব্রজেৎ।
—মহা ত ১৪।১৭৭

৬ কৌলা ভবন্তস্তে পাশৈর্মুক্তা যান্তি পরং পদম্।—ঐ ১৪।১৮৩

উপলব্ধ হয় বলে কুলধর্মের বিরোধী কুতার্কিকরা ব্যাহত হয়েছে। পরোক্ষ কি কে জানে; কার কি হবে কে বলতে পারে। সেইজন্য যা প্রত্যক্ষ ফল প্রদান করে তাই উত্তম ধর্ম।[১]

তবে কৌলাচার সম্বন্ধে অন্য সম্প্রদায়ের লোকেদের যে এরূপ উচ্চ ধারণা ছিল না এ কথার ইঙ্গিত কৌলতন্ত্রেও পাওয়া যায়। যেমন কুলচূড়ামণিতন্ত্রে কুলধর্মকে সর্ববাদিসদাচার এবং সর্ববাদিবিগর্হিত আচার বলা হয়েছে।[২] এই উক্তির তাৎপর্য এই যে যাঁরা কুলধর্মের মর্ম অবগত হন তাঁদের সবার কাছে শাস্ত্রবিহিত কৌলাচার সদাচার কিন্তু যাঁরা সে-মর্ম অবগত নন তাঁদের সবার কাছে এ আচার বিগর্হিত। কৌলাচার সম্বন্ধে অন্য সম্প্রদায়ের লোকেদের ধারণা যে ভাল ছিল না উক্ত তন্ত্রবচনে তার ইঙ্গিত আছে।

কৌলাচার ও যোগ—আমরা লক্ষ্য করেছি জিতেন্দ্রিয় যোগী ভিন্ন অন্য কেউ যথার্থ কৌল সাধক হতে পারেন না। যোগ কৌলাচারের অপরিহার্য অঙ্গ। রুদ্রযামলে স্পষ্টই বলা হয়েছে[৩]—অষ্টাঙ্গ যোগের অভ্যাস ছাড়া কুলমার্গে সিদ্ধিলাভ হয় না।

উক্ত তন্ত্রে আরও বলা হয়েছে—ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদির প্রথমে যোগসাধনা করতে হবে। তার পর যোগবিদ্যায় সম্যক্ সিদ্ধিলাভের জন্য কুলক্রিয়া করতে হবে। যোগী কৌল হয়ে অহর্নিশি যোগাভ্যাস করবেন।[৪]

তবে আমরা পূর্বেই বলেছি কৌলমার্গের যোগ ভোগের মধ্য দিয়ে যোগ। অন্যমতে যেখানে ভোগের বাহুল্য সেখানে যোগের কথাই উঠে না আর যেখানে যোগ সেখানে ভোগ নাই কিন্তু কৌল সাধক যোগ ও ভোগ উভয়ই লাভ করেন।[৫]

কৌলাচার গোপনীয়—কাজেই কৌলাচার অন্যান্য মতের সাধনার থেকে স্বতন্ত্র। আর এই আচারের সাধনা যে অত্যন্ত কঠিন এবং অল্পসংখ্যক লোকই এর অধিকারী হতে পারে তাও আমরা লক্ষ্য করেছি। অথচ সাধনাটি আপাতঃদৃষ্টিতে সহজ মনে হয়। বিশেষ করে পঞ্চতত্ত্ব নিয়ে সাধনা বিহিত হওয়ায় অনধিকারী লোকেরও এর প্রতি আকৃষ্ট হবার সম্ভাবনা প্রবল। কৌলতন্ত্রের ভাষায় এ-সব অনধিকারী লোক পশু। পশু

---

১ লোকধর্মবিরুদ্ধঞ্চ (কোঽপি) সিদ্ধযোগিবর্বরি প্রিয়ে। কুলং প্রমাণতাং যাতি প্রত্যক্ষফলদং যতঃ।
প্রত্যক্ষং চ প্রমাণায় সর্বেষাং প্রাণিনাং প্রিয়ে। উপলব্ধিবলাত্তস্য হতাঃ সর্বে কুতার্কিকাঃ।
পরোক্ষং কোঽনুজানীতে কস্য কিং বা ভবিষ্যতি। যথা প্রত্যক্ষফলদং তদেবোত্তমদর্শনম্।—কু ত. উঃ ২

২ সর্ববাদি-সদাচারঃ সর্ববাদি-বিগর্হিতম্।—কুলচূড়ামণিতন্ত্র ।৩১

৩ তথা যোগং বিনা নাথ অষ্টাঙ্গাভ্যাসনং বিনা। কুলমার্গো মহাভক্তো ন সিধ্যতি কদাচন।—রু যা, পঃ ১০

৪ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদীনামাদৌ যোগাদিসাধনম্। পশ্চাৎ কুলক্রিয়া নাথ যোগবিদ্যাপ্রসিদ্ধয়ে।
ভূত্বা যোগী কুলীনশ্চ যোগাভ্যাসমহর্নিশম্।—ঐ, পঃ ২২

৫ যত্রাস্তি ভোগবাহুল্যং তত্র যোগস্য কা কথা। যোগেঽপি ভোগবিরহঃ কৌলস্তূভয়মশ্নুতে।—মহা ত ৪।৩৭

কৌলাচারের মর্ম বুঝবে না ; অথচ বাহ্য পঞ্চমকারে প্রলুব্ধ হয়ে সাধনার নামে ব্যভিচার করবে। তাতে নিজেও অধঃপাতে যাবে এবং ধর্মকেও নষ্ট করবে।

এইজন্য তন্ত্রে বার বার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কৌলাচার কুলশাস্ত্র শাম্ভবীবিদ্যা এ-সব পশুর নিকট গোপন রাখতে হবে। এ সম্পর্কে নানা তন্ত্রে বচন পাওয়া যায়। যেমন গুপ্তসাধনতন্ত্রে বলা হয়েছে—মহাজ্ঞান কুলাচার পশুসঙ্কটে অর্থাৎ পশুদের ভিড়ে গোপন রাখতে হবে।[১]

মহনির্বাণতন্ত্রে শিব বলছেন[২]—সংসারে পশুর বাহুল্যহেতু এবং অধিকারিভেদের জন্য আমি কোথাও কোথাও নির্দেশ দিয়েছি কুলাচারসম্ভূত ধর্ম গোপন রাখতে হবে।

কুলার্ণবতন্ত্রের নির্দেশ[৩]—নারকেলের শাঁস ও জল যেমন গোপন থাকে তেমনি করে কুলাচার গোপন রাখতে হবে। মাতৃজারবৎ সর্বদা সকল অবস্থায় কুলধর্ম সযত্নে গোপনীয়।

নীলতন্ত্রে এ সম্পর্কে কার্যকর উপদেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে—কৌলাচারের অনুষ্ঠান নির্জনে করতে হবে, জনসন্নিধানে নয়। এমন কি পাখী পতঙ্গ প্রভৃতি দেখতে পায় এমন স্থানেও করতে নেই। ভূগর্ভস্থ মণ্ডপে সুনিয়ন্ত্রিত গহ্বরে বা নিশ্ছিদ্র মণ্ডপে কুলকর্ম করা কর্তব্য, জনসমক্ষে নয়।[৪]

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় শাক্ত সাধনামাত্রই গোপনে করতে হয়। সিদ্ধ মহাপুরুষ বামা ক্ষেপা বলেন "ভক্তের সাধনা বড়ই গুপ্ত, ইহা লোক দেখাবার জিনিষ নয়। তাই গুরু বলতেন গোপয়েৎ মাতৃজারবৎ। তুমি যে কেউ হও না কেন সাধনা কখনও লোক দেখিয়ে করবে না। তাতে তোমার সাধনা ভাল হবে না। লোক দেখিয়ে কেবল পূজাদি করতে হয়। সাধকের সাধনা খুব গোপনে, কেউ না জানতে পারে, জানলেই পণ্ড।"[৫]

আমরা পূর্বেই বলেছি মুখ্য কৌলাচার শ্রীবিদ্যাবিষয়েই বিহিত হয়েছে। পরশুরামকল্পসূত্রে শ্রীবিদ্যা সম্পর্কে বলা হয়েছে[৬]—বেদাদিবিদ্যা বেশ্যার মতো প্রকট, সমস্ত দর্শন অর্থাৎ শাস্ত্রের

১ কুলাচারং মহাজ্ঞানং গোপ্তব্যং পশুসঙ্কটে।—তঃ প্রা তো, কাণ্ড ৭, পরিঃ ৩, ব সং, পৃঃ ৫৩১

২ অধিকারিবিভেদেন পশুবাহুল্যতঃ প্রিয়ে। কুলাচারোদিতং ধর্মং গুপ্তার্থং কথিতং কচিৎ।—মহা ত ৪।২২

৩ কুলং সংগোপয়েদ্দেবি নারিকেলফলাম্বুবৎ। কুলধর্মমিদং দেবি সর্বাবস্থাসু সর্বদা।
গোপয়েচ্চ প্রযত্নেন জননীজারবৎ প্রিয়ে।—কু ত. পৃঃ ১১

৪ নির্জনে চৈব কর্তব্যং ন চৈবং জনসন্নিধৌ। কিম্বা পক্ষিপতঙ্গাদিদর্শনে নৈব কারয়েৎ।
পাতালমণ্ডপে বাপি গহ্বরে সুনিয়ন্ত্রিতে। নিশ্ছিদ্রমণ্ডপে বাপি কর্তব্যং ন চ সন্নিধৌ।
—তঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৬২৩

৫ বামা ক্ষেপা, পৃঃ ৭৫

৬ বেশ্যা ইব প্রকটা বেদাদিবিদ্যাঃ। সর্বেষু দর্শনেষু গুপ্তেয়ং বিদ্যা।—প ক সূ ১।৩০

মধ্যে এই বিদ্যা গুপ্তা। কুলার্ণবতন্ত্রে আরেকটু স্পষ্ট করে বলা হয়েছে—বেদশাস্ত্র পুরাণ প্রভৃতি সামান্যগণিকার মতো কিন্তু এই শাম্ভবী বিদ্যা অর্থাৎ শ্রীবিদ্যা কুলবধূর মতো গোপনে থাকে।[১]

বিদ্যাগুপ্তির প্রাচীনতা—গুহ্য সাধনার ঐতিহ্যটি অতি প্রাচীন। যাস্ক নিরুক্তে এই শ্রুতিটি উদ্ধৃত করেছেন—ব্রহ্মবিদ্যা ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে বললেন আমাকে গোপন রাখবে, তা হলে আমি তোমার নিধি হয়ে থাকব। অসূয়াকারী কুটিল অসংযত ব্যক্তির কাছে আমাকে প্রকাশ করো না। আমাকে এমনি প্রকাশ না করলেই আমি বীর্যবতী হয়ে থাকব।[২]

ভাস্কররায় সেতুবন্ধে এই শ্রুতিটি উদ্ধার করেছেন এবং বিদ্যা শব্দের অর্থ করেছেন শ্রীবিদ্যা আর ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে বলেছেন যিনি ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ অধ্যয়ন করেছেন বা ব্রহ্মকে জেনেছেন তিনি ব্রাহ্মণ।[৩] কাজেই ভাস্কররায়ের মতে ব্রহ্মবিদ্যা শ্রীবিদ্যা গোপনীয়া এ শ্রৌতসিদ্ধান্ত।

উপনিষদের যুগে একটা গোপন সাধনার ধারা ছিল। তার নিদর্শন উপনিষদেই আছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হয়েছে[৪]—পুরাকল্পে বেদান্তে যে-গুহ্য পরমতত্ত্ব উপদিষ্ট হয়েছে তা যে প্রশান্ত নয়, পুত্র নয় বা শিষ্য নয় তাকে দেবে না।

এই গুহ্য পরমতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব শ্বেতাশ্বতর ঋষি তপঃপ্রভাবে এবং দেবতার কৃপায় সাক্ষাৎ করেন।[৫] যে-তত্ত্ব গুহ্য তার সাধনাও যে গুহ্য ছিল তা সহজেই বোঝা যায়।

কৌলচারের গোপনীয়তায় উক্ত শ্রৌতধারাই অনুসৃত হয়েছে। তাই দেখা যায় ফেৎকারিণীতন্ত্রে আলোচ্য শ্রুতি বচনেরই প্রতিধ্বনি করা হয়েছে—এই বিদ্যা অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির কাছে সব রকমে গোপন রাখতে হবে। তাতে বিদ্যা বীর্যবতী হবেন, প্রকাশিতা হলে হবেন না।[৬]

---

১ বেদশাস্ত্রপুরাণানি সামান্যগণিকা ইব। ইয়ন্তু শাম্ভবী বিদ্যা গুপ্তা কুলবধূরিব।—কু ত, পঃ ১১

২ বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণমাজগাম গোপায় মা শেবধিষ্টেঽহমস্মি।
অসূয়কায়ানৃজবেঽযতায় ন মাং ব্রূয়া বীর্যবতী তথা স্যাম্।—দ্রঃ নিরুক্ত ২।৪

৩ বিদ্যা শ্রীবিদ্যা। ব্রাহ্মণং ব্রহ্মাধীতে ব্রহ্ম বেদ বা ব্রাহ্মণঃ।—বা নি ৩।৪-এর সে ব

৪ বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্। নাপ্রশান্তায় দাতব্যং নাপুত্রায়াশিষ্যায় বা পুনঃ।
—শ্বে উপ ৬।২২

৫ তপঃপ্রভাবাদ্দেবপ্রসাদাচ্চ ব্রহ্ম হ শ্বেতাশ্বতরোঽথ বিদ্বান্।—ঐ ৬।২১

৬ সর্বথা গোপনীয়েয়ং বিদ্যা স্যাদজিতেন্দ্রিয়ে। তেন বীর্যবতী বিদ্যা ন বিদ্যা স্যাৎ প্রকাশতঃ।
—দ্রঃ কৌ র, পৃঃ ১৭৮

কৌলাচারের গোপনীয়তা সম্বন্ধে মহানির্বাণতন্ত্রে আবার ভিন্ন মতও প্রকাশ করা হয়েছে। উক্ত তন্ত্রে সদাশিব বলছেন—পরব্রহ্ম সত্যস্বরূপ; সত্যই পরম তপ, সমস্ত সাধনক্রিয়া সত্যমূলক, সত্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই। কাজেই পাপ কলিতে মৎকথিত কুলাচারও সত্যভাবে এবং ব্যক্তভাবে সাধনীয়। গোপনতায় সত্যের হানি হয়, মিথ্যার আশ্রয় না নিলে কিছুই গোপন করা যায় না। সেইজন্য কৌলিকের প্রকাশ্যে কুলসাধনা করা উচিত। আমি কুলতন্ত্রসমূহে যে বলেছি কুলধর্ম গোপন করতে হবে এবং এইভাবে গোপন করার উদ্দেশ্যে কোনো মিথ্যাচার জুগুপ্সিত নয়, সে-বিধান প্রবল কলিতে প্রশস্ত নয়।[১]

কিন্তু কৌলাচারাদির সাধনা চলে গুরুপরম্পরায় আগত উপদেশ অনুসারে। এমন-সব ক্রিয়াকর্ম আছে যেগুলি গুরুর কাছেই হাঁতে কলমে শিখতে হয়। এ সম্পর্কে তন্ত্রের নির্দেশ সুস্পষ্ট—মন্ত্র এবং আচারাদি গুরুপরম্পরায় অবস্থিত। এই-সব গুরুমুখে লাভ করলে তবে সফল হয়, অন্যভাবে হয় না।[২]

সহজ কথায় বলা যায় অন্য তান্ত্রিক সাধনার মতো কৌলাচারের সাধনাও সম্প্রদায় অনুসারে হয়। সম্প্রদায় অনুসারে কৌলাচার গোপনীয়। কাজেই মহানির্বাণের অভিমত সম্প্রদায়বিরুদ্ধ বলে সাধারণতঃ সাধকদের নিকট গ্রাহ্য নয়। অবশ্য মহানির্বাণতন্ত্রোক্ত কোনো সম্প্রদায় থাকলে সেই সম্প্রদায়ানুযায়ীদের কাছে উক্ত মত গ্রাহ্য হবে সন্দেহ নাই।

কৌলাচারের ব্যভিচার—তবে মহানির্বাণতন্ত্রের উক্ত অভিমত থেকে একটি বিষয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কৌলাচারের গোপনতার জন্য এই আচারের নামে গোপনে গোপনে অনেক অনাচার এবং ব্যভিচার চলছিল। সম্ভবতঃ এই কারণেই মহানির্বাণতন্ত্র প্রকাশ্যে কৌলাচার অনুষ্ঠানের বিধান দিয়েছেন।

কৌলাচারের নামে ব্যভিচার যে চলছিল তার অন্য নিদর্শনও আছে। পরশুরামকল্প-সূত্রের বৃত্তিতে রামেশ্বর লিখেছেন[৩]—সম্প্রতি আধুনিক অজিতেন্দ্রিয় চপলজিহ্ব শিশ্নোদর-পরায়ণ লোকেরা আসক্তিতে অন্ধ হয়ে কেবলমাত্র পঞ্চমকারের লোভে কৌলিকতার ভান

১ সত্যরূপং পরং ব্রহ্ম সত্যং হি পরমং তপঃ। সত্যমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্বাঃ সত্যাৎ পরতরো ন হি।
অতএব ময়া প্রোক্তং দুষ্কৃতে প্রবলে কলৌ। কুলাচারোঽপি সত্যেন কর্তব্যো ব্যক্তভাবতঃ।
গোপনাকীয়তে সত্যং ন গুপ্তিরনৃতং বিনা। তস্মাৎ প্রকাশতঃ কুর্যাৎ কৌলিকঃ কুলসাধনম্।
কুলধর্মস্য গুপ্ত্যর্থং নানৃতং স্যাজ্জুগুপ্সিতম্। যদুক্তং কুলতন্ত্রেষু ন শস্তং প্রবলে কলৌ।—মহা ত ৪।৭৭-৮০

২ পারম্পর্যাং সমায়াত মন্ত্রাচারাদিকং প্রিয়ে। সর্বং গুরুমুখাল্লব্ধং সফলং স্যান্ন চান্যথা।—কু ত, উঃ ১১

৩ সম্প্রতি ইদানীন্তনাঃ অজিতেন্দ্রিয়াঃ চপলজিহ্বাঃ শিশ্নোদরপরায়ণাঃ রাগান্ধতয়া আরোপিত-কৌলিকতাকাঃ কেবলদ্রব্যমাত্রলোলুপাঃ লিখিতবচনাস্তনাদৃত্য স্বাধিকারমবিচার্যৈব স্বাভিপ্রায়সাধনানি "পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা" ইতি, "আগলান্তং পিবেদ্ দ্রব্যম" ইত্যাদিকুলার্ণববচনান্যেব পুরস্কৃত্য

করছে। এরা শাসন অগ্রাহ্য করে এবং নিজেদের অধিকার বিচার না করেই 'পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা,[১] 'আগলান্তং পিবেৎ দ্রব্যম্'[২] ইত্যাদি কুলার্ণবতন্ত্রবচন নিজেদের অসংযত অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্যে প্রমাণরূপে সামনে রেখে অর্থাৎ এই-সব বচনের দোহাই দিয়ে যথেচ্ছাচার করে বেড়ায়। তারা কুলার্ণবতন্ত্রের উক্ত বচনাদির হয় অভিপ্রায় জানে না, নয় জেনে শুনেই ধূর্তের মতো এইগুলিকে নিজেদের কাজে লাগায়। এই-সব লোক ইহলোক বা পরলোক কোথাও সুখ পায় না। প্রত্যুত মৃত্যুর পর শ্রীধর্মরাজের শাসনে মহাপাতকজনিত নরকযন্ত্রনা ভোগ করে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। তন্ত্রগোষ্ঠীতে এই-সব পতিত লোকদের নাম করা নেই।

রামেশ্বর অন্যত্র এই-সব তথাকথিত কৌলিকদের ব্যঙ্গ করেছেন। তিনি লিখেছেন[৩]—আজকাল কৌলিকাভাসগণ আমরা কৌলিক এই বলে নিজেদের জাহির করে এবং সেই অধিকারে, কিন্তু আসলে কৌলিকের যথার্থ অধিকারের নামগন্ধ না জেনেই, পানপাত্র বগলে নিয়ে ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর শিষ্টাভাসগণ এদের মণ্ডলে ঢুকিয়ে হবিঃশেষ কুলদ্রব্যের যথাবিহিত পাত্রসংখ্যা লঙ্ঘন করে পান করাচ্ছে। এই-সব পাত্রদাতাদের বার বার নমস্কার। কিন্তু এ-সব অসংকাজ আর নয়।

আকরগ্রন্থেও এরকম ব্যভিচারের পরোক্ষ উল্লেখ আছে। মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে—কলিযুগের শিশ্নোদরপরায়ণ লুব্ধ মানব পঞ্চতত্ত্ব নিয়ে ত সাধনা করবে না, লোভের বশে পঞ্চতত্ত্বের সেবা করে অধঃপতিত হবে। ইন্দ্রিয়সুখের জন্য প্রচুর মদ্যপান করে হিতাহিতজ্ঞানহীন মাতাল হবে। কেউ কেউ পরস্ত্রী-ধর্ষক হবে, ডাকাত হবে, মত্ত হয়ে নারী সম্পর্কে পাপাপাপ বিচারও করবে না।[৪]

তদভিপ্রায়মজানন্তো ধূর্তাঃ সন্তঃ যথেচ্ছাচারং কুর্বন্তি। ইহামুত্র ন কুত্রাপি শর্ম লভন্তে। প্রত্যুত মহাপাতকজনিতং দুঃখং শ্রীধর্মরাজশাসনাৎ লভন্ত এব। নাত্র সন্দেহঃ। তাদৃশাঃ পতিতাঃ তন্ত্রগোষ্ঠীষু ন স্মর্তব্যাঃ।—প ক সূ ১।১১-এর বৃত্তি

১ পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা যাবৎ পততি ভূতলে। উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে—কু ত, উঃ ৭

২ আগলান্তং পিবেদ্ দ্রব্যং স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ।—দ্রঃ প ক সূ ৫।২২-এর রামেশ্বরকৃতবৃত্তি

৩ ইদানীন্তনাঃ কৌলিকাভাসাঃ বয়ং কৌলিকা ইতি প্রতিষ্ঠাবন্তঃ অধিকারস্বরূপং অধিকারগন্ধমপ্যজানন্তঃ পানপাত্রং কক্ষে নিধায় গেহাদ্ গেহমটন্তি। তাংশ্চ শিষ্টাভাসাশ্চ মণ্ডলে প্রবেশ্য হবিশ্শেষং পাত্রসংখ্যামুল্লঙ্ঘ্য পায়য়ন্তি তেভ্যঃ দাতৃভ্যশ্চ ভূয়ো ভূয়ো নমঃ ইত্যলমসদাবেশেন।—প ক সূ ১০।২৬-এর বৃত্তি

৪ কলিজা মানবা লুব্ধাঃ শিশ্নোদরপরায়ণাঃ। লোভাত্তত্র পতিষ্যন্তি ন করিষ্যন্তি সাধনম্।
ইন্দ্রিয়াণাং সুখায় পীত্বা চ বহুলং মধু। ভবিষ্যন্তি মদোন্মত্তা হিতাহিতবিবর্জিতাঃ।
পরস্ত্রীধর্ষকা কেচিদ্দস্যবো বহবো ভুবি। ন করিষ্যন্তি তে মত্তাঃ পাপযোনিবিচারণম্।—মহা ত ১।৫৮-৬০

কুলার্ণবতন্ত্রেও এই ধরণের ভণ্ড মূঢ়দের উল্লেখ পাওয়া যায়। মহেশ্বর কুলধর্মের বিস্তর প্রশংসা করে উক্ত তন্ত্রে দেবীকে বলছেন—কুলধর্ম শ্রীগুরুর করুণাতেই লাভ করা যায়। ভুক্তিমুক্তিপ্রদ এই ধর্ম তোমার ভক্তেরাই জানতে পারে, অন্যেরা নয়। কিন্তু গুরূপদেশবর্জিত এমন-সব মূঢ় লোক আছে যাদের মহান্ত বলা হয়; যারা নিজেরা আগে মোহগ্রস্ত হয়ে অন্যদেরও পরে মোহগ্রস্ত করে। এই-সব দুরাচারপরায়ণ কোনো কোনো পামর আবার উপদেশও দেয়। এই ধরণের লোক যার সেবক সেই গুরুই বা পবিত্র হবে কেমন করে? পারম্পর্যবর্জিত মিথ্যাজ্ঞানবিড়ম্বক অনেক লোক কৌলধর্ম কল্পনা করে নেয় অর্থাৎ এরা শাস্ত্র জানে না, সম্প্রদায় জানে না, নিজের মনগড়া কৌলধর্মের অনুসরণ করে।[১]

অজিতেন্দ্রিয় শিশ্নোদরপরায়ণ মূঢ় ধার্মিকম্মন্য ব্যক্তিরা মনে করে মদ্যপানাদির দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হয়, মোক্ষলাভ হয়। কুলার্ণবতন্ত্রে এ সম্বন্ধে বড় সুন্দর কথা বলা হয়েছে—মদ্যপানের দ্বারা যদি সিদ্ধিলাভ হত তা হলে সব মদ্যপায়ী পামর সিদ্ধিলাভ করত। মাংস-ভক্ষণের দ্বারা যদি পুণ্য হত তা হলে সংসারে যত মাংসাশী আছে সব পুণ্যবান্ হয়ে যেত। আর স্ত্রীসম্ভোগের দ্বারা যদি মোক্ষলাভ হত তা হলে সংসারের সব স্ত্রীসংভোগকারী জন্তু মুক্তিলাভ করত।[২]

কাজেই দেখা যাচ্ছে কৌলাচারের ব্যভিচার সম্পর্কে শাস্ত্রও সচেতন এবং এ সম্বন্ধে সতর্কবাণীও যথেষ্ট উচ্চারিত হয়েছে।

---

১ গুরুকারুণ্যসংলভ্যমীদৃশং কুলদর্শনম্। ত্বদ্ভক্তা এব জানন্তি নেতরে ভুক্তিমুক্তিদম্।
গুরূপদেশরহিতাঃ মহান্ত ইতি কেচন। মোহয়ন্তি জনান্ সর্বান্ স্বয়ং পূর্ববিমোহিতাঃ।
দুরাচারপরাঃ কেচিদ্বাচয়ন্তি চ পামরাঃ। কথং পূতো ভবেৎ স্বামী সেবকাঃ স্যুস্তথাবিধাঃ।
বহবঃ কৌলিকং ধর্মং মিথ্যাজ্ঞানবিড়ম্বকাঃ। স্ববুদ্ধ্যা কল্পয়ন্তীত্থং পারম্পর্যবিবর্জিতাঃ।—কু ত, উঃ ২

২ মদ্যপানেন মনুজো যদি সিদ্ধিং লভেত বৈ। মদ্যপানরতা সর্বে সিদ্ধিং গচ্ছন্তু পামরাঃ।
মাংসভক্ষণমাত্রেণ যদি পুণ্যা গতির্ভবেৎ। লোকে মাংসাশিনঃ সর্বে পুণ্যভাজো ভবন্তি হি।
স্ত্রীসম্ভোগেন দেবেশি যদি মোক্ষো ভবতি বৈ। সর্বেঽপি জন্তবো লোকে মুক্তাঃ স্যুঃ স্ত্রীনিষেবনাৎ।—ঐ